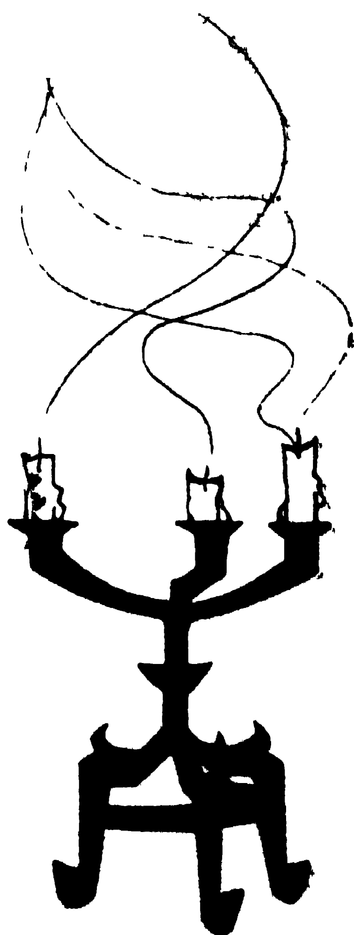
ক্লিম স্যাম্গিন

[১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব
ও তার আগে ও পরে]

ম্যাকসিম গর্কী





র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
৬ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা-১২

অনুবাদ : সৌরীন রায়
সম্পাদনা : পার্থকুমার রায়

প্রথম বাংলা সংস্করণ : ১৯৬৪

প্রকাশক :
বিমল মিত্র, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২
মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯

॥ ১ ॥

বাগানে চেরী গাছে ফল ধরেছে। থোলো থোলো বেগুনী রঙের ফল। তারি ছায়ায় ব'সে আছে ক্লিম সামঘিন আর স্পিভাকরা। সন্ধ্যে হয়েছে। গুমট হাওয়ায় ঝড়ের সংকেত। শ্যামাভ-ধূসর মেঘ স্তরে স্তরে ঢেউয়ের মতো ফুলে ফেনিয়ে উঠছে আকাশ জুড়ে। আকাশ নয় তো, মন্থন করা দুধের সমুদ্র। চলন্ত মেঘের ছায়ারা বাগানের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

আর একদিকে বিচিত্র স্তব্ধতায় স্থির হয়ে আছে ঘন পাতার জাল। গোল টেবিলটার ওপর কনুই ভর দিয়ে হাতের তেলোয় মুখ রেখে বসে আছে এলিজাবেথা স্পিভাক। একটা খুদে লাল রঙের পোকা বোকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে টেবিলটার ওপর,—সেই দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর স্বামী জানালাটার নীচে আদুর গায়ে মাদুরের ওপর শুয়ে খন্ খন্ ক'রে কাশছে আর আনমনে বাচ্চার ঠেলা-গাড়িটা আস্তে আস্তে ঠেলছে। গাড়ির মধ্যে বাচ্চাটা শুয়ে পা ছুঁড়ে খেলা করছে। তার মস্ত বড় মাথাটার নীচে গভীর কালো দু'টি শান্ত চোখ বুঝি আকাশের লেখা পড়ছে।

নিজ্নী নভগোরদ-এর বিরাট প্রদর্শনীতে যে কাণ্ড হ'য়ে গেল, তারই বিবরণ দিচ্ছিল ক্লিম। ওর মনে গভীর দাগ কেটেছে এই ঘটনা। তরুণ জারকে প্রথম যে-দিন দেখেছিল, সে-দিন ওরও মনে যে-আশার লহর উঠেছিল, তার কথা আজ মনে করতেও ওর লজ্জা। মানুষটার মুখের ওপরকার সেই অপরাধী হাসিটুকু ছাড়া আর কিছু ওর মনে নেই। বলছিল ক্লিম: 'একেবারে অপদার্থ। মন্ত্রীরা খুশিমত ওঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বাচ্চা ছেলের মতো।' নিজের মন্তব্যে নিজেই অবাক হয়ে যায় ক্লিম; কেমন একটু প্রতিহিংসার ঝাঁঝ রয়েছে ওর কণ্ঠে, কেমন একটু ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শ।...

মৃদু হেসে এলিজাবেথা বলে: 'ইনোকভ জারের কথা আমায় লিখেছে চিঠিতে। এসব কথা যে ও লেখে, বোধ হয় ওর ধারনা, ও আর আমি ছাড়া গোটা রুশ দেশটায় আর কেউ লেখা পড়া জানে না, আর পুলিশরা সব মূর্খ।'

লাল পোকাটা ক্লিমের কাছে এসে গেছে। টোকা দিয়ে ওটাকে সে নীচে ফেলে দিল।

'আচ্ছা খোদিন্কা সম্বন্ধে কোন কথা শুনলেন?' মাথা তুলে জিজ্ঞেস করে এলিজাবেথা। জারের অভিষেকের দিন মস্কোর খোদিন্কা ময়দানে সহস্রাধিক লোকের নিষ্পেষণে অপমৃত্যু ঘটেছিল।

'খোদিন্কা? না, শুনিনি তো কিছু!' উত্তর দিল ক্লিম। তাই তো! অত বড় একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘ'টে গেল মস্কোতে, সে-কথা ওর একবারও মনে হয় নি। হঠাৎ ওর খেয়াল হ'লো, এতক্ষণ ও জারের কথাই ভাবছিল। একটু শ্লেষের সঙ্গে ক্লিম বলে:

'সদাশয় মহানুভব জাত আমাদের, সব কথা ভুলে গেছে! কিন্তু ইনোকভ ভুলল

কি ক'রে! যে দুনিয়ার খবর কুড়িয়ে বেড়ায়, রাত দিন যার খবর শুনে আমাদের কান ঝালা পালা, এত বড় একটা খবর সে কি ক'রে ভুলতে পারে?'

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ক্লিম-এর দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে কি যেন বলতে যাচ্ছিল এলিজাবেথা। ঠিক এমনি সময় বাচ্চাটা চুক্ চুক্ শব্দ ক'রে উঠল। স্বামী ওর কাপড় টেনে ধরে বলল:

'ক্ষিদে পেয়েছে বোধহয় খোকার! খেতে চাইছে, দেখছ না!'

ছেলেকে কোলে তুলে পেছন ফিরে মাই দিতে দিতে বলল এলিজাবেথা, স্বরটা একটু নাকী শোনাল:

'সোনা মণি আমার, দেখছ তোমরা কি রকম শান্ত ছেলে আমার! একটুও কাঁদে না! নিজের মধ্যেই ডুবে আছে! এক মনে সংসারটাকে যেন যাচাই ক'রে দেখছে ও! ওরে আমার সোনা মাণিক রে!'

আলোর দিকে নিজের আঙুলগুলি ধ'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখছিল এলিজাবেথার স্বামী। পুত্রগর্বে উল্লসিত হয়ে উঠে সে বলে ওঠে:

'ও ভাবে কি জানো? ভাবে, আমার এই নখগুলোর মধ্যে বুঝি সুর লুকিয়ে আছে।'

অসহ্য আত্মম্ভরিতা! অসহনীয় বিরক্তিতে মনটা কেমন খিচ্ড়ে আছে ক্লিমের। একটা বিপুল অবসাদে ওর চেতনা ছেয়ে আছে। ওই নারী, যার শুভ্র বেশের ওপর নক্সা কেটে চলেছে চেরী গাছের ফল-পাতার নৃত্যপরা ছায়ার দল, যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত ওই সঙ্গীত-শিল্পীর কালো চশমা পরা পান্ডুর মুখ, বাগান খানার স্তব্ধতা, ঊর্ধ্বের স্নিগ্ধ আকাশ আর শহরের অলস কোলাহল গুঞ্জন...কিছুই ভালো লাগছে না ক্লিমের।

এর পর ক'দিন ধরে গুমট চলল আর ক'দিন ধরেই ওর মনের অবস্থাটা অমনি খিচ্ড়ে রইল একটা বিপুল পাষাণ-ভারের মতো। মা এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ভারাভকার ওপর ওর ভয়ানক রাগ হ'তে লাগল। প্রদর্শনীর পর তাঁরা দু'জনে চলে গেলেন ক্রিমিয়ায়। আর গোটা একটা মাস ওকে এখানে আটকে বসে থাকতে হ'লো। রাতে মনটা নারী-সন্ধাতুর হ'য়ে ওঠে। ভারাভকার মেয়ে লিদিয়ার কথা মনে পড়ে বার বার। তাকে ও ভালো বেসেছিল—ব্যর্থ হয়ে গেছে সে-প্রেম। ব্যর্থ হয়ে গেছে—কিন্তু এতটুকু নিষ্প্রভ হয়নি তার স্মৃতি। নিজের ওপর রাগ হয় ওর। একদিন সন্ধ্যে-বেলা গেল লিদিয়া যে-ঘরটায় থাকত সেই ঘরে। শূন্য ঘর—শূন্য স্প্রিং-এর খাট, গোটান পর্দাটা পড়ে আছে তার 'পর, বালিশগুলোতে ওয়ার নেই, আয়নাটা খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া, ঢাকনা-দেওয়া আরাম-চেয়ারটা জানালার পাশে এলিয়ে আছে; জানালার তাকে ফুল নেই, ফুলদানী সব খালি, টুকি টাকি জিনিস-পত্র কিছুই নেই বাইরে। ঘর খানার শূন্যতা যেন হা হা ক'রে ব্যঙ্গ ক'রে উঠে ওকে শুধায়: 'কোনদিন কি এখানে সে-মেয়ে ছিল?'

'ছিল, ছিল। আমার মনের বিপুল শূন্যতা যে সাক্ষ্য দিচ্ছে সে ছিল, সে ছিল...'

ওখান থেকে বেরিয়ে এল বড় ঘরটায় যেখানে শীতের দিনে বাচ্চারা খেলা করত। অনেকক্ষণ ধরে ঘরময় পাইচারী করে আর বেদনাহত মনে স্মৃতির ভান্ডার হাতড়ায়। কত সহজে মানুষ সব ভোলে। ভোলা যায় না শুধু সেইটে যা মনকে উতলা করে। বাবা হয়তো কোথাও বেঁচে আছেন। কই, তাঁকে একটুও আজ আর তো ওর মনে পড়ে না। মনে পড়ে না ভাই দিমিত্রিকে। কিন্তু না চাইলেও লিদিয়া এসে দাঁড়ায় মনের পটে। আজ যদি সে ফিরে আসত, দুর্ভাগ্য তাড়িত হয়েও যদি সে

ফিরত—, প্রেমে ব্যর্থ হয়েও যদি ফিরত! লিদিয়া! লিদিয়া—! এত অহঙ্কার তোমার কেন? কী আছে তোমার অহঙ্কারের? তোমার ঐ আকাশচুম্বী অহঙ্কার যদি ধূলিসাৎ হয়ে যেত, সত্যিই তুমি বেঁচে যেতে...রূপহীনা, বুদ্ধিহীনা তুমি, তবুও...

ধূলিকণা ভরাতি গৃহটির ধূসর শূন্যতা ওর সমস্ত চিন্তা-শক্তি যেন নিঃশেষে শুষে নিল। ঘরে, উঠানে ইতস্ততঃ আনাগোনা করছে ভৃত্য-পরিজনেরা দল। রেলের যাত্রী-গাড়ির জানালা দিয়ে দূরের মাঠে-চরা গোরুর পালের দিকে যেমন ক'রে চেয়ে থাকে, তেমনি ক'রে এই মানুষগুলোর দিকে চেয়ে থাকে ক্লিম। বিরক্তিতে অবসাদে ও যেন তলিয়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে ফুলে ফেঁপে উঠছে শুধু অবসাদ। কোন কিছুই ভাল লাগছে না...লোকজন, বাড়িঘর, শান্ত কর্দমাক্ত নদীর তীরে হুমড়ি খেয়ে পড়া শহরের কোন কিছুই নয়। নিজ্‌নী-নভগোরদের সেই বিরাট প্রদর্শনীর চিত্র, স্বপ্নের মতো ওর মন থেকে মুছে যাচ্ছে...আর সেখানে মাথা উঁচিয়ে উঠছে জারের মূর্তি।

এলিজাবেথা বাড়িতে থাকে নিঃশব্দে; তার নড়া চড়ার শব্দ নেই; মেয়েলী উপদেশ কিংবা শ্লেষের হুল ফুটানো বক্তৃতা নেই। ভাল লাগে ক্লিমের, আবার মনে খোঁচাও লাগে। সে স্কুল নিয়েই ব্যস্ত। কথা বলে না। যে-টুকু বলে, তাও ওই স্কুল আর ছাত্র। আর কিছু নয়। স্বামী-পুত্র ছাড়া আর সব কিছুর ওপরেই যেন তার একটা নিরাসক্ত ভাব। তাকে দেখে মনে হয় যেন সদা পরিশ্রান্ত, নিজের মধ্যেই যেন সে ডুবে থাকে। সকাল ন'টায় চলে যায় স্কুলে, ফেরে বিকেল তিনটেয়। পাঁচটা থেকে সাতটা অবধি ছেলে কোলে আর বই হাতে নিয়ে পায়চারী করে বাগানে। সাতটায় চলে যায় আর-একটা অপেশাদারী ভজন গানের আসরে বাজাতে। ফিরতে রাত হয়। কোন কোন দিন সঙ্গে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যান গির্জার উপাসনা-সঙ্গীতজ্ঞ। লম্বা চুল, বেঁটে-মোটা ফুলবাবুটি। হাতে পানামা ছড়ি। গোঁফ জোড়া বেশ পুরু—দেখে মনে হয়, ঠোঁটের ওপর যেন আলকাতরার দুটো টান দেওয়া রয়েছে। দু' একবার ক্লিমকে বলেছে এলিজাবেথা:

'প্রদর্শনী সম্বন্ধে আপনি কিছু লিখুন না!'

'হাঁ, লিখছি—' উত্তর দিয়েছে ক্লিম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, শুরুই করতে পারেনি এই ক্লান্তিকর অবস্থায়।

এলিজাবেথা ভোর বেলা বেরিয়ে যাবার পর তার স্বামী খানিকটা পা টেনে টেনে পায়চারী ক'রে বেড়ায় বাড়ির দোরগোড়া হ'তে গেট পর্যন্ত। নতুন হাঁটতে-শেখা শিশুর মতো তার চলায় কেমন একটা শিথিল অনিশ্চয়তা। একটা নিশ্বাস হাল্কা-করার যন্ত্র গলায় বাঁধা। থুতনিটা তাতে একটু উঁচু হয়ে থাকে। ঝাঁকড়া-চুলো মাথাটা হঠাৎ দেখলে মনে হয় লোমশ কুকুরের মাথার মতো। কালো লোম-ওঠা কোটটা পরে ভদ্রলোককে ঠিক সার্কাসের কুকুরের মতো লাগে।

ক্লিম-এর সাথে দেখা হ'লেই যন্ত্রটা একটু নামিয়ে নিয়ে আরম্ভ করে সেই এক কথা। সঙ্গীতের কথা। দুই হাতের সাতটা আঙুল ক্লিমের চোখের সামনে তুলে ধরে বলে:

'এই দেখ, দেখছ! সাতটা মাত্র সুর, বুঝলে! মাত্র সাতটা। অথচ এই দিয়েই বিঠোফেন, মোজার্ট, বাখ্—এঁরা কি অপরূপ সৃষ্টিই না ক'রে গেছেন! ওই একই মসলা সব কিছুতে। আমরা আর পেলাম কতটুকু! কিন্তু ওই দিয়েই তো অফুরন্ত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছি!'

তার মতে কথার ভাষার চেয়ে সংগীতের ভাষা অনেক বেশী ঐশ্বর্যশালী। বলে: 'এই দেখ না, একটা সুরসংগতি, একটা কর্ড তোমাকে বোঝাতে হ'লে ডজন খানেক কথা খরচ করতে হবে।'

আর একদিন, এক গুমোট সন্ধ্যায়, জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে স্পিভাক ক্লিমকে বলে—যেন একটা জরুরী খবর বলছে—এমনি ভাবে:

'এবার আমার দিন ঘনিয়ে এল ক্লিম, এই শরতেই বোধহয়—'

'কি বাজে বক্‌ছ। ওসব বলে না।' পাছে তাকে তুচ্ছ করছে ভাবে, তাই জবাব দিল ক্লিম সামঘিন।

'আমার স্ত্রীও বিশ্বাস করতে চায় না।' আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা জটিল নক্সা আঁকতে আঁকতে বলে স্পিভাক: 'কিন্তু আমি তো জানি; জানি যে শরৎকাল এবার আর কাটছে না। ভাবছ, ভয় পেয়ে গেছি! না, ভয় টয় আমার নেই। তবে একটু দুঃখ হয় বৈকি। গান বাজনা শেখাতে বড় ভালো লাগে আমার।'

নিজের কাঠির মতো আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার জীর্ণ পঞ্জর ভেদ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

'আমার স্ত্রীও ভালোবাসে বাজনা শেখাতে। সত্যি ভালোবাসে। জীবনটাকে অর্কেস্ট্রার মতোই গড়ে তোলা উচিত। সবাই যদি খাঁটি হয়ে নিজের নিজের কাজ ক'রে যায়, কি সুন্দর হয় বলতো!'

বলতে বলতে হাঁপায় সে। গলার কাছে একটা ঘর্ঘর শব্দ ওঠে। হঠাৎ মাথাটা দু' হাতে চেপে ধরে হাঁচতে আরম্ভ করে। তারপর দম নিয়ে আবার বলে:

'শহরটার ধুলোয় যেন পুরীষের গন্ধ।'

ক্লিম সামঘিনকে সহ্য করতে হয় স্পিভাকের প্রলাপ। লিদিয়ার বন্ধু দিয়োমিদভের কথা মনে পড়ে...মস্কোএ তার প্রলাপও শুনতে হয়েছিল এই ভাবে। এ যেন আরও বিরক্তিকর, অসহনীয়। পত্রিকা-অফিসের দিকে ক্লিম পা বাড়ায় এই বিরক্তি-ভাব কাটাবার জন্য।

*

মধ্যবিত্ত পল্লীতে দভরিয়ানস্কাইয়া রাজপথ ও তার পার্শ্ববর্তী একটা কানা-গলির মোড়ে অবস্থিত পত্রিকা-অফিস। এক অনাথ আশ্রমের লৌহ কপাটে এসে শেষ হয়েছে কানা গলিটা। মোড়ের দু'তলা প্রাচীন বাড়িখানা দুটো অংশে বিভক্ত: একটা অংশ বড় রাস্তার ওপরেই; আরেকটি অংশ গেছে বন্ধ গলির মধ্যে। কারুকার্যহীন প্রাচীন দেয়ালের উপর ধুলো জমতে জমতে সমস্ত বাড়িটায় কেমন বৈচিত্রহীন ব্যারাক-বাড়ির কাঁচা-চামড়ার রং এনে ফেলেছে। রোদে-জলে জানালার আসল রং কবে মুছে গেছে। আধ-বোঁজা জানালার উপর বিচিত্রিত সাইন-বোর্ডে লেখা চোখে পড়ে: ন্যাস ক্রে (আমাদের এলাকা)।

নীচের ঘরে খটাং-খট্ ক'রে সশব্দে মুদ্রণযন্ত্র চলেছে...দোতলায় উঠবার লোহার সিঁড়ি কেঁপে উঠছে। সেই কম্পমান সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে বড় একখানা ঘরে প্রবেশ করল ক্লিম। ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল...মসীলিপ্ত অয়েলক্লথ বিছানো রয়েছে তার উপর। ইভান দ্রোনভ মৃদু শিস দিতে দিতে নোট বই দেখে একটা লম্বা কাগজে কি যেন টুকছিল।

ক্লিম সামঘিনকে প্রথমে দেখে ঠিক যেন চিনতে পারে নি এই ভাবে অভ্যর্থনা জানাল সে। ক্লিমের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখে পরমুহূর্তে দ্রোনভ দুহাতে তার হাত জড়িয়ে ধরে আপ্যায়ন জানাল...তার এই ফুটিয়ে-তোলা আতিশয়ভাবটা যেন বড় বেশী চোখে ঠেকে।

'কবে ফিরে এলি রে?'

'তোর খবর কি?—' ক্লিম উল্টো প্রশ্ন করে। দ্রোনভের আনন্দ-প্রকাশের আতিশয়-চেষ্টায় সে কেমন একটু হকচকিয়ে গিয়েছে।

'আর আমাদের খবর! নির্বোধ আমরা...জঞ্জাল নিয়ে কারবার আমাদের—তারই ওপর খবর সাজানো আমাদের পেশা—অর্থাৎ ছিবড়ের ব্যাপারী। আজে-বাজে কিছু নিয়ে এস, তার ওপর রঙ চড়িয়ে সংবাদ সৃষ্টি ক'রে দু'চারদিন আমরা ঐ একই খবর বেশ চালিয়ে যাব...। আর, এমন শহর এটা, যে, কোন খবরের বালাইও নেই এখানে। খবর পেতে হলে নিজে গিয়ে লুট-তরাজ, খুন-জখম ক'রে একটু সংবাদ তৈরি করতে হয়।' ঘাড়-কামানো দ্রোনভের মাথাটা যেন আরও বড় মনে হয়, তার থ্যাবড়া নাকটা যেন আরও ফুলে উঠেছে। কথা বলতে বলতে মসীলিপ্ত টেবিলের উপর কলমের গোড়া দিয়ে ৪-অক্ষরটি ঘষে ঘষে সে লিখে চলে। দোরের ও-পাশে সম্পাদকের ঘর থেকে কাগজের খস খস শব্দ আসছে, তাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনবার চেষ্টা করছে। যেন একটা বিড়াল কাগজ নিয়ে খেলা করছে ঐ ঘরে।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে সম্পাদক দ্রোনভের ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর কতগুলো কাগজের স্লিপ। চেঁচিয়ে বললেন:

'দ্রোনভ! কি করেছ তুমি—! আরে, আরে আপনি! আসুন, আসুন—!' দোর খুলে ক্লিমকে সম্পাদক সাগ্রহে নিজের ঘরে নিয়ে যান। সম্পাদকের মুখোমুখি বসে ক্লিম শুনতে থাকে:

'সেন্সর ভুগছে লোগোফোবিয়ায় অর্থাৎ ভাষার ভীতি তাদের, কথাতঙ্ক; আর পত্রিকা-লিখিয়েরা ভুগছে 'কোপিয়া ভারবোরামে'...অর্থহীন আর প্রগতিবাদী ভাষার মার প্যাঁচে...কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে তারই এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা মশাই—'

সম্পাদক কথা বলছেন অতি ধীর-শান্ত ভাষায়, কারও বিরুদ্ধে তাঁর কোন নালিশ নেই। মাঝে মাঝে রুমাল বের ক'রে ফ্যাকাশে কপালের ঘাম মুছে ফেলছেন। লাতিন কথা ব্যবহার করবার সময় তাঁর নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ চাপ খেয়ে গাম্ভির্য তারা সৃষ্টি করছিল। ক্লিম জানতো পত্রিকা-অফিসে দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই লাতিন ব্যবহার করা হয়...সম্পাদকীয়তে লাতিন কথা হলো অলঙ্কার: 'অ্যাব ওভো, ও টেম্পোরা! ও মরেস! ডিখি টেস্টিমোনিয়াম পপারতাতিস...' প্রভৃতি কথা ব্যবহার পত্রিকা-জগতে সুলভ। সম্পাদকের পিছনে কাঁচের আলমারী ভর্তি বই; সম্পাদকের ছায়া পড়েছে কাঁচের উপরে...মেয়েলী স্কন্ধ, ঈষৎ চকচকে গ্রীবাসন্ধি, ধূসর পৃষ্ঠদেশ, দেখে মনে হয় যেন আলমারীর মধ্যে সম্পাদকের একটা জীবন্ত নকল মূর্তি কাজ করছে।

'তবেই বুঝতে পারছেন মশাই, এই অবস্থায় গণমত সৃষ্টি ও চালনার পথে কত বড় ব্যাঘাত-বিপত্তি রয়েছে। এর পরে আছে এমন সব লোক যারা এসে নির্বি-চারে জোরের সঙ্গে অভিমত জানিয়ে যাবে যে, তার ঐ বিশেষ মতই ঠিক, অন্য সব মত ভুয়ো। সর্বোপরি আছে মশাই মার্ক্সবাদীরা—জনসাধারণের প্রতি দরদহীন সখের বিপ্লবী এরা!'

কালি-কাগজের ভ্যাপসা গন্ধে ঘর ভর্তি, চারদিকে ছেঁড়া কাগজ ছড়ানো। মেঝের নীচে এক দৈত্যের কঠিন ঘটাং-ঘট একটানা ঘর্ঘর শব্দ। একটা মাছি বারে বারে সম্পাদকের ঘর্মাক্ত কপালে বসবার চেষ্টা করছে। হাত দিয়ে মাছিটাকে তাড়াতে তাড়াতে শ্রান্তির নিশ্বাস ফেলে সম্পাদক আবার বলেন:

'প্রদর্শনী সম্বন্ধে তো আপনার লেখা, তাই না?—' পান্ডুলিপিটা দিয়ে সজোরে নিজের কপালে মাছি মারতে মারতে তিনি বলতে থাকেন: 'সংবাদদাতা হিসেবে ইনোকভকে দিয়ে কিছু হবে না—' মাছিটা টেবিলের উপর পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই দেখতে দেখতে তিনি বলে চলেন: 'ইনোকভ হলো মানব-দ্বেষী। কোষ্ঠ কাঠিন্য হলেই লোক এইরকম নর-বিদ্বেষী হয়। এ-সব আমার মত নয়, মনস্তত্ত্ববিদ কোভালেভস্কিও আমাকে বলেছেন যে প্রাচীন এথেনবাসী টাইমনও নাকি কোষ্ঠ কাঠিন্যে ভুগতেন। এবং নর-বিদ্বেষীদের এটাই বলে লক্ষণ।'

মাছিটাকে মেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সম্পাদক, ঠোঁটদুটো একটু প্রসারিত হয়ে পড়ল। সামঘিনের মনে হলো সম্পাদক মৃদু হাসছেন।

'আর তা ছাড়া, ইনোকভ এ-রকম অদ্ভুত কবিতা লেখে...একেবারেই হাস্যাস্পদ কবিতা। হুঁ, আর-একটা কথা, স্থানীয় কবিদের লেখা গজ কয়েক কবিতা আমার হাতে এসে পড়েছে। একবার চোখ দুটো বুলিয়ে যাবেন নাকি? রবিবাসরীয় সংস্করণে দেওয়া যেতে পারে। বলতে কি মশাই, এই নতুন কবিতা আমি ঠিক বুঝি না।'

কপাল কুঁচকিয়ে ড্রয়ার থেকে এক তাড়া বিভিন্ন ধরনের কাগজ ক্লিমের সামনে দিয়ে বললেন:

'এই যে এইটে! সপ্তাহ কয়েক আগে দ্রোনভ একটা ভারী সুন্দর কবিতা দিয়েছিল। পত্রিকায় ছাপলাম। পরে শুনলাম ওটা বেনেদিকতভের লেখা! চমৎকার হাসির খোরাক হয়ে পড়েছি মশাই আমরা শহরে। দ্রোনভকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এরকম করলে? সে জবাব দিল কি জানেন? সে বলল যে, এ-কবিতা তাকে এক পরিচিত ধর্মতত্ত্বের ছাত্র দিয়েছিল। মশাই, এই সব ব্রহ্মবিদ্যার ছাত্রদের আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।'

এমনি সময় হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল কলমী রবিন্‌সন্‌। ঢুকেই উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল:

'কি, আবার আমাকে জবাই করা হয়েছে তো?' তারপর ক্লিমের কর-মর্দন করতে করতে বলে উঠল:

'এ মাসে আমার পাঁচ নম্বর।' অর্থাৎ পাঁচ নম্বর প্রবন্ধ।

তারপর জানালার তাকে ব'সে প'ড়ে কাশতে আরম্ভ করল। কাশির দমকে ওর হলদে মুখটা লাল হয়ে উঠল, যেন এক্ষুণি ফেটে পড়বে। সরু সরু প্যাঁকাটির মতো ঠ্যাং দু'টোর গোড়ালি পাঁচিলের গায়ে আছড়াতে লাগল সাংঘাতিক ভাবে। গা থেকে খ'সে পড়ল জামাটা, মাথাটা ঝাঁকুনি খেতে লাগল পাগলের মতো, বিস্রস্ত বিবর্ণ চুলগুলো এসে পড়ল মুখের ওপর। কাশি থামলে শুকনো রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে বলল:

'সর্দি হয়েছে বড়।' তারপর বলতে আরম্ভ করল ওর সাংবাদিক জীবনের এই ন'টি বছর সেন্সর-প্রভুরা কি কান্ড করেছেন ওর লেখা নিয়ে। এতদিন ওর যত লেখা তাঁরা ধামা-চাপা দিয়েছেন, তা দিয়ে ফি-পাতায় আড়াই হাজার হরফওলা তিন শ' কুড়ি পাতার এগার খানা বই নাকি হয়ে যায়। সামঘিন বোঝে লেখাগুলো

না বেরুনতে রবিনসনের আফসোস নেই বিন্দুমাত্রও, বরঞ্চ এর জন্য ও বিশেষ গর্ব বোধই যেন করে।

এক চোখে একটা পাণ্ডুলিপি, আর এক চোখে একটা বেয়াড়া মাছিকে নিরীক্ষণ করতে করতে সম্পাদক বললেন:

'বড্ড ফোলাচ্ছেন যে মশাই নিজেকে!' কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রবিন্‌সন। কিন্তু কাশির বেগ এসে বাধা দিল। কাশতে কাশতে লাফিয়ে উঠল ও, গয়ার ফেলল ছেঁড়া-কাগজ-ফেলা ঝুড়িতে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে সম্পাদক ওটাকে পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। এবং বিরক্ত ভাবে ঘন্টাটা টিপ্‌লেন।

'আজও পিক্‌দানীটা রাখতে ভুলে গেছে দেখছি!' আপন মনে গজরাতে লাগলেন তিনি।

দ্রোনভ এল।

'তোমায় তো ডাকিনি। ডেকেছি বেয়ারাটাকে।'

'স্থানীয় সংবাদ।' দ্রোনভ বলে।

'বল।'

'একজন জলে ডুবে মরেছে, দুটো ছিঁচ্‌কে চুরি, বাজারে একটা হাঙ্গামা, একজন জখম।'

ক্লিমের হাত ধ'রে ব'লে উঠল রবিনসন: 'একেই বলে জীবন! চলো ভাই, একটু বীয়ার খাওয়া যাক কোথাও গিয়ে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সম্পাদকের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বলে যেতে লাগল দ্রোনভ:

'মেয়রের দুইজন সহকারী গ্রাশেভ্ এবং তিমোফিয়েভ্। কাল টাউন-হলে জেল-ইনস্পেক্টর তোপোরকভ্ গ্রাশেভ্‌কে বোকা, এবং তিমোফিয়েভ্‌কে চোর বলেছে।'

'কিন্তু দু'জনের কেউই তো বিশ্বাস করেনি তা।' ব'লে ক্লিমকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রবিন্‌সন।

*

সামগ্রিক ভাবে ভালোই হলো, সুযোগ পাওয়া গেল। ভালো ক'রে পরখ করা যাবে লোকটাকে। সবাইকে সমালোচনা করার আর উপদেশ দেবার অধিকার আছে বলে যিনি মনে করেন, তিনি নিজে কেমন দেখা যাক। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কথা বলতে বলতে ধুলোর জন্য আধ-বোজা চোখে লম্বা লম্বা পা ফেলে, কাশতে কাশতে বাতাস উড়িয়ে চলেছে রবিনসন।

'ভাল্‌হল্লায় চলেছি আমরা। আসল নাম ভল্‌গা; ও-নামটা আমার দেওয়া। জায়গাটা রাশিয়ান...এই যাকে বলে সত্যি ভাল্‌হল্লাই। আমাদের মহারথীরা এবং আরো অনেকে সর্বনেশে খেয়ালের তাড়নায় যখন জ্বলে পুড়ে খাক হন তখন এখানে আসেন আত্মার শান্তি খুঁজতে। কোন্ প্রবৃত্তির তাড়নায় তুমি চঞ্চল হয়েছ, তরুণ বন্ধু? বলো দেখি।'

ছিম্‌ছাম্ পরিচ্ছন্ন রাস্তা। দুই ধারে রঙ বেরঙের ছোট ছোট বাড়ি। সামনে পেছনে এক এক ফালি বাগান।

লোভীর মতো বুক ভরে উষ্ণ বায়ুর নিশ্বাস নিয়ে আপন মনে বলে রবিনসন:

'ভারী চমৎকার বাড়িগুলো। কিন্তু দুনিয়ার যত গোঁড়ামীর আড্ডা। যেখানে আরাম সেখানেই গোঁড়ামী..."

সামঘিন বলে: 'এই সব হতভাগারা যাদের ঘর বাড়ি নেই, কোন দায়িত্ব নেই, খোয়াবার মতও কিছু নেই...'

'তলস্তয়-এর লেখা আকিম্ চাচার "জলের ঘড়ার" আরাম সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তিটা মনে আছে তো?'

জবাব দিল না ক্লিম, শুধু একটু হাসল। প্যাঁকাটির মতো লোকটা; তার হল্‌দে জ্যাকেট পরা, হলদে টুপী হাতে এক মাথা শনের নুড়ির মতো রুক্ষ চুল, নুয়ে-পড়া বিচিত্র চেহারাটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন উল্লসিত হ'য়ে ওঠে ও। লোকটার সম্বন্ধে ওর যা ধারণা ছিল তার বিপরীত কথাই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল:

'লোক তুমি খারাপ নও বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'ঠিক বলেছো,' রবিনসন ব'লে ওঠে: 'কিন্তু খারাপ হওয়া দরকার। বিশেষ ক'রে আমার যা পেশা তাতে।'

একটা খাড়া টিলার মতো জায়গা। ঈষৎ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে নদীর বুক পর্যন্ত। টিলাটার ওপরেই পান-শালা। একটা ঝুল-ছাদ কয়েকটা মাত্র বরগার ওপর ভর করে শূন্যে ভেসে আছে। মনে হয়, একটা বিরাট তাক যেন ঝুলে আছে। মহা-বৃদ্ধ লিন্ডেন গাছগুলির মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায় নদীর নীল রেখা। জলের বুকে গলিত সূর্যের ঝরা আগুন। দূরে বালিয়াড়ির ওপর গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে চাষীদের মেটে রঙের কুটির। আরও দূরে জুনিপার গাছে ঢাকা পাহাড়ের সার। এবং তারও ওপারে বর্ণাঢ্য মেঘের জলুষ পৃথিবীর বুক থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়েছে ঊর্ধ্বাকাশে।

ছাদের এক কোণে ব'সে আছে বিপুল-দেহা এক মহিলা। ভাঁজ-পড়া মাংসল চিবুক, তরমুজের মতো মুখ, বাজ পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক; তার নীচে এক জোড়া কালো গোঁফ। নাকটাকে নকল নাক বলে মনে হয়। সামনের টেবিলে একটা খালি আইস্-ক্রীমের প্লেট্। মহিলার মুখে বিরক্তির চিহ্ন; আর কি রকম একটা একলা-লাগা ভাব।

ক্লিমের কানে কানে বলে রবিন্‌সন: 'মাদাম কাসপারী—নামকরা আড়কাঠি। এর সম্বন্ধে কাগজে কিছু লিখেছ কি সেটা সেন্সরের কড়া হুকুমে—'

অল্পবয়সী এক পরিবেশক এগিয়ে আসে। মোলায়েম স্বরে ফরমায়েস করে রবিন্‌সন:

'মাছ, ডিম, আর দুটো বীয়ার দাও, মিশা।'

বলেই অস্থির ভাবে সিগারেট ধরায় রবিন্‌সন। ক্লান্ত পা দুটোকে টেবিলের নীচে ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের পিঠে দেহটা এলিয়ে দেয়। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করে। ওর চোখে কেমন যেন একটু অভদ্ররকম কৌতূহল:

'এ জেনারেশন মানুষের ওপরেই যখন হতাশ হয়ে পড়েছে তখন তাদের কাছ থেকে কি আর আশা করা যায় বলো! মনে হয় নায়কদের সম্বন্ধে তোমাদের ঘোর আপত্তি, এমন কি হয়তো ভয়ও আছে; অথচ ইতিহাসকে এখনও অগাস্টাস্ বেবেল্ এবং তাঁর মতো মানুষদের কীর্তি বলেই মনে করা হয়। আমার মনে হয়, তোমরা নারোদনিক্‌দের চেয়েও ঢের ঢের বেশী ব্যক্তি-তান্ত্রিক। জন-সাধারণকে তোমরা সামনে রেখেই চলো যাতে নিজেরা এক পাশটিতে সরে

থাকতে পারো। উস্পেনস্কির মতো জনসাধারণকে ভালোবেসে অমন ক'রে আত্মদান করতে পারা, মনে তো হয় না কেউ আছে তোমাদের মধ্যে।'

কড়া রকম একটা জবাব দেবার মতো কথা হাতড়াতে হাতড়াতে রাগে ফুলতে লাগল সামঘিন। রাজনীতি চর্চা করার ইচ্ছে ওর একটুও ছিল না। বরঞ্চ ও চেয়েছিল খুঁজে বের করবে—লোকটা এই যে মনে ক'রে নিয়েছে যে সক্কলের ও খুঁৎ ধরতে পারে, সমালোচনা করতে পারে,—এ বিশ্বাসটা ওর এল কোত্থেকে, তার মূলটা কোথায়! এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে, সমস্ত মুখটা কুঁচকে একটা কুৎসিত হাসি হেসে বলে যেতে লাগল রবিন্সন:

'মনে আছে কি মর্মান্তিক ভাবে উনি কেঁদে গেছেন এই কথা ব'লে ব'লে যে গতানুগতিক মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, আর বাগাড়ম্বরের ওপর দিয়ে গড়ে উঠুক মহাজীবন। আর এজন্য "ভয়ানক চেষ্টা" করা দরকার যাঁরা প্রাজ্ঞ আর যাঁরা সাচ্চা মানুষ তাদেরই।'

রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে বড় বড় খণ্ড ক'রে রেলিঙের ওপর দিয়ে পায়রাদের দিকে ও ছুঁড়ে দেয়। ঝুঁটি মাথায় মেঘ রঙের নোটন পায়রাগুলি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে কাড়াকাড়ি ক'রে খায়। তাকিয়ে থাকে রবিন্সন। ওর অস্থিসার বিশীর্ণ মুখটা কি এক চিত্ত-বৈকল্যে কাঁপতে থাকে।

'জীবনের দাবী যেন কেবলি বাড়ছে। আর আমি ভাঁড় সেজে অভিনয় ক'রে চলেছি। পারিনে আর এ অভিনয় করতে। বড় ক্লান্ত আমি। বন্ধু, খবরের কাগজের কলমীরা হচ্ছে হাতুড়ে বদ্যি, ভাঁড়।'

চেয়ার থেকে একটু উঁচু হয়ে পায়রাগুলির দিকে একটা কর্ক-ছুঁড়ে মেরে বলল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে: 'বোকা পাখি! যাক গে ছাই। উস্পেনস্কি ছিলেন আশাবাদী।... মিথ্যে আর ছেঁদো কথার ওপর অতি সহজে জীবন গড়ে ওঠে, তার জন্য বিবেক আর বুদ্ধির কাঠ-খড় পুড়িয়ে "ভয়ানক চেষ্টা" করতে হয় না।'

অতি দ্রুত কথা বলছে রবিনসন; যেন এই বিষয়ের পর-মুহূর্তেই আর-এক বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেয়াল খুশি মতো এলোমেলো পথে চলতে হবে। ক্লিমের মনে হয় এই চলার মধ্যে কি যেন একটা আছে জট্ পাকান, উল্টোপাল্টা, কি যেন স্বীকারোক্তির মতো। নীরবে বসে রইল ক্লিম; দরদ উচ্চারিত হয়ে উঠল ওর চোখে মুখে। একটু খুশিও হলো দেখে, যে যতটা গুরুত্ব লোকটাকে ও দিয়েছিল ঠিক ততটা ওজন তার নেই।

কাঁটা দিয়ে জেলী-লাগান মাছটা তুলল এবং অন্যমনস্ক ভাবে তাড়াতাড়ি জেলীটুকু খেয়ে ফেলে বলল:

'আমি স্রেফ মাছ আর ডিম খাই। খুব ফস্‌ফরাস্ আছে এ দুটো জিনিসে।'

ডিম কিন্তু খেল না ও। দু' হাতে কাগজে জড়িয়ে পকেটে রেখে দিল।

'একটা কুকুর আছে, তার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। আশ্রয়-হারা রাস্তার কুকুরগুলোর জন্য কি জানি আমার কেমন মায়া হয়। বোধ হয় ওটা আমার রোগ। অমন দরদী জীব আর হয় না। কিন্তু কে তার কদর করছে? মানুষকে অত ভালো আর কেউ বাসতে পারে না কুকুরের মতো।'

মদের মতো একটু একটু ক'রে বীয়ার খায় সামঘিন। মুখ বাঁকা ক'রে ঠোঁট চাটে। তারপর হঠাৎ খুশি হ'য়ে উঠে বলে:

'উপাখ্যান-টান কেমন লাগে হে? আমার ভারী ভালো লাগে।'

ডান চোখটা বন্ধ ক'রে মাঝে মাঝে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে রবিন্সন কাকে যেন নকল ক'রে বলে:

'মানুষ আপন মনের কৌতূহলে পৃথিবীটাকে পুরাণ-উপাখ্যানের মতো ক'রেই দেখে। না না, সত্যি বলছি আমি। একাদিক্রমে এগারোটা শহরে থেকেছি। কি কুড়িয়ে এনেছি সে-সব জায়গা থেকে? কতগুলি গল্প। বাস্। কাজান্-এ আমার বাড়িওলার নাম ছিল স্কোপেৎস্—দুঁদে লোক। লগ্নী কারবার ছিল লোকটির। ও আমাকে বলেছে, গেব্রাইল দরঝাভিন্-এর নাকি মেলা টাকা ছিল। কিন্তু হ'লে হবে কি—সব সময় ভাব দেখাত, যেন কিচ্ছু নেই। ভিখিরীর মতো রাস্তায় দুঃখের গান গেয়ে বেড়াত। এই ভাবে ও বছর চল্লিশ বয়েস পর্যন্ত কাটিয়ে দিলে। তারপর পড়ল গিয়ে সম্রাট আলেক্জান্দারের খপ্পরে। সম্রাট ছিলেন অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ। দিলেন তাকে ঠুকে একেবারে সাইবেরিয়ায়। শুধু তাই নয়, আরো ভালো ক'রে লোকটাকে জব্দ করবার জন্য ওর একটা মূর্তি গড়ালেন—পরনে ছেঁড়া নেংটি, হাত বাড়িয়ে যেন ভিক্ষে করছে। সেটাকে রেখে দিলেন একেবারে থিয়েটারের দোর-গোড়ায়। এবার কেমন জব্দ বাছাধন!'

রবিন্সনের হেঁড়ে গলাটায় কেমন যেন একটা ব্যথার সুর বেজে ওঠে। বিদ্রূপের হাসি হেসে ও ঢাকতে চেষ্টা করে তা। ওর চোখ দুটি ক্ষণে ক্ষণে কিসের জ্বালায় ধক্ ক'রে জ্বলে উঠেই যেন এক ফুঁয়ে নিবে গিয়ে পক্ষ্ম-জালের তলায় একেবারে হারিয়ে যায়—কোটর গত সেই চোখ দু'টি হতে, তাদের চারদিকের কাক-চরণ-চিহ্ন গুলি থেকে জন্ম নিয়ে কালো কালো ছায়ারা ছড়িয়ে যায় ওর খোঁচা খোঁচা হাড়-বের-করা মুখটার ওপর।

'দরঝাভিন উপাধিটা কোত্থেকে পেল জান? মহামান্বিতা সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের রাজ-প্রাসাদে ঘর গরম রাখার অগ্নি-কুণ্ড জ্বালাবার কাজ পেল কাজানের ওই চাষার পো। সম্রাজ্ঞীর একদিন কি কারণে ঝগড়া হলো প্রেমিক পটেমকিনের সঙ্গে। রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন—গর্দান লেগা—ব'লে। পটেমকিন তো চোঁচা দৌড়। রানীও ছুটলেন পিছু পিছু যে-ভাবে ছিলেন সে-ভাবেই। অঙ্গে সুতোটি নেই। এখন গেব্রিলের ভারী বুদ্ধি যোগাত সময় বুঝে। পেছু পেছু সে চেঁচাতে শুরু করল—"আ রে করেন কি? করেন কি রানীমা! হলেই বা পেয়ারের মানুষ—তাই বলে অমন ক'রে পেছনে ছোটা কি আপনার সাজে!" রানী হাসলেন। বললেন: "ঠিক বলেছ। আমার রানীর মান আর নারীর ইজ্জত তুমি বাঁচালে। আমার রাজ-শক্তিকেও বাধা দিয়ে তুমি আমার কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছ। তোমায় আমি পুরস্কার দেব।" রানী ওকে তাঁর শয়ন-কক্ষের প্রহরী ক'রে দিলেন। খেতাব দিলেন—দরঝাভিন। সাত বচ্ছর ঐ কাজ করেছিল ও। আর পটেমকিনের কি হলো শোন। কাজানের গভর্ণর ক'রে ক্যাথারিন দিলেন তাকে ঠেলে নির্বাসনে। পরে সে গিয়ে পুগাচেভ্-এর দলে যোগ দিল।'

একটা কালো রঙের লোহার সিগারেট কেস্ বের করল রবিন্সন পকেট থেকে। নদীর ওপারের বায়ুমণ্ডল কেমন একটা ধোঁয়াটে তন্দ্রালুতায় ঝিমিয়ে আছে। সেই দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক থেকে।

'তা শ' খানেকেরও বেশী এরকম গল্প সংগ্রহ করা আছে আমার জার, কবি, আর্কবিশপ, গভর্ণর এবং এরকম বহু লোকের সম্বন্ধে।'

ঔদাস্যের সুরে বলে সামঘিন: 'বেশ মজার তো!'

গল্প শুনতে শুনতে ওর মনে পড়ে যায় এই রবিন্সন সম্বন্ধে ভারাভাকার শ্লেষ-পূর্ণ টিপ্পনী:

'যে-সব বুদ্ধি-জীবীদের জীবনের অভিজ্ঞতা একটা স্পষ্ট রূপ নিয়ে দানা

বেঁধে ওঠে না, এমন কি ইস্কুল-মাষ্টারী তিক্ততারও সৃষ্টি করে না, এই রবিনসন তাদেরই একজন—একটি পোষা কুকুর বিশেষ।'

*

'চলি—,' ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় ক্লিম।

রবিন্‌সন বলে: 'চলো আমিও যাব।'

ইতিমধ্যে হাওয়ার বুকে পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি তুলে রেস্তরাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কয়ার-মাষ্টার, যেন উইংস-এর ভেতর দিয়ে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন কোন অভিনেতা। পেটান গড়ন, ময়লা রং, সুপুষ্ট গোঁফ-জোড়ার ডগা উল্টে পাকান,—প্রায় চোখ ছুঁয়েছে। গায়ের ভারী কোটটার বোতামগুলির মতো গোল গোল কালো কালো দুটো চোখ। আপাদ মস্তক ছিমছাম্, চক্‌চকে, যেন পালিশ করা। লোমশ হাতের ছড়িটি অবধি চক্‌চক্ করছে।

রবিন্‌সন গলা বাড়িয়ে ক্লিমের কানে কানে বলল: 'করভিন্।' বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চেপে বসল চেয়ারে।

'বেটা শয়তান, চাল মেরে বেড়ায় কি জানো? ও নাকি হাঙ্গেরীর রাজা স্তেপানের বংশধর। দলের ছোঁড়াগুলোকে কি মার মারে। আচ্ছা ক'রে ঠুকেছিলাম ব্যাটাকে সেবারে কাগজে। কি রকম ক'রে তাকাচ্ছে দেখ না, যেন গিলে খাবে!'

ছড়ি দুলিয়ে, হল্‌দে দস্তানা পরা হাত নেড়ে কোণের এক মহিলাকে স্বাগত জানিয়ে সেই দিকেই এগুচ্ছিল করভিন্। রবিন্‌সনের দিকে চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ভ্রূ-জোড়া কুটিল হয়ে উঠল, ভীতিজনক ভাবে কাঁপতে লাগল গোঁফের ডগা। আর বিবর্ণ চোখ দুটো এক লহমায় আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল। ক্লিম তার চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে পলক গুনতে লাগল,—এই বুঝি কোন্ সর্বনাশ ঘটে। রবিন্‌সনের মুখে আর লাজুক হাসিতে একটা আশংকা থম্ থম্ করতে লাগল।

হঠাৎ রেস্তরাঁর দরজা খুলে দুদ্দাড় করে ছুটে এল ইনোকভ। এক হাতে টুপী, তলোয়ার বাগানোর মতো ক'রে হাতটা বাড়ান; কেপ্ কোট-পরা চেহারাটা ঠিক দাঁড়-কাকের মতো দেখাচ্ছিল। হঠাৎ এরকম ভাবে আসায়, আর ওর চেহারাটা দেখে কাঁদুনে হীরো দন্ সীজার দ্যর কথা মনে পড়ে গেল ক্লিমের; আর সেই থেকেই মনে হলো ওই তলোয়ারের কথা।

উল্লাসে লাফিয়ে উঠে চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল রবিন্‌সন।

'আরে ইনোকভ যে! কখন—' ব'লেই ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল চেয়ারে।

ইনোকভ ততক্ষণে হাতের টুপীটা দিয়ে করভিনের পিঠে বসিয়ে দিয়েছে এক ঘা, আর তার হাতের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রেলিং পার ক'রে। করভিনের গোল মুখটা লাল টক্ টক্ করছে, চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাইছে ঠিক্‌রে। আর ইনোকভ ওর টুঁটি ধরে প্রাণপণে ঝাঁকাচ্ছে আর গর্জাচ্ছে। কয়ার-মাষ্টার লম্বায় ইনোকভের গলা পর্যন্ত; কিন্তু দৈর্ঘ্য যাই হোক প্রস্থে আর ওজনে অনেক বেশী। ক্লিম ভয়ে মরছিল, দৈত্যটা দেয় বুঝি ওকে আছাড়। কিন্তু করভিন টলতে টলতে পানামা টুপীটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ইনোকভের বুকে ঘুষি মারল।

'এই বার! কেমন! তোমার মতলব খানা কি? দাঁড়াও রিপোর্ট ক'রে তবে ছাড়ছি।'

ওর বাজখাঁই গলা ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল।

কিন্তু আশ্চর্য হ'য়ে গেল ক্লিম, ইনোকভ নেহাৎ অবলীলায় লোকটাকে উল্টে ফেলে পাছায় এলোপাতাড়ি লাথি চালাতে লাগল গর্জাতে গর্জাতে:

'মেরেই ফেলব একেবারে! মেরেই ফেলব!'

ছুটে এল পরিবেশক দু'জন, ছুটে এল কেরানী। একটা মোটা লোক কোমরে ঝাড়ন বেঁধে দরজায় এসে দাঁড়াল। সেই মহিলা টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে চিৎকার ক'রতে লাগলেন:

'পুলিস! পুলিস! পুলিস ডাকো! কেউ নেই পুলিস ডাকবার? সব মরেছে?'

করভিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে থপ্ থপ্ ক'রে ভেতরে চ'লে গেল। আর সেখান থেকে টুপী আস্ফালন ক'রে শাসাতে লাগল:

'মজা টের পাওয়াচ্ছি, যাবে কোথায় চাঁদ!'

ক্লিমও খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠল এই হাঙ্গামায়, কিন্তু এত উত্তেজনার মধ্যেও ওর মনে হ'তে লাগল, ভয় পেলে কি মজার চেহারাই না হয় মানুষের।

মহিলা উঠে বেরিয়ে যেতে যেতে ওকে লক্ষ্য ক'রে বলে গেলেন:

'লজ্জা, লজ্জা—! একটা মানুষকে অমন ক'রে হেনস্তা করা হ'লো, আর সব কিনা দাঁড়িয়ে দেখল, যেন সার্কাস দেখছে!'

মহিলার পথ রুখে সামনে এসে দাঁড়াল ইনোকভ। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে হুংকার ক'রে বলল: 'ভাগো, ভাগো, নিকালো—'

মহিলা এক লাফে রেস্তরাঁর ভেতর পালিয়ে গেলেন। শাসিয়ে গেলেন:

'আমি সাক্ষী আছি।'

ইনোকভ রবিন্সনের কাছে এগিয়ে এসে একটু কঠিন হাসি হেসে প্রথমে ওর তারপরে ক্লিমের করমর্দন করল। ওর হাতটা ঘামে একেবারে সপ্ সপ্ করছে আর থরথর ক'রে কাঁপছে। চোখের গোলক দুটো অদ্ভুত রকম সাদা, দেখতে ভয় করে। বিবর্ণ মণি দুটোয় মুখটাকে মনে হচ্ছিল যেন অন্ধের মুখ। একজন পরিবেশক একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। হাত দুটো টেবিলের তলায় ঠেলে দিয়ে বসে পড়ে হুকুম দিল ইনোকভ:

'একটা বীয়ার চাই, মাৎভেই ভ্যাসিলিভিচ্, বরফ দিয়ে।'

'কি ব্যাপার হে, কিছুই তো বুঝলাম না।' রবিন্সন শান্ত অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'ও ব্যাটাকে জিজ্ঞেস করোগে।' ইনোকভ মাথা নেড়ে জবাব দেয়। ঝাঁকানীতে টুপীটা কোলের ওপর পড়ে যায়।

একটা সিগারেট ধরাল রবিন্সন। রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বলে: 'এ সব একটুও ভালো লাগে না আমার।'

ইনোকভ কোন জবাব না দিয়ে শুধু মাত্র একটু কাঁধ ঝাঁকাল।

সামঘিন রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে বলল:

'ওঃ! দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে।'

ওর মনটার মধ্যে কেমন খচ্ খচ্ করতে লাগল—এত খানি গায়ের জোর ইনোকভের! ওই পাহাড়ের মতো, ওর চাইতে ওজনে অতখানি ভারী লাশটাকে,

কি রকম কায়দা ক'রে ফেলল! কেন জানি ভারী অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগল ওর। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল একটা কুস্তি-প্রতিযোগিতায় একদা একজন মন্তব্য করেছিল: 'সাহসে জয়, বলে নয়।'

ক্লিম উঠবে উঠবে ভাবছিল, কিন্তু পারছিল না, পাছে ইনোকভ মনে করে ব্যাপারটায় ও অসন্তুষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া কেন যে পাষণ্ডটা লোকটাকে ধরে মারল জানবার জন্য মনটা ওর উস্‌খুস্ করছিল।

'কখন এলি?' জিজ্ঞেস করল ক্লিম।

'কাল রাতে।' প্রায় ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয় ইনোকভ। পরক্ষণেই হেসে ফেলে। কঠিন মুখখানা হাসিতে কোমল হয়ে ওঠে। শুধু কোমল নয়, সুন্দর, মুগ্ধ হওয়ার মতো। বলে:

'আমার দফা ঠাণ্ডা হে। ভারাভাকার সঙ্গে হয়ে গেল এক চোট্। খবরের কাগজের চাকরিটি তো খতম। খেদিন্কার ব্যাপারটা নিয়ে এমন আদেখ্‌লেপনা করলেন ভদ্রলোক—খেলনার দোকানে ঢুকে বাচ্চারা যে রকম করে প্রায় ঠিক সেই রকম। আর ভেরা পেত্রভ্না যেন কোন্ লাটসাহেবের বৌ! কিছুতেই অবাক হন না তিনি। ভারাভকাকে এমনিতে আমার ভালোই লাগে। তবে সব খানিই যে ভালো, তা নয়।'

'তুই কি দুনিয়ার সঙ্গে কোঁদল ক'রেই বেড়াবি?' ইনোকভের দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে রবিনসন বলে: 'তোর সঙ্গে আর পারা গেল না। এখন বল্ দেখি ও-লোকটাকে বেমক্কা অমন ঠুকলি কেন?

একটা সিগারেট তুলে নিল ইনোকভ। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সিগারেটটাকে ভেঙে-চুরে ছাইদানের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর কুঞ্চিত চোখে দেহটাকে টান ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'তা, যার কথা, তাকেই জিজ্ঞেস করগে না। আর, আমার কথা? আমি চললাম কামস্কট্‌কা—এক পাল শুয়র যাচ্ছে সেখানে সোনা খুঁড়তে, সেই সঙ্গে। তোর সাহিত্যের কচ্‌কচি, সম্পাদক, ছাপাখানার ঘর্ঘর আওয়াজ—আর সইতে পারছি না বাপু। আর ভালো লাগছে না ওসব। তে'তো হয়ে গেছি।'

টিপ্পনী কাটে রবিনসন: 'পত্রিকার আড্ডা থেকে একেবারে কামস্কট্‌কা! বেড়ে! তা তোর দিক থেকে দেখলে ঠিকই করেছিস।'

সামঘিন দেখল এবারে ও যেতে পারে।

ওর কর-মর্দন ক'রে এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করে ইনোকভ:

'খুব মুণ্ডুপাত করছিস আমার, না?'

'কি ব্যাপার না জেনে মুণ্ডুপাত করতে যাব কেন রে?' ঔদার্য দেখায় সামঘিন।

নিজেকেও বিশ্বাস ক'রতে পারছে না কিন্তু অন্তরে বুঝছে, অতি নিশ্চিত রূপে বুঝছে যে, ওর চোখেই অনেক খানি বড় হয়ে গিয়েছে ইনোকভ। অথচ নিজে সেই যথাপূর্বম্।

তাই বলছে মন—একজন আজ ছোট হয়ে গেল—আর একজন বড়। সত্যটা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে অনুভূতিতে। বিরক্তিতে মুখখানা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। ভয়ে ভয়ে নিজেকে শুধায়:

'তাহ'লে কি লোকটার পালোয়ানী আর চট্‌পটে ভাব দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম!'



বাড়ি এসে কবিতার বাণ্ডিল খুলে বসল ক্রিম। একটা কবিতার নীচে ইনোকভের স্বাক্ষর। কিন্তু সমস্ত লেখাটাই যেন কেমন। দস্তখত করেছে—হরফ-গুলো কেমন বাঁধুনি ছাড়া। লিখেছে,—লাইনগুলো বাঁকা, অসমান, খাড়া হয়ে পেছন দিকে নেমে এসেছে। কোথাও কোন শ্রী নেই, ছাঁদ নেই—। অক্ষরগুলো ছাড়া ছাড়া; ব্যঞ্জন বর্ণগুলো লেখা ছোট হাতের অক্ষরে, আর স্বরবর্ণগুলো বড় হাতের—সব যেন খাপছাড়া। মনে হয়, ইচ্ছে করেই করা, কোন মতলব আছে পেছনে। কবিতাটা পড়তে পড়তে কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল ক্রিমের। কবিতাটা এই—

সুচরিতে—

আমি এক সারমেয়, অতি ভালো এক সারমেয়।
দুনিয়ার যত প্রাণী সবাই মেনেছে এ কথা—
মেনেছে শূকরও যার কাছে আমি ঘৃণ্য।
মেনেছে, একেবারে নিগুর্ণ নই আমি।

কিন্তু পাইনে সে-মানুষ—
যে আমায় শুধু একটু ভালোবাসবে
চাওয়া পাওয়ার হিসেব না রেখে।

মানুষকে আমি চিনি, ভালো ক'রে চিনি—
আমার সর্বস্ব চিরকাল তুলে দি তার হাতে,—
দি আমার হৃদয়,
দি আমার আজলা আজলা ভ'রে আনা আনন্দ
আর বেদনা।

কিন্তু মানুষের কাছ থেকে নেবার মতো কিছু পাইনে।
আমি চিনি খাইনে, খাইনে ঘি-মাখন—
কদর্যতায় পেট আমার গুলিয়ে ওঠে
এক মাত্র শৈশবেই যত মিথ্যে পেয়েছি—
এখনও জীর্ণ হয়নি তা।

চাই, আমার সমস্ত উন্মাদনা দিয়ে চাই
এক মানুষ—প্রসন্ন সুন্দর মানবিক এক মানুষ,
যার হাত আমি লেহন করতে পারি,
আনন্দ দিয়ে, দিয়ে ভালোবাসা।

সুচরিতে—

আমার দেবতা হও, এই কুকুরের দেবতা—
যে-কুকুর নয় মন্দ, নয় অসৎ।
জেনো দেবী, খর্ব হবে না তোমার মহিমা।
আকাশের ধূসর শূন্যতায় দৃষ্টি মেলে নারী শুধায়—
'ছন্দ কোথায় ?'

কবিতা! এ আবার কবিতা নাকি! দোমড়ান কাগজটার দিকে তাকিয়ে ভাবে ক্লিম। আবার ভাবে, না, মৌলিকতা আছে কবিতাটায়। মৌলিকতা! মৌলিকতা মানে তো অনেক খানি দূরে দূরে বসান কতগুলো কথা দিয়ে তৈরি অর্থহীন প্রলাপ। কিন্তু সব যেন গোলমাল হ'য়ে যায়—ইনোকভের কবিতাটার প্রতি ছত্রে শক্তির পরিচয়। কিন্তু তবু ওকে স্বীকৃতি দিতে মন চায় না। পাণ্ডুলিপিটির "এ" আর "ও" হরফ গুলির মধ্যে পেন্সিল দিয়ে চোখ মুখ, খাড়া খাড়া চুল আঁকতে লাগল। হরফগুলো ভূতুড়ে মাথার মতো হয়ে উঠল। আচ্ছা, কবিতাটার একটা প্যারডী লিখলে কেমন হয়! 'মেচেতা ও কবিতা' বা, ঐ রকম একটা কিছু শিরোনামা দিয়ে! শিক্ষা হয় একটু বাছাধনের। কিন্তু এই 'সুচরিতে'-টি কে? স্পিভাক—? নিশ্চয়ই। না হ'য়ে যায় না, এইবারে বোঝা গেল কয়ার-মাষ্টারের ওপর ওর অত রাগ কেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। ক্লিম স্পিভাকদের ঘরের দিকে গেল। এলিজাবেথা সেলাই করছিল টেবিলের কাছে বসে। কবিতাটা পড়ে শোনাল ওকে। শেষ হ'লে মাথা না তুলে জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথা:

'আমায় যে শোনালেন কবিতাটা, অনুমতি দিয়েছে তো ইনোকভ?'

'না, তা দেয়নি। তবে এটা তো আর ছাপা হচ্ছে না।' একটু অপ্রস্তুত ভাবে জবাব দেয় ক্লিম: 'কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন যে এটা ইনোকভের লেখা!'

মৃদু হেসে চোখ তুলে ক্লিমের দিকে তাকায় এলিজাবেথা। আরও ঘাবড়ে যায় ও। মিনতি ক'রে বলে: 'বলবেন না যেন ওকে।' হাতের কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে এলিজাবেথা বলে: 'ইনোকভকে আপনি মোটেই দেখতে পারেন না, তাই না!'

'ঠিক তা নয়। তবে কি জানি, ওর মধ্যে কি যেন আছে, একটুও ভালো লাগে না।' একটু থেমে জবাব দেয় ক্লিম।

'যা বলেছেন। বড় যেন রুক্ষ।' আঙুল থেকে অঙ্গুলি-ত্রাণটা খুলে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে এলিজাবেথা: 'কারণ কি জানেন? আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। তা ছাড়া শীলার আর কার্ল মুরের কাছ থেকেও পেয়েছে খানিক।' চেয়ার দোলাতে দোলাতে আত্মগত ভাবে বলে যায় ও। ইনোকভ রোম্যান্টিক। কিন্তু হ'লে কি হবে! বাস্তবের চাপে মাথা কি আর তুলতে পারে। কাজেই কবি হওয়া ওর কপালে নেই। একটা কবিতা লিখেছিল কবে যেন। শুনবেন? শেষের লাইন কটিই শোনাচ্ছি:

ব্যর্থ বাক্যরূপী কাগজের ফুলে
সাজাইয়াছ দেহ,
নিরাশা সে বারাঙ্গনা সম
ব্যাভিচারে কলুষিত করিতেছে
আত্মারে আমার।

—দেখলেন তো। কি রকম যেন আড়ষ্ট হয়ে থ' মেরে আছে। কথাবার্তায়ও অমনি মানুষটা। মনটাও তাই। বোধ হয় খাঁটি মানুষরা এমনিই হয়।'

এলিজাবেথা কথা বলে। কিন্তু তার হাত ঘুরে বেড়ায় চঞ্চল হ'য়ে। কখনও চুল পরিপাটি করে, কখনও জামার কলার, কখনও তার বুকের ভাঁজ গুলো। ক্লিমের মনে হয় মুরগীর মত গা ঠোকরাচ্ছে সে। কেমন যেন দুধ দুধ গন্ধ গায়ে এলিজাবেথার। কেমন যেন স্কুল-মিস্ট্রেসী সুরে সে কথা কইছে, শুনতে একটুও

ভালো লাগছে না। ক্লিমের কানে এল: 'অল্প বয়সে আমরা সবাই খুশিমত নিজের পথ খুঁজি। গেটেও তাই বলে গেছেন।'

মনে মনে বলে ক্লিম: 'স্ত্রীচরিত্র আমি ভাল বুঝিনে; কিন্তু কি ঘ্যান্‌ঘ্যানে মেয়েরা বাবা! কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো। অথচ সেই পিটর্সবুর্গে ইনিও তো—'

'তিনি বলতেন জীবন-সত্য আর কাব্য দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। মনে আছে?'

'কে বলতেন?'

'গেটে।'

'তা বটে। আপনারও কি সেই মত?'

অনুচ্চ অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দেয় স্পিভাক:

'মেয়েদের চোখে কাব্য মিথ্যে। অবশ্যি তাদের দিক থেকে দেখতে গেলে এর যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে বৈকি।'

পাশের ঘরে কেশে চলেছে সঙ্গীত-শিল্পী। এই কাশির সঙ্গে যেন জড়িয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে তার স্ত্রীর কথার ক্লান্তিকর একঘেয়ে সুর। ক্লিম উঠবার ফাঁক খোঁজে। এবং পাওয়া মাত্রই সরে পড়ে। স্পিভাক-এর ওপর একটা তিক্ততায় বিষিয়ে ওঠে ওর মন। রাতে শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ ধ'রে ভাবে ও—সেই যে মানুষটি নিজের হাতে পথ কেটে চলেছিল, তারই কথা। তাকে জোর ক'রে বাঁধতে চেয়েছিল মানুষ তাদের চলতি পথের বাঁধনে। চেয়েছিল তার ব্যক্তিত্বের মৌলিক পরিচয়কে মুছে ফেলতে। ভাবছিল ও আলেনা তেলেপনিভার কথা—তার আবেগভরা আকুল আর্তি—"সারা দুনিয়াটাই তো দেখছি আমার সংশোধনাগার!" কথাগুলো তখন বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল। কিন্তু বড় সত্যি কথা বলেছিল আলেনা। এলিজাবেথা স্পিভাক্‌দের মতো মানুষদের হাতে পড়েই দুনিয়াটা সত্যি সংশোধনাগার হয়ে উঠেছে।

*

কদিন পরের কথা। সে-দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজখানা খুলল ক্লিম। খোদিন্‌কার প্রদর্শনী সম্বন্ধে ওর লেখা প্রবন্ধটা বেরিয়েছে। খুশিতে ও উছলে উঠল। চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। বন্ধ চোখের সামনে ভাসতে লাগল ক্ষুদে ক্ষুদে হরফে লেখা শিরোনামা:— 'রাশিয়ার শিল্পোৎসবে।' ঠাস্ বুনুনী ছটা কলম পড়েই চঞ্চল হ'য়ে উঠল ও। ছট্‌ফট্ করতে লাগল অব্যক্ত যন্ত্রণায়। চারদিক থেকে যেন এক ঝাঁক মৌমাছি এসে ঘিরে ধরেছে ওকে, তাদের বিষাক্ত হুলে জর্জরিত হ'য়ে উঠেছে ওর সর্বাঙ্গ। কি সর্বনাশ! লেখাটায় অসংখ্য ছাপার ভুল, যেখানে সেখানে নির্বিচারে ছড়ান কতগুলি নেহাৎ অনাবশ্যক দুর্বোধ্য বাক্য। কি এক জায়গায় এমনি জমকালো ভাষা—ভারী বিশ্রী লাগল ওর দেখে। প্রবন্ধটার বক্তব্য মোটামুটি বজায় রয়েছে বটে,—কিন্তু বেশ বোঝা যায় আর কারো হাত পড়েছে। পড়েছে ইনোকভের—তারই কতগুলো প্যানপেনে বস্তা-পচা মত-বাদের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ ক'রে তিন চার জায়গায় তো বেশ বোঝা যাচ্ছে, একেবারে হুবহু ইনোকভের ভাষা। ইউলিসিসের প্রতীক্ষারতা পেনিলোপী এবং টাকমাথা প্রেমিকদের সম্বন্ধে মন্তব্যটি প'ড়ে ও একেবারে মাথায় হাত দিয়ে

বসে পড়ল। 'কি ক'রে এমনটা ঘটতে দিলাম আমি।' নিজেকে তিরস্কার করে ক্লিম কতকটা তিক্তভাবেই।

আরশীতে ওর প্রতিচ্ছবি পড়েছে। বিরক্তিতে কুঞ্চিত হ'য়ে আছে মুখের পেশী। নিচের ওষ্ঠ পিষ্ট হচ্ছে দাঁতের চাপে। চশমার আলো পড়ে তার জলুষে ফিকে হয়ে গেছে মুখটা।

কি বলবে এলিজাবেথা।

বলল:

'একটু বেশী রঙ চড়িয়ে লেখা হয়েছে না!' পরক্ষণেই সান্ত্বনা দিল: 'তা মোটের ওপর ভালোই তো হয়েছে। অভিনন্দন।'

অভিনন্দন জানাল দ্রোনভও। ওর দুই হাত ঝাঁকিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'সাহিত্যিক হবি রে! তারি সূচনা।'

এলিজাবেথার মন্তব্যেরই পুনরুক্তি করল রবিনসন:

'তোমার প্রচেষ্টাটা প্রসংশার যোগ্য। কিন্তু ভাই, না বলে পারছিনে, প্রবন্ধটা পয়লা নম্বরের মুদী-দোকানের শো-কেসের মতো হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিস ভালো, চমৎকার স্বাদ; কিন্তু সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।'

কথা গুলো প্রশংসা বলেই গ্রহণ করল ক্লিম।

কাগজখানার সংবাদাতাদের সকলকে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে ক্লিমের সিদ্ধান্ত হ'লো সংবাদ-দাতাদের মধ্যে দ্রোনভই হ'লো সবচেয়ে ইনটারেষ্টিং মানুষ, এবং ও যেন কাগজখানার ধাতেই গড়া। ছাপটা ওর মধ্যেই সব চেয়ে বেশী পড়েছে। মনে হ'তেই কাগজখানার গুরুত্ব যেন ওর চোখে অনেক খানি কমে গেল। কিন্তু ওকে স্বীকার করতে হলো যে স্থানীয় সংবাদ-দাতা হিসেবে দ্রোনভ উপযুক্ত ক্ষেত্রই পেয়েছে। ওর চঞ্চল চোখ দুটির তীক্ষ্ম দৃষ্টি শহরের প্রতিটি গৃহের প্রাচীর ভেদ ক'রে চলে যায় দৈনন্দিন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, সূক্ষ্মতম ধূলিকণা অবধি। এবং নিপুণ হাতে তা থেকে ও সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে কালো কলংক-চিহ্নগুলি আহরণ ক'রে আনে।

মুখ বাঁকিয়ে ও গুমর করে: 'এই শর্মা মসলা যোগায়, তাই না কাগজখানা চলো হে! আমার দৌলতে লিখছে রবিনসন। আমাকে জায়গা-টায়গা তো দেয় না বেশী, নইলে দেখতে মাসে শ' দেড়েক তো অন্ততঃ কামাতাম!'

কিন্তু এই শহরের জীবন সম্বন্ধে যা কিছু বলে দ্রোনভ তার মধ্যে অতি স্পষ্ট ভাবে বাজে একটা ঘৃণার সুর, যে-ঘৃণা ওর মধ্যে নিরন্তর টগ্‌বগিয়ে ফুটছে। আর এই ঘৃণা দিয়ে ও না-পারছে কিঞ্চিৎ মুনাফা করতে, না-পারছে তা সংবাদ ব্যবসায়ের কাজে লাগাতে। তার জন্য ওর যে আফসোস আছে, তাও ওর কথার মধ্যে স্পষ্ট। সংবাদ-দাতার কাহিনী স্বেদ-ক্লিন্ন ধুলোর জীবনের যে ছবি লেখা হয়, তা শুধু স্থূল অশ্লীলতার নিঃস্রোত পল্বল। বিরূপ হয়ে ওঠে ক্লিমের মন, বিমুখ হয়। আবার আকৃষ্টও হয়,—যে-হেতু এরই পরিপ্রেক্ষিতে ওর আত্মদর্শন হয়, ও দেখে এই কাদা-খোঁচাদের চেয়ে ও কত ভিন্ন। সে যাই হোক, দু' একবার দ্রোনভকে ও বলেছে:

'তোর দেখছি, মানুষের যে-দিকটা কালো সে-দিকেই নজর বেশী।'

'আর আছেই বা কি!' হাতে হাত চেপে, আঙুল মট্‌কাতে মট্‌কাতে জবাব দিয়েছে ও। নাকের ডগাটা লাল হয়ে উঠেছে ওর। 'সম্পাদক যে তোর সৎবাপকে মেয়রের গদিতে বসাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে রে। লোকটা যেরকম গাধা না, তাই নিজেকে রাশিয়ার সুধার-করণেওলা ব'লে ভাবে। ব্যাটার তো কাজ-কর্ম নেই—

কাজের মধ্যে খালি ব'সে ব'সে মেয়ে প্রুফ-রীডারের হাঁটুর তলা চুলকোন দেখা। মহিলা বড্ড সারাক্ষণ চুলকোয় জায়গাটা। বোধ হয় খুব আঁট গার্টার পরে।'

রীতিমত গম্ভীর হয়ে কথাটা বলেছিল দ্রোনভ, যেন জরুরী খবর বলছে একটা।

'যা না চেহারা শ্রীমতীর,—একটি আস্ত কাক-তাড়ুয়া। মুখে বসন্তের দাগ। ছিলেন তো এক গেঁয়ো ইস্কুলের মাষ্টারনী। তাড়া খেলেন র‍্যাডিক্যালদের ভ'জে। যখন কাজ কর্ম থাকে না ব'সে ব'সে পেসেন্স খেলে। এক দিন জিজ্ঞেস করলাম: কার ভাগ্য গুনছেন? বললে: দেখছি কবে আমাদের সংবিধান তৈরি হবে। মিথ্যুক কোথাকার, গুনছিল কোনো হবু-প্রেমিকের কথা।'

আরও খবর দিল, কে একজন ভাইস্-গবর্ণর কোন অভিনেত্রীকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে আঙুলে পিন্ ফুটিয়েছিল। হাত ফুলে উঠল। কাটতে হলো শেষ অবধি। এখনও বিপদ কাটেনি। গল্পটা শেষ ক'রে দুঃখিত ভাবে বলল: 'এ তো রবিনসনের মাল!' পরক্ষণেই কি এক আশায় উল্লসিত হয়ে বলে উঠল:

'এ বাপু ওর হাত দিয়েও ওৎরাবে না।'

নিষিদ্ধ প্রেম, ঠগ্ জোচ্চুরী, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এরকম বহু কাহিনী আছে দ্রোনভের ঝুলিতে যা লোকসমাজে উচ্চারণ করা যায় না।

'সেন্সর ব্যাটা একটা কুকুর। বুড়োর ভুঁড়ি নয়তো যেন জালা, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ছুকরী বৌ, তার বাপ পাদরী। মেয়েটা ছিল রেড্-ক্রসের নার্স। গভর্ণরের বিশেষ কর্ম-সচিব মায়েভস্কির কাছে তালিম নিচ্ছে এখন। মাষ্টার মশায় ছাত্রীকে ছয় জোড়া লেসের ইজের উপহার দিয়েছেন হালে।'

দ্রোনভের কল্পনায় শহরটি হচ্ছে পাকা দুর্জনদের আড্ডাখানা, যেখানে হরেক রকম দুষ্কর্ম চলে; হাটে হাঁড়ি ভাঙবার জন্য পরমোৎসাহে পরস্পরের ওপর টিক-টিকিগিরি করে। আর শ্রীযুক্ত ইভান দ্রোনভ সকলের ওপর নজর রেখে ঝুরি ঝুরি তথ্য সংগ্রহ করেন, আর সকলের বিরুদ্ধে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির কাছে গিয়ে সংবাদ সরবরাহ করেন।

॥ ২ ॥

শনিবার সম্পাদকের দপ্তরে এসে জোটেন সাংবাদিক এবং কাগজখানার সুহৃদ্-সমর্থকের দল,—স্পষ্টতঃ যাদের আড্ডাই চাই, যেখানে হোক আর যা নিয়ে হোক। সামঘিনের মতে মানুষ হচ্ছে শুধু কথা। এই আড্ডাটা দেখে দেখে ক্রমশঃই ওর এই মত আরও দৃঢ় হয়। কিন্তু মোটা মানুষের ব্যাখ্যা যে এ দিয়ে হয় না, এও ও লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে। অবশ্য নিয়ম থাকলেই ব্যতিক্রম থাকবে। যথেষ্ট দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে ও এও সম্ভব বলেই মনে করে যে মানুষ শুধু কথা মাত্রই নয়, অসাধারণ দক্ষতা দিয়ে চয়ন করা শোভন কথা দিয়ে সে নিজেকে সাজায়। কিন্তু এই অবস্থায় সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে নিজের মতো কথাই কেবল তৈরি করা সম্ভব, তার বেশী নয়। তবে এর মধ্যে এমন বুদ্ধিমান মানুষও আছে যারা কথার কচ্‌কচি ছেড়ে একটা স্থির চিন্তাধারায় পেঁৗছতে চায়। এবং সেই আগ্রহে তাদের মানসিক পরিণতি গিয়ে ঠেকে বিশ্বাসে। পরিণামে তাদের বৌদ্ধিক অগ্রগতির ঐখানেই ইতি হয়ে তারা মূর্খের দলে গিয়ে ভেড়ে।

বসে বসে শোনে সামঘিন, কখনও কথা হয় রাজনৈতিক সংস্কারের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা নিয়ে, ইওরোপীয় সংবিধানের ভালো ধারাগুলি নিয়ে চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কখনও বা রাশিয়ার আসন্ন সমাজতান্ত্রিক কৃষক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চলে তর্ক বা ভবিষ্যৎ-বাণী। রোজই তর্কে তর্কে ঘরের হাওয়া গরম হয়ে ওঠে, কখনও বা তার পরিণতি হয় তিক্ততায়। শুনে শুনে সামঘিন ভাবে এসব হচ্ছে কথার খেলা, খিঁচড়ে-যাওয়া মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য. নয়তো পেশাদারী "রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করনেওলা'দের রুটি-রুজি কামাবার ব্যবসা। এরা দ্য গ্রেট্ ট্রান্স্ সাইবেরিয়ান রেইল-রোড, উপকূল এলাকায় রাশিয়ার অভ্যুত্থান, চীনদেশে ইওরোপীয় নীতি, জার্মানীতে সমাজতন্ত্রের সাফল্য, ইত্যাদি সাধারণভাবে সারা পৃথিবীর হালচাল সম্বন্ধে যে সব মতামত প্রকাশ করে তাও ওই কথারই খেলা, নয় তো কথার ব্যবসাদারী। দেখে ওর ভারী আশ্চর্য লাগে যে, অজ মুল্লুকের এই ক্ষুদে শহরের মোটে হাজার সত্তরেক বাসিন্দা, যাদের গোটা দুনিয়া হচ্ছে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীতে বাঁধা—তাদেরই জন কুড়ি মানুষ বসে বসে পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। এই শহরের জীবন-যাত্রা নিয়ে আলোচনা করতে বসেই ওরা চরম কদর্যতার পরিচয় দেয়। এ বিষয়ে সকলেই দ্রোনভের সমগোত্রীয়। প্রত্যেকেরই যেন একটা লুকোন ঝুলি আছে,—তাতে আছে ধুলো আর কাদা; তাই থেকে মুঠো মুঠো তুলে নিয়ে ওরা পরস্পরের গায়ে ছিটোয়, ঠিক যেমন ক'রে গাঁয়ের মেটে রাস্তায় উলঙ্গ ছেলেরা খেলা ক'রে ধুলো ছোড়া-ছুঁড়ি করে। দ্রোনভের ঝুলিটা সব চেয়ে বড় সন্দেহ নেই. কিন্তু ভেতরের বস্তু সবারই এক। গা গুলিয়ে ওঠে সামঘিনের এই নোংরামি দেখে। সকাল বেলার কাগজটা খোলে, সেখানেও ছাপার হরফে সেই নোংরামি ছড়ান পাতায় পাতায়।

সম্পাদকের বক্তৃতা শুনেও ওর মনের বিরক্তি ঘোচে না। অন্যদের কথা শুনতে

শুনতে ভদ্রলোকের ওপরের ঠোঁটটা ফাঁক হয়ে উল্টে উঠে যায়। ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে নড়ে চড়ে আঁট হয়ে চেয়ারটায় বসেন—যেন কোন অতর্কিত মুহূর্তে এই আশ্রয়টুকুও পিছলে সরে যাবে। তার পর তিনি জবাব দেন স্পষ্ট ভাষায়, দৃঢ় প্রত্যয়ের ভঙ্গিতে—সুরটা যেন সাবধান বাণীর মত শোনায়।

'বুঝলেন, বড্ড বাড়াবাড়ি চলছে আজকাল বাস্তব বাস্তব ক'রে। একটা ব্যাধি-বিশেষ; অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাধি—প্রায় সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। হাঁ, মানছি—রাশিয়ার মাটিতে পাশ্চাত্য রাজনীতির চাষ করা দরকার হয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও তো ভুললে চলবে না যে আমাদের দেশাত্ম-বোধ, আমাদের নিজস্ব জীবন-ধারা—তারও কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে; গুরুত্ব আছে।'

সুদীর্ঘ বক্তৃতা। কিন্তু অচঞ্চল স্থির কণ্ঠ—কোথাও ওঠে না, পড়ে না, কাঁপে না। প্রায় প্রতিটি বক্তব্যের শেষে 'নীচের তলার' সম্ভাব্য বিপ্লবের সতর্ক ইসারা। বলেন: 'রাশিয়ার বিপ্লব রাইলীন, পেস্তেল, পেত্রাশেভ্স্কী বা ঝেলিয়াবোভ্দের দ্বারা হয়নি। হয়েছে বোলোৎনিকভ্, রাজিন এবং পুগাচেভ্দের মতো মানুষের দ্বারা। একথা মনে রাখবেন আপনারা।'

সামঘিনের মনে হয়, বেশ চমৎকার বুদ্ধি-দীপ্ত কথা। কিন্তু হেমন্ত কালের বৃষ্টির মতো—শুরু হ'লে আর ছাড়ে না। ছাতা না খুললে উপায় নেই।

কিন্তু হোক ভালো কথা, কে আর শুনছে। এক সমর্থক যা তমিলিন। ও'র ভয়ে কেউ মাথা তুলতে সাহস করে না। কোন তর্ক, কোন প্রশ্ন উঠেছে কি তমিলিন দমকলওয়ালার মতো বুক চিতিয়ে দাঁড়াবেন। ছুটবে জলের তোড়, তর্কের আগুন—চোখের নিমেষে ঠাণ্ডা। ব'লে চলে সম্পাদক মশাই:

'আশে পাশে চারদিকে আছে সাধারণ মানুষ, যাদের মনোবৃত্তি আজও পশুর স্তরে। অতএব তারা উচ্ছৃঙ্খল হবেই। উচিত রাজনীতি নিয়ে কচ্‌কচি ছেড়ে জনসাধারণের এই স্বাভাবিক অরাজকতাকে সংযত ক'রে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার চেষ্টা করা এবং তার জন্য উপযুক্ত মনোভাব তৈরি করা। রাজনীতি দিয়ে কখনও বদলান গেছে কিছু? যায়ও নি, যাবেও না।'

প্রতিপক্ষীয়েরা তমিলিনের সঙ্গে তর্ক করতে চায় না। করলেও করে নেহাৎ অনিচ্ছায় আর অতি সাবধানে। আইনজীবী প্রাভ্দীনই কেবল চেষ্টা করেন কথার মার প্যাঁচে তাঁকে জব্দ করতে। বলেন:

'যদি ঠিক বুঝে থাকি,—সাধারণ মানুষ সম্পর্কে নীৎসে এবং রেনাঁ যা বলে গিয়েছেন আপনারও তাই মত। বিশেষ ক'রে রেনাঁ তাঁর দার্শনিক নাটক "ক্যালিবান্"-এ...'

তমিলিনের গ্রাহ্য নেই। দাঁত বের ক'রে হেসে, ভ্রূ নাচিয়ে, চীনেমাটির চোখের মতো মরা চোখ দিয়ে প্রাভ্দীনের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন:

'তা'হলে আপনি মানছেন যে জীবন যুক্ত্যাশ্রয়ী হওয়াই সঙ্গত। তাহ'লে এও মানছেন যে বুদ্ধি-জীবীরাই যুক্তির ধারক ও বাহক।'

ক্লিম লক্ষ্য করে যে এখানেও তমিলিনকে কেউ পছন্দ করে না। এক সম্পাদক ছাড়া সকলেই তাঁকে ভয় করে। তমিলিন জানেন একথা এবং এ নিয়ে তাঁর গুমর আছে। এই গুমরেই তাঁর তামার তারের মতো রুক্ষ চুলগুলো আরো বেশী খাড়া হয়ে থাকে। ক্লিমের মনে হয় সাধারণ মানুষকে মাষ্টার মশাই ঘৃণা করেন। তাই ইচ্ছে করেই অমন অপভাষা প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন:

'যত রকম চেহারার মানবতা-বাদ আছে সব হচ্ছে জনতার সামনে বুদ্ধি-জীবীদের

ক্লীবত্বের স্বীকৃতি মাত্র। যেমন আমরা লজ্জাকর যৌন অভিশাপকে ঢাকবার জন্য কাব্যের আশ্রয় নি। তেমনি আমাদের একাকীত্বের দুঃখকে ঢাকি ফুরিয়ে, ক্রপট্‌কিন, মার্ক্স এবং এ'দেরই মতো যত মহাপুরুষদের আপ্তবাক্য দিয়ে—যাদের জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস নেই, যারা ভীরু, ক্লীব।' দন্তপাটি বিকশিত ক'রে হেসে বক্তব্য শেষ করেন তমিলিন: 'বড্ড দেরী হয়ে গেছে। দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান-শূন্য হয়ে যে-ভাবে কারিগরী উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে, তাতে জয় হবে বস্তু-তান্ত্রিকতারই। বস্তু-তান্ত্রিকতার রাজত্ব ঘাড়ের ওপরে চেপে বসল ব'লে।'

ভারী রেগে যান এটর্ণী প্রাভ্‌দীন। চেঁচামেচি লাগিয়ে দেন তাঁর স্ববিরোধ আর সংকীর্ণতার নজীর তুলে, কনস্তানাতিন ও পোবোতনোস্তেভ্‌-এর কথা নিয়ে। ওদিকে রবিনসন হাসিতে কাশিতে মিলিয়ে ক্লিমের কানে কানে বলে: '

'মর্কটটা কিরকম ভাবে ওদের খ্যাপাচ্ছে, দেখছ?'

একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে তমিলিন পকেট থেকে ঝাড়নের মতো মস্ত বড় একটা রুমাল বের ক'রে জোরে জোরে মুখ কপাল মুছতে থাকেন। ঘষায় ঘষায় মুখটা বেগুনী হয়ে উঠল, চোখ উঠল ফুলে, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, আর নীচের চামড়া নীল হয়ে থলো হয়ে ঝুলে পড়ল। পরিপাটি ক'রে খেয়ে মানুষ যেরকম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে, সেরকম একটা নিশ্বাস ফেললেন তিনি। ক্লিমের মনে হয় তিনি যদি তাঁর ওই বিশ্রী দাড়িটা কামিয়ে ফেলেন তবে তরমুজের মতোই মোলায়েম একখানা মুখ বেরুবে। তমিলিন সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে ক্লিমকে অবজ্ঞা ক'রে চলে। কোথাও দেখা হ'লে, ক্লিম হাত বাড়িয়ে দিলে, তমিলিন নিঃশব্দে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর লোমশ হাতখানার মুঠোর মধ্যে বাড়ানো হাতখানা তুলে নেন মাত্র।

ক্লিম একবার সব-জান্তা দ্রোনভকে জিজ্ঞেস করল: 'ওর এত রাগ কেন আমার ওপর রে, বলতে পারিস?'

'বোধ হয় হিংসে হয়েছে। চেলা চামুণ্ডা তো নেই! তোকে মাষ্টার মশাই দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ বলেই জানেন। উকিল-মোক্তারদের তিনি দু' চোখে দেখতে পারেন না। ওরা নাকি কিছু জানে না। ও'র বক্তব্য হচ্ছে, কোন কিছুর পক্ষ সমর্থন করতে হলে সব কিছুই জানতে হবে।'

আড়চোখে একবার তাকিয়ে আবার বলে দ্রোনভ: 'গোগোলের ই'দুরে মতো ও'কে একবার শুঁকেই পালিয়ে যায় সব—!'

'তুই যাস্‌ নাকি মাঝে মাঝে ও'র ওখানে?'

'কখনও সখনও,' অস্পষ্ট ধরনের জবাব দিয়ে দ্রোনভ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একটা; 'ভদ্রলোকের স্ত্রীটি ভারী সুন্দরী।'

একটা কাঁচি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল ও। হঠাৎ একটা আঙুল কেটে গেল। কাঁচিটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি আঙুলটা মুখে পুরে পরমুহূর্তে ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে পুরে দিল আঙুলটা পেন্সিলের মতো ক'রে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'অনেক কিছু জানেন মাষ্টার মশাই যা একেবারে খাঁটি। সত্যি সত্যি জানেন। যেমন ধর এই মানবতা-বাদের কথা যা বললেন। সত্যি তো, দয়া করতে যাবে কেন মানুষ? কি হেতুতে? নেহাৎ হয়তো ভয়ে করতে হয়। কিন্তু ও'র বউটাকে দেখ্‌না। এমনি ওর দয়া, একেবারে কান্ড-জ্ঞান হীন! ও যেন দয়ার নেশায় মাতাল! মাষ্টার মশাই আচ্ছা ক'রে বউকে তালিম দিয়েছেন যাতে ভগবানে বিশ্বাস-টিশ্বাস না করে। আর সে-কিনা এই ছেচল্লিশ বছর বয়সে!'

স্বীকার করে ক্লিম মানবতা সম্বন্ধে তমিলিন ঠিক কথাই বলেছেন। ও অনুভব করে সম্পাদকের মতো এ লোকটিরও চিন্তাধারাও তাঁর মানসিক অবস্থারই অনুরূপ। কিন্তু দু' জনের কারো ওপরেই ওর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই। একজন ভাঁড়ামী করে, আর দ্বিতীয় জনকে দেখলেই ওর কেমন ভয় করে। সম্পাদকীয় দপ্তরখানায় আর যারা আসে তাদের মতোই এদের দু'জনকে দেখলেই ওর মেজাজ বিগড়ে যায় কেন জানি। অনেক সময় ওর মনে হয়েছে মানুষগুলোর অতিরিক্ত বিদ্যার বহরের মধ্যেই হয়তো এই 'কেন জানি'র জবাব রয়েছে।

*

স্থানীয় ঐতিহাসিক ভ্যাসিলি এরিমিয়েভিচ্ কজলভ্‌কে ভালো লেগে গেল ক্লিমের। ছোট-খাট বৃদ্ধ ভদ্রলোক, উদ্‌বেড়ালের মতো মুখটা, অতি তীক্ষ্ন কান দু'টি টুক টুকে গোলাপী। এক মাথা সাদা চুল, নিখুঁৎ ভাবে কামান দাড়ি, ছিমছাম পারিপাটি। হলদেটে মুখখানা রক্তাভ শিরা-উপশিরায় যেন নক্‌সী-কাটা। রুপোর ফ্রেমে আঁটা পুরু চশমার পেছনে এক-জোড়া ঘোলাটে চোখ বড় কোমল। মস্ত বড় নাকটা যেন বিষাদাবনত। তার নীচে সুছ.দ, সুছাঁট শুভ্র গোঁফ; বিশীর্ণ ঠোঁঠের ওপর সর্বদাই সৌজন্যের হাসি। দেখলে মনে হয় বড় বেশী মদ খান; কিন্তু কি জানি আছে ও'র মধ্যে যা মানুষকে প্রীত করে। পরিচ্ছন্ন কোর্টটি, সার্টের বুকের তুষার শুভ্রতা, ট্রাউজারের নিখুঁৎ ভাঁজটি, চক্‌চকে পালিশ করা জুতো —সব মিলিয়ে বেশ পুতুল পুতুল লাগে। সব থেকে বড় গুণ হ'লো যে ভদ্রলোক আদর্শ শ্রোতা। নীরবে শুনে যান এ বয়সে যা সচরাচর দেখা যায় না। এই সব নানা কারণে আকৃষ্ট হয়েছে ক্লিম। কিন্তু ওর ভাবনা জাগে—: 'আমি বুড়ো হলেও হয়তো এমনি ক'রে পরিচিতের সভায় বসে থাকব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, অপরিচিত হয়ে...'

কজলভ্ প্রায়ই শহরের ইতিবৃত্ত নিয়ে প্রবন্ধ লিখে নিয়ে আসেন সম্পাদকের কাছে...ছোট ছোট চৌক কাগজে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে অনেকটা সরকারী রিপোর্টের ধরনে লেখা। লেখা তাঁর ছাপা কমই হয়। সুখপাঠ্য হয়নি, অথবা সেন্সরের অজুহাতে অধিকাংশ লেখাই বাতিল হয়। কিন্তু সৌজন্যের হাসি হেসে প্রত্যাখ্যাত লেখার তারা গুটিয়ে নিয়ে বৃদ্ধ বিনীত ভাবে গিয়ে বসেন রুশ দেশের মানচিত্রখানার নীচে যে-চেয়ারটা আছে সেখানে। আধ ঘন্টাটেক বা আরো কিছু সময় ব'সে ব'সে শোনেন লেখকদের কথাবার্তা, পুরু চশমার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করেন যুধ্যমানদের। কিন্তু এরা সবাই যেন এক জোট হয়ে মানুষটাকে উপেক্ষা করে। তাঁকে যে কেউ চেনেনা তা নয়। ভালো ক'রেই চেনে কাগজের স্থানীয় লেখক আর মুরুব্বীর দল। কিন্তু ছিট্-গ্রস্ত আর গ্রাফোম্যানিয়াকদের মতো করেই তাঁকে অবজ্ঞা আর করুণা করে ওরা। ক্লিম বোঝে তমিলিনকে বেশ পছন্দ করেন ভদ্রলোক। আসলে কিন্তু ভয় করেন। বোধ হয় এই জন্য যে সম্পাদকের ঘরে ইনি ঢুকলেই তমিলিন তাঁর তামাটে হাতদুটো ছুঁড়ে দু'ধারের খাড়া চুলগুলো চেপে ধরেন। তাঁকে যারা চেনে তারা ভাববে, সত্যি বুঝি কোন অপকর্ম ক'রে ফেলে তিনি হায় হায় ক'রে উঠলেন। এমনি তাঁর ভঙ্গি।

ঐতিহাসিকের সম্বন্ধে অনেক কিছু দ্রোনভের কাছে শুনেছে ক্লিম। ভদ্রলোক

সেনা-বিভাগে কাজ করতেন। ১৮৫৯-এর শেষের দিকে স্থানীয় একটা জেলখানায় আগুন লাগিয়ে দেয় কয়েদীরা। পুড়ে মরত সবাই যদি না জেলখানার দরজা খুলে দিতেন। বাঁচল কয়েদীরা, অনেকে অবশ্য সেই সুযোগে পালিয়েও গেল। অনেক অনেক ফাঁসির আসামীরও প্রাণ বাঁচল। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত দয়া দেখাবার অপরাধে বিচারে কয়েদী হ'লেন তিনি নিজে। তারপর থেকে এই চল্লিশ বছর কজলভ্ এই শহরের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। বই লিখেছিলেন একখানা; কিন্তু ছাপতে চাইলে না কেউ। প্রাক্তন জেলার সরকারী গেজেটে নিয়মিত লিখেছেন বহুকাল; ঐ বইখানার কতকাংশ প্রকাশিতও হয়েছে গেজেটে। কিন্তু এ সুযোগও একদা খোয়া গেল কোন এক আর্ক-বিশপের তদানীন্তন গভর্ণরের সঙ্গে ঝগড়ার বিষয় নিয়ে এক তথ্য-সম্বলিত প্রবন্ধ লেখার ফলে। কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করলেন প্রবন্ধটার মধ্যে তাঁদের মানহানি করবার মতো অনেক মাল আছে, যার ফলে লেখক রাজনৈতিক সন্দেহ-ভাজন বলে চিহ্নিত হলেন। বেচারা! সেই থেকে পেট চালান পুরোনো রুপো আর গির্জার প্রাচীন নাথ-পত্রের কেনা-বেচা ক'রে।

কটা রঙের থুঁতান চুলকোতে চুলকোতে দ্রোনভ বলে:

'দেখনা, চেহারাখানা যেন বিনয়ের অবতার! কিন্তু ভেতরে আছে কুলোপানা চক্র। মনটাও বড় ছোট। তাই না? ঐ জন্যই তো বউ জুটল না কপালে।'

পরচর্চার সময় দ্রোনভের মুখে বাঁকা হাসি ফোটে আর বাঁকা চোখে এমন ভাবে অন্য দিকে চায় যেন ঐ দিকে যিনি ব'সে আছেন তিনি অতি ভালো লোক, যাঁর তুলনায় আলোচ্য ব্যক্তিটি দুর্বৃত্ত বিশেষ। সম্ভবতঃ তার ধারণা খুব একটা খারাপ ভেবে সে কারো নিন্দা করে না। তাই উপসংহারে এসে বাছা বাছা কড়া কড়া শব্দের বেশ টান চড়িয়ে দেয়। তার এই স্বভাব ক্লিম জানে।

কিন্তু ঐতিহাসিক কজলভের কাহিনী বলতে গিয়ে দ্রোনভের যেন যথেষ্ট কালো রঙের যোগান মেলে না। স্বরটা কেমন মিইয়ে যায়; উৎসাহ ফিকে; চোখে ঝল্সায় না কাউকে হাতের মুঠোয় পেয়ে প্রাণ ভ'রে কাদা ছিটোতে পারার সেই উল্লাস। এই জন্য ওই ছোট খাট ছিম্ছাম্ মানুষটির দিকে আরো বেশী ক'রে আকৃষ্ট হলো ক্লিম।

সে-দিন সম্পাদকের দপ্তর থেকে এক সঙ্গেই বেরুল দু'জনে। ভারী খুশি হ'লো ক্লিম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঐতিহাসিক:

'বুড়ো বয়সটা ভারী কষ্টের। এই তো আমি—ব'সে ব'সে শুধু শুনি ওদের কথা। কি আর নতুন কথা বলে। সবই জানি, কিন্তু অর্থ যেন বুঝতে পারিনে আজকাল।'

সামঘিনের চোখের দৃষ্টিতে কি যেন খোঁজেন বৃদ্ধ; অদ্ভুত এক আকুতি ঘন হ'য়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বরে:

'মনে হয় আপনি তলিয়ে সব দেখতে চেষ্টা করেন; বুদ্ধি আছে এবং কথার চটকে সহজে ভোলার মানুষ নন আপনি। বেশীর ভাগ সময়ই তো দেখি চুপ ক'রে শুনছেন। আচ্ছা বলুন তো ইতিহাসকে তুচ্ছ করা চলে? আপনার কি মত?'

'নিশ্চয়ই নয়।' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয় ক্লিম।

কাঁধের ওপরে হাত তুলে আঙুলগুলো মুঠো ক'রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে পেছনের দিকে দেখিয়ে বলেন ঐতিহাসিক:

'কিন্তু ওরা তাই করে। ইতিহাস ওদের কাছে তুচ্ছ। প্রত্যেকেই মনে করে তার জন্মের দিনটি থেকেই ইতিহাসের শুরু।'

বয়সে কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও অদ্ভুত তার দৃঢ়তা। এক বিচিত্র ব্যঞ্জনায় তা রণিত

হতে থাকে।

ক্লিম বলে: নিজেদের মূল্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা একটু বাড়াবাড়ি রকম বেশী।'

'যা বলেছেন। সব তাতেই কি তাড়া ওদের! ঘোড়া লাফিয়ে চললে তো আর হাল চাষ হয় না! —বিশেষ ক'রে কৃষি-ভিত্তিক রাষ্ট্রে অত লাফিয়ে লাফিয়ে কি চলা যায়! যাই হোক, তাড়াতাড়ি ইওরোপের নাগাল ধরবার জন্য আমরা সবাই তো পরস্পরকে পেছন থেকে চাবুক কষছি—অবশ্য যথেষ্ট উদার ভাবেই।'

একটু থেমে ক্লিমের কনুই স্পর্শ করেন ঐতিহাসিক।

'আমাকে মোটেই গোঁড়া মনে করবেন না। গোঁড়া আমি একেবারেই নই। জেম্‌স্‌ত্‌ভো-পরিষদের এবং ঐ রকম সব কিছু সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে রাজী আছি। কিন্তু অমন ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ইওরোপের পেছনে ছোটা—যাই বলুন আমি কিছুতেই সংগত বলে মেনে নিতে পারছি না...।'

কজলভ চারদিকে তাকিয়ে স্বর একটু নামিয়ে বলেন—যেন কোন গোপন কথা বলছেন: 'ইওরোপ আস্ত একটা এক-চোখো শয়তান। বুঝলেন!'

তারপর আরও স্বর নামিয়ে, আরও রহস্য ঘনিয়ে তুলে বলেন: 'মনে ক'রে দেখুন—এই তো সে-দিনের কথা। ধরুন না সেই 'দ্বাদশ বৎসরের' পর থেকেই—সেবাস্তোপোল, তারপর সান্‌ স্তিফানো আর সব-শেষে সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্দারের গর্বিত ঘোষণা: "মন্টেনিগ্রোর প্রিন্স নিকোলাসই—আমার একমাত্র মিত্র।" —হুঃ, মন্টেনিগ্রোর সেই ছোঁড়া! কে তাঁকে চেনে? ইওরোপে তো উনি একটা মশা-মাছির সামিল। তা ইওরোপের কথা যদি বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে ঘোর অন্যায় করেছে তারা, শয়তান ছাড়া আর কি বলতে পারেন তাদের? ওদিকে তুর্কীরা যা করছে তার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই; অথচ আমাদের এই মহান জাতটাকে উচ্ছেদ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা।'

প্রশান্ত রাস্তার চড়াই বেয়ে চলছে দু'জনে। দু'দিকে আরামের আমেজ মাখানো ছোট ছোট একতলা বাড়ি; কোনটায় তিনটে জানালা, কোনটায় পাঁচটা। জানালায় মসলিনের পরদা। আর ফুলের সজ্জা তার পৈঠায়। জানালার আলো-রোধক ভারী পরদা, বাড়ির পাঁচিল, ফটক—সব রঙ করা। সবুজ, নীল, বাদামী, কোনটার বা সাদা, এক-একটা বাড়ি যেন বিনয়ে সামনের বাগানের আড়ালে আপনাকে রেখেছে লুকিয়ে; আবার কোনটা যেন গুমর ক'রে বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে সান্‌-বাঁধানো ফুটপাথের ওপর। বাগানে বাগানে সবুজ পাতার উৎসারিত সমারোহ। গত দুই দিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। সদ্য-স্নাত পত্রপল্লব গৃহগুলির ছাদে ছাদে ছায়া রচনা করেছে। অঙ্গনে, উদ্যানে শৈশবের কলকাকলি; কোথাও খোলা জানালার পথে ঝিলিক দেয় কচি মেয়ের হাসিমুখ। কার বাড়িতে যেন পিয়ানোর সুর-সংস্কার করছে যন্ত্রী। পাহাড়ের ওপর থেকে গির্জার ঘন্টা নীচের পৃথিবীর মানুষকে সান্ধ্য উপাসনায় আহ্বান জানাচ্ছে। ধূসর দিনাবসানের ভেজা বাতাসে তামার ঘন্টার সেই কোমল শিঞ্জিতের মিঠে আমেজ।

'দয়া ক'রে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে যদি একটু চা খেয়ে যান, কৃতার্থ হই।' প্রশ্নের সুরেই বলেন ঐতিহাসিক: 'আমি খাঁটি চা-খোর। কিছু মেশাই না—ক্রীম, লেবু, জ্যাম,—কিছু না। অমনি খাই চা। কাজেই প্রথম শ্রেণীর চাই ব্যবহার করি। সত্যি খুব ভালো জিনিস খাওয়াব, দেখবেন।'

পাঁচ জানালাওয়ালা একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ান কজলভ।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরম তৃপ্তির সুরে বলেন:

'আমাদের এই শহরের সব থেকে সুন্দর, সব থেকে জীবন্ত এই রাস্তাটি। জীবনের পরম রসোপলব্ধির জন্যেই যেন এই রাস্তাটা তৈরি হয়েছে।'.

এ রাস্তায় ক্লিম এর আগে আর কখনও আসেনি—ঐতিহাসিককে কথাটা বলতে গিয়ে কি রকম লজ্জা করতে লাগল ওর। কালো পোশাক পরা একজন দীর্ঘাঙ্গিনী এসে দরজা খুলে দিলেন—; বর্ণ শ্যাম, মোটা পুরু ভ্রূ, গোঁফের ক্ষীণ রেখা যেন চোখে পড়ে, মুখখানা ভাবলেশহীন—যেন প্রতিমার মুখ।

'আন্‌ফিসা নিকোনোভ্‌না স্ত্রেল্‌ৎজোভা—আমার মাননীয়া গৃহপালিকা।' পরিচয় করিয়ে দেন ঐতিহাসিক। ভ্রূ নাচিয়ে পাশের দিক হতে ক্লিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন মহিলা...শক্ত, যেন কাঠের হাত।

'স্ত্রেলৎজোভ, আর্মাশিকফ্, পুষ্কারেভ্, জাতিনশ্চিকফ্, তিউনফ্ আর আইনোজেমৎস্তেভ্‌রাই হলো এই শহরের সব থেকে প্রাচীন বংশ।' অতিথিকে ভেতরে নিয়ে আসতে আসতে বলেন ঐতিহাসিক। ঘরখানা বেশ বড়, দুটো জানালা আছে। তার ওধারে উঠোন এবং সব্জী-বাগান। 'তা আমাদের শহরের বাসিন্দাদের কাছে প্রাচীন ঘরনার কোন বিশেষ আদর নেই। গোটা শহরে ফ্যাসানী দরজী গামিরভ্‌ই একমাত্র মানুষ যে এখনও বংশগৌরব করে। কিন্তু কে তা পোছে?'

ক্লিম শ্রদ্ধার সঙ্গেই শোনে। শুনতে শুনতে বাড়িখানা নিরীক্ষণ ক'রে দেখে। জানালা দুটির মাঝখানের কোণটা ওপর হ'তে নীচে বিভিন্ন সেইন্টদের প্রতিমূর্তি দিয়ে ঠাসা। প্রতিমার সামনে তিনটি প্রদীপ জ্বলছে—একটি সাদা, একটি লাল ও আর একটি নীল।

মনে মনে আন্দাজ করে ক্লিম: নিশ্চয়ই জাতীয় পতাকার রঙ এগুলো। এর মধ্যে একটা গ্রাম্যতার পরিচয় থাকলেও কি যেন একটা ওকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সোনা-রুপোর কাজ করা অঙ্গ-সজ্জার দীপ্তিতে ঝলমল করছে প্রতিমাগুলি: ওপাল রঙের অশ্রুবিন্দুর মতো মুক্তো দিয়ে তৈরি হয়েছে, ঝালরঙ হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। ওদিকে পাঁচিলের ধারে রয়েছে একখানা পুরোনো খাট, কেরেলিয়ান বার্চ কাঠের তৈরি—তাতে ব্রঞ্জের কাজ। ঘরের মাঝখানে টেবিল,—চারদিকে টেবিলের সাথেই মিল-করা চারখানি চেয়ার। দরজার কাছে অন্ধকার কোণটায় একটা কাঁচের আলমারী, তার তাকে রয়েছে দুটো ছোট ছোট কয়লা-ঢালা হাতা ও বড় বড় পান পাত্র। মদের গেলাস। চামড়ায় বাঁধান বইয়ের কালো পিঠগুলোও দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে চারদিকে কি যেন একটা মহিমা আছে।

'এখানকারই অধিবাসী আফানাসি দিয়াকফ্ সম্বন্ধে আমার একটা রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সরকারী গেজেটে। তার মধ্যে সুইডেনের অধিবাসী কে এক ঈগর—সম্ভবতঃ আসল নামটা ঈঙ্গভার—অর্থাৎ ও থেকেই ডাক নাম হিসেবে জিয়োর্গ বা ঈগর দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকবে—হাঁ, সেই ঈগর সন্বন্ধে কাহিনী আছে যে, একবার সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট্ এই শহরে এসেছিলেন কোথায় যাবার পথে। কি রকম কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন সম্রাট, তা তো জানেনই! কিন্তু ঈগর ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির এবং সাহসী। সরাসরি সম্রাটকে গিয়ে বলল: মহামান্য জার আপনার লোহা গলান ও ঢালাই-এর কাজ শেখা দরকার। আপনার কেঠো রাজ্যে আপনি ছাড়াও বহু কাঠের মিস্ত্রী আছে। সুইডেন অভিযানের সময় এই স্পষ্ট-বক্তা ঈগরকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ফাঁসি দেওয়া হয়।'

এই ভাবে অনর্গল কথা বলতে বলতেই সাবধানে গায়ের কোটটি খুলে রেখে মেয়ে-

দের ব্লাউসের ধরনের একটা ডুরীদার জ্যাকেট পরেন ঐতিহাসিক। তারপর আলমারী খুলে সোনার জলে কাজ করা রূপোর কয়লা-ঢালা হাতা গুলো বের ক'রে দেখান। একটা জার ফিওদোরের আর একটা জার আলেক্সির। নিজের সংগ্রহ সম্বন্ধে যে একটা গর্ব আছে ঐতিহাসিকের, তা অপ্রকাশ রইল না।

হাতা দুটোর খোদাই-করা লেখাগুলোকে দেখালেন। শুধু দেখানো নয়, যেন অক্ষরগুলোকে আদর করতে লাগলেন। জানালেন, কর্মদক্ষতার জন্য এগুলো পান-শালার কর্মচারীদের ইনাম দিয়েছিলেন সম্রাট। তারপর সগর্বে বের ক'রে ক্লিমের সামনে ধরলেন একখানা বই—সবুজ মরক্কো চামড়ার বাঁধাই, তাতে সোনার কাজ। শিশকেফের রচনা, নাম: "সাহিত্যের প্রাচীন ও নূতন শৈলী।" বইটাতে ডেনিস্ দাভিদভের নিজের হাতে নাম লেখা। আর একজনের কার যেন বাঁকা হাতের হরফে কিছু একটা লেখা রয়েছে। লেখার প্রথম দিকটায় কালি ধেবড়ে গেছে, খালি দেখা যাচ্ছে "—যাহার ফলে যথাযোগ্য শাস্তি-বিধান করতঃ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদলের হাতে সমর্পণ করা হয়।"

যেন অত্যন্ত গোপন বস্তু দেখাচ্ছেন, এই রকম ভঙ্গি ক'রে বের ক'রে আনলেন একখানা হাতের লেখা হলদেটে কাগজ যার শিরোনামা হচ্ছে: "টইলদারী সাধারণ সৈন্যদলের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কুফল সম্বন্ধে জনৈক নিরক্ষর নাগরিকের স্বাধীন চিন্তাধারা—মহা-সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথা পেত্রভনার সিংহসনাধিরোহনের কাল হইতে ধার্মিক-প্রবর সম্রাট প্রথম পল্-এর মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতাবলির পূর্ণ দলিল সম্বলিত।"

বিষণ্ণ ভাবে কজলভ বলেন: 'নিশ্চয়ই একখানা বইয়ের মতো বই হয়েছিল। কিন্তু এই টুকুই মাত্র আমার হাতে এসেছে। একজন পুরাতত্ত্ববিদের কাছ থেকে "বিশ্বাসের অনড় ভিত্তি" নামে একখানা বই এনেছিলাম পড়তে। তারই মধ্যে এই পাতাটা পেয়েছিলাম।'

দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দেখান ঐতিহাসিক। বিশীর্ণ বিবর্ণ হাঁসের পায়ের মতো হাতখানা দিয়ে আলতো ক'রে হাত বুলান প্রতিটি বস্তুর ওপর। টিকটিকির মতো হাল্কা পায়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ান ঘরের চারদিকে—অনুচ্চ দৃঢ় কণ্ঠে তার রহস্য ঘনতর হয়ে ওঠে। কপোলের লাল শিরার নক্সীগুলো প্রথমে ফুলে মোটা হয়ে ওঠে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে।

মৃদু হেসে বলেন: 'মানুষের হাতের অপূর্ব সৃষ্টি-মহিমা দেখলে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। আমাদের এই ছোট্ট সুন্দর শহরটিতে আজ যারা আছেন তাঁরা সাম্প্রতিক ইতিহাসের রাজপথ থেকে দূরে সরে থাকেন। এই জন্যই বহু মূল্যবান তথ্য আজও চাপা পড়ে আছে শহরেরই নানা জায়গায়। এ-পর্যন্ত কারও হাত পড়েনি এসবে। হয়তো পড়বে একদিন—যেদিন আসবেন আর একজন কারামজিন বা জাবেলিন। বুঝলেন, আমার ভারী ভালো লাগে এই ঐতিহাসিক কবি দুজনকে—বিশেষ ক'রে কারামজিন। এমন ক'রে আর কেউ বোঝেননি রুশ দেশকে আর মানুষের মর্মকথা। কে বুঝেছে অমন ক'রে যে রাশিয়ার আজ প্রয়োজন একটু দরদের, আর মানুষ চায় শুধু একটু করুণা!'

স্বাদে গন্ধে সত্যি অপূর্ব চা। পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শহরের সেকালের কত তথ্য যে শুনতে লাগল ক্লিম—কত গভর্ণর, আর্কবিশপ, এটর্ণীদের কত কাহিনী, কোন এক কাউন্ট মুরাভিয়েভের ইতিবৃত্ত:

'লোকটা ছিলেন কিন্তু অত্যন্ত অভদ্র ও কটুভাষী। একবার আর্কবিশপ

মাকারীকে খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একটা শুয়োরের মাথা অতিথির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেব, গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়। অত্যন্ত রসিক ছিলেন আর্কবিশপ। রসিকতা তাঁর জিভের ডগায় তৈরি থাকত। উত্তর দিলেন মহামহিম: 'আপনি আগে আরম্ভ করুন!...' বলে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়লেন কজলভ।

'বুঝলেন? কাউন্ট মুরাভিয়েভ যদি বলতেন: 'এইটে আমার শরীর। তবে বলতাম, হাঁ রসিকতার মতো রসিকতা বটে!'

আর-একটা কাহিনী শোনান: 'এক বনিক। তার স্ত্রী ভারী দয়ালু। প্রতি শনিবার জেলের কয়েদীদের জন্য খাবার জিনিস-টিনিস পাঠিয়ে দিতেন। একদিন শোনা গেল জার মহাত্মা স্পারেন্স্কিকে অপমান করেছেন। এবং তিনি এ শহরে এসেছেন। মহিলা তাঁর কর্মচারীকে দিয়ে পাঁচটা ডিম ভাজা আর একখানা রুটি পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে।'

বলতে বলতে আবার হেসে ওঠেন ঐতিহাসিক। সামঘিনের কেমন বিশ্রী লাগে হাসিটা। মনে মনে বলে: 'হাসার সুযোগ তো পায় না বেচারা!'

'নেপোলিয়ন হেন লোকের সহকর্মী, আর তাঁর নিজের কৃতিত্বও কম নয়—তার দাম কিনা পাঁচটা ডিম ভাজা! কদরটা দেখছেন তো!' বলে শূন্যে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন কজলভ। 'আর কি দয়ার প্রাণ মহিলার, আর কি সরল, বলিহারি!'

সেই খোঁড়া বুড়ী ফেদোসোভাকে মনে পড়ে ক্লিমের। কজলভ যেন অনেকটা ঐ বুড়ীর মতো। নিজনী-নভোগোরদ-এ দেখা হয়েছিল বুড়ীর সঙ্গে। গদগদ হয়ে এমন ভাবে বলছিল বুড়ী পরীদের কথা, যেন ও নিজে পরীরাজ্যের প্রতিবেশী। গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্লিম শুনেছিল। এই ছিম্‌ছাম্ বৃদ্ধও তেমনি করেই বলেন সাধারণ লোকের কথা—যারা নেহাৎ সাধারণ, তাঁর মতোই সাধারণ। কিন্তু তাঁর বলার মহিমায় মূল্যহীনের দল মূল্য পায়। এমন কি সুন্দরও হয়ে ওঠে। প্রীতি দিয়ে সাজিয়ে কোমল রঙ দিয়ে দৈনন্দিন আর নেহাৎ সহজ সরল জীবন যাত্রার যে ছবি তিনি আঁকেন তাতে জীবনকে মনে হয় শান্তি ভরা নিত্য উৎসব, যার মধ্যে গির্জায় যাওয়া আছে, সরুচাক্‌লী আছে, জ্যাম-জেলী আছে, নাম-করণ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ—সব আছে। অতি সুন্দর সহজ জীবন—কুটিলতা নেই, জটিলতা নেই। কজলভ বলেন: 'মধু-ঋতুর দেবতা য়ারিলার উৎসব হতো আগের কালে। এখনও হয়। অতীতের প্যাগান যুগের বহু উৎসবানুষ্ঠান কিছু কিছু এ কালেও বেঁচে আছে।' ঐতিহাসিক তাঁর ইতিবৃত্তি শোনান ক্লিমকে।

আশ্চর্য ক্ষমতা ঐতিহাসিকের। জ্ঞানগর্ভ ঝুরি-ঝুরি পুঁথি-পড়া পণ্ডিতেরা যে-সব জিনিসকে বলেন অশ্লীল, অর্থহীন, আর ক্ষতিকর,—উদার হাসি দিয়ে এমন কৌশলে তা সহজ ক'রে নেন কজলভ যে, অবাক হয়ে যায় ক্লিম। এই শহরে কবে কি ক'রে শুরু হলো, কিছুই ও জানত না, জানতে চায়ও নি। আজ শুনল। সীমান্তের এই ছোট্ট শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন ঝাদভ্। যাযাবরদের আক্রমণ থেকে মস্কো রক্ষার জন্য জার বোরিস গোদুনভ্ যে সেনা-বাহিনী ও ক্রীতদাসের দল পাঠিয়েছিলেন,—তাদের দিয়েই হয় কাজ শুরু। সৈন্য আর ক্রীতদাসেরা মর্দভিন্‌দের যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী ক'রে এনে কাজে লাগিয়ে দেয়। ঝাদভের নিষ্ঠুরতা সইতে না পেরে বহু ক্রীতদাস পালিয়ে যায়। আর নিরুপায় ঝাদভ্ সেই স্টেপীর কঠোর জীবন সইতে না পেরে পাগলের মতো চুল ছিঁড়তে থাকেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিখুঁত ভাবে প্রতিটি ঘটনা বর্ণনা করে যান কজলভ।

সকলের কথাই বলেন কজলভ—হতভাগ্য মর্দাভিন, তাতার, ক্রীতদাস, সৈন্য-সামন্ত, ঝাদভ, ধর্ম-যাজক ভ্যাসিলী, ডীকন, তিশ্‌কো, দ্রোজ্‌দ,—শহরের প্রতিষ্ঠাতা আর শত্রু—শহরটিকে যারা তৈরি করেছে, প্রতিকূলতা করেছে যারা—প্রতিটি মানুষ অবস্থায় পড়ে ভালো-মন্দ যা কিছু করেছে সবার ওপর, সব কিছুর ওপর সমান দরদের স্পর্শ ঐতিহাসিকের।

'আমাদের সাধারণ লোকেরা ভারী শান্তিপ্রিয়। কোন রকম অশান্তির সৃষ্টি করতে তারা মোটেই চায় না।' কজলভের বলার ভঙ্গি মনকে ছুঁয়ে যায়। 'শাপাভ, আর কশাক্‌বংশীয় দানিলা মর্দোভৎজেভ-এর মতো বিদেশীরাই আমাদের দেশের কৃষকদের বৃথা অপবাদ দেয় যে তারা নাকি রাজনৈতিক আন্দোলন পেলে আর কিছু চায় না, আর এরাই নাকি মস্কোর সার্বভৌমতার সব চেয়ে বড় শত্রু। একেবারে স্রেফ মিথ্যে কথা সব। কশাকরা মস্কোকে ঘৃণা করে। মাজেপ্পা মহান্ পিটারের কাছে বিশ বছর কাজ করেছে আর তার পর কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করলে!'

কঠোর হয়ে ওঠে ঐতিহাসিকের স্বর। কথা বলত বলতে টেবিলের ওপর ঘুষি মারেন উত্তেজনায়; মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠে গোটা মুখটা রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই মুখটা আগের মতো দরদ ঢেলে আবার বলতে আরম্ভ করেন: 'আর এই ভাবেই গড়ে উঠেছে এই শহর। একদিন যারা এর বুনিয়াদ পত্তন করেছিল আজ তাদের কণাও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু শহর গড়ে উঠল, বড় হলো। সুন্দরও হ'লো—অস্বীকার করতে পারবেনা কেউ। আজ এখানে সত্তর হাজার মানুষ ঘর বেঁধেছে। ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। আসল শক্তির পরিচয় তো নীরবে কাজ ক'রে যাওয়ার মধ্যেই, লড়াই দাঙ্গায় নয়। বিশ্বাস করুন। ঘোড়া লাফিয়ে চললে কি জমি চাষ হয়!' শেষের কথা কটি অত্যন্ত প্রিয় কজলভের।

অজস্র তাঁর কথার ভাণ্ডার, কিন্তু একই সুর। বিভিন্ন তান লয় মাত্র। 'কানির্সের ইঁট আসল নয়, ভিত্তির ইঁটই আসল ইঁট'; 'বাছুর হয়ে তবে তো ষাঁড়!' এই ধরনের বহু কথা তিনি সর্বদাই ব্যবহার করেন। তাঁর আলাপ প্রীতিতে সরস; ভাষা কোমল শব্দ-বিন্যাসে স্নিগ্ধ। মনোরম একটা মৃদু দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয় তা থেকে। তাঁর আলমারীতে রাখা পুরোনো রুপোর জিনিসগুলোর বর্ণের সঙ্গে তার যেন মিল আছে। তাঁর কথা শুনতে ভালো লাগে, তাঁকে দেখতে ভালো লাগে। কালো গ্রন্থিল আঙুলওয়ালা শীর্ণ হাত দু'খানা নাড়ার ভঙ্গি সহজ; শিরা-বিচিত্রিত মুখখানা বড় সুন্দর হয়ে বলি-রেখার ভাঁজ পড়েছে; তাঁর সাদা গোঁফ জোড়ায় কেমন একটা কাঁপন জাগে; পুরু চশমার পেছনে এতটুকু চোখের তারা দুটি দেখলে মনে পড়ে সেইন্টদের প্রতিমার পোশাকের মুক্তার ঝালরগুলোর কথা। তাঁর একটু একটু ক'রে চা খাওয়ার ভঙ্গিতে একটা অপূর্ব সুষমা আছে; সুষমা আছে ছোট ছোট দাঁত দিয়ে খুঁটে খুঁটে ক্রীম-ক্র্যাকার খাওয়ায়। ফুল গাছের মতো একটা মনোরম সৌরভ বিকীর্ণ হয় তাঁর সারা সত্তা থেকে। সময়ের হিসেব থাকে না ক্লিমের। কোথা দিয়ে মাঝ-রাত গড়িয়ে যায়। তারপর তৃপ্তির হাসি হেসে বিদায় নিয়ে ও বেরিয়ে আসে। প্রদর্শনীতে গিয়ে ও যে আনন্দ লাভ করেছিল, তার চেয়ে আরো বেশী আনন্দ পেল ও এই বৃদ্ধের সাহচর্যে, পেল উদ্দীপনা। গরম পড়েছে, কিন্তু বাগানের গাছপালায় নাচন জাগিয়ে শিরশিরিয়ে বইছে শীতল বাতাস; ভেসে-আসা অজস্র সৌগন্ধে ভরে উঠেছে পথের আকাশ। পূর্ণিমার চাঁদ স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে অবগুণ্ঠন টেনেছে। দুপাশের গৃহ-শীর্ষ পেছনে ফেলে

ঊর্ধ্বাকাশে উঠে গেছে গির্জার সুবর্ণ-মণ্ডিত মিনার। নিদাঘ-রাত্রির আদর ভরা কোমলতায় জড়িয়ে আছে প্রতিটি বস্তু যেন এই মাত্র জন্ম নিল তারা। সব থেকে বড় কথা এই যে প্রতিটি বস্তু যেন মানুষের প্রতি প্রেমে আর কোমলতায় ভরে উঠেছে।

কোমলতায় সিঞ্চিত হয়েছে সামঘিনেরও চিত্ত—সবই মমতা ভরা আজ—চাঁদ, বাতাস, ফুল-সৌগন্ধ, নিশীথ রাত্রির শহরের মূর্চ্ছিত কোলাহল—সব মমতা-ময়, মায়াময়। এই শান্তি-ভরা, আরাম-ভরা বাড়ি ঘর যেখনে নীড় বেঁধে এসেছে শান্তি প্রিয় মানুষ, যারা সে-দিনের দুর্বার ধনুর্ধারী, বন্দুক-ধারী যোদ্ধৃ-বীর আর পলাতক ক্রীতদাসের দল, ভাগ্যহীন কশাক, জোর ক'রে ধর্মান্তরিত উঁচু-চোয়াল মর্দভিনের দল আর অদৃষ্ট-বাদী তাতারদের বংশধর।...

দাঁত চেপে যে-শহরের কথা বলে দ্রোনভ, প্রবন্ধে যে-শহরকে ব্যঙ্গ করে রবিনসন, ব্যর্থকাম আর কঠোর জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত মানুষের আক্ষেপ যে-শহরকে দীর্ণ করে,—এ সে-শহর নয়। এদের ওপর আজ রাগ হয় না ক্লিমের। বোঝে ও জীবনের যে স্বরূপ ঐতিহাসিকের উদার স্বীকৃতি পেয়েছে, সেই জীবনেরই তো অংশ-ভাক্ এরা।

*

তারপর আরো দু'তিন দিন আলাপ হয়েছে ওদের। নতুন কোন কথা হয়নি। কিন্তু প্রথম আলাপের দিনে কজলভের কাছ থেকে যে অজস্র ঐশ্বর্য লাভ করেছিল ক্লিম, পরবর্তী কয়দিনের আলাপে তা দৃঢ় হয়ে দানা বাঁধবার অবকাশ পেল। আরো কিছু কিছু উপাখ্যানও শুনল: অভিজাতদের কথা, ধনী বনিকদের কথা, নানা অত্যাচার অবিচারের কাহিনী, মানুষের মানুষকে কষ্ট দিয়ে, স্ফূর্তি করার ইতিবৃত্ত।

'ক্ষমতার বাড়াবাড়ি হলেই ঐ রকম নিষ্ঠুর রসিকতা করে মানুষ। পাজী সাদকো ভাঁড়ামী করে, আর মগজহীন বুস্লায়েভ বেড়ায় বীরত্বের জাঁক ক'রে।' গেলাসে সোনালী রঙের চা ঢালতে ঢালতে এমনি সব কথা বলে যান কজলভ।

বৃদ্ধ ঐতিহাসিকের ছেলেমানুষী যুক্তিগুলি নীরবে সশ্রদ্ধ হয়ে শোনে ক্লিম; মিঠে সুরের গানের মতো বাজে কানে, সুরটা উপভোগ করে। তর্ক করতে ইচ্ছে করে না ওর।

চিনির খণ্ডটাকে চামচ দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে উপদেশের সুরে বলে যান কজলভ: 'আমরা যে সমালোচনা করি তার মূল্য হচ্ছে ইওরোপের কাছে আমাদের লজ্জা, আমাদের অহংকার আর আমাদের নিজস্ব ধরনে চলতে পারার অক্ষমতা। এই ধরুন যেমন হার্টজেন হতে চাইলেন ভলতেয়ার। প্রত্যেক সমালোচকেরই ঐ রকম এক-একটা খেয়াল আছে। —আরে! কিছুই তো খাচ্ছেন না, নিন্ একটা কেক নিন্। টক বেরীর রস দিয়ে তৈরি কেক এটা। আমার গৃহপালিকাটি যে কত রকম রান্না জানে! রীতিমত রন্ধন-শিল্পী!'

গুন্ গুন্ ক'রে একটা বোলতা উড়ে বেড়াচ্ছে টেবিলের ওপর দিয়ে। বৃদ্ধের চোখ উড়ন্ত বোলতার সঙ্গে সঙ্গে চলে—। একটা চামচে খানিকটা জ্যাম রাখলেন। লক্ষ্য করতে লাগলেন কখন ওটা ওই জ্যামে পড়ে। পড়লও শেষ পর্যন্ত। উনি চামচটা তুলে নিয়ে সামোভার থেকে খানিকটা ফুটন্ত জল ঢেলে বোলতাটার ইহকৃত্য

শেষ ক'রে দিলেন।

'আমি সমালোচনা পছন্দ করিনে একথা বলতে পারিনে,' স্বরটা আরো কঠিন হ'য়ে ওঠে: 'কোটোশিকিন, প্রিন্স কুরবস্কির মতো বেশ ভালো ভালো সমালোচক আছেন আমাদের দেশে। এমন কি সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনও সমালোচনা-বিমুখ ছিলেন না।'

বিষণ্ন ভাবে হাতদুটিকে মেলে ধরেন। জিভ দিয়ে ঠোঁঠ ভিজিয়ে নিয়ে আবার বলেন: 'কিন্তু বুঝতে পারিনে কি রহস্য আছে—সুইডিশরা সেই কোটোশিকিনের মাথা কেটে ফেললে। কুরবস্কি গেলেন লিথুয়ানিয়ায়—আর ফিরে এলেন না। কোথায় যে বেমালুম মিলিয়ে গেলেন, কে জানে।' ধুলোর মতো যেন হাওয়ায়ই উড়ে গেলেন। ওঁর বংশেই আর কেউ রইল না। আর ক্যাথারিন—উনি যদি একটু আত্ম-সমালোচনা করতেন, ভাল হ'তো। একটা গল্প বলছি ওঁর সম্বন্ধে শুনুন। গল্পটা একটু অবশ্য অশ্লীল। তা ঐ ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে অশ্লীল ছাড়া ভলো জিনিস পাবেন কোথায়?'

নেহাৎ একটা মামুলী গল্প। মেয়েলী দুর্বলতার ফলাও-করা কাহিনী। তারপর আরো জোরের সংগে বলতে লাগলেন:

'সমালোচনা তো আইন সম্মত। কিন্তু তামা, রূপো অতি সাবধানে পরিস্কার করতে হয়। আর আমরা কি তা করি। কষে ঝামা দিয়ে ঘষি। ফলে জিনিসগুলোর বারোটা বেজে যায়। ইওরোপ খুবই উন্নতি করেছে। তার জন্য যোগ্য মর্যাদা তার প্রাপ্য। আবিষ্কারও বহু করেছে তারা, এবং এজন্য গর্ব করতে পারে। এই ইওরোপের জুতোই ধরুন না কেন—কত রকম জুতো বের করেছে তারা। কিন্তু আমাদের দেশের তৈরি বুটগুলোতে অনেক বেশী আরাম। ইওরোপের বুট তার ধারে কাছেও লাগে না। সে যাই হোক, আমরা ছুঁচলো ডগার জুতো তৈরি করছি আজকাল, যদিও পরে আরাম নেই, তার ওপরে কড়া যা পড়ে তার তো কথাই নেই। জুতোটাই আমার কথা নয়,—দৃষ্টান্ত হিসেবে বললুম মাত্র।'

জানালার ধারের গাছটায় পাতার শিরশিরানী, আর সামোভারের ফুটন্ত জলের গম্ভীর সোঁ সোঁ শব্দের কেমন যেন একটা মিল আছে কজলভের স্বরের সংগে। টেবিলের মসৃণ টালির ওপর হিল্লোলিত হচ্ছে পত্র-ছায়ার চিত্রালি। প্রতিমার সামনের প্রদীপ তিনটির একটার সলতেয় ফট্ ফট্ শব্দ হচ্ছে। মরা বোলতাটা পড়ে আছে ট্রের ওপর—চামচ দিয়ে কজলভ সেটাকে নাড়ছেন

'আমাদের এখানকার লোকেরা সম্পাদকের দপ্তরখানায় গিয়ে জোটেন। ইওরোপ ইওরোপ বলে চ্যাঁচান সব। সম্পাদক আর তার সাকরেদরা সব বাইরের লোক—তাদের সামনে বসে নিজেদের শহরের নিন্দে করা হয় গলা ছেড়ে। করে, কারণ ওরা জানে না এ শহরের ইতিহাস। এর আত্মার সাথে ওদের পরিচয় নেই। তাই হয়তো ওদের এত রাগ।'

চশমার ভেতর দিয়ে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে বলেন: কি মনে হয় জানেন? —কি বলি—ঐ ভাবে বাইরের লোকের সামনে ঘরের নিন্দে করা,—আমার ভালো লাগে না মশাই। কথাটা একটু ইয়ে হচ্ছে, কিন্তু ধরুন আমার বাপ মদ খান, বা পূর্বপুরুষের কেউ খেতেন,—বাইরের লোকের সামনে তা বলা উচিত? তমিলিনকে দেখলেই আমার বুক দুর্ দুর্ করে। লোকটা জংগলী, অনর্গল কথা বলে. ওর মুখ বন্ধ করে কার সাধ্য! ওর ঘাড়ের ওপর যে বস্তুটা রয়েছে সেটা মাথা নয়,—পচা কচু। আর রবিনসন তো একটা ভাঁড়! তার জন্য আমার মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু ইনোকভ বলে এক ছোকরাও আসে ওখানে। আমার এখানে এসেছিল বার

দুই। এ ছেলেটার যে কি ক্ষমতা আছে, না-আছে ভেবেই পাইনে।'

চামচ দিয়ে ঠেলে শূন্য বোলতাটাকে সামনে টেনে আনেন ঐতিহাসিক, তার পর অভ্রান্ত লক্ষ্যে চামচের এক আঘাতে ওটাকে চেপ্টে দিয়ে সামোভারের জ্বলন্ত উনুনে ফেলে দিলেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে: 'কতগুলো খারাপ লোক আছে আমাদের দেশে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কি? কোন পথে তারা চলেছে?'

নিজের মতামত চেপে অত্যন্ত হুশিয়ার হয়ে বলে সামঘিন। এটা ওর স্বভাব। কেন জানি এখন ওর মনে হলো এর পর মজার কিছু শুনতে পাবে। তাই একটু হেসে বলল: 'ওরা রাজনৈতিক পরিবর্তন আর পার্লামেন্টারী গভর্ণমেন্টের স্বপ্ন দেখছে।'

তীব্র স্বরে প্রায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন ঐতিহাসিক: 'আমি জানি। গণতন্ত্র! গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছে সব! সমাজতন্ত্রের স্বপ্নও দেখছে বোধহয়। স্বয়ং যীশুখৃষ্ট ওই সমাজতন্ত্র নিয়ে—মানে স্বয়ং ভগবানের সন্তান খৃষ্টও পারেন নি সমাজতন্ত্র আনতে। আপনি কি বলেন? কিছু মনে করবেন না জিজ্ঞেস করছি বলে।'

কি বলা যায়! একটু হিসেব ক'রে উত্তরটা দিতে হয়। কিন্তু সামঘিন কথা খুঁজে পাবার আগেই চামচ দিয়ে হাতের তেলোয় বাড়ি মেরে উত্তেজিত ভাবে ঐতিহাসিক বলে উঠলেন: 'আমার মনে হয় কি জানেন? সেই ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সেইন্ট-পিটর্সবুর্গের সেনেট স্কয়ারে সম্রাট প্রথম নিকোলাস রাজশক্তির যে কঠোর পরিচয় দিয়েছিলেন, আমাদের বর্তমান সম্রাটকেও তাই দিতে হবে।'

কঠোর হুসিয়ারীর সুরে তাবিখটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তারপর দৃপ্ত ভঙ্গিতে চেয়ারের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে সোজা হয়ে বসলেন ঘোড়-সওয়ারের মতো। তাঁর উদ্‌বেড়ালী ছাঁদের মুখটা শক্ত হয়ে আরো যেন ছুঁচলো হয়ে উঠল। গাল দুটো লাল হয়ে দপ্ দপ্ করতে লাগল, কানের লতি ফুলে চেরী ফলের মতো গোল হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ সেইন্ট মূর্তির দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রস্ চিহ্ন এঁকে দিলেন। মুখখানা আবার কোমল হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে বললেন: 'নাঃ, রাগ করা উচিত নয়। যদিও রাগ করার কারণ যথেষ্ট আছে।'

তাড়াতাড়ি চিবিয়ে একটা বিস্কিট খেলেন কজলভ। তারপর বার কয়েক চুমুক দিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অথচ জোরাল স্বরে বিবৃত করতে আরম্ভ করলেন ইতিহাস:

'আমার বয়েস তখন কম। সেবার একদল কয়েদীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কজান থেকে পার্ম-এ। আমি গেলাম রক্ষীদলের অধিনায়ক হয়ে। ভীষণ গরম ছিল সেদিন। রাস্তায় একটা কয়েদী হঠাৎ মরে গেল। স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল এতক্ষণ লোকটা। হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল আর মরল...যেন শূন্য থেকে একটা তীর এসে ওর ব্রহ্মতালু ফুটো ক'রে দিয়ে গেল। বুড়ো নয়, কিছু নয়—মাত্র বছর চল্লিশেক বয়স, তাগড়া যোয়ান—অবশ্য দেখতে ভাল নয়—জানোয়ারী চেহারা। ধর্মনিন্দা, অনাচার, জালিয়াতী ইত্যাদির অভিযোগে লোকটার কঠোর শ্রমের দণ্ড এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসন হয়েছিল। তার থলেটার মধ্যে পাওয়া গেল ছোট ছোট গোটা কয়েক ছবি—তারই আঁকা—বেশ ভালো হাত। এই গুণ ছিল বলেই হয়তো লোকটা জালিয়াতীর পথে গিয়েছিল। গোট পাঁচেক ছবি বোধহয় ছিল—বিষয-বস্তু একই—কিষাণ-বীর মিকুলা সিলিয়ানিনোভিচ্ সর্পরূপী শয়তান ৎস্মে গরিনিচ্-এর সঙ্গে গরুর গাড়ির জোয়াল নিয়ে লড়ছে। দুই মাথা সাপটার...এক মাথায় মুকুট, আর এক মাথায় ধর্মযাজকের টুপী। একটাব নীচে লেখা "সেইন্টপিটস্-বুর্গ." আর একটার নীচে "মস্কো"।...আর কি বলতে চান?'

রুপোলী চুলগুলো হাত দিয়ে আর-একবার পালিশ ক'রে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন কজলভ: 'অসংযত-চিত্ত মানুষকে বড় ভয় করে আমার—' জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে বলে যান: 'কথা আছে না, অল্প শিক্ষার ফল অপরিণত মন—কথাটা সত্যি। মশায়, আমাদের মনগুলো হচ্ছে বেড়ালছানার মতো। চেয়ার বলুন, দামী গালিচা, রাজ-সিংহাসন কোথায় না নোংরা করে বেড়ালছানারা! সব সমান ওদের কাছে। গির্জার বেদীতে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিন,—সেখানেও তাই করবে। আসবাব কামড়ে, জুতো চিবিয়ে ওদের খেলা—জামা কাপড় ছিঁড়ছে, ফুলের কেয়ারী খাবলে মাটি তুলছে—যেখানে যা কিছু ভালো আছে সব নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে নির্বোধেরা।'

হাত তুলে তর্জনী নির্দেশ ক'রে অন্তরঙ্গ সুরে বলে যান ঐতিহাসিক: 'একথা অস্বীকার করব না যে, ব্যবহারিক বুদ্ধি আছে এমন কিছু লোক সত্যি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু যুক্তির মধ্যেও নিষ্ফল কল্পনার স্থান আছে। সেই কল্পনা, তার নারী-সুলভ ছলা-কলা এবং অকুণ্ঠ ভাবে মোহ-বিস্তার ক'রে আমাদের লোভ দেখানোর হীন প্রচেষ্টার কাছে আমরা অন্ধভাবে আত্ম-সমর্পণ করি। আমার আপত্তি হচ্ছে সেইখানে। সাহিত্যিক গোগোল তাঁর মারাত্মক ভুলের অনু-শোচনা করতে গিয়ে কঠোরভাবে ঐ জিনিসটা আমাদের সামনে তুলে ধরেন।' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন কজলভ। একটা বিষণ্ণতার সুর ঘন হয়ে ওঠে স্বরে। বলতে থাকেন তিনি: 'মেয়েদের কথাই ধরুন। এই রুশ দেশের মেয়েরা বেশ ভালো। আরো ভালো হ'তে পারত...হয়তো তাতেই আমরা ইওরোপের ওপরে উঠে যেতাম—যদি না মার্থা বোরেৎস্কায়া, সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং দ্বিতীয় ক্যাথারিনকে নিয়ে সব ভুল মতের কচ্‌কচিতে আমাদের পুরুষদের মাথা না গুলিয়ে যেত। এদের দৃষ্টান্তের ওপরেই নারীর সমানাধিকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশুভ কুসংস্কার সব গড়ে উঠেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইওরোপে যদি একজন লুই মিচেল থেকে থাকেন, আমাদের দেশে আছে হাজার হাজার। অবশ্যি জানি আমার আর আপনার মতের মিল হবে না। কিন্তু দাঁড়ান, বয়েস হোক আর-একটু—তখন প্রকৃতির ধর্মেই নীড় বাঁধতে লেগে যাবেন, আর...'

ক্লিম জবাব দেয়: 'আমি আপনার কথা সবটা মানতে পারছিনে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে থামেন ঐতিহাসিক। 'বেশ বেশ। শুনে খুশি হলাম যে সম্পূর্ণ না হলেও অন্ততঃ খানিকটা আপনি আমার সংগে একমত।' একটু হেসে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন কজলভ: 'আমাদের রুশ দেশে যুক্তির দৌলতে বহু জিনিসই তাদের যোগ্য স্থান হতে চ্যুত হয়ে ভুল যায়গায় গড়িয়ে চলে গেছে।'

বিদায় নিয়ে চলে আসে সামঘিন। ওর মনে হয় বৃদ্ধকে বুঝেছে ও। ওর অন্তরের অন্তস্থল অবধি দেখতে পেয়েছে। একটা অস্থিরতা নিয়ে ফিরল ও। নতুন অনুভূতি যেন প্রকাশের পথ খুঁজছে। হাতড়ে ফিরছে কথা। ঘন মেঘে ধূসর আকাশের নীচে তন্দ্রালু পথ। চলতে চলতে আকাশের দিকে চেয়ে আঙুল মটকাতে মটকাতে পাঁতি পাঁতি ক'রে মনের অলি গলি খোঁজে—। এ চাঞ্চল্য কেন, কোথায় এর উৎস! ভাবে ও, ঠিক কথাই বলেছেন ঐতিহাসিক। লাখে লাখে উদ্যমী নিরহংকার মানুষ আছে। তাদের চিন্তাধারাও হয়তো ওঁ'রই মতো। কিন্তু সামঘিনের মনের অস্বস্তি যায় না। কেবলি ওর মনে হয়: 'পেলাম না, পেলাম না। যা খুঁজি—তা পেলাম না।'

॥ ৩ ॥

দুদিন পরের কথা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে নখ প্রসাধন করছিল সামঘিন। নিঃশব্দে গেট খুলে অঙ্গনে এসে ঢুকলেন বৃষকন্ধ এক পুরুষ—গায়ে এক ধুলোঘ্রাণ আলখাল্লা, মাথায় সাদা টুপী, হাতে হাল্কা ব্যাগ। গেটটা বন্ধ ক'রে টুপীটা খুলেলেন ভদ্রলোক...বেরিয়ে পড়ল তাঁর কদম-ছাঁট মাথাটা। প্রথমে রাস্তার দিকে, তারপর বাঁ দিকে তাকিয়ে ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে একবার এ-কাঁধ আর-একবার ও-কাঁধ বাড়িয়ে পা বাড়ালেন স্পিভাক্‌দের ফ্লাটের দিকে।

চিনতে পারল ক্লিম—কুতুজভ। মনে পড়ে গেল সেবার সেইন্টপিটর্সবুর্গ-এ ঈস্টার রবিবারের রাতে কি কুৎসিত কাণ্ড করেছিল লোকটা মাতলামী ক'রে। মনে মনে বলেছিল ক্লিম আর যেন দেখা না হয় কখনও। কিন্তু এখন শুধু কৌতূহল নয়, তার চাইতে তীব্রতর কোন আবেগে অদম্য পিপাসা জাগল ওর মনে লোকটাকে দেখবে, শুনবে ওর কথা, তর্ক করবে ওর সাথে, করবে বচসা। নিজেকে চোখ রাঙাল ক্লিম—কি ছেলেমানুষী হচ্ছে! কিন্তু বারন মানল না মন। ঘন্টা খানেক যেতে না যেতেই ও স্পিভাকের ঘরে এসে হাজির হ'লো।

যখন ছাত্র ছিল কুতুজভ, পরতো ছাত্রের পোশাক। কিন্তু ছাত্রের মতো লাগত না তাকে একটুও। আজ তার পরনে ধূসর রঙের কোট, চওড়া কাঁধ দুটোর ওপর আঁট হয়ে পড়েছে তার বাঁধন; কড়া কলপের সার্টের উঁচু কলার ঠেকেছে থুতনীতে। ছাগল-দাড়ী বিশ্রী ক'রে ছাঁটা...সব মিলিয়ে চেহারাটা যা হয়েছে তার তুলনা মেলে না।

ক্লিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সৌজন্যে গদগদ হ'য়ে সম্ভাষণ করল: 'এই যে, কেমন আছ?'

'নতুন বেশে একদম ভোল পাল্টে গেছে দেখছি। বেশ ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী লাগছে দেখতে!'

রসিকতা করতে চেয়েছিল সামঘিন, কিন্তু সুরটা ঠিক বেরুল না।

ভালামানুষী হাসি হাসে কুতুজভ। বলে: 'কি বললে, ব্যবসায়ীর মতো? তাই নাকি? নতুন বেশ বলছ কেন? সাধারণ পোশাকই তো পরেছি। বুঝলে, ছিলাম বিজ্ঞান-মন্দিরে; কর্তৃপক্ষ পাঠাচ্ছেন খৃষ্টভক্তদের কাছে প্রচার করতে...মানে গুচ্ছের কতগুলো মিথ্যে কথা বলে এসো—!' শক্ত কলারের মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে মুখটাকে বিকৃত ক'রে মাথা নাড়ে কুতুজভ।

'ভারী অন্যায়। বড় বিশ্রী লাগে। বিজ্ঞান-মন্দিরকে আমি রীতিমত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু খৃষ্টভক্তদের ওপর আমার কোন আকর্ষণ নেই। হাঁ, লিজা মাসী, একটা সিগারেট খাই? আমার নাতিটির কোন অসুবিধে হবে না তো?'

শিশু কোলে সাদা ড্রেসিং গাউন পরা লিজা স্পিভাককে দরদী শিল্পী বোদেন-হুসেনের আঁকা ম্যাডোনার মতো লাগছিল। ছবিখানি অতি বিখ্যাত। শহরের প্রায় প্রতি ষ্টেশনারী দোকানে এর প্রতিলিপি দেখা যায়। লিজার গোল মুখখানায়

বিষাদের ছায়া। মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়াচ্ছে কিসের একটা উদ্বেগে।

'তোমার একটা চিঠি আছে সামঘিন। একটি মেয়ে দিল। কি ভয়ানক চেহারা মেয়েটার!' ব'লে ক্লিমের হাতে একটা মোটা খাম দিল কুতুজভ।

শান্ত ভাবে এলিজাবেথা বলল: 'তারপর স্তেপান?'

'তারপর আর কি? গ্রামে যাব তুরোবোয়েভদের বাড়ি। খুব চাল মেরেছে লোকটা, নদীতে নাকি দারুণ পাট্ মাছ আছে।'

দীর্ঘ চিঠিটা পড়তে পড়তে থেমে গিয়ে সামঘিন বলে: 'মারাকুয়েভ ধরা পড়েছে মস্কৌতে। আমার বিশেষ পরিচিত।' ওর বলার ভঙ্গিতে গর্বের ভাব।

'মারাকুয়েভ! নারোদনিক মারাকুয়েভ? নেহাৎ ছেলেমানুষ যে!' চোখ কুঁচকে শুধায় কুতুজভ।

'তাই বটে!'

কপাল কুঁচকে অনেকখানি ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ কুতুজভ বলে ওঠে: 'একটা কথা সামঘিন, তোমাকে চিঠিটা যিনি লিখেছেন তাঁকে একটু বলে দেবে, যে-মেয়েটির হাত দিয়ে চিঠিটা পাঠিয়েছেন তিনি সে-মেয়েটি বিশেষ সুবিধের নয়—ভারী অসাবধান, বুদ্ধি-সুদ্ধিও কম। নইলে অপরিচিত লোকের হাতে কি এমন চিঠি কেউ ছাড়ে! চিঠিটার মধ্যে কি আছে আমাকে বলে দেওয়া উচিত ছিল।'

ক্রুদ্ধ ভাবে পোড়া সিগারেটটা প্লেটের মধ্যে ফেলে দিয়ে উঠে দুম দুম ক'রে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে কুতুজভ।

'অবশ্য আমার নিজেরই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। কিন্তু যা চেহারা মেয়েটার, ভাবলাম, রোম্যান্সের ব্যাপার!'

ক্লিমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে লিজা: 'যারা যারা ধরা পড়েছে সবাইকে চিনতে?'

'চিনতাম।' ক্লিম জবাব দেয়। ঝম্ ঝম্ ক'রে উঠল কথা গুলো। মনে মনে বলল: 'না, চিনি না! আমি যেন মিথ্যে বড়াই করছি!' বাইরে বলল, বিরক্তি ফুটে উঠল কথায়: 'কে জানে বাবা, কবে এই ধর-পাকড় শেষ হবে।'

কুতুজভ টেবিলে গিয়ে বসে। গেলাসে চা ঢেলে নিয়ে আবার ঘাড়ের পেছনে কলারের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে মাথাটায় একটা মোচড় দেয়। একবার নয় বারে বারেই, একটু পরে পরেই। বোধহয় কলারের চাপে দাড়িতে টান পড়ছে।

'নেহাৎ ছেলেমানুষী আব্দার, সামঘিন,' কুতুজভ বলে: 'ধর-পাকড় শেষ হবে? কেন? সরকারের সাথে লড়বে, আর মাঝে মাঝে ক'দিন একটু হাজত ঘুরে আসতে আপত্তি? তা হওয়া তো উচিত নয়। যা মেহনৎ তোমাদের, দেহটা বিশ্রামও তো পায় একটু! এর পর তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হ'লে তোমরাই আবার কত লোককে জেলে পুরবে!'

সামঘিনের রাগ হয় নিজের ওপর। কেন কথাটা তুলতে গেল, নইলে তো এই বক্তৃতাটা শুনতে হতো না। ভারী মাষ্টারী করছেন, আমাকে যেন ইস্কুলের ছেলে পেয়েছে! মনে মনে বলে সামঘিন এ ধরনের মুরুব্বিয়ানা ও সহ্য করতে পারে না। কিন্তু একটু ভেবে দেখল, কই ততটা রাগ তো হয় নি!

'বিপ্লবের জন্য এখনও বহুদিন হা ক'রে বসে থাকতে হবে।' জবাব দেয় সামঘিন। কথার সুর একটু বেশী হাল্কা হয়ে পড়ল যেন।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কুতুজভ বলে: 'কেন, বসে থাকতে আবার হবে কেন? লেগে যাও কোমর কষে। ফতে ক'রে ফেল।'

'বিপ্লবী নেই বললেই হয়,' সাম্‌ঘিনের কণ্ঠে গভীর অভিযোগের সুর। নিজেই অবাক হয়ে যায় ও! কুতুজভ দৃষ্টি তুলে গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করে ওকে। তারপর কোমল সুরে বলতে আরম্ভ করে: 'আমার তো মনে হয় একজনও নেই। চার বছর ধরে দেখছি মানুষকে। যারা বিপ্লবের ভেক নিয়েছেন, সবই যে সস্তার মাল! এশিয়ার আদি-বাসীদের জন্য যে-রকম ছিট-কাপড় রপ্তানী করা হয়, ঠিক সেই রকম বাহারী সব নক্‌শা যেন...কিন্তু বেশীদিন টেঁকে না।'

তৃতীয় দফা চা শেষ হয়। চিন্তামগ্ন ভাবে শিশুর ছোট্ট গোলাপী হাত দুটির দিকে তাকিয়ে বলে কুতুজভ:

'জীবনে ক্লান্ত হয়ে, বাহাদুরীর নেশায়, বা রোম্যান্সের আশায়, বা ধর্মের জন্য যারা সব বিপ্লবী হয়, তারা সব ভিজে বারুদ। আবার কোন বুদ্ধি-জীবি ধরো—ব্যক্তিগত জীবনে সফল হ'তে পারল না, বা চলতি কাঠামোতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না, বা হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে মাস খানেক হয়তো শ্রীঘর ঘুরে আসতে হলো তাকে, বা এমন কিছু। তারপর শোধ তোলবার জন্য গিয়ে সে বিপ্লবী হলো। কখনও খাঁটি বিপ্লবী নয় সে।'

জিজ্ঞেস করতে চাইল সাম্‌ঘিন: 'তাহলে বিপ্লবী কে?'

কিন্তু তার আগেই কুতুজভ এলিজাবেথার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলতে আরম্ভ করেছে:

'উইট্রের লেখা "রুশ দেশের সৃজনশীল শক্তি" নামে বই খানা দেখেছ নাকি? কি পেল্লায় বইরে বাবা! পাহাড়! একখানা বাইবেল বিশেষ! উদার-পন্থীদের ভারী পছন্দ হয়েছে বইখানা। নিজেদের তারা মার্ক্স-এর শিষ্য বলে মনে করে কি না! নতুন কথা, কি বলো!'

একটা নতুন জিনিস লক্ষ্য করে ক্লিম। কুতুজভ আজ ভারী উচ্ছল, কৌতুকে পরিহাসে সে যেন টগবগ করছে। কিন্তু বুঝল এহ বাহ্য। তার পরিশ্রান্ত চুপসে-যাওয়া মুখখানার সঙ্গে একেবারে বেমানান। তার প্রতিটি কথায় যেন প্রচ্ছন্ন একটি নৈরাশ্যের সুর। এই জন্যই বুঝি আজ তাকে বড় ভালো লাগছে ক্লিমের। সেইন্টপিটর্সবুর্গ-এ যখন ছিল এই মানুষটাকে নিয়ে বার বার কি দোটানায়ই না পড়েছে ও। কুতুজভীপনায় ওর ঘেন্না ধরেছে। কিন্তু মানুষ কুতুজভ ওকে টেনেছে. অনন্য-সাধারণ কি যেন একটা ছিল লোকটার মধ্যে। কুতুজভ তার ডবল ভাঁজপড়া থুথুনীটা চুলকোতে চুলকোতে বলে চলেছে:

'সে এক মজার ব্যাপার লিজা মাসী, যদি দেখ, কিরকম লোভীর মতো আর কিরকম সত্যিকারের বুদ্ধি ক'রে মানুষ ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে আঁকড়ে ধরে। সে-দিক দিয়ে তাই মার্ক্সবাদ অনেকের ভারী পছন্দ। কেবল বিবর্তন, নিয়তিবাদ, ব্যক্তিত্বের শক্তিহীনতা ইত্যাদি দু-চারটে বুলি কপ্‌চাও, বাস ঠাণ্ডা!'

মাথাটা ঝাঁকায় কুতুজভ। কদম-ছাঁট চুলগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। মুখটা গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে ওঠে।

'সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এমনি প্রচুর নৈরাশ্যজনক ব্যাপার গলাধঃকরণ করেছি। আমাদের রুশদেশে চিন্তাধারা অত্যন্ত স্থূল, একেবারে যেন হাতে-তৈরি চীজ্‌। বিশেষতঃ মস্কো-মার্কা রাশিয়া এই ব্যাধিতে ভুগছে আরো বেশী। একটা কারখানায় গিয়েছিলাম একবার। আমার এক জ্ঞাতি ভাই কাজ করে সেখানে। দিন-মজুর। মতের মিল হলো না ব'লে গির্জা ছেড়েছে সে। ওখানে শ্রমিকদের মধ্যে দু'টো দল। একদল হলো ব্রহ্ম-শব্দবাদী, আর-একদল শব্দ-ব্রহ্ম-বাদী। এর উৎপত্তি হ'লো সেইন্ট জন্‌ লিখিত সুসমাচারের প্রথম শ্লোকটা থেকে। প্রথম

দল প্রমাণ দিল "ব্রহ্মাই শব্দ" ছিলেন আর দ্বিতীয় দল দেখিয়ে দিলে শব্দ হচ্ছে ব্রহ্মের। একদল চ্যাঁচায়, প্রথমে শব্দ, পরে ব্রহ্ম। আরেক দল হাঁকে ঝুটা হ্যায় —শব্দ ছিল ব্রহ্মের মধ্যে। সেই শব্দই হচ্ছে জ্যোতি। এবং এই শব্দ-জ্যোতি দ্বারাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এর মীমাংসার জন্য অপটিনো-তে গিয়ে ধর্মগুরুদের সঙ্গে মোলাকাৎ অবধি করেছে ওরা। এই সব বাজে কতগুলি কথার মারপ্যাঁচ নিয়ে শেষ অবধি হলো কি জান? নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা, ঝগড়া এই সব। আর এর ফল যা হয়ে থাকে—এবার বসন্তকালে যখন ওদের মজুরী বাড়ানোর প্রশ্ন উঠল শব্দ-ব্রহ্ম-বাদীরা ব্রহ্মশব্দবাদীর দলকে সমর্থন করতে অস্বীকার ক'রে বসল।'

মুঠো ক'রে দাড়ি ধরতে যায় কুতুজভ অভ্যাস মতো। ভুলে গেছে যে দাড়ি ছাঁটা। হাতটা শূন্যে উঠে মুঠি পাকড়ে ধপ্ ক'রে হাঁটুর ওপর পড়ে যায়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে:

'গুবেলশুখ্‌ৎ একটা মানসিক ব্যাধির বর্ণনা দিয়েছেন—নামটা বোধহয় গুয়েব্‌লশুখ্‌ৎ—অর্থাৎ "নিষ্ফলা বুদ্ধি"। মানে, এই ধর যেমন--নীল কেন লাল নয়, ভারী কেন হাল্কা নয়, এই ধরনের চুল-চেরা বিচার নিয়ে মাথা কোটা। ব্যাধিটা হলো এই। আমার তো মনে হয়, আমাদের রুশ দেশে হাজার হাজার শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ এই রোগে ভুগছে।'

ঘুমন্ত বাচ্চাটার মুখের ওপর থেকে মাছি তাড়াতে তাড়াতে অত্যন্ত শান্ত ভাবে এলিজাবেথা বলে:

'এ অবস্থা তো আর থাকবে না, স্তেপান।'

ওর প্রতিটি কথায় গভীর বিশ্বাস উচ্চার হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ক্লিম।

কুতুজভ সায় দেয়: 'তা আমরা বড়লোক হচ্ছি বটে। দারুণ বড়লোক। নিজ্‌নী নভগোরদের প্রদর্শনীটা দেখতে পারলাম না। দুঃখ রয়ে গেল। সামঘিন তোমার প্রবন্ধটায় ইউলিসিসের নজীরটি দিয়ে বেশ কায়দা ক'রে খোঁটাটি দিয়েছ কিন্তু হে! অবশ্য শ্রমিক-শ্রেণী তাদের প্রেমিকদের ঘাড় মচ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। অমনি ছাড়বে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অবস্থা-গতিক তো ভালো ঠেকছে না।' তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'সময় হয়েছে, না?'

'হয়েছে,' বলে সন্তর্পণে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে যায় স্পিভাক। কুতুজভ উঠে এসে ক্লিমের সামনের চেয়ারটায় বসে বেশ খুশি খুশি ভাবে জিজ্ঞেস করল: 'তোমার বিশ্বাস বিপ্লবীদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমি বলছি কি, তাদের এক জনকেই বা দেখলে কোথায়? কি রকম দেখতে তারা বল তো!'

অস্বাভাবিক রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ক্লিম। এক নিশ্বাসে বলে গেল তিন-আঙুলে ডীকন, লিউত্, এবং প্রেইস্-এর কথা, যেন ওর অজান্ত অজ্ঞাতসারে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় জানবার একটা ইচ্ছা ওকে পেছন থেকে তাড়া করছে।

'আরে সেই ডীকন ইপাতিয়েভ্‌স্কি—সারাদিয়াকভ্ নাকি? ছেলে আছে না? মারা গেছে? ওহোঃ, তাইতো! বাপও ঝুঁকেছে ওদিকে? অদ্ভুত! আচ্ছা, তুমি দেখি এখনও সেই নারোদনিকদের পেছনে ঘুরছ!'

'পেছনে ঘুরছি না। ওদের ভালো ক'রে দেখছি, জানতে বুঝতে চেষ্টা করছি।' সংশোধন ক'রে দেয় ক্লিম তার বাচালতায় আহত হয়ে।

'জানতে-বুঝতে চেষ্টা করছ? সেই ক্ষুদে মোড়লদের বাদ দাও, বাদ দাও!

ভুল করছ।' বলতে বলতে আড়ামোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায় কুতুজভ।

চাপা দৃষ্টিতে কুতুজভের দিকে তাকিয়ে মনে মনে গর্জায় ক্লিম:

'ওঃ উনি সব জানেন! সবজান্তা একেবারে!'

আমাদের জাতীয় ভাবধারার বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ জমির সাম্প্রদায়িক মালিকানা, বাঁশের বাঁশী, ব্যাঙের ছাতার আচার, জারান মাছের ডিম, সরু-চাকলী, সামোভার ইত্যাদি গ্রামীন-জীবনের যত কাব্য, আর কৃষাণদের সরলতা ইত্যাদি নিয়ে কাউন্ট যত বক্তৃতা দিয়েছেন সব স্রেফ ছেলেমানুষী।' ক্লিমের মাথার ওপর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে কুতুজভ ব'লে যায়। 'ছেলেমানুষী হোক আর যাই হোক, ওসবের মধ্যে সৌন্দর্য আছে বৈকি কিছু। এ আমি অস্বীকার করব না, কিন্তু আর নয়। বাঁচতে যদি চাও তবে এখনও সরে পড়। ক্ষণিকের বীরদের দূর ক'রে দেবার সময় এসেছে। এসব লোকদের আমরা চাইনে। চাই সেই সব মানুষ যারা জীবন পণ ক'রে বীর-ব্রত পালন করবে; আমরা চাই বীর শ্রমিক, বীর বিপ্লবী। যার ক্ষমতায় কুলোবে না, সে পথ দেখুক।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে ক্লিমের কাঁধ ঘেঁষে এসে বসে কুতুজভ।

'নারোদনিকেরা একটি বিষয়ে কিন্তু ভারী ঠিক।' এই খানে ওর গলার স্বর যেন চিন্তাবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আমাদের শ্রমিকেরা চমৎকার লোক। তারা জানতে চায়, বুঝতে চায়। সেই জন্যই বক্তৃতার ওপর ওদের একটা দুর্বলতা আছে, তা যে কোন রকম বক্তৃতাই হোক না কেন। কোন নারোদনিক যখন জনগণকে ভালোবাসে ব'লে জাহির করে, আমি বুঝতে পারি। ভালোবাসো, কিন্তু তার মধ্যে যেন করুণা না থাকে। করুণা ভালোবাসার অনুকৃতি মাত্র, ভালোবাসা নয়। অত্যন্ত বিশ্রী জিনিস এই করুণা। "১লা মার্চের" ব্যাপারে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের বিচারের বিবরণটা সম্প্রতি পড়ছিলাম আবার। আলেক্জান্দ্রভস্ক-এর কাছে মাইন পাতা হয়েছিল সম্রাটের ট্রেন উড়িয়ে দেবার জন্য। সে-মাইন ফাটেনি। তার তারগুলি বলে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমার তো ধারণা যে তার মূলে রয়েছে ওই করুণা, আর কিছু নয়। নিশ্চয় শেষ মুহূর্তে "মুক্তিদাতা"-র [সম্রাট] ওপর কারো করুণা হয়েছিল।'

সাদা পোশাক পরা, উট পাখীর পালক গোঁজা সাদা টুপী মাথায়, হাতে স্বর-লিপি-ভরা চামড়ার কেস্, এলিজাবেথা এসে ঢুকল।

'একটু দাঁড়াও লিজা মাসী, ভুলোনা যেন।'

'না না, ভুলব না।' বলে বেরিয়ে গেল লিজা।

তার অপসৃয়মান মূর্তির দিকে চেয়ে রইল দুজনে। হাওয়ায় তার স্কার্ট উড়ছে। টুপীর পালকটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে খাড়া হয়ে উঠেছে। উড়ন্ত স্কার্টটা সামলাতে গিয়ে বারংবার নীচু হ'তে হচ্ছে তাকে, যেন বাতাসের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে সে মিনতি জানাচ্ছে।

'তুরোবোয়েভ কি অনেক দিন হ'লো ফিরেছে?'

'তা প্রায় মাসখানেক হলো।'

"স্ত্রীকে এনেছে?'

'সে কি? বিয়ে হয়েছে নাকি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কুতুজভ। আলেনার সঙ্গে তুরোবোয়েভের প্রেমের ব্যাপারটা শুনে সে হেসে উঠল: 'তাই নাকি? কই, বৌ-টউ তো দেখলাম না। আমার স্ত্রী মেরিনা তো ওখানেই থাকে। কই, সে কি তাহলে আমায় লিখত না কিছু? আচ্ছা, দিমিত্রির খবর টবর কিছু পাও?'

'নাঃ, ও লেখে টেখে না।'

'বেশী দিন হয়তো ওখানে আটকে থাকতে হবে না ওকে। আমার স্ত্রীর কাছে লিখেছিল যে দক্ষিণে যাচ্ছে, বোধহয় পল্তাভায়।'

ক্লিমের ভারী আশ্চর্য লাগছে শুনতে লোকটার এই রোজকার সব মামুলী ব্যাপার নিয়ে আলাপ। আরো আশ্চর্য লাগছে, যে-বেচারার বাগদত্তাকে ও ভাগিয়ে নিয়ে গেল, কত সাধারণ ভাবে আর সহজে তার কথা বলছে। কুতুজভ উঠে পিয়ানোয় গিয়ে বসল—একটা গৎ-এর টুকরো টুংটাং করতে করতে বলল:

'ভালো বাজনা শুনিনি বহুকাল। তুরোবোয়েভের ওখানে গিয়ে অবশ্য খুব হৈ-হল্লা আর মদ চলবে। ওর জমিদারীটা ভারী মজার জায়গা। ইঁদুর যেমন জিনিসপত্র কাটে, ওর প্রজারা তেমনি ক'রে ওর গোটা জমিদারীটা কেটে টুকরো টুকরো ক'রে দিয়েছে। মাছ ধরতে ভালোবাসো নাকি? আক্সাকভের 'মাছ ধরা' বইখানা প'ড়ো একবার। দেখো, নেশা ধরে কিনা। অদ্ভুত বই। এমন চমৎকার লিখেছে। ব্রেহ্মেরও হিংসে হবে।'

তারপর, সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আর ধূসর চোখে স্মিত হাসির আলো ছড়িয়ে মাছেদের চরিত্র বর্ণনা করতে বসে যায় পরম উৎসাহে। ঐতিহাসিক কজলভের যেমন এ-শহরের ইতিহাস ও মানুষ সম্বন্ধে বিষদ জ্ঞান, কুতুজভেরও দেখা গেল মাছেদের সম্বন্ধে ঠিক তেমনি। কজলভের মতোই বলার আগ্রহ তার। শুনতে শুনতে ক্লিমের বিরক্ত লাগে,—কুতুজভের ওপর নয়, নিজের ওপরেই। কেন ওর এমন অনবস্থাচিত্ততা, কেন যা করা উচিত ছিল, তা করল না ও! হাওয়ার দাপটে উড়ন্ত পাখীর মতো কেবলা এদিক ওদিক দোল খেল।...

ফিরল এলিজাবেথা। মুখের রেখায় রেখায় গভীরতর উদ্বেগ। আস্তে আস্তে কি যেন বলল কুতুজভকে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল কুতুজভ—দুই হাত একসঙ্গে মুঠো ক'রে উদভ্রান্তের মতো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগল:

'অসম্ভব, অসম্ভব, হ'তে পারে না...'

সামঘিন বোঝে, ওর এখানে আর থাকা সংগত নয়। বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেল।



ঘরে গিয়ে হাতে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ল ক্লিম। চোখ বন্ধ করল। যেন নির্বাধায় মনের মধ্যেকার জোট-পাকান চিন্তাগুলোকে ভালো ক'রে সমীক্ষা করতে পারে। ওর মস্তিষ্কের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ফিরছে কুতুজভের গভীর কণ্ঠ। কি গভীর বিশ্বাস নিয়েই না সান্ত্বনা দিল এলিজাবেথা—'এ-অবস্থা থাকবেনা—.' ছলনাময়ী! মিথ্যে দিয়ে মন ভোলায়! বিপ্লবী নয় আর কিছু! কিন্তু এত বিশ্বাস পায় কোথায়?

স্পিভাকের সম্বন্ধে ভাবতে গেলে মনটা সহজেই তেঁতো হয়ে ওঠে। কেননা ক্লিমের বিশ্বাস অনেকের মতোই এ-মেয়েও ওকে ঠকিয়েছে। কিন্তু কুতুজভের প্রতি কোন অপ্রসন্নতা মনে ঠাঁই পায় না।

'বিপ্লবের-কর্মী। কথাটা মন্দ নয়! হয়তো খুব বুদ্ধিমান নয় লোকটা, কিন্তু সৎ। কেমন বলে দিল—"আমার মতো ক'রে জীবনকে যদি তৈরী করতে না পার, সরে পড়।" বিশেষ ক'রে যারা অবসাদ বা অনুরূপ কারণে বিপ্লবের পথে এসেছে তাদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত কথা। ওদের কড়া ক'রে সাবধান ক'রে দেওয়া বিশেষ

দরকার—এসব বাঁদরামো আর চলবে না। —ঐ ধমকই তো নিষ্ঠুর ভাবে গর্জে উঠেছিল প্রথম নিকোলাসের কামানের মুখে। সে অবশ্য আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনে। আত্ম-রক্ষার অধিকার আছে বৈকি প্রত্যেকের। ঠিক কথাই বলেছেন কজলভ।'

লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে সামঘিন। ঘরময় পায়চারী করতে করতে তীর্যক দৃষ্টিতে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়। এক অতি-মানুষের মুখ—, বিষণ্ণ, উত্তেজনায় পাণ্ডুর, চোখে চশমা, চিবুকে সুশোভন সুক্ষ্মাগ্র লঘু শ্মশ্রুর গোছা।

'তাই! বিবর্তন! ওঃ আমায় ছেড়ে দাও! শান্তিতে থাকতে দাও! যত সব নিষ্ফল মতবাদের কচ্‌কচি। —কি নাম না? গ্রুয়েবুলেশুখৎ? যে-চিন্তা করতে চাই না, যে-মানুষ, যে-ঘটনা আমার একটুও ভালো লাগে না, তার মধ্যে গিয়ে আমায় পড়তেই হবে—এমন বাধ্য-বাধকতা কেন আমি স্বীকার করতে যাব? কেন? সর্বক্ষণ কেবলি মনে হয় এ যেন আমার পোশাক নয়। আর কারো পোশাক। কখনও ঢল্‌ঢলে হয়ে খুলে পড়ে যায়, নয় তো এমনি আঁটো হয় যে দেহটা কুঁকড়ে যায়, নড়বার-চড়বার শক্তি থাকে না।'

ওর চিন্তাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে উড়িয়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল। আর তার জায়গায় রাগ হ'তে লাগল নিজের ওপর। একটা ফটোর দিকে চোখ পড়ল—ইস্কুলে তোলা; ওর সঙ্গে যারা ওখানকার পড়া শেষ ক'রে বেরিয়ে আসে—সকলের এক সঙ্গে গ্রুপ ছবি। বন্ধু ওর কেউ নেই এদের মধ্যে। প্রথম সারিতে আছে ওকে নিয়ে তেরো জন। ও দাঁড়িয়ে আছে জেলা-প্রধানের মোটা ছেলেটা আর ডাঃ লুবো-মিউদভ্-এর ভাইপোর মাঝখানে। ডাক্তারের ভাইপোটি বেশ লম্বা। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। নিজের ছবিটা দেখে মনে হয় ক্লিমের, ওর দাঁড়ানর ভঙ্গীটা যেন বড় কঠিন, ঠিক যেন কুচ্-কাওয়াজের জন্য সারিতে সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। গাল দুটো হাস্যকর রকম ফোলা, চোখ দুটো যেন অন্ধের চোখ। ভারী বিশ্রী লাগে ওর। হঠাৎ টেনে নামিয়ে ফ্রেম থেকে ছবিটা খুলে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল, তারপর ফেলে দিল টেবিলের তলাকার ছেঁড়া কাগজ ফেলা ঝুড়ির মধ্যে। আরও কিছু করবার জন্য ওর হাত নিশ্‌পিস্ করতে লাগল। বইয়ের আলমারী খুলে বইগুলো নামিয়ে ঝেড়ে পুঁছে আবার সাজাল। এতেও মাথা ঠাণ্ডা হ'লো না। বিরক্তিটা উবে গিয়ে এখন রাগ হ'তে লাগল—নিজের ওপর এবং অলক্ষ্য আর-এক-জনের ওপর, হয় ওকে দাবার বোড়ে বানিয়ে খুশি মাফিক এ-ছক্ থেকে ও-ছকে ঠেলে চলেছে। সত্যি তো তাই, খেলাই করছে ওকে নিয়ে অদৃশ্য কোন্ এক শয়তানের হাত। খেলার ছলে ওকে টেনে এনে ফেলেছে ওর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের সব মানুষের মুখোমুখি—এরা আর ও যে মিশ খাবে না, পাশাপাশি চলতে পারবে না, বিশেষ ভাবে এটা প্রমাণ করাই বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল। তার মানে তবে কি ওর যে কারো সঙ্গে না মিশে আলাদা হয়ে থাকার অধিকার আছে—এইটেই ওকে বোঝাতে চায়?

বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ থেমে যায় সামঘিন। বিরক্ত ভাবে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, অতি সন্তর্পণে— যে শুভ সংকেতটি ও পেল আজ, পাছে তা হারিয়ে যায়। অন্ধকারের বুকে আগুনের মতো হঠাৎ জ্বলে উঠেছে এ-সংকেত। তারি টানে ওর পড়া বই গুলোর প্রায়-ভুলে-যাওয়া পৃষ্ঠা হ'তে আশ্চর্য ত্বর্ণ গতিতে ছুটে এল অসংখ্য সান্ত্বনার দল, যেন ওরা কাছেই কোথাও বহুদিন ধরে এই প্রতীক্ষায় ঘুরছিল কখন ওদের একসঙ্গে হবার সময় আসবে।

সেই সময় এসেছে। সম ছন্দ-বর্ণ. ওই সান্ত্বনার দল তাই ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল; ওকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলল এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে ওর মধ্যে ওরা গড়ে তুলবে এমনি এক বলিষ্ঠতা যা হবে ক্লিম সামঘিনের যে পূর্ণ আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার আছে তারই অঙ্গীকার।

খর বেগে বইছে চিন্তা স্রোত। যেন বহুদূর থেকে ও চেয়ে রইল সেই দিকে। উচ্চারণ করল মন্ত্র:

'পূজারী নয়, পূজার উপাচার নয়। শুধু স্বাধীন মানুষ!'

সম্মোহিতের মতো ও দাঁড়িয়ে রইল খোলা জানালার কাছে। প্রসন্নতায় ওর হৃদয় ভরে গেল। ছোট্ট দাড়ির গোছায় হাত বোলাতে বোলাতে স্মিত হাসিতে ওর সমস্ত মুখ আলো হ'য়ে উঠল।

*

গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। ইনোকভ আসছে। কিন্তু স্পিভাকদের দিকে না গিয়ে হাত নেড়ে বলল ক্লিমকে:

'তোর কাছেই এসেছি।'

আশ্চর্য! এ বাড়িতে প্রায়ই আসে ইনোকভ, কিন্তু ওর কাছে বড় আসে না। ওর চিন্তাসূত্রে বাধা পড়ায় খানিকটা বিরক্ত হলেও, মুখে প্রসন্নতা এনে স্বাগত করল অতিথিকে। কিন্তু পর মুহূর্তেই বুঝতে পারল অতিথির আগমন শুভ হয়নি। ঘরের দোরে পা দিয়েই হুংকার করে উঠল সে:

'আমার কবিতা এলিজাবেথাকে কেন পড়ে শুনিয়েছিস তুই?'

ওর কথায় রাগ ও রুক্ষতা থাকলেও মুখের ভাবে ছিলনা তার তিক্ততা। মনে হ'লো বরং যেন ও অবাক হয়েছে। প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারার পর ওর মুখটা অর্ধেক হা হয়ে গেল, ভ্রূতে পড়ল ঊর্দ্ধ টান; সঙ্গে সঙ্গে গোঁফের ডগা থির্ থির্ ক'রে কাঁপতে লাগল। ক্লিম বুঝল যে লক্ষণ ভালো নয়। সুতরাং একটা কোন কৈফিয়ৎ হাতের কাছে তৈরি রাখা দরকার।

'কবিতা? তোর?' চশমা খুলে যেন ভারী অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল: 'তা একটা কবিতা পড়েছিলাম বটে, খুব নতুন ধরনের ছিল কিনা, একেবারে মৌলিক। আর নীচে নাম-টান তো কিছু ছিল না! ছেঁড়া ছিল তলাটা।'

নিজেই অবাক হয়ে গেল ক্লিম নিজের এই চমৎকার অভিনয়ে।

'ছেঁড়া ছিল? সে কি?' ব'সে পড়ে হাতের তেলো দিয়ে মুখটা মুছে ইনোকভ বলল: 'তাই বল্! আমিও ভাবছিলাম, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, নইলে এ কিছুতেই হ'তে পারে না। যাক্‌গে, আছে নাকি ওটা তোর কাছে?'

'যে-সব কবিতা ছাপা হবে না তা পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলেন সম্পাদক মশায়।'

একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে ইনোকভ চারদিকে তাকায়, দুই হাতের আঙুল দিয়ে চোখ দুটো রগড়ায়; তার দৃষ্টির স্বাভাবিক বিষন্নতার ভাবটা কেটে গিয়ে মুখটা কেমন ভাবলেশ-হীন হয়ে পড়ে।

'ঠিক হয়েছে। বেশ করেছিস!... ওঃ, কি বিশ্রী শহর, দম বন্ধ হয়ে যায়!' চঞ্চল ভাবে চারদিকে তাকায় আবার। তারপর বলে—করুণ আবেদনের মতো শোনায় গলাটা: 'চল না একটু বাইরে মাঠের দিকে। যাবি!'

'নিশ্চয়ই!' জবাব দেয় ক্লিম। ইনোকভের কাছে বড় অপরাধী মনে হয় নিজেকে। ওর কেন জানি মনে হয়, কিছু ওকে বলতে চায় বেচারা। তা ছাড়া ছিল তীব্র কৌতূহল...কি সম্পর্ক রয়েছে ইনোকভ, করভিন আর স্পিভাকদের মধ্যে। এর একটা হদিস মিলেও যেতে পারে আজ।

হন্ হন্ ক'রে হাঁটে দুজনে। জোরে জোরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ইনোকভ বলে, ওর স্বরে যেন কিসের প্রতিজ্ঞা: 'প্রায়ই আমি আসি এই মাঠের দিকে। অস্ত্রাগারের ব্যারাকগুলো তৈরি হচ্ছে, বসে বসে আমি দেখি। আমি নিজে কুঁড়ে, কিন্তু অন্যদের কাজ করতে দেখতে আমার ভারী ভালো লাগে। দেখতে দেখতে কি মনে হয় জানিস, মনে হয়, এসব তুচ্ছ ছোট-খাট কাজ করতে করতে মানুষ একদিন নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। সে-দিন সে কোন সত্যিকারের বড় কাজে হাত দেবে। আর...সে-দিন অসাধ্য-সাধন করবে সে।'

'আরেকটা টাওয়ার অব্ বেবেল?'

ক্লিমকে কনুই দিয়ে একটু খোঁচা মেরে তিরস্কারের স্বরে বলে ইনোকভ: 'মন্দ কি! না-না, সত্যি বলছি, আমি সত্যি বিশ্বাস করি—অসাধ্য সাধন করবে মানুষ। তাক্ লাগিয়ে দেবে। নইলে চিরটাকাল এই তুচ্ছ ইঁট-কাঠের বোঝা বয়ে মানুষ করবে কি! এই ঘর বাড়ি, ল্যাম্প-পোষ্ট...এই কি জীবন? একটা পেতলের বোতামের চাইতে কি বেশী দাম তার?'

সিগারেটের টুক্‌রোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টুপীটাকে মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে একটু বিমর্ষ ভাবে জিজ্ঞেস করে:

'আচ্ছা, করভিনের সঙ্গে সে-দিন যে-ব্যাপারটা হয়ে গেল তুই কি তার কথা এলিজাবেথা স্পোভ্‌নাকে বলেছিস?'

'আমি? কক্‌খনও না, আমি কেন বলতে যাব?' একটু রাগত স্বরেই জবাবটা ফুটে ওঠে ক্লিমের কণ্ঠে।

লক্ষ্য করে না ইনোকভ। বলে: 'তাহ'লে কে বলতে পারে? নিশ্চয়ই সেই ব্যাটা শয়তান নিজেই বলেছে।'

'অমন ক'রে বলছিস কেন ভদ্রলোকের সম্বন্ধে?'

রাগে গরগর্ করতে করতে ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে কারণটা ইনোকভ। সম-কামী-বিলাসীদের ছেলে যোগান দেয় করভিন। সেবার ধরা পড়ে, মামলা হয়। বিশপ গিয়ে মাঝে পড়ে বাঁচান তাকে। 'আজ না হয় বাঁচল, কিন্তু একদিন ব্যাটাকে জেলে যেতেই হবে।' চাপা গর্জন করে ইনোকভ।

'এলিজাবেথা স্পোভনা কি জানে এসব ব্যাপার?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে সামঘিন।

'সে কি ক'রে জানবে?'

'রোজ তো সে-লোকটার সঙ্গে ওর দেখা হচ্ছে...'

'একজন? অমন বহু বদমায়েশ আছে এলিজাবেথা স্পোভনা যে কয়ারে বাজায় তাতে।'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে, থুথু ফেলে, হঠাৎ গুম হয়ে যায় ইনোকভ।



রোদে ঝল্‌মল করছে মাঠের শুকনো ঘাস। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে বহুদূরে গিয়ে মেঘের দিকে হাত বাড়িয়েছে মাটি। আরো দূরে সারি সারি শঙ্কু আকৃতি তাঁবু... যেন বরফ-ঢাকা-পাহাড়। তারি বাঁ দিকে বনভূমির গাঢ় পটভূমিকায় কুচ্‌ কাওয়াজ করছে সাদা উর্দি পরা সৈনিকের দল। মনে হচ্ছে যেন কতগুলো পুতুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরো বাঁয়ে দুইখণ্ড মেঘের মাঝখান দিয়ে সুনীল শূন্যতার বুক চিরে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে নির্মীয়মান এক বিরাট অট্টালিকা। ইঁটের লাল আরো লাল দেখাচ্ছে রোদে। চারদিকে বাঁশের ভারা বাঁধা—কর্ম-ব্যস্ত কুলি-মজুরের ভিড়কে মনে হচ্ছে শিশুর মেলা। তামাটে রঙের ঘোড়ায় চড়ে এক সাদা সওয়ারী এগিয়ে চলেছেন কুচ্‌ কাওয়াজ রত সৈন্যদের দিকে, তীব্র রোদে সৈন্যদের বেয়নেটগুলি যেন আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে—আর সাদা সওয়ারীর দেহ একটা শুভ্র অগ্নিশিখার মতো ঝলক দিয়ে উঠছে।

একটা খাদের পাশ দিয়ে চলেছে ক্লিম আর ইনোকভ। বিরক্তির সুরে ইনোকভ সংবাদ দেয়: 'শহরের শেষ-মাথায় ভারাভ্‌কা খুলেছে কসাই-খানা, আর ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরের আর-এক মাথায় ব্যারাক বানাচ্ছেন আরেক জন।'

ক্লিমের পায়ের নীচে শুকনো ঘাস মচ্‌মচিয়ে ওঠে। খোলা জায়গায় এসে ওর মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়; নিজেকে মনে হয় তুচ্ছাতিতুচ্ছ। ইনোকভের সঙ্গে চলতে চলতে ওর মনে হয়—সূর্যকরের স্পর্শে, আর শুকনো ঘাসের গন্ধ-ভরা উষ্ণ বাতাসের আমেজে ও যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছেনা, ইনোকভের বক্‌বকানী শুনতে ভালো লাগছে না। ওর দৃষ্টি রয়েছে সামনে বাঁশের খাঁচায় বদ্ধ ওই বিরাট ইঁটের দেহটার দিকে। তিন খানা ইমারত—ট্রাপেজ্‌-এর আকারের। মাঝেরটা প্রায় শেষ; চারতলার দেয়ালের গাঁথুনি প্রায় সারা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, লাল নীল জামা, আর সাদা এপ্রন পরা মিস্ত্রীরা ইঁট গেঁথে চলেছে...মজুরেরা ইঁটের বোঝা মাথায় নিয়ে মই বেয়ে উঠছে। খাদের পাশ দিয়ে দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে বহুদূরে। নরম মাটি জলের ধারায় কেটে কেটে তৈরি হয়েছে খাদটা। তার এক পাড়ে যত রাজ্যের আবর্জনা ফেলা; আগাছা, ঘাস, লতা পাতায় ঢেকে গেছে আবর্জনার স্তূপ। আরেক পাড়ে লৌহ-বরণ লৌহ-কঠিন রিক্ততা—মাঝে মাঝে যেন কার থাবার আঁচড় কাটা। দূরের ওই মানুষের তৈরি ইমারতের শ্রেণী আর এ ধারের এই খাদ—একেবারে বিপরীত দুই বস্তু। মনে মনে ভাবে সামঘিন, অত বড় বড় ইমারতগুলো কি অবলীলায় তৈরি ক'রে ফেলল ওই রৌদ্র-ভাস্বর ছোট ছোট মানুষের দল—কিন্তু এই খাদটা ভরতে তাদের লাগবে বহু হাজার বছর।

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে চিৎকার ক'রে উঠল ইনোকভ:

'সর্বনাশ, পালা, পালা, শিগ্‌গির!'

বালকের মতো লঘু গতিতে সামনের দিকে ছুটল ইনোকভ। চোখের সামনে যে দৃশ্যের যবনিকা উঠল, কয়েক মুহূর্ত কিছুই যেন বুঝতে পারল না ক্লিম। দুই খণ্ড মেঘের ফাঁকে আকাশের যে নীল খণ্ডটা নির্মীয়মান ব্যারাকটার পটভূমি রচনা করেছিল, তাই যেন ফুলে ফেঁপে উঠে সেই পাষাণ প্রাচীরের ওপর চেপে বসে ভীম বেগে নাড়া দিয়ে উল্টে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে। ভারা বাঁধা কাঠ-বাঁশের বিশাল খাঁচাটা যেন প্রলয়-তাড়নায় প্রবল বেগে ঝাঁকুনি খাচ্ছে। প্রকাণ্ড খুঁটিগুলো গাঁথনি থেকে খসে গিয়ে যেন কোন্‌ অদৃশ্য শক্তির ধাক্কায় বেঁকে নুয়ে ক্লিমের দিকে

বেগে ধেয়ে আসছে নতুন-গাঁথা পাঁচিলগুলোকে সংগে নিয়ে। ইঁট খসে পড়ছে মইগুলোর ওপর, চারদিকে ছিট্‌কে পড়ছে।

পড়ন্ত ভারাগুলো থেকে ত্রস্ত মজুরের দল যেমন পারছে লাফিয়ে পড়ছে। চারদিকে উন্মত্ত বিশৃংখলতা। ইঁটের বোঝা মাথায় নিয়ে যারা মই বেয়ে ওপরে উঠছিল তারা দিগিদ্বদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে নামছে। বোঝাগুলো উল্টে ইঁট ছিটকে পড়ছে ভয়ংকর শব্দ ক'রে; কাঁচা পাঁচিলের গায়ে ইঁটের আঘাত লেগে পড়ছে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন। কাঠ পড়া, খুঁটি ভাঙ্গা, দেয়াল ধ্বসে পড়া, ইঁট ছোটা, মানুষের আর্ত চিৎকার আর ছুটোছুটির ভয়াল তাণ্ডব আর কোলাহলে ক্লিমের মোহ ভাঙ্গল। বুঝল ইমারৎটা ভেঙ্গে পড়ছে। ও ছুটল ওই দিকে। পায়ের তলায় মাটি যেন ভয়ানক ভাবে লাফাচ্ছে, আর পড়ন্ত ইমারতটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। পিঙ্গল ধুলোর তুফান তুলে পাঁচিলগুলো টুকরো টুকরো হ'য়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জানালার ফাঁক গুলি যেন মুখ-ব্যাদন করে রোষে ভ্রূকুটি করছে। একটা জানালার মধ্য দিয়ে ভারা-বাঁধা তক্তার একটা অংশ বেরিয়ে ছিল। সেটাও সাংঘাতিক ভাবে দুলছে—মনে হচ্ছে কোন দানবের ব্যাদিত মুখের মধ্যে তার ভীম জিহ্বাটি আন্দোলিত হচ্ছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমন অস্বাভাবিক রকমে বাঁকিয়ে মুচড়িয়ে হাওয়ার বুক চিরে এমন ক'রে বিদ্যুতের বেগে লাফাতে পারে মানুষ, মাটিতে পড়ার এমন শব্দ হ'তে পারে—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চারদিকের ভীত-ত্রস্ত এলোমেলো চিৎকার আর তাণ্ডব ভেদ করেও সেই শব্দ কানে আসতে লাগল সামঘিনের। মানুষ গুলোকে কে যেন আছড়ে ফেলে দিচ্ছে। হাতের কাছে কোন খুঁটি ধরে বাঁচতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু খুঁটিগুলো মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো কিলবিল্‌ ক'রে পড়ন্ত মানুষগুলোকে লুফে নিল। অভাগারা স্থির হয়ে গেল সেই ভয়াল আলিঙ্গনের মধ্যে। একজন একটা জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল; একটা কাঠ ধরতে যাবে, ঠিক এমনি সময় একটা দিক ধ্বসে পড়ল; মুখের কাছে এগিয়ে-আসা ভরসার আমন্ত্রণ ফসকে গেল। অসহায় হাতদুটো শূন্যের বুকে আছড়ে পড়ল, চিৎ হয়ে পড়ে গেল মানুষটা।

একটা মস্তবড় শোলার টুপী কোথা থেকে উড়তে উড়তে এসে সামঘিন-এর পায়ের কাছে পড়ে গড়াতে লাগল। লাফ দিয়ে সরে গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে ওর রক্ত প্রবাহ স্তব্ধ হ'য়ে গেল। পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু বিপরীত দিকেই ছুটেছে ও। মাত্র কয়েক গজ দূরে সামনে এক বিরাট ধ্বংস-স্তূপ, তার ওপরে চলছে বিধ্বস্ত খুঁটি, তক্তা, কাঠ লোহার মার। ক্লিমের হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল ঠক্‌ ঠক্‌ করে। মাটিতে বসে পড়ল ও। দরদর ধারায় ঘাম ঝরতে লাগল; ওর দৃষ্টির সামনে নেমে এল কুয়াসা; চশ্‌মা খুলে দেখল মিস্ত্রী আর ছুতাররা বিভ্রান্ত হয়ে পালাচ্ছে যে যেদিকে পারছে, হাত ওদের থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপছে। নীল জামা-পরা একটি ছোট ছেলে বোকার মতন প্রাণপণে খালি ছুটছে আর চিৎকার করছে:

'পল কাকা, কল পাকা...'

সামঘিনের পাশ দিয়ে ও ছুটে চলে গেল—চুনের পলেস্তারা দেওয়া মুখ—ওষ্ঠ দুটি হাঁ করা, টাকার মতো গোল বড় বড় দুই চোখ।

একজন দাড়ি-ওয়ালা খোঁড়া লোক সর্বাঙ্গ ধুলো মাখা—ক্লিম-এর কাছ থেকে ফুট দুই দূরে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগল। ঘাড়ের পেছন দিকের চুল থেকে হাত দিয়ে রক্ত পুঁছে এনে মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে হাত খানা এপ্রনে পুঁছে বলতে লাগল—উচ্চাবচ কণ্ঠস্বর—যেন সাইন বোর্ড পড়ছে:

'শালার হারামীর দল, পিতলে বোতাম! শালারা পয়সা বাঁচাচ্ছেন, কড়ির হিসেব করছেন...'

সৈন্যদের ছাউনি হ'তে একজন সাদা ঘোড়-সওয়ার জোর কদমে এগিয়ে এল। সারা মাঠময় ছুটোছুটি করছে সৈন্যরা—বিভ্রান্তের মতো ছুটছে—পরস্পরের সঙ্গে টক্কর খাচ্ছে, পড়ে গিয়ে বলের মতো গড়াচ্ছে। তাদের অনেকটা পেছনে দুটো সবুজ রঙের গরুর গাড়ি আসছে মন্থর গতিতে। বনশীর্ষে গোধূলির রঙ লেগেছে—তারি চমক্ লেগে সারা মাঠ প্রান্তর ভাস্বর। যেন বিশেষ করে আজের এই শোচনীয় দুর্দৈবকে জ্যোতির স্বাক্ষর দিয়ে অবিস্মরণীয় ক'রে রাখতে চাইছে।

ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগল ক্লিম মানুষের ভিড় এড়িয়ে। মাঝে মাঝে মাথাটা ওর ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে উঠছে। আর চোখ রয়েছে উচ্চকিত প্রান্তরের নাট মঞ্চে যে-খেলার অভিনয় চলছে তারি দিকে। নজর পড়ল হঠাৎ একটা লোককে কাঁধে ক'রে নিয়ে আসছে ইনোকভ। নেকড়ার পুতুলের মতো এলিয়ে পড়েছে শরীরটা। ঝুলেঝুলে হাত দুটো ইনোকভের বুকের মধ্যে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে—যেন ওর জামার বোতামগুলো খুলতে চেষ্টা করছে। একজন অফিসার ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসতে আসতে দস্তানা-পরা হাতটা নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ইনোকভকে। ইনোকভ বসে প'ড়ে সন্তর্পণে লোকটিকে মাটিতে শুইয়ে তার হাত দুটো সোজা ক'রে টান ক'রে দিয়ে আবার ছুটে চলে গেল। সৈন্যরা ইতি-মধ্যেই এসে জুটেছে। ময়দার পোকার মতো কিলবিল তারা করছে সারা অকুস্থলময়। শ্রমিকরাও আবার ফিরে আসছে, তাদের মধ্যে অনেকেই সামঘিনের চারদিকে ছড়িয়ে শুয়ে বসে ছিল। জোরে জোরে ঝাঁঝালো কণ্ঠে তারা বলাবলি করছে। বিশেষ ক'রে নারীকণ্ঠের মতো সুতীব্র একটি কণ্ঠ ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল:

'মিনায়েভ্, পল, হাঁ—? কেমন বেড়াতে যাওয়া! হু...উ-উস্...আলবৎ মিনায়েভ্, পল...'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠল ষণ্ডামার্কা রাজমিস্ত্রীটা যার ফোলা ফোলা মুখটা দাড়ির জঙ্গলে ভরা আর চোখের নীচে ঝুলছে থল্থলে মাংসের একটা নীলরঙা থলি:

'বড় বাঁচন বেঁচে গেছ হে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও ভায়ারা...।'

'আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম...'

'শালারা খরচ কমাচ্ছেন...কমা শালারা আর...'

'এই চোপরাও। ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের এখন প্রার্থনা করা উচিত।'

'ওঃ কিভাবে মাত্ভেই পড়ে গেল, আমার একেবারে চোখের সামনে, সত্যি বলছি...ঠিক যেন লাফ দিয়ে প'ড়ল।'

*

সামঘিনের মনে হ'লো গরম যেন বাড়ছে। সূর্য যেন এই মানুষগুলোর মুখ, কথাবার্তা, নড়াচড়া আগুনের আখরে লিখে দিচ্ছে ওর স্মৃতির পটে। ভারী অদ্ভুত লাগছে ওর উত্তেজিত রাজমিস্ত্রীদের বহু-কণ্ঠের কথাবার্তা। গলা যতদূর সম্ভব উঁচুতে তুলেই কথাবার্তা কইছে ওরা, সৈন্যদের কোলাহলকে ডুবিয়ে দেবার জন্যই হয়তো। কে একজন ককিয়ে চলেছে ও হো হো...

জন ছয়েক অকুস্থলের দিকে পিঠে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মুখে চোখে

উল্লাস। ছোট খাট একজন কৃষক হাওয়ায় ক্রুশের চিহ্ন আঁকছে এবং আশ্বাস দিয়ে চলেছে অন্যদের:

'কসম খেয়ে বলছি, একবর্ণ মিথ্যে বলছি না। এখনও স্পষ্ট দেখছি চোখের সামনে, ঠিক যেমন এই তোমাদের দেখছি। লোকটা ওপরে ছিল। ছুটতে লাগল। পায়ের তলায় যে তক্তাখানা ছিল, ভর সইলে না তাতে। বাস্, কোথায় গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল কে জানে। মাইরী বলছি। একটুও মিথ্যে নয়।'

সামঘিন চার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে কি ক'রে ও ঘটনা স্থলের এত কাছে এসে পড়ল। ও তো ইচ্ছে ক'রে আসেনি। ওর মনে পড়ে ইনোকভ সামনের দিকে দৌড়ল। ও তার সঙ্গে যায়নি। পাশে সরে এসেছিল লাফিয়ে।

আহতদের সরিয়ে আনছে সৈন্যরা: শুইয়ে দিচ্ছে এক লাইনে: নিখুঁত একটি সরল রেখার লাইন। দেখতে ওর অদ্ভুত লাগে।

ইনোকভ আসে। ওর বাঁ হাতটা রুমাল দিয়ে বাঁধা, দাঁত এবং ডান হাতের সাহায্যে গেরো লাগাতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

'দে দেখি বেঁধে।' ক্লিমকে বলে।

'লাগলো নাকি?'

'আঙুল গুলো একদম চেপ্টে গেছে।'

'অনেক মরেছে?'

'এ পর্যন্ত তিনজন তো দেখে এলাম!'

মাথায় টুপী নেই ওর—সর্বাঙ্গ চুনে-ঢাকা, জামার আস্তিন ছেঁড়া। কেন জানি মাটিতে পা ঠুকছে অনবরতঃ। শুকনো মাটি, কাঠ-কুটো সুরকি চারদিকে ছড়ানো। ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে চোখ পিট্‌পিট্ ক'রে বলল ইনোকভ:

'কি যে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। বিরাট ভারাটা যখন পড়ছিল—কেমন মনে হচ্ছিল জানিস? যেন দৈত্যের মতো একটা মাকড়সা ছুটে ছুটে মানুষগুলোকে ধরতে লাগল।'

'ঠিক তাই,' সমর্থন ক'রে বলে ক্লিম: 'মাকড়সাই বটে। আচ্ছা আমি কি তোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছিলাম? না দাঁড়িয়েই ছিলাম! ঠিক মনে করতে পারছিনা।'

ইনোকভের চোখ দেখে মনে হয়, ও যেন বুঝতেই পারেনি কথাটা।

'একটা লোকের মাথা একেবারে চেপ্টে গেছে। কিছু নেই, শুধু নীচের মাড়ি আর থুতনিটা ছাড়া। যাবি?'

গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে চলে দুজনে। পায়ে পায়ে বেধে গিয়ে চলায় বাধা হয়। বারে বারে জামার অস্তিন দিয়ে মুখ মোছে ইনোকভ আর পেছন পানে তাকাতে গিয়ে বার বার ক্লিম-এর গায়ে এসে পড়ে। ক্লিম সরে যায় না। বলে: 'আমার ধারণা আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য, তা নয়। দেখলাম তোর পেছন পেছন দৌড়ুচ্ছি।'

একটু নির্বোধের স্বরে গুন্‌গুনিয়ে জবাব দেয় ইনোকভ:

'এর মধ্যে আশ্চর্যটা আর কি আছে?' একটা ক্ষীণ হাসিতে কুণ্ঠিত হয়ে ওঠে ওষ্ঠ। বলে: 'যে-সব মিস্ত্রীদের চোট্-টোট্ লাগেনি,—দিব্যি তাদের মাথা ঠান্ডা দেখলাম। আমি যখন পেঁছোলাম, দেখলাম, একটা লোকের দুটো পা লোহার বরগার নীচে চাপা পড়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা। আমি চিৎকার ক'রে এক-জনকে ডাকলাম...বললাম: "ভাই একটু হাত লাগাও দেখি, টেনে বার করি মানুষটাকে।" লোকটা বললে কি জানিস! বললে, "খবরদার ওকে ছুঁয়োনা। মড়া ছুঁতে দেব না।"

হ'লে সে নির্বিকার ভাবে চলে গেল। ওই রকম সব্বাই। সেপাইরা খাটল—কিন্তু ওরা স্রেফ দাঁড়িয়ে দেখল।'

সামঘিন ভাবল, ভয় পেয়েছে বোধহয়। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেবার স্কেট খেলতে খেলতে বরিস ভারাভ্‌কা যখন বরফের খাদে গিয়ে পড়ল—ও কি ভাবে স্কেট্‌-এর সাহায্যে তীরবেগে গিয়ে পেঁৗছেছিল ডুবন্ত মানুষটার কাছে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে টুপ্‌ ক'রে ডুবে গেল লিদিয়ার ভাই বরিস চিরকালের মতো।

'আজের ঘটনা এ তুলনায় তো কিছুই নয়—' জোরে জোরেই বলে উঠল ক্লিম। কিন্তু ইনোকভ ওর দিকে তাকিয়ে ওর চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করে দিয়ে বলল: 'আমিও আজের মতো এমন ব্যাপার জীবনে দেখিনি।'

বরিসের স্মৃতিটুকু এক ফুঁয়ে নিভে গেল এই কথায়।

কেমন দুর্বল বোধ হ'তে লাগল সামঘিনের। ওর গা গুলিয়ে ন্যক্কার আসতে লাগতে লাগল। ইচ্ছে হ'লো চোখ বুজে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। যাতে আর কিছু ও দেখতে না পায়, ভুলতে পারে কি ভাবে পড়ে গেল মানুষগুলো, শূন্যে যখন ছিট্‌কে পড়েছিল কি অস্বাভাবিক ছোট দেখাচ্ছিল ওদের।

প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আনমনে ইনোকভ বলে যায়:

'তোর মনে হচ্ছে তুই উল্টো দিকে দৌড়োচ্ছিলি। আর আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি একটা—এতটুকু একটা ছাই রঙের কুটো—যেন বন্দুকের গুলির মত ছুটে গেল—কাঁপতে কাঁপতে—ছোট্ট লার্ক পাখীটার মতো কাঁপতে কাঁপতে—আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য, সত্যি! এখানে এত মানুষ সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়ে পড়ে আছে, চ্যাঁচাচ্ছে, কাৎরাচ্ছে—আর আমার স্মৃতির মধ্যে বিঁধে আছে কিনা এই এতটুকু একটা কাঠের কুটো! ছোট ছোট জিনিষ—ছোট ছোট কাঠের কুটো—জানিনে বাবা কেন...'

আবার গুঁতো লাগল সামঘিনের সঙ্গে। গতি শ্লথ ক'রে ইনোকভ আবার বলল: 'একটা লোক ডান্ডা নিয়ে আমায় মারতে উঠেছিল। ডান্ডাটা তুলতে গিয়ে ব্যাটার হাতে একটা শাল ফুটে গেল—বেশ বড় একটা শাল—আমাকেই আবার সেটা বের ক'রে দিতে হ'লো।'

আবার হাঁটতে থাকে তারা।

'কুটো আর কাঁটা...ইস্‌। এত ময়লা আমাদের আত্মায়?'

সামঘিন ভাবে নিশ্চয়ই লোকটা আগে থেকে তৈরি ক'রে রেখেছে ওই কুটো-কাঁটার কথা। জিজ্ঞেস করে: 'মানে?'

'মানে টানে জানি না, জানলে কি আর বলতাম কিছু?' বলেই হঠাৎ একটা ছোট্ট বাড়ির আঁকা-বাঁকা গেটের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় ইনোকভ।

সে আবার কি? অবাক হয়ে ভাবে সামঘিন। 'মানে জানলে কিছু বলতাম না...' তার মানেটা কি হ'লো! কি ব্যাদ্‌রা মানুষ রে বাবা!

ডুবন্ত সূর্যের দীপ্তিতে গির্জার গম্বুজ জ্বলন্ত মশালের মতো দেখাতে লাগল। ধীরে ধীরে একটা গোলাপীর রাগ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ল।



বাড়ি পৌঁছে একরকম যান্ত্রিক ভাবেই ও বাগানে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর

ফসল। হেমন্তের রঙ লেগেছে প্রকৃতিতে। একটা লালচে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সারা বাগান। ক'দিন ধরে তীব্র গরম পড়েছে—বৃষ্টির পূর্বাভাস কিন্তু মাতাল হাওয়া মেঘ দিয়েছে উড়িয়ে, গাছের ডাল রিক্ত ক'রে সোনালী পাতা ঝরিয়েছে, আর ধূলি-ধূসর করেছে শহরের বুক। সামঘিনের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে হাত-পা হীন একটা বিকৃত দেহ-পিণ্ড; মাথাটা একটা ছাই রঙের এপ্রনে ঢাকা। একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও—দেহটা গাঁট পাকানো, আর বন বন ক'রে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরছে। আর একটা মানুষ হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সটান হয়ে উড়ছে। অস্বাভাবিক লম্বা মানুষটা। তার লাল সার্টটা হাওয়ায় ফুলে উঠছে। ঠিক একটা টিউলিপ যেন। ঠিক মনে পড়ছে না ওর এরকম ভাবে উড়তে ও তিন জনকে দেখেছে, না, চার জনকে। তিন চার নয়, বোধ হয় ডজন খানেক হবে।

খোলা জানালা দিয়ে এলিজাবেথা স্পেভ্নার শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কিছু দিন হলো সে একটা সাহিত্যের ক্লাশ খুলেছে তার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে। জন আটেক আসে। ভাবনার হাত থেকে এড়াবার জন্য জোর ক'রে ক্লিম কান পাতে। স্পিভাক্ বলছে:

'রিমবদ স্বরবর্ণের ব্যবহারে রঙের খেলা দেখিয়েছেন। কিন্তু এতো নতুন কিছু নয়। কথার মাধ্যমে রঙ জাগাবার প্রয়াস তিয়েক ক'রে গেছেন বহুদিন আগে।'

শুনতে শুনতে সামঘিন ভাবে:

'কি ফাঁকিবাজ মেয়ে রে বাপ্! ওর মতলব খানা কি?'

স্পিভাক-এর একটানা গলার স্বর ভারী একঘেয়ে লাগছে সামঘিনের:

'আসলে রোমাণ্টিসিজ্‌ম্-এর মূল হচ্ছে বাস্তব-বিমুখীনতা। জীবন-সংগ্রাম থেকে পালাবার চেষ্টা। কথা গুলো একটু রূক্ষ্ম হ'লেও, খোলা মনেই একথা স্বীকার করেছেন রোম্যানটিসিষ্ট কারমজিন:

দুঃখ আছে? থাক না তা।
কাঁদবি সদা তাই বলে?
খেয়াল খুশির কল্পনাতে
ভাসা রে নাও পাল তুলে।'

'কি মিথ্যেবাদী!' মনে মনে বলে সামঘিন, যদিও ও জানে সহজ পথ খুঁজতেই চেষ্টা করছে স্পিভাক।

'অতএব কেবল একটি মুহূর্তকে নয়,' স্পিভাক বলে চলেছে: 'সারা জীবনটাকেই কল্পনার রঙে রাঙিয়ে রাখতে চায় অনেকে এবং সেই জন্যই বাস্তবের মুখোমুখী না দাঁড়িয়ে তারা পালিয়ে ফেরে। আর কেউ কেউ...'

সামঘিন উঠে জানালার কাছে গিয়ে অতি পরিচিত আধা-অন্ধকার ঘরখানার দিকে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার ক'রে উঠল:

'শুনছেন? আর্টিলারী ব্যারাকটা ভেঙে পড়েছে। বহু লোক মারা গেছে, আর জখম হয়েছে...'

এক মুহূর্তে চেয়ার ঠেলার শব্দে ঘর ভরে উঠল। এক কোণে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল, এক খানা জীর্ণ অস্থিসার হাতকে সেই আলোয় উদ্ভাসিত ক'রে দিয়ে। ভয়-পাওয়া মুরগীর মতো কল্‌কল্ ক'রে উঠল কে একটা মেয়ে। সামঘিনের ভারী খুশি লাগল যে ওর কথায় একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ও ভাবল এইবারে তো সাংঘাতিক ঘটনাটা বলার জন্য ওর ডাক পড়বে; আঙিনায় পায়চারী করতে করতে ও মনে মনে ঐ জন্য তৈরি হ'তে লাগল। কিন্তু দেখতে

পেল স্পিভাক-এর গোড়োরা হট্টগোল করতে করতে বেরিয়ে গেল। আর এলিজাবেথা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বাতি জ্বালছে। আলোর ঢাকনিটা যেন তার স্পর্শে বেজে উঠল। বৃদ্ধ রাদিয়েভ্ বসে বসে মাথা নেড়ে নেড়ে তখনও বাজাচ্ছে।

'খুব নাটুকেপনা করলেন যা হোক্,' গম্ভীর হয়ে তিরস্কারের সুরে বলে স্পিভাক।

সমর্থন করে রাদিয়েভ: 'সত্যি, কেলেঙ্কারীই করলে! তা শ্রীমান শ্রীমতীরা যে সব ভেগে গেল!'

দুর্ঘটনা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল রাদিয়েভ। কালো পোশাকটায় অস্বাভাবিক ঋজু আর দীর্ঘাঙ্গী মনে হচ্ছে স্পিভাককে। হাত ওপরে তুলে চুল বাঁধতে বাঁধতে সংবাদ দিল সে:

'কুতুজভ ধরা পড়েছে।'

'সত্যি তাই। জাহাজে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমর্থন করে রাদিয়েভ। তার পর উঠে পড়ে। এক হাতে ক্লিমের করমর্দন করে আর এক হাতে এলিজাবেথার হাতে মৃদু টোকা মেরে সান্ত্বনা দিয়ে বলে:

'তা জামিনের চেষ্টা করা যাবে। কি বল! আচ্ছা চলি তাহ'লে।'

সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসে এলিজাবেথা। ক্লিম তখনও ভাবছে কুতুজভের গ্রেপ্তার হওয়ার কথা। কি করা যায় এখন! এমনি সময় এলিজাবেথা ফিরে এল, সঙ্গে করভিন। সেদিন রেস্তরাঁয় যেমনটি দেখেছিল ঠিক সে-রকম চকচকে চেহারা, অনেকটা যেন ওস্তাদ নাপিতের মতো। একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে এলিজাবেথা:

'আপনাদের পরিচয় নেই?'

স্যাকারিনের মতো মিঠে সুরে আত্ম-পরিচয় দেন অতিথি: 'আঁদ্রে ভ্লাদিমিরোভিচ করভিন।'

সঙ্গে সঙ্গেই করভিনের নাকের ওপর দেখা গেল গভীর বলি রেখা; ভ্রূ দুটি এক টানে সিধে হয়ে একটা সরল রেখা হয়ে গেল। গোল গোল প্যাঁচার মতো চোখ দুটি যেন মিলে গলে মুহূর্তের মধ্যে একটা চোখ হয়ে গেল ৪-এর মতো দেখতে। সামঘিন আঁৎকে উঠে বুঝি কয়েক পা পিছিয়েই গেল।

'যাই, ছেলেটাকে একটু দেখে আসি,' বলে ভেতরে চলে গেল এলিজাবেথা দুই জনকে ঐ ভাবে রেখে। করভিন ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে একটা ট্যাঁক-ঘড়ি বের ক'রে বলল:

'রিহার্শেলের এখনও বাকী আছে। আমাদের হাতে পাকা চল্লিশ মিনিট সময় আছে।'

এলিজাবেথা ভেতরে যেতেই করভিন গলাটা টান ক'রে দাঁড়াল, আর তীব্র চাপা গলায় ফেটে পড়ল।

'সে-দিনকার ব্যাপারে আপনি সাক্ষী ছিলেন। জেনে রাখুন, আমি ছেড়ে দেব না। হ'তে পারে লোকটা পাগল—কিন্তু পাগ্লামী দিয়ে পার পাবে না, কিছুতেই না—না। এলিজাবেথা সেবাভনা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। উনি যেন কিছু জানতে না পারেন। আশা করি আপনার আপত্তি নেই এতে। ব'লে দেবেন ওটাকে যে, কড়ায় গণ্ডায় পাওনা সব চুকিয়ে দেব আমি!'

'আমি কেন বলতে যাব? আমার কি দায় পড়েছে?' ঝাঁঝালো গলায় উত্তরটা ছুঁড়ে মারে ক্লিম।

হাত তুলে করভিন বলে: 'ইশ্‌-শ্‌-শ্‌! কেন বলবেন না? কেন নয় শুনতে পাই?' এক হ'য়ে যাওয়া চোখ দুটো আলাদা হ'য়ে স্ব-স্থানে ফিরে এল। গোঁফ পাকাতে পাকাতে ঝুলদার-কোটের পকেট থেকে রেশমী রুমালটা বের ক'রে ঠোঁট মুছে, কেশে, চাপা গলায় বলল করভিন: 'আপনাকে নিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়েছি তো—আর ঐ কলমী ব্যাটাকেও।'

এলিজাবেথা ঘরে ঢুকে অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে ব'সে পড়ল একটা সোফায়। অন্ত-রঙ্গভাবে একটা চেয়ার টেনে করভিনও তার পাশে এসে বসল। ট্রাউজারের পা দুটো খানিকটা টেনে দিল; চৌখুপী-দেওয়া মোজা দুটো দেখা যেতে লাগল। মোটা থামের মতো দুই উরু। অত ঘনিষ্ঠতা আর ফিস্‌ ফিসানী ক্লিমের গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দিল। ওর ভয়ানক ইচ্ছে হ'তে লাগল লোকটার সম্বন্ধে সত্য ঘটনা ও জানিয়ে দেয় মহিলাকে। কিন্তু এমন ভাবে এলিজাবেথা ওর দিকে পেছন ফিরে করভিনের সঙ্গে আলাপে মগ্ন হ'য়ে গেল যে ভয়ানক অপমান বোধ হলো ওর।

'দুর্ঘটনার কথা শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথা। সামঘিন অবাক হয়ে গেল। কোন্‌ দুর্ঘটনা? কুতুজভের গ্রেপ্তার? তাহ'লে এ লোকটাও বিপ্লবী?'

কিছুই শোনেনি করভিন। এলিজাবেথা ক্লিমকে অনুরোধ করে ঘটনাটা বলবার জন্য।

নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে বলে ক্লিম, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও শুষ্ক ভাবে। শুনল কয়ার-মাষ্টার কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। টিপ্পনী কাটল: 'সব তাতে আমাদের তাড়াহুড়ো, তাই সব ভেস্তে যায়। দেশের মানুষের মধ্যে এতটুকু শৃঙ্খলা সংযম যদি থাকে! আর কিছু বলল না।

এবং লোক-সঙ্গীত, কন্‌সার্ট পার্টি, গানের জলসা প্রভৃতি সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বাচালের মতো রীতিমত বক্তৃতা সুরু করে দিল করভিন্‌। গলাটা ধাতব মেজাজে ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে বেজে চলল।

'খেলা-ধুলোও চাই; তাতেও উৎসাহ দেওয়া দরকার; বিশেষ ক'রে বক্সিং-এ। আমাদের দেশের মানুষ লড়াই ভালোবাসে..' বলতে গিয়ে গলাটা একটু বেধে যায়। কেশে নিয়ে ক্লিমের দিকে ঝাঁঝালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে যায় করভিন:

'ভালো তো বাসে কিন্তু লড়ে বোকার মতো, জানোয়ারের মতো। লড়াই হলেও, তার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা, একটা নিয়ম তো থাকবে?'

সামঘিন কিছু বলল না, শুধু একটু খানি হাসল। অপেক্ষা করতে লাগল, এলিজাবেথা কি বলে। স্বরলিপিটার জায়গায় জায়গায় পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছিল ব'সে ও। মাথা না তুলেই হঠাৎ বেখাপ্পা বলে উঠল:

'আঁদ্রে ভ্লাদিমিরোভিচ্‌ কোরিয়াতে ছিলেন।'

কয়ার-মাষ্টার আবার লাল রুমালটা বের করে মুখ মুছল, চোখ দুটোকে তাল গোল পাকিয়ে ৪-এর মতো করল। তারপর সামঘিনের দিকে তাকিয়ে আগের কথার জের টেনে বলে চলল আরো কঠিন ভাবে, আরো হুশিয়ার হ'য়ে:

'এই ইংরেজদের কথাই ধরুন না কেন। ওদের ছাত্ররা কখনও বিপ্লব-বিদ্রোহের ধার ধারে না। ওরা প্রচুর খেলা-ধুলো করে, কাজেই ওসব আজে বাজে কল্পনা আর পাগলামো ওদের মস্তিষ্কে খেলতেই পারে না। পাশ্চাত্য দেশের ভালোগুলো তো আমাদের চোখে পড়ে না, খারাপ গুলোই নি। মাঝে মাঝে জন-সাধারণকে নিয়ে যদি ধর্মীয় শোভাযাত্রা বের করা যায় খুব ভালো হয়—তাতে ক্রুশ, পতাকা-টতাকা বেশ থাকবে। পোপতন্ত্র এত শক্তি-শালী হলো কি ক'রে? অত জাঁক-জমক

আড়ম্বর-অনুষ্ঠান, তার একটা নাটকীয় প্রভাব আছে মানুষের ওপর। জন-সাধারণ ধর্ম বোঝে চোখ দিয়ে, স্থূল বিষয়-বস্তুর মারফৎ। উনিশ শ' বছর ধরে আধ্যাত্মিকতার প্রচার করা হচ্ছে—কিন্তু তার কতটুকু যে ফল হলো তাতো নিজেরাই বুঝতে পারছি। যা হচ্ছে শুধু ঝগড়া আর দলাদলি।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথা বলে: 'কোরিয়ার কথা বলুন শুনি।'

'কি বলব কোরীয়ানদের কথা। ভারী দুর্ভাগা ওরা। জাপানীদের চরিত্র নষ্ট করেছে ইওরোপ; আর ওদের খপ্পরে পড়ে কোরীয়ানরা প্রায় শেষ হ'য়ে গেল।' একটু রুক্ষ ভাবেই বলল করভিন। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে প্রায় এলিজাবেথার হাঁটুর ওপর ধোঁয়া ছাড়ল।

'ভারী সরল জাত, একেবারে মোমের মতো নরম,' কোরীয়ানদের গুণের বিবরণ দিয়ে কার্ডবোর্ডের তৈরি সিগারেটের গোড়াটা মোটা ঠোঁট দুটো দিয়ে চিবুতে চিবুতে গভীর বিশ্বাস আর চ্যালেঞ্জের সুরে বলে যায় করভিন: 'ইওরোপীয় সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র দরকার নেই তাদের।'

বোধ হয় কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেল হঠাৎ। ওর চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো লাল হয়ে উঠল, মুখ হয়ে উঠল কঠিন: ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ক'রে হাঁটু দুটো চুলকোতে চুলকোতে জাপানীদের গাল দিতে লাগল। হঠাৎ একটা ভারী মজার কথা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল:

'আমাদের দেশেও ওই বড়-গাড়ির দলই জন্ম-গোঁড়া, সোজা করল গেঁয়ো গরুর গাড়ির দলকে নিজের ধর্মে অবিশ্বাস করতে শেখায়।'

'সময় হয়ে গেছে,' বলে উঠে পড়ল এলিজাবেথা স্পিভাক, সামঘিনের মনে হলো ওই 'সময় হয়েছে' কথাটার দুটো অর্থ আছে। কিন্তু স্পিভাকের মুখ দেখে মনে হলো করভিনের কথা ও এতক্ষণ কিছুই শোনেনি। ক্লিমকে ডাকল স্পিভাক: 'আসুন না আমাদের সঙ্গে!'

ক্লিমের মনে হয় ওকে বোধহয় দরকার আছে স্পিভাকের। তা ছাড়া ও নিজে করভিন্-এর কথাবার্তা আরো কিছুটা শুনতে চায়। রাস্তায় চলা কঠিন। কড়া হাওয়া। অলি গলি, আঙিনা, হাজারো জায়গা থেকে ছুটে আসছে হাওয়ার দল: ঝরা পাতা উড়ছে ছড়াচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে রাস্তার ওপর দিয়ে, আঁকড়ে ধরছে বাড়ির দেয়াল, পালাচ্ছে গেটের তলা দিয়ে; আবার কতগুলি যেন দিশে হারা হয়ে ভয়-পাওয়া ইঁদুরের মতো পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠছে। আবার পরক্ষণে পড়ে গিয়ে ঘূর্ণী হাওয়ায় পাক খেতে খেতে পথিকের পায়ের তলায় গুড়িয়ে যাচ্ছে। মনে প'ড়ে যায় সামঘিনের ঠিক এমনি করেই ঝরা-পাতার মতো টুপ্ টুপ্ করে খ'সে পড়েছিল মিস্ত্রি আর মজুরের দল ধ্বসে-পড়া দেয়ালের ওপর থেকে।

'স্ত্রীলোকের স্বভাবই হলো যা বলো সব বিশ্বাস করবে।' করভিন বলে ধর্মপ্রচারকের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। তার ভারী ভারী পা উঁচু হয়ে ওঠে চলবার সময়, কদম পড়ে সেনাপতির মতো নির্ভুল পরিমাপে আর ভঙ্গিতে। সামঘিন যাতে বেশী কাছে আসতে না পারে সেই জন্যই যেন সে ছাতিটা বগলে নিয়ে চলেছে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে এলিজাবেথা বলে: 'কি যে সব সময় বাজে বক্‌বক্ করেন।' কিন্তু করভিনকে রোধে সাধ্য কার!

'অবিশ্বাসিনী নারী হলো একটা...'

সামঘিন একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে—দুটো মাত্র বাতি জ্বলছে গলিতে, তার ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার ঘোচেনি।

॥ ৪ ॥

বাতাস যেন পেছন থেকে ঠেলছে। ধুলোয় মুখ-গলা শুকিয়ে উঠছে সামঘিনের। ঠিক করল কোন একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়ে একটু বীয়ার খেয়ে গলা ভিজিয়ে নেবে। আর সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের সংগ-সুখও লাভ করা যাবে কিছুক্ষণ। ভারী সরল ওরা। হঠাৎ একটা বাড়ির ফোকর থেকে ছোট খাট দেখতে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। তার মাথায় কালো রঙের রুমাল বাঁধা। শান্ত ধীর স্বরে মিনতি জানাল মেয়েটি:

'আমার সঙ্গে দয়া ক'রে একটু আসুন না!'

সামঘিন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। মেয়েটিও পেছন পেছন আসতে লাগল। পাথরের রাস্তায় ওর জুতোর গোড়ালির খুট্ খুট্ শব্দ হ'তে লাগল। পেছন থেকে আবার চাপা স্বরের মিনতি শোনা যায়:

'এই কাছেই আমি থাকি।'

ঘুরে দাঁড়ায় সামঘিন। মেয়েটির মুখটা গোল, হাঁ-টা মস্ত বড়, আর নাকটা ওল্টান। রাগে প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে সামঘিন:

'চলে যাও আমার সামনে থেকে। যাও বলছি!'

ভয় পেয়ে চলে যায় মেয়েটি।

সামঘিন ভাবে: 'মন যা চায় না তা সব যদি এমনি ক'রে ছুঁড়ে ফেলতে পারতাম!—'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বড় রাস্তায় এসে পড়ল ও। মনে মনে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করে: 'এর জন্য লিদিয়াই তো দায়ী। ওই তো আমার মন মেয়ে জাতটারই ওপর বিষিয়ে দিয়েছে।'

লিদিয়ার কথা আজকাল আর ততটা ভাবে না ও। বরঞ্চ তার ওপর ওর রাগ। বিশেষ ক'রে আজ বড় রাগ হলো।

একটা রেস্তরাঁয় এসে ঢুকল ও।

'কি সাংঘাতিক মেয়ে! মনের মধ্যে প্যাঁচ কত।' মনে মনে গাল দেয় লিদিয়াকে। লিদিয়ার যত অসম্ভব, অসংলগ্ন প্রলাপ আর প্রশ্নগুলি ওর মনে ওতপ্রোত হ'তে থাকে।

'কিন্তু ক্লিম, বড় সাংঘাতিক এই ভগবান আর মানুষের যৌন দেহ!'

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছে ক্লিম যে মেয়েদের ওপর ওর আস্থা চলে যাচ্ছে। ভালোই হলো—ভুল করার পথও রইল না। গর্তেও পা পড়বে না।

সরু লম্বা ফালির মতো ঘরখানা রেস্তরাঁর। দেয়ালের ধারে ধারে রঙ চটা গদী আঁটা সোফা। একদা বোধহয় বাদামী রঙ ছিল গদীগুলোর। দু'জন ক'রে বসতে পারে প্রত্যেকটায়। দুটো আসনের মাঝখানের টেবিলটায় গিয়ে বসল সামঘিন। ওর মনে হ'তে লাগল প্রকাণ্ড বড়, হাওয়ায় ফাঁপান একটা রেলের কামরায় ব'সে আছে ও। তামাকের আর রান্নার গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে। একটা হাল্কা নীল কুয়াসার জাল ছড়িয়ে আছে ঘরের বায়ুমণ্ডলে। সামঘিনের মনে হয়

ভারী মানিয়েছে এই নীল আবছা ভাবটি।

ছুরির কাঁচি প্লেটের রিনি-ঠিনি, ঠক্-ঠাক্ শব্দ। ওদিকে দীভান্-এর পিঠের ওপর দিয়ে উঠছে একটা স্থূল নির্লোম ঘাড়—আধা-পালক-ছাড়ান মুরগীর মতো দেখতে। ভারাভকার মহাশত্রু ঠিকেদার মারকুলভের ঘাড়। মারকুলভের মুখোমুখি বসেছেন বিশপের স্থপতি দায়ানিন। জানালায় ক্লিমকে দেখেই চিৎকার ক'রে ব'লে উঠল বন্ধুকে: 'ল্যাজারাসের উত্থান হয়েছে!'

'নির্বোধ ব্যাটারা চলেছেন সব বেড়াতে...উত্তর মেরু আবিষ্কার করবেন! আ মোলো—উত্তর মেরু আবিষ্কার ক'রে কোন স্বর্গটা হাতে পাবেন শুনি!' কঠিন স্বর মারকুলভের, প্রতিটি কথায় রাগ ফুটে বেরুতে লাগল।

'কৌতূহল হে, স্রেফ্ কৌতূহল, আর বিদ্যে জাহির করা!' পানীয়ের গেলাসে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে সমর্থন করেন স্থপতি, তার কালো চোখ দুটি কঠিন ভাবে তাকিয়ে আছে ক্লিমের দিকে।

সামঘিনের বাঁ দিকে রয়েছে দোমোগাইলফ্—শহরের উৎকৃষ্ট পারিবারিক স্নানাগারগুলির মালিক। মাজিনের বকবকানী শুনে হোঃ হোঃ ক'রে হাসছিল দোমোগাইলফ্। নপুংসক মাজিন মুনিসিপালিটির একজন কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি; লোমহীন থল্থলে মুখ। দু'বছর আগে লোকটা নিজের মেয়েকে একজন পদস্থ বিপত্নীক পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। গির্জা থেকে ফিরে এসেই মেয়েটি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করে।...

'কী শয়তান মশাই! এমনি ভালো মানুষের মতো মুখ করল, যেন কিচ্ছুটি জানে না। তা, আমার এই মাথাটা ছয়টা মাথার সমান। দিলাম এমনি প্যাঁচ ক'ষে.' বড়াই ক'রে বলেন এক স্থূলাঙ্গী মহিলা—পরনে সিল্ক, সেদ্ধ লেচির মতো ফুলো ফুলো কান দুটো জরোয়া গয়নার ভারে নুয়ে পড়েছে। হাসিটা তাঁর সর্বনেশে। মহিলার নাম ফিয়োনা গ্রোসোভা। তেজারতী ব্যবসা করেন—নিরেট, পাথরের মানুষ ব'লে শহরে খ্যাতি হয়েছে। "সুখী জীবনের রহস্য" জানেন বলে গুমর ক'রে বেড়ান। কোন এক অভিজাত শ্রেষ্ঠের বাবুর্চির কন্যা উনি। "সুখী জীবন" আরম্ভ করেছিলেন পিতার মনিবের রক্ষিতা হিসেবে। বৃদ্ধের বিপুল ধন-দৌলত দশ-হাতে দুদিনে উড়িয়ে দিয়ে এক জহুরীর ধর্ম-পত্নী হ'লেন। ভদ্র-লোক ক'দিনেই পাগল হ'য়ে গেলেন। এর পরে, এক উপ-রাজ্যপালের অংক-শায়িনী হ'লেন। এবং সর্বশেষে ভিড়লেন গিয়ে অভিনেতাদের মহলে। এক-এক বছর এক-এক জনের ঘর করেন। মহিলার স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর, এবং তা নিয়ে অসংখ্য গল্প প্রচলিত আছে শহরে। কিন্তু তাঁর আর-একটা যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে শহরের মানুষ আশ্চর্য হ'য়ে গেছে। একটা শিশুদের হাঁসপাতাল ক'রে দিয়েছেন মহিলা। এ ছাড়া ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রায় গোটা কুড়ি বৃত্তি দিয়ে থাকেন ফি বছর।

ছোট্ট মানুষ উসভ, কাঠের ব্যাপারী। নাকটা মস্ত বড়, শয়তানী চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। তাকে কইনাগ ঢেলে দিতে দিতে বলছিলেন ফিয়োনা:

'এবারে বেশ জাঁকিয়ে একটা ড্রামাটিক ক্লাব করতে হবে।'

ওদিকে মারকুলভ বলছে স্থপতিকে:

'আমাদের পিতৃ-পিতামহরাই আমাদের শিখিয়ে গেছেন: "কি নিচ্ছ আর কোথা থেকে নিচ্ছ তা ভালো ক'রে জেনে নেবে।"

স্থপতি পানীয়ের গেলাশটা আলোর সামনে তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করতে করতে

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে: 'সাইবিরিয়াতে আজকাল রেল-রাস্তার ধারে ধারে অনেক গির্জা তৈরি হচ্ছে।'

এর মধ্যে উসভ চেঁচিয়ে বলে উঠল:

'শোন না, ফিয়োনা দিমিত্রোভনা, এদিকে হয়েছে কি, একদিন একজন স্প্যানিয়ার্ড ভাসিল সুস্কভ্-এর কাছে এল কাঠ কিনতে। লোকটা নিজের ভাষা ছাড়া আর কিছু জানে না। ফরাসী ভাষা সামান্য জানত। এখন ভাসিল শিখবে স্পেনের ভাষা—তাতো আর হয় না। তাই ঐ লোকটাকেই রুশ ভাষা শেখাতে লেগে গেল সবাই। এবং বেশ শিখে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত। আশ্চর্য!'

ক্লিম নিয়েছে চিংড়িমাছ ভাজা আর উৎকৃষ্ট বীয়ার। খেতে খেতে শুনছিল চারধারের কথাবার্তা। জন সতের মানুষ রেস্তরাঁয়—প্রায় প্রত্যেকেরই একখানা ক'রে বাড়ি আছে—রবিনসনের ভাষায়—"নগর-পিতা"। শহরের মধ্যে এরাই যে সব চেয়ে ধনী তা নয়। ঐতিহাসিক কজলভের ব্যাখ্যামত এরা হচ্ছে "সরল-প্রাণ মেহনতী মানুষ"; এরাই জীবনকে অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তোলবার জন্য অত্যন্ত ধীরে ধীরে হ'লেও নিশ্চিত ভাবে সংগ্রাম করছে। ধনীদের চেয়ে এদেরই ভূমিকা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেন না ধনীরা চিরজীবন সুখের মধ্যে থেকে শহরের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং কজলভের মতে, তা ছাড়া যুক্তির দিক থেকে দেখতে গেলেও এই 'মেহনতী মানুষরা' প্রশংসার যোগ্য। সে যাই হোক ক্লিমের মন সায় দেয় না এতে। ও ভাবে:

'বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হ'লে এই সব জানোয়ারদের খিদমতী করতে হবে আমায়! হয়তো এদেরই কারো কন্যাকে বিয়ে ক'রে এক দল ছেলেমেয়ের জন্ম দেব যারা বছর পনের পরে আমাকেই চিনতে পারবে না। দিব্যি নাদুস্ নুদুস হয়ে ভুঁড়ি বাগিয়ে বসব, আর যারা পড়াশোনা করে, করতে ভালোবাসে, জানবার ক্ষুধা আছে, তাদের টিট্‌কিরি দেব। তারপর বুড়ো হবো, অসুখ হবে, এবং মরব আই-জ্যাকের মতোই বিশ্বাস নিয়ে যে দেবতার কাছে উচ্ছুগে হলাম। কিন্তু কোন্ দেবতার কাছে?'

অদ্ভুত সব চিন্তা। এর আগে কখনও এ-ধরনের চিন্তা ওর মনে আসেনি। মন বিকল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুতেই ও নিজেকে মুক্ত করতে পারে না এসব চিন্তার হাত থেকে। ও যেন একটা শূন্য ঘর—ঠিক তেমনি করেই ওর চার পাশের মানুষের হাসি-কলরব, প্লেট-চামচের ঠুন্ ঠুন্ একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনের মতো হয়ে ওর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে; ওর চিন্তা-স্রোতে কোন প্রকার আলোড়ন না জাগিয়ে যেন ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যায় তারা। কিছু যদি পেত ও হাতের কাছে যা দিয়ে চিন্তার এই আগুনকে ও নেবাতে পারত! ওর হৃদয় আজ অসংখ্য স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত, নিপিষ্ট—যা ক্রমশঃই ওকে বর্ধমান বিদ্বেষে মানুষের প্রতি বিমুখ ক'রে তুলছে। এই ভারাভকা—যার কাছে মানুষ শুধু শ্রম-শক্তি! ...অতি পরিপাটি, অতি নিখুঁত মানুষ রাদিয়েভ। অতি কোমল ভাবে ভদ্র ভাবে যে বলে: 'বুদ্ধিজীবীদের আমি অত্যন্ত পছন্দ করি এইজন্য যে তাদের স্বার্থ-বুদ্ধি নেই। কাজে তাদের ভারী নিষ্ঠা।'...

ওদের পাশে বসেছে লিউতভ—বিপ্লবীমাত্রকেই যে মনে করে তার আজ্ঞাবহ। ক্লিমের মনে পড়ে কুতুজভের কথা—যে কুতুজভ বর্তমান জীবন-ধারার অন্ত ঘটানোর ব্রত গ্রহণ করেছে। কিন্তু কুতুজভের কথা মন থেকে সরিয়ে দেয় ও। ভাবে:

'সে তো এখন এসব ব্যাপারের বাইরে। বোধহয় বহুদিনই থাকতে হবে তাই।

তারপর পোয়াকভ্ ও মারাকুয়েভরা—কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কিই বা করতে পারে মারাকুয়েভরা?' আশে পাশের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকেই শুধায় ক্লিম:

'না, ভুলতে হবে এসব চিন্তা...।' কয়েক মিনিট পরে ও বেরিয়ে পড়ে একটা রাস্তায়—নিস্তব্ধ নির্জন পথ।

*

কালো মেঘের ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো ভেসে বেড়ায় শহরের আকাশে। ক্লিমের কেমন ভালুক ভালুক লাগে ওগুলোকে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের অবকাশ, বিপুল নীল গভীরতা। এই গভীরতাকে গভীরতর করে সেখানে নক্ষত্ররা জ্বলে—কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে যেন জ্বলে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে। এত অন্ধকার যে ল্যাম্প-পোস্টগুলিও আর দেখা যায় না—চিমনি-ঘেরা তেলের আলোগুলো যেন শূন্যে ঝুলে আছে। অলিতে গলিতে বহু-পদ-প্রহত পাথরের ওপর দিয়ে নিজের ছায়াকে টেনে টেনে এ ল্যাম্প-পোস্ট থেকে ও ল্যাম্প-পোস্ট পর্যন্ত পাহারাওয়ালার মতো ঘোরাঘুরি করছে রাত্রি-বিলাসিনীরা। টুপীর তলা দিয়ে ওদের দিকে তাকায় ক্লিম; বহু মুখের হাসি ওকে নিমন্ত্রণ পাঠায়। নাক্কার আসে ক্লিমের। পরক্ষণেই মুখগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

মনে মনে ভাবে ও: সব থেকে স্বাধীন-চেতা মানুষ হলো ইনোকভ। হবেই না বা কেন—লোভে তো আর পড়েনি এখনও। ও খালি তো প্রেমেই পড়েছে বছর দশেকের বড় এক মহিলার সঙ্গে।

একটি যুবক—টুপীতে প্রায় আধখানা মুখ ঢাকা—চুপি চুপি পা টিপে টিপে মেয়েগুলোর কাছে ঘুর ঘুর করছিল। মনে হচ্ছে, তার যেন ইচ্ছে সব ক'জন মেয়ের চারদিকেই একটা চক্কর দিয়ে আসে, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছিল না।

সামঘিনের মনে হয় লোকটা অসুস্থ।

এক মাতাল—কোটটা কেপের মতো ক'রে কাঁধে ফেলা—টলতে টলতে এসে ঐ লোকটার গায়ে প'ড়ল টক্কর খেয়ে। এবং গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে বলতে লাগল:

'মাপ কর...মাপ কর...এই শয়তান, করলিনে মাপ!'

মোড় ঘুরে একটা সংকীর্ণ গলিতে এসে প'ড়ল সামঘিন। আচম্কা একটা দমকা বাতাস এসে ওকে যেন তচ্‌নচ্ ক'রে দিল। ধুলোয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল। আঁকা বাঁকা গলিটার দুধারে এলোমেলো বাড়ি। কোন বাগান থেকে ভেসে আসছে গাছেদের পত্র-মর্মর; উঠছে কাঠের বাড়িগুলোর মচ্‌মচানি। আনাচ্-কানাচ্ দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে ঠেলে উঠছে বায়ু। মাঝে মাঝে চাবুক মারবার মতো শব্দ উঠছে সাঁই সাঁই ক'রে। মনে হয়, গোটা শহরের বায়ু চলাচলের পথ এই গলিটা দিয়েই।

বীয়ারের প্রভাবে মাথাটা একটু টলছে। পা দু'টো ভারী হ'য়ে উঠেছে। এগিয়ে চলেছে ক্লিম। বুঝতে পারছে বাইরের মাতাল হাওয়ায় মনটাও ওর ঘুলিয়ে উঠছে। যত সব আজে বাজে ক্লান্তিকর চিন্তা পাক খাচ্ছে মস্তিষ্কের মধ্যে। চলতে চলতে বিজেতা সেইন্ট জর্জ-এর গির্জায় এসে পৌঁছোল। চারদিকের ছোট ছোট বাড়িগুলো গির্জাটাকে ঘিরে প্রায় আড়াল ক'রে রেখেছে। সামনের দিকে

কোন্ পুরোনো দিনের দুটো কামান মাটিতে পোঁতা। গির্জার সিঁড়ির ওপর ব'সে প'ড়ল সামঘিন। রুমাল বের ক'রে চশমা আর চোখের ধুলো মুছে নিল। মনে প'ড়ে গেল বরিস ভারাভকার কথা। স্বপ্ন ছিল বরিসের যে, কামান দুটোকে তুলে, সংস্কার ক'রে প্রতিষ্ঠা করবে; প্রতিদিন সান্ধ্য-উপাসনার আগে ফাঁকা আওয়াজ করা হবে কামান থেকে। মানুষকে চমক লাগিয়ে দেবার কত যে ফন্দী আসত ওর মাথায়! বেঁচে থাকলে ও নিশ্চয় বিপ্লবী হ'তো।

অপরিসীম বিরক্তিতে ও অস্থির হ'য়ে উঠল। 'দুত্তোর ছাই—' ব'লে প্রায় চিৎকারই ক'রে উঠল। চশমাটাকে আঙুলের ডগায় লাগিয়ে ঘোরাতে লাগল বন বন ক'রে। গির্জার প্রবেশ-পথের মুখে যে প্রদীপটা জ্বলছিল, তার ছায়া এসে পড়তে লাগল চশমার কাঁচে। আজকাল সামান্য ক্লান্ত হলেও বড় বেশী অবসন্ন মনে হয় ওর নিজেকে। কেন যে এমন হয়! আগে তো হ'তো না। মানসিক ভার-সাম্যের এই অভাব ওর ভারী বিশ্রী লাগে। বড় হীন মনে হয় নিজেকে, বড় বিব্রত বোধ হয়। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে তবু—এ দৌর্বল্য নয়, এ শক্তি; হয়তো মহিমাও বলা চলে। ও এই শহরেই বাস করছে, অথচ এখানে থাকতে ওর বিন্দু-মাত্র ভালো লাগে না। ব'সে তো আছে ও গির্জার সিঁড়িতে, যদিও গির্জায় কোন ওর দরকারই নেই। উদ্দাম হাওয়া গোঙিয়ে ফিরছে; কালো কালো দৈত্যদানা গুঁড়ি মেরে বেড়াচ্ছে শহরের বুকের ওপর দিয়ে—এই শহর যে-শহরে ওর কোন বন্ধু-বান্ধব নেই।

নিজেকে তিরষ্কার করে: 'কি ছেলে মানুষী হচ্ছে!' সংশোধন করে পর-মুহূর্তে: 'মেলাই পুঁথি পড়া হয়েছে কিনা, যত কেতাবী বুদ্ধি!' পঁচিশ বছর বয়েস হলো ওর, ভগবান নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি ও। ভগবান আছেন কি নেই—এ প্রশ্নই মাথায় আসে নি। ওর ঠাকুরমা. এবং ইস্কুলের পাদ্রী এই দু'জন ছিলেন যেন নৈতিক-শাস্ত্রের স্রষ্টারূপী যে ভগবান খোদ তারই প্রতিনিধি। কোথায় ভগবান হবেন অপরিমেয় ভূমা, এবং ভয়ের বস্তু; অথবা অনুপম রূপে ভূষিত হবেন—যে-রূপে মন-মাতাবে, কিন্তু তা না হয়ে বেচারাকে এই দুই মানব সন্তানের ফিকে ছায়া মাত্রতে পর্যবসিত হ'তে হলো।

'ভুয়ো, ভুয়ো, সব ভুয়ো!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে সামঘিন। হঠাৎ কাদের যেন কথাবার্তা শোনা যায়। আড়ালে সরে গিয়ে কান খাড়া করে ও।

ইনোকভের গলা: 'মিথ্যে কথা, সলিমান্—এ কখনও হ'তে পারে না।' অত্যন্ত রূঢ় ভাবে চিৎকার ক'রেই বলল কথাগুলি। আরো কি যেন বলল, কিন্তু আর শোনা গেল না; আর-একজনের কণ্ঠে ডুবে গেল: 'তাতার কখনও মিথ্যে বলে না। কিন্তু সলিমান বলবে না, বলবে জুলিমান।'

একটা ছোট্ট বাড়ির জানালার কাছে এসে থামল ওরা। ভেতরে আলো জ্বলছিল। সুতরাং আলোকিত পর্দার পটভূমিতে মাথা দুটো দেখতে পেল সামঘিন। এলোমেলো ঝোরো কাকের মতো মাথাটা ইনোকভের। আর একটা মাথা—বেশ পালিশ ক'রে আঁচড়ানো চুল—তাতারী টুপী পরা।

'তুমি তাতারকে নেশা ধরিয়েছ। কেন, কেন করেছ?'

'বাড়ি যাও।'

'না, দাঁড়াও। খাঁটি মরোক্ক হ'লে ছাগলের চামড়া নেব। আর খাঁটি না হ'লে ভেঁড়ার চামড়া। হলো তো?'

তাতারটির দীর্ঘ দেহ, সরু মুখ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দেখতে অনেকটা লি-হুঙ-

চ্যাঙের মতো, সাধারণ মানুষের চাইতে রাশিয়ান জারের সাথেই যার চেহারার মিল ছিল বেশী।

সামঘিন ভাবে, ভগবান আর মানুষে কোন মিল না থাকাই ভালো। চীনারা বোঝে কথাটা। তাই তাদের ঠাকুর দেবতার চেহারা দানবের মতো অমন সাংঘাতিক... ইনোকভ জানালায় টোকা মেরে টুপীটাকে দোলাতে দোলাতে চলে গেল। সামঘিনও বাড়ির দিকে পা বাড়াল। ওর আফসোস হতে লাগল ডাকল না কেন ইনোকভকে। হয়তো ওরা কোথাও স্ফূর্তি লুটতে গেল।

নিশ্চয় কোন বান্ধবী আছে ওর—হয়তো গীটার বাজায় সে।

*

বাগানে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়েছিল এলিজাবেথা। ক্লিম ফিরে এসে আঙিনায় পা দিতেই চাপা স্বরে বলল:

'কে যেন ঢুকেছে বাগানে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওই শুনুন!'

'ও কিছু নয়, বাতাস।' উত্তর দেয় ক্লিম।

'তখন যে বড় পালিয়ে গেলেন?' বাগানের দরজাটা খুলতে খুলতে এলিজাবেথা জিজ্ঞেস করে।

'আপনার ওই কয়ার-মাষ্টারটিকে আমার ভালো লাগে না।' ক্লিমের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। ওর ইচ্ছে হ'তে লাগল করভিন আর ইনোকভ ঘটিত-ব্যাপারটা বলে দেয় এলিজাবেথাকে। কিন্তু বলল না। শুধু জিজ্ঞেস করল:

'মানুষটা কেমন?'

রাস্তার ওপর দিয়ে পায়চারী করতে করতে এলিজাবেথা বলতে আরম্ভ করে করভিনের বৃত্তান্ত। তার চোখ অন্য দিকে; স্বরে কেমন একটা নিরাসঙ্গ, যেন আর কারো কথা ভাবছে; অথবা ভাবছেই না কিছু।

অসুস্থ অজ্ঞান অবস্থায় করভিনকে এক মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে পেল একদিন স্পিভাকের বাবার এক কর্মচারী। নিয়ে এল স্পিভাক-দের বাড়ি। জ্ঞান হ'লে জানা গেল তার কাহিনী। একদল অন্ধের পথ-প্রদর্শক ছিল সে। দলের মধ্যে একজন কিছুটা দেখতে পেত। লোকটা বলত, সে নাকি তার কাকা। ভীষণ অত্যাচার করত তার ওপর। একদিন সইতে না পেরে করভিন পালিয়ে গেল জঙ্গলে। সেখানে তার অসুখ করল—হয়তো অনাচারের অসুখ, নয়তো, কোন বিষের ক্রিয়া হবে।

'মাত্র বছর আটেক বয়েস ওর তখন,' স্পিভাক বলে যায়: 'আমার মা বললেন, ওকে এইভাবে পাওয়ার মধ্যে নাকি দেবতার ইঙ্গিত আছে...ভীষণ কুসংস্কার ছিল মার। অতএব বাবা আর কি করেন, মার জন্যেই ওকে রাখতে হ'লো বাড়িতে। কিন্তু সে কি পোষ মানে! দামাল ছেলে, কোন শাসন মানে না। লেখা-পড়া শেখাতে চাইলেন বাবা। কাকে শেখাবেন! বই দেখেই সে পালিয়ে যায়। একেবারে বে-পাত্তা। তারপর আবার এল—তখন ওর বয়েস পনের। কিছুটা শান্ত হয়েছে। এক আশ্রমের গরু চড়ায়, থাকে আমাদের কাছেই। অনেক চেষ্টা করেছেন বাবা ওর জন্য। কিন্তু কিছুই হ'লো না। এক দিন নালিশ এল, একটা বাচ্চা

মেয়ের ওপর বলাৎকার করেছে। মেয়েটার অবস্থা সঙ্গীন, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। অতএব আবার পালাল। অনেকদিন পরে আবার ফিরে এল। এবার সোজা মঠে গিয়ে নাম লেখাল। শেষবার দেখলাম, মনে আছে—গুরু-গম্ভীর মৌনব্রতধারী সন্ন্যাসী। তারপর বছর কুড়ি—সে এক বিচিত্র ইতিহাস। কত কিছু যে করেছে। প্রথম যোগ দিল কসাক আসিনভ্-এর সঙ্গে। দুর্ধর্ষ এক অভিযানে বেরিয়েছিলেন তিনি। পণ করেছিলেন আবিসিনিয়া উপহার দেবেন রাশিয়াকে। এর পর করাভিন চলে গেল ফ্রান্সে। সেখানে এক কসাইখানায় কসাই হয়ে কাজ করল কিছু দিন। তারপর মিশনারী হয়ে গেল কোরিয়ায়। কি ক'রে যে লোকটা মিশনারী হ'লো— ভারী আশ্চর্য! ভয়ানক উঁচু আশা ছিল ওর। কিন্তু কোন যুৎ ক'রে উঠতে পারল না। কাজেই মন ওর বিষিয়ে গেল। স্বভাবটা তাইতেই অত কর্কশ। কিন্তু আশ্চর্য ওর স্মৃতি শক্তি। আর একটু কাছে এসে আর একটু ভাল ক'রে ওকে যদি বুঝতে চেষ্টা করেন, দেখবেন সত্যি ইণ্টারেষ্টিং মানুষটা।'

'আরও জানা? বাপ্‌স্! হাঁপিয়ে উঠেছি ইনটারেষ্টিং লোককে নিয়ে!'

'তাই নাকি?' নির্লিপ্তভাবে জিজ্ঞেস করে স্পিভাক।

'তাই নাকি মানে? নিশ্চয়ই।' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গরম হয়ে জবাব দেয় ক্লিম। 'ইনটারেষ্টিং! আপনার তথাকথিত ইন্টারেষ্টিং মহাপ্রভুরা কেবল নিজেরা যে কতখানি ইন্টারেষ্টিং তাই জাহির করতেই ব্যস্ত।'

'আচ্ছা!' একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে টিপ্পনী কাটল স্পিভাক। তারপর একটা ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে বলল:

'রাত হয়েছে, শুতে যেতে হয় এবার।'

ছোট্ট একটা নাইট-ল্যাম্প জ্বলছে ঘরখানার মধ্যে। তারই অতি ক্ষীণ আলোয় ঘরখানা প্রায় অন্ধকার।

ঝোড়ো হাওয়ায় গাছ-পালার ওপরে তাণ্ডব জেগেছে। শুকন পাতার দল দিক-বিদিকে ছুটছে। মেঘের দল উড়ে চলেছে ঊর্ধ্বাকাশে—বেগ হ'তে বেগে, তারার দলকে ক্ষণে ক্ষণে নিবিয়ে আর জ্বালিয়ে।

হঠাৎ ব'লে ওঠে ক্লিম: 'এলিজাবেথা লেবোভ্‌না, আপনি বিপ্লবী হ'লেন কেন বলুন তো, বলতেই হবে আমায়।' দাবীর সুর।

চলার গতি মন্দ হয়ে আসে এলিজাবেথার। ক্লিমের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়: 'অদ্ভুত প্রশ্ন!'

'জানি।'

'তা' ছাড়া, বড় দেরী ক'রে ফেললেন—'

'আরো অনেক কিছু বলবেন জানি, বলবেন ছেলেমানুষী, হেন তেন। তা বলুন। কিন্তু আমার কথাটার জবাব দিন।'

একটু এগিয়ে যায় স্পিভাক। শান্ত স্বরে বলে: 'আমি যে ঠিক বিপ্লবী, তা বলতে পারিনে। তবে বেশ বুঝেছি এবং সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি যে শ্রেণী-সমাজের বুকে ঘুণ ধরেছে, তার আর কোন ক্ষমতা নেই; শেষ অবস্থা। এবং আরও যদি বেশী দিন টিকে থাকে, তাহ'লে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকট ঘনিয়ে আসবে। সাধারণ মানুষের সর্বনাশ হবে। আপনি তো জানেন সব। আপনার মন কি বলে?'

'একেবারে কুতুজভের মুখের কথা।' গুন্‌গুনিয়ে বলে ক্লিম।

'আর তারপর?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে স্পিভাক: 'স্তেপান আমার

শিক্ষক। মনে হচ্ছে, আপনার মনে কিছু সন্দেহ ঢুকেছে, তাই না ?'

প্রশ্নটায় যেন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর। ক্লিমের ইচ্ছে হয় মেয়েটার সঙ্গে খুব খানিকটা তর্ক করে, দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। কিন্তু চলে যাচ্ছে এলিজাবেথা; একলা থাকতে ঘোর আপত্তি ক্লিমের। তবু দরজা খুলে শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল মেয়েটা। ক্লিমও তার ঘরের দিকে গেল। রাস্তার দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে বসল। ঠিক সামনেই কে একজন বারে বারে সিগারেট জ্বালাতে চেষ্টা করছে, বারে বারে হাওয়ায় নিবে যাচ্ছে দিয়াশলাই। কে যেন এল—না ? ইনোকভ।

'কোথায় চল্লি রে ?' চেঁচিয়ে ডাকে ক্লিম।

'যত্র তত্র। শুন্যে। একা আছিস নাকি ? আসি তাহ'লে।'

'আয়—।'

*

মিনিট পাঁচের মধ্যেই সামঘিনের ঘরে দাঁতে সিগারেট চেপে, গেলাসে মদ ঢেলে নিয়ে গুছিয়ে ব'সে বলতে আরম্ভ ক'রল ইনোকভ:

'আমার স্নায়ু টায়ু সব ঝরঝরে হ'য়ে গেছে। সারা শহর দৌড়োচ্ছি যেন মানুষ খুন ক'রে বিবেকের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। দুত্তোর ছাই !'

ইনোকভের চেহারাটা সব সময় ছন্ন-ছাড়া উড়ন-চড়ে গোছের, হয়তো বাহবা নেবার জন্য। কিন্তু আজ আরো বেশী আলু-থালু, আরো একটু বেশী নোংরা, আপাদ-মস্তক ধুলো মাখা। সামঘিন ভাবল মদের মাত্রাটা আজ বেশী হয়েছে বোধহয়।

'করছিস্ কি আজকাল ?'

ক্লান্ত ভাবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে জবাব দেয় ইনোকভ:

'একটা বই সংকলন করছি—"অরণ্যের অগ্নি-প্রতিরোধের উপায়" নাম। বইটা লিখেছে এক খুদে বুড়ো। লেখাপড়া টড়া জানে না, কিন্তু বেশ টগ্‌বগে আছে। নীতি-বাগীশ। মানবতা-বাদী। একেবারে মূর্তিমান "দশ দফা আদেশ" আর "শিষ্টাচার মালা"। "নিভা" কোম্পানীর প্রকাশিত এই নামের একখানি বইও আছে সত্যি। ভারী মজার—বাঁদর আর কুকুরকে শেখাবার পক্ষে মোক্ষম।'

কথাগুলো হাস্যস্কর কিন্তু একটা যেন বিষাদের সুর বাজছে—কিসের যেন তাড়া, কথাগুলোর ওপর দিয়ে ও যেন হুড়মুড় ক'রে দৌড়ে চলেছে। বাকী মদটা গেলাসে ঢেলে ও হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে ব'সল:

'আচ্ছা সামঘিন, তোর কি কখনও এরকম হয় যে তোর মধ্যের একটা "তুই" হাঁটছিস, চলছিস, কথা বলছিস, আর, আর-একটা কেবলি শুধিয়ে চলেছে, কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ ?...'

'কই না, কখনও তো হয় না—।' জোরের সঙ্গেই বলল ক্লিম। ভারী অবাক হ'য়ে গেল ও। 'তুই এমন প্রশ্ন শুধোবি তা ভাবতেই পারিনি। কতগুলি কবিতা আছে, বিশিষ্ট মতবাদের কবিতা অবশ্য—

পদ যে সুধায় পুকারিয়া—চলেছি কোথায় আমি ?
হস্ত...'

'জোচ্চোর ! ফুলবাবু সব !' গজ গজ ক'রে বলে ইনোকভ। হেসে আরও

একটু যোগ ক'রে দেয়: 'বাজীকর।'

'বাজীকর' মানে ?' সামঘিন আরো অবাক হয়ে শুধায়।

'এই বললাম আর কি! ভারী মজার লাগে যখন ওই জোচ্চোর বাটপাড় গাধা-গরুর দল একেবারে লোকহিতায় হামড়ে পড়ে। রাগে আমার পিত্তি জ্ব'লে যায়।' রুখে ওঠে ইনোকভ। পোড়া সিগারেটটা ফেলবার জন্য জায়গা খোঁজে। ছাইদানটা টেবিলের ওপরেই ছিল। আড়াল পড়েছিল বইয়ে। শুধু হাত বাড়িয়ে ওটা একটু এগিয়ে দেওয়া। কিন্তু অতটুকু হাত নাড়তেও ইচ্ছে হ'লো না ক্লিমের।

'ভারী মিথ্যে কথা বলে দিওমিদফ্। একদম কুনো হ'য়ে গেছে ওটা। কিন্তু এ ছেলেটা?' চশমার ভেতর দিয়ে ইনোকভকে দেখতে দেখতে ক্লিম ভাবে: 'এ ছেলেটা সত্যি পাগল।'

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা টেবিলের তলাকার ছেঁড়া-কাগজের ঝুরিতে ফেলতে গিয়ে ক্লিমের পায়ের ওপর প'ড়ে গেল। বিরক্ত হ'লো ক্লিম।

'আচ্ছা, মানুষ খুন করতে পারিস তুই? কি মনে হয় তোর।'

অতর্কিতে প্রশনটা বেরিয়ে এল ক্লিমের মুখ থেকে। ইনোকভের মনটাকে একেবারে নিরাবরণ ক'রে একবার দেখতে চায় ও। বুকের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে ইচ্ছেটা। হয়তো তারই তাড়নায় ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাপারটা ঘ'টে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে তাকাল ইনোকভ। ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অত্যন্ত কঠিন স্বরে ও জিজ্ঞেস করল:

'কি বলতে চাইছিস রে? তোর ইঙ্গিতটা কি করভিন?'

'আচ্ছা, তাই যদি হয়, তা করভিন-এর সম্বন্ধে তোর মতলবটা কি শুনি?'

'আমার ইচ্ছে ও মরুক। কিন্তু আমি যে এ কথাই ভাবছিলাম তা তুই জানলি কি ক'রে?'

'তোর মুখ দেখে।' সামঘিন বলে।

'ভারী ধারাল চোখ তো তোর।' একটা কাগজ-চাপা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে ইনোকভ।

কাগজ-চাপাটা একটা ব্রঞ্জের নারী-মূর্তি। এক খণ্ড মর্মর পাথরের ওপর দাঁড়ান। হঠাৎ ভারী মোলায়েম একখানি হাসিতে সারা মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠল ইনোকভের। একেবারে আলাদা রকমের এ হাসি। মূর্তিটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি ক'রে বলল:

'সত্যি, আশ্চর্য ধারাল চোখ। আমার মনে হয় কি, জানিস? খুন সবাই করতে পারে। আমিও পারি। এমনিতে কারো ওপর আমার রাগ নেই। কিন্তু এক এক সময়ে ভেতরে যেন একটা সবুজ আগুন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে থাকে। তখন আমি আর আমার বশে থাকি না।'

উন্মুখ হ'য়ে শোনে ক্লিম। প্রতীক্ষা করে কখন এই জংলী বর্বরটা ঈগল অথবা ময়ূরের পালক পরে সাজতে বসে। কিন্তু ইনোকভ আত্মকথা বলে নেহাৎ আলগা আলগা, দায়-সারা ভাবে, যেন নেহাৎ কোন তুচ্ছ বাজে বিরক্তিকর কথা বলছে। মূর্তির হাতখানা ওপরে তুলবার জন্য যেন ও ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেশ লাগবে হাতখানা ওপরে ওঠাতে পারলে—মনে হবে মেয়েটি হয় আত্মরক্ষার জন্য হাত তুলেছে, নয় কোন সাবধান বাণী উচ্চারণ করছে।

'কবিতা টবিতা লিখিস নাকি?'

'কবিতা নয়, টবিতা।' কাগজ-চাপাটা নিয়ে ও 'ঠিক তেমনি ব্যতিব্যস্ত।

মাথা না তুলেই বলে: 'ওই ছন্দেই তো যত গোল। ছন্দে কথা কইতে গেলেই মনে হয় মিথ্যে কথা বলছি।'

মূর্তির হাতখানা ভেঙে গেল। ভাঙা হাতখানা পকেটে রেখে বলল:

'ব্রঞ্জটা খারাপ ছিল, বড্ড নরম। টিন বড় বেশী দিয়েছে। যাক্‌গে ঝালাই চলবে। আমি করিয়ে দেব'খন।'

ফিরে টেবিলের ওপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে তার পিছনটা দেখেই আবার রেখে দিল।

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে জার্মান ভাষায় শোপেনহাওয়ার পড়েছিলাম। য়ারো-স্লোভাল লাইসিয়ামের ছাত্র ছিল সে। কিন্তু কলেজ থেকে ওকে তাড়িয়ে দেয়। কিছু ক'রত টরত না। লক্ষ্মীছাড়া বাউন্ডলের মতো থাকত। খাওয়া অবধি জুটত না। সত্য সত্য করেই লোকটা গেল। এক বাড়িতেই থাকতাম আমরা। একদিন রাত্তির বেলা এসে গজ গজ করতে লাগল স্কাইলেরমাশের নাকি ভারী জোর গলায় বলছে যে—আমাদের সুখের যে সংস্কার তা হ'লো ধাত্রী স্বরূপিনী। এই ধাত্রীর সাহায্যেই যুক্তি থেকে জন্ম নেয় সর্বোত্তম কল্যাণের সংজ্ঞা। তিনি নাকি এও বলেন যে কল্যাণ ও চরিত্র-শুদ্ধি একেবারেই পৃথক। কিন্তু কান্ট ভুল ক'রে সর্বোত্তম কল্যাণের সংজ্ঞাকেই সুখের উপাদান বলে গুলিয়ে ফেলেছেন। এতে আমার বন্ধুটি মহা ভাবনায় প'ড়ে গেছে। কি করে দুটোর সামঞ্জস্য করা যায়? কত বোঝালাম—সামঞ্জস্য করার দরকারটা কি! যত সব বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানো। ও চটে যায়। তমিলিনের বিরুদ্ধে ওকে খেপিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম: মনে আছে তো তমিলিনকে? নিশ্চয়ই আছে।'

মাথা নাড়ে সামঘিন। কাগজ-চাপাটা আবার তুলে নিয়েছে ইনোকভ। এবারে পা-টাকে বাঁকাবার জন্য কসরৎ করতে করতে বলে চলল: 'মানুষই ঘটনা সৃষ্টি করে।'

সামঘিন বলতে যাচ্ছিল: 'মানুষ কথা বানায়।' কিন্তু বলল না।

'এত সব তথ্য জড় হয়েছে, যে ইচ্ছে করলে প্রগতি বল, বিবর্তন বল, বাস্তবের পক্ষে, বিপক্ষে—যা চাস তা নিয়ে ডজন খানেক "-বাদ" তৈরি করতে পারিস। আর আমার কথা যদি বলিস, আমার ইচ্ছে করে প্রগতির ওই ভ্রু-কোঁচকান কুটিল মুখটার ওপর দি গোটা কয়েক থাব্ড়া কসিয়ে।'

অতিথি মূর্তির পাটা প্রায় ভেঙে এনেছে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লিম বলল:

'ও তো ডস্তয়ভস্কির কথা। চুরি ক'রে নেয়া হয়েছে।'

মাথা না তুলেই জবাব দিল ইনোকভ:

'হ'লোই বা! প্রগতি আর বাস্তব থেকে তো ইনি বাদ যান না। বাস্তব! ছোঃ, ভারী নোংরা জিনিস।' মূর্তির পা দু'খানা বেঁকিয়ে পেটের কাছে আনবার কসরৎ করতে করতে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ইনোকভ। পা উঠল না, ভেঙে দু' টুকরো হ'য়ে গেল। 'দেখিসনি, মানুষ বাস্তবকে এড়িয়ে যায়! বাস্তব থেকে সাত হাত দূরে থাকতে চায় ওরা।'

ব্রঞ্জের ভাঙা পা দিয়ে মূর্তির মর্মর বেদীর ওপর ঠক্ ঠক্ করতে করতে ক্লিমের দিকে চোখ তুলে তাকায় ইনোকভ:

'কি ভাবে ওই মিস্ত্রী মজুররা প'ড়ে গেল, ইস্! এই তো বাস্তব! ছিঃ। জানিস, আমার মস্তিষ্কটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। আর সেই খা খা করা ফাঁকার মধ্যে গিস্ গিস্ করছে কেবল ইঁট আর শূন্যে ছিটকে পড়া

হতভাগাদের খাবি-খাওয়া দেহগুলো। কি ছোট্ট দেখাচ্ছিল মানুষগুলোকে—ঠিক বাচ্চার মতো।'

ইনোকভের মুখটা কঠিন হ'য়ে ওঠে। অর্ধ-স্তিমিত হ'য়ে আসে চোখ। আজ প্রথম চোখে পড়ে ক্লিমের কি ললিত ভঙ্গিতে ওই চোখ দুটির পক্ষ্মগুলি বাঁকা হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। ইনোকভের কথাগুলো একটুও বানান ব'লে মনে হ'লো না আজ। ওর নিজের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে ইনোকভের চিন্তাধারার। কিন্তু মনে মনে বলে: 'লোকটা এনার্কিস্ট।'

'কে দরজা নাড়ল না?' জানালার দিকে তাকিয়ে ইনোকভ বলে।

কান পাতে ক্লিম। অতি সন্তর্পণে কে যেন দরজার তালা খুলছে। কাঠের দরজায় কুকুরে আঁচড়ানর মতো শব্দ হচ্ছে।

'নিশ্চয় চোর এসেছে।' হাসতে হাসতে বলে ইনোকভ। ক্লিম এগিয়ে এল। মস্ত বড় ভারী একটা মানুষ গেট টপ্‌কাল। ভালো ক'রে বোঝা গেল না অন্ধকারে। লোকটার হাত থেকে গোল মতো কি যেন একটা মাটিতে প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথার ওপর চাপিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই বোঝা গেল পুলিস।

একটা বিশ্রী কাঁপুনি ওর পিঠের দিক থেকে পায়ের দিকে বয়ে যেতে লাগল।

'নিশ্চয় স্পিভাকের জন্য এসেছে।' খানিকটা যেন আশ্বস্ত হয় ও।

'তাই বলো।' ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে বলে ওঠে ইনোকভ: 'আমি যাচ্ছি স্পিভাকের কাছে।'

চলে গেল ও। সামঘিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুনতে লাগল—উঠনে লাইন ক'রে দাঁড়াচ্ছে পুলিস। তেরো জন। কয়েকজন গেল স্পিভাকদের অংশে। বাকীরা দাঁড়িয়ে গেটে। আর তক্ষুণি কর্কশ আওয়াজ করে বাঁশী বেজে উঠল শূন্য ঘর-গুলির শূন্যতা মন্থন ক'রে। একটা অশুভ ইঙ্গিত ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়।

প্রথমে সামঘিন ঠিক করল, দরজা ও খুলবে না, ঝিই খুলে দিক। কিন্তু কেন জানি পরক্ষণেই বাতিটা কমিয়ে নিজেই উঠে গেল।

*

প্রথমে ঢুকল মোটা একজন সার্জেন্ট, বগলে ব্রিফ্ কেস, থুথ্‌নিতে সু-ছাঁটের সুছাঁদের সামান্য একটু দাড়ি। সামঘিনকে আলনাটার দিকে ঠেলে সরিয়ে পথ ক'রে দিল কালো দাড়ি কালো-চশমা পরা একজন অফিসারকে।

'মিঃ সামঘিন?' হেলাভরে জিজ্ঞেস করে অফিসার।

'এই লোকটি আপনার ঘরে ছিল?'

অফিসারের পেছন থেকে পুরুষভাবে চিৎকার ক'রে ওঠে ইনোকভ:

'আপনাকে বললাম না?'

'এটা আপনার ঘর?'

'এটা...মানে বাড়ি তল্লাসী করবেন?' জিজ্ঞেস করে ক্লিম। ওর গলাটা হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল। কাশি পেতে লাগল।

বুক চিতিয়ে হাত দুটো পেছনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকায় অফিসার। বৃদ্ধ সার্জেন্ট সাবধানে কোটটা খুলে নিয়ে ব্রিফ্-কেসটা এগিয়ে দেয়। চশমাটাকে

সোজা ক'রে অফিসার বেশ অন্তরঙ্গতার সুরে জিজ্ঞেস করে:

'তারপর?'

'ক্লিম আত্মগত ভাবে নিজেকে কেবলি বোঝায়: 'ঘাবড়াসনে, ঘাবড়াসনে।' হাত দুটো প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দেয় ও, যেন হাত দুটো ওর প্রকৃতিস্থ থাকার পক্ষে অন্তরায় ছিল।

ওর ভারী কষ্ট হ'তে লাগল দেখে যে সরকারী উর্দি-পরা সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজন লোক জাঁকিয়ে ওরই চেয়ারে ব'সে ওর দেরাজ খুলছে, ঘন দাড়ির উষ্ণতার আমেজে বসে-থাকা নার্কটির সামনে তুলে ধরে ওর কাগজপত্রগুলো নির্বিকার ভাবে পড়ছে। বাতিটাকে উস্কে দিয়েছে অফিসার। ওর কালো চশমায় কাঁপছে তার শিখা। মনে হচ্ছে চশমার পেছনকার চোখ দুটোই ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। লোকটার হাতের থ্যাব্‌ড়া আঙুলগুলো টক্ টক্ করছে লাল। নখগুলো নীল, আর ধারালো। মুখটা থেকে থেকে কুঁচকে উঠছে। চাল-চলন, নড়ায়-চড়ায় কেমন গড়িমসি ভাব। মুখে তাচ্ছিল্য জড়ান। ওর কাগজ ধরার ভঙ্গি বলে দেয় যে ও-হাত তাস খেলায় পোক্ত।

বিমর্ষ ভাবে সামাঘিন ভাবে—হয়তো তল্লাসীর রীতিই এই। খবরের কাগজের কেটে-রাখা টুকরোর গোছাটা নাড়তে নাড়তে অভ্যস্ত অলস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে অফিসার:

'এ প্রবন্ধটা আপনার লেখা?'

'আজ্ঞে। স্থানীয় কাগজে বের হয়েছিল। তা থেকেই কেটে রেখেছি।'

'ওঃ। পড়েছি বটে। আর এগুলো?'

'আরো কতগুলি প্রবন্ধ লিখব বলে নোট জোগাড় করেছি।'

ক্লিমের ইচ্ছে ছিল কিন্তু ইনোকভের মতো রুক্ষ ভাবে নয়, খুব জোর গলায় হেঁকে দেয় জবাবটা বুক টান ক'রে। কিন্তু নিজের কানেই ওর স্বরটা অদ্ভুত ফিকে আর নির্জীব শোনাল, যেন ও অপরাধী, অপরাধ স্বীকার করছে।

নোটগুলো এক ধারে সরিয়ে রেখে তার ওপর টোকা মারতে লাগল অফিসার, বুড়োমানুষরা যেমন ক'রে নস্যির কৌটোর ওপর টোকা মারে। একটুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইনোকভকে জেরা ক'রতে লাগল:

'করেন কি আপনি? লেখেন? কোথায়, কি ক'রে লেখেন?'

জানালার তাকে ব'সে সিগারেট খেতে খেতে ইনোকভ শার্সির ওপর ধোঁয়ার জাল বোনা দেখছিল। কঠিন মুখে জবাব দিল:

'আমার ঘরে, টেবিলে বসে—'

'ঠাট্টা রাখুন,' অফিসার ধমক দেয়। পাটা টানতে গিয়ে বাধা পড়ে। মেজের গালিচায় জুতোর কাঁটা কখন যে আট্‌কে গেছে জানতেও পারেনি। ক্লিম ব'লে দিতে গিয়েও ভয়ে থেমে গেল, পাছে এই সামান্য ভদ্রতাটুকুও ইনোকভ খোসামোদ মনে করে। ইনোকভ না থাকলে ও নিঃসন্দেহ বলে দিত। ছেলেটার সামনে ওর কেমন বিব্রত বোধ হ'তে লাগল। আবার ভাবনাও হ'লো যা বাঁকা চাল ইনোকভ সুরু করেছে, এতে পরিস্থিতি জটিল না হয়ে ওঠে। পা টানাটানি করতে লাগল অফিসার। ক্লিম চঞ্চল হ'য়ে উঠল। বড় অস্বস্তি লাগতে লাগল ওর। কিন্তু মনে করিয়ে দেয় নিজেকে; না, না কোন উত্তেজনা নয় এখন।

একজন পাকা দাড়িওয়ালা পুলিস কর্মচারী ওর বইয়ের আলমারীটা নিয়ে পড়েছে। বইগুলো নামিয়ে একটা একটা ক'রে পিঠ ধরে উল্টে ঝাঁকিয়ে দেখছে

সে, আর নজর রাখছে ছোকরা কর্মচারীটির ওপর। সে ওদিকটায় তল্লাসী করছিল। বিছানা-পত্র ছত্রখান ক'রে, খাটের তলায় টেবিলের তলায় উঁকি মেরে সে আর কিছু বাকী রাখছিল না। দরজায় দাঁড়িয়ে একজন কনেস্টবল্ গম্ভীর ভাবে সিগারেট খাচ্ছে আর পেছনের দিকে যে-খানে বেসরকারী সাক্ষী দু'জন দাঁড়িয়েছিল ওদের দিকে ধোঁয়া ছাড়ছে। আইওডোফর্মের গন্ধ আসছে ঘরের মধ্যে সে-দিক থেকে। ছোকরা-কর্মচারীটির চোখ পড়তেই ইসারা ক'রে সামঘিন বলে:

'পাটা ছাড়িয়ে দিন না, মশায়।'

ছোকরা অফিসারের পায়ের কাছে নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়তেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে ধন্যবাদ দেয় অফিসার।

আত্মগত ভাবে ক্লিম বলে: 'গাধা কোথাকার! ইনোকভ ভাববে না যে ধন্যবাদটা আমায় দিচ্ছ!'

কিন্তু ইনোকভ নেই এ জগতে। সে তেমনি জানালার শার্সিতে মাথা রেখে নিজের সিগারেটের ধোঁয়ায় বোনা জাল্লির মধ্য দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। অফিসার ঝুঁকে প'ড়ে প্রায় টেবিলের তলায় মাথাটা ঢুকিয়ে একটা হাঁচি দিল। তারপর চশমা ঠিক ক'রে রুমালে নাক, দাড়ি, গোঁফ মুছে ব্রিফ্‌কেস্ থেকে এক গোছা কাগজ বের ক'রে ধীরে আস্তে কি যেন লিখতে লাগল। আশ্চর্য মানুষ! কখনও কিছুতেই তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই। এই গড়িমসি, গা-ছাড়া, গদাই-লস্করী চাল ওর ভারী বিশ্রী লাগে। এই যে বাড়িটা তল্লাসী হ'লো, এর যেন কোন গুরুত্বই নেই লোকটার কাছে। অভিমানে ঘা লাগে বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তও হওয়া যায়।

একজন পুলিস-সাবইনস্পেক্টর ঘরের মধ্যে এল। গোল মুখ, কাল কুচ্‌কুচে গোঁফ, অনেকটা করভিন-এর সঙ্গে আদল আসে। মুখ কাঁচুমাচু ক'রে অফিসারের সামনে গিয়ে কানে কানে কি যেন বলল।

হঠাৎ ইনোকভ চেঁচিয়ে উঠল: 'আরে পোয়ারে, এখানে? কেমন আছ?'

সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে সাব্‌ইনস্পেক্টরের তলোয়ারটা টেবিলে ঠুকে যায়। মুখ কঠিন, কিন্তু বেরিয়ে-আসা চোখ দুটোতে হাসি ঝিল্‌মিল করছে। অফিসার মাথাটা না তুলেই মিন্ মিন্ ক'রে বলল:

'এক্ষুণি, ফোমিন, সাক্ষীদের নিয়ে এসো।'

যে-দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পেছনে,—তারাই সাক্ষী। একজন রাতের চৌকিদার। আর-একজন অজ্ঞাত-পরিচয়। লোকটার মুখ ক্ষত-বিক্ষত, ভাবলেশহীন, ঘাড় ব্যাণ্ডেজ করা। ওই ব্যাণ্ডেজ থেকেই আইওডোফর্মের গন্ধ উঠে সারা ঘর ছড়িয়ে গেছে। হলে ঢুকে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল অতি সাবধানে, পরম ভক্তিভরে, যেন দীক্ষা গ্রহণ করতে এসেছে। ক্লিম পুলিস-কর্তার তৈরি রিপোর্টে সই করল। পুলিস-কর্তা টেবিল থেকে উঠলেন। পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে টান হ'য়ে দাঁড়ালেন। 'কর্তব্য' সম্বন্ধে কি যে বললেন, বোঝা গেল না। তারপর ক্লিমের সামনে এগিয়ে দিলেন কাগজ—শহর ছেড়ে সে যাবে না, এই মর্মে মুচলেকা সই ক'রে দিতে হবে।

বড় কর্তার পেছন পেছন যেতে যেতে সাবইনস্পেক্টর তার ডিমের মতো চোখ দুটো দিয়ে ইনোকভের দিকে তাকিয়ে ইসারা করে। ইনোকভ আলুথালু মাথাটা নেড়ে অন্তরঙ্গ ভাবে সাড়া দেয়।

'এলিজাবেথা স্পিভাক্‌নার ঘরের দিকে গেল যে ওরা!' ব'লে লাফ দিয়ে নেমে

জানালাটা খুলতে যায় সে। জাম হয়ে আছে জানালা, খোলে না। ফ্রেমের ওপরে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করে:

'মহিলাকে সত্যি সত্যি গ্রেপ্তার ট্রেপ্তার করবে নাকি? একটা বাচ্চা আছে যে!'

ইনোকভের পাশে জানালায় এসে দাঁড়ায় ক্লিম। জবাব দেয়:

'তার জন্য তো ওদের মাথা-ব্যথা!'

খানা তল্লাসীর ব্যাপারটা চট্‌পট্ হ'য়ে যাওয়াতে ক্লিম অত্যন্ত খুশি। ওর খুশির ভাবটা দেখতে পায়নি ইনোকভ। তা'ছাড়া আরেকটা ব্যাপারও ছিল...

ইনোকভের সম্ভাবিত জবাবের উত্তরটাকে মনে মনে গোছাতে গোছাতে জিজ্ঞেস করে ক্লিম: 'পোয়ারে বন্ধু বুঝি?'

ওর দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট বের করে ইনোকভ। কিন্তু না জ্বালিয়ে জানালার শিকের ওপর রেখে দেয়। তারপর হাসতে হাসতে বলতে আরম্ভ করে:

'হামেশা এত ঠান্ডা মাথা, আর এখন...' হঠাৎ মাঝ খানে থেমে গিয়ে ঠোঁট দুটোকে চাটতে থাকে বিশ্রী ভাবে। 'পোয়ারে?' অত্যন্ত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে নামটা ব'লে। তারপর আবার ব'লতে আরম্ভ করে উচ্ছ্বসিত ভাবে। জোর করে টেনে আনা উচ্ছ্বাস। 'আরে ওই কারান দ্য-আশের ভাই ও, ব্যঙ্গ-চিত্রকর কারান দ্য-আশ্। ওর আর-এক ভাই হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী জলবাহিনীর একটা জাহাজের কাপ্তেন। ওর বোন অভিনেত্রী। আর ও নিজে ছিল গভর্ণরের বাবুর্চি, তারপর হ'লো কনষ্টেবল...আর...'

দুই হাত এক সঙ্গে মুঠো ক'রে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে ও:

'এলিজাবেথার ওখানে কিছু পাবে টাবে নাকি রে?'

কাঁধ ঝাঁকায় ক্লিম: 'জানিনা।'

'পোয়ারেটা একটা শয়তান,' ব'লে চলে ইনোকভ কপাল আর চোখ ঘসতে ঘসতে। এত আস্তে আস্তে কথা বলে যে উঠানের চাপাস্বরের কথাবার্তাও স্পষ্ট শোনা যায়। 'ওকে জার্মান শেখাই আমি। একসঙ্গে দাবা খেলি। বিয়ে থাওয়া করেনি; বদ-মাইসী ক'রে ঘুরে বেড়ায়। ওর শোবার ঘরে ম্যাডোনার মূর্তি; তার সামনে দিবা রাত্র প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। কিন্তু ওদিকে দেখোগে দেয়াল ভর্তি সব উলঙ্গ ফরাসী ডানা-কাটা পরীদের ছবি টাঙ্গান। আর ঘর ময় ছড়ান ফরাসী প্রত্রিকা 'ন্যু' ডজনে ডজনে। একটা আস্ত লম্পট ওটা। আর কি হিংসুক! পরের খুঁৎ ধরে বেড়ান ছাড়া আর কোন কর্ম নেই।'

মাঝপথে কথা থামিয়ে কি যেন শোনে। তারপর, 'বাপ্‌স্ বেটাদের আর হয়ই না। হাত পা যেন আর নড়তে চায় না,' বলে জানালার কাছ থেকে সরে এসে বইয়ের আলমারীটার সামনে দাঁড়ায়। নির্লক্ষ্য দৃষ্টিতে বইগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে ব'লে চলে:

'একবার সারা রাত্তির ওর ওখানে ছিলাম। খুব ভোরে উঠে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল ও। অনেক ক্ষণ ধ'রে প্রার্থনা করল। কি সব ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে বুক চাপড়িয়ে হেঁচকি পাড়তে লাগল। চোখ দিয়ে যেন জলও পড়ছিল মনে হ'লো...দেখ, দেখ তো ওরা চলে যাচ্ছে না! শুনেছিস!...'

সত্যি চলে যাচ্ছে পুলিসের লোকেরা। ভারী পায়ের শব্দে উঠন কাঁপিয়ে খোলা গেট গলিয়ে যেন অন্ধকারে ডুব মারল ওরা। শেষ কালো ছায়া-মূর্তিটিও মিলিয়ে গেলে দরোয়ান গেট বন্ধ ক'রে দিল। হেসে বলল সামঘিন:

'অন্ধকার যেন হাল্কা হয়েছে খানিকটা।' ঘোড়ার মতো পা ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল ইনোকভ। সারা ঘর ছত্রখান। চারধারে কাগজ পত্র ছড়ান—বিরাট অবসাদে সামঘিনের সর্বাঙ্গ এলিয়ে এল। ওর মনে হলো পুলিস পুঙ্গবেরা তাদের আলস্যের বিষ ঢেলে দিয়ে গেছে সারা বায়ুমণ্ডলে।

*

জানালাটা খুলতে খুলতে নিষ্প্রাণ সুরে নিজের মনে বলে সামঘিন: 'আরেকটা পরীক্ষা—।' উঠনে পায়চারী করছে স্পিভাক; ক্ষণে ক্ষণে গায়ে কম্বলটাকে আরও শক্ত ক'রে জড়াচ্ছে। পাশে ইনোকভ, হাতদুটো তার পিছনে পরস্পর-সংলগ্ন। চাপা স্বরে ও চলেছে বক্‌বক্‌ ক'রে:

'যত সব বাজে কথা!' উঁচু পর্দায় গলা ওঠে স্পিভাকের।

সামঘিন বেরিয়ে এল উঠনে। কথা বন্ধ হ'য়ে গেল ওদের। সামঘিন বলল: 'ভোর হ'য়ে এল ব'লে।'

ফিকে আকাশের দিকে তাকায় স্পিভাক। রাগে জ্বলছে ও। ওর চেহারাটাই যেন বদলে গেছে—চেনা যায় না।

'পাজীটার চুলের মুঠি ছিঁড়ে দিলেনা কেন?' হঠাৎ ব'লে উঠল ইনোকভ স্পিভাককে। তারপর সামঘিনের দিকে ফিরে ওকে বলতে লাগল ব্যাপারটা:

'ওর কাগজ পত্র খানাতল্লাসী করেছে ওই শুয়র, য়্যাসিস্টেন্ট জেলা-এ্যাটর্নীবেটা।'

কথার মাঝখানেই: 'চলুন বসিগে।' ব'লে স্পিভাক দুয়ারেই ব'সে প'ড়ে ইনোকভকে জিজ্ঞেস করে:

'গল্পটা লিখেছেন নাকি?'

ক্লিমের মনে হ'লো ইনোকভের সামনে খানাতল্লাসীর ব্যাপারটা নিয়ে কোন আলোচনা করতে চায় না ও।

কি অদ্ভুত খামখেয়ালী মেয়ে! পায়চারী করতে করতে ভাবে সামঘিন। এ মেয়েকে বুঝে ওঠা, ওর সঙ্গে মানিয়ে চলাও এক বিষম দায়।

কাক ডাকছে। ও বাড়ির লম্বা লোম-ওলা, শেয়াল-মুখো ছট্‌ফটে কুকুরটা ডেকে চলেছে। সারা রাত্তির ও ডেকেছে—কি যেন ওর প্রশ্ন, কিসের যেন রাগ। একবার করে ডাকে, আবার থামে কোনো পক্ষ থেকে কোনো জবাব আসে কিনা সেই প্রতীক্ষায়। আবার ডাকে। উদ্ধত জেদের চিৎকার—কিন্তু দুর্বল। দিনের বেলা ওকে দেখা যায় না। কদাচিৎ কখনও গেটের তলা দিয়ে মাথাটা গলিয়ে সন্দিগ্ধ ভাবে বাতাস শোঁকে। তখন যেন ওর মুখটা একদম বদলে যায়। কাল ওকে যে দেখেছে তারও মনে হবে—আজের এ মুখ কালকের দেখা মুখ নয়।

দুই আঙুলের ফাঁকে সিগারেট চেপে ধরে সাদা থামটা'র গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলছে ইনোকভ:

'ওটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। লিখতে ব'সে দেখছি কিচ্ছুই লিখতে পারছিনা। মানুষকে তো দেখা যায় না—সে থাকে নেপথ্যে—থাকে ভাব ইতিবৃত্ত।'

'বিদ্রোহ-টিদ্রোহের কাহিনী লেখা বড় শক্ত। নিজেকে মনে করতে হবে যুদ্ধ-কৌশল-অভিজ্ঞ সেনাপতি, ঠিক তেমনি ক'রে যদি ভাবতে পারা যায় তবেই হবে।'

কাঁধটা ঝাঁকিয়ে, হাত দিয়ে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিলে ইনোকভ। এলি-

জাবেথা লেবোভ্‌নার দিকে ঝুঁকতেই ওর রুক্ষ, বলিরেখাকীর্ণ মুখের ওপর আবার এসে প'ড়ল চুলগুলো।

'একটা নতুন গল্প লিখতে আরম্ভ করেছি। একটা ছেলে ছিল। কাজে লাগল একজনের কাছে। তার হাঁসগুলোকে দেখা শোনা ক'রত। হাঁসেদের সঙ্গে থেকে থেকে পাখীদের ওপরই গিয়ে পড়ল ওর সমস্ত ভালোবাসা। ঠিক এমনি সময় ওর কাজ বদলে গেল—হ'লো ও আস্তাবলের সহিস। সেখানে থাকতে থাকতে যেই ওর মন পড়ল ঘোড়ার ওপর, অমনি ওকে চলে যেতে হ'লো। এবার কাজ হ'লো নৌ-বিভাগে। ক্রমে সমুদ্রের সাথে হ'লো ওর মিতালি। কিন্তু দৈবের চক্রান্ত, পার্টি ভাঙ্গল সেখানে। সে-কাজটি গেল। মিলল এবার শিকারের জন্য সংরক্ষিত এলাকার খবরদারীর কাজ। ভারী ভালো একটি মেয়েকে ভালোবাসল। ইচ্ছে ছিল তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঘটল অন্য রকম: এক বিধবা, দুটি সন্তান নিয়ে দুর্গতির সীমা নেই। দয়া হ'লো ওর। বিয়ে ক'রল তাকেই। এবং ভালও বাসল। একটি সন্তান হ'লো। বাচ্চাটিকে নিয়ে চ'ললো গাঁয়ে বাপ্তাইজ করবে। পথে ঠাণ্ডায় মরে গেল বাচ্চাটা—'

'নিজে মাথা থেকে বের করেছেন?' ধীরে ধীরে শুধায় স্পিভাক। কতকটা অপরাধীর মতো জবাব দেয় ইনোকভ:

'ঠিক সবখানি নয়। গল্পটা আমায় বলেছে পোয়ারে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প জানে পোয়ারে। এবং শোনাতেও ভালোবাসে। কি ভাবে যে শেষ করবো ভাবিনি এখনও। বাচ্চাটাকে বরফের মধ্যে কবর দিয়ে চিরদিনের মতো লোকটাকে উধাও করিয়ে দেব; না, সব জায়গায়—ভালোবাসায় ব্যর্থ হ'য়ে হ'য়ে ও হিংস্র হ'য়ে উঠে সাংঘাতিক কিছু ক'রে বসবে—ঠিক করতে পারছিনা। কি করি বলুন তো!'

ছোট্ট কি যেন একটা জবাব দিল স্পিভাক, শোনা গেল না।

ঘোলাটে আলোয় আকাশের কালো কালো মেঘের টুক্‌রো দৃশ্যমান হ'য়ে ওঠে। ময়দা-কলের বাঁশীটা আর্তনাদ করে ওঠে কর্কশ সুরে...তার প্রত্যুত্তর জাগে নদীর ওপারের করাত-কলের বাঁশীতে। সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে ধোলাই-কল, কলপ-কল, আর দেশলাইয়ের কারখানার বাঁশী। রাস্তা মুখর হয়ে ওঠে মানুষের পায়ের ধ্বনিতে। প্রত্যহের অভ্যস্ত, অতিপরিচিত, অন্তরঙ্গ প্রতিটি বস্তু: শান্তির, সান্ত্বনার। গত রাত্রির খানাতল্লাসীর ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়, মনে হয় এই মাত্র ইনোকভ যে গল্পটা বলল, ঠিক সেই রকম একটা অসম্ভব অবাস্তব কাহিনী মাত্র ওটা। ঝি দেখা দিল বারান্দায়। সর্বাঙ্গে সাদা পোশাকে চেহারা হয়েছে ময়দার বস্তার মতো। আকাশের দিকে তাকিয়ে খবর দিল:

'আর্কাশা জেগে উঠেছে।'

লাফিয়ে উঠে প'ড়ল স্পিভাক। ত্রস্ত পদে চলল ঘরের দিকে—গায়ের কম্বলটা ঝুলে প'ড়ে মাটিতে লোটাতে লোটাতে চলল। ধীরে ধীরে সমস্ত দেহটাকে ঘুরিয়ে অপসয়মানার দিকে তাকিয়ে বলল ইনোকভ:

'আমিও চলি।'

ভেতরে গিয়ে টুপী আর কেস্‌টা নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে এল ও। এবং নীরবে সামঘিনের করমর্দন ক'রে ধূসর আলো-আঁধারির ছায়ায় মিলিয়ে গেল। চিন্তাগ্রস্ত সামঘিনও ফিরে আসে ঘরের মধ্যে। জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু ওলট-পালট ছত্রখান বিছানাটা দেখে ওর মন বিগড়ে গেল। শোয়া আর হলো না। ছড়ান কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে দেরাজে তুলতে লাগল। আর

মনকে বোঝাতে লাগল—কিসের ভয়—হ'লোই বা তল্লাসী, কিছু হবে না। কিন্তু অবচেতন মনের কালো ভয়টাকে তাড়াবে কোন্ যুক্তি দেখিয়ে!

*

দুপুরে বেলা সম্পাদকের আফিসে ঢুকল সামঘিন। হাওয়াটা একেবারে নতুন ঠেকল। সকলের মুখে একটা সম্ভ্রম ও আগ্রহান্বিত সহানুভূতির ভাব। সবাই জেনেছে—বহু জায়গায় তল্লাসী হয়েছে গত রাত্রে। সংখ্যাতাত্ত্বিক স্মলিন, আর ধর্ম-শাস্ত্রের ছাত্র দোল্‌গানভ্ গ্রেপ্তার হয়েছে। আরও একটা খবর জুড়ে দিল দ্রোনভ:

'রাদিয়েভের মিলের একজন মিস্ত্রী, একজন ইহুদী শিক্ষানবীশ রাসায়নিক, আর কোমারভের গির্জার স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রীও গ্রেপ্তার হয়েছে।'

আরও খবর দিল ও যে, কালো দাড়ি-ওয়ালা পুলিস কর্মচারী পোপোভ-এর স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে পুলিসের ডাক্তারের সাথে থাকছে। আর সেই জন্য ডাক্তারের বেতনটা পাচ্ছে পোপোভ।

'এমন ছোটলোক ওই পোপোভটা—একজন কনষ্টেবল আছে, আগে ছিল সে জুতোর কারিগর—তাকে দিয়ে ও নিজের জুতো সেলাই করায়।'

সদা-বিরক্ত মুখখানাকে উদার হাসিতে বিস্ফারিত ক'রে আন্তরিক ভাবে সামঘিনের করমর্দন করলেন সম্পাদক। বললেন:

'যাক্, মশাই জাতে উঠে গেলেন।' রবিনসন খুশিতে ডগমগ হ'য়ে জানিয়ে দিল—তার তিনবার খানাতাল্লসী, সাড়ে পাঁচ মাস জেল আর উর্ঝুমে দেড় বছর নির্বাসন ভোগ হয়ে গেছে। বলল:

'মশাই, উচ্চিংড়েরা প্রায় সাবড়ে দিয়েছিল আমায়। এমন হতচ্ছাড়া শহর! ৯০ নং রাস্তার ছোঁড়ারা কি গাইত জানেন—

'বাজ বাজ শিঙগা বাজ। ওরে তুর্কী, আমাদের পরাক্রমের কাছে তোরা টিক্‌তে পারলিনে। ওই দেখ তোদের বল্কান পর্বতের ওপর দিয়ে আকাশ ভেদ করে উঠেছে আমাদের বিজয় গৌরব।'

সৌখীন উকিল প্রাভদিন বিষণ্ণ ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল: 'রাশিয়ায় ভালো লোকের এই দুর্গতিই হয়। কখন কোন সময়ে যে—'

সামঘিন ভাবতে চেষ্টা করল, ওকে হিরো বানিয়ে এই মাতামাতি ক'রে নিছক পাগলামো করছেন মূর্খেরা। কিন্তু মনে মনে খুশিই হ'লো। কদিন পরে ওর নজরে প'ড়ল—রাস্তায় ওকে দেখলে স্কুলের মেয়েদের মুখে মিষ্টি হাসির অভিনন্দন ফোটে: অপরিচিত পথচারীরাও সম্ভ্রম-ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে যায়। অবাক হয় ও। ব্যাপার কি! মনটা তীর্যক হ'য়ে ওঠে:

'টিক্‌টিকি নয় তো? না উদার-পন্থীরা যাচাই ক'রে দেখছে দেশের জন্য আত্ম-ত্যাগে কতখানি প্রস্তুত আমি!'

ওর প্রতি সকলের এ মনোযোগের কি কারণ হ'তে পারে? মাঝে মাঝে বড় ভয় করে, হয়ত এর জন্য ওকে কঠিন মূল্য দিতে হবে। দ্রোনভই বিশেষ ক'রে ওকে জ্বালাতন করছে সব চেয়ে বেশী। প্রভুভক্ত কিন্তু চঞ্চল প্রকৃতির কুকুরের মতো দিবা রাত্র সে পেছনে লেগে আছে, আর এটা সেটা অনর্গল ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে চলেছে।

'তাহলে তুইও জড়িত আছিস এ ব্যাপারে?'

ক্লিমের সন্দেহ হয় নিশ্চয় ওর কিছু মতলব আছে। রাগে ওর শরীর জ্বলে যায়। এমন ভাবে হাত কচ্‌লিয়ে দ্রোনভ কথা বলে যেন নিজের ওপর বেশ খুশি আছে ও। তাড়াতাড়ি কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে:

'ধর্মশাস্ত্রের ওই যে ছাত্রটি—দোলগানভ, তার সাথে দেখা হয়েছে তোর?'

ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেয় ক্লিম: 'না, ধার্মিকদের আমার একটুও ভালো লাগে না।'

তৎপর ঘটকের মতো বলেই চলে দ্রোনভ চাপা স্বরে: 'একজন লেখক এসেছেন এখানে, অল্প বয়েস। জবরদস্ত মানুষ। চলনা, পরিচয় করিয়ে দি। একটি কলেজের মেয়েও আছে, মার্ক্সবাদে বিশ্বাস করে—'

লেখক বা কলেজের মেয়ে কারো সাথেই সাক্ষাৎ করতে রাজী হয় না ক্লিম। ভারাভকার দেশের বাড়িতে একজন ঘটক ছিল, দ্রোনভকে দেখলে তার কথাই মনে হয় ওর। দিন রাত্তির ঘটকালি ক'রে বেড়াত লোকটা। ক্লিম-এর পরিচিতের দলের মধ্যে একমাত্র ঐতিহাসিক কজলভই একটিও দরদের কথা বলেননি। দেখা হ'লে নীরবে শুধু করমর্দন করেছেন। সময়োপযোগী কিছু বলার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাকে সবলে যেন চেপে রেখেছে ওঁর দৃঢ়-বদ্ধ ঠোঁট দুটি। এতেও ক্ষুব্ধ হয়েছে ক্লিম। আহত হয়েছে ওর অভিমান।

ক্লিম লক্ষ্য করে ছিম্‌ছাম্‌ ওই ছোট্ট মানুষটি চলতে চলতে ছাতাটা জোরে জোরে মাটিতে ঠোকেন। তাঁর ভেতরে কিসের যেন একটা চাপা রাগ। মানুষের প্রতি আর সে প্রসন্ন দাক্ষিণ্য নেই তাঁর। সকলের ওপরই রাগ, যেন সকলেই তাঁর ওপর অন্যায় করেছে।

*

সামঘিনের ডাক পড়েছে পুলিস-প্রশাসন বিভাগের দপ্তরে। বুক ফুলিয়ে যাবে ও। সোজা বলে দেবে কর্তাদের:

'দেখুন মশায়রা, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু নিয়ে আমায় জোর জবরদস্তি করবেন না।' অথবা এই রকমই যা হোক কিছু। অর্থাৎ এমন জবাব দেবে, যে প্রভুদের তাক লেগে যাবে।

গম্ভীর ভাবে সাজ পোশাক করল। পরিপাটি ক'রে দাড়ি কামাল। নতুন এক জোড়া দস্তানা পরে নিল।

রাস্তায় হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার দাপাদাপি—যেন কোন এক অনাগত সংকটের ভয়ে পাগল হয়ে হাওয়ার দল বৃষ্টি-ভেজা বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পালাবার পথ খুঁজছে। [illegible] কালো মেঘের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে নভো-নীলের এক অপূর্ব স্বচ্ছতার রূপ উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

ছোট পড়ার ঘর খানি—[illegible]। [illegible], নিরালা আরামের পরিবেশ; [illegible] টেবিলের ফুটে আছে দুর্লভ [illegible]। [illegible] বলেছে [illegible] করা [illegible] প্রাকৃতিক দৃশ্য—খাড়া বালুবাময় পাহাড়; তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছের সারি। নীচে মাটির বুকে বয়ে চলেছে নদী, ঘোলাটে সবুজ তার জল। 'পেঁয়াজ-কলি দিয়ে ভাজা ওমলেট্' নামে

আখ্যাত ছবিগুলোরই অন্যতম এখানি। এক কোণায় তীর্যক ক'রে রাখা ডেস্ক। তার পেছনে ব'সে আছেন ক্যাপটেন পপোভ। দস্তানা-পরা আঙুলের ফাঁকে মীরশমের নল লাগান সিগারেট।

'আরে এই যে! আসুন, আসুন।' পুরোনো পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা ঢেলে স্বাগত জানালেন। ক্যাপটেনের গায়ে বহুল-ব্যবহারের চিহ্ন যুক্ত জ্যাকেট। দেখে কি রকম ঢিলে-ঢালা অলস প্রকৃতির ভালো মানুষ গোছের ব'লে মনে হচ্ছিল মানুষটাকে।

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে পপোভ বলে: 'বড় শিগ্গির শীত প'ড়ে গেল এবার, না?'

করোটির আকারের ছাইদানে সিগারের ছাইটা ঝেড়ে, থ্যাব্ড়া আঙুল দিয়ে একটা কাগজের বাণ্ডিলে টোকা মেরে বললেন: 'আপনার কাগজপত্রগুলো হাতে হাতে ফিরিয়ে দেব বলে এখানে টেনে এনে কষ্ট দিলাম আপনাকে।'

চেষ্টা ক'রে অতি মাত্রায় স্বাভাবিক করেই কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক; কিন্তু কাগজের বাণ্ডিলটা এগিয়ে এলনা সামঘিনের দিকে।

'কিছু কিছু পড়লাম। না বলে পারছিনে, বড় চমৎকার আপনার লেখা। ভাববেন না সামনে বলে বলছি। সত্যি আমার ভারী ভালো লেগেছে। অত্যন্ত পরিণত মনের চিন্তা। কি যে ছাইভস্ম লেখে আজকাল! যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন পড়লাম। পড়ে হেসে বাঁচিনে। কি না—সে একটা আনারস শূন্যে তুলে নাচাল, আর তার গলার স্বর গদগদ হয়ে উঠল। আশ্চর্য!'

সামনের তামাটে মাথাটার ওপর দিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে সিগারেটের ধোঁয়া, সেই দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলে সামঘিন:

'বুদ্ধু কোথাকার। খোসামুদ করছেন। ঘুষ কবলাচ্ছেন দেখ না!'

ক্যাপটেন চশমা খুলতেই আঁখি-পল্লবের নীচ থেকে বেরিয়ে এল ইঁদুরের মতো দুটি চোখ। কালো দাড়ি-মণ্ডিত মুখ খানা মস্ত বড় একখানা হাসিতে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সাবধানে রুমালটা চোখে চেপে ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন:

'আর সেই যে মেয়েটির কথা লিখেছেন—চিৎকার ক'রে উঠল—থামো যথেষ্ট বেয়াকুফী হয়েছে, আর নয়—ঐটে পড়ে বিশেষ ভাবে ভালো লাগল। আর ব্যাপারটার ওপর আপনার নিজের যে আলোচনা—সত্যি ইন্টারেষ্টিং।'

'শুয়র কোথাকার!' মনে মনে গর্জায় সামঘিন। হয়তো কর্তব্য বোধেই এ গর্জনে কোন বিদ্বেষ ছিল না।

সামঘিন ভেবে এসেছিল দেখবে এক জোড়া কালো কঠিন চোখ—না হ'লেও অন্ততঃ ভ্রূকুটি-কুটিল তো বটেই, কিন্তু দেখল শুধু বর্ণহীন দুটি গোলক, যার পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাপটেনের দাড়ির গোছা দেখাচ্ছিল রঙ-করার মতো, আর মুখখানাকে আরো যেন ভালোমানুষী দেখাচ্ছিল। ঘরের আবহাওয়াটা সহজ। ক্যাপটেনের পিছন দিকে, মাথার ঠিক ওপরে একটা কালো রঙের ত্রিভুজের ওপরে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের কৃষ্ণ শ্মশ্রু-মণ্ডিত প্রশস্ত মুখখানা যেন সমস্ত ঘরখানাকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে। কাগজ-সাঁটা অপ্রশস্ত দরজাটার ওপরে কার একখানা ফটো—মাথা-ভরা টাক, মুখ-ভরা গোঁফ, বহু সম্মান-চিহ্ন-ভূষিত পরিচ্ছদ। আর ডেস্কের ওপরে ক্লিম-এর লেখাগুলো চাপা দেওয়া রয়েছে এক খানা ভারী বই, সিয়েনকিয়েউইজ্-এর লেখা "বাই ফায়ার এণ্ড সোর্ড" দিয়ে।

'আচ্ছা, আমার বাড়িখানা তল্লাসী হবার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

জিজ্ঞেস করে সার্মাঘন। নিজের গলার স্বরটা কানে যেতেই বুঝল আসবার পথে যে বীরত্বের উদয় হয়েছিল হঠাৎ, তা উবে গেছে।

চশমাটা পরলেন ক্যাপটেন, নীলচে কান দুটো রগড়ালেন, তারপর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে অত্যন্ত অমায়িক ভাবে বললেন:

'কি করি বলুন, মস্কোর হুকুম। আছেন বোধহয় কোন কিছুর মধ্যে।'

সার্মাঘন বলে ফেলল: 'এই তল্লাসীর জন্য আমার অবস্থাটা ভারী বিশ্রী হয়ে গেছে।' তক্ষুণি শাসাল নিজেকে: 'এতো প্রতিবাদের মতো শোনাচ্ছে না, নালিশের মতো শোনাচ্ছে যেন।'

ক্যাপটেন পপোভ-এর গোটা দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে এল। বুকের ধাক্কা লেগে কেঁপে উঠল ডেস্কের ওপরকার বাতির চিমনিটা। ডেস্কের ওপর হাত রেখে, ঠোঁট দুটোকে একবার চেটে আর ভুরু জোড়া একটু নাচিয়ে নিয়ে নীচু স্বরে বললেন:

'বুঝি, আমি সব বুঝি। তা ভাল রিপোর্টই পাঠাব মস্কোতে। আশা করি আর আপনাকে বিরক্ত করবে না, অবশ্যি আপনি যদি বাধ্য করান করতে, তবে আর কি করা যাবে।'

অদ্ভুত ভাবে তাঁর মুখের পেশীগুলো নড়ে উঠল। সেই নাড়া খেয়ে দাঁড়িগুলো ছড়িয়ে গেল, ওপরে উঠে গেল গোঁফ-জোড়া; ওষ্ঠ দুটি ফাঁক হয়ে একটি বৃত্ত রচনা করল, আর তার গহ্বর দিয়ে বেরিয়ে এল হোঃ হোঃ ক'রে উচ্চগ্রামের একটা গমগমে হাসি। তারপর একটা আঙুল দিয়ে সিগারেটের বাক্সটা সার্মাঘনের দিকে ঠেলে দিয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন:

'চলে? আমি তো রীতিমত খোর। তামাকের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আমার গোঁফ সুদ্ধু কটা মেরে গেছে দেখছেন না।?'

কটার 'ক'ও দেখতে পেল না সার্মাঘন। দিব্যি নিকষ কালো গুম্ফ-শোভা।

'কি করি বলুন, যা কাজ আমাদের মাথা ঠিক রাখা যায় না।' আর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে। হঠাৎ তাঁর গলার মধ্যে একটা ঘর্ ঘর্ আওয়াজ উঠল। তারপর হঠাৎ কথার একটা অতি দ্রুত স্রোত যেন ভেঙে পড়ল। অতি গোপনীয় কথার ভঙ্গিতে ব'লে যেতে লাগলেন পপোভ:

'আশা করি আপনি এ কথা মানবেন যে মিছিমিছি আমরা ছেলে-ছোকরাদের পেছনে লাগি না। কি স্বার্থ আমাদের, বলুন! প্রত্যেকটি বুদ্ধিমান মানুষকে আমরা যোগ্য মর্যাদা দিয়ে থাকি। বিপ্লবীরা ভিন্ন ধাতের মানুষ। তাদের স্রেফ্ পার্টি। পার্টি ছাড়া কিছু জানে না তারা, পার্টির লোক ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলেই মনে করে না মশাই।'

আরও বললেন পপোভ যে, শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতিকে যে-করেই হোক বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন বলেই এবং এ কর্তব্যে আত্ম-নিয়োগ করবার জন্যই ভদ্রলোক পুলিসের কাজে এসেছেন:

'রাশিয়াতে মানুষের ভাবনা-চিন্তা-কল্পনার মুখে যে-রকম লাগাম পরাতে হয়, যে-রকম রাশ টেনে রাখতে হয়, এমন আর কোথাও হয় না।' নিজের নরম বুকটায় খোঁচা মারতে মারতে নিশ্চয়তার সুরে বলেন পপোভ। সার্মাঘন বেশ বুঝতে পারে কি বলতে চায় লোকটা। এবং সেই জন্যই ওর মনে হয়, ওর আর ওর বৌ সম্বন্ধে মিথ্যে কথাই রটিয়েছে দ্রোনভ।

'মশাই, যে-সব ছেলেরা কোন দিকে কিছু করতে পারে না, তাদেরই সব দলে টেনে নেয় বিপ্লবীরা। অবশ্য এদের মধ্যে প্রতিভাওয়ালা ছেলেও যে আছে, তা

অস্বীকর করছিনে আমি,' একটা অন্তরঙ্গ নরম সুরে কানে আসে সামঘিনের: 'আছে, কিন্তু তাদের অনেকেই পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এবং সে-পথ ছেড়ে রাষ্ট্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ ক'রে ভুলের প্রায়শ্চিত্তও করেছে। এ সব তো জানেন আপনি।'

ক্রমশঃই যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছেন লোকটি; ক্রমশঃই বেশী গদ্‌গদ হয়ে উঠছেন যেন সামঘিনকে বিশ্বাস করে ভারী গোপনীয় সংবাদ দিচ্ছেন যেন। লোকটির চোখ বন্ধ হ'য়ে এল। এ যেন ভারাভকাই কথা কইছে—শুধু গলার স্বরটা অন্য।

ভীষন জোরে কোথায় যেন একটা পিয়ানো বেজে উঠল। গোঁফ চুমরে উল্লসিত হ'য়ে বললেন ক্যাপটেন: 'আমার স্ত্রী আর মেয়ে বাজাচ্ছে।'

ফোঁস ফোঁস ক'রে তাঁর নিশ্বাসের শব্দ হ'তে লাগল। যেন নিশ্বাসের সংগে টেনে নিতে লাগলেন বাজনার শব্দটা। নাকের ডগাটা ফুলে ঢোল হয়ে লাল টক্-টক্ করতে লাগল।

'আমার মেয়ে গানের স্কুলে যায়। মাদাম স্পিভাক যে বক্তৃতা দেন সংগীতের ইতিহাসের ওপর, তা শুনতে ভালোবাসে মেয়েটা। আচ্ছা মাদাম স্পিভাক কি কুতুজভের কেউ হন ?'

'মাদাম স্পিভাকের বাবা ছিলেন একজন মার্শাল অব নোবিলিটি, নামটা ঠিক জানিনে আমি। আর কুতুজভ হ'লো কৃষক।' নিজের অজ্ঞাতসারেই জবাবটা বেরিয়ে এল ক্লিমের মুখ থেকে।

'তাই নাকি ? সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে! আর বিয়ে করল কিনা একটা ইহুদীকে!'

'ভদ্রলোকের ঠাকুরদা তো তার আগেই খৃস্টান হয়ে ছিলেন।' বলল ক্লিম। পিয়ানোটা বেসুরো বাজছে, ওর কানে লাগছে।

'এই স্কুলটা ক'রে দিয়ে আপনার মা শহরটার ভারী উপকার করেছেন।' ক্যাপটেন পপোভ-এর স্বরে শ্রদ্ধা ঝরে পড়ে। শ্রদ্ধা গদগদ হয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন:

'কুতুজভের সংগে আপনার অনেক দিনের আলাপ বুঝি ?'

হুঁশিয়ার হয়ে গেল সামঘিন। একটু নড়ে চড়ে বলল:

'যখন পিটর্সবুর্গে ছিলাম, একই বাড়িতে দুজনে খেতাম।'

'কৃষক, তাই বললেন না ?' একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেন ক্যাপটেন। হাত উঠিয়ে আঙুলগলো নাড়তে নাড়তে থুঁতনিটা উঁচু ক'রে দিলেন। ঘন দাড়ির জঙ্গল উঠে মাটির সংগে সমান্তরাল হয়ে শূন্যে ভাসতে লাগল। সামঘিনের দিকে ঝুঁকে মুখ বাঁকিয়ে ছড়া কাটেন পপোভ:

'বন-বাদাড়ের ঘেঁটু ফুল,
জুঁই-এর মালায়—নাইকো তুল,
আহা মরি মরি গো!

বড্ড সরল আপনি, বন্ধু, বড্ড সরল। আ রে ইহুদী সে-ইহুদীই। ওকি আর পবিত্র জলের ধোয়ায় সাফ হবার চীজ্! মোদ্দা কথা, চাষা চাষাই। প্রকৃতির দিকে দেখুন না তাকিয়ে—সেখানে কোনটা কার সংগে সমান! ছুঁচোর সংগে কাগের জোট বাঁধে ? দেখেছেন ?' গম্ভীর ভাবে উপদেশ দেন ক্যাপটেন।

শুনে না হেসে থাকতে পারে না ক্লিম। পপোভের এক হাতের আঙুল বিচিত্র সব নক্সা কেটে চলেছে আর এক হাত দাড়ির গোছা শক্ত ক'রে ধরে আছে, যেন নিংড়ে

নিংড়ে কথা বের করছেন ওই ঝোপ থেকে। কথাগুলো ক্রমশঃই কেমন যেন রহস্য-পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

'জোট, বে-জোট! মশাই, প্রকৃতির দুনিয়ায় অসঙ্গত জোটের ঠাঁই নেই। ক্ষয়িষ্ণুতার...' কুঁড়ে মানুষটির এ উত্তেজনায় বড় মজা লাগে ওর। যা কাজ তাতে মেলাই বাজে কথা বলতে হয় ক্যাপটেনকে। কিন্তু লোকটা যে মন্দ নয় তা বেশ বোঝা যায়। নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য করে যান। গির্জার পাদরী বা ব্যাংকের কাজ হ'লে, বেশ বড় রকম একটা বন্ধু বান্ধবের বৃত্ত তাঁকে ঘিরে অনায়াসে গড়ে উঠতে পারত। বেশ পছন্দও করত ওঁকে লোকে। কিন্তু পুলিসের লোক, অতএব সকলের ভয় ও ঘৃণা কুড়োতে হয়। এমন কি গাঁয়ের "হস্ত শিল্পী সহায়ক সমিতি"ও নানা অপবাদ দিয়ে বেচারীকে অপাদস্ত করতে বাকী রাখেনি।

দ্রোনভ মানুষটার সম্বন্ধে মিথ্যা কথাই বলেছে।

হঠাৎ নেহাৎ যেন এমনি কথার ছলে জিজ্ঞেস করেন পপোভ:

'সেইন্টপিটর্সবুর্গের পরে কুতুজভের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি বোধহয় আপনার?'

অতর্কিত প্রশ্ন। প্রস্তুত ছিল না সামঘিন। তক্ষুণি জবাব দিল না। ক্যাপটেন চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। একটা উৎফুল্লতার ঝিলিক তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

'হয়েছে নাকি দেখা? চশমটা মুছতে মুছতে আবার জিজ্ঞেস করেন পপোভ: 'এই কিছুদিনের মধ্যে?'

'হয়েছে।' জবাব দেয় ক্লিম।

কি রকম ভয় করতে আরম্ভ করে ওর। কিন্তু ভয়টা চাপার জন্য যেন কিছুই জানেনা এমনি ভান ক'রে জিজ্ঞেস করে:

'কুতুজভকে খুব বিপজ্জনক বলে মনে করেন বুঝি?'

অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত। পপোভ তার খুশি ঝরা চোখ দিয়ে ক্লিমকে নিরীক্ষণ ক'রে বলেন: 'আপনারই তো বেশী জানবার কথা। বিশেষ ক'রে আপনার ভাই দিমিত্রির ব্যাপারে। আচ্ছা, এই ইনোকভটি করে কি?'

ক্যাপটেনের সঙ্গে এর পরে যা কথাবর্তা হ'লো পরবর্তীকালে তা মনে আনতেও বিশ্রী লাগত ক্লিমের। কালো-দাড়িওয়ালা পুলিস-কর্মচারীটির উপদেশটুকু ছাড়া আর সব নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ও। উপদেশ দিয়েছিলেন সেই লোকটি:

'ওই মানুষ-শিকারীদের কাছ থেকে দূরে থাকলে আর সত্য কথা বলতে কখনও ভয় পাবেন না।'

ক্লিমকে বিদায় দেবার সময় করমর্দন করেন ক্যাপটেন। হাতখানা দেখতে তুল-তুলে, কিন্তু এমন শক্ত যে আঘাত যেন ঠিক্‌রে ফিরে আসে।

*

আবার রাস্তা। মনটা খারাপ হ'য়ে গেছে ক্লিমের। যা ভেবেছিল হ'লো তার একেবারে বিপরীত। কি রকম বিশ্রী বোকার মতো করল ও!

'কোন বাজে কথা তো কইনি। আর কিই বা বলতাম? ইনোকভের সম্বন্ধে

যা বলেছি—তা ওরা নিজের চোখেই তো দেখেছে। কি অভদ্র আর ফোঁপর-দালাল দালাল লোকটা।

কুয়াশায় ঢাকা সারা শহর। রাস্তাগুলো ভেজা স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে। ওর পিটর্সবুর্গ আর কুতুজভ্-এর কথা মনে পড়ছে। ফিকে হয়ে এসেছে সে-সব দিনের স্মৃতি। আজ ভাবতে গিয়ে দেখল কোন তিক্ততা, কোন বিরূপতা ওর মনে নেই। লোকটা যেন চিরকালের মতো ফুরিয়ে গেছে।

পরের দিন শুনতে পেল সামঘিন স্পিভাককেও ডেকে জেরা করা হয়েছে। ক্যাপটেন নয়। খোদ বড়কর্তা করেছে।

নাক সিঁটকে বলল স্পিভাক: 'যাচ্ছে তাই মানুষ, বামন-বীর, গো-মূর্খ কোথাকার!' কতগুলো বই বা কাগজ কাপড় মুড়ে সেলাই ক'রে বান্ডিল বাঁধছিল স্পিভাক। হাত চলছিল হাওয়ার মতো। হেসে আবার বলল—হাসিটা যেন পরিচিত নয়: 'সেই যে সংখ্যা-তাত্ত্বিক, স্মলিন! নেহাৎ ভালোমানুষ—জেলার মেজ এ্যাটর্ণী সাহেব ভিসারিওনভকে এক লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার সেল থেকে।'

বিশ্বাস হ'তে চায় না ক্লিমের। জিজ্ঞেস করে:

'আপনি কি ক'রে জানলেন?'

'কি ক'রে জানলাম তা দিয়ে কি হবে?' মাথা না তুলেই জবাব দিল স্পিভাক এবং পাল্টে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, আপনার সেই ক্যাপটেন ভদ্রলোক কুতুজভের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে নি?'

'না।'

'তাই নাকি, আশ্চর্য তো!' সোজা হ'য়ে বসল স্পিভাক। ভ্রূ জোড়ার নীচ থেকে দুটো তীক্ষ্ম তীর যেন গিয়ে বিঁধল ক্লিমের মর্মস্থলে।

'কেন?'

'কারণ, সমস্ত ব্যাপারটার মূলেই যে কুতুজভ।'

আর-একটা মিথ্যে কথা বলে ব'সল সামঘিন:

'কেন? আমি যে কারণ নই তাই বা মনে করছেন কেন?' ব'লে নিজের মনেই অবাক হ'য়ে গেল ও। ভাবল, বিশ্বাস করবে তো?

স্পিভাক আবার মাথা নীচু ক'রে সেলাই করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে ধীরে ধীরে বলল:

'দেখুন, এখন ঠিক ঠাট্টা-তামাশার মেজাজ নেই আমার।' বড় অস্পষ্ট ও নিস্তেজ শোনায় কথাগুলো।

ক্লিমের বুঝতে বাকী থাকেনা যে এখন আর কথাবার্তা কইবার মতো ইচ্ছে নেই ওর। মুখ গম্ভীর, নীলকান্তি চোখ দুটি হিমশিলার মতো কঠিন, দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম, মর্মভেদী।

ক্লিম চলে গেল মনে মনে গজরাতে গজরাতে, দুমুখো সাপ একেবারে! কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিকের ব্যাপারটা ও জানল কি করে? তাহ'লে কি ও-ও গুপ্তদলের সভ্য? নিশ্চয় বড় গোছের কেউ। তাইতো মনে হচ্ছে।

ক্লিমের পরিচিতের বৃত্ত রাজনীতি-আলোচনায় মুখর। উত্তেজনায় হাওয়া গরম। সকলে বলাবলি করছে—এসব ধর-পাকড় আর খানাতল্লাসী আর কিছু নয়, বড়

কর্তাদের কাছে নিজেদের গুণপনা দেখানর জন্য ছোট কর্তাদের চাল। সামাঘিন সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষ কৌতুহল। বিশ্রী লাগে ক্লিমের এ-অশিষ্টতা। ওর মন বিষিয়ে ওঠে। দ্রোনভ অনর্গল হাজারো প্রশ্ন ক'রে চলেছে। ঘন ঘন আসছে ইনোকভ। প্রায় প্রতি দিন। আসে, খানিকটা সর্দারী করে। অসহ্য লাগে ওর। ও বুঝি পাগল হ'য়ে যাবে। আর থাকতে পারল না সামাঘিন। অবশেষে সত্যি পালাল একদিন। পাড়ি দিল মস্কোয়। ভারাভকা আর মা'র ফেরার জন্য অপেক্ষাও করল না।

॥ ৫ ॥

গোটা শীতের অর্ধেকটা ওর একেবারে একলা কাটল। এতদিন ওর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে আর অনুভবের জগতে যা কিছু সঞ্চিত হ'য়েছিল, তাই নিয়ে ব'সে ব'সে নাড়া চাড়া করল, ঝাড়াই বাছাই করার চেষ্টা করল। কিন্তু ফেলবার মতো কিছু পায়নি। সবই দরকারী। ওর মনে হয় জীবনটা যেন একটা জঙ্গল, যার মধ্য দিয়ে ওকেই ওর পথ খুঁজে নিতে হবে; খুঁজে নিতে হবে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর অনবস্থিততা হ'তে মুক্তির উপায়। থিয়েটারে যায়। চশমার ভেতর দিয়ে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, স্ফূর্তি করার জন্য দুঃখ-বেদনা, হীনতা-তুচ্ছতাকে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনে কি বিপুল মূর্খতারই পরিচয় দেয় মানুষ; ভাবে, প্রেম আর হিংসা দিয়ে জীবনকে সৃষ্টি-ছাড়া নাটক ক'রে না তুললে তারা বাঁচতেই পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহল আন্দোলনে মেতে আছে। তাদের কাছ থেকেও ও দূরে সরে থাকে। সঙ্গীদের দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন বয়সে ও তাদের চেয়ে অনেক বড়। নিজের মনে বলে, এসব আন্দোলন তো সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র! ওর বিশ্বাস গম্ভীর হ'য়ে দূরে দূরে থাকলেই বেশী সম্মান পাওয়া যাবে।

ইস্কুলে যখন পড়ত, মাস্টার মশায়দের পড়ান শুনে ওর যেমন বিরক্ত লাগত, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনেও ওর ঠিক তেমনি বিরক্ত লাগে। সুতরাং বাড়িতেই থাকে ও। বছর চল্লিশেক বয়েস হবে ওর বাড়িওয়ালী ফেলিৎ-জাতা পল্‌সেন্‌-এর। তারি আশ্রয়ে ও থাকে। সাজান গোছান আরামের ঘরখানায় ব'সে ব'সে কেবল লেখে—নীল কাগজে ছোট ছোট মুক্তো-ঝরানো হরফে। লেখে আকাশ পাতাল যা মনে আসে। কোনো শিরোনামা না দিয়ে প্রথম পাতায় ও লিখে রেখেছে আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে:

"মানুষ যখন সম্পূর্ণ একলা
তখনই
সে মুক্ত।"

যত ও লেখে ভাবে তার বেশী। প্রত্যেকটি কথাকে অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবে। দৃষ্টি ওর সুদূর-প্রসারী লক্ষ্যের দিকে। ও ভোলে না, ভুলতে পারেনি এই লেখাই এক দিন ওকে রক্ষা করেছে।

এক দিন লিখল: 'সরল প্রকৃতির মেয়েদের নিয়ে যারা চিরকাল খেলা ক'রে এসেছে, তারা যেমন মেয়েদের ঘৃণা করে—প্রফেসর আজবুকিনও ঠিক তেমনি ঘৃণা করেন তাঁর ছাত্রদের। অথচ তাঁর উদার মতবাদের টোপ ফেলে ছেলেদের ফাঁদে ফেলাতেও চেষ্টা কম করেন না।'

প্রফেসর বুক্‌ভিনকে দেখলে আমার মনে পড়ে সেই যে একজন মিশনারী যিনি আধা-বর্বর মর্দ্‌ভিন্‌দের আলোক দান ক'রে বেড়াতেন, তাঁর কথা। উনি যখন মানবতা-বাদ নিয়ে বক্তৃতা দেন, ওঁর মুখখানা ভারী বিরক্ত বিরক্ত লাগে। বেশ বোঝা যায়, মনে যা বিশ্বাস করেন না তাই জোর গলায় বলতে হচ্ছে। বিরক্তির মূল সূত্রটা হয়তো ঐখানেই।'

রবিনসনের স্থূল রসিকতা ধার ক'রে এক এক জন প্রফেসরের এক একটা নাম দিল। যেমন এক জনের নাম রাখল—স্লাবোল্যুবেভ্ অর্থাৎ বচন-বিলাসী; আর একজনের স্লাবোতেকফ্ অর্থাৎ বাক্য-বাগীশ, স্নুকৎভর্ৎজেফ্ মানে প্যান্‌পেনে। এমনি সব। কেউ কম কেউ বেশী, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের মতো ক'রে ওকে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই সংক্ষেপে এদের চরিত্রের এমনি একখানি ছবি এ'কে ও অসম্ভব খুশী হ'য়ে উঠল। কখনও বা লিখল: 'পোয়ারকভ মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকছে। ওর মধ্যে কি যেন আছে যা ঠিক বুড়ো কানা ঘোড়ার মতো লাগে।'

'গ্রেপ্তার হ'য়ে মারাকুয়েভ-এর নিজেকে হঠাৎ খিলাত-পাওয়া রাজকর্মচারীর মতো মনে হচ্ছে।'

এমনি ধারা ছোট ছোট টুকরো টুকরো ছবি। ভারী মজা লাগে ওর।

একলা ঘরে ব'সে কাগজের সঙ্গে নীরবে মনের কথা কয়ে সুদীর্ঘ-হেমন্তের সন্ধ্যা আর রাতগুলো কাটল সামঘিনের। ওর যত কথা সব বুক পেতে নিয়েছে কাগজ। ক্রমে ক্রমে ওর নিজের চোখেই নিজেকে অনেকখানি বড় মনে হ'তে লাগল। ওর বিশ্বাস হ'তে লাগল যে, ওর পরিচিত মণ্ডলির মধ্যে একমাত্র সেই মেজাজী মাষ্টার মশাই তমিলিনই সব চেয়ে বুদ্ধির কাজ করেছেন এবং জীবনের সব চেয়ে সুবিধার ঠাঁই খুঁজে নিয়েছেন।

কিন্তু বড় অবসাদ আসে বারে বারে। আগে এভাব এত ঘন ঘন হতো না। এখন ক্রমশঃই যেন বাড়ছে। বৃষ্টি, বাতাসের কোলাহল, আর ঝড়ের তাণ্ডবের সাথে সাথে কোথা থেকে যেন এক বিবশ-করা অবসাদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে উষ্ণ ঘর খানার মধ্যে, এক ফুঁয়ে ওর যত বিরূপ চিন্তা নিবিয়ে দিয়ে সব একাকার ক'রে দিয়ে যায়।

ভাবতে বসে ও: 'মনের মধ্যে এই কেবলি অর্থহীন কতগুলি এলোমেলো কথা গাঁজিয়ে তুলেছি—কি এর উদ্দেশ্য? কি চাই আমি?'

নারী সঙ্গাতুর মনটি আবার জেগে ওঠে। লিদিয়া চলে গেছে বহু দিন। সুদীর্ঘ এই বিরহের পারে ব'সে ওর মনে পড়ে তার সঙ্গে ওর সংক্ষিপ্ত রোমান্সের স্মৃতি—যা স্বপ্নের মতো আনন্দের চাইতে ব্যথাই দেয় বেশী। অসমাপ্ত রয়ে গেল সে-অধ্যায়। বড় নিষ্ঠুর ভাবে থেমে গেল মাঝ পথে। বোঝেনি লিদিয়া, কিছুই বোঝেনি—তাকে ঘিরে ওর মরমের সেই নাম-গোত্রহীন আশা; বোঝেনি সে যে ওর কি ছিল। বোঝেনি বলেই ওর বুক ভেঙ্গে দিয়েছে; সমস্ত নারী জাতির ওপর বিষিয়ে দিয়েছে ওর রুচি। বুকে ওর প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেছিল, কিন্তু প্রতিশোধ ও নেয়নি। "রুচি!" হাঁ রুচিই—ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওই ঠিক সংজ্ঞা। লিদিয়া যাবার পর মেয়েদের সইতে পারে না ও।

কথাটা আরও স্পষ্ট হ'লো ভারভারার সঙ্গে কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হবার পরই। মস্কো আসার পর প্রথম দিকেই দেখা হ'লো ভারভারার সাথে, এবং হ'লো অনেকবারই। মেয়েটিকে ওর ভালো লাগত না। কিন্তু সে-দিন এক থিয়েটারে বিরতির সময় ওকে দেখে কি-আনন্দে সে-মেয়ে এমনি ডগমগ হ'য়ে উঠল—ক্লিম অবাক হ'য়ে গেল। ভালও লাগল।

ওর হাত ধরে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলল ভারভারা: 'ভারী দুষ্টু তো! এসেছ, কিন্তু মুখ খানা একবার আমায় দেখাতে পারলে না!'

সেই অভ্যস্ত চড়া-রঙের জমকালো সাজ, চেঁচিয়ে কথা বলা—আশে পাশের সবাই যেন ওর আপন জন। আপন জনের মতোই সহজ ওর ব্যবহার।

খুশি হ'য়ে ওকে সঙ্গে ক'রে বাড়ি পৌঁছে দিল সামঘিন। সারা রাস্তা বক্-

বক্ করতে করতে চলল ভারভারা—দিওমিদফের কথা, মারাকুয়েভের কথা—আরো অনেকের কথা, অনেক রকম কথা। সারা মস্কো চর্কির মতো ঘুরে বেড়ায় দিওমিদফ। মাঝে-মধ্যে আসে ওদের বাড়ি। তের দিন মারাকুয়েভকে জেলে পচিয়ে তারপর নাকি পুলিস ওর কাছে ক্ষমা চায়। বলল নিজের কথাও—নাট্য-বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও, কিন্তু বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্থূলকায়া এন্‌ফিমিয়েভনার কাছেও সাদর অভ্যর্থনা পেল ক্লিম: 'আরে কত বড়টি হয়ে গেছ! কি সুন্দর চেহারা হয়েছে! দাড়িও রেখেছ দেখছি! তা রাখবেই তো!'

অল্প সময়ের মধ্যেই ভারভারার সংগে ওর যে-সম্পর্ক দাঁড়াল তাতে বেশ কৌতুকই লাগল সামঘিনের। রোগা হয়ে গেছে ভারভারা। ঘাড়টা লম্বা হ'য়ে গেছে হাড়-গিলের মতো। ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে মুখটা একটুকু দেখায়। বাড়িতে অদ্ভুত সব জামা প'রে থাকে ও। অসম্ভব ঢোলা আস্তিনের মধ্য দিয়ে গোটা হাতটা দেখা যায় কাঁধ পর্যন্ত। পা টেনে টেনে নিতম্ব দুলিয়ে চলে। ভারভারার বিশ্বাস এতে খুব সুন্দর দেখায় ওকে। উচ্চারণ কতকটা অনুনাসিক; মস্কো ফ্যাসানে 'ও'র উচ্চারণ করে 'য়্যা'র মতো ক'রে। চাল-চলনে অতিরিক্ত নাটুকেপনা। বিখ্যাত মহিলাদের সম্বন্ধে ও গদগদ। কখনও ঝোঁকে মাদাম রিকামিয়ের দিকে, কখনও রোলাঁর দিকে। ওর এই দোল খাওয়া দেখে মানুষ হাসে। এই যশস্বিনীদের ছবি টাংগানো ওর ঘরে। তাদের জায়গা বদল হয় ঘন ঘন। পয়লা নম্বরের জায়গা কখনও একজন পান, কখনও আরেক জন; দুই ফরাসিনীর মধ্যে কার ছবি কোথায় ঝুলছে তা দিয়ে ভারভারার মেজাজের আবহাওয়ার নিশানা পেত সামঘিন। তর্কের আসরে ব'সে যে-দিন সামঘিন দেখে রিকামিয়ের ছবি প্রথম স্থান পেয়েছে, সে-দিন ও বলে, শিল্প তো হচ্ছে ভোগ-পরিতৃপ্ত ধনীদের খেলার বস্তু। আর শিল্পীরা হচ্ছে বুর্জোয়াদের ভাঁড়। কিন্তু সুর বদলায় যে-দিন দেখে মাদাম রিকামিয়ে মাদাম রোলাঁর অনুকূলে স্থানচ্যুত হয়েছেন। জোর গলায় অমনি ও বলে, বোদলেয়ার-এর চাইতে নেক্রাসভ অনেক বেশী বিপ্লবী। অথবা বলে, বুর্জোয়া সমাজের ভয়াবহ মিথ্যা আর ক্লেদের যে ছবি মোপাঁসা তাঁর গল্পগুলিতে এঁকেছেন, তার প্রভাব অনেক কড়া রাজনৈতিক প্রবন্ধের চাইতেও বেশী। ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ধরনের রসিকতা যে অত্যন্ত স্থূল, এতে শ্লেষের সূক্ষ্মতা নেই এ কথা সামঘিন না বোঝে তা নয়। কিন্তু তার জন্য ওর বিন্দুমাত্র আফসোস নেই।

ভারভারা শোনে আর ব'সে ব'সে পাণ্ডুর ঠোঁট দুটি চাটে। ও যখন ওর কটা চোখের ওপর পাতাদুটিকে একটু বেশী ক'রে টেনে দিয়ে, ছুঁচল থুঁথান বাড়িয়ে গলা টান ক'রে বসে, মনে হয় মুখের মতো জবাব আসবে এবারে। কিন্তু জবাব আসে না। আসে কতগুলি বোকা বোকা আবোল তাবোল প্রশ্ন যাতে ওর অজ্ঞতা ধরা প'ড়ে যায়। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কেবলি নালিশ করে ভারভারা:

'কেমন জানি তুমি। হেঁয়ালী। কিছু বুঝতে পারি না। বহুদিন এক সংগে থাকলেও বোধহয় তোমায় চেনা যায় না। তোমার আশে পাশে আর যারা আছে, তারা যেন অপেরার গায়ক। হাঁ করলেই বোঝা যায় এবার কি গান ধরবে।'

ভারভারার এই স্তুতিবাদ আন্তরিক কিনা সে-বিষয়ে সামঘিনের সন্দেহ আছে। কারণ, ওর মনে হয় ভারভারা চতুরা হয়তো নয়, কিন্তু ও এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছে। এবং ওকে নাচিয়ে ক্লিম যতখানি আনন্দ পাচ্ছে, ওই অভিনয় ক'রে সেও হয়তো ততখানিই পাচ্ছে।

*

যখনই ভারভারাদের বাড়ি যায়, সামঘিন দেখে মারাকুয়েভ রয়েছে। একেবারে যেন ঘরের মানুষ। মন দিয়ে মন পাবার আশ্বাস পেয়েছে যে-প্রেমিক তারই মতো অন্তরঙ্গ ভারভারার সঙ্গে ওর ব্যবহার। ওরা পরস্পরকে 'তুমি' বলে, কিন্তু কেন জানি সামঘিনের মন কিছুতেই স্বীকার করে না যে ওদের মধ্যে প্রেম আছে। দুই জন এত বিভিন্ন প্রকৃতির যে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা সম্পূর্ণ একটা ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপার ব'লেই ওর ধারণা। ওদের এই বন্ধুত্বে নিয়ে ভারভারার একটু বেশী রকম নাটকীয় হ'য়ে ওঠারই কথা। তবু খানিকটা ভাবালুতাও আসা উচিত ছিল। কিন্তু দু'জনে মিলে সম্পর্কটাকে একটা হাল্কা কমেডি ক'রে তুলছে।

মারাকুয়েভ আগের মতোই উচ্ছ্বসিত। আগের মতোই সহজে গরম হয়; কথা কইতে তেমনি উচ্ছ্বাস, তেমনি ঝাঁঝ। খোদিন্কার সেই সাংঘাতিক কান্ডকারখানার দিন ওর যে ভোগান্তি হয়েছিল তার যে কোন চিহ্ন ওর মধ্যে আছে, বা পোয়ারকভের মতো কোন রেখাপাত ওর মনে হয়েছে বাহ্যতঃ তার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। ওদিকে পোয়ারকভের মুখ আরও অন্ধকার হয়েছে; সারাক্ষণ মাথা গুঁজে থাকে। অত যে বইয়ের পোকা ছিল সে, আজকাল বই ছোঁয়ই না। গান গায় না। আগের মতো গলার জোর নেই। চিঁচিঁ ক'রে কথা কয়, যেন ও ভেঙ্গে চুরে একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে। সূঁচের মতো খোঁচা খোঁচা পাকা-দাড়ি গজিয়েছে মুখে, তাতে ওর বয়েসটা যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ভারভারাদের বাড়িতে আসে কদাচিৎ। এলেও বেশীক্ষণ থাকে না। গীটারে হাত দেয় না। মারাকুয়েভ আর ও দু'জনে এক সঙ্গে গাইত আগে, তাও ছেড়েছে।

গীটারের কথা একদিন তুলেছিল সামঘিন। ও জবাব দিল জার্মান প'ড়তে নাকি বেশী ভালো লাগছে। স্বরটা কেন জানি ভারী রাগ রাগ ছিল।

এক দিন ক্লিমের কানে এল লিদিয়া যে-ঘরটায় থাকত সেখানে নাকি মারাকুয়েভের ছাত্ররা আসে, কিসের বৈঠক হয়। অবাক হ'য়ে গেল ও। ব্যাপারটা ভালো লাগল না। নিজেকেই একটা ধমক দিল: 'যে-খানে যাবে সেখানেই এসব! বাঁচোয়া নেই।'

কিন্তু জানতে তো হবে ব্যাপারটা! কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে ক্লিম। মানুষকে জানবার আগ্রহে নয়, ফাঁকি ধরার জন্য। ছট্‌ফট ক'রতে লাগল ও। মারাকুয়েভ আর তার দলের খবর সংগ্রহ ক'রতে তৎপর হ'য়ে উঠল। দুনায়েভ ব'লে এক জন আসে সভায়। আগেও তাকে দেখেছে ক্লিম। কোঁকড়া দাড়ি। চিরকালের সেই হাসি মুখে লাগা। ওর সঙ্গে আসে আর একজন। একেবারে অন্য ধরনের। গোমরা মুখ, কুচকুচে কালো গোঁফ। পাথুরে মুখখানার মধ্যে কোটর-গত এক জোড়া কালো চোখ; দৃষ্টিটা সংশয়ী। এক তরুণও আসে; ফিটফাট ছিমছাম চেহারা, হাঁ-টা বড়, চওড়া নাক, সাদা ভ্রূ। আসে অতি সন্তর্পণে। ওর হরিণ-চোখ দু'টি যেন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক খানি দূরে। একই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দু'টি চোখ দু'দিকে চায়, অথচ ট্যারা বলা চলে না ওকে। যেন পরস্পরের কাছ থেকে অনেক খানি দূরে। একই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দু'টি চোখ দু'দিকে চায়, অথচ ট্যারা বলা চলে না ওকে।

রোগোঝিন কারখানা থেকে আসে আইকন-চিত্রকর পাবেল ওদিনৎসভ। চেহারাটা সুন্দর মেয়েলী ধরনের। আসে দারুশিল্পী ফোমিন। ছটফটে মানুষ, চেহারায় বয়স বোঝা যায় না। লিকলিকে রোগা; মুখটা ইঁদুরে মতো; ডান গালে একটা সরোম তিল; দৃষ্টি হ্রস্ব, মর্মভেদী চোখ দুটি সর্বদা কুঁচকে থাকে।

আসে ডীকন। অনর্থক কুঁজো হয়ে হাঁটে। চুলে বৃত্তাকার কদম-ছাঁট। দাড়িটি তিন থাকের। একটি থাক লম্বা আর ছুঁচল ক'রে ছাঁটা। সুজদলে যে সেইন্ট্‌দের অসংখ্য প্রতিমূর্তি আছে তাদের মুখগুলি কি রকম মিলে মিশে একাকার হয়ে একটি মানুষের মুখ হয়ে ওঠে—একটি রুশ মানুষের মুখ—যার রুশীয়ত্ব চিরন্তন, যা কোন কালে ঘুচবে না। একদা ডীকনের মুখেরও সাদৃশ্য ছিল এদের সঙ্গে। যে বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ এ সাদৃশ্য ছিল, ওর আজের চাঁচা-ছোলা চেহারাটা থেকে তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। গোঁফের ডগা ছেঁটে ফেলা হয়েছে সে-কথা মনে থাকে না ডীকনের—প্রায়ই গোঁফের খোঁজে কান থেকে থুতনি পর্যন্ত গালে হাতড়ায়। গায়ের ঝুলি ঝুলি ছেঁড়া জামা আর পায়ের মোটা চামড়ার গোবদা জুতো জোড়ায় তাকে পুরোনো-কাপড় বিক্রিওয়ালার মতোই দেখায়।

বাইরের বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও সামঘিনের মনে হয় এরা সবাই যেন এক, অস্বস্তিকর রকমের এক। এদের ব্যবহার-চাল-চলনের স্থূল গ্রাম্যতা, উদ্ধত প্রশ্ন, অজ্ঞতা, মারাকুয়েভের বক্তৃতার সমর্থনে দাঁত বের ক'রে বিশ্রী হাসা অসহ্য লাগে ওর। ওদের প্রত্যেকের মধ্যে কি যেন একটা আছে অত্যন্ত হাস্যকর, ওর চোখে লাগে। সামঘিনের সব চেয়ে বেশী ক'রে মনে হয় ওরা স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত বলেই বুঝি ওদেরই মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ এ যাবৎ যা বিশ্বাস ক'রে এসেছে এবং যা ওদের করা উচিত ছিল, সে সব কিছুই নেহাৎ হেলায় ওরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

একটা কথা ওর মনে পড়ে। ছোট বেলায় লিদিয়া চামচিকেকে ভীষণ ভয় পেত। বছর পোনের পর্যন্ত ছিল ভয়টা। এক দিন সন্ধ্যে বেলা যেই চামচিকেরা নিঃশব্দে উড়তে আরম্ভ করেছে উঠন আর বাগানের ওপর দিয়ে ও চিৎকার জুড়ল: 'ইঁদুরেরা উড়বে কেন?'

ক্লিম অনেক চেষ্টা করল বোঝাতে:

'আরে ওগুলো ইঁদুর নয়, ইঁদুর তো মাটির তলায় থাকে।'

তা কে শোনে কার কথা। পা আছড়ে ও চেঁচিয়েই চলল:

'চুপ করো তুমি! ইঁদুরেরা উড়তে পারবে না—না—।' এই লোকগুলো নিশ্চল হ'য়ে ব'সে যখন মারাকুয়েভের কথা শোনে ওদেরও কেমন চামচিকের মতো লাগে ওর। ঠিক সেই রকম চুপ্‌ চাপ স্থির, তেমনি ভুতুড়ে, তেমনি দিন-কানা। অন্ধকার চিলেকোঠার কোণায় ঘুপ্‌সিতে, গাছের খন্দ-খোড়লে হেঁট-মাথা হয়ে ঝুলে-থাকা উড়ুক্কু ইঁদুরের মতোই।

লিদিয়ার সেই ফিট্‌ফাট ঘরখানা—তার দশা কিনা আজ এই! খারাপ তামাক আর জুতোর কালির গন্ধ, ডীকনের জুতো থেকে বেরুচ্ছে...আলকাত্‌রার গন্ধ, সাদা-চুল ছেলেটার মাথায় পমেডর গন্ধ, আইকন-চিত্রকর ওদিনৎসভের গায়ের পচা-ডিমের গন্ধ—এমনি সব পাঁচমিশেলী বদ্‌গন্ধে রি রি করছে ঘরটা। মানুষগুলির ভারী নিশ্বাসে ঘরের হাওয়া গুমট্‌, বাতিটাকে অবাধ ফিকে লাগছে। কেমন যেন একটা হাল্কা নীল ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে। তারই মধ্যে হাত নেড়ে নেড়ে মারা-কুয়েভ মুহুর্মুহুঃ আওয়াজ তুলছে: 'জন-গণ!' জন-গণ!

যেখানেই সুবিধে পাচ্ছে তাক্‌ ক'রে ওই কথাটা লাগিয়ে দিচ্ছে হুংকার ছেড়ে।

মোটা কাপড়ে পরদা-ঢাকা জানালাটার ডান দিকে ছিল মারাকুয়েভ। চুলগুলোকে এক ঝট্‌কায় সরিয়ে দিয়ে, মুঠো হাতটা ওপরে তুলে আস্ফালন করতে করতে তড়াক ক'রে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে ও। যেন কথার নেশায় ও মাতাল হয়েছে; মাতালের মতো দুই চোখ ওর ঘুরছে। খানিকক্ষণ হাঁপায়, জোরে জোরে হাত ছোড়ে, তারপর একেবারে স্থির নিশ্চল হয়ে যায় যেন ক্রুশ-বিদ্ধ হয়েছে। পাকা রুশ চেহারা, চমৎকার দেখতে—রূপ কথার বীর-কুমারের মতো। এমন জোর দিয়ে কথা কয় যে মন না দিয়ে পারে না ক্লিম। ওর হিংসে হয়, কথার মধ্যে এত জোর পায় কোথায় মারাকুয়েভ? কোত্থেকেই বা জোগায় এত রকমারী কথা, এত রকমারী ভাব—কখনও রাগ, কখনও দুঃখ, আশা, অহংকার, অভিমান। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে এসব। কিন্তু এহ বাহ্যঃ। এ-সব কিছুর ওপর রয়েছে ওর গভীর মানব-প্রেম। বিশ্বাসের অগ্নি-শিখায় প্রদীপিত অন্তরের আলোয় আশ্চর্য রকম ভাস্বর ওই মুখখানার দিকে তাকিয়ে এ মানুষটির আবেগকে আজ অবিশ্বাস করতে পারল না ক্লিম। করবার সাহস হ'লো না। পরে, নিজের মনে মনে এ আগুনকে ও আখ্যা দিয়েছিল 'নিশানী আলো', আর ওর বক্তৃতাকে আতস বাজী।

টান হ'য়ে ব'সে গভীর আগ্রহে মারাকুয়েভের কথা শোনে লোকগুলি। সাদা-চুল ছেলেটি হাঁ ক'রে শুনছে: ভয় আর বিস্ময়, ওত-প্রোত হচ্ছে ওর চোখে। চেয়ারের একধারে ধার ঘেঁষে অদ্ভুত ভাবে ব'সে আছে পাবেল ওদিনৎসভ—শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া, মাথা উঁচু; বক্তার মুখের বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জনার দিকে স্থির হয়ে আছে ওর ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টি—নেশার, না, ঘুমের, কে জানে। ফোমিন দুই হাতের মধ্যে হাঁটু রেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নীচের দিকে ওর পায়ের কাছে যেখানে বরফ গলে জল জমে আছে।

গোমরা-মুখো ভারাক্‌সিনের চওড়া কাঁধের ওপর হাত রেখে পরম আয়েসে দীভানে দেহ এলিয়ে কান খাড়া ক'রে আছে দুনায়েভ—মারাকুয়েভ যেন অনেক দূরে। ক্লিম লক্ষ্য করে ওরা দু'জনে কি যেন কানাকানি করছে। এমন কি যখন মারাকুয়েভ অত্যন্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছে তখনও ওরা থামে না। ভারাক্‌সিনের মুখ কঠোর; রাগে তার গোঁফ কাঁপছে। ফোমিন ওদের থামাতে চেষ্টা করে হুঁটু আর কনুয়ের গুঁতো দিয়ে। দুনায়েভ ফোমিনের দিকে চেয়ে উল্লসিত ভাবে চোখ মিট্‌মিট্‌ করে।

সামঘিনের সন্দেহ হয় যে ওই হাসি-মুখ শয়তান দুনায়েভটা ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারছে না মারাকুয়েভের প্রচারধর্মী বক্তৃতাগুলি কি সাংঘাতিক। দুনায়েভের চেয়ে ডীকন কম হ'লেও প্রায় পোনের বছরের বড়, কিন্তু ওর কাছে সে যেন নেহাৎ ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষের প্রতি যেমন হয়, ডীকনের প্রতিও ওর ব্যবহারটা তেমনি সহৃদয়তা-মিশ্রিত কৌতূহল আর প্রশ্রয়ের। পায়রা আর চড়াইরা যেমন মন্দা টার্কীকে বিশ্বাস করে না, ঠিক সেই রকম এই শীর্ণকায় বৃদ্ধকেও বিশ্বাস করে না কেউ। সকলেই ওর সম্বন্ধে অত্যন্ত হুঁশিয়ার। আর যার সঙ্গে ওর যে সাদৃশ্য থাকুক না কেন, সব চেয়ে বেশী রয়েছে বাদুড়ের সাথে। ও ঠিক যেন একটা মস্ত বড় বাদুড়।

*

আরেক দিনের কথা। মারাকুয়েভ বক্তৃতা শেষ ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে বসেছে। ডীকন তার দীর্ঘ দেহটাকে টান ক'রে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল, যেন গির্জার বেদী থেকে বলছে:

'ধর্মযাজকের পদ থেকে আমি খারিজ হয়েছি, তার জন্য আমার বিন্দু মাত্র দুঃখ নেই। কিন্তু তবু আজ আমি ধর্মযাজক হিসেবে, আর যে-ছেলে মানুষকে ভালোবেসে প্রাণ দিয়েছে তার পিতা হিসেবে জোরের সঙ্গে আপনাদের বলছি যে, এই মাত্র যা-বলা হ'লো সব সত্যি। আপনারা শুনুন ভালো ক'রে।'

গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার আরম্ভ ক'রল গভীর গম্ভীর স্বরে:

'প্রাচীন কালে যে-সমস্ত জিনিষ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছিল, কালক্রমে মুষ্টিমেয় কয়েক জন তা ছলে বলে কৌশলে নিজেদের কুক্ষিগত ক'রে নিতে লাগল। কিছু লোকের নিজেদের অলস জীবনকে কায়েম রাখার জন্য প্রয়োজন হ'লো দাসের। তাই অন্য সকলকে দাসত্বের বোঁড়ি পরাল তারা। ক্রমে ক্রমে জীবন ধারণের অপরিহার্য যাবতীয় উপকরণ, সঙ্গে সঙ্গে জমি পর্যন্ত তাদের দখলে এসে পড়ল। নিজেদের লোভ ও লালসা চরিতার্থ করবার জন্য এদের হাতে চরম অপব্যবহার হ'তে লাগল এই সমস্তের। অন্যায় আইন তৈরি ক'রল তারা। এবং সেই আইনের রক্ষা-ব্যূহের আড়ালে থেকে ঘৃণা আর হিংসার পথে চলল তাদের শোষণ।'

শপথ গ্রহণের ভঙ্গিতে হাত উঁচু ক'রে ব'লে চলল ডীকন:

'যা বলছি সব অমোঘ সত্য। এর একটিও আমার কথা নয়। এ বাণী উচ্চারিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছিল আজ হ'তে দেড় হাজার বছর আগে খৃষ্টীয় চার শতকে খৃষ্ট ধর্মের প্রধান যাজকদের অন্যতম ঋষি লাকতানতিউস্-এর শ্রীমুখ হ'তে। লাকতানতিউস্ খৃষ্ট ধর্মের "সিসেবো"-আখ্যা পেয়েছিলেন। তাঁর যে সমস্ত লেখা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সেইন্টপিটর্সবুর্গ থেকে ছাপা হ'য়ে বেরোয়, তাতেই আছে আমি যা বললাম সেসব। সেন্সরের হাত থকে বইগুলি রীতিমত পাশ হয়। এবং এ বইখানা কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরীক্ষিতও হ'য়েছিল এবং জন-সাধারণের পাঠ্য বলে অনুমতিও পেয়েছিল। অবশ্য ভুল ক'রে। আমাদের শাসকগোষ্ঠি এমনি ভুল করেই জীবনে সত্যের প্রবেশ পথ খুলে দেয়।'

স্বর আরো খানিকটা তুলে বলে:

'আমি আবার বলছি, যা বললাম তা আমার কথা নয়। তা এক সনাতন শাশ্বত সত্য। এস ভাই সব, সর্বশক্তি দিয়ে জীবন পণ ক'রে, বীরের মতো সংগ্রাম ক'রে সেই সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ক'রবো আমরা।'

কুঁজো হ'য়ে ব'সে পড়ে ডীকন। ভারাকসিনের দিকে তাকিয়ে চোখ মিচ্‌কিয়ে দুনায়েভ্ বলে:

'আচ্ছা, এই লাকতান্‌ৎসেভ্ নিশ্চয় মার্ক্সবাদী ছিল। না?'

'ছিল তো কি হয়েছে? তার মানে মার্ক্স-এর জন্মের পোনের শ' বছর আগেই তা জানা গিয়েছিল।'

'তা, ফাদার, এখন এসব কাজে লাগানো যায় কি ক'রে? কাজে লাগানো!'

বলতে থাকে দ্যুনায়েভ তেমনি চোখ টিপে টিপে।

গম্ভীর স্বরে জবাব দেয় ডীকন:

'পথ! পথ তোমরাই ঠিক ক'রে নেবে।'

একটু ন'ড়ে চ'ড়ে মোটা গলায় বলে ওঠে ওদিন্‌ৎসভ্:

'হাথিয়ার চাই। কোথায় পাব হাথিয়ার?'

ঠিক যেন এক্ষুণি ঘুম ভাঙ্গল এমনি ভাবে চোখ পিট্ পিট্ করে ও। ওর চোখগুলি কেমন অনিদ্রা রোগীর মতো। সাদা চুলওয়ালা ছেলেটি কর্ণ-পটাহ বিদারী ভেরী নিনাদের মতো আওয়াজ তুলে নাক ঝাড়ে এবং লজ্জা পেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকে।

বিশ্রমের পর মারাকুয়েভ আবার বলতে উঠলে শ্রোতারা সোজাসুজি মুখ ঘুরিয়ে ব'সল। স্পষ্টই বোঝা গেল ডীকনের বক্তৃতার ওপর ওদের বিন্দু মাত্র আগ্রহ ছিল না। খুশিই হ'লো ক্লিম।

হাতটাকে কাত ক'রে যেন শূন্যকে চোপাতে চোপাতে মন্দ্র কণ্ঠে আওয়াজ তোলে মারাকুয়েভ:

'আমাদের সংগ্রাম ক'রতে হবে আমাদের সংগ্রামিক অধিকার এবং মানবিক অধিকার রক্ষার অধিকারের জন্য। মার্ক্সবাদীরা বলে চাষীদের কারখানায় পাঠাতে হবে। কারখানা-রূপী পাত্রে তাদের দমে সেদ্ধ ক'রতে হবে।'

সাদা-চুল ছেলেটির পাশে ডীকন ব'সেছিল। সেখান থেকে উঠে এসে ডীকন পরুষ ভাবে ব'লে উঠল:

'এর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।'

মার্ক্সবাদীদের সমালোচনা শেষ ক'রে মারাকুয়েভ যারা বিদায় নিচ্ছিল তাদের সঙ্গে করমর্দন করে, তারপর ডীকনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই সে ওকে দেয়ালে চেপে ধ'রে গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিতে শুরু করে:

'কমরেড পিটার, ওই খ্যাঁদা-নাক লোকটাকে ব'লে দিও, সবতাতে অত কৌতূহল কেন ওর? কে, কোত্থেকে, কেন, হেন, তেন,—অত খবরের দরকারটা কি ওর? ও কি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করবে ব'লে লিষ্টি তৈরি করছে? আচ্ছা আসি, আবার দেখা হবে।'

কুঁজো হ'য়ে বেরিয়ে যায় ডীকন। ক্লিম আর মারাকুয়েভ গেল ভারভারার ওখানে, চায়ের নিমন্ত্রণ আছে।

'আমার মতে বিপ্লবী হচ্ছে কবি ইউরিয়েল...একটা বিশেষ প্রমিথিউসের অগ্নির বাহক। ডীকনকে দেখছি পেয়ে গেছ তোমরা।'

সুপক্ষল চোখ দু'টিতে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি টেনে এনে বলে ভারভারা। ক্লিমের বিশ্বাস চোখের ওই দৃষ্টিটা ভারভারার ছলনা।

মারাকুয়েভ হেসে বলে:

'বোকার মতো কথা হ'লো যে।'

ওকে মনে করিয়ে দেয় মারাকুয়েভ পেঞ্জার পুরোহিত ফোমা—যিনি পুগাচেভের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন—তাঁর কথা, পুরোহিত হাবক্কিজর কথা। জার্মানীর কৃষক-বিদ্রোহের সমসাময়িক যাজকরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার আরও বিবরণ দিতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু থামিয়ে দিল ভারভারা।

'আমাদের ডীকনকে দেখলেই আমার হাসি পায়। আর ওই যে আর একজন, কি নাক রে বাবা! ওর পাস্-পোর্টে বিশেষ চিহ্ন হিসেবে নিশ্চয় নাকটাই দেখান

আছে। ওই নাকের জন্যই ও টিকটিকিদের নজরে প'ড়বে।'

আবার হেসে উঠল মারাকুয়েভ। ক্লিম বলল:

'তা যা বলেছে, বিপ্লবীকে নৈর্ব্যক্তিক হ'তে হয়।' ঠাণ্ডা কণ্ঠেই বলল, কিন্তু অত্যন্ত বিষণ্ণ শোনাল কথাটা।

তর্ক করার জন্য কোমর বাঁধে মারাকুয়েভ। ক্লিমের কথার জের টেনে বলে:

'মার্ক্সবাদের গন্ধ ছাড়ছে যে!'

ক্লিম জবাব না দিয়ে চায়ের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল দেখে মারাকুয়েভ হাত কচলাতে কচলাতে বলল: 'রাশিয়া জেগে উঠেছে।'

তারপর মাথা দোলাতে দোলাতে 'বেগে'র কবিতার দু'টি লাইন আওড়াল:

'পবিত্র সে রুশ দেশে পোহায় শর্বরী,
ঐ শোন ডাকে কাক আনন্দে শিহরি।'

ক্লিমের ইচ্ছা হ'লো জিজ্ঞেস করে—তাহ'লে কি এতদিন দেশটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল? কিন্তু থেমে গেল মারাকুয়েভের প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে। বুঝল কবিতার কাকের দল যাই করুক, এই কাকটির মনে কোন সংশয় ঠাঁই পাবে না।

মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে দিল ভারভারা। কণ্ঠমণিটা উঁচু হ'য়ে উঠল পিণ্ডের মতো। খ্যাপানোর সুরে বলতে লাগল ও:

'কি জানি। হয়তো রাশিয়া সত্যি জাগছে। কিন্তু পিটার তুমি তোমার ছাত্রদের সম্বন্ধে যে ভাবে কথা বলো, আমার কিন্তু হাসি পায়, বাপু। আমার কাকা ক্রিসানফ ঠিক অমনি ক'রে তাঁর মাছ ধরার গল্প বলতেন। যত বড় বড় মাছ, সব নাকি বড়শী ছিঁড়ে পালিয়ে যেত। বাড়ি আসতেন দু'চারটে কাঁটা-ওয়ালা চুনো পুঁটি নিয়ে। কি বিচ্ছিরি খেতে!'

মারাকুয়েভ নিশ্চয় চটছে। ওর চটা মুখখানা দেখবার আশায় সামঘিনের চোখে কৌতুক খেলে যায়। কিন্তু হাঃ হাঃ ক'রে দরাজ হাসিতে ফেটে পড়ে মারাকুয়েভ।

*

সে-দিন রবিবার। ভারভারাদের বাড়ি গেল ক্লিম। ডীকন এসে জুটেছে আগেই। মারাকুয়েভও আছে। কথা হচ্ছিল লাভ্রভ্-এর লেখা—"ঐতিহাসিক পত্রাবলী" বইখানা নিয়ে। মারাকুয়েভ বইখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে রীতিমত বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে। চায়ে একটু একটু ক'রে চুমুক দিতে দিতে মনোযোগী ছাত্রের মতো চুপচাপ শুনছিল ডীকন। মারাকুয়েভের কথা শেষ হলে শূন্য গেলাসটা সরিয়ে রেখে মোটা গলাটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম ক'রে বলল:

'একটু বড় হলাম আর তার পরেই তো পাদ্রী-গিরির ত্যালিম সুরু হলো। সেই থেকেই কেতাবী বিদ্যের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। তাই ব'লে বই পড়িনে তা নয়, নভেলটা-আসটা পড়ি মাঝে মাঝে। ভালোই লাগে। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে বই হচ্ছে ক্র্যাচ্-এর মতো। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মত। আমার মতই ঠিক তা আমি বলছি নে। কিন্তু দেখনা—অপকর্ম ক'রে ক'রে ইহকাল পরকাল তোমার ঝর্ ঝরে হয়ে গেল—তারপর হলো কি না—একখানা বাইবেল তোমার হাতে ঠেকিয়ে দেওয়া হলো। বাস, আর চাই কি তোমার! অর্থাৎ কি না—বাছা আমার, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তোমার জন্য রাস্তা একেবারে শান বাঁধিয়ে রেখেছি। এই বইখানায় ভর দিয়ে

চলে যাও—কুছ পরোয়া নেই।—তাই তো চলছি আমরা হাজার হাজার বছর ধরে। কিন্তু চলেছি ভুল রাস্তায়। সব বই ভালো ক'রে দেখে নেওয়া চাই। বাজে বইও। যাকে বাজে বই বলো তোমরা, তার মধ্য থেকেই তা বেশ চাট্ চাট্ গন্ধ ছাড়ে। বেশী চাটাই তে হয় কি জানো! দেবতার সৃষ্টি তো মানুষের আনন্দের জন্য হয় নি, হয়েছে তাদের কষ্টের জন্য। কিন্তু ওই চাটাইতে দেবতার স্বার্থে মানুষের মনটা পিষে মারা যায়।'

কেন জানি খুশি হয়ে ওঠে ভারভারা। জিজ্ঞেস করে:

'আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না?'

'না। পৃথিবীতে এত পাপ, কিন্তু তবু যে-দেবতা নিজেকে ন্যায়-পরায়ণ বলে পুজো পেতে চান, তাকে আমি বিশ্বাস করিনে। বরঞ্চ প্রকৃতিকে বুঝি—কারণ প্রকৃতি স্বয়ংসিদ্ধা। তার জন্য প্রমাণের দরকার নেই। ডারউইন প্রমাণ ক'রে দিয়ে গেছেন এ কথা। ভগবান আর পাপের সহ-অস্তিত্ব যে সম্পূর্ণ সম্ভব তা লাইব্নিজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। "বুক্ অব্ জব্"-এ যে তার অকাট্য প্রমাণ আছে, তাও তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লাইব্নিজ হচ্ছেন জার্মানীর একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। সত্যকে তিনি অন্তরে পাননি। পেয়েছিলেন হাইনরিক হাইম—যাঁর ভাষায় "বুক্ অব্ জব্" হচ্ছে একটি "সংশয় বাদ"-এরই মহাকাব্য।'

ফুস্‌ফুস্ কানায় কানায় ভরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডীকন। ওর জলো চোখ দুটো ভয়ংকর ভাবে বেরিয়ে আছে, আর একটা সাদা যেন ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে।

'আমার যে ছেলে মারা গেছে, সে ছোট এক খানা বই লিখেছিল। তাতে সে লাইব্নিজের মত এবং ঈশ্বরের পূর্ণতা নিয়ে যত রকম মতবাদ সব পাষণ্ডিক, এবং যা কোন মতেই আপোষ-যোগ্য নয় তারই সাথে আপোষের একটা ঘৃণ্য চেষ্টা ব'লে প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দিয়ে গেছে।'

সামঘিন লক্ষ্য করে যে ডীকনের এই ব্রহ্মতত্ত্বের কচকচানিতে মারাকুয়েভও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ও বসে বসে অস্থির ভাবে টেবিলে টোকা মারছে আর শিস দেবার মতো ক'রে ঠোঁট কোঁচকাচ্ছে। ভারভারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিল এতক্ষণ। এবার দার্শনিকের দিকে ও তাকাল চোখ তুলে। ওর দৃষ্টিতে অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ। ক্লিমের কানে কানে বলল: 'বাপরে, কি হিংস্র মুখ!'

ডীকনের ভ্রূক্ষেপ নেই। মোটা গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে চলেছে অরমুজদ আরিমন্দ্ আর বাল-এর কথা—যেন ঢাল বেয়ে ছুটছে গোঁ ধ'রে।

'যে-সব জিনিসকে আমরা খারাপ বলি, তার বেশীর ভাগই হচ্ছে মন্দের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ঘৃণা-প্রসূত প্রতিরোধেরই রূপ।' ডীকন বলে।

হঠাৎ নিঃশব্দে দুয়ারে এসে দাঁড়াল দিওমিদফ। বাধা পড়ল বাক্য-স্রোতে। টুপীটাকে দুই হাতে দোমড়াতে দোমড়াতে অপাঙ্গে চারদিকে তাকাতে লাগল দিও-মিদফ—যেন নতুন জায়গায় এসেছে নতুন মানুষের মধ্যে। সব যেন অচেনা মুখ। মারাকুয়েভ শুধু খুশি নয়, উচ্ছ্বসিত। ওর গলায় জোর এল। ডীকন ঘাড় বাঁকিয়ে একবার দিওমিদফের দিকে তাকিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে উঠল:

'আচ্ছা!'

বলার ভঙ্গিতে মনে হ'লো যেন যতি-চিহ্ন টানা হলো।

নিঃশব্দে দিওমিদফের সঙ্গে করমর্দন ক'রে ডীকনকে জিজ্ঞেস করে ক্লিম: 'আপনি লিউতফের ওখানে গেছেন কখনও?'

'খাই বই কি, তবে খুব বেশী নয়।'

'মদ-টদ খায় এখন ও?'

'প্রচুর। আমার ছেলেটা মারা যাবার পর আমি কি রকম আর মদ ছুঁতেই পারি নে। ও নিজে মদ খায় কিন্তু আমায় অপমান করতে ছাড়েনি। ডেকে নিয়ে বলে কিনা—চাকরের কাজ কর এখানে। পাদ্রীগিরি গেছে বলে কি ঘুঁটে কুড়োব? এপ্রিল মাস থেকে কাচের কারখানায় একটা কাজ পেয়ে যাচ্ছি।'

ডীকনের প্রতি সৌজন্যের দায় সারা হয়েছে। এবারে ক্লিম ফিরল দিওমিদফের দিকে—নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল মানুষটাকে।

মাথায় দেবদূতদের মতো বাবরি চুল রেখেছে দিওমিদফ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, চমৎকার চুল হয়েছে কিন্তু ওর নীল চোখ দুটির দীপ্তি ম্লান হয়ে গেছে। সব জড়িয়ে ওর সে জলুষ আর নেই, রঙ-ছুট চেহারা। ভরা মুখখানা শুকিয়ে লম্বা হয়ে পীতাভ সূক্ষ্ম লোমে ঢেকে গেছে। কথা বলার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় আলাপকারীর দিকে, দীর্ঘ পক্ষগুলি কাঁপে থির থির ক'রে; ওর চোখ দেখে মনে হয় তাকাতে তাকাতে যেন ওর দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। বারে বারে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলে: 'হাঁ, কি যেন বলছিলে?'

ক্রমশঃই গলার স্বর ওপরে ওঠে—কথা বলে, যেন বই পড়ছে। এমন ভারে সোজা হয়ে বসে আছে এক্ষুনি যেন ওর উঠবার হুকুম আসবে।

ভারভারা এক দিন জানাল যে ওর নিজেরই অসাবধানতার সুযোগে দিওমিদফ্ সেদিন লিদিয়ার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মারাকুয়েভের সভা চলছিল তখন তার ছাত্র-দের নিয়ে। ঢুকেই ঠাস ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এল। পরে একদিন রেগে জিজ্ঞেস করেছিল ভারভারাকে:

'কেন এদের সব ঢুকতে দাও এখানে। সিগারেটের ধোঁয়া আর ছাইয়ে সব একাকার ক'রে রেখে যাবে, আর ঢোকা যাবে ঘরে?'

আর একদিন ঘরের ছবিগুলো দেখে জিজ্ঞেস করেছিল:

'লিদিয়ার ছবি কোথায়?'

ভারাভারা জবাব দিয়েছিলে, লিদিয়া তো এখনও বিখ্যাত হয়নি। শুনে বলে-ছিল দিওমিদফ:

'বিখ্যাত প্রখ্যাতদের দিয়ে কি হবে? পুলিসের মতো ওরা শুধু মানুষের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আবার বলেছিল: 'কে জানে, হয়তো লিদিয়া একদিন বিখ্যাত হবে।'

এক গেলাস দুধ খেয়ে, গালে এক ডেলা চিনি ফেলে হলদেটে ছোট্ট গোঁফ জোড়া-টিকে এমনভাবে ঘষতে লাগল দিওমিদফ্ যেন মুছেই ফেলবে গোঁফ-জোড়া। তারপর ব'সে ব'সে মারাকুয়েভ আর ডীকনের কথা শুনতে শুনতে যেন ধমকেই উঠল:

'এখনও ওই কথা চলছে! হায় ভগবান্। এখনও বুঝতে পারছ না যে আমরা পরস্পরকে ভুলিয়ে কেবলি বাঁধবার চেষ্টা করি, হয় পরিবারের মধ্যে, নয় কোন সম্পর্ক দিয়ে, নয়তো জোট পাকিয়ে। যত গোলমাল তো এইখানে। তোমার চাট বল, পার্টি বল, ওখানে কারোর হাত চলে না—'

'ফের সিমিওন্!' ধমকে আধপথে থামিয়ে দেয় ডীকন: 'এখনও ভেদবাদীদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করছ? তার চেয়ে বরং বেশী ক'রে দুধ গেলো গে, কাজে লাগবে।'

রাগে আগুনের মতো দপ ক'রে জ্বলে উঠল দিওমিদফ। ওর মুখটা সাদা হয়ে গেল, চোখে ঘন ঘন ভ্রূকুটি খেলতে লাগল। মাথাটা ক্রমাগত ঝাঁকাতে লাগল। এত রাগতে ওকে আল্ল দেখেনি কখনও ক্লিম।

ডীকনের দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে কর্কশ গলায় চিৎকার ক'রে উঠল দিওমিদফ: 'ঐক্য? একজনকে নিয়ে নাকি?'

মুখখানাকে অন্ধকার ক'রে জবাব দেয় ডীকন:

'আঙুলগুলোকে ছড়িয়ে রেখে তো আর টুঁটি টিপে ধরা যায় না!'

'বহুর মধ্যে ঐক্য হয় না। কখনও হবে না। হবে না, হবে না। মিছিমিছি নিরীহ মানুষগুলোকে পাপের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।'

মারাকুয়েভ হেসে উঠল; ভারভারার স্মিত হাসি মুছে গিয়ে ফুটে উঠল শ্লেষ আর বিরক্তির হাসি। দিওমিদফ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, চেয়ারটাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই হাতে বুক চেপে ধরল। হঠাৎ সামঘিনের বড় কষ্ট হলো দিওমিদফের জন্য। উত্তেজনায় দিওমিদফের মুখ থেকে যেন বন্যা ছুটতে লাগল:

'সে-দিন কয়েদীদের খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল স্টেশনে। ঝন্‌ঝন্‌ করে তাদের শেকলগুলো বাজছিল। তুমিও লুকিয়ে লুকিয়ে শেকল বানাচ্ছ—মানুষের আত্মাকে ঐ শেকলে বাঁধবে।'

'কি সব আজেবাজে বকছ!' রেগে চিৎকার করে ওঠে মারাকুয়েভ। দিওমিদফ এক ঝটকায় টেবিলের কাছ থেকে সরে গিয়ে হন হন করে দরজার দিকে চলল। দোরের কাছ থেকে আগুন-চোখে ফিরে তাকিয়ে বলে গেল:

'মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে এ ঘোর পাপ! এর জন্য অনুতাপ করতে হবে!'

'ওঃ, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে একেবারে!' দিওমিদফের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ডীকন বলে। ভারভারার মুখে অন্ধকার নেমে এল। গেলাসটা ওর দিকে সরিয়ে দিল ডীকন। ভারভারা বলল:

'সর্বক্ষণ বেচারাকে অমন করে খ্যাপান উচিত নয়।'

'কারণ নিশ্চয়ই আছে।' জবাব দেয় ডীকন। রাগে গর্‌ গর্‌ করতে করতে কানের কাছের ছেঁটে-ফেলা দাড়ির গোছার জন্য সারা গাল হাতড়াতে লাগল। বিরক্ত হয়ে মারাকুয়েভ ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। ডীকন ওর দিকে ফিরে বলল:

'দেখ এতদিন তোমায় বলিনি। কিন্তু আজ বলব। ও-লোকটা বাইরেই অমন-তরো মেনীমুখো দেখতে। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিন্ত থেকো না। সাংঘাতিক মানুষ ও। একটু ভীতু গোছের, কিন্তু মানুষকে ও যাদু করতে পারে। সাধারণতঃ হাঁ...ধন্যবাদ ওকে...ওরই মতো একটা তুচ্ছ কীটের জন্যই আমার ছেলেটা নাহক কষ্ট পেল।'

*

আগাগোড়া ডীকনের ব্যবহার, বিশেষ ক'রে ওর ওই কর্কশ ভাষায় সামঘিন গরম হ'য়ে উঠল। ওর ইচ্ছে হ'তে লাগল খুব কড়া জবাব দিয়ে শেষ ক'রে দেয় লোকটাকে।

কিন্তু আবার বলতে আরম্ভ করে ডীকন:

'দিন দশেক আগে পাগলটা আমার বাড়িতে এল। খুব বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগল যাতে শ্রমিকদের মধ্যে বক্তৃতা-টক্তৃতা আর না দিই। আর বুঝলে কমরেড

পিটার, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমায় ও যেন ও-পথ ছাড়াবেই। ওর মনের গতিকটা কি, প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারিনি বলে গম্ভীর ভাবেই আলোচনা করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করল কি, একেবারে হাঁটু গেড়ে পায়ের কাছে ব'সে পড়ল; আর কেঁদে ককিয়ে, চোখের জলে ভেসে ওই কথাই বলতে লাগল। বিশ্বাস কর আর না-কর, মাতাল স্বামীকে মদ ছাড়াবার জন্য তার বৌ হয়রান হয়ে গিয়ে যেমন ক'রে মাথা কোটে ঠিক তেমনি। সেই একই কথা। এই যে ন্যায়ের দাবীতে মানুষকে এককাট্টা করা হচ্ছে তাতে নাকি মানুষ জাতই ধ্বংস হয়ে যাবে। রীতিমত চ্যাঁচাচ্ছিল—বিপ্লবীদের ধরে ধরে নাকি জ্যান্ত পুড়িয়ে ছাইগুলো আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া উচিত, জার দিমিত্রি —যাকে লোকে বুজরুক বলত তার বেলা যেমন করা হয়েছিল।'

অত্যাধিক উত্তেজনায় ডীকনের কপাল আর গাল বেয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরতে লাগল; চোখ দুটো কাঁপতে লাগল যেন বেরিয়ে আসবে।

'কি বিশ্রী মুখ!' মনে মনে বলে সামঘিন।

চাষীরা যে রকম কোট পরে সে রকম একটা কোট পরা ছিল ডীকনের। আল-খাল্লার মতো সাদা রঙের ধর্মীয় পোশাক ক্যাসক্-এর ওপরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোটের এদিকের পাল্লাটা অন্যটার ওপর তুলে দিয়ে ডীকন আবার বলতে লাগল। স্বরটা গাঢ়:

'আমায় যেন আগাপাশতলা ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল ও। রাত্তিরটা রইল আমার ওখানেই। সারা রাত প্রলাপ বকল বিকারের রোগীর মতো। ভোরের দিকে ধাতে এল। ক্ষমা টমা চাইল। কিন্তু...'

পিয়ানো বাজাবার মতো ক'রে টেবিলের ওপর হাত রেখে আর স্বরটাকে যথাসাধ্য কোমল ক'রে ব'লে চলল ডীকন:

'কিন্তু ভাবো দেখিনি একবার। ভয়ের চোটে আবার যদি অমনি বিকার হয়। কে জানে হয়তো সোজা পুলিসের প্রাদেশিক প্রশাসনিক দপ্তরে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়বে...।'

মনে মনে হাসতে লাগল সামঘিন। ডীকনের কথা শুনে মারাকুয়েভ যে পরিমাণ উত্তেজিত হ'য়ে উঠল তা দেখবার মতো। ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে এক হাতে মাথার চুল টানতে, আর এক হাতের আঙুলগুলো মট্‌কাতে লাগল মট্ মট্ ক'রে। সারা মুখখানা কুঁচকে ঝিম্ ধ'রে রইল। গুন গুন ক'রে বলল:

'চুলোয় যাক্। কিন্তু এসব কি কাণ্ড! তুমি বলোনি কেন কিছু?'

ক্লিমের দিকে তাকিয়ে ভারভারা জোর গলায় বলে উঠল:

'আমাদের যে রাঁধুনী আছে তার সঙ্গে বেজায় খাতির পুলিসের...'

দূরের জিনিস দেখবার মতো ক'রে চোখের ওপর হাত রেখে ভারভারার দিকে তাকাল ডীকন। তারপর বলল:

'ও সব রাধুনী-টাধুনীর কাজ নয় এবার। আমাদের আড্ডার জায়গাই বদলাতে হবে।'

ক্লিমের নজরে পড়ে ভারভারার একটুও ভাল লাগছে না। বেশ খুশি হ'য়ে উঠল ও। ডীকন ও মারাকুয়েভের কথা শুনতে শুনতে প্রায়ই ও নাক সিঁটকিয়ে আর যেন খারাপ গন্ধ পাচ্ছে এমনি ক'রে নাকের সরু ছেঁদা দুটো টানতে টানতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দেখলে মনে হয় যে ওর মুখ-ভঙ্গির দিকে ক্লিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ইচ্ছে করেই অমন করে। মারাকুয়েভ বিশেষ ভাবে গরম গরম কিছু বললে ও আস্তে আস্তে টিপ্পনী কাটে: 'ব্যর্থ গণপ্রেমে বুকের প্রদাহ হয়।' সামঘিনের যেন অস্পষ্ট

মনে পড়ে, কথাটা ওর পরিচিত। ভিক্তর ব্যুয়োরিনের কোন রস-রচনায় পড়ে থাকবে।

ফেরার পথে চলতে চলতে সামঘিনের মনে হয়, মারাকুয়েভ ধরা পড়ল বলে। ভারভারাও হয়তো পরিত্রাণ পাবে না। ধরা প'ড়লে হয়তো ও বিপ্লবীদের আরো কাছে আসবে। এমনি করে নিজেদের অজ্ঞাতসারে বিপ্লবীরা দরদী আর সাহায্য-কারীর সংখ্যা বাড়ায়। এলিজাবেথা স্পিভাকের বেলায়ও হয়তো এই হয়েছে।

সামঘিনের সমস্ত কৌতূহল যেন পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। ও ঠিক করল ভারভারা-দের ওখানে আর যাবে না।

নির্জন অন্ধকার রাস্তা। ডীকন এসে ধরল পেছন থেকে। নমস্কার ক'রে নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে যেন বাতাসের প্রতিকূলে হাঁটছে এমনি ভাবে ঝুঁকে পড়ে ওর পাশে পাশে চলতে লাগল। হঠাৎ সোজাসুজি জিজ্ঞেস ক'রে বসল:

'স্তেতপান কুতুজভের খবর রাখেন নাকি কিছু?'

বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সামঘিন। তারপর পা চালিয়ে দিল। হাঁটতে হাঁটতে বলল: 'কুতুজভ গ্রেপ্তার হয়েছে।'

কিন্তু ডীকনের হাত ছাড়ায় সাধ্য কি। চলতে চলতে তীক্ষ্ম অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে চেয়ে বলে ডীকন:

'জামিনে খালাস হয়েছে।'

'সে এখন কোথায় আছে আমি জানি না।' কোন মতে জবাব দেয় সামঘিন।

পালাবার পথ খোঁজে ও। চারদিকে তাকায়। ধারে-কাছে একটা গলিটলিও দেখা যায় না। ডীকন বকেই চলেছে:

'বেশ, বেশ।—পুড়িয়ে মারো, আর আঁস্তাকুড়ে ছাই ফেলে দাও—শোনেন নি! ওদিকে কি রকম শিশুর মতো সরল দুটো চোখ! ডারউইন যা বলে গেছেন না—একেবারে অকাট্য। কি বলেন!'

মনে মনে যেন চিৎকার ক'রে উঠল সামঘিন:

'মূর্খ কোথাকার! এর মধ্যে আবার ডারউইন এল কোত্থেকে?'

কিন্তু বাইরে বলল: 'এক ভদ্রমহিলাকে জানি, ডারউইন ডারউইন ক'রে পাগল হয়ে গেছেন।' স্বরটা ভদ্র হলেও রুক্ষ।

মাথা নেড়ে সমর্থনের সুরে বলে ডীকন:

'তা তো হতেই পারে। আমাদের থিওলজীর ক্লাসে আমি সব সময় ডারউইনের বিরোধিতা করতাম। আমাদের প্রশ্ন আসত পরীক্ষায়, ডারউইনের যুক্তি খণ্ডন কর। তা করেছি বই কি।'

উত্তরের আশা না করেই সামঘিন জিজ্ঞেস করে:

'কুতুজভের কাছে আপনার কি দরকার?'

'আমার ছেলেও ঐ পথেরই পথিক ছিল...তা ছাড়া...'

একটা গলির মোড়ে এসে বলল সামঘিন:

'আচ্ছা আসি। এই দিকেই যাব আমি।'

ডীকন তার দীর্ঘ হাতখানা বাড়িয়ে দেয়। বাঁ হাতে টুপী খুলে শুভকামনা জানায়: 'কল্যাণ হোক।'

ঝির্ ঝির্ ক'রে সারাদিন বরফ পড়েছে। পথ-ঘাট, ল্যাম্প পোস্ট, বাড়ির ছাদ, সব কিছু যেন কান-ঢাকা নাইট্-ক্যাপ্ প'রে আছে। হাওয়ায় আশু-ফলা কাঁচ শসার রসনা-লোভন সুবাস। মার্চ মাসের প্রথম দিকের বরফী-মৌসুমে বিশেষ ক'রে

এ শংসা ফলে। ধীরে ধীরে চলতে চলতে সামাঘিন ভাবছিল:

'এরা আমাকে ওদেরই একজন মনে করে। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওরা কত বড় মূর্খ। ইচ্ছে করলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই নিতে পারতাম এদের মধ্যে। দিওমিদফ ওদের খবর পুলিসে দেবে না তো। ওর পক্ষে দেওয়াই তো উচিত। তা ভারভারার ওখানে আর যাচ্ছিনে।'

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মারাকুয়েভের শিষ্যদের ভিন্ন ভিন্ন চেহারাগুলি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ডীকনের মুখটাই সব চেয়ে বেশী বিরক্ত। সামাঘিন ভাবে, বেচারা বুড়ো হয়েছে। বুঝতে পারে না ওকে সকলে অবজ্ঞা করে। বোকা, তাই অমন করে। নইলে মারাকুয়েভের চাইতে ডীকন ওদের বেশী কাছের মানুষ হ'তো, তার কথা ওরা বুঝতেও পারত বেশী।

অবাক হ'য়ে ডীকনের কথা ভাবতে ভাবতে এই প্রথমবার নিজেকে সুধায় ক্লিম:

'মানুষটা তো হাড়ে মজ্জায় রুশ-যাজক। অথচ বিপ্লবীদের জন্য ওর অত দরদ! ঐ জন্যই কি এত বিরক্ত ও?'



কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছিল ক্লিম, প্রেইসের চোখ দুটিতে একটা বিশেষ আগ্রহের ভাব ওর জন্য। এই ফিট্‌ফাট্ ছেলেটিকে মন্দ লাগে না ওর। ওর মধ্যে আছে এক অনিহুদী-সুলভ আত্ম-প্রত্যয়; ওর বলবার সংক্ষিপ্ত, সুচিন্তিত, গোছান রীতিটিও তরুণ-সুলভ নয়। অনেক সময় অবাক হয় সামাঘিন ভেবে কিসের টানে এক টুপী-ওয়ালার ছেলে এসে ভিড়ল এই মার্কস-বাদ প্রচারের কাজে। মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে বচসা হয় প্রেইসের মারাকুয়েভের সঙ্গে। এক এক দিন অদ্ভুত কথা বলে বসে প্রেইস্:

'আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, হার্জেন নামে একটা লোক ছিল। এক গাছ-কাটা কুড়ুল নিয়ে সে জারকে মারতে উঠল একদিন। তারপর নিজের ব্যবহারে হলো তার অনুতাপ। নাকে কানে খৎ দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গদগদ হয়ে বলল— "হে গ্যালিলির বীর জয়ী, জয়ী তুমি, জয়ী হে। আমি যা করেছি তা প্রত্যাহার করছি।" কিন্তু ওই প্রত্যাহারের কাজটা নাকি কাঁচা কাজ হয়েছিল, সময়োপযোগীও হয়নি, তাই পরে আবার প্রত্যাহারকে প্রত্যাহার করতে হলো। কাঁচা কাজ করাই দেখছি নারোদনিকদের বৈশিষ্ট্য। তারা যে কৃষক-বিদ্রোহী পুগাচেভের প্রচার ক'রে বেড়ায় তাতেই এর স্পষ্ট প্রমাণ।'

প্রায়ই এই রকম জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে যায় প্রেইস্। যার ফলে ওর সম্বন্ধে সামাঘিনের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়।

একদিন এক সভার পর প্রেইস বলল সামাঘিনকে:

'চলুন না আমার ওখানে, একটু আলাপ-সালাপ করা যাবে।'

একটা কলরবহীন শান্ত রাস্তার ধারে একটা বাড়ির তেতলায় থাকে প্রেইস্। কাঠের তৈরি রাস্তাটা—খাস মস্কোরিই বৈশিষ্ট্য, নানা রঙের বাড়িগুলোর মধ্যে সদ্য-কলি-ফেরান ওই বাড়িখানাকে ফুলবাবুটির মতোই লাগে। ভারী ওক্ কাঠের দরজাটা পরিচারিকা এসে খুলে দিল। মেয়েটির অল্প বয়েস, সাদা এপ্রন আঁটা পরিপাটি করে আঁচড়ান চুলের ওপর লেসের টুপী। সামাঘিন ভেবেছিল প্রেইস্

নিজে যেমন ছিম্ ছাম্, তার ঘরখানাও তেমনি সাজান-গোছান হবে। ঘরখানা নেহাৎ ছোট একটা মাত্র জানালা। তার মধ্য দিয়ে ওদিকের একটা চালাঘরের চাল দেখা যায়। সারা ঘর বই দিয়ে ঠাসা। এক কোণে একটা খাটিয়া—সস্তার কম্বল একটা পাতা তার ওপর। মার্গারিটাদের বাড়ির মতো জলের গামলা রাখার একটা লোহার তেপায় রয়েছে দরজার কাছে। একদিকে ওই সুবেশা ফ্যাশান-দুরস্ত তরুণী পরিচারিকা। আরেক দিকে ঘরখানার এই রুক্ষ কঠোর বৈরাগ্যের চেহারা দেখে একটা নাম-না-জানা সংশয়ে আর ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সামঘিন।

চা নিয়ে এল অন্য আর-একজন পরিচারিকা—মোটা বেঁটে, বসন্তের দাগ-ওয়ালা লাল মুখের মধ্যে বোকা বোকা বেরিয়ে আসা দুই চোখ। বেশ খুশি খুশি ভাব। চা দিয়ে বলল: 'লেবু নেই।'

'শুনলাম আপনার বাড়ি নাকি খানা-তল্লাসী হয়েছে?' আলাপ আরম্ভ করে প্রেইস্।

ক্লিম জবাব দিল: 'হ্যাঁ...মানে...একটা ভুল বোঝা-বুঝির ব্যাপার হয়ে গেল।' বুঝিয়ে বলে ব্যাপারটা।

তারপর ওকে বসে বসে মিহি কথার তারিফ শুনতে হয়—নারোদনিক আর মার্ক্স-বাদীদের ঝগড়ার ব্যাপারে ও কি রকম সংযমের পরিচয় দিয়েছে। বেশ মুন্সীয়ানা আছে প্রেইসের বলার ভঙ্গিতে।

পাতলা হাতের তেলোটা ঘষতে ঘষতে, মটকাতে মটকাতে বলে:

'বড্ড সাংঘাতিক ভাবে চলেছে ওদের ঝগড়া।'

ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে আর একটু যোগ ক'রে দেয়:

'এই বাচ্ছাদের ঘুটিং খেলা আর বাবুদের প্রেফরেন্স খেলার মতোই সাংঘাতিক, কি বলেন!'

কোমল আলো-ঝরা মখমল চোখ দুটির দিকে তীক্ষ্ন ভাবে তাকিয়ে মৃদু হাসে ক্লিম। চোখ দু'টিতে সন্ধানী দৃষ্টি। ওর স্বরে ছাত্রের সামনে শিক্ষকের শ্রেষ্ঠত্ব-বোধের সচেতনতা—যা এর আগেও লক্ষ্য করেছে ক্লিম। ওর মনে পড়ে নভোভার-মিয়াতে ইহুদী বিরোধীদের উক্তি: 'ইহুদীদের প্রাচীন জাতিগত আভিজাত্য এক উদ্ধত কদর্যতায় পর্যবসিত হয়েছে।'

'না, প্রেইস্-এর সম্বন্ধে একথা খাটে না। একেবারে স্বতন্ত্র মানুষ। ওকে দেখলেই বোঝা যায়,' ভাবছিল সামঘিন ওর মস্ত বড় বড় কেতাবী বুলি শুনতে শুনতে। নীট্শের মতবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রেইস্ বলছে: 'নীট্শের মত-বাদ হচ্ছে মার্ক্সবাদেরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া,' অত্যন্ত চাপা সুরে কথা বলছিল প্রেইস যেন গোপন কথা বলছে যা ও ছাড়া আর কেউ জানে না: 'একটা শ্রেণী যখন আর একটা শ্রেণীর স্থান অধিকার করে, সেই সংকটময় সন্ধিক্ষণেই ব্যক্তিগত সত্ত্বার সমস্যা-গুলি বিশেষ ভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে।'

শ্যামবর্ণ মুখখানা সম্পূর্ণ স্থির। শুধু যখন কোন কথাকে বিশেষ ভাবে শ্লেষ দিয়ে উচ্চারণ করে তখন বাঁকা পুরু ভ্রু-জোড়া সামান্য একটু খানি কেঁপে ওঠে। নীরবে ব'সে শোনে সামঘিন। নেহাৎ ভদ্রতার দাবীতে মাঝে মাঝে শুধু মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়; সহিষ্ণুভাবে প্রতীক্ষা করে এই কঠোর ছোট খাট মানুষটি হয়তো নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেবে।

'দেখা যাচ্ছে জার্মানীতে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যার ফলে বিশেষ কোন সাংঘাতিক পরিণতি ছাড়া, কেবল বিবর্তনের পথেই সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন সম্ভব হবে

ওখানে,' যেন সামঘিনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এসব কথা বলছে প্রেইস অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে। 'লাখ লাখ জার্মান শ্রমিকের ভোটের অধিকার রয়েছে। সেখানে জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান যে অত্যন্ত উঁচু, তা অনস্বীকার্য। সোস্যালিস্ট পার্টির বৈষয়িক প্রচেষ্টাও বিপুল', অমায়িক হেসে হাত কচলাতে কচলাতে বলে চলে প্রেইস। ওর আঙুল মটকাবার শব্দ সামঘিনের কানে গিয়ে ধাক্কা দিতে লাগল। 'বিবর্তন-মূলক ভাবধারাকে এ্যাংলো-স্যাক্সন ও জার্মানরা আশ্চর্য নিখুঁত ভাবে গ্রহণ এবং আত্তীকৃত ক'রে নিয়েছে। এবং বর্তমানে তা তাদের সংবিধানের অংশ।'

'সত্যি তাই।' স্বীকার করে সামঘিন।

প্রেইস্ যা বলছে সবই ওর জানা, পড়েছে বইয়ে। পুঁথির পাতার যুক্তি সিদ্ধান্ত হয়তো ঠিক, তবুও তা নিরর্থক ক্লিমের কাছে। ও অনুভব করে, প্রত্যক্ষও করেছে ছাপার হরফের কালো কালো লুতা-জালে ওর স্বাধীন মনন ও ইচ্ছা-শক্তি বাঁধাই পড়ে। গভীর বিশ্বাসের প্রেরণা-লব্ধ যারা তাদের কথা শুনলেও তাই হয়। অগাস্ট বেবেল্-এর মতই ঠিক বলে মানতে ও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অনাড়ম্বর ক্ষুদ্রকায় ঐতিহাসিক কজলভ যে সরল সত্যটিকে গভীর ভাবে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন এবং কাব্যময় ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন, ওর মনে হয়, তার অত্যন্ত কাছা-কাছি এসেছেন ইউজিন রাইসটারই। মার্ক্সীয় যুক্তির লৌহ-সম্মার্জনী হয়তো সত্য, শুধু সত্য নয়, ঘোরতর সত্য। যে-গসপেলকে ইনোকভ "সৌজন্য-বিধি"র সঙ্গে তুলনা করে, সেই গসপেলও তাই। গসপেলকে "সৌজন্য-বিধি"র সঙ্গে তুলনা ধৃষ্টতা, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যথাযথ। প্রথম অবস্থায় নারোদনিকী নীতিও সৌজন্য বলেই বিবেচিত হতো। এখন মার্ক্সীয় নীতির দাবীও তাই। মার্ক্সবাদে 'জনগণ' ও 'শ্রমিক-শ্রেণী'কে সমার্থবোধক ক'রে জনগণের সংজ্ঞাকে সংকুচিত করা হয়েছে। এবং পূর্বগামী নারোদনিকদের মতোই জনগণের মধ্যে বিলুপ্তি-সাধন চায় তারা; যেমন চেয়েছিলেন কৃষক-বেশী তলস্তয়-শিষ্য কাতিন, চেয়েছিলেন জেকব জ্যাঠা। ভাই দিমিত্রির তো বিলুপ্ত হয়েই গেছে। কিন্তু এ সবকিছুর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি যে কি তা বোঝা শক্ত। সে কি এই যে মানুষ হবে আইসাকের মতো দেবতার বলি! অথবা ইতিহাসের ভারী গাড়িটাকে কোনও বিশেষ লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাবার ভারবাহী পশু? প্রেইসের নিরাবেগ, সরস বক্তৃতা শুনে যায় ক্লিম নিঃশব্দে। কোন মন্তব্য করে না, কারণ ও বোঝে যে সমাজতন্ত্রের আদর্শের সাথে ওর মজ্জাগত বিরোধ আছে। সেই বিরোধের সপক্ষে ওর শক্তিশালী সারবান মনন চাই। কিন্তু অন্তরের মধ্যে তার সন্ধান ও এখনও পায়নি। সে যাই হোক, সমাজতন্ত্রবাদী ও তাদের বিপক্ষীয়েরা যদি না থাকত তবে ওর জীবন অনেক সহজ হতো, ও স্বস্তিতে থাকত এ ও বোঝে। ও যে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে জোর গলায় বলবে —আমি আইজাক হতে চাই নে—বলি দিতে চাও, তোমরা ভেড়া বলি দাও—এমন শক্তি ও নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

শেষ পর্যন্ত ওর বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। কারণ ওর নির্ভুল আত্ম-মূল্যায়নের দাবী নিয়ে যখন বর্তমানের মতো এমনি মুহূর্ত এসেছে, নিজেকে বিচার ক'রে ওর মনে হয়েছে, হয় ও এক রকমের রক্ষণশীল নৈরাজ্যবাদীই শুধু, নয় রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন নৈরাজ্যবাদী।'

ভারী অদ্ভুত লাগে ওর। নিজের কাছে নিজে যেন অবোধ্য হয়ে উঠছে।

প্রেইসের ওখান থেকে বিদায় নেয় সামঘিন। মনোভাব গোপন করার জন্য এমনি এক চিন্তামগ্নতা মুখের ওপর টেনে রাখে ও, যেন এই মাত্র সম্পূর্ণ নতুন এক জ্ঞান

লাভ করল যার পূর্ণ পরিমান ও গভীরতা এ যাবৎ ওর অজ্ঞাত ছিল।

'আসুন না আগামী রবিবার। অনেক ভালো ভালো লোকের সঙ্গে দেখা হবে।' সহৃদয় ভাবে অনুনয় করে প্রেইস।

সার্মঘিন সংকল্প ঠিক ক'রে নেয়—ও আসবে না রবিবারে। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে নিজের ওপর রাগ হতে লাগল। নিজের সত্যকার চেহারাটা আর কতদিন লুকিয়ে রাখবে—ভাল হোক, মন্দ হোক, আছেই যখন চেহারাটা। না, যাবে ও প্রেইসের ওখানে। নিশ্চয় যাবে। দেখিয়ে দেবে যে ছাত্রোচিত বয়স ও অতিক্রম ক'রে গেছে—ওর নিজস্ব একটা সত্য আছে—সে-সত্য স্বতন্ত্রতা-কামী মানুষের সত্য, স্বতন্ত্রতা সাধকের সত্য।

দু'দিনের মধ্যে ও খুব ভালো ক'রে পড়ে ফেলল কজলভের উপহার দেওয়া বইগুলি, রাদিস্তেভের বইয়ের হার্জেন-সংকলিত লণ্ডন সংস্করণ খানা, প্রিন্স স্তশারবাতভ-এর "রাশিয়ার নৈতিক অবনতি," দানিলেভেস্কির "রাশিয়া এবং ইওরোপ", সোস্যালিস্ট-বিরোধী লে বন্-এর লেখা "সমাজতন্ত্রবাদ"—সব এক সঙ্গে ক'রে বাঁধান। এ ছাড়া ও পড়ল নীট্শের গ্রন্থাবলি। এই ক'খানা বই-ই মাত্র ওর হাতের কাছে ছিল। তবুও এগুলো প'ড়ে নিজেকে অনেকটা প্রস্তুত মনে হ'লো। প্রেইসের বর্ণিত 'ভালো ভালো লোকদের' মধ্যে মারাকুয়েভের ছাত্রদের মতো লোক নিশ্চয়ই থাকবে এই আশা নিয়ে ও গেল প্রেইসের ওখানে।

*

সুবেশা পরিচারিকা একটা সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে এল ওকে। চামড়ায় মোড়া দামী আসবাব; জানালার কাছে বিরাট একটা লেখার টেবিল; তার ওপরে একটা ব্রঞ্জের বাতি—ভারভারাদের পড়বার ঘরে যেটা আছে ঠিক সেই রকম। দামী পুরু কাপড়ের পরদা ঝুলছে জানালা দুটোয়। ভেতরে শ্যামলা শ্যামলা আলো-আঁধারি। কোথা থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে...ঘরের হাওয়া ভরপুর।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল একজন ছাত্র—দীর্ঘ দেহ, গায়ে ঝুলদার কোট, সওয়ারী সৈন্যের মতো বাঁকা পা। ভোতা আর চওড়া থুঁথনি আর কামানো গালের রঙ কেমন কালো কালো। ঘন গোঁফের ডগা তেরছা ক'রে পাকান। সাদা বেরিয়ে-আসা চোখ দুটো দিয়ে সার্মঘিনকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করে, কদম-ছাঁট গোল মাথাটা নেড়ে আত্ম-পরিচয় দিল:

'আমার নাম স্ত্রাতনভ।'

আরেকটি ছাত্র বসেছিল আরাম-চেয়ারে। নাদুস্ নুদুস্ চেহারা, গোলাপী গাল, দেখে মনে হয় যেন তুর্কী-স্নানাগার থেকে এই মাত্র নেয়ে বেরিয়ে এল। পা দু'খানি খাটো, একখানির ওপর চেপে বসেছিল ও। বসে বসেই সুপুষ্ট, কচি শিশুর মতো হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

'তাঘিলস্কি।'

'বড় আনন্দ হলো আপনাকে দেখে।' স্বাগত জানাল লাল-চুলো, অস্থিসার, ক্ষুদ্রকায় তৃতীয় ব্যক্তিটি—গায়ে পুরু জ্যাকেট, পায়ে ছেঁড়া জুতো। মুখখানা হেঁয়ালি, তাতে সোনালী রঙের লঘু এক গোছা দাড়ির শোভা। দাড়িতে বোধহয় ওর বড় অস্বস্তি, তাই বাঁ হাত দিয়ে ক্রমাগত দাড়ি টানে। সেই টানে পুরু ওষ্ঠ

দ্বিটিতে একটা বিমূঢ় হাসি ফুটে ওঠে। খুদে চোখ দুটো ঝক্ ঝক্ করে আর মোটা ভ্রু-জোড়া নড়ে। প্রেইসের চার নম্বর অতিথি বেরিয়ে পড়ল পোয়ারকভ। এক কোণে চামড়ায় বাঁধান বইয়ে ঠাসা আলমারীটার পেছনে গিয়ে বসেছে।

প্রেইস তার ডেস্কের ওপরে এমন ভাবে হাত রেখে বসেছিল যেন কোচম্যান অদৃশ্য ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। বাতির সবুজ আবরণীর সবুজে ওর মুখখানা শ্যামাভ। একটা আসন খুঁজে নিয়ে সামঘিন বসতেই বলতে আরম্ভ করল চট্‌পটে গোছের ছেলেটি:

'এ থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশের অতি দ্রুত শিল্পোন্নতি হচ্ছে—এর মধ্যে আর ভুল নেই...'

'ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমি তা বলছি না,' ভাঙ্গা গলায় বলে উঠল লাল-চুল ছেলেটি। তারপর এক দীভানের ওপর উঠে হাত নেড়ে বলে চলল: 'যে-জাতি ব্যক্তিত্ব-সচেতন নয় সে-জাতি জাতিই নয়। এই আমি বলে দিলাম।'

এবারে সরে সরে গিয়ে দীভানের একেবারে ধারে গিয়ে বসল সে। বসতে ওর রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। মুখখানা ভয়ের ছবি। মিনিট পাঁচেক আবোল তাবোল অনেক রকমের কথা বলে গেল যার মধ্যে পারস্পরিক সংলগ্নতা খুঁজে পেতে রীতিমত বেগ পেতে হ'লো সামঘিনের।

'স্লাভোফিল বলো, নারোদনিক বলো, এমন কি আমাদের ভেদপন্থীরাও সকলেই কি জানি একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।' রীতিমত বক্তৃতার সুরে ব'লে যায় ও। হঠাৎ প্রেইস্-এর দিকে ফিরে কম্পিত হাত খানা বাড়িয়ে দেয়। বক্তৃতা চলতে থাকে:

'ইংলণ্ডে আজকাল ট্রেড্-ইউনিয়ন হয়েছে। ফ্রান্স ঝুঁকছে সিন্‌ডিক্যালিজম্-এর দিকে। জার্মানীর মজ্জায় মজ্জায় রাষ্ট্র ও জাতীয়তার ভাবাদর্শ। আর আমরা? আমাদের কোন্ পথ? এই কথাটাই তোমাদের আমি জিজ্ঞেস করতে চাই।'

এ প্রশ্নের এখনও সময় আসে নি—এ ধরনের কি একটা অস্পষ্ট স্বরে বলল প্রেইস্। সঙ্গে সঙ্গেই কাল-চুল-ওয়ালা ছেলেটি দীভান থেকে যেন স্প্রীংয়ের ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠে ওদিকের কোণে ছুটে গিয়ে একটা আরাম-চেয়ারে ধপাস ক'রে ব'সে পড়ল। তারপর বলে উঠল দাঁড়ি খুঁটতে খুঁটতে আর পুরু থল্‌থলে ওষ্ঠটা টানতে টানতে—টানে টানে অসমান দাঁতগুলো বেরিয়ে প'ড়ে কথা আটকে যেতে লাগল:

'কেন? সময় আসেনি কেন? এ তো সাধারণ অবস্থা। সে তো যুদ্ধের বহু আগে...'

লাল-চুল কোণে চলে আসতেই তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ঢ্যাঙ্গা ছেলেটি দীভানে এসে বসল। কঠিন স্বরে টিপ্পনী কাটল সে: 'যুদ্ধের কথা কেউ ভাবছে না এখন...।'

লাল-চুল জোর গলায় পাল্টা জবাব দিল: 'আলবৎ ভাবছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে, পারীতে...'

তাঘিলস্কি আস্তে আস্তে উঠে হুলো বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এসে লাল-চুলের চেয়ারের হাতলে ব'সে ওর কানে কানে কি বলতেই লাল-চুল আলুথালু মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললে:

'তাই তো! নিশ্চয়! নিশ্চয়—'

ওর চঞ্চলতা দেখে লিউতভের কথা মনে পড়ে ক্লিমের। হাঁটুর ওপর দুই কনুই ভর দিয়ে চুপ্ ক'রে বসে আছে পোয়ারকভ। একবার মাত্র সে স্ত্রাতনভকে

বলল:

'তথ্যের শ্রেণী-বিন্যাস—বেশ ভালো কাজ, যে-সব বিরোধের সাথে আপোষ চলে না সে-গুলোর সাথে আপোষের চেষ্টাটা তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।'

ওর দিকে তাকায় প্রেইস্। ক্লিমের মনে হয় ওর দৃষ্টিটা যেন অপ্রসন্ন। নিজের নিরাভরণ ছোট ঘরখানার বাসিন্দা প্রেইস্ যেন এ নয়। এখানে ওর একেবারে লাট্-বেলাটী চাল। আলোচনা যা হ'লো নেহাৎ জোলো। কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে এই লোকগুলির মধ্যে। কিসের, কার ওপর যেন একটা অসন্তোষ। সামঘিন ঠিক করল ও নিজেকে লুকিয়ে রাখবে না। উঠে এসে বলল:

'সামাজিক লড়াইয়ের কথা ভাবছে কিছু লোক। আবার কিছু লোক মনে করছে এ লড়াই অবশ্যম্ভাবী।'

মন দিয়ে শোনে সকলে। ডীকনের কথা তোলে সামঘিন নাম গোপন রেখে। লাল-চুল উঠে অনুনয় করে:

'আমার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দেবেন দয়া ক'রে। দেবেন তো! আপনি পারবেন। ভুলবেন না যেন। দেখবেন।'

স্ত্রাতনভ্ চেইনে বাঁধা সোনার ঘড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে দৃঢ় স্বরে বলে:

'আপনি নিজেই এসব মানুষকে কাহিনীর চরিত্র বলেছেন। ঠিকই বলেছেন। স্বাভাবিক জীবনের হাওয়া বইতে শুরু ক'রলে এরা সব ধুলোর মতো কোথায় যে উড়ে যাবে তার ঠিক নেই।'

নীলচে গালদুটো ফুলিয়ে একমুখ হাওয়া ছাড়ে ও, যেন দেখাতে চায় মিঠে হাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া সব হাওয়ার ও রাজা। লোকটা কথাই বলে শক্ত ক'রে, কঠোর ক'রে, এবং তারপর গালদুটোকে বলের মতো ক'রে ফোলায়। যার দরুণ ওর সাদা চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে যায়, শুধু মণির কালোটাই দেখা যায়।

তাঘিলস্কি আবার লাল-চুলোর কানে কানে কি বলে। লাল-চুল জবাব দেয়:

'আরে তাই নাকি? হাঁ, হাঁ, তাইতো।'

বিশ্রী একঘেয়ে লাগে আবহাওয়াটা। ক্লিম উঠে পড়ে। প্রেইস্ ওকে এগিয়ে দেবার জন্য সঙ্গে যেতে যেতে বলে:

'জমল না আজ। এক জন এসে গেল কি না। ভলো করে চিনিনে লোকটকে।'

'ওই যে ধূর্ত ধূর্ত চেহারার লোকটা?'

'না, ওই যে কোণের দিকে ব'সে ছিল।'

মার্চ মাসের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে রাস্তা। যেতে যেতে ক্লিম ভাবে:

'নিশ্চয় পোয়ারকভ। বেশ মজার তো!'

কিছুতেই ও বুঝতে পারে না এই লোকগুলোকে, যদিও আরও দু'তিনটে বৈঠকে ও গেল। ওরা চেঁচিয়ে কথা কয় না, বাক-বিতণ্ডা করে না। গম্ভীর ভাবে শুধু রাজনৈতিক-অর্থশাস্ত্রের আলোচনা ক'রে যায়। বিষয়টার সামঘিনের খুব ভালো জ্ঞান নেই। পছন্দও করে না। এরা নিজেদের মার্ক্সবাদী বলে। কিন্তু এদের মধ্যে সেই কুতুজভীয় কঠোর ঋজুতা নেই। শ্রমিক সমস্যার চাইতে শিল্প-বানিজ্যের দিকেই এদের ঝোঁক বেশী। পরমোৎসাহে তেল, শস্য, চিনি, চর্বি, শাস ইত্যাদি রাশিয়ায় উৎপন্ন যাবতীয় কাঁচামালের হিসাব কষে ব'সে ব'সে। সামঘিনের অনেক সময় মনে হয় ওরা ভাষার চাইতে সংখ্যা দিয়েই যেন কথা কয় বেশী। ওরা "দ্য গ্রেট্ সাইবেরিয়ান রেইলওয়ের" ভবিষ্যৎ, মাখন-শিল্প, গ্রাম-ছাড়া কৃষক-শ্রেণীর দেশান্তর গমন, কৃষি-ব্যাঙ্কের কার্য-পদ্ধতি, জার্মানীর শিল্প-নীতি নিয়ে আলাপ

করে। বিরক্ত লাগে ক্লিমের। কারণ এ সবই ওর অনধিগত বিষয়। খবরের কাগজের মারফৎ কিছু খবর অবশ্য রাখে আজকাল। কিন্তু তাও নেহাৎ অনিচ্ছায়।

এদের এই শুধুই কথার কচ্‌কচি ভালো লাগে না ক্লিমের। কিন্তু মানুষগুলোর ওপর ওর কৌতূহল বেড়ে যায়। কি চায় এরা? এই স্ত্রাতনভ? ওকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ক্লিম। কেমন যেন একটা জংগী ভাব। স্ত্রাতনভ যদি ছট্‌ফটে লাল-চুলওয়ালা ছাত্রটিকে হঠাৎ 'হুঁশিয়ার' বলে হুকুম দিয়ে বসে, একটুও অবাক হবে না ক্লিম। একজন কম্যান্ডিং অফিসারের মত করেই ও কথা বলে যাচ্ছে। লাল-চুলকে একটুও দেখতে পারে না মানুষটা। ওকে বলে:

'যারা ভালো করে বুঝে দেখে তবে কোন জিনিসকে অন্তরে গ্রহণ করে, তাদের ভিতরে বিরোধ থাকা উচিত নয়।'

লাফিয়ে ওঠে লাল চুল: অবাক হয়ে অবিশ্বাস্যের সুরে জিজ্ঞেস করে: 'সত্যি! সত্যি বলছেন?'

জবাব দিল না স্ত্রাতনভ। কোন প্রশ্নের জবাব সে দেয় না।

নিষ্প্রাণ তাঘিলস্কিকে দেখে ভাই দিমিত্রিকে মনে পড়ে ক্লিমের। অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি এ লোকটার, যেন আস্ত একটি নোট-বুক, যার মধ্যে দুনিয়ার তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করা ও পরিপাটি ক'রে সাজান আছে। বন্ধুদের ভারী সুবিধে হয়। বিন্দুমাত্র দেমাক নেই তার; যে যা জিজ্ঞাসা করে একটা বিনীত ঔদাস্যে অমনি বলে দেয়—যেন অত্যন্ত মেধাবী-ছাত্র, ইস্কুলের চাপে একেবারে শেষ হ'য়ে গিয়ে অধীত বিদ্যা ভুলবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছে। ওর গোলাপী রঙের মুখ, যা চীনে-মাটি দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়, আর অনিশ্চিত রঙের ছায়াচ্ছন্ন চোখ দুটিকে তার কথার ভংগিতে দিয়েছে নারীর লালিত্য। গানের মতো সুরে কথা কয় সে, কিন্তু স্বর নীরস, আর তাতে শ্লেষের অম্ল-প্রক্ষেপ। শাসক গোষ্ঠীকে সে গাধা, বোকা, শয়তান যা খুশি বলে গাল দেয়। দিয়ে হয় বসে বসে নখ খোঁটে, নয় একটা মেয়েলি সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে থাকে যতক্ষণ না কেউ ওকে কিছু জিজ্ঞেস করে। ক্লিমের মনে হয় দিও-মিদফের সংগে অদ্ভুত মিল আছে এ মানুষটির। আরও মনে হয় সে যেন গভীর বিশ্বাস নিয়ে আশা ক'রে পথ চেয়ে বসে আছে—কখন বুঝি ডাক আসে, কারা যেন আসবে তার কাছে, হয় তো এই বোকারাই আসবে; এসে নতশিরে মিনতি ক'রে বলবে:

'অনুগ্রহ ক'রে আমাদের শাসনভার গ্রহণ করুন।'

লাল-চুল ছাত্রটির নাম আন্তন বেরেনদিয়েভ। বেশ ইন্টারেস্টিং মানুষ। দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে বিপ্লব অনিবার্য। আবার ভয়ও আছে বিপ্লবের নামে। কিন্তু ভয় ও লুকোয় না, লুকোতে চেষ্টা করে না। একটু শংকিত ভাবেই প্রেইসকে বলে সে:

'বিপ্লবের সংগে সংগে ধর্মেরও সংস্কার দরকার। বুঝতে পারছেন তো কি বলছি? কিন্তু সংস্কার-টংস্কার যা হয় ওই দক্ষিণী ভায়াদের বুদ্ধি-মাফিক যেন না হয়।'

স্ত্রাতনভ তার ফ্যাকাশে চোখ ঘুরিয়ে আশ্বাস দেয় তাকে: 'সে-ভুল আমাদের হবে না। সে-সব ঠিক আছে। আমাদের চাষীরা হেঁয়ালী-বিশেষ।'

'আর তোমাদের স্টানডিস্ট্ আর ব্যাপটিস্ট-রা কি?'

তাঘিলস্কি তার মোটা নাকটা ঝেড়ে বক্তৃতার ভংগিতে বলে:

'আসলে প্রশ্নটা ধর্মের, সংস্কারের নয়। ও বস্তুর দরকার আমাদের কারো নেই। দরকার হচ্ছে গির্জার পরিচালন-রীতির সংস্কারের। দরকার যাজকদের অধিকার

সম্প্রসারণ করার, তাদের অর্থনৈতিক উন্নতির...'

বেরেনদিয়েভ মাঝখানেই চিৎকার করে উঠল:

'দরকার গ্রামের যাজকদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের, তাদের নতুন ক'রে শিক্ষা দেওয়ার—'

সামঘিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলে:

'গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমাদের কঠোর সংগ্রাম করতে হবে।'

ভীতস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে বেরেনদিয়েভ: 'খুবই কঠোর।' তারপর হাত দুটো ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে চাপা রহস্য-ঘন স্বরে আবার বলে: 'সত্যি খুব কঠোর সংগ্রাম করতে হবে।'

বাঁকা পা দুটো জোর ক'রে, হাত পেছনে রেখে, বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ায় স্রাতনভ। আরো জবরদস্ত দেখায় তাকে এই ভঙ্গিতে। বেরেনদিয়েভকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে মেরে বলে:

'আমার মতে ইতিহাস একমাত্র আমাদেরই ওপরে দায়িত্ব দিয়েছে যে আমরা সংগঠিত করব, আমাদের সচেতনা দিয়ে তার মৌল-শক্তিগুলোকে করায়ত্ত করব, এবং জনসাধারণের অবশ্যম্ভাবী অরাজকতাকে আমাদের ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা...'

তাঘিলস্কি তার সযত্ন-প্রসারিত মাথাটা স্রাতনভ-এর দিকে ঘুরিয়ে মুখ বাঁকিয়ে স্বরে ঝংকার তুলে ওকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে:

'তুমি যে নিজেকে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রই ভাবছ! তাই এখনও কথায় কথায় নেচে ওঠো আর দৌড় মার আগ বাড়িয়ে। বড্ড বেশী এগিয়ে যাও। আমাদের এখন ভাবতে হবে বিপ্লবের কথা নয়; জনসাধারণের যোগ্যতা বাড়াবার এবং তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য একেবারে ধারাবাহিক ভাবে সংস্কার-মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার কথাই ভাবতে হবে।'

প্রেইস্ নিঃশব্দে বসে ডেস্কের ওপর টোকা মারছিল। বাড়িতে স্বভাবতঃই ও কথা বলে কম। তাই বক্তব্য থাকে অস্পষ্ট। ক্রিসানফ কাকার ওখানে, বা বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাকুয়েভের সঙ্গে তর্ক করতে যে বুদ্ধি-দীপ্ত, আত্ম-বিশ্বাস পরায়ণ সুবক্তাটিকে প্রায়ই দেখে সামঘিন, তার সঙ্গে এ মানুষটার কোন সাদৃশ্যই নেই।

পোয়ারকভের সঙ্গে আর একবার দেখা হলো ক্লিমের। ঘন্টা দেড়েক চুপ ক'রে বসে থেকে, চাটুকু নিঃশেষ ক'রে, চেয়ার থেকে করমর্দন ক'রে ও বলেছিল:

'একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে দেখছি। আগামী দিনকে এই পথেই চলতে হবে।'

আর কাউকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল না পোয়ারকভ্, চলে গেল। ওর নুয়ে-পড়া পিঠটার দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মনে বলে ক্লিম: 'ঠিক কথাই বলেছে প্রেইস্: লোকটা সত্যি যেন কেমন কেমন।'

যতক্ষণ এ ঘরে ছিল ক্লিম, ওর ব্যবহারে ছিল শান্ত গাম্ভীর্য, যা তাদেরই থাকে যারা দেখে উদার মন নিয়ে, কিন্তু দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তুকে যাচাই করে কঠোর ভাবে; এবং কোন প্রকার বিরোধে বিচলিত না হয়ে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ ক'রে তার আসল মূল্য বিচার করতে পারে। তাঘিলস্কি একদিন বেরেনদিয়েভকে বলেছিল:

'ওহে আন্তন, তোমার সামঘিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। যে কোন মতবাদই হোক, তার ভিত্তিতে যে বাস্তব এবং বাস্তবের কষ্টিপাথরে তার আসল যাচাই হয়, একথা সে কখনও ভোলে না।'

'আরে! চা টা আনতে বলুন দেখি আগে!'

॥ ৬ ॥

কখনও কখনও সামঘিনের মনে হয় ও ঠিক ঠাঁইটি যেন খুঁজে পেয়েছে, পথ খুঁজে পেয়েছে। ও যেন সমাজে বাস করছে না, রয়েছে চারধারে আরশি-পরিবেষ্টিত হয়ে। চার ধারের মানুষগুলো যেন এক একটি আরশি যার মধ্যে ওর ছায়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে তাদেরও ব্যক্তিগত ন্যূনতা। নিজেকে ও একখানি ধীসম্পন্ন, তীক্ষ্ণ ও মৌলিক মনের অধিকারী বলে জানে। পরিচিতদের অসম্পূর্ণতা দেখে দেখে ওর নিজের সম্বন্ধে ওই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে। এমন একটি মানুষের দেখা ও আজ অবধি পেল না, যে ওর চাইতে বেশী ইনটারেষ্টিং, বা যাকে ওর চাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

নিজের ভেতরের দিকে তাকিয়ে ও বেশ বুঝতে পেরেছে যে নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও এমন কিছুর সঙ্গে ওকে জড়িয়ে পড়তে হবে যা ওর একেবারে মৌল চিন্তা-ধারার বিরোধী। এই ওর ভবিতব্য। ছাদের ওপর থেকে খেদিন্কা ময়দানের যে দৃশ্যটি ও চাক্ষুষ দেখেছিল—মাছের ডিমের মতো ঠাসবুননী করা সেই মাঠটা ঠাসা মানুষ—হঠাৎ আজ আবার সেই দৃশ্য চোখের সামনে ঝলক দিয়ে যায়। নেখালো-ভার কাছ থেকে উপহার পাওয়া শিল্পী রুশগ্রস্-এর আঁকা ছবিখানির কথা মনে পড়ে। ছবিটার নাম হচ্ছে "সুখের অন্বেষণে"। নানা স্তরের নানা রকম মানুষের বিরাট এক জনতা। নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করতে করতে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে মানুষগুলো। কালো, নৈর্ব্যক্তিক একটা ক্ষুদ্র কীটাণ্ডের মতো এই গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া—বাধ্য হয়ে দশের সঙ্গে একই পথে চলে এমনি করে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে অনিবার্য ধ্বংসের কবলিত হওয়া—সামঘিন জানে—এর চাইতে সাংঘাতিক ও অমর্যাদাকর আর কিছু নেই। গড্ডালিকা প্রবাহে এখনও গা ভাসায়নি ও, দূরে সরেই আছে। কিন্তু যতই দিন যায় ততই ওর বেশী ক'রে মনে হয় জনতা তার সামূহিক সত্তার মধ্যে ওকে শোষণ ক'রে নিচ্ছে। ওকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলেছে তাদের সঙ্গে। চোখের সামনে ভাসতে থাকে সেই ব্যারাকের দেয়াল ধ্বসে পড়ার ছবি—কি ভাবে সেই উঁচু থেকে মানুষগুলো ছিট্‌কিয়ে পড়ছিল—প্রাণপণে ছুটেছিল নিজেও। ভাবছিল পালাচ্ছে—কিন্তু কেন যে ও দৌড়োতে লাগল অকুস্থলের দিকেই এবং একেবারে ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে থামল, সে এক রহস্য। এমনি সব কথা ও যখন চিন্তা করে তখন প্রতিটি মানুষের ওপর, এমন কি নিজের ওপরেও তীব্র ঘৃণার একটা বিষ-বাষ্প কে যেন পাম্প ক'রে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ও ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে ওঠে।

সে-দিন সন্ধ্যাবেলার কথা। সামঘিন প্রেইস্-এর ওখানে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছনে কার যেন দ্রুত ভারী পায়ের শব্দ। পেছন ফিরতেই একেবারে কুতুজভের মুখোমুখি।

'ভারি সুন্দর আপনার চলার ভঙ্গি।' দাড়ির অরণ্যের ফাঁক দিয়ে হাসতে হাসতে কুতুজভ বলে। একবুক লম্বা দাড়ির গোছা। স্বর কোমল অথচ খুশিতে

ভরা। 'সাত্য, ভারী সুন্দর। যেন, যাকে একদা ভালবাসতেন কিন্তু এখন আর বাসেন না এমনি কোন বান্ধবীর কাছে চলেছেন। ...তা চলছে কেমন?'

সামঘিন ওর কথার ধরনে ও বন্ধুত্বের এই স্থূলপ্রকাশে অত্যন্ত বিরক্ত হ'লো। চারদিকে তাকিয়ে কুতুজভ আবার জিজ্ঞেস করে:

'শুনলাম আপনি নাকি জামিনে খালাস হয়েছেন?'

'ঠিকই শুনেছেন, তবে বর্তমানে এখান থেকে কোথাও যাবার হুকুম নেই। এ ভাবে বসে থেকে থেকে মুটিয়ে যাব। তাই যা হোক একটু নড়াচড়া করি আর কি!'

এরপর কথাবার্তা আর বিশেষ হলো না। দুজনে এক সঙ্গে প্রেইস্-এর বাসায় এল। বাঁ হাতে ঘন্টাটা টিপতে টিপতে ডান হাতটা সামঘিনের দিকে বাড়িয়ে দেয় কুতুজভ। সামঘিন বলে:

'আমার গন্তব্যও তো এখানেই।'

'আরে! তাই নাকি! বেশ বেশ!'

এক জন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দেয়। কুতুজভ কাঁধ দিয়ে সামঘিনকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে পরিচারিকার পিঠে একটা চড় মেরে বলে:

'কি আশ্চর্য! কাজা যে! দিব্যি আছ দেখছি! ভালোবাসি তোমায় যে গো, ও মোর কাজিয়া ...' গেয়ে ওঠে সুর ক'রে।

উৎফুল্ল হয়ে মুখের ওপর জবাব দেয় কাজিয়া:

'আমিও আপনাকে দারুণ ভালবাসি!'

কুতুজভের হাত থেকে কোটটা নিতে যায় কাজিয়া। কুতুজভ এগিয়ে গিয়ে নিজেই ওটা ঝুলিয়ে রাখে।

টিপ্পনী কাটে ক্লিম: 'গণতান্ত্রিক!'

কতকটা খুশি কতকটা বিব্রত হয়ে ওদের স্বাগত করে প্রেইস:

'ছাড়া পেলেন?'

'এই পেলাম আর কি।'

সকলে উঠে আসে প্রেইস্-এর আশ্রম-মার্কা ঘরখানার মধ্যে। ভারী দেহটা ক্যাম্প খাটের ওপর আছড়ে ফেলে চেঁচামেচি জুড়ে দেয় কুতুজভ:

'আরে! চা টা আনতে বলুন আগে!'

'আপনাদের যে পরিচয় আছে জানতাম না তো!' কুণ্ঠিত, মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে কথাগুলি বলেই প্রেইস্ বিছানার ওপর এসে বসল এবং কুতুজভ এতদিন কোথায় ছিল, কি করেছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে লাগল। ক্লিম একটু বিব্রত বোধ করতে লাগল। প্রেইস কুতুজভের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে যেন তার একান্ত জগতের প্রবেশাধিকার ও পেয়ে গেছে। কুতুজভের মনেও যেন প্রেইস সম্পর্কে সেই একই কথা। ক্লিম একবার জিজ্ঞেস করতে গেল—ও থাকতে তাদের কথাবার্তা বলতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা। কিন্তু কৌতূহলও আছে, তাই চুপ ক'রে রইল। কুতুজভ বসে বসে সবুট পা দু'খানা দোলায়। বহুদিন পালিশ পড়েনি জুতো জোড়ায়, তার ওপর লেগেছে বর্ষাতি-জুতোর ঘষা। দেয়ালে হেলান দিয়ে এক হাতে চায়ের গেলাস আর এক হাতে প্লেটটা বেশ কায়দা ক'রে ধরে বলে যেতে লাগল। কোন নতুন কথা নয়, ক্লিমের জানা কথাই সব।

'ক্ষুদে মার্ক্সবাদীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। বেশীর ভাগেরই দেখি মুখে লম্বা লম্বা বাত, কিন্তু কাজের বেলায় লবডঙ্কা। তার মধ্যে আবার কোন কোন সোনার চাঁদের নালিশ

আছে—মার্ক্সবাদে রোম্যান্স নেই। নারোদনিকদের দলে বেশ 'হিরো', বোমা-বাজী ইত্যাদি যত রকম সার্কাসী কায়দা নাকি আছে।'

আঙুল মটকাতে মটকাতে প্রেইস জিজ্ঞেস করে:

'কাজান, খারকফ্‌ ওসব জায়গার অবস্থা কেমন?'

প্রশ্নটা নেহাৎ বন্ধু-ভাবে করা, কিন্তু ভঙ্গিটা যেন অধীনস্থকে ওপরওলার হুকুমের। ভারভারাদের গ্রীষ্মাবাসে যে মেয়েটি থাকত তার সঙ্গে লিউতফ্‌ ঠিক এমনি ক'রে কথা কইত।

কোটের পকেট থেকে একটা সিগারেটের বাক্স বের করল কুতুজভ। বাক্সটা খালি; এক চোখের অপাঙ্গে ওটা খুলে দেখে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস নেই? নাঃ! একটু-আধটু বদভ্যাস থাকলে যে বন্ধুদের উপকার হয়, সেটি বুঝবেন না!'

কুতুজভকে এতটা খুশি খুশি ক্লিম আর কখনও দেখেনি। বিছানায় আধশোয়া হয়ে সে বলে যাচ্ছিল:

'ব্রায়ান্স্ক থেকে তুলাতে গেলাম। বেশ কয়েকজন কাজের লোক আছে সেখানে। ভাবলাম, যাই একবার তলস্তয়ের সঙ্গে দেখাটা ক'রে আসি। গেলাম। গস্‌পেলের তলোয়ার নিয়ে লাগল তর্ক। উনি কোমর বাঁধলেন যীশুখৃষ্ট যে-সব তলোয়ার খাপে বন্ধ ক'রে রাখতে বলেছেন সেই সব ভোঁতা হেতের নিয়ে আর আমার হাতে ছিল যার নাম "শান্তি নয়, যুদ্ধ"-এর তলোয়ার। তা, তলস্তয়কে ঘায়েল করে কার সাধ্য। যুক্তি টুক্তির ধার তো ধারেন না, খামখেয়ালী মানুষ। সে যাই হোক আমারও ওঁকে ভালো লাগেনি, ওঁরও আমাকে ভালো লাগেনি।'

সামঘিন বলে: 'অদ্ভুত মানুষ এই তলস্তয়। বড্ড বেশী রকম রাশিয়ান।'

'যা বলেছেন,' সায় দেয় কুতুজভ: 'সেই জন্যই তো বিপদ বেশী।'

'কিসের বিপদ?' জিজ্ঞেস করে সামঘিন।

'ইতিহাসের।' জবাব দেয় কুতুজভ: 'এই সব ভাবালুতা নিয়ে ইতিহাসের এমনিতেই কাহিল অবস্থা।'

'তলস্তয় রাশিয়ার গ্রামীন প্রাণ-শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি।' কতকটা চিন্তান্বিত ভাবে, কতকটা ঔদাস্যের সুরে প্রেইস বলে।

'তা হ'লে এর থেকে কি বুঝতে হবে?' বিছানা থেকে লাফিয়ে ওঠে কুতুজভ। এক গোছা দাড়ি মুখের মধ্যে দিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে:

'কিছু মনে করবেন না, সামঘিন। বোরিস একটু এদিকে এস তো!'

'প্রেইস-এর কাঁধে হাত দিয়ে ওকে দরজার কাছে নিয়ে গেল কুতুজভ। সামঘিন একলা দাঁড়িয়ে রইল। জানালা দিয়ে তাকাল সেই চালা ঘরটার দিকে। এই রম্য-দর্শন ইহুদী তরুণের সঙ্গে চাষাড়ে কুচজভ-এর কথা বলার গর্বিত ভাবটুকু বেশ ভালো লেগেছে সামঘিনের। ভালো লাগেনি ওর 'গণতান্ত্রিক' ধরন; ভালো লাগেনি ওর জুতো-জোড়া আর কুৎসিৎ দাড়ির গোছা। তলস্তয়ের প্রতি কুতুজভের মনোভাবও অত্যন্ত খারাপ লেগেছে ওর। কিন্তু এই সব মিলিয়েই যে লোকটার অমন অদ্ভুত সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব—সে কথা স্বীকার করতেই হয় ওকে। কেমন যেন একটু হিংসা হয়।

'আচ্ছা, চলি তা'হলে।' ঘরের মধ্যে ফিরে এসে কুতুজভ বলে: 'সামঘিন আপনি?'

'আমিও চলি।'

*

ওরা রাস্তায় বেরিয়ে দেখল দুর্দান্ত হাওয়া। বরফ পড়ছে। গায়ে যেন হুল বিঁধছে। কোটের বোতাম সেঁটে কুতুজভ গুন্ গুন্ ক'রে বলে:

'দিব্যি আরামে আছে প্রেইস।'

'ও যে কিসের টানে মার্ক্সবাদে এসে ভিড়ল তা বুঝিনা।' সামঘিন বলে।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকায় কুতুজভ। বলে:

'সেকি? বুঝতে না পারার কি আছে?'

কয়েক পা গিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'খাবেন কিছু?'

'একটু ভদ্‌কা হলে মন্দ হয় না।'

'বেশ তো, চলুন না, এই যে—' বলে ছোট একটা দোকানে গিয়ে ঢুকল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল। মুখে একটা সিগারেট দাড়ির জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আছে। দিল দরিয়া ভাবে হেঁকে বলল:

'চলুন দেখি এবার অন্য কোথাও গলা ভেজান যাক।'

সামঘিনের মুখখানা আবার নিরীক্ষণ ক'রে দেখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে। বলে:

'তা হ'লে পুলিসের লোকেরা আপনাকে বাজিয়ে দেখে নিয়েছে যে রাজনৈতিক দিক থেকে আপনার একদম অক্ষত কৌমার্য!'

স্থূল পরিহাস, কিন্তু রাগ করবার সময় পেল না সামঘিন। কারণ কুতুজভ বলেই চলেছে। স্বর রীতিমত নরম, এবং অমায়িক।

'রক্ত খুব গরম হয়ে উঠেছিল তো! হয়নি? বাঃ বেশ, বেশ। সেই প্রথমবার যখন পুলিসী জেরার সামনে পড়ি,—ভীষণ চটে গিয়েছিলাম আমি। আসলে কি জানেন? দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

একটা সস্তার রেস্তরাঁ পাওয়া গেল। ধোঁয়ার নীল জালে বোনা নিরালা কোনটা বেছে নিয়ে বসে ভদ্‌কা আর মাংসের ফরমায়েস করল কুতুজভ। ঘরখানা অপ্রশস্ত। নীচু ছাদে ধোঁয়ার ছাপ। চোখ কুঁচকে আশেপাশের মানুষগুলোর দিকে চেয়ে দেখে ওরা। তিন জন লোক একই ভাবে একটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে খেয়ে চলেছে। চতুর্থ জনের খাওয়া শেষ হয়েছে। একটি মেয়ে জানালার কাছে বসে চিঠি পড়ছিল। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁত খুঁটছে লোকটা। মেয়েটির সামনে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা বইয়ের বাণ্ডিল। আধখানা মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। ওষ্ঠ দুটি দৃঢ়-নিপিষ্ট। ক্লিম-এর চোখ তার ওপর পড়তেই ঠোঁট দুটি আরো নিপিষ্ট হতে লাগল। আর তার চার দিকে ফুটে উঠল ক্রোধের রেখা। ক্লিমের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ক্লিম চিনতে পারল, মেয়েটি লিউতভেরই একজন বান্ধবী। গুপ্ত আড্ডা নাকি জায়গাটা? মনে মনে ভাবে ও। কুতুজভকে জিজ্ঞেস করে:

'এখানে আর কখনও এসেছেন নাকি আগে?'

'না, আজই প্রথম এলাম,' প্লেট থেকে মাথা না তুলেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে জবাব দেয় ও। ভরা মুখে তোৎলাতে তোৎলাতে আগের কথার জের টানে:

'তাহ'লে আপনি বোঝেন কিসের আকর্ষণে কেউ কেউ মার্ক্সবাদী হয়?'

'না।'

ক্লিমের দিকে পানীয়ের গেলাস এগিয়ে দেয় কুতুজভ।

'এই নিন।'

তারপর নিজের প্লেটের ওপর অনেক খানি মাস্টার্ড ছড়িয়ে দেয়। কড়া গন্ধে ক্লিমের নাকে সুড়সুড়ি লাগে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে কুতুজভ বলে:

'চোখের ধাধা আর কি। কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিবর্তনের সূত্রই শুধু দেখতে পায়; এ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় না মার্ক্সবাদের মধ্যে। এই দেখুন না কেন—'

খানিকটা ভদ্‌কা গলায় ঢেলে আবার বলে:

'বন্ধু পোয়ারকভের মত হচ্ছে যে আমাদের অর্থবান তরুণেরা তাদের শ্রেণী-সুলভ সহজাত দূরদৃষ্টির তাগিদেই মার্ক্স ভজে এটা বুঝেই যে, যতই এড়াবার চেষ্টা করুক, সামাজিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ধর্মেই ঐ পন্থা আর কি।'

খাওয়া শেষ হলে একটু দুঃখিত ভাবেই প্লেটের দিকে তাকায় কুতুজভ। তারপর কফি আনতে বলে।

'এই হলো আদত কথা। কারো হলো চোখের ভুল, কারো বা শ্রেণী মনোবৃত্তি। কোন শ্রমিকের যদি এমন কোন মতবাদ থাকে যা মালিকের পক্ষে হানিকর, ঘটে বুদ্ধি থাকলে সেই মতবাদটা ভালো ক'রে বোঝার চেষ্টা করাই হচ্ছে মালিকের উচিত। জিনিসটা ভালো ক'রে জানলে তবে তাকে বিকৃত করা চলে। ইওরোপে এর প্রাণ-পণ চেষ্টা চলছে। আর আমাদের কোমলপ্রাণ ক্ষুদে বুর্জোয়ারাও নেহাৎ চোখ-কান বুজে নেই। খোলাখুলিভাবেই শ্রেণী-সচেতনতাকে তারা সংগঠিত করতে চেষ্টা করছে। দল গড়া হচ্ছে। পিটর দ্য গ্রেট্‌কে টেনে নামান হচ্ছে মাটির ধুলোয়। মোট কথা, বেশ একটা নাড়া পড়ে গেছে।'

সেই যে চারজন মুখ আঁটা মানুষ তারা যেন হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে, ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। মহিলার চিঠি পড়া শেষ হলো। চিঠিটা ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বন্ধ করার সময় ক্যাঁচ ক'রে খুব জোরে শব্দ হলো। চাপা স্বরে কুতুজভ বলে চলেছে:

'আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন যে আন্দোলন উঠেছে সেটা সম্পূর্ণভাবে একটা লক্ষণ মাত্র। এই সব প্রতীকপন্থী এবং ক্ষয়িষ্ণুদের মধ্যেও নাকি অনেক প্রতিভা-বান লোক আছে শুনি। সাহিত্যের ক্ষয়িষ্ণুতা শ্রেণী-সমাজের অকাল ক্ষয়েরও লক্ষণ হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় রাশিয়ার যে ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে তার কারণ আসলে হচ্ছে অন্যের অনুকরণ। বুর্জোয়া ইওরোপের মানসিক পচনের সব চেয়ে যারা বড় সাক্ষী ও শিকার, তাদের লেখারই অনুকরণ করে আমাদের দেশের তরুণেরা। এরা বড় হয়ে স্বভাবতই নিজের মতো করেই যা হোক কিছু করবে।'

'স্ত্রাতনভকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করে ক্লিম।

'আইনের ছাত্র? সেই পেল্লায় আলনাটা? তা পরিচয় আছে বৈকি। তার আবার কি হলো? গবেট্‌টা কালে ঠিক গভর্ণর হবে দেখবেন!'

তোয়ালে দিয়ে দাড়ি মুছে একটা সিগারেট ধরায় কুতুজভ। সস্নেহে ওটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে একটা:

'যেতে হয় এখন। কি বিশ্রী শহর। যেন খোদ শয়তান তার ডাণ্ডাটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এটাকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। কেবলি যেন হাঁক পাড়ছে শহরটা— "আমি তোমাদের ইউরোপ নই" —অথচ দেখুন বাড়ি-ঘরগুলো ঠিক ইওরোপের মতো।

অর্থাৎ ভিয়েনিস্ পদ্ধতি অতি যাচ্ছেতাইভাবে খুশি মাফিক মস্কো ঢং-এ ঢালাই করা হয়েছে। এই সব বিশ্রী কতগুলি ব্যাপার তো আছেই। তা ছাড়াও দেখুন না একটা তিন-জানালা-ওলা বাড়ি তো নয়—মুরগীর খাঁচা, হুমড়ি খেয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। গেটে সাইন-বোর্ড লাগান—"এখানে পাঁচটা হইতে আটটা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ গণনা করা হয়।" —বোধহয় নিজের ভবিষ্যৎই গোনে লোকটা! হুঃ!' এক গাল হেসে কুতুজভ বলে: 'মস্কো, তুমি ইওরোপ হবে; এই তোমার ভবিষ্যৎ!'

হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল। সামঘিনের হাতে একটা এক রুব্‌লের নোট গুঁজে দিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে পড়ে কুতুজভ্।

'চললাম বিলটা দিয়ে দেবেন।'

ক্লিম আর-এককাপ চা নিল। উদ্দেশ্যটা খাওয়া নয়, চা হাতে নিয়ে বসে থাকা—দেখতে হবে কার জন্য বসে আছে মহিলা। মুখের আবরণ সরিয়ে একটা নোট বইয়ে কি যেন লিখছিল সে। ওই দিকে নজর রাখতে রাখতে সামঘিন ভাবছিল:

'সর্দারী করার আর বিখ্যাত হবার ভারী সুবিধে রাজনীতিতে। ঐ টানেই তো কুতুজভের মতো লোকেরা রাজনীতি করে। কিন্তু ইনি? এ'র টানটি কিসের।'

ওর চিন্তা চলছে দ্বিধারায়। এক দিকে ওই মেয়েটির কথা; আর এক দিকে কুতুজভের ওপর ওর মনোভাব কি—তাই নিয়ে চলছে আত্ম-বিশ্লেষণ। মানুষটার সঙ্গে তৃতীয়বারের এই সাক্ষাতে ওর মনে পরস্পর-বিরোধী ভাবের উদয় হচ্ছে। কুতুজভের 'কুতুজভীয়ানা', ওর বিশ্রী স্থূল রসিকতা, ওর নিজের মতবাদকে অভ্রান্ত বলে জাঁক—ওর অসহ্য লাগে। কিন্তু ওদিকে আশ্চর্য মানুষটার স্পষ্ট কথা বলার ক্ষমতা; আশ্চর্য আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধ। মুগ্ধ হয়ে যায় সামঘিন। হিংসা হয়; শুধুই হিংসা, যার মধ্যে দ্বেষ নেই।

মহিলা উঠে দাঁড়ায়। মুখের ওপর ঘোমটাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

'তাইতো, আর চলছে না বসে থাকা,' মনে মনে বলে সামঘিন। 'নিশ্চয় প্রেমিকের জন্য বসেছিল এতক্ষণ। কে জানে, হয়তো গ্রেপ্তার হয়েছে সে-বেচারা।'

*

লিদিয়ার কথা না ভেবে নারী জাতির কথা ভাবতেই পারে না। লিদিয়ার কথা মনে হলেই একটা তীক্ষ্ণ ব্যথায় আর আহত অভিমানে ওর বুকটা টন্‌টন্ ক'রে ওঠে।

ভারভারা একদিন জিজ্ঞেস করল:

'লিদিয়া চিঠিপত্র লেখে তো সর্বদা?'

'খুব একটা নয়,' জবাব দেয় সামঘিন। 'পারী থেকে সেই একখানা চিঠিই লিখেছিল ও। চিঠি লিখতে ভালো লাগে না ওর।'

'কথা বলতেও ভালো লাগে না। তাই না? আস্ত হেঁয়ালি ও মেয়ে।'

চশমার ভেতর দিয়ে কঠোরভাবে ওর দিকে তাকায় ক্লিম।

'হেঁয়ালি আর কি? মানুষ হেঁয়ালি হয় না। ওটা লেখকেরা বানিয়ে বলে তোমাদের খুশি করবার জন্যই। দুনিয়ায় থাকবার মধ্যে আছে প্রেম আর ক্ষুধা। দুটি মূল শক্তি। এদের শাসন সবাইকেই মানতে হয়। শিল্প জীবের যৌন-দাবীর ওপর রঙ ফলায়। আর বিজ্ঞান মেটায় জঠরের দাবী। এই তো আছে। আর

আছে কি ?'

ওর মনে হয় এরকম মোটা উলঙ্গ ভাষায় কথা বলে ও ভারভারাকেই নাচাচ্ছে না শুধু। খেলছে নিজের সাথেও। বেশ লাগছে মেয়েটাকে নাচাতে। তা ছাড়া এ খেলাই ওর নিজের মন ভোলাবার একমাত্র উপকরণ; এই খেলাই ওকে অনর্থক আত্ম-সমীক্ষার ক্লেশ থেকে রক্ষা করে। ও জানে মারাকুয়েভ ওর চেয়ে অনেক বেশী সুদর্শন। এও বুঝেছে যে ভারভারার মতো অন্তঃসারশূন্য নির্বোধ মেয়ে একজন স্ফূর্তিবাজ ছেলেকেই বেশী পছন্দ করবে। মারাকুয়েভও এ মেয়ের প্রেমে পাগল। কিন্তু বেচারার ওপর ভারভারার অত্যাচার বেড়েই চলেছে। ভারী মজা লাগে ক্লিমের। ভারভারা প্রখ্যাত মহিলাদের ছবি সংগ্রহ করে। প্রাণ-পাত ক'রে সেই সংগ্রহের ভাণ্ডারে যোগান দেয় মারাকুয়েভ। একদিন এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে মেকলের ইতিহাসখানা দেখতে দেখতে মারী স্টুয়ার্টের একখানা কাঠ-খোদাই ছবি ও বেমালুম কেটে নিয়ে এল। সামঘিনের কাছে বকুনি খেয়ে জবাব দিয়েছিল :

'বাচ্চারা তো খেলছিল বইটা নিয়ে!'

আর একদিনের কথা। ডীকনের তারিফ করছিল মারাকুয়েভ:

'গাঁয়ে প্রচারের কাজ খুব ভালো হবে ওকে দিয়ে। এদের মতো পোকারাই রোমানফ্‌দের সিংহাসন কুরে কুরে ফোঁকলা ক'রে দেবে।'

ভারভারা জবাব দিয়েছিল: 'তা পোকার মতোই দেখায় ডীকনকে।'

'এরা যদি পোকা হয়, তবে বীরত্ব, সৌন্দর্য এসব কোত্থেকে আসবে?'

'আরে, আসবে আসবে। সব হবে। দেখই না।' আশ্বাস দিয়েছিল মারাকুয়েভ।

ভারভারা জবাব দিয়েছিল: 'তা পোকার মতই দেখায় ডীকনকে।'

সামঘিন সায় দিয়ে হেসেছিল। সামঘিনের সামনে এমনভাবে থাকে ভারভারা যেন কিছুই বোঝে না। যা বল অমনি বিশ্বাস করবে। এ জন্য ওর ওপর বড় রাগ হয় ক্লিমের। আরও রাগ হয় ভারভারার চেহারা ভালো নয় বলে। মেয়েটাকে খেলাতে, ওকে আঘাত দিতে আরো বেশী ইচ্ছে হয় সামঘিনের। ভারভারার সবুজ চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে ও মনে মনে বলেও:

'মেয়েদের যা আসল চেহারা তা থেকে তাদের অনেক সুন্দরী মনে ক'রে নিতে হয়। তাহলেই জীবনে নারী-সঙ্গের মর্মান্তিক প্রয়োজনকে সহজভাবে মেনে নেওয়া যায়। জীবনে নারীকে অমন দরকার বলেই পুরুষের যত রাগ ওদের ওপর। প্রত্যেকটি পুরুষের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে প্রচ্ছন্ন ভাবে।'

জানে সামঘিন যে নীট্‌শে ও মাকারভের কথাই চর্বিত-চর্বন করছে ও। তা হোক, খানিকটা পাণ্ডিত্য তো ফলান গেল।

অতি মৃদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভারভারা বলে:

'তুমি ভারী সুন্দর কথা বল।'

ওর দীঘল পক্ষের রেখা চোখের ওপর নেমে এল।

ধীরে ধীরে ভারভারার সঙ্গও ভালো লাগে সামঘিনের। সামান্য একটুখানি ভালোবাসার ইঙ্গিতে সাড়াও মিলল ও পক্ষ থেকে।



কি একটা ছুটির দিন ছিল সে-দিন। ভারভারাদের বাড়ি খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। সামঘিন এসে মাকারভকে টেবিলে দেখে অবাক হয়ে গেল। ডাক্তারী পড়ে মাকারভ। এরই মধ্যে রগের কাছে চুলে রুপোলী ছিটে পড়েছে। চোখ গর্তে বসা। যেন অকাল বার্ধক্যের চেহারা। কিন্তু অসুস্থতার ম্লানিমা নেই। শুধু মেয়েদের সম্বন্ধেই কথা বলছে। হয়তো অন্য বিষয়ে কথা বলার মতো ক্ষমতা নেই।

'পুরুষের ওপর যত নিষ্ঠুরতা, যত অন্যায় হয় সবার মূলে এই একটি স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক বিশেষ্য—নারী। হিংসা, দ্বেষ, লোভ, লালসা, চাতুরী—সব ওই নারী।' মাকারভ বলছিল।

ভারভারা ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উগ্রভাবে জবাব দিল। গলার স্বরটা আহত শোনাল:

'আর ভালোবাসা, আনন্দ এ সব?

ক্লিম হাসতে হাসতে জুড়ে দেয়: 'বোকামি, দুঃখ,...নোংরামি।'

'জীবন, সংগ্রাম, জয়...' জের টানে মারাকুয়েভ।

মাকারভ শান্তভাবে বসে রইল। ওদের চেঁচামেচি থামলে ভারী অদ্ভুত একটা কথা বলে বসল:

'ব্যতিক্রম দিয়ে কিছু খণ্ডন করা যায় না। ঘৃণার মধ্যে কেউ কেউ কাব্যের স্বাদও পান।'

সকলের উদ্যত প্রতিবাদকে ভ্রুকুটির আঘাতে থামিয়ে দিয়ে ও বলে যেতে লাগল:

'আমার এ সম্বন্ধে যে মত তা অত্যন্ত সরল। অর্থাৎ নারী জাতিকে যত গাল-মন্দ করা হয়েছে, তার মূলে হচ্ছে সেই আদ্যিকালের ঈভের ওপর আমাদের রাগ। আর রাগের কারণ হলো আদম জানত পুরুষকে চিরকাল নারীর দাসত্ব করতে হবে। এই হচ্ছে তার অবধারিত ভবিতব্য।'

বন্ধুবরের মাথাটা ঠিক আছে কিনা ঠাহর করতে চেষ্টা করছিল সামঘিন। ভারভারা সামঘিনকে জিজ্ঞেস করল:

'তোমার মতও কি তাই নাকি?'

কিছুদিন আগের কথা। একদিন রাতে ওদের গ্রামের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাকারভ তার মানসিক অস্বস্তির কথা শোনার জন্য কি করুণভাবে কাকুতি মিনতি করেছিল সামঘিনের কাছে। আজের এ মাকারভ সে নয়। এ মানুষের ব্যবহার স্থির শান্ত; স্বরে নিশ্চিততা; আগের চেয়ে সিগারেট খায় অনেক কম। কিন্তু দেশলাইয়ের কাঠিটি জ্বালিয়ে শেষ অবধি পুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে তবে ছাড়ার অভ্যাসটি এখনও সেই রকম আছে। মুখখানা আগের চাইতে আর-একটু কঠিন আর-একটু স্থির হয়েছে। গভীরশায়ী চোখ দুটির ভাব হয়েছে কঠোর কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক। মারা-কুয়েভ অত্যন্ত চটে গেছে। সে শরীরটাকে চেয়ারের ওপর আছড়াতে আছড়াতে মাকারভের সামনে আঙুল নেড়ে নেড়ে চিৎকার ক'রে তর্ক করছে:

'যত সব মধ্য-যুগের ভূত! তাতারী বর্বরতা! গির্জাইপনা দেখাচ্ছেন! পড়ে দেখগে শিশকফ্-এর লেখা—"রাশিয়ার নারী" বইখানা। প্রতিভাহীন লেখক

শিশকফ্ যাকে বহুদিন হয় লোকে ভুলে গেছে।

মাকারভের উদ্দেশ্য যে মেয়েদের হীন করা নয় এ কথা বুঝতে পেরেই ভারভারা রাগ করেনি। বরঞ্চ মারাকুয়েভ্‌কে ধমক দিল:

'থামো! অমন ক'রে চেঁচিও না। কিছু বুঝতে পারোনি তুমি...'

ভারভারার কাছে মারাকুয়েভের কদর কমছে দেখে খুশি হয়ে ওঠে সামঘিন।

চুপ ক'রে প্রতীক্ষা করে সামঘিন। মারাকুয়েভের দম ফুরিয়ে গিয়ে চুপ করলে পর আবার ও আরম্ভ করে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, ঠিক যেন মাছি তাড়াচ্ছে। দার্শনিক এন্. এফ্. ফিদোরভ-এর একটা প্রবন্ধের একখানা পুনর্মুদ্রিত কপি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। সামঘিনের অপরিচিত লেখক। খানিকটা পড়ে শোনায় মাকারভ্। লেখার ধরন অদ্ভুত রকম জটিল। লেখক বলছেন ধনতন্ত্রের যাবতীয় হৃদয়হীনতা অতিমাত্রায় ও অস্বাভাবিক যৌন উদগ্রতা এবং জৈব-প্রবৃত্তিরই প্রতিক্রিয়া; কারণ যৌন-প্রবৃত্তিকে সংযত ও সুন্দর ক'রে তোলার কোন উপাদান তাদের নেই। সিগন্যাল-ম্যান যেমন ক'রে লাল নিশান নেড়ে নেড়ে বিপদের সংকেত জানায়, তেমনি ক'রে প্রবন্ধটা নেড়ে নেড়ে বলে মাকারভ্:

'গির্জা গির্জা করেই গেল সব। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধেও সবাই বেশীর ভাগ গির্জার দিকেই তাকিয়ে থাকে। এই লেখক হচ্ছেন অতি চতুর প্রতিপক্ষ। তিনি বলেন মেয়েদের আধিপত্য তেমন-জবরদস্ত না হলেও মারাত্মক বটে। খাঁটি কথাই বলেন। মেয়েদের নিজেদের আধিপত্যের জ্ঞানটুকু এবং তারা যে সংসারের মধ্যমণি, এই বোধটুকু তাদের অজ্ঞাতসারেই জন্মায়—এই সত্যটিকে এমন নিখুঁতভাব রাশিয়ার মধ্যে ইনিই প্রথম বলেন। কিন্তু নারী জাতিই যে সংস্কৃতির প্রধান উৎস ও প্রেরণা—সে কথা স্বীকার ইনি করতে পারেন নি।'

অত্যন্ত বিরক্ত বোধহয় সামঘিনের। কিছুটা অন্ততঃ অস্বাভাবিকত্ব লোকটার মধ্যে আছেই। খুঁজে বের করবার জন্য ও অস্থির হয়ে ওঠে। কোনও দিকে কর্ণপাত না করে ওর একটা ধারণাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা এবং দেশলাইয়ের কাঠি শেষ পর্যন্ত পোড়ানর অভ্যাস দেখে সিদ্ধান্ত করে সামঘিন লোকটা হয়তো একজন ওন্যানিস্ট। সামঘিন শুনেছিল মাকারভ্ ক্লিনিকগুলিতে খুব খেটে কাজ করছে এবং একজন বিশিষ্ট স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ওর খুব যত্ন নিচ্ছেন।

'এখনও কি লিউতভ-এর ওখানেই আছিস নাকি?'

'হ্যাঁ—'

'পানের অভ্যাস আছে?'

'ছাড়তে চাইছি ওটা। একটুও ভালো লাগে না।' জবাব দেয় মাকারভ্। লিউতভ্‌ও তার বাবা যাবার পর থেকে পানভ্যাস কমিয়ে ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এখন ব্যবসা ধরেছে লোকটা। নিজেদেরই ব্যবসা—পাখির লোম আর পালকের। সারা রাশিয়া ঘুরে বেড়ায়।'

*

হঠাৎ সে-দিন রাতে একটা অন্ধকার গলির মুখে লিউতভ-এর সঙ্গে ধাক্কা লাগল সামঘিনের।

'মাপ করবেন।'

'আরে তুমি!' আনন্দে এত জোরে চিৎকার ক'রে উঠল লিউতভ যে চলতি মানুষেরা মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল। মারামারি হবে মনে ক'রে দু'জন তো দাঁড়িয়েই পড়ল। লিউতভ-এর গায়ে ছিল ফার্-এর কোট। মুখের ছাগল-দাড়িতে চেহারাটা দেখাচ্ছিল ঠিক নেক্রাসভের মতো। ক্লিমও বলল সেই কথা।

'তুমি যে তারিফ ক'রে ফেললে হে। লোকে আমায় পাগল বলে জান? চল না, তেসতভ-এর ওখানে যাওয়া যাক। —এই গাড়ি!'

মিনিট পোনেরর মধ্যে একটা শুঁড়িখানার প্রাইভেট্ কামরার মধ্যে এসে ঢুকল ওরা। একটা দীভানে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়ল লিউতভ। তারপর দামী মদে চুমুক দিতে দিতে সামঘিনের দিকে তাকিয়ে খুশিতে, হাসিতে, অনর্গল কথায় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল সে:

'তারপর বুঝলে হে, এক নাগারে প্রায় পাঁচটি সপ্তাহ একেবারে সেই যাকে বলে প্রকৃতির বক্ষে। চারদিকে শুধু জঙ্গল আর তেপান্তরের মাঠ ধু ধু। জন-মনিষ্যির চিহ্নও নেই। এক দিন কি হলো, জানো! আমি ছিলাম মাঠে। হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরুল, আমার মতোই বগলে বন্দুক—কে বলতো! —তুরোবোয়েভ। ও বললে—আমাদের পরিচয় হয়েছে এর আগে মনে হচ্ছে! আমি জবাব দিলাম, তাইতো মনে হচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছিল কি জানো? দিই ওই নোংরা মুখটার ওপর দুম ক'রে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু পারলাম না। হাজার হলেও সভ্য মানুষ তো। পিনাল কোড্ বলে একটা জিনিস আছে, তা তো জানি। তা ছাড়া খবর পেয়েছিলাম আলেনার সাথে ওর সেই সব ব্যাপার ভেস্তে গেছে। যাকগে ছাই। মরুকগে।'

চোখ বন্ধ ক'রে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল ও। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্লিমের গেলাসে মদ ঢেলে দিল।

'আসলে ভাবি টাবিনি কিছুই। এক জন মানুষ দেখতে পেয়ে দারুন খুশি হয়ে উঠেছিলাম। ওই তো জঙ্গল। চারদিকে ঝল্‌সে-যাওয়া পাইনের ঝাড় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সুগন্ধী থাইমের বনে বান ডেকেছে যেন। পাখীরা মেতে উঠেছে। মদ্দা পাখীরা গান গেয়ে মাদীগুলোর মন ভোলাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তুরোবোয়েভ আর আমি। আমরাও তো মরদ। কিন্তু আমাদের গান শোনবার কেউ নেই। আমি তখন একজন সম্পন্ন চাষী পরিবারে থাকি। গৃহ-কর্তা জেমস্‌ৎভোর সমর্থক। এবং উদারপন্থী হলেও দারুণ ইহুদি-বিরোধী। ও লোকটার সঙ্গে থাকা—বাপ্‌স্! আমার তো জান শেষ। ওর গিন্নীর বয়েস বছর চল্লিশ। বসে বসে মোপাসাঁ গেলে আর পেট-ব্যথায় কোঁ কোঁ করে।'

চঞ্চল চোখ দুটো কষে রগড়ে নিয়ে আবার দীভান্-এ এলিয়ে পড়ল লিউতভ।

'এবারে ওখানটা ছেড়ে চলে এলাম তুরোবোয়েভ-এর কাছে। ও রকম লোক আমার ভারী পছন্দ। ঠিক যেন:

নিষ্ফলা সে ডুমুরের গাছ—
কেহ নাই, কিছু নাই তার;
শুধু কায়া আছে, তারও নাই ছায়া।
শূন্যতারে সাথী করি দিবা রাত্র আছে দাঁড়াইয়া।

সবটা ঠিক মনে নেই। ভুল হলো বোধ হয় কোথাও কোথাও। কিন্তু কি মানুষ! নিজের নসিব ঠিক জানে এবং মরবার জন্য একদম তৈরি। আমি স্রেফ্ মুগ্ধ। কিস্‌সু ও বিশ্বাস করে না। করতে পারে না। শেখার মতো। কিন্তু আমাদের লক্ষ

ঝম্প সব থেমে যায়। চারদিকে মুঝিকরা যে মাথা চারা দিচ্ছে হে।' চাপা হেসে ও বলে যায়: 'দুটো গাঁয়ের মানুষ তো ঝেঁটিয়ে নতুন জায়গায় গিয়ে ডেরা ফেলার জন্য তল্পী-তল্পা বাঁধছে। যত মুর্খের দল। আর একটা গাঁ আছে—সেই যে গাঁ খানার মানুষগুলোর নামে সরকারী জঙ্গলে আগুন লাগাবার অপরাধে নালিশ রুজু হয়েছে।'

আলেনা কোথায় জিজ্ঞেস করে সামঘিন।

কোনও অজ্ঞাত কারণে ছাদের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জবাব দিল লিউতভ: 'পারীতে। লিদিয়া লিখেছে আরেকটি মেয়ে থাকে ওদের সঙ্গে। কি নাম, কি নাম...ভুলে গেছি।' উঁচু কপালটা হাত দিয়ে মুছে নিয়ে আবার আগের কথার খেই ধরে: 'চাষীরাও জেগে উঠেছে। তোমার কি মনে হয়, চাষীরা আন্দোলনে নামবে?'

'বিপ্লব হবেই।' জবাব দেয় সামঘিন। ও মনে মনে ভাবছিল লিদিয়ার কথা। এই অপদার্থটার কাছে চিঠি লিখবার সময় হ'লো, কিন্তু ওর কাছে লিখতে পারলো না! আবোল তাবোল বকে যাচ্ছিল লিউতভ। অন্যমনস্ক ভাবে শুনতে শুনতে ভাবছিল সামঘিন। দুই একবার খুব লম্বা লম্বা চিঠিও লিখেছিল লিদিয়াকে, লিখে দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে দেখে অত্যন্ত সাবধানতা সত্ত্বেও দু'চারটে এমনি কথা লিখে ফেলেছে যাতে নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যায়। লিদিয়াকে তো আর বলাই চলেনা। সুতরাং চিঠি আর ডাকের পথ খুঁজে পায়নি। ঐ পর্যন্তই।

একটু একটু ক'রে মদ খেতে খেতে কথা বলে লিউতভ এমন ভাবে যেন ওর মুখ পুড়ে গেছে:

'শক্ত হয়ে থাকো, সামঘিন। তুমি তো অল্প কথার মানুষ। পদাতিকও নও, সওয়ারী-ফৌজও নও। তুমি হচ্ছো একেবারে ইঞ্জিনীয়ারিং ফৌজ—হয়তো একাধারে গোটা জেনারল স্টাফই তুমি।'

সন্দিগ্ধ ভাবে ভ্রূ কোঁচকায় ক্লিম। যা বলছে হয়তো আন্তরিক ভাবেই বলছে লিউতভ। কারণ কথিত আছে যে-কথা সুস্থ মানুষের মনে থাকে, মাতালের তা থাকে জিভের ডগায়। আরও মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করে। বলে যায় লিউতভ:

'আর আমি ফাঁদে-পড়া শিকার, তুরোবোয়েভও তাই। ইতিহাসের সঙ্গে পা ফেলে সে আর চলতে পারছে না। আর আমি ফেঁসেছি মদের প্রেমে। তাই তো আমাদের এত মিতালি। এতে হাসবার কিছু নেই হে, হাসবার কিছু নেই।'

দীভান থেকে লাফ দিয়ে নেমে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল লিউতভ। ওর পায়ের দাপটে ঘরের কাচ, শিশি বোতল ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল।

'ঘণ্টাখানেক আগে গিয়েছিলাম একটা জমায়েৎ-এ। সেখানেও সুরু হয়ে গেছে ছট্‌ফটানি। ওরাও দেখলাম, এই আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য সব পতঙ্গের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এক মহিলাকে দেখলাম—এই এতখানি নাক, দ্রুঝ্কি-চালকের মতো চেহারা। মহিলার স্বামী নাকি একজন জেনারেল এবং প্রিভিকাউন্সিলার। বিরাট বড়লোক এক মদ চোলাই-ওয়ালার মেয়েও এসেছে দেখলাম। আরো অনেকেই এসেছে। অতি ভালো লোক সবাই। অর্থাৎ সকলেই জনগণের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছে। একটা পত্রিকা—মানে মার্ক্সবাদী পত্রিকা বের করবে—তাই টাকা তুলছে।'

পাগলের মতো হাসতে হাসতে ছুটে টেবিলের কাছে এসে নিজের গেলাসটা সামঘিনের গেলাসের সাথে ঠেকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল:

'রাশিয়ার গ্রামগুলিতে সব থেকে মোটাবুদ্ধি যে-সব গিন্নীমায়েরা আছেন—আমি তাদের স্বাস্থ্য পান করি। কেন, বুঝলে? অর্থাৎ কিনা—যারা ছুটন্ত ঘোড়া

থামাতে পারে তারাই জ্বলন্ত ঘরে ঢুকবে গিয়ে।'

ঢক্ ঢক্ ক'রে মদটা গিলে ফেলে গেলাসটা স্টোভের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর আবার বলতে লাগল:

'সত্যি বলছি, ওদের দেখলে আমার বড় ভয় করে। কি পাহাড়ের মতো এক-এক খানা বুক রে বাবা! কিন্তু ওই বুকের দুধ খাইয়ে খাইয়ে মাঠাকরুণেরা বোকার ঝাড়ই বাড়াচ্ছেন শুধু। হ্যাঁ বাবা, হক্ কথা। প্রতিভা থাকলেই হলো না। একটা বিশেষ পরিমাণের প্রতিভা থাকলে আবার মানুষ বুদ্ধু হয়, আর প্রতিভাধর যদি হয় তো সে সাংঘাতিক অসহ্য রকমের প্রতিভাধর। অন্ততঃ আমাদের রাশিয়ায় তো বটেই।' বসে প'ড়ে লিউতভ ক্লিমের ঘাড়ে এক খানা হাত রাখে।

'তোমরা গাণিতিক আর জার্মানদের মতো, পাকা হিসেব-নবিসের মতো মানুষের দুঃখ দুর্দশার হিসেব খতাও, মায় ধন ঋণ সব। কিন্তু কলজে তোমাদের একদম বে-দরদ। জাহান্নামে যাও সব।'

অবাক হয়ে যায় সামঘিন। 'তাহলে আমার সম্বন্ধেও ওর ওই ধারণা!' ভাবে। লিউতভ ওর ঘাড়টা মোচড়াতে সুরু করে। কেমন ভালো লাগে না সামঘিনের। ওর হাতটা সরিয়ে দিয়ে জবাব দেয়:

'আমাদের অনেক দুঃখ কষ্টই আমরা নাহক্ বাড়িয়ে তুলি।'

এক ঝটকায় সামঘিনের কাছ থেকে সরে গিয়ে লাফাতে লাফাতে বলে লিউতভ:

'আমায় বলা হচ্ছে বুঝি? মিথ্যে কথা। আমি...কিন্তু যাক্‌গে... আমি দুচোখে তোমায় দেখতে পারি না। বুঝেছ। একটুও না—' আবার চিৎকার করতে আরম্ভ করে। 'তুমি মানুষটা ইনটারেস্টিং বটে, কিন্তু তুমি সেই যাকে বলে দরদী নও। বোধহয় আমার চাইতেও তুমি খারাপ।'

উদ্ভ্রান্তের মতো অংগভংগি করতে লাগল লিউতভ। গলার স্বর মিইয়ে গিয়ে ফিসফিসানির মতো হয়ে উঠল:

'কোন আশমান থেকে জনগণকে দেখ তোমরা? ছাতের ওপর থেকে?'

প্রায় আধ ঘন্টা খানেক চেষ্টার পর ঠাণ্ডা হলো মানুষটা। কিন্তু আবার পাগলামো করতেই সামঘিন ভদ্র ভাবে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। চলতে চলতে আবার ও মনে মনে ভাবে: 'আমাকে এই ভাবছে ও!'

কিন্তু এবারে ওর একটুও দুঃখ হলো না। ভাবল, সবাই হয় তো তাই ভাবে। আমিই হয়তো পারি না। দরদ নেই আমার? নাই থাকল। কি হবে দরদ দিয়ে?

লিউতভের বুদ্ধি নেই একথা কেউ বলবে না। নিজের সম্বন্ধে তার অভিমতটা জেনে খুশিই হ'লো সামঘিন যদিও দরদ-হীন আখ্যা পেয়ে অভিমানে একটু ঘা লেগেছে। তবু নিজেকে যেন অনেকটা বুঝতে পারল ও। নিজেকে মৌলিক ও গুরুত্ব সম্পন্ন বলে ওর যে ধারণা ছিল তা আরও উন্নত হলো।

*

এর দিন পোনের আগের ঘটনা। মনটা কেমন খিঁচড়ে ছিল। বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। এল ভারভারার ওখানে। খাবার ঘরের দরজায় এসে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামোভারের সামনে টেবিলে বই নিয়ে বসে আছে লুবাশা সমভা। ছোট খাট নাদুস্ নুদুস্ মানুষটি—যেন স্ত্রী বুলফিঞ্চ পাখীটি। ওকে দেখেই

খাটো হাতখানা নেড়ে—'এই যে এসে গেছ!' —বলে ছুটে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে, উচ্ছ্বসিত হয়ে কলরব তুলে, আদরে গদগদ হয়ে ওকে ঘর ময় চরকি ঘোরাতে লাগল। লুবাশার উচ্ছ্বাসে ভেজাল নেই। কিন্তু ক্লিম বড় বিব্রত হয়ে উঠল। ও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কোন মতে মিন মিন ক'রে বলল:

'আরে একি? দাঁড়াও, দাঁড়াও। একেবারে হঠাৎ! কোত্থেকে এলে?'

সমভা গৃহকর্ত্রীর ঠাটে জাঁকিয়ে চেয়ারে বসে ওর মুখের কথা লুফে নিয়ে জবাব দিল:

'পারী থেকে। লিদিয়া পাঠিয়েছে। এখানেই থাকব এখন। গিন্নীর সাথে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু গিন্নীটি কে হে? লিদিয়া ভারী প্রশংসা ক'রেছে মহিলার।'

তারপর চোখ বন্ধ ক'রে মাথা নেড়ে সুরেলা স্বরে বলল:

'আহারে, ক্লিম ভাই, কি চমৎকার জায়গা যে পারী কি বলব!'

ক্লিমের হাঁটুতে আস্তে আস্তে থাবড়া মারতে লাগল। 'পারী না দেখলে জীবন যে কাকে বলে তা ঠিক বোঝা যায় না।' বলেই একটু থেমে ঠোঁট কামড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্লিমের চশমার দিকে তাকিয়ে শুধাল:

'মার্ক্সবাদী?'

'হাঁ।'

'ধেৎতারিকা! মার্ক্সবাদের যেন মড়ক লেগেছে। জানো! লিদিয়া এখন পাগল! ধর্ম, দর্শন, আর—ইনোকভ কোথায় হে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসল সমভা। কিন্তু জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার কলকল ক'রে চলল:

'চা খাচ্ছো না কেন? সামোভারটা দেখে আমি তো খুশির চোটে নেচেই উঠেছিলাম। শোন সুইট্‌জারল্যাণ্ডে গেছে একজন, তার সঙ্গে ছিল একটা সামোভার...'

ওর অসংলগ্ন প্রলাপকে মাঝপথে বাধা দিয়ে সামঘিন বলল:

'ইনোকভ এক মহিলার প্রেমে পড়েছে। মহিলা ওর চেয়ে বছর দশেকের বড়। প্রেমে শুধু পড়েনি, হাবুডুবু খাচ্ছে। এবং বর্তমানে কবিতা লিখছে। মানে কবিতা না বলে বলো গবিতা।'

অবিশ্বাসের সুরে সমভা জিজ্ঞেস করে: 'গবিতা? তার মানে?' আর কিছু বলল না। চিন্তান্বিত ভাবে মাথা নীচু ক'রে নিজের বেণীটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

'কি ভাবছ? "পুরানো প্রেমে মরচে ধরে না". না?' জিজ্ঞেস করে সামঘিন।

সমভা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে চায়ের গেলাসে হাত গরম করতে করতে বলে:

'ভালো লেখা তো উচিত ওর। ওর মধ্যে লেখার শক্তি আছে।'

গুছিয়ে বসে সমভা। আবার আরম্ভ করে আগের মতো খাপ ছাড়া কলকল। হঠাৎ হঠাৎ ছেঁড়া ছেঁড়া প্রশ্ন আর টিপ্পনী। প্রথমটায় সামঘিনের মনে হয়েছিল বিদেশ ঘুরে এসে সমভার রাশিয়ান বৈশিষ্ট্যগুলি আরও পরিস্ফুট হয়েছে। সেই জন্যই বোধহয় এত লবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে ও। নীলাভ চোখ, গোলাপী গাল, ঘন সোনার বরণ চুল আর চিকণ ক'রে আঁচড়ান মাথা—সব মিলিয়ে এ মেয়ে যেন খাঁটি রাশিয়ার কৃষক-বালা। কিন্তু বড্ড বেশী কথা বলছে। বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে। কথা বলার সময় আবার অঙ্গ ভঙ্গি করে। খুদে খুদে বেঁটে হাত দুটো এমন ভাবে নাড়ে যে দেখলে হাসি পায়। কি রকম বিশ্রী জবরজঙ্গ একটা ব্লাউস পড়েছে।

ওটাতে আরো বেঁটে আর মোট দেখাচ্ছে ওকে। ঠিক যেন মুরগী। মুরগীর মতোই কলকলিয়ে কথা বলছে।

'তাই তো বন্ধু, আমার প্রেমে পড়তে ভারী ইচ্ছে করে। সাবধান থেকো।' সতর্ক করে দেয় সমভা। চেয়ারটাকে টেনে আরো কাছে নিয়ে এসে বসে। তারপর মানুষ ক্লান্ত হয়ে বাইরে থেকে এসে যেমন ব্যস্ত হয়ে জামা কাপড় ছাড়ে, ঠিক সেই রকম ভাবে ব্যস্ত হয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বলতে আরম্ভ করে:

'রোম্যান্স একটা ঘটেছিল, কিন্তু কপালে টিকল না।' চোখ টিপে টিপে হাসে। ক্রমে যেন নিভে আসে চোখ দুটি। 'ক্রিমিয়ায় ছিলাম তখন। চাকরী করি এক মহিলার কাছে। কাজটা হচ্ছে তাঁকে বই পড়ে শোনান। ভারী বিশ্রী কাজ। অনেক দিন থেকে ভুগছিলেন মহিলা। বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিছু তো আর বলা যায় না। কিছুদিন পর তার ছেলে বাড়ি এল। আস্ত হাঁদারাম একটি, হাড়-গিলের মতো চেহারা। ছুঁচলো এক ছিটে এতটুকু একটা নাক। কিন্তু চোখ দুটি! আঃ, অদ্ভুত সুন্দর! হলে হবে কি। এক ফোঁটা বোধসোধ ছিল না মানুষটার। কিছু বুঝত না।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আঙুল নাচিয়ে ক্লিমের কানে কানে বলল: 'কাউকে বলো না যেন—!'

'চোখের কথা?' দুষ্টুমি ক'রে ক্লিম বলে।

'না না, এ বিষয়ে কিচ্ছু বলবে না কাউকে।' কাঁধের ওপর বেণী দুলিয়ে ব্যগ্র স্বরে মিনতি করে ও: 'সব তাতেই খালি বলত—ঐ যাঃ, এতো জানতাম না! সত্যি জানত না। মন্দ কাকে বলে স্রেফ জানত না। ও যেন একটা বন্ধ কাঁচের আলমারীর মধ্যে বাস করত। আশ্চর্য! কি যে ছেলেমানুষ ছিল! নেহাৎ শিশু। সেই শিশুর সঙ্গেই প্রেমে পড়লাম। লোকটা জ্যোতির্বিদ্‌ ভূতত্ত্ববিদ্‌, মানে একাধারে সব বিদ্‌। ফাইল্লার নামে কে জানি একজন, কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, তার তত্ত্ব খণ্ডন করা সে এক কাজ ছিল ওর সর্বক্ষণ। কিন্তু সব জড়িয়ে বেশ মানুষটা। যেন স্বয়ং ভগবানের পোষা বাঁদরটি। ঠিক ইনোকভের মতো।'

এই স্থূল বিশ্লেষণগুলো সামঘিনের একটুও ভালো লাগছে না। ওর মনে হলো সমভা বোধহয় কথার ধরনটাই শুধু মনে রাখে। তাই জিওলজিষ্টকে বলল জিকোলজিষ্ট। এমনিতেই কথা বলতে গেলে ভাষায় থাকে হাজারটা ভুল। কোন কথা স্পষ্ট করে গোটা উচ্চারণ করে না। শেষের অংশটা হয় বাদই দেয়, নয় এমন আস্তে উচ্চারণ করে শোনাই যায় না। চাইলড্‌ কথাটাকে কখনও চাইলড্‌ ব'লে উচ্চারণ করে না। বলে—চাইল।

'দিন রাত্তির কেবলি গুনছে আর গুনছে—ত্রিশ লক্ষ বছর, সাত লক্ষ কিলো-মিটার—কেবল শূন্যের ছড়াছড়ি। এক দিন ওর চোখে চুমু খেতে যাচ্ছি—ও তখন আওড়াচ্ছে কাল্ট আর লাপ্লাশ, গ্র্যানাইট্‌ আর এমীবা। আমার মনে হলো লোকটার কাছে আমিও একটা শূন্যেরই সামিল। কিন্তু তা হলেই বা কি! আমি যে মজেছি। আমার তখন নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছিল।'

হাসে সমভা। কিন্তু ওষ্ঠের ওপর দাঁত শক্ত হয়ে বসেছে, চোখ উঠছে ছলছলিয়ে।

'কান্না পেয়ে যাচ্ছে। কি বোকা আমি না?' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সমভা।

'কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত আমারি জয়। আমার সঙ্গে বাছা-ধনকে প্রেমে পড়িয়ে তবে ছেড়েছি। সে যে কি আশ্চর্য কি বলব তোমায়! ও যেন একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল। সবে যেন ও ঘুম ভেঙে মেসোজয়িক যুগ থেকে

নক্ষত্রপুঞ্জের নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাহু দুটি ছিল লম্বা কিন্তু শক্তি ছিল না তাতে। ও আমায় চুমু খেত, বুকে জড়িয়ে ধরত এমন ভাবে যেন এই মাত্র নতুন ক'রে ও জন্ম নিল সম্পূর্ণ এক আলাদা দুনিয়ায়।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে ও কাঁদতে লাগল। উড়ে গেল সংযমের শোভনতা; মুখের হাসিকে ডুবিয়ে অঝোরে চোখের জল ঝরতে লাগল, রোদ-ভরা আকাশে বৃষ্টির কান্নার মতো।

'ওর ভেতরে প্রেম যে রূপ নিল তা যেন ওকে লোকান্তরে নিয়ে গিয়ে একেবারে জন্মান্তর ঘটিয়ে ছেড়ে দিল।' বেণীর ডগা দিয়ে চোখের জল মুছে বলে সমভা। কান্নায় যেন ও গলে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কোথায় যে তার কারুণ্য ক্লিম এক বিন্দুও খুঁজে পেল না। তবু চোখের জলে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

'তারপর—ভাবতে পারো তারপর কি হলো ? এক দিন রাতে ওর মা আমার ঘরে এলেন। এমনি গম্ভীর মুখ ক'রে এলেন যেন সাংঘাতিক কোন বিপদ ঘটেছে। বিনা ভূমিকায় বললেন—এই মাত্র আমার ছেলের কাছ থেকে শুনলাম সে তোমাকে বিয়ে করতে চায়। লক্ষ্মীটি তুমি তাকে মানা কর। বল যে তুমি চাও না। তোমার কাছে মিনতি করছি আমি—ভিক্ষা চাইছি—তাকে ফিরিয়ে দাও। কত বড় বিরাট ভবিষ্যৎ তার সামনে পড়ে রয়েছে। অত বড় একজন বিজ্ঞানী। তার কি এখন বিয়ে করা উচিত ? তোমার দুটি পায়ে পড়ছি—সত্যি সত্যি পায়ে পড়েন আর কি—অথচ আমাকে ঝি-চাকরের মতোই দেখেছেন এতদিন। হায় ভগবান!'

পাঁজর ভেঙে ওর কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল। কান্না চাপার জন্য রুমালটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রইল। গাল দুটো ফুলে উঠল। ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বাস পড়তে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধা মানল না। ফোলা গাল বেয়ে ধারাসারে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল।

'কি আর বলব—বড় কঠিন—আমি ভাবতেও পারি না—তবু বললাম, তাই হবে। যা চান তাই হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ভোরবেলা চুপচাপ চলে এলাম। ও ঘুমিয়ে ছিল। একখানা চিঠি লিখে রেখে এলাম—বিলিতি নভেলী ঢঙের চিঠি আর কি—বেশ করুণ ক'রে, দুটো প্রেমের কথা ব'লে—বেশ গুরু গম্ভীর চিঠি। বাস হয়ে গেল আর কি।'

চোখের জলে ভেজা রুমালটা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে একটা আরামের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে:

'ও মানুষটার একটুখানি ভালোবাসা পাবার জন্য কি সাধনাই না করেছি।'

হাসি লুকোবার জন্য মাথা নীচু করে সামঘিন। কাহিনীটা শুনে ওর মনে হয় এ মেয়ের চেহারা ও চরিত্র নাটকের উপযোগী নয়, মিলনান্ত উপন্যাসেই খাপ খায় ভালো। তবু ওর অদৃষ্ট ওকে নিয়ে নাটক করিয়েই ছাড়ল। একটু দুঃখ হয় সামঘিনের। নাটকের অভিজ্ঞতা ওর নিজেরও আছে। যে-আলোড়ন ওর অন্তরকে মথিত করছে, তাকে ও কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবে! কিন্তু সমভার শেষের কথা কটি ওর সমস্ত সমবেদনা এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিল। একটু ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল সামঘিন:

'ওর সঙ্গে এক সঙ্গে থেকেছ কখনও ?'

মাথা নাড়ে সমভা। একেবারে নরম হয়ে কুঁচকে যেন এতটুকু হয়ে গেছে ও। কাঁধ নেতিয়ে পড়েছে। মাথাটা একদিকে হেলিয়ে ছোট আঙুলগুলোতে বেণীর ডগাটা জড়াতে জড়াতে ও বলল:

'ওর মা ওকে জার্মানীতে নিয়ে গিয়ে এক জার্মান প্রফেসরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। স্নায়ু-বৈকল্যে ভুগছে এখন। একটা স্যানাটোরিয়মে আছে চিকিৎসার জন্য। ওর বাবার ডিপসোম্যানিয়া ছিল।'

একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে।

'আমার যে এতে ভালো হবে না এ আমি প্রথম থেকেই জানতাম। আমার ভাগ্যে সবই কেমন গোলমাল হয়ে যায়—!'

ওর চোখ দুটি অসহায় হয়ে ওঠে। বেদনার্ত চোখে কি একটা জিজ্ঞাসা ঘনিয়ে ওঠে। সামঘিন ভয় পায়, আবার বুঝি কাঁদতে আরম্ভ করবে মেয়েটা। তাই আলেনার কথা তোলে ও। সমভা বলে:

'দিব্যি আছেন তিনি। কি বেপরোয়া মেয়ে বাবা! সে আলো আর নেই, চিনতেই পারবে না ওকে। গাঁয়ে টায়ে সৈন্যদের বিধবা বৌরা যেভাবে থাকে ঠিক সেই রকম হয়েছে। অপূর্ব সুন্দরী দেখতে। পালে পালে সব পুরুষরা ওর চারদিকে কিলকিল করে। জানো নিশ্চয়ই—না জানো না—আলেনা আর লিদিয়া যে ফিরছে শিগ্গিরই।'

উঠে পড়ে সমভা। আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিয়ে বলে:

'যাই একটু মুখহাত ধুয়ে আসিগে। কিন্তু যাই কোথায় বল তো?'



সমভা নাইতে গেছে। এমন সময়ে ভারভারা ফিরল। তার একটুখানি পরেই এল মারাকুয়েভ্...ছ্যাৎলা-ধরা একটা কোট গায়ে, পরনে ঢলঢলে প্যান্ট, পায়ে উঁচু বুট।

'আবার বহুরূপী সেজেছ?' ব'লে বাঁকা বাঁকা স্বরে ওকে স্বাগত করে ভারভারা।

মাত্র আধঘন্টাটেক গেছে, সামঘিন লক্ষ্য করে, এরই মধ্যে সমভা যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে এল। বেশ বোঝা গেল মারাকুয়েভের সঙ্গে ওর বহুদিনকার আলাপ। কিন্তু দু'জনের মধ্যের সম্পর্কটা মধুর নয়। সমভার প্রথম সম্ভাষণই এল চ্যালেঞ্জের সুরে:

'হে সত্য এবং সাচ্চাই-এর পীর, আপনাকে বড়ই বিচিত্র দেখাইতেছে।'

সমভাকে দেখামাত্র মারাকুয়েভের ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটে যে রেখা ঘনায়িত হয়ে উঠেছিল তা এক নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফরাসী ভাসায় কি একটা কথা বলল।

বলেই বোধ হয় বুঝতে পারল জবাবটা সংগত এবং ভদ্রোচিত হয়নি। ওর মুখ আবার অন্ধকার হয়ে উঠল। ভারভারা চা তৈরি করতে ব্যস্ত। এই অবসরে সমভা আর মারাকুয়েভের মধ্যে রীতিমত বচসা বেঁধে গেল। টান হয়ে দাঁড়াল সমভা। খাড়া হয়ে উঠল ওর জামার ফিতে ও ফিতে দিয়ে বানান ফুল। এক মুহূর্ত আগে যে-মেয়ের ফোলা গাল দু'টো চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল সেই মেয়েকেই যখন নাক সিঁটকিয়ে মারাকুয়েভকে বলতে শুনল: 'যত সব বাজে ভাবালুতা.' হাসি পেয়ে গেল সামঘিনের।

সামঘিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে সমভা:

'এখনও কি এ লোকটা গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ধুনো জ্বালায় নাকি?'

মারাকুয়েভ বলে উঠল: 'মার্ক্সবাদ তোমা দ্বারা হবে না।'

'আমি মার্ক্সবাদী কি না জানিনে, তবে কথা কি জানো, আমি যা বুঝিনে, বাইরে তা নিয়ে হাঁক-ডাক করিনে। মানুষকে ভালোবাসি ভালোবাসি বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটাইনে।'

অবাক করল মেয়েটা। হতভম্ব হয়ে গেল ক্লিম। কত সাত-সতের রকমের কথা বলে চলেছে। নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তে বলছে না, বা এ ওর মনের কথা নয়। যা মাথায় এল দুম্ ক'রে তা বলে ফেলল, এই আর কি। ওর মনে পড়ে সেই যখন ছোট্টটি ছিল সমভা...কি বিশ্রী মেজাজ ছিল! অদ্ভুত অদ্ভুত ফন্দী ফিকির আবিষ্কার করে মানুষকে জ্বালাতো সর্বক্ষণ। কি অস্বাভাবিক পরবর্তন হয় মানুষের। কোন্ দিকে কিভাবে যে মানব-চরিত্রের মোড় ঘোরে তা কেউ বলতে পারে না।

ভারভারা তাদের এই অপ্রত্যাশিত নতুন বোর্ডারকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখছিল পক্ষজালের ভেতর দিয়ে প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে। কথা না বললেও ক্লিম বেশ বুঝতে পারল যে ভারভারা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে। মারাকুয়েভ চা খেতে ব্যস্ত। নেহাৎ অনিচ্ছায় মাঝে মাঝে জবাব দিচ্ছে। অনভ্যস্ত পোশাকটা পরে ও বিশেষ বিব্রত, এবং কেন জানি আজ ওর মেজাজও একটু বেশী রকমের খারাপ। সমভা অনর্গল বক্‌বক্ ক'রে চলেছে; কেউ ভ্রূক্ষেপ করছে না।

'দেশে থাকতে যে কাজ করতাম আমি তো কাজ হিসেবে দরকারী কাজই করেছি বলেই ভাবতাম। কিন্তু মালিকের পক্ষে সে ছিল নেহাৎই অদরকারী। তবু সে কোনরকমে আমাকে বরদাস্ত করত, বাগানে কাকটা বসলে যেমন কেউ তাড়িয়ে দেয় না, সেইরকম আর কি। ভদ্রলোকের চাষবাস ছিল। লেখা পড়া জানত না; কিন্তু নিজস্ব ধরনে চাষের কাজ বেশ ভালো জানত। লোকও বেশ ছিল। এবং মনে করত দুনিয়ায় ওই একমাত্র কাজের লোক এবং ওকে না হলে চলবে না। অথচ এও বুঝত সে করেছে বহুমনিবের খিদ্‌মত যা নাকি অত্যন্ত অসম্মানজনক ও হীন। ওর ছেলেপুলেদের আমি তো ঠুকে ঠুকে বিজ্ঞান পড়াতাম। কিন্তু ও নিজে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করতো না। আসল কথা ও কিছুই বিশ্বাস করতো না।'

মারাকুয়েভ অস্পষ্ট স্বরে কি যেন একটা বলল গোঁড়ামী নিয়ে। সমভা ধমকে উঠল : 'বোকার মতো কথা ব'লো না। যীশুখৃষ্টের নামে বিপ্লব হবার দিন গেছে। আদৌ ও রকম কোন বিপ্লব হয়েছিল কিনা তা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ।'

নিরাশ ভাবে হাত নেড়ে অলস সুরে শুধু বেশ বেশ বলে থেমে গেল মারাকুয়েভ।

'আমি আবার বলছি, কিছুই বিশ্বাস করতো না সে।' টেবিলে সজোরে একটা কিল মেরে বলে উঠল সমভা।

কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। সমভা বুঝতে পারল ওর বকবকানীতে সকলেই বিরক্ত হচ্ছে। একটু দুঃখ হলো ওর। বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। ও ঘরটাতেই লিদিয়া থাকত। মারাকুয়েভ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল :

'মার্ক্সবাদ মানুষকে বড় রুক্ষ ক'রে তোলে।'

'অনেকদিন থেকে চেনো নাকি সমভাকে?' ক্লিমকে শুধায় ভারভারা।

'হাঁ, ছোট বেলা থেকেই।'

'খুব ভুখোর মেয়ে—না?'

'এই যেমন দেখছ।' বলে ক্লিম বিদায় নিল।

সমভার এখানে আসা একটুও ভালো লাগল না ক্লিমের। ওর শৈশবের সাক্ষী

হয়ে ভারভারার এখানে ও থাকবে, বারে বারে ওর সঙ্গে দেখা হবে—অসহ্য লাগতে লাগল এ চিন্তা। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল—সমভা ওর শান্তি ভঙ্গ করবে না। সে প্রফেসর গোরিয়ের কলেজে ভর্তি হবার জন্য প্রাণপণ পড়াশোনা করছে। বলের মতো সারা মস্কো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ক্লিমের সঙ্গে দেখা হলেই খুশিতে ডগমগ হয়ে কলকলিয়ে ওঠে:

'কি চমৎকার শহর। ঠিক যেন পরীর রাজ্য। যতই চল, মনে হবে স্বপ্ন-রাজ্যের মধ্য দিয়ে চলেছ। হঠাৎ দেখবে পথে আর নেই তুমি। ঘুরছ বিপথে। পথটা বেমালুম হারিয়ে গেছে। ভারী সহজে পথ হারানো যায়, ক্লিম। আচ্ছা লেভ তিখোমিরোভ কি মস্কোর লোক? জানো না? তাই, আমি জানি, উনি মস্কোরই লোক।'

কৌতুক বোধ ক'রে ক্লিম বলে: 'কিসে তোমার মনে হচ্ছে ইনি মস্কোর লোক, বলতো?'

'উনি যে পথ হারিয়েছিলেন!'

'তুমি তো মস্কোর নও, কিন্তু তুমিও তো পথ হারিয়ে ফেলেছিলে। আচ্ছা, তুমি 'বস্তুবাদের ইতিহাস', আর ডঃ প্রেল-এর লেখা 'রহস্যবাদের দর্শন' পড়েছ কি?'

'সবই তো জানতে হয়, বন্ধু।'

ভারভারা শুষ্ককণ্ঠে মন্তব্য করে: 'ও সব বড় বড় পুঁথিতে মেয়েদের সম্বন্ধে ভারী বিশ্রী ক'রে লেখা থাকে।'

চিন্তিতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেণী নিয়ে টানাটানি করতে থাকে সমভা।

'জুরিখের একজন প্রফেসরও ওই কথা বলেন। তিনি নারী-বিদ্বেষী। কি যেন নামটা! মনে পড়ছে না। ভারী রাগী মানুষ। সুইস্-জার্মানরা ভারী রাগী জাত। ওদের ভাষাটাও তাই।'

ক্লিমের সঙ্গে দেখা হলেই দুনিয়ার খবর দেয় সমভা। ছাত্রদের মধ্যে কবে একজন গোয়েন্দা বেরিয়েছিল। একদল ছাত্রের অধিকাংশই মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছে; একজন নতুন গুপ্ত কর্মী এসেছে কোথা থেকে—ইত্যাদি। বলতে বলতে সুখে ওর চোখ ঝলমল করে। ক্লিম অনুভব করে শিশুর মতোই বাঁচার আনন্দে কল্লোলিত হয়ে উঠেছে সমভা। যা দেখে তাই ভালো লাগে সমভার—মানুষ, বাড়িঘর, ত্রেতিয়াকফ-গ্যালারীর ছবি, ক্রেমলিন, থিয়েটর—দুনিয়ার সব ভালো লাগে। এ মেয়ের এই ভালো লাগার ক্ষমতাকে কাঁচা মনের সারল্য বলে অবজ্ঞা করতেও হিংসা হয় ক্লিমের। এসব জিনিষ সম্বন্ধে ভারভারাও আলোচনা করে সরল আনন্দে। কিন্তু তার মধ্যে মুন্সিয়ানা থাকে। তার ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক।

॥ ৭ ॥

ভারভারা সামঘিনের কাছে গল্প করে কোথায় কোন ছাত্র কোন অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছে; কতগুলি বড়লোকের ছেলে হৈ হৈ করবার জন্য দঙ্গল বেঁধে 'স্ট্রেলনা' ও 'য়ার'—এ গিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কি রকম বিশ্রী মাতামাতি করে; চার্লস্ অমন্টের মঠে যে নূতন গায়িকার দল এসেছে তাদের কথা বলে; এ ছাড়াও অমুকের ব্যর্থ-প্রেম, আর একজনের বিড়ম্বিত জীবন-নাট্যের ইতিবৃত্ত—ইত্যাদি বহুরকম কথা। কিন্তু ওর বলার ধরন সামঘিনের কাছে বড় নীরস লাগে। ওর আখ্যান ভঙ্গিমার মধ্যে কোন লালিত্য নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ আখ্যান বস্তুগুলো বেশী ভালো লাগে। মাঝে মাঝে দর্শন ফলাতে যায় ভারভারা। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সেই একই কথা রোজ বলে: 'প্রেম কায়া, তার অবধারিত ছায়া হচ্ছে দুঃখ।'

ভারভারার গল্প করার ধরনে দ্রোনভের কথা মনে পড়ে ক্লিমের। মহিলার কাছে নারী-পুরুষের দেহ-ঘটিত প্রেমের অজস্র কাহিনী শুনে শুনে ওর যে মানসিক অবস্থা ও মেজাজ সৃষ্টি হয়, সামঘিনের কাছে তা অত্যন্ত মূল্যবান। আদিম প্রবৃত্তির ঘূর্ণি-ঝড়ে অসহায় ভাবে এমনকি অত্যন্ত অমর্যাদাকর ভাবে ওলট্ পালট্ হচ্ছে কত নামজাদা আইনজীবী, বিরাট বিরাট ধনী শিল্পপতি, তরুণ কবি অভিনেতা-অভিনেত্রী, ছাত্র-ছাত্রীর দল। শিক্ষাপ্রদ, মুখরোচকও বটে। এখন ও বিশ্বাস করতে পারে যে জীবনের এই হলো নগ্ন সত্য। মান-অভিমান, মিষ্টিকথা ইত্যাদি নিয়ে কারবার করে বটে, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই জীবনে। আজ যেন ও নতুন করে জানল এবং জেনে খুশি হলো যে এই চিরন্তন বিধি এবং এ বিধি অমোঘ। এর অবসান ধর্মযাজক, শ্রমিক-শিল্পী, মারাকুয়েভের মতো বিপ্লবের পাণ্ডা, কারো সাধ্য নয়। মনে পড়ে মাকারভ একদিন বলেছিল: 'নারীর আধিপত্য প্রবল না হলেও প্রাণান্তকর।' মনে পড়ে প্রিন্স শেরবাতফ্-এর লেখা: 'নৈতিক আদর্শের অবনতি' বইখানার একটি লাইন:—'পুরুষের অপেক্ষা নারী বেশী অত্যাচারী হয়।' এই সব নানা কথা মনে পড়ে। ভারভারার দিকে চেয়ে মনে মনে ক্লিম হাসে।

সামঘিনের বুঝতে বাকী রইল না যে ভারভারা ওর প্রেমে পড়েছে। নানা অছিলা ক'রে ওকে একটু ছোঁয়ার সুযোগ খোঁজে; পরক্ষণেই মুখটা লাল হয়ে ওঠে। গোলাপী নাসা-রন্ধ্র দুটি থির থির ক'রে কাঁপতে থাকে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে। ওর ওই ছলনা অত্যন্ত স্থূলভাবেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

ক্লিম মনে মনে বলে:

'না, এর শেষ ক'রে দিতে হবে। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না।' আরও বেশী তাগিদ অনুভব করে ক্লিম, যখন দেখে মারাকুয়েভের—সেই হাসিখুশি মানুষটার—মুখ ক্রমশঃই কালো হয়ে উঠছে। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অন্ধকার থেকে অজানা একটা কৌতূহল ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবল হয়ে ওঠে।

ভারভারার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ যথারীতি চলতে থাকল। শুধু ও রইল ঔদাস্যের খোলস পরে। ওর কাছে সাড়া না পেয়ে ভারভারা বিব্রত হয়। দেখে

ক্লিমের উল্লাস বাড়ে। কিছুদিন দেখা গেল সমভার ওপর ওর হিংসা। ক্লিম এলে তাকে খাবার ঘরে না বসিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে বসায়। খাবার ঘরে হয়তো সমভা এসে জুটবে। অতি সুন্দর ছোট্ট আরামের ঘরখানা ভারভারার। মোপাসাঁর মতো করে গল্প বলা চলে এখানে বসে। যেন সেজন্যই ঘরখানা তৈরি। দেয়ালে ঝোলান ফটো আর খোদাই-এর কাজ করা ছবির মধ্যে দুখানা প্রসিদ্ধ ছবির প্রতিলিপি রয়েছে। একখানা বুকলিন-এর আঁকা। বিষয়বস্তু হচ্ছে: সুনীল-শ্যাম-কান্তি সমুদ্রের অথৈ জলে ঢেউয়ের মুখে-পড়া একটি মেয়েকে সামুদ্রিক জন্তুরা তাড়া করেছে। মেয়েটি চারু-কেশী, কিন্তু মাথায় কিছুটা টাক আছে। দ্বিতীয় ছবিখানা হচ্ছে শিল্পী স্তুক-এর। ছবিখানার নাম—"পাপ"। একটি অমার্জিত চেহারার নারীর দেহ ঘিরে জড়িয়ে আছে মোটা একটা সাপ। সাপের বিসদৃশ মাথাটা শিকারের কাঁধের কাছে উঁচিয়ে আছে।

ভারভারার আবেগোচ্ছলতা, সামঘিনের দুটো মিষ্টি কথায়, একটু সদয় হাসিতে তার আনন্দ, এবং ওর একটু ঔদাস্যে বা একটু হাসি-ঠাট্টায় সেই আনন্দের এক মুহূর্তে গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া দেখে ক্রমেই ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে ইচ্ছে করলেই ও মেয়েকে সামঘিন যখন খুশি আপন অধিকারে পেতে পারে। এই সম্ভাবনাটুকুই কখনও কখনও ক্ষণেকের জন্য ওর মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু লোভকে ও সংযত করে। সংযমের জন্য আত্ম-প্রশংসা করতে করতে মনে মনে ভাবে:

'আমার এ বাধা কোত্থেকে আসছে? লিদিয়া? মারাকুয়েভ?'

এমনি ক'রে অবস্থা যখন অনেকদূর গড়িয়ে গেল, একদিন সমভা জিজ্ঞেস ক'রে বসল: 'তোমার কি হয়েছে বলতো। বুঝতে পারছ না ও-মেয়েটা যে তোমার জন্য গেল!'

কিছু চিন্তা না ক'রে, অতি ঠাণ্ডাভাবে জবাব দিল ক্লিম:

'তা আমার করতে হবে কি? দুনিয়াশুদ্ধ মেয়ে যদি আমায় ভালোবাসে, আমার তাই বলে সব্বাইকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সমভা বলে:

'তুমি একটি সাক্ষাৎ শয়তান!'



ঝিমিয়ে পড়া সকাল। বাড়িতেই ছিল সামঘিন। বসে বসে চোখ বোলাচ্ছিল 'আমাদের এলাকা' সংবাদপত্র খানার ওপর—কালো কালো হরফ ছিটোন অতি বাজে মার্কা একখানা ধুম্র রঙের কাগজ। প্রধান প্রবন্ধটার আরম্ভ: 'ইওরোপ যখন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় সাফল্য লাভ করেছে...' ইত্যাদি ইত্যাদি ক'রে শহরের শ্মশানগুলির দুরবস্থার কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে শ্মশানের আবাসিক কর্মচারীর ছাগলটি কিভাবে ফুল পাতা গাছ সব মুড়িয়ে ঝুড়িয়ে খেয়ে যায় বিশেষভাবে তারও উল্লেখ রয়েছে। প্রবন্ধটার গম্ভীর মেজাজে ওর সন্দেহ হলো আলোচিত বিষয়টা খোলসমাত্র; সেন্সরের চোখে ধুলো দিয়ে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অন্য একটা কিছু: লেখার ধরনে বুঝল স্বয়ং সম্পাদকের কলম। কারণ শহরের কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা লিখতে হলে—'সেই আমাদের কালে—'-র নজীর টেনেই সাধারনতঃ ইনি বক্তব্য পেশ করেন, যা পড়ে উনবিংশ

শতাব্দীর সাতদশকের মানুষেরা হাসে। ভারাভকার এই কাগজখানা সাধারণতঃ বড় নীরস সংকীর্ণ আর প্র্যাকটিক্যাল। কেবল কলমী রবিনসনের লেখা কি ক'রে কদাচিৎ বেশ সরস হয়ে ওঠে। ও একটা রস-রচনা লিখেছিল আগাগোড়া সম্পাদকের প্রিয় কথা, ভাষা ও তাঁর লেখা বা বলা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। রচনাটির আরম্ভে ছিল—'অসংখ্যবার পৃথিবীকে এই কথাই বলা হইয়াছে—,' ক্লাইলভ্-এর একটি গল্পের এই লাইনটি। এবং তারপরে এ যাবৎ পৃথিবীকে যা যা বলা হয়েছে—এক ঘেয়ে ভাষায় তার একটি তালিকার পর উপসংহারে ছিল ক্লাইলভেরই আর একটা গল্প থেকে বেড়াল সম্বন্ধে অতি বিষাদভরা এই লাইনটি: 'রাঁধুনীর কথা শুনতে শুনতে পুষি মুরগীর ছানাটিকে খাইয়া চলিল।' একেবারে শেষে একটা প্রশ্ন ছিল: প্রশ্নটি হয়তো সম্পাদক, কিংবা সেন্সরকে উদ্দেশ করেই করা হয়েছিল : *"Tu l'as voulu, George Dandin ?"*

কাগজখানার শেষ পৃষ্ঠাটা বেশ মজার লাগল সামঘিনের। খুলে পড়তে লাগল : 'ভি পি সামঘিনের সংগীতবিদ্যালয়ের ঘোষণা...' টি, এস্, ভারাভকার টেক্‌নিক্যাল আফিস্... টি, এস্, ভারাভকার গ্রীষ্মাবাস-এর পরিচালন...' ভারাভকা—ভারাভ্‌কা—ভারাভ্‌কা—। শুধু ভারাভ্‌কা।

ক্লিম মনে মনে হাসতে লাগল : 'প্লাসানদের জয়,' তারপর আরো পড়তে লাগল : 'আই, আই, দোমাগেইলভের পারিবারিক স্নানাগার সমূহ সম্পর্কে ঘোষণা এই যে উক্ত স্নানাগারগুলির বিশেষ অংশে ভদ্রমহোদয়গণের নিমিত্ত প্রফেসর চারকটের প্রণালী অনুযায়ী ধারাযন্ত্রের এবং মহিলাদিগের নিমিত্ত সুরভিত স্নানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।'

হঠাৎ দরজায় ঘা পড়ল। ও চিৎকার ক'রে ডাকল:

'চলে আসুন ভেতরে।'

দুনায়েভ। মারাকুয়েভের একজন ছাত্র। কোঁকড়া চুল। একটু অবাক হলো ক্লিম। এর আগে এখানে আর আসেনি কখনও দুনায়েভ। চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে ওকে স্বাগত জানাল। দুনায়েভের মুখে তার সহজ স্মিত হাসিটুকু লেগে আছে; ঘন দাড়ির ছোট ছোট কোঁকড়া গোছাগুলো কাঁপছে; নাকটা অদ্ভুতভাবে ঢাকা পড়ে গেছে গোঁফের অরণ্যে। পা ফেলছে এমনভাবে যেন মেজেটা ওর পায়ের চাপে ভেঙে যাবে।

'আর কেউ নেই তো এখানে?' বিছানার পর্দাটার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ও।

ওর প্রশ্নের ভঙ্গিতে বুঝতে পারে সামঘিন অপ্রীতিকর কিছু একটা ঘটেছে। জবাব দেয় : 'না, কেউ নেই; বসুন।'

দু'বার মাথা নেড়ে বসল দুনায়েভ। নিজের নোংরা জুতোর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হ'য়ে টেবিলের নীচে লুকিয়ে ফেলল পা দু'টো। মুখে সেই সহজ হাসি নিয়ে শান্ত ভাবে বলল :

'কমরেড্ পীটার ধরা পড়েছেন। ডীকনও। সারপুকভ্-এ ধরা পড়েছেন ও'রা আর ভারাকসিন্ আর ফোমাকে এখানেই ধরেছে। ওদিন্‌ৎসভ্-এর খবর জানিনে, হাসপাতালে আছে সে। আমিও হয়তো শিগ্গিরই ধরা পড়ব।'

স্তব্ধ হ'য়ে গেল সামঘিন। ওর পিঠের চামড়ার তলা দিয়ে যেন ভয়ের একটা তুহিন-স্রোত বইতে লাগল। ওর কেবল দিওমিদভের কথা মনে হচ্ছিল। অনেক ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞেস করল:

'আপনার সম্বন্ধে পুলিশকে কেউ খবর দিয়েছে নাকি?'

'এই জন্যই তো এলাম,' টেবিলের ওপর স্তূপ করা বইগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে দুনায়েভ 'আমাদের এলাকা' কাগজখানা নাড়তে নাড়তে বলে: 'আপনি কি কমরেড ভারভারার কোন খবর জানেন? তাঁর কিছু হয়নি তো?

'আমি জানি নে তো।'

'খবরটা নিতে হয়। যদি এখনও কোন বিপদে না পড়ে থাকেন তবে একটু সাবধান ক'রে দিতে হচ্ছে।' একটু জোরের সঙ্গেই দুনায়েভ বলে। 'আমার যতদূর মনে হয়, ও'র কাছে বইপত্র আছে কিছু। আমার ওখানে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'বেশ, আমি এক্ষুণি দেখছি।' বলে সামঘিন।

'আপনার যদি কিছু না হয় টয় এই ব্যাপারে, তবে জেলে যাতে পড়বার জন্য বই টই পাই একটু দেখবেন। শুনেছি ইচ্ছে মত নাকি পড়তে দেয়।'

'আপনার কি মনে হয় পুলিশে লাগিয়েছে কেউ আপনার সম্বন্ধে?' কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সামঘিন।

একটু থেমে, কোণের দিকে কি একটা বস্তুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জবাব দেয় দুনায়েভ: 'মনে তো হয়। একজন ছিল আমাদের দলে—মাথায় সাদা চুল, নাম সাপোঝনিকভ। লোকটা কি রকম বোকা বোকা আর ভীতু ছিল। সে জন্য আমরা ওকে তাড়িয়ে দি। কি জানি—হয়তো সেই রাগটাগ ক'রে...'

'তা এই লোকটাকে এখন কি করতে চান আপনারা?' জিজ্ঞেস করে সামঘিন। কিন্তু বোঝে প্রশ্নটা ঠিক হলো না। নেহাৎ অবান্তর এবং নির্বোধের মতো প্রশ্ন।

দুনায়েভ বলে: 'ওকে পাবই বা কোথায়। ধরা টরা যদি না পড়ি, তবে একটু আলাপ করবার ইচ্ছে রইল বৈকি।'

মুখ থেকে হাসিটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে দুনায়েভের; যদিও গোঁফের ফাঁকে সাদা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। মুখখানা যেন পাথর হয়ে গেছে। চোখ দুটির হিম দৃষ্টি এমনি কঠোরতায় ক্লিমের ওপর স্থির হয়ে আছে যে অনিচ্ছা-সত্ত্বে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কোন মতে শুধু বলে:

'তাই তো...তাই তো...।'

'আচ্ছা আসি। আপনি তাহ'লে এক্ষুণি যান—এক্ষুণি।'

আবার হাসি ফুটে ওঠে—সেই সহৃদয় অমায়িক হাসি। কিন্তু ক্লিমের বিশ্বাস হয় না। দুনায়েভ চলে যাবার পর কিছুক্ষণ ও পকেটে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল ভারভারার ওখানে যাবে কি না। শেষে সংকল্প ঠিক ক'রে নিল যাবে। কিন্তু উপলক্ষ্য হবে সমভা—ক্রুচেভ্স্কির লিথোগ্রাফ্ করা বক্তৃতাটা ওর জন্য নিয়ে যাবে।



একটা নীল রঙের টেলিগ্রামের কাগজ দেখিয়ে ওকে স্বাগত জানায় সমভা।

'লিদিয়া আসছে, শুনছ?—কি হলো? ব্যাপার কি?'

এক নিশ্বাসে ধরপাকড়ের কথা ওকে জানায় ক্লিম। বলতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে প্রায় উল্লাসেরই মতো একটা শিহরণ অনুভব করে।

ওকে খাবার ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে চাপা স্বরে বলে সমভা: 'চট্‌পট্‌ চট্‌পট।' ভারভারা বসেছিল ওখানে, খোলা চুল পিঠে ছড়ান, উজ্জ্বল রঙের একটা ড্রেসিং গাউন পরা। ওদের দেখেই চমকে উঠে চিৎকার ক'রে পালাতে যাচ্ছিল ভারভারা। সমভা কঠিন স্বরে হুকুম করল:

'দাঁড়াও, কি করছ? বেআইনী জিনিসপত্র যা আছে তোমার কাছে, সব দিয়ে দাও আমার কাছে। কোথায় সে সব? মারাকুয়েভের চিঠি পত্র, নোট্‌ সব। সব এনে আমার হাতে দাও চট্‌পট্‌।'

ভারভারা হতভম্ব। সেই অবস্থাতেই ওকে টানতে টানতে ওর ঘরে নিয়ে গেল সমভা। স্টোভের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সামঘিন:

'এখানে এখনও খানাতল্লাসী হয়নি।'

ওর ভয় রূপান্তরিত হলো আনন্দে। এত বেশী আনন্দ যে তার উচ্ছ্বাস সংযত করতে হলো। ভাবতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে:

'লিদিয়ার সাথে আগের সে সম্পর্ক আর সম্ভব নয়। চাইও না আমি। আচ্ছা, লিদিয়ার যদি সন্তান-সম্ভাবনা হয়ে থাকে?'

তক্ষুণি আবার মনে হয়:

'যদি ধরা পড়ি। তাহ'লে হয়তো ওর মন গলবে।'

ছোট একটা পুঁটুলি হাতে নিয়ে সমভা ছুটে বেরিয়ে এসে ভারভারার কামরার দিকে মুখ ক'রে চেঁচিয়ে বলল:

'চিঠিপত্রগুলো সব আগুনে ফেলে দাও।'

আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সমভা। উত্তেজনা আর হৈ-চৈই ওর আসল জীবন। ভাবে সামঘিন। দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে ভারভারা বিব্রতভাবে হেসে বলে:

'তৈরি হয়ে আসছি আমি। একটুও দেরী হবে না।'

ক্লিম বলে: 'কিন্তু আমায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হবে।'

বেরিয়ে পড়ে ক্লিম। হাঁটতে থাকে জন-বিরল রাস্তায় রাস্তায় যতক্ষণ না ক্লান্তি এসে পা দুটি অবশ ক'রে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে লিদিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎটা কি রকম হবে, তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত হবে।

*

কালই যেন পরীক্ষা এমনি অস্থিরতার মধ্যে একটা দিন কাটিয়ে ক্লিম পরের দিন স্টেশনে গেল। আলেনাকেই দেখা গেল প্রথম। কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হুকুমের স্বরে চিৎকার করছে সে:

'কুলি! কুলি! চোখের মাথা খেয়েছ সব, দেখতে পাও না?'

দেহে জড়ান কালো রঙের কেপ্‌; মাথায় ধূসর রঙের পালক-লাগান কিনারা-ওল্টান প্রশস্ত টুপী; আর হাতে বেতের ছড়ি। সব মিলিয়ে ক্রুদ্ধ মুখখানা মহিমা-মন্ডিত হয়ে উঠেছে। ছাত্র-মার্কা টুপীটা হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড সম্ভ্রম বিস্ময়ে ঐ মহিমার দিকে তাকিয়ে রইল সামঘিন।

ফরাসী ভাষায় ওকে স্বাগত জানিয়ে আলেনা একটা ভারী পোশাকের বাক্স ওর হাতে গুঁজে দিল—যেন ও কুলি। আলেনার পেছনে লিদিয়া—মুখে ওর শূন্য

হাসি; আলেনার তুলনায় অনেকখানি জলুষহীন চেহারা; গায়ে একটা বিশ্রীরকম পুরোনো ফার্ কোট; মাথায় সিল মাছের চামড়ার টুপী।

'কেমন আছ?' ক্লিমকে জিজ্ঞেস করে লিদিয়া। শান্ত, নিরানন্দ স্বর; ক্লিমের মনে হয় কালো চোখ দুটিতে যেন বড় ক্লান্তি। ওর হাতে চুম্বন দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ওর কোমরের দিকে তাকায় ক্লিম। কিশোরীর মতো তনু আর ঋজু দেহ। আলেনার সঙ্গে স্লেজে গিয়ে উঠল লিদিয়া। এমন স্বাগত পাবে ভাবেনি সামঘিন। আঘাত লাগল মনে। কতকটা বিমূঢ়ের মতো ও মালপত্র নিয়ে আর একটাতে গিয়ে উঠল। সতর্ক দৃষ্টি রইল জিনিসগুলির ওপর। মহা ভাবনা—পাছে একটাও খোয়া যায়।

হোটেলে পোঁছে ঠিক স্টেশনের মতো করেই মহাকলরবে বৃদ্ধ পরিবেশককে হুকুম দিল আলেনা:

'শিগ্গির একটা সামোভার আর কিছু খাবার নিয়ে এসো। যতটা সম্ভব রাশিয়ান হয় যেন। দু'বছর বাইরে ছিলাম, বুঝেছ?'

'বুঝেছি।' বাৎসল্য-ভরা সুখের হাসি হেসে জবাব দেয় বৃদ্ধ পরিবেশক।

আলেনার পাশের ঘরটা নিল লিদিয়া। ছুটতে ছুটতে লুবাশা সমভাও এসে গেল। এবং মালপত্র খুলতে লেগে গেল। দরজার ফাঁক দিয়ে ও দুজনকে দেখতে লাগল।

ইস্পাত রঙের একটা ভ্রমণের পোশাক পরা আলেনার, খোলা চুলের রাশ পিঠে ও কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে রমনীয় ছন্দে বিপুল সম্ভারে। টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরম রোলের ওপর কেভিয়ার মাখাতে মাখাতে করুণ-স্বরে বলে আলেনা:

'হায়রে রাশিয়া আর তেমনি তার খাবার! কি বা রোল, কি বা কেভিয়ার আর কি বা তার সস্-দেওয়া মাছের ছিরি...!'

দু'বছর আগের সেই কিশোরীটির চিহ্ন মাত্র নেই এ নারীর মধ্যে—যে কিশোরী তার অপরূপ রূপ নিয়ে সগৌরবে পথ চলেছে পৃথিবীর বুকে। আজ সেই রূপে এসেছে আরো জলুষ, আরো বর্ণাঢ্যতা। চলার ভঙ্গিতে এসেছে এক রমণীয় মন্থরতা। ও যা করে তাই সুন্দর—এ কথা ও জানে এবং সেই জানার পরিচয় লেখা আছে ওর মুখের চেহারায়। ওর জামার আস্তিনের লিলাক্-এর আস্তরের পট-ভূমিতে ঝলমল করে ওর সুডোল বাহুর কান্তি। ওর চলন-ভঙ্গির অলস মন্থরতার মধ্যেও কেমন একটা বোহিসেবী দুঃসাহসিকতা আছে। এবং সেই দুঃসাহসিকতাই ফুটে আছে ওর হেজেল নয়নের হাসির দ্যুতিতে।

মুখের মধ্যে এক রাশ খাবার ঠুসে দিয়ে আলেনা বলে:

'আমি কিন্তু ভাই, খেতে বড্ড ভালোবাসি। ফরাসীরা কি খেতে জানে? ওরা জানে শুধু ছল-চাতুরী খেলাতে। ওদের সব তাতেই তাই: সাজ-পোষাক বল, কাব্য বল, প্রেম বল—সর্বত্র।'

ক্লিমের মনে হয় আলেনার সেই বলিষ্ঠ সুললিত কণ্ঠটি যেন অনেকখানি মোটা হয়ে গেছে। ওর স্বভাবেও এসেছে ওর স্বরূপ যা সেইভাবেই নিজেকে দেখাবার ব্যস্ততা।

সমভা একটা ফার্-কোট গায়ে দিয়ে এ ঘরে এসে ঢুকল। লিদিয়া ভালো ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

'আমি এই ঘন্টাখানেকের মধ্যে আসছি,' বলে আবার বেরিয়ে গেল সমভা। আলেনা সেই দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বলে:

'চললেন বিপ্লবের চাষ করতে! কিন্তু বেশ লাগে আমার মেয়েটিকে। বেশ একটা গ্রাম্য সরলতা আছে।' তারপর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ক্লিমকে বলে: 'তুমিও কি তাই করো নাকি?' পরক্ষণেই অন্য কথা জিজ্ঞেস করে:

'তুরোবোয়েভের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়?'

কিছুক্ষণ থেমে খেতে খেতে আবার বলে:

'সেই প্রথম মাসের শেষের দিকটায় কি হলো, একদিন আমার ঘরে এসে ঢুকল স্রেফ্ ভেতরের জামা-কাপড় পরে। মুখে চুরুট্। আমি বললাম: চুরুট আমার ভারী বিশ্রী লাগে। ও অবাক হলো। বলল: তাই নাকি? বাস্ ওই পর্যন্তই। মুখের চুরুট মুখেই রইল। এই তো হলো সবে ব্যাপারটার সূত্রপাত।'

এক গেলাস আপেল-নির্যাসের কড়া পানীয় নিঃশেষ ক'রে তৃপ্তির সঙ্গে ঠোঁট চাটতে থাকে আলেনা। রুটির ওপর সেঁকা স্যামন মাছের একটা টুকরো সাজাতে সাজাতে বলতে লাগল:

'আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এই সব ভদ্র মার্কা দানব তোমাদের দলে থাকতে পারে। মানুষের সঙ্গে ওর কারবারটা কি রকম জান? ঠিক যেন বইয়ের পাতা ওল্টান। এক দিন ওকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম—আমাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে। এমনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল যে আমি একদম বোকা বনে গেলাম। তারপর বলল: সর্বনাশ। আমি বিয়ে থাওয়া ক'রে স্বামী হয়ে বসে ঘর-সংসার করছি ভাবতে পারছ? বুঝলাম—বিয়ের জন্য ওর সৃষ্টি হয়নি। আবার বলল ও: আর তোমার কথাও ধর, অত গুণ তোমার—শুধু ঘর-সংসারই করবে? সেই জন্যই কি জন্মেছ? মনে মনে ভেবে দেখলাম—কথাটা ঠিকই বলেছে। যদিও কান্না এসে গেল। কাঁদলামও খানিকটা। নাও না এক গেলাস, ক্লিম। এক সঙ্গে বেশ খাই বসে দু'জনে। ভদ্কা বেশ লাগে, না?'

গেলাসটা নিঃশেষ ক'রে মাথা ও হাতের অপূর্ব ভঙ্গিতে বিপুল চুলের রাশ বুকের ওপর টেনে নিয়ে এসে অর্ধেকটা দিয়ে বেণী বাঁধতে আরম্ভ করে।

ধীরে ধীরে অনেকটা আত্মস্থ হয়ে এল আলেনা। শান্তভাবে বলে যেতে লাগল: 'ওর বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমার অবস্থা এমন করে তুলেছিল যে একজন তো তার সঙ্গে পারী যাবার নেমন্তন্নই করে বসল। ভদ্রলোক তেলের ব্যবসা ক'রে লাখপতি হয়েছেন। আমার কি তখন আর বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েছে। ওর প্রস্তাবটা কিছু দোষের মনে হলো না। পরে অবশ্য খেয়াল হলো। ঈগরের কাছে বলে দিলাম সব। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল: শুয়রটা। সব জাত—শুয়রের দল। তারপর আমায় সান্ত্বনা দিল—ভাবছ কেন? আমিই তোমায় পারী নিয়ে যাব। একটু সবুর কর, বাকী জমিগুলো বিক্রি করেনি। আরো খানিকটা কাঁদলাম বসে বসে। তখন মনে হলো আমার চোখ দুটোর কথা। ঠিক করলাম—বাস্, আর কান্না নয়। আমি কেন কাঁদতে যাব? যার কাঁদার সে কাঁদুক। আমি আর কাঁদব না!'

থেমে গেল—খাওয়ার হাত আর মুখের কথা দুইই। কি যেন ভাবতে লাগল বসে ক্লিমের মাথার ওপর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে। ওর উদ্ধত রূপের দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেল ক্লিম। ওর মনে হলো—আলেনার কথা সমভা বলেছিল—ঠিক যেন সৈনিকের বিধবা—ঠিক তাই।

*

লিদিয়া এসে ঘরে ঢুকল। গায়ে ফিরোজা রঙের চোখ ধাঁধান ড্রেসিং গাউন, তাতে সবুজ রঙের কোমর-বন্ধ। এক মাথা ভিজে ঝাঁকড়া চুল। শ্যামলা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁটে চাপা সিগারেট থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আলেনার পাশে ও যেন কোন অনিপুণ শিল্পীর মোটা হাতের আঁকা চড়া রঙের ছবি। ধোঁয়ার জন্য চোখ কুঁচকে গেলাসের চা গামলায় ঢেলে ফেলে বলল:

'খুব কড়া ক'রে এক পেয়ালা চা দাও তো দেখি!

চা ঢালতে ঢালতে হঠাৎ আলেনার মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। উচ্ছ্বসিত হয়ে ও বলে উঠল:

'শিক্ষায়-দিক্ষায়, আচার-ব্যবহারে বেশ মার্জিত ছিল লোকটা। বড় বড় ব্যবসায়ীরা, বিরাট বিরাট ধনীরা ওকে বেশ ভয় করত। যেমন ক'রে কুকুরছানাকে শেখায়, ঠিক তেমনি ক'রে ওই উজবুকগুলোকে ও চাল চলন, খাওয়া, পরা, কথা বলা সব হাতে ধরে শিখিয়েছে।'

বড় বিব্রত বোধ হতে লাগল সার্মাঘনের। লিদিয়া চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে পা মুড়ে দীভানে বসে আছে; চুপচাপ বসে বসে ওকে দেখছে অমনি। বিগত দিনের কত স্মৃতি উচ্চারিত হয়ে উঠছে লিদিয়ার চোখে।

একটু বিরক্ত ভাবে ক্লিম ভাবে: 'শ্রীমতীর চোখ দুটিতে তো হাজার জিজ্ঞাসা উপচে পড়ছে, অথচ মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করবে না।'

বাকী অর্ধেক চুলগুলি বেণী বেঁধে আলেনা আবার আরম্ভ করে:

'একজন ফরাসী মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মহিলা অভিনেত্রী। অতি বদ-মেজাজী, হিংসুটে, বদ-চরিত্রের মেয়ে মানুষ। দারুন চালাক। কি যে চালাক হয়, ভাই ক্লিম, এই ফরাসী মেয়েগুলো! কি আর বলব। বলে কি না, আমাদের —মানে মেয়েদের কাছে কেই বা কি চায়, তাই তো আমরা এত গরীব। মনে আছে লিদিয়া?'

অন্যমনস্ক ভাবে লিদিয়া শুধায়: 'কি?

'সেই তুই কি রকম তর্ক করেছিলি মেয়েটার সঙ্গে! আরও বলেছিলি—'

'ওঃ, হাঁ, হাঁ। মনে আছে বৈকি। বাবা কি ধড়িবাজ মেয়ে!'

কথাগুলো লিদিয়া এত তাড়াতাড়ি বলল যে ক্লিমের মনে হলো, ওকে এ বিষয়ে আর কিছু জানতে দেওয়া লিদিয়ার ইচ্ছে নয়।

চটে গেল ক্লিম। মনে মনে ভাবল: 'নিশ্চয়ই কোন মফঃস্বল-বাসী রুশ নন্দিনী একটু বাড়াবাড়ি রকম যৌন-কৌতূহলে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। তাই হয়তো গিয়েছিলেন কমিক-অপেরার অভিনেত্রী হয়ে অ্যাড্ভেঞ্চার করতে।' ও বুঝতে পারছে লিদিয়ার বিরুদ্ধে কোন রকমে নিজেকে খেপিয়ে তোলার জন্য ও হন্যে হয়ে উঠেছে।

সবটা চা খেল না লিদিয়া। পোড়া সিগারেটটা চায়ের গেলাসে ফেলে দিয়ে উঠে ও জানালার কছে গিয়ে দাঁড়াল। বিন্দু বিন্দু কুয়াশা জমেছে কাঁচে। রুমাল দিয়ে তা মুছতে মুছতে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে লিদিয়া:

'তোমায় এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন, ক্লিম?'

খুব একটা কড়া জবাব দিতে চাইল ক্লিম যা অনেক দিন লিদিয়ার মনে থাকবে। কিন্তু কথা যোগাল না। ক্ষুদে ক্ষুদে মাছির মতো এলোমেলো ভাবে যেন কথার দল উড়ে বেড়াতে লাগল। অত্যন্ত নীচু স্বরে ও বলল:

'আমার পরিচিত কয়েকজন সম্প্রতি গ্রেপ্তার হয়েছে। আমারও বোধ হয় আর দেরী নেই।'

বাধা পড়ল। দুদ্দাড় ক'রে এসে ঢুকল ভারভারা। দৌড়ে লিদিয়ার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর ক'রে, চুমু খেয়ে খেয়ে অস্থির ক'রে তুলল। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলতে লাগল:

'ওগো আমার রানী, জিপ্সী রানী!'

তারপরেই আলেনার মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল:

'ও মা, কি সাংঘাতিক সুন্দর! লিদিয়ার কাছে শুনেছিলাম তুমি সুন্দরী। কিন্তু এত সুন্দর! তোমাকে ছুঁতেই যে ভয় করছে!'

আলেনার হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কেবল ওই কথা। কথা আর ওর থামে না। সামঘিন লক্ষ্য করে ওর উত্তেজনায়, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, কলোচ্ছ্বাসে আবার সেই কৃত্রিমতা, সেই চটুলতা ফিরে এসেছে, যা ওর বিদ্রুপের আঘাতে ভারভারা প্রায় ভুলতে বসেছিল। বোঝাই যাচ্ছে বন্ধুকে পেয়ে লিদিয়া ভারী খুশি; এবং বন্ধুর আনন্দে ও অভিভূত। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে ওরা দীভানে গিয়ে বসল। লিদিয়ার চোখে কোমল দৃষ্টি রেখে, হাতের তেলোয় ওর গাল দুটি তুলে ধরে সোহাগ করতে করতে ভারভারার চোখে জল এসে গেল।

'বন্ধু...'

ক্লিম ভাবে: 'এত দিন পরে দু'জনের দেখা হয়ে পরস্পরকে ওদের কেমন লাগছে? বোধহয় আলেনা থাকাতে অসুবিধা হচ্ছে।'

বলছিল আলেনা: 'এক জায়গা থেকে সংগীত-নাট্যে অভিনয় করবার জন্য আমার ডাক এসেছে। যাব হয়তো। আমার সেই ফরাসীনী বান্ধবীর কথায় বলি, জন্মেছি যখন, বাঁচার মতো বাঁচা দরকার।'

উঠে দীভানের কাছে গিয়ে দুই বান্ধবীর মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ল আলেনা। এতক্ষণে অনেকটা স্থির হয়েছে দু'জনে। বারান্দা থেকে আসছে পরিবেশকদের ছুটোছুটির শব্দ, প্লেটের ঝন্‌ঝনানী, ঝাঁটার শপ্‌শপানী। কেউ একজন চিৎকার ক'রে বলছিল:

'তেরো নম্বর একটি আস্ত গাধা।'

আলেনা আর ভারভারার আলাপন ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। নিজেদের মনের কথা না বলে ওরা যেন কোন গোপন ভাষায় কথা কইছে। কার যেন আধো আধো কথা নকল ক'রে। হঠাৎ আলেনা বেখাপ্পা ভাবে বলে বসল:

'সমাজবাদীদের বিশ্বাস করো না, ভাই। ওরাও মাঝপথে গিয়ে তোমার দিকেই চাইবে।'

তারপর মন্তব্যটা ব্যাখ্যা করে:

'ক্রিমিয়ায় এক ভদ্রলোক ছিল—সমাজবাদী। জুতো পরত না, মোটা কাপড়ের জামা ছাড়া পরত না, বেল্ট বাঁধত না, কলারের বোতাম লাগাত না। ইয়া দাড়ির জঙ্গল, কিন্তু তার মধ্যে একখানা ভারী কচি মুখ—ঠিক যেন শিশুর মতো। অর্থাৎ একটা শিশু আর বাঁদর যেন এক সঙ্গে। তলস্তয়-পন্থী এক বুড়ীকে রোজ গাড়ী ক'রে এক পিপে জল দিয়ে আসত।'

'ও নিজেও তো ভাস্তয়-পন্থী ছিল।' লিদিয়া বলে।

'ও তাই বুঝি? তা হবে। সে একই কথা। চমৎকার রাশিয়ান গান গাইত আর বাচ্চারা যেমন ক'রে কেকের দিকে তাকায় ঠিক তেমনি ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত।'

সামঘিন দেখল ওর আর এখন আবশ্যক নেই। টুপী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'তা তোমরা এখন একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করো।'

আলেনা আস্তে আস্তে ওর হাতের ওপর চাপড় দিয়ে বলল:

'তা সন্ধ্যে বেলায় আসছ তো!'

লিদিয়া নিঃশব্দে করমর্দন করে। ভারভারার দৃষ্টি সামঘিনের সঙ্গে সঙ্গে যায়। ওর চোখ দুটিতে খুশি উচ্চার হয়ে ওঠে। দেখে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে সামঘিন। লিদিয়ার ঔদাস্যে গভীর বেদনা বয়ে ফিরে যায় ও। ভেবেছিল এ ঔদাস্য কৃত্রিম এবং বাইরের খোলস মাত্র। ওর আশা ছিল পারীতে থেকে লিদিয়া সহজ এবং স্বাভাবিক হবে। এমন কি ও যদি বিপথেও যেত তা হলেও হয়তো ওর পক্ষে মঙ্গলের হতো। কিন্তু কিছুই হলো না। যে নিশাচর পাখী দিনের আলোয় আড়াল খোঁজে তারি দৃষ্টি দিয়ে সামঘিনের দিকে তাকায় ও।

নিজের মনে ও গর্জায়: একটা বোঝা পড়া ক'রে নিতেই হবে লিদিয়ার সঙ্গে। সন্ধ্যা বেলা ও আলেনাদের হোটেলে গেল। খবর পেল আলেনার কাছে, লিদিয়া নেই। "ত্রোয়াৎসে সার্জিয়েভ্ আশ্রমে" গিয়েছে। দামী সিল্কের পোশাক পরে আয়নার সামনে বসে নখ কাটছিল আলেনা। এবং নখ কাটতে কাটতে অমনি কথাচ্ছলে বলল:

'নেহাৎ ছেলেমানুষ ওটা। চিরটা কাল অমনি খেয়ালী। যা মাথায় একবার ঢুকবে করা চাই-ই। এযে ওর চরিত্রের অভাব তা নয়। বরঞ্চ বিপরীত। বলছিল, তুমি নাকি ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে। কিন্তু ওর মতো স্ত্রী নিয়ে চলা তো শক্ত। ও শুধু অসাধারণ মানুষ খুঁজে বেড়ায়। সাধারণে ওর তৃপ্তি নেই। কিন্তু ভাই, মানুষ হচ্ছে কুকুরের মতো। জাত যাই হোক, স্বভাব সেই এক।'

তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে জবাব দেয় ক্লিম: আশ্চর্য! তোমার মুখে এসব কথা!'

'কেন? আশ্চর্য হবার কি আছে! আমার মাথায় মগজ বলে কিছু পদার্থ তো আছে।'

নখ-ঘষা যন্ত্রটা ব্যাগে রেখে এবার নখ-পালিশ নিয়ে বসল। ওর পোশাকের মতোই দামী ওর প্রত্যেকটি জিনিস। ব্যাগই কতগুলি।

'লিউতভ-এর খবর কি? নিবিষ্ট চিত্তে নখ পালিশ করতে করতে জিজ্ঞেস করে আলেনা।

শ্লিষ্ট স্বরে লিউতভ-এর খবর দেয় সামঘিন—মদ খেয়ে ওর মাতলামী করার খবর, বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশার খবর, তুরেবোয়েভ-এর সাথে সাক্ষাতের খবর। আলেনা নিঃশব্দে শোনে। সামঘিনের কথা শেষ হলে সমর্থনের সুরে বলে:

'বেশ ইনটারেস্টিং মানুষ এই ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ, না?'

'ওর জন্য মায়া হয় না তোমার?'

'মানে?' অবাক হয়ে টেনে টেনে বলে আলেনা। 'মায়া? কিসের জন্য? ঠিক কথা, ওর অনেক দুঃখ আছে। সে তো আমারও আছে। আমরা সব সমান। এই দেখ না, লিদিয়া কেমন অসম্ভবের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওর উচিত লিউ-

ওকে বিয়ে করা। না, সত্যি বলছি, ক্লিম—যারা ব্যবসা করে তারা জানোয়ার বিশেষ—সত্যি জানোয়ার। কিন্তু এদিকে আবার ভারী ইনটারেস্টিং ওরা।'

ক্লিমের দিকে ফিরে বসে একটা গল্প বলতে আরম্ভ করে আলেনা। গল্পটা ও শুনেছিল ভল্‌গার একজন ব্যবসায়ীর কাছে। ভদ্রলোকের খুড়ো—বেশ বয়স্ক, লাখপতি একজন, বৌ-ছেলে-মেয়ে সব আছে—একদিন এক পরিচিত ব্যক্তিকে বললেন যে গভর্ণরের সুন্দরী স্ত্রীটি যদি নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন ক'রে একবার ওকে দেখা দেন, তবে তার জন্য হাজার পঞ্চাশ রুবল অবধি খরচ করতেও কুণ্ঠিত হবে না। লোকটার শত্রুর অভাব ছিল না। খবর যথারীতি পৌঁছে গেল গবর্ণর-গৃহিনীর কাছে। এবং তিনি প্রস্তাবে রাজী হলেন। তবে শর্ত হলো যে, তিনি এক ঘরে থাকবেন এবং খুড়োমশাইকে থাকতে হবে অন্য ঘরে। দরজার চাবীর ছিদ্র দিয়ে উঁকি দিয়ে সেখান থেকে দেখবে। তাই ঠিক হলো। এবং ঐ ভাবেই নয়ন সার্থক হলো খুড়োমশাইর। এর কিছু দিন পরে দু'জনের একবার মুখোমুখী সাক্ষাৎ হলো কোনও অবকাশে। আ-ভূমি নত হয়ে গভর্ণর-পত্নীকে অভিবাদন ক'রে খুড়ো মশাই বললেন:

'দেবী, আমার ধৃষ্টতার জন্য ভগবান যীশুখৃষ্টের নামে আপনার কাছে এ অধীন ক্ষমা-প্রার্থী, কিন্তু দেবী, আমি ধন্য হয়েছি। আপনার ওই রূপরাশি অপার্থিব। ওই পরম বিস্ময় নয়নগোচর ক'রে সত্যি আমি ধন্য হয়েছি।'

'এটা হয় তো নিছক গল্পই। কিন্তু বেশ মজার, তাই না?' বলে উপসংহার টেনে উঠে দাঁড়ায় আলেনা। উপরওয়ালার সম্মুখে গমনোদ্যত রাজকর্মচারীর মতো ক'রে আয়নার সামনে ঘুরে ফিরে নানা ভাবে ও নিজেকে নিরীক্ষণ করে। ক্লিম জিজ্ঞেস করে:

'টাকা দিয়েছিল লোকটা?'

'সেই বুড়ো? আলবৎ দিয়েছিল।'

'বিশ্বাস করি না।'

'তুমি হচ্ছো প্র্যাকটিক্যাল মানুষ!' ক্লিমের দিকে তাকিয়ে ধূর্ত হাসি হেসে আলেনা বলে, ওই হাসিতে কি একটা ছিল—ক্লিম প্রশ্ন ক'রে বসল:

'কত টাকায় তুমি নিজে ঐ কাজটি করতে পার?'

'অত টাকা নেই তোমার, দোস্ত!' ক্লিমের মুখের ওপর জবাব ছুঁড়ে দিয়ে তারপর বলে আলেনা:

'চল, একটু বেরিয়ে আসা যাক।'

*

রাস্তায় বেরিয়ে দেহের দৈর্ঘ্যকে পূর্ণ ঋজুতায় মুক্তি দিয়ে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে চলে যায় আলেনা। গর্বোন্নত মাথা, নিতম্ব স্থির ছন্দে দোলে। ওই উন্নত-সুন্দর ভঙ্গিমায় কি যে ছিল ক্লিমের অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে গেল। চিত্তে এল প্রসন্নতা। লিদিয়ার চিন্তা মিলিয়ে গেল। যে-নারীর রূপে পুরুষের চক্ষু নন্দিত, প্রতিটি নারীর হৃদয় ঈর্ষান্বিত, তার হাত ধরে পথ চলা পরম সৌভাগ্য। ক্লিম আশেপাশে পুরুষদের দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখল যে লঘুতা এবং কাম-লুব্ধতা নিয়ে তারা সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকায় তার কিছু নেই তাদের দৃষ্টিতে; আছে

শুধু সব-আবিলতা-বর্জিত মুগ্ধ বিস্ময়। উটপাখীর পালকের মতো স্তবকে স্তবকে মেঘ আকাশের বুকে স্তব্ধ হয়ে আছে। তারা বুঝি মিল খুঁজছে আলেনার টুপীর পালকের সাথে।

আধঘন্টা খানেক ঘুরে বেড়াল ওরা। আলেনা বলে বসল:

'খিদে পেয়ে গেল যে!'

"হার্‌মিটেজ্-এ" ওকে নিয়ে যায় সাম্‌ঘিন। সব চেয়ে ভালো টেবিলটা বেছে নেয় আলেনা। ওয়েটার মেনু এনে দিল। তার দিকে তাকিয়ে ভুবন-ভোলান হাসি হেসে কলকণ্ঠে আলেনা বলে:

'ওতে হবে না হে। দেখ দেখি যতটা পার বেশ জুতসই ক'রে একটু মস্কোর খানা খাওয়াও দেখি।'

বুঝিয়ে বলে ক্লিমকে: 'বুঝলে ক্লিম, পারীতে ঠিক এমনি করেছি। হোটেলে গিয়েই ঢালা ফরমাশ—ভালো করে খাওয়াও। এতে হয় কি জানো? বেশ খুশি হয় সবাই এবং যা সাধ্যে কুলোয় না তাও ক'রে ফেলে। সব ব্যাপারেই তাই।'

'প্রেমেও?'

'নয় তো কি!' অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে জবাব দেয় আলেনা। চোখ কুঁচকে দন্ত-রুচি-কৌমুদী বিকশিত ক'রে আর একটু শান্তভাবে বলে:

'আমার মধ্যে কিছুটা ঢলানেপনা দেখছ। যাতো কারো কোন ভুল ধারণা না থাকে এই আমি তোমাকে বলে রাখলাম, আমি ওই পেশাই নিচ্ছি। কে তোমাদের তোয়াক্কা রাখে? চুলোয় যাও সব।'

অতি সাংঘাতিক রকমের একটা তীক্ষ্ম চাপা স্বরে কথাগুলি শেষ করে। রাগে চোখ দুটো যেন ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলতে থাকে।

'আমি নীতি-বাগিশ নই।' ওকে শান্ত করবার জন্য আস্তে আস্তে বলে সাম্‌ঘিন। আলেনার রূপ ও মেজাজ দুইয়েতেই ও সন্ত্রস্ত ও বিব্রত। 'পেশা' কথাটার উল্লেখে খানিকটা যেন আলোক-পাত হয় ব্যাপারটার। সংগে সংগে ক্লিমের আশংকাও বাড়ে। চারদিকের মানষগুলির দিকে আলেনার অর্ধ-নিমীলিত চোখের চ্যালেঞ্জ-ভরা চাহনি ক্লিমকে বলে দিল যে ওর সংগিনী হরেক-রকম নাটকীয় 'দৃশ্যে'র সংগে পরিচিত এবং তাতে ওর কিছু মাত্র ভয় নেই। গোটা হলটায় যে-চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলল আলেনা তাতে সাম্‌ঘিনের বড় অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। ঘর ভরা মানুষের দৃষ্টি ওর দিকে; ওর কথা শুনবার জন্য তারা উৎকর্ণ। দুই ট্রে ভরে থরে থরে প্লেট-বাটি সাজিয়ে নানা রকম চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নিয়ে এল ওয়েটার। পাকা খাদ্য-বিশারদের মতো সেদিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে বলল আলেনা:

'বাঃ বেশ! শিগ্গিরই তোমার উন্নতি হবে।'

ওয়েটারের মুখখানা তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নীচু হয়ে কানের কাছে মুখ এনে গোপন পরামর্শের মতো ক'রে চুপি চুপি বলল:

'এই কমলা-লেবুর সরবৎটা খেয়ে দেখুন কি চমৎকার! আর এই লাল 'বরদো'টা ভারী হালকা আর পুরোনো।'

অতি অশোভন রকম ভংগিতে বেশ জোরে জোরে বলে উঠল আলেনা:

'আমি ওয়েটারদের ভালবাসি। ওয়েটাররাই যা হোক মেয়েদের ওপর একটু শিভালরি দেখায় এখনও। ...তারপর—মারাকভ কোথায় এখন?'

সাম্‌ঘিন হেসে ফেলে: 'একেবারে ওয়েটার থেকে এক লাফে মারাকভ—'

'ওয়েটার নয়। নাইট!' ব্যস্ত হয়ে সংশোধন করে আলেনা।

'পড়ছে। লিউতভের ওখানে থাকে। দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না।'

'কেন?'

'কি ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে ভালো লাগে না।'

'হয় তো তোমার সম্বন্ধে ওরও ওই নালিশ।'

'হবে।'

খেতে আরম্ভ করে আলেনা। সামঘিনের মনে হয় এমন জাঁক জমক ক'রে খাওয়া, এবং খাওয়ার আনন্দ এমন ক'রে চোখে মুখে ফুটে ওঠা আর কখনও দেখেনি ও। এতক্ষণে অন্যেরাও হাতে ছুরি-কাঁটা ধরল। এমন স্তব্ধ হয়ে ছিল ঘরখানা এতক্ষণ, যে সুঁচ পড়লেও শোনা যেত।

খাওয়ার পরেই আলেনা চলে গেল। বলে গেল: 'যাই দেখি একটু আখেরের ব্যবস্থা করিগে।'

বেঁটে মোটা তাঘিলাস্কি মদ খেয়ে নেশায় টং হয়ে এক কোণে বসে ছিল। আলেনা চলে যেতেই কোনও মতে গড়াতে গড়াতে সামঘিনের কাছে এসে চিৎকার ক'রে জিজ্ঞেস করল:

'পেত্নীটা কে হে? প্যারীর পরী? তাই বলো!'

তারপর টকটকে ঠোঁঠ দুটো চাটতে চাটতে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলে:

'মজাটা টের পাবেন।'

তাঘিলাস্কির টেবিলে ওরই মতো পিপে-মার্কা মাঝ বয়সী আর এক জন বসেছিল। মাথা-জোড়া টাক, মুখ-ভরা দাড়ি, জাঁদরেল ভুঁড়ি আর লম্বা একজোড়া ঠ্যাং। মদ খেয়ে চুর হয়েছিল সেও। তাঘিলাস্কি সামঘিনকে ওদের টেবিলে আসার জন্য ডাকল। কিন্তু সামঘিন তা কানে তুলল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

*

গুরু ভোজনে এবং কড়া মদে নেশা ধরতে লাগল সামঘিনের। ও হাঁটতে হাঁটতে একবার স্যাসনয় স্কয়ার পর্যন্ত চলে গেল। ওর ভারী হাসি পেতে লাগল "—রূপ নিয়ে কি আদিখ্যেতাই না করল। কিন্তু এখন—!" লিদিয়ার কথা ভাবতে চেষ্টা করল। হঠাৎ লিউতভ-এর একজন বান্ধবীকে দেখতে পেল। মেয়েটির মুখে সর্বদা হাসি লেগে আছে। কৃত্রিম হাসি হলেও ও-হাসি ভোলা যায় না। আশ্চর্য ভাবে মনের মধ্যে গেঁথে থাকে। একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। সামঘিনের দিকে তাকিয়ে হাসল—ওর মনে হলো সেই বিচিত্র হাসি। কিন্তু স্বাভাবিক সৌজন্যে ও টুপী তুলে সম্ভাষণ জানাতেই মেয়েটির আটপৌরে মুখখানা বিস্ময়ে বিশ্রী রকম কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

অন্য আর-একদিকে পত্রহীন একটা গাছের তলায় শোকের বেশ পরা আর এক মহিলা বসে ছিলেন। পেছনে ফিরে সেই দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সামঘিন:

'ভুল করলাম কি? না ভুল হয়নি। নির্ঘাৎ সেই মেয়ে। শয়তান কোথাকার, লুকোচুরি খেলা হচ্ছে!'

লিদিয়ার খবরের আশায় ভারভারাদের বাড়ি গেল সামঘিন। খাবার ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেল। লিদিয়া সশরীরে টেবিলে বসে আছে। মুখোমুখি হয়ে বসে আছে দিওমিদফ্ আর ভারভারা বসে আছে দীভানে।

দিওমিদফ্ সভয়ে গলা তুলে বলছে:

'আলবৎ তোমার দোষ, আমি বলছি।'

লিদিয়ার দিকে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে দিও-মিদফ্। অনবরত হাত দুটো অস্থির চঞ্চলতায় নড়ছে, যেন কি একটা আঁচড়াচ্ছে অথবা ছড়াচ্ছে। ওর হাতের দাপটে টেবিল ক্লথটা কুঁচকে যাচ্ছে, সেগুলো আবার হাতের তেলো দিয়ে ঘষে ঘষে পালিশ করছে। ক্লিম আসতেই নিজের শক্ত হাতখানা তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়েই আবার তক্ষুণি টেনে নিল।

'কেমন আছ? অচঞ্চল নির্বেদের সুরে একটা ভদ্রতার সম্ভাষণ ছুঁড়ে দিল লিদিয়া ক্লিমের দিকে, যেন চলতি পথে স্টেশনে দেখা হলো। পরক্ষণেই দিওমিদফের দিকে ফিরে পূর্ব কথার জের টানল:

'হাঁ তারপর!'

অসমাপ্ত কথার খেই ধরে নীচু গলায় গড় গড় করে বলে যেতে লাগল দিও-মিদফ। ওর অর্ধেক কথা যেন আবার গলার মধ্যে ঢুকে যায়, বাইরে বেরোয় না। ডান হাতের প্রবল আস্ফালনে সেই ঘাটতি পূরণ হয়। বাঁ হাতের আঙুলগুলি টেবিলের ধার শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকে।

ক্লিম ভারভারার পাশে গিয়ে বসে পড়ে। ভারভারা হাতের আঙুলগুলিকে শক্ত করে চিমটের মতো করে কোলের ওপর রাখা বাক্সটা থেকে লজেঞ্চুষ তুলে সামঘিনের মুখে ফেলে দিল, তারপর কানে কানে বলল:

'সাবধান, ভেতরে নেশার আরক আছে কিন্তু। বেশ নেশা ধরে।'

বিজয়ীর মতো চিৎকার করতে থাকে দিওমিদফ্:

'তোমার সেই মাকারভ—আস্ত একটা জোচ্চোর। রাতকে বেমালুম দিন ক'রে ছাড়ে। তোমাদের তো সে খোরাই কেয়ার করে। বেচারা বুড়ো ফিদোরভ—একেবারে আলাদা জিনিস শেখায়। আমি জানি কিনা বুড়োকে!'

ক্লিম ভাবছিল এই কয় দিনের কথা—এই কয়দিনের মধ্যে দুটিবার শুধু 'কেমন আছ' ছাড়া আর ওর সঙ্গে কি কথা বলেছে। একটু যেন নেশা ধরেছে। ভারী হাল্কা মোলায়েম একটা আমেজ। মেজাজে একটু চড়া সুর লাগে। ও লিদিয়ার পেছনে বসেছে। দিওমিদফের দিকে তাকিয়ে আছে লিদিয়া। ওর মুখের ভাব পড়তে চেষ্টা করে সামঘিন। সামঘিনের কোন কথা লিদিয়ার সহ্য হয় না। এমন কি ভালো কথা বললেও ওর চোখ দুটি কুঁচকে যায়, মুখে পড়ে জেদের কঠিন রেখা।

দিওমিদফ বলছিল: 'মেয়েদের সম্বন্ধে যারা চোখ চেয়ে বুজে থাকে তাদের কড়া শাস্তি হওয়া উচিত। কেন জান? এই তোমাদের খুশি করবার জন্য পিন, এসেন্স, ফিতে, টুপী, কানের দুল—হেন তেন যত রাজ্যের যত বাজে জিনিসের কারখানা দিয়ে জীবনটাকে একেবারে আঁস্তাকুড় বানিয়ে তুলেছে। আর তোমাদের কাছ থেকে পুরুষগুলো কি পেয়েছে? পেয়েছে কাব্য আর ছবি আর নভেলের খোরাক। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রেরণা নয়।'

কি সব আবোল তাবোল বকছো! এসব ছাই-ভস্ম শুনতে আর ভাল লাগে না।' অত্যন্ত শান্ত ভাবে ভারভারা বলে।

লিদিয়াও ঠিক তেমনি ভাবেই বসে থেকে বলে:

'আঃ, থামোনা, ভারভারা।'

দিওমিদফ চটে উঠল:

'ছাই-ভস্ম? সে তোমার ওই চিনির ডেলাগুলো।'

'চুপ ক'রে শ্নেছ কি করে, লিদিয়া ? প্রতিবাদ করবে না ?' অভিযোগ করে ভারভারা। তারপর দিওমিদফ-এর দিকে ফিরে বলে : 'কি বলছিলে না ? আধ্যাত্মিক জীবনের, প্রেরণা পাওনি তোমরা ? নাই বা পেলে। শিল্পের প্রেরণাই যদি পেয়ে থাক, তাতে ক্ষতি কি ?'

'ম্খর্ !' খে'কিয়ে ওঠে দিওমিদফ : 'ঋষি এনক্-এর লেখা পড়ে দেখ। তিনি লিখেছেন কি জানো ? মানব-কন্যাদের শিল্পের গ্রু হচ্ছে ভ্রষ্ট দেবদ্তেরা। কারা সেই ভ্রষ্ট দেবদ্ত, জানো ?'

দিওমিদফ-এর ম্খটা দেখতে পাচ্ছে ক্লিম। ওর নীল চোখ দ্টো ধক্ ধক্ ক'রে জ্বলছে। ক্রোধে পিঙ্গলবর্ণ গোঁফ-জোড়া খাড়া হয়ে উঠেছে। চিব্ক কাঁপছে শির শির ক'রে। এ মান্ষটাকে এত উত্তেজিত হতে ক্লিম কখনও দেখেনি। ওর সমস্ত সত্তা যেন আজ নাড়া খেয়েছে। কদাচিৎ এমন ঘটনা হয়েছে। ওর তৈল-চিক্কণ, পরিপাটি ক'রে আঁচড়ান মাথাটিকে দ্বিধা ক'রে চলে গেছে ঋজ্ দীর্ঘ সি'থির রেখা। নতুন একটা সার্টিং ব্লাউস্ গায়ে। ফিট্-ফাট্ ধোপ-দ্রস্ত চেহারা, যেন বিয়ের বর, নতুবা যেন হোলি কম্যুনিয়ন গ্রহণ করতে চলেছে। অনবরত ওর হাত নড়ছে, কখনও আঙ্লগ্লি ম্ঠো পাকিয়ে উঠছে ; কখনও বা হাতের তেলোটা পেতে যেন বাতাসের ওজন মাপছে। ও বলে চলেছে :

'শিল্প ? শিল্প তোমাদের কোন্ কাজে লাগে ? লাগে তো শ্ধ্ এমনিতেই যাদের দ্গতির সীমা নেই সেই প্র্ষগ্লোর রক্তমাংসকে তাতিয়ে তুলতে আর সে বেচারাদের জন্য লোভের ফাঁদ পাততে। শিল্প তো নয় ব্জর্কি ! যত নষ্টের ম্ল তোমরা। অনিষ্টের যে দানব তার চরেরা তোমাদের থেকেই পয়দা হয়।—তার মানে জীবনের যত রকম অকল্যাণ আছে—অহংকার, বড় বড় কথা, নোংরামি, যত রকমের দ্ষ্কর্ম আছে—সব তোমাদের কাছ থেকে আসে। আত্মা ভ্রষ্ট হয় তোমাদেরই জন্য। বড় কঠিন ম্ত্যু আন তোমরা। মান্ষে মান্ষে হানাহানি, যত রকম জল্ষী কদর্যতা, যত রকমের পৈশাচিকতা আছে—সবের গোড়া তোমরা। কিন্তু বাছাধন ! পরমাত্মা আছেন। তোমাদের মনিব যে শয়তান—সে হচ্ছে তাঁর দ্শমন।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এমন জোরে টেবিলে একটা কিল মারল দিওমিদফ যে লিদিয়া স্দ্ধ কে'পে উঠল। ওর সংকীর্ণ পিঠটা ছিট্কে সোজা হয়ে গেল, কাঁধ দ্টো ঝাঁকুনি খেয়ে যেন বইয়ের মলাটের মতো ম্ড়ে এল।

ভারভারা অনবরতঃ চকোলেট খেয়ে চলেছে। প্রথমে কামড়ে ফ্টো করে ভেতরের রসটা চুষে নিয়ে তারপর র্মাল দিয়ে বেশ ক'রে ম্খটা মোছে। চতুর সামঘিনের কেমন সন্দেহ হয় ভারভারা যে আজ এত খ্শি তার কারণ চকোলেট নয়। তার কারণ হচ্ছে আজ এখানে সামঘিন উপস্থিত আছে এবং ওই আধ-পাগলা মান্ষটার কাছে লিদিয়া কি রকম জব্দ হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করছে।

ওর দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে ও দিওমিদফ-এর কথা শ্নতে শ্নতে মনে মনে গাল দেয় ওকে : 'আচ্ছা শয়তান মেয়ে তো !' দিওমিদফ ক্লান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে, চিৎকার করছে; সি'থি-চেরা মাথাটাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বাতাসকে দ্ই হাতের ম্ঠো দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে বারেবারে।

'ঈভ থেকে শ্র্। তারপর থেকে তোমরাই পাপ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ। এব্ল্-এর জন্মের স্চনা হয় স্বর্গে আর কেইন্-এর ইডেন্ উদ্যানের সীমানার বাইরে। অর্থাৎ স্বর্গের মান্ষের শত্র্ রইল প্থিবীর মাটিতে।'

লিদিয়া উঠে স্তোভের কাছে যেতে যেতে দিওমিদফ্কে মনে করিয়ে দিয়ে

যায় : 'কেইন হচ্ছে ঈভের প্রথম সন্তান।'

দুই হাতে টেবিলের উপর সমস্ত দেহের ভার রেখে দিওমিদফ্ আস্তে আস্তে অর্ধেক উঠে দাঁড়ায়। ওর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর, গালগুলো গর্তে বসে গেছে।

'বেশ বেশ তাই হলো। ভুলই না হয় হয়েছে আমার—' চোখ পিট্‌পিট্ করতে করতে মিন্ মিন্ ক'রে বলে দিওমিদফ : 'তাতে হ'লোটা কি ? শয়তানের ফাঁদে তো পড়েছিল ঈভ। তাই না ?'

'অন্ততঃ বাইবেলখানা পড়ে ফেলো, দিওমিদফ্।' হাসতে হাসতে টিপ্পনী কাটে ক্লিম। কথাটা বেশ নরম করেই বলতে চেয়েছিল। কিন্তু একটু রূঢ় হয়ে গেল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তাকিয়ে দেখলো ওর এই গায়ে-পড়া সর্দারী লিদিয়ার মনঃপুত হয়নি। তবুও থামল না ক্লিম, বলল :

'একটু পড়াশোনা করো। নইলে যে কেলেংকারী হচ্ছে। চিন্তা-শক্তিই তো নেই তোমার। চিন্তাই হলো আসল শক্তি যার জোরে মানুষ পশুর স্তর থেকে উপরে উঠেছে। সেই ব্যবহারই যে তুমি জানো না।'

'আমি বাপু নেহাৎ সাধারণ মানুষ।' আহত স্বরে জবাব দেয় দিওমিদফ্।

'ঠিক বলেছ! কিন্তু কথাটা মনে রেখো। খুব কষে বোধহয় তলস্তয়ের লেখা গিলেছ এতদিন। তাই না ?'

'যদি পড়েই থাকি, কি হয়েছে তাতে ?'

সভ্য জীবনের অশেষ জটিলতায় তলস্তয় নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই জটিলতাগুলিকেই তিনি তাঁর শিল্পীর হাত দিয়ে অতি নিপুণ ভাবে আরো জটিল করেছেন। সমালোচনা তিনি করতে পারেন—মহা পণ্ডিত লোক। কিন্তু তুমি ? কি জানো ?'

'জানি যে জীবন-যাত্রা বড় কঠিন।' জবাব দেয় দিওমিদফ্।

'চুপ করো, ক্লিম অত্যন্ত অভদ্রভাবে কথা বলছো।' লিদিয়া বলে উঠল। তার স্বর দৃঢ়, প্রায় রূঢ়। ক্লিমের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে একেবারে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। স্টোভের সাদা টালির পটভূমিতে ওর নীলাভ-ধূসর রঙের মূর্তি বড় নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। ক্লিমের গলার কাছে ডেলার মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলল :

'অভদ্র ? হবে। তবে বিনয় দেখিয়ে চুপ ক'রে থেকে এই রকম বর্বরের মতো সত্যের বিকৃতি আমি বরদাস্ত করতে পারব না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দিওমিদফ্।

'তাই যদি হয় তবে আমি চললাম।' বলে গট্‌গট্ ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। জুতোর মচ্ মচ্ শব্দে বেশ একটা সৌখীনতার সুর বাজল।

'দাঁড়াও সিমিঅ',' বলে লিদিয়া ওর পেছন পেছন হল-ঘর পর্যন্ত এগিয়ে গেল। গায়ের শালটা মাটিতে লোটাতে লাগল। ক্লিম কি ইসারা করল ভারভারাকে। ভারভারা ক্লিমের কানে কানে বলল :

'বেশ ধোলাইটি দিয়েছ যাহোক, ওর দরকার ছিল।'

হল-ঘরের মধ্যে গিয়ে বর্ষাতি-বুট পরতে পরতে পা দাপাচ্ছিল দিওমিদফ্। ভারভারা আবার চুপি চুপি বলল ক্লিমকে :

'অবশ্য এতেও ও-মেয়ের চৈতন্য হবে না। দেখলে তো কি রকম উদাসক্ত হয়ে গিয়েছে! আর তাও কিনা পারী থেকে এসে!'

অস্পষ্ট স্বরে গুণ গুণ ক'রে কি যেন ব'লে সামঘিন লিদিয়ার সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করার জন্য নিজেকে তৈরি করতে লাগল।

দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যায়। ভারভারা হলের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে বলে :

'লিদিয়া দিওমিদফ-এর সঙ্গে চলে গেল।'

ওর দিকে কঠিন ভাবে ভ্রূকুটি ক'রে সামঘিন বলে :

'তা তুমি এত খুশি কেন বলতো? যাই হোক আমিও চলি এখন।'

কিন্তু যাবার কোন তাড়া দেখা গেল না ওর। ভারভারার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল ক্লিম—বাড়িতে কি আছে। সেই একঘেয়েমি আর বসে বসে লিদিয়া আর নিজের কথা ভেবে মাথা খারাপ করা।



ক্লিম বাড়ি ফিরে দেখল টেবলের ওপর একটা মোটা খাম—লিদিয়ার হাতের লেখা ঠিকানা। এমনি জায়গায় রাখা রয়েছে চিঠিটা যেন অতি সহজেই চোখে পড়ে। কয়েক সেকেণ্ড ও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। চিঠিটার ওপর ওর দৃষ্টি যেন বিঁধে রইল। টেবিলের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ও, কিন্তু তবু হাত দিয়ে চিঠিটা তুলতে ওর সাহস হলো না। কেমন যেন ভয় করতে লাগল। তারপর যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল কোন মতে—কিন্তু মাথাটা ঘুরে উঠল, পড়তে পড়তে সামলে গেল। হাতটা আছড়ে পড়ল চিঠিটার ওপর। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে মনে মনে ধমক দিল : 'কি বোকার মতো করছ।' তারপর টেবিলে এসে বসল।

খামটার মধ্যে পাঁচখানা ছোট ছোট কাগজ। ঘন ঘন ছোট ছোট করে লেখা। কতগুলি লাইন এবং বাক্য একেবারে এমন ভাবে কেটে দেওয়া যে আর পড়া যায় না। কোথাও কোথাও আবার তারি ওপর দিয়ে লেখা। বেশ কয়েক মিনিট কাটল চিঠিটার আরম্ভ কোথায় খুঁজে বের করতে।

'পারী থেকে এই চিঠিগুলিই তোমাকে আমি পাঠাতে চেয়েছিলাম—' পড়তে লাগল ক্লিম। চশমাটা চেপে ধ'রে রইল যেন ভয় পাচ্ছে চশমাটা খসে পড়ে যাবে। 'কিন্তু যা বলতে চাই তা স্পষ্ট ক'রে লিখতে পারছিলাম না। এমন কি আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট হচ্ছিল না। তুমি জানো—আমি না পারি লিখতে না পারি বলতে। আমি পারি কেবল প্রশ্ন করতে। আমি কি চাই—তা আমি জানি; অন্ততঃ কি চাইনে তা তো জানিই—চাইনে তোমার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখতে। কাল আমার মনে হ'লো—কথাটা বিশ্বাস হয়নি তোমার; এবং এখনও তোমার আশা আছে যে এই কসরতের খেল যাকে প্রেম না কি বলে—তাতে তোমার অংশীদার হবো আমি। কিন্তু আমার তাতে বিন্দু মাত্র রুচি নেই। কেন নেই, সেই কথাটাই ব্যাখ্যা করা দরকার। অথচ ঠিক গুছিয়ে লিখে উঠতে পারছিনে—এমন কি আমার নিজের কাছেও খুব একটা স্পষ্ট হচ্ছে না। সত্যি বলছি পারছি না। ভারী কঠিন কাজ এই ব্যাখ্যা করা।'

দ্বিতীয় কাগজখানায় রয়েছে: 'তুমিই ছিলে আমার আরশি যার মধ্যে আমি

নিজের কথা আর চিন্তার ছবি দেখতাম। খুশিমত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি তোমাকে। তুমি বাধা দাও নি। না দিয়ে ভালই করেছ। আমায় বুঝতে দিয়েছ কত ব্যর্থ ছিল আমার সে-সব জিজ্ঞাসা।'

তৃতীয় কাগজখানায় : 'বোধহয় কিছু কিছু মানুষ আছে যারা ভালো বা মন্দ কোন শ্রেণীতেই পড়ে না, এবং যাদের সংস্পর্শে এলে কুচিন্তাই মনে আসে। তোমার সাহচর্যে এমন বহু মুহূর্ত আমার কেটেছে যার তুলনা হয় না। আমি প্রেমের উচ্ছ্বাসের কথা বলছি না। প্রেম তো যে-কোন মানুষের সঙ্গে করতে আমিও পারতাম, তুমিও পারবে।'

এই লাইনগুলোর ওপর আবার অতি ছোট ছোট ক'রে লেখা ছিল: 'সেই যাদের "ইন্দ্রিয় পরায়ন" না কি বলে, আমার মনে হয় তুমিও তাই। অর্থাৎ ভালো না বেসে শুধু ফুর্তি লোটা—অবশ্য ভালোবাসা কাকে যে বলে আমি জানলামই না।'

এরই সঙ্গে আড়াআড়ি ক'রে যোগ করা ছিল : 'তোমাকে আঘাত করতে সত্যি চাই না।'

এর পরের অংশ আর পড়া যায় না। চশমাটা এত জোরে চেপে ধরল সামঘিন যে নাকটা ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠল। হাত কাঁপতে লাগল। অথচ চশমা থেকে হাতটা সরিয়ে নেবার কথা মনেই হলো না। অজস্র কাটাকুটি, যেখানে সেখানে ঘষাঘষি, ওপরে নীচে যেখানে খুশি লেখা—যার ফলে লেখার খেই হারিয়ে গেছে। অতি কষ্টে জোড়া-তালি দিয়ে বক্তব্যের বিষয় যতটুকু বোঝা গেল তা এই:

'আজ তোমাকে যা বলতে বসেছি, এ ভাবে বোধহয় আর কাউকে বলতে পারব না। তোমার আত্মবিশ্বাস এত বেশী যে আমার অসহ্য লাগে। আমি বরাবর দেখেছি আমাকে তুমি বুঝতে পারোনি। চাওনি বুঝতে এবং চাওনি বলেই আজ আমারই মুখ খুলতে হলো। আমি অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির মানুষ। নিজের কাছে আমারই কিছু গোপন, কোন অস্পষ্টতা নেই। সেই জন্যই বলছি—কেন যে আমাদের মধ্যে এমনটা ঘটল আমি বুঝতেই পারছি না। আমার হয়তো কোন ত্রুটি কোথাও ছিল। যদিও তার জন্য আমার কোন অপরাধ হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। তোমায় কোন দিন ভালোবাসি বলেছি বলেও আমার মনে পড়ছে না। বরঞ্চ তোমার জন্য আমার কষ্টই হতো। এমন বিশ্রী ব্যবহার করতে। অবশ্য তোমার মেয়েলী কৌতূহলই তার কারণ ছিল।'

'অবশ্য' কথাটা পরে কেটে দেওয়া হয়েছে।

'রাগ ক'রো না। আর করলেই বা কি। বরঞ্চ রাগ যদি করো সে তোমার পক্ষেই ভালো হবে।'

রাগ হলো সামঘিনের। কাগজগুলি ও ছুঁড়ে মারল টেবিলের ওপরে। একটা টুকরো মেজের ওপর পড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়তে লাগল।

'যারা বলে বিপ্লব মানুষকে সত্যি ক'রে বাঁচতে শেখাবে—তারা নির্বোধ, কিছুই বোঝেনি তারা। কি দেবে বিপ্লব—জানি না। কিন্তু আমি বলি—বিপ্লব নয়, চাই অন্য কিছু—এমনতরো একটা কিছু—ভয়ংকর একটা কিছু—যাতে প্রতিটি মানুষের বুক ভয়ে কেঁপে উঠবে—জানবে নিজের সম্বন্ধে, নিজের কার্য-কলাপ, গতিবিধি সম্বন্ধে, জবাবদিহি সেই শক্তির কাছে করতে হবে। এতে যদি অর্ধেক মানুষ মরেও যায় যাক্। পাগল হয় হোক্।

কিন্তু যে-কদর্য জীবনের বিষম গ্লানি মানুষকে বহন করতে হচ্ছে, অন্ততঃ বাকী অর্ধেক মানুষ যেন তা থেকে মুক্তি পায়। তোমাদের বিপ্লবের বুলি শুধু ফাঁকা আওয়াজ। অফিসের কেরানীর মতো তোমাদের বুদ্ধি। যে ভাব-গভীরতা বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করে, তোমাদের তা নেই। তোমরা বিপ্লব করো শুধু মানুষকে করুণা করবার জন্য, নয় তো তোমার জেকব জ্যাঠার মতো করো।'

আর-একখানা কাগজ, তার আগাগোড়া কাটা। তা থেকে শুধু এইটুকুই উদ্ধার করা গেল:

'কুকুর তার নিজের ছায়ার সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে, ছায়াটা কিছুই বোঝে না। তোমার কাছে আমার এসব কথা বলাও বোধ হয় ঐরকমই।'

সার্মাঘন সবগুলো কাগজ একসঙ্গে ক'রে জড়িয়ে মুড়িয়ে মুঠোর মধ্যে রেখে চশমাটা খুলল। এতো চিঠি নয়, বিকারের প্রলাপ। অসহ্য রাগে ওর সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। তুহিন স্পর্শের মতো মুখটা যেন জ্বলতে লগল। কিন্তু নিজের বুকের মধ্যে কান পেতে ও দেখল—এ শুধু বাইরের আক্ষেপ, ত্বকের উপরকার ক্রিয়া। নিতান্তই দৈহিক ব্যাপার। রাস্তার কোন ছোকরা ওর গালে চড় মেরে গেলে তার প্রতিক্রিয়া হয়তো এর বেশী হবে না। ওর স্মৃতির পটে লিদিয়ার দুর্বল মুহূর্তের সব ছবি ভেসে উঠতে লাগল: পর্যুদস্ত লিদিয়া—ক্লান্ত লিদিয়া—অনাবৃত লিদিয়া।

'ও যে এরকম কিছু একটা করবে তাতো জানাই ছিল—অত্যন্ত দায়িত্বহীন চরিত্রের মেয়ে। এ ছাড়া আর কি আশা করা যায়!' মনে মনে ভাবে ও।

ব'সে ব'সে দোমড়ান কাগজগুলি আবার সমান ক'রে টেবিলের ওপর বিছাতে লাগল। তৃতীয় কাগজটা আরেকবার প'ড়ে দিন-লিপির খাতার মধ্যে গুঁজে রেখে দিল। বাকী কাগজগুলি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল। চামড়ার মতো শক্ত কাগজ। খামটা ছিঁড়তে গিয়ে দেখল খাতার ছেঁড়া কাগজের মতো আর-একটা কাগজ ওর মধ্যে। তার মধ্যে লেখা:

'ক্লিম, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য, সব চেয়ে উজ্জ্বল উচ্ছল শহরে এলাম! সত্যি বড় সুন্দর, মহিমাময়, ঝলমলে শহর। তাই বলে সকলে। কিন্তু আমি বড় বেদনা বোধ করি। ভাবি কি জান? হৃদয়ে আনন্দ থাকলে মানুষ কখনও নোংরা কাজ করতে পারে না। এখানে এলেই শুধু বোঝা যায়, মানুষকে যখন খেলনায় পরিণত হতে হয়—কি তার গ্লানি কি যাতনা। কাল রাতে আমায় Folies Bergere দেখতে নিয়ে গেল। নেপোলিয়নের সমাধি দর্শন করা যদি কর্তব্য হয়, তবে এ জায়গাটা দেখাও কর্তব্য। এখানে কেবল স্ফূর্তি হুল্লোড়। চরম স্ফূর্তি। দেখলাম দঙ্গলে দঙ্গলে মেয়ে—কতক দারুণ সেজেছে, কতক একেবারে উলঙ্গ। ওরা খেলায়—ওদেরও নিয়ে খেলা করে...'

এর পরে আর কিছু বোঝা গেল না। কেবল একটা লাইন—কি সাংঘাতিক লজ্জা! মরে যেতে ইচ্ছা ক'রে...'

এ কাগজখানা অনায়াসে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল সার্মাঘন। তারপর টেবিল ছেড়ে কৌচে এসে শুয়ে পড়ল।

'সে দিন ভেবেছিলাম—এ প্রেম একমাত্র আমারই আবিষ্কার। সে দিন তো এ মিথ্যা ছিল না—সত্যই ছিল।' মনে মনে ভাবে ক্লিম।

পরিচারিকা সামোভার নিয়ে এল। শুয়ে শুয়ে খানিক্ষণ সামোভারের স্নিগ্ধ গুঞ্জন শুনল ক্লিম। তারপর উঠে এক গেলাশ চা ঢেলে নিল। দুটি চায়ের পাতা জীবন্তের মতো ঘূর্ণীপাক খাচ্ছে চায়ের মধ্যে। ক্লিম চামচ দিয়ে তুলতে

গেল, কিন্তু বারে বারেই পাতা দুটি ফসকে গেল। ঘনায়মান সন্ধ্যার নীলাঞ্জন ছায়ার প্রলেপ পড়েছে জানালার সার্সীতে। চামচটা ফেলে দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় ক্লিম।

'আমিও তাহলে ব্যর্থ-প্রেমের কারবারী! ছিঃ! রাবিশ!' একঘেয়ে ভাবে জানালায় টোকা মেরে মেরে ভাবতে লাগল।

'ভালই হলো, অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম। এবার আমার মুক্তি।'

মনের আর এক স্তরে চলতে লাগল ঘাত প্রতিঘাত। এই নির্মম অন্যায় আর অপমান ও ভুলবে কি করে! ...না হয়...ও-ই একটু নরম হতো...একটু মাথা নোয়াত...।

লিদিয়ার ভালো-মন্দ, সবকিছু যেন অবয়ব পরিগ্রহ করে; তাদের যেন ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, অবিশ্বাস্য রকম ব্যাপ্তি পেয়ে ওর চিত্তের রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ে। মনে পড়ে মাতাল লিউতভ একদিন ওর সম্বন্ধে বলেছিল :

'ও হচ্ছে আমাদের তেত্রিশের কোঠার দাঁতের মতো। জান, আমার একটা আক্কেল দাঁত উঠেছে। ভারী লাগে জিভে।'

॥ ৮ ॥

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা লুবাশা সমভার কাছ থেকে টেলিফোন এল লিদিয়াকে তুলে দিতে সামঘিন কেন ষ্টেশনে আসেনি। শরীর ভাল আছে তো?

'একটু সর্দি মতো হয়েছে, তাই আর বেরুলাম না।' জবাব দেয় সামঘিন। কেন জানি আবার বলে: ঈষ্টারে ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি।'

'চলো না, আমিও যাব।'

মায়ের কাছে যাবার ওর সত্যি সত্যি ইচ্ছা ছিল না। এবং গেলও না। সারাটা বসন্ত কাল নিয়মিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল পরীক্ষার আগ পর্যন্ত। এবং বাড়িতেও প্রাণপাত ক'রে পড়াশোনা করতে লাগল। কদাচিৎ কখনও শনিবারে প্রেইস-এর ওখানে যায়। সেখানেও বিশেষ ভালো লাগে না। আসে সেখানে জন-কয়েক। একজন হচ্ছে ইন্‌ষ্টিটুট্ অব্ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং-এর ছাত্র—ভীষণ লম্বা। মুখখানা যেন কাঠের তৈরি; আর একজন হচ্ছে সমুস্ক রেজিমেন্টের অশ্ব-বাহিনীর একজন অফিসার—বেশে বাসে ফিট্-ফাট্, ছিম-ছাম, দেখে মনে হয় যেন ছিল ব্যবসায়ী, কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে সৈনিক-বৃত্তিতে আসতে হয়েছে। তাঘিলস্কি ওদের চালায়। তারই নির্দেশে ওরা অলসের মতো বসে বসে কেবল অংক কষে। মস্ত বড় বড় অংক—ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার টন—না—না হলোনা—চাষী-ব্যাংকের নীট আয় হলো...

স্প্রাতনভ্ দুম্ দাম ক'রে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে আর জার্মান, ইংরেজ ও জাপানীদের গাল দেয়।'

মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় ভারভারাদের ওখানে যায় সামঘিন; ঘণ্টাখানেক ওর সঙ্গে খেলা করে, লুবাশার সঙ্গেও গল্প গুজব ক'রে কাটিয়ে আসে। ভারভারার সঙ্গে খেলা এক রকম ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লুবাশা এসেই খেলা এলো-মেলো ক'রে দেয়, তবু মেয়েটিকে ওর দিনে দিনে বেশী করে ভালো লাগছে। কারণ ও ছাত্র মহলের এবং ওর ভাষ্য মত "মুক্তি-আন্দোলনের" অনেক খবর রাখে।

ভারভারার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে সমভার। ভারভারার সম্বন্ধে ও বড়-বোনের মতো ক'রে সম্মান দিয়েই কথা বলে। একটু কৃপণ ভারভারা। নতুন বান্ধবীকে সে এ পর্যন্ত সামান্য টুকি-টাকিই উপহার দিয়েছে। একদিন সমভার সামনেই এ নিয়ে ওকে ঠাট্টা করেছিল সামঘিন। সমভা দপ ক'রে জ্বলে উঠে বলল: 'রাখো তো তোমার তুর্কী কায়দা! বেশ ক'রে কান দুটো মলে দেওয়া যায়।' ভারভারা ওকে শান্ত করার পথ পায় না। বোঝাতে চেষ্টা করে:

'আরে চট্‌ছ কেন, ও তো ঠাট্টা করছে।'

সমভার মধ্যে একটা জিনিস ভালো করে না বুঝলেও ভালো লাগে সামঘিনের। সে ওর দুনিয়ার লোকের উপকার করার আগ্রহ এবং ক্ষমতা। এই গুণ তানিয়া কুলিকোভারও ছিল। সেই জন্যই ক্লিমের মনে হতো তানিয়া যেন তার নিজস্ব সত্তা ছেড়ে বিশ্বজনীন মানুষ হয়ে গেছে। যেন সেবা-ব্রতের মন্ত্র নিয়েছে। ঘরে বাইরে, ভিড়ের মধ্যে, সামনে ঘোড়াই থাক আর বেড়ালই থাক—সর্বত্র অকুতোভয়ে

চড়াই পাখীর মতো নাচতে নাচতে চলে যায় ওই প্রাণ-চঞ্চলা মেয়ে। আশ্চর্য ক্ষমতা! ও অমনি করে ঘুরে বেড়াত মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, তাদের পরিচয়-পরিবেশকে নিবিড় ক'রে জানবার একটা অদম্য ক্ষুধা নিয়ে—যাতে প্রয়োজন মতো প্রত্যেকটি মানুষের সেবায় নিজেকে লাগাতে পারে; খুলতে পারে তাদের জীবনের গ্রন্থি; বাঁধতে পারে জীবনের ঢিলে তারগুলো; রিপু করতে পারে যত ছেঁড়া আর ফাড়া। ও কাজ করত রাজনৈতিক রেডক্রশ্-এ। প্রণয়িনী পরিচয় দিয়ে প্রতি সপ্তাহে মারাকুয়েভের সঙ্গে জেলে গিয়ে দেখা করে আসত।

সামঘিন একদিন বলেছিল: 'মারাকুয়েভের সঙ্গে দেখা করতে ভারভারা যায়না কেন? ওরই তো যাওয়া উচিত।'

'ওর বদলে আমি তো যাচ্ছি। ওকি আর কর্তাদের কাছে সহজে ছাড়পত্র পেত!'

সামঘিন বলে উঠল: 'তা নয়, ও মারাকুয়েভকে এড়াতে চায়।'

ফোঁস ক'রে ওঠে লুবাশা: 'তার জন্য দায়ী তো তুমিই।'

উল জড়াচ্ছিল ও। হাত থামিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে তাকিয়ে বলল: 'অমন ভালো মেয়ে, কিন্তু ওর সঙ্গে ভারী খারাপ ব্যবহার করছো তুমি।'

সামঘিন হোঃ হোঃ ক'রে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে। দাঁত চেপে অদ্ভুত স্বরে বলে: 'ঘটকালি!'

লুবাশা ঠিক কুলিকোভার মতো নয়। কুলিকোভা মনে করে সে যা আছে তার চেয়ে আরো ভালো হলো না কেন সেই অপরাধ তার নিজের। কিন্তু লুবাশার সে-সব বালাই নেই। তার পরপোকার করতে পারলেই হলো। কোনরকম কাজেই ওর অপমান বোধ নেই। এক কথা জানে বলেই সামঘিনের লুবাশাকে সেই অদ্ভুত ভ্যান্স্কক্-এর মতো মনে হয়, কখনও বা লেসকভ্-এর লেখা "এ্যাট ড্যাগার্স ড্রন" বইখানির অন্যতম চরিত্র আন্না স্ককোভার মতো লাগে। এ বইটা আর পিসেমস্কির "ট্রাব্‌লড্ ওয়াটার্স" ও দস্তয়ভস্কির 'পসেসড'-এর সাথে রেখে দিয়েছে কারণ বই তিনখানি সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত শিক্ষা-মূলক।

লুবাশা সর্বক্ষণ ব্যস্ত। যখনই দেখ তখনই ও কোথাও-না কোথাও যাবার জন্য তৈরি; ঘন ঘন দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে পাছে দেরী হয়ে যায়। রাতে শোবার সময়ও যেন নিজেকে চোখ রাঙিয়ে শোয়—সাড়ে সাতটায় ওঠা চাই!

লুবাশা করিৎ-কর্মা। একই সঙ্গে ও সেলাই করতে পারে, পড়তে পারে অনর্গল, ওর প্রিয় বাদাম-দেওয়া মোটা মোটা বিস্কুট 'ফিলিপভ' কুরমুর ক'রে খেতে পারে, গম্ভীর ভাবে সামঘিনকে অজস্র বোকার মতো প্রশ্ন করে যেতে পারে—যেমন 'শ্রেণী-যুদ্ধের যা উদ্দেশ্য তা তো পৃথিবী থেকে মানবিকতা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে, তাই না?' ইত্যাদি।

ওকে নিয়ে একটু মজা করার এবং ভয় দেখাবার জন্য সামঘিন বলে:

'তাতো থাকবেই না। মানবিকতাও চাই, লড়াইও চাই। তা তো হয় না। ও দুটো পরস্পর-বিরোধী। শ্রেণী-সংগ্রামের আসল সংজ্ঞা জানতেন রেজিন আর পুগাচেভ্—যাঁরা সেই "নির্মম রুশ হাঙ্গামার" স্রষ্টা। আর আমাদের বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে একমাত্র নেকয়েভাই বোঝেন মানুষের ওপর বিপ্লবের দাবী কতখানি।'

হঠাৎ সামঘিনের মনে হয়, যে কথাগুলো ও বলল তার উপলক্ষ্য যতটা ও নিজে, সমভা ততটা নয়।

'বিপ্লব কি দাবী করে জানো? দাবী করে যে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলে, স্বতন্ত্র-ভাবে সৃষ্টি-সাধনার স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে এই কথাই শুধু

জানুক—সে ইতিহাসের দাস মাত্র।'

যে-সব চিন্তা ওর অন্তরকে পীড়া দিচ্ছিল তা বলার জন্য ও, পাগল হয়ে উঠেছিল। সে প্রয়োজন মিটে গেল। এবারে নিজের মনের সত্য পরিচয় গোপন করবার জন্য ও নিতান্ত নির্বিকার ভাবে বলে:

'মানুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির চাইতে ইতিহাস অনেক বেশী নির্মম। মানুষ তার সহজাত প্রকৃতির দাবী মেটাক—প্রকৃতি এইটুকুই চায়। কিন্তু ইতিহাসের অত্যাচার মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির ওপর।'

'তলস্তয় এরকম কি একটা বলেছিলেন না?' জিজ্ঞেস করে লুবাশা।

সার্মঘিন লক্ষ করে, মাষ্টার মশাইয়ের প্রেমে-পড়া ইস্কুলের ছাত্রীর মতো ভারভারা ব'সে আছে। কখন সার্মঘিন ওকে কোন অজানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে ফেলে এই ভয়ে ও কাঁটা হয়ে আছে। সেই দিক থেকে সার্মঘিনকে ঠান্ডা রাখার জন্য মাঝে মাঝে ও সহানুভূতি-ভরা দীর্ঘ নিশ্বাসের রসান দিয়ে দু'একটা মন-রাখা-গোছের মন্তব্য করে। যেমন:

'জীবন সম্বন্ধে এত হতাশ কেন তুমি?'

'ও নৈরাশ্য-বাদী, জানো না?' টিপ্পনী কাটে লুবাশা।

কথায় লুবাশা ভয় পায় না বা ঘাবড়ায় না। ও সর্বদা বলে:

'বাবাঃ, দয়া নেই মায়া নেই, এ তো আমি ভাবতেই পারি না।

সার্মঘিন জানে, বাইরে থেকে অত উগ্র না হলেও লুবাশার জেদ সাংঘাতিক। সেই জন্যও ওর যেন সন্দেহ হয় যে লুবাশা যত সরলই হোক, আর যতই আবোল-তাবোল বকবক করুক, আসলে ও অত্যন্ত ধূর্ত। সেই জন্যই ওর সংগে সার্মঘিনের ব্যবহার অত্যন্ত সতর্ক। লুবাশা যদি কখনও নিজের সম্বন্ধে হাল্কা ভাবে বা ঠাট্টা ক'রে কিছু বলে, সার্মঘিনের কাছে ও যেন আরো দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে।



লুবাশার বাইরের মানুষটা যে তার নিজস্ব সত্য-স্বরূপ নয় এই কথাটা স্পষ্ট ক'রে হৃদয়ংগম করার অবকাশ জুটে গেল সার্মঘিনের। সে-দিন দিওমিদফ যখন ও-বাড়িতে এল, ঘটনাচক্রে ও উপস্থিত ছিল। যেমন স্বভাব, দিওমিদফ হঠাৎ এল একেবারে নিঃশব্দে, যেন ঘরের পাঁচিল ফুটে বেরিয়ে এল। মাথা কামান—যার ফলে তীক্ষ্ন-গঠন করোটিটা, চ্যাপ্টা ঘাড় ও নীচের-অংশ-কাটা নীলচে কান দুটো একেবারে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। মুখটা ফোলা; চোখের সাদা মাংস হলদেটে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দৃষ্টিতে গভীর অবসাদ ও ঘৃণা। বলল:

'হাসপাতালে ছিলাম তেইশ দিন।' ভারভারার কাছে গোটা কয়েক টাকা ধার চাইল—যত দিন ভালো হয়ে কাজ না করতে পারছে চালাতে হবে তো।

সেলাই করছিল লুবাশা। ওর হাত থেমে গেল। কঠিন দৃষ্টিতে দিওমিদফ-এর দিকে তাকিয়ে রইল। দু'একবার ওই দেখে দিওমিদফ চটে উঠে বলল :

'অমন ক'রে আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? আমার চেহারাটা দেখতে ভালো লাগছে না?'

'লিদিয়া ভারাভ্কার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনি য়্যানার্কিস্ট,

তাই না?'

'আমি মানুষ।' কঠোর স্বরে জবাব দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় দিওমিদফ।

লুবাশার কঠোর শ্লেষ এমন নির্মম ভাবে মানুষটাকে আক্রমণ করল যে সামঘিন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর মুখ আর থামেই না। দিওমিদফও উপযুক্ত জবাব দিতে কসুর করে না। তাতে আরো আগুন হয়ে ওঠে লুবাশা। ওর খুদে খুদে চোখগুলিতে একটা কিরকম হিম আলো যেন ঝলসে ওঠে। ঝাপটা মেরে সূ্চের সুতো কাটে—সুতোটা যেন ধাতব তারের মতো ঝন্ঝনিয়ে ওঠে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সামঘিন। সেই ছোট খাটো, গোলগাল মেয়েটি, গ্রাম্য-বালার মতো যার সারল্য ভরা চেহারা, করুণায় বিগলিত হয়ে ছাড়া সম্ভবতঃ যে কিছু ভাবতেই পারে না—সেই মানুষ একটা রুগ্ন আতুরের ওপর এমন নির্মম কি ক'রে হতে পারে! এত বিষ কোথা থেকে আসে ওর! কুকুরের তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো অসহায় দেখায় দিওমিদফকে। ও বলে:

'আজ আমায় নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু দাঁড়াও, দিন আসবে। তোমায় নিয়েও মানুষ হাসবে।'

'তাই নাকি? তার এখনও দেরী আছে।' জবাব দেয় লুবাশা।

তারপর হতবাক্ সামঘিনকে আরো হতবাক্ ক'রে দিয়ে ওর করুণা ও প্রীতিতে সরল হয়ে উঠে একেবারে নিখাদে নেমে আসে।

'যাবেন এক জায়গায়? বোধহয় তার সঙ্গে আপনার মতের অমিল হবে না। লোকটা মৌমাছির চাষ করে। সেক্টারিয়ান। এমনিতে বেশ মজার লোক। অনেক বই আছে। কয়েকটা দিন থেকে আসুন না গিয়ে সেখানে। দেশের হাওয়ায় শরীরটাও একটু সারবে।'

'ও সব আমার পছন্দ নয়।' আপত্তি জানিয়ে উঠে যাবার জন্য তৈরি হয় দিওমিদফ। আর সামঘিনের দিকে তাকালও না, ভারভারার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমভাকে বলল করমর্দন না করেই:

'গাঁয়ে আমি যাব না।'

ও চলে গেলে লুবাশাকে জিজ্ঞেস করে ক্লিম:

'এক সেক্টারিয়ানের সঙ্গে ওকে জুটিয়ে দেবার জন্য তুমি এমন উঠে পড়ে লেগেছে কেন, বলো তো।'

'ওখানটায় ছাড়া আর কোথায় ওকে রাখার ব্যবস্থা করি, বলো।'

'কেন? দুনিয়ার লোকের ব্যবস্থা করার ভার তোমার ওপর পড়েছে বলে মনে হচ্ছে যেন!'

'যা বলেছ!' হাতের কাজ থেকে চোখ না তুলেই জবাব দেয় লুবাশা।

ওকে একটু জব্দ করার ইচ্ছা হয় সামঘিনের। প্রশ্নে প্রশ্নে ওকে একেবারে নাজেহাল করে তোলে। অবশেষে বাধ্য হয়ে লুবাশাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয়:

'আমাদের গ্রামগুলো এত অশিক্ষিত। কোন কিছু কেউ চিন্তাই করে না। মতবাদ যাই হোক না কেন, এদের মনগুলোকে যদি নাড়া দিতে পারে তাহলেই যথেষ্ট হয়।'

ব্যঙ্গের স্বরে জবাব দেয় সামঘিন: 'অভিনব পন্থা বটে।'

মুখ না তুলেই ব্যাখ্যা করে লুবাশা:

'গ্রামের সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই।'

সামঘিন নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমনি কিছু হয়তো ভাবতে পারত—যে ও

জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, বেশ নাম-করা, মান্য-গণ্য মস্ত বড় একজন লোক হবে। স্ত্রীটি হবে সুশীলা, গৃহকর্ম-নিপুণা; যে-কোন বিষয়ে বেশ বুদ্ধি দিয়ে আলাপ করতে পারবে; আর পারবে ওর মজলিসে অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়ন ও গৃহ-কর্ত্রীর কর্তব্য দক্ষতার সঙ্গে পালন করতে। ছোট্ট সে-মজলিসটিতে থাকবে শুধু সাংস্কৃতিক সমস্যা নিয়ে সত্যিকার আগ্রহশীল বাছা বাছা এরকম জনকয়েক বন্ধু-বান্ধব, যাদের মন-মেজাজকে গড়ে পিটে তৈরি করবার নিয়ম-কানুন, আদর্শ-উদ্দেশ্য রচনা করবে ক্লিম সামঘিন স্বয়ং। কিন্তু অন্তরায় হ'লো লুবাশা।

কোন রাস্তার বদমাশ ছোকরা একটু হাঙ্গামা করার মতলবে পরের রবিবার সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে যে-সুরে নিজেকে আশ্বাস দেয়, ও ভবিষ্যতের কথা সেই সুরে বলে। যেন মহামারীর মতো এ ধরনের মনোভাব, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে—সহ্য না করেও উপায় নেই। অত্যন্ত প্রবল কতগুলি শক্তির সঙ্গে বোধহয় ক্লিমের সংঘর্ষ অনিবার্য। ও বুঝতে পারছে এমনি একটা ভয় যেন ওর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমাগতই ওকে পেয়ে বসছে।

*

ভারভারা ও লুবাশার কাছ থেকে নানা কাহিনী শুনে এবং নিজের মনের মধ্যে সেইগুলি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে হাল-আমলের ভাবধারা, বিভিন্ন মতামত, বিরোধ ইত্যাদির খবর, চলতি নানারমক সূত্র, কাহিনী, শ্লোক ইত্যাদি সামঘিনের ভান্ডারে জমা হয়। আজকাল ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ছাপা পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। প্রথম প্রথম লুবাশা এনে এগুলি জোর ক'রে ওকে গছাত। এখন ও নিজেই সংগ্রহ করে। অল্প দিনের মধ্যেই ওর সংগ্রহের ভান্ডারে এল দুমুখো ঈগলের কবল থেকে নিজেদের সংবিধান রক্ষায় সংগ্রামরত ফিনল্যান্ডের ছবি-সম্বলিত পোষ্টকার্ড; আর একখানা এল—চাষ-রত একটি রুশ কৃষক, সঙ্গে আছেন জার, একজন সেনাধ্যক্ষ, একজন যাজক, একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, একজন বৈজ্ঞানিক, একজন ধনিক ও ভিখারী। এই সাতজনের হাতে চামচ। ছবিটার নীচে লেখা—'এক জনাতে লাঙ্গল চষে, সাত জনাতে চামচ কষে।' ভারভারা যেন কোথা থেকে কার আঁকা একটা ড্রয়িং-এর ফটোর কপি ওকে এনে দিল, যার বিষয়-বস্তু হচ্ছে—উজাড়-প্রায় একটা গ্রামের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিবস্ত্র জার—তাঁর মাথায় মুকুট, আর দুই হাতে তলোয়ার। ছবিটার নাম—"সামেদেরঝেজ" *

ওর অন্যান্য সংগ্রহের মধ্যে একখানা ছিল শাদ্রিন্-এর দানব-পরিবৃত এক মানুষের ছবি। আর একখানায় পবোদেনেস্‌ৎসেভ্‌কে আঁকা হয়েছে বাদুড়ের মতো ক'রে। এ ছাড়াও আরও বহু দুষ্প্রাপ্য ছবির পোষ্টকার্ড জমা হয়েছে ওর ভান্ডারে। এই সংগ্রহটি সম্বন্ধে ওর মনে কিছুটা ভয় থাকলেও, এটি ছিল ওর একটা বিশেষ গর্বের বস্তু। সংগ্রহ ও বাড়িয়েই চলেছিল; কোর্ট-ইনস্‌পেক্টর যেমন ক'রে কারো বিরুদ্ধে নালিশ করতে হলে তার মাল-মশলা সংগ্রহ করে তেমনি ক'রে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল কমই যায় ক্লিম। সেখানে ছাত্রদের মধ্যে বিদ্রোহ

* কথাটার অর্থ হচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী কিন্তু শব্দগত অর্থ, হচ্ছে—যে নিজেকে রক্ষা করে। —অনুবাদক।

ক্রমশঃই ছড়িয়ে পড়ছে। একদিন এক সভায় শুনলো একজন ছাত্র খুব গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছে সরকারের কাছে ১৮৬৪ সনের শিক্ষা-আইনের পুনঃ-প্রবর্তনের দাবীর জন্য সমস্ত ছাত্র-সমাজের কাছে উদাত্ত আহবান জানিয়ে।

ক্লিমের পাশে যে-ছাত্রটি দাঁড়িয়ে ছিল—ভালো চেহারা, হাল্কা চুল, সম্ভবত দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর—পাগোলের মতো চিৎকার করে উঠল:

'আমাদের দাবী—' এবং ক্লিমকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল: 'আরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আওয়াজ তোল—'

শুকনো ভাবে জবাব দিল ক্লিম: 'কিসের আওয়াজ তুলব। ও-আইনে কি আছে আমি জানিই নে।'

ছেলেটি জবাব দিল: 'সে কি ছাই আমিই জানি!' তারপর আবার চিৎকার ক'রে উঠল: 'রাজী। আমরা রাজী। মন্ত্রীর কাছে আবেদন করা হোক।'

সামঘিনের মনে হয়—এবং মাঝে মাঝেই হয়—ঠিক কথাই বলেছিল ভারভারা যে, এসব বিরোধিতা হচ্ছে উচ্ছ্বাস মাত্র।

পড়ায় ওর উৎসাহ নেই। পড়তে হবে তাই পড়ে। এখন বুঝতে পারে আইন নেওয়া ওর ঠিক হয়নি। আদালতে দাঁড়িয়ে ও খুনি গুণ্ডা আর বুজরুকদের পক্ষ সমর্থন করছে—এ ছবি ও কল্পনাও করতে পারে না। ওর বিচারে যারা অসাধু, ভণ্ড—যারা ওর অর্থাৎ নিতান্তই ব্যক্তিগত ভাবে আধ্যাত্মিক মেজাজের যে মানুষ—এরকম মনোগঠনকে ওর যতই সৃষ্টিছাড়া মনে হোক—তবু সেই মানুষের জীবনে যারা হস্তক্ষেপ করে, তাদের অপরাধ স্খালন করার বিন্দু মাত্র প্রবৃত্তি নেই ওর।

*

সারকিট কোর্টের ফৌজদারী মামলার বিচার শুনতে সামঘিন বার পাঁচ গেল। এর আগে কখনও মামলা দেখেনি ও। গির্জায় ও অবশ্য খুব কমই গেছে। তবু গির্জার সঙ্গে আদালত—কক্ষের কোথায় যেন খানিক মিল আছে ব'লে মনে হলো। এজলাসটি যেন বেদী, তার পেছনে টাঙ্গানো জারের ছবিটি যেন বেদীর শিল্প-শোভিত পশ্চাৎ-পট; আর কাঠগড়া ও জুরীদের আসন যেন প্রার্থনা-সঙ্গীতের জন্য নির্দিষ্ট আবেষ্টনী।

প্রথম দিন গিয়ে ও হতাশ হলো। একটা চুরির মামলার শুনানী চলছিল। আসামী তিন জন। দ্বিতীয় বারের অপরাধ। বিভিন্ন বয়স কিন্তু তিন জনেই পরিণাম সম্বন্ধে উদাসীন। আদালতের রীতি-পদ্ধতি সবই যেন ওদের নখাগ্রে। কি শাস্তি পাবে তাও যেন জানা। ইচ্ছা না থাকলেও শান্ত ভাবেই অবশ্য-করণীয় গুলো ক'রে যায়। জেরার জবাব তাদের যান্ত্রিক, সংক্ষিপ্ত ও ভদ্র। ঠিক তেমনি যান্ত্রিক ও ক্লান্তি-কর বিচারপতির জেরা ও বাদী-পক্ষের কৌঁসিলীর সওয়াল। আসামীদের মধ্যে একজন পলিত-কেশ বৃদ্ধ অভিনেতাদের মতো গোঁফ-দাড়ি কামান, মাংসল মুখ, ক্লান্ত চোখ। বিচারকদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য—প্রায় অনুচিত রকমের। সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে চলেছে বৃদ্ধ। দুটি তরুণ অ্যাডভোকেট—সম্ভবতঃ সরকার নিযুক্ত আসামী পক্ষের কৌঁসিলী—নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কি যেন আলাপ করছিল। নিজেদের মক্কেলদের সম্বন্ধে তাদের কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। জুরীরা দারু-মূর্তির মতো গম্ভীর হয়ে বসে

আছেন। এক জন শুধু ফরিয়াদীদের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এবং উক্ত আসামী ধর্মাবতার বলে উঠে দাঁড়াতেই খুদে চোখ দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হেসে ওঠেন। ভদ্রলোক বয়স্ক, ছোট খাট দেখতে, মাথা-জোড়া টাক, নবজাত শিশুর মতো টকটকে গোলাপী মসৃণ মুখমন্ডল ; গলা বেষ্টন ক'রে আছে বিশিষ্ট কোন সম্মানের সূচক-সম্বলিত পটি; অনবরত দাড়ি নেড়ে কথা বলেন তিনি।

অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হলো সামঘিনের। সে বসে বসে দর্শকদের গুনতে লাগল। তেইশ জন পুরুষ, নয় জন মহিলা। দামী ফার-কোট ও পুঁতির টুপী পরে স্থূলকায়া, আয়ত-নয়না এক মহিলা এসেছেন ; অস্ত্রভ্স্কির অসংখ্য বণিক-বনিতাদের চরিত্রের মধ্যে কোন একটি ভূমিকায় অবতীর্ণা অভিনেত্রীর মতো লাগছে দেখতে। হিসাব ক'রে দেখল সামঘিন তিন জন মাত্র আসামীর বিচারের জন্য জন বিশেকের ওপর মানুষ লাগছে। কাজেই এ মামলা নিশ্চয়ই অত্যন্ত ব্যায়-বহুল।

আরেকটা মামলায় যে বর্বরতা দেখল তাতে ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। আসামীদের মধ্যে চারজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ এবং এক জন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার মস্ত বড় নাক, বসে-যাওয়া কুৎকুতে চোখ—মুখখানা যেন ছেঁড়া ন্যাকড়ার তালি-দেওয়া। অভিযোগ—খুন। এক মহিলাকে নাকি ডাইনী সন্দেহে পাঁচ জনে মিলে হত্যা করেছে।

শীতের দুপুর। দুইটি প্রশস্ত ফলক রচনা ক'রে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে আদালত কক্ষে। সেই আলোয় আলো হয়ে উঠেছে বাদী পক্ষের এটর্নীর নিখুঁৎ ভাবে আঁচড়ান তামাটে রঙের মাথাটি, আর দশজন জুরীর দশটি মুখের বিভিন্ন আকারের প্রফাইল। দুইজেন জুরীকে দেখা যাচ্ছে না, তারা দশম জনের প্রকাণ্ড বড় মাথা-ভরা রাশি রাশি চুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ওদিকে বসে আছে প্রতিবাদীরা; কয়েদীর পোশাক আর লম্বা দাড়িতে তাদের প্রায় একই রকম দেখাচ্ছে। ওরা ঠিক যেন চারটি সহোদর ভাই। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওরা বিচারকদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সামনে রয়েছেন তাদের পক্ষের এটর্ণী—ছোট খাট মানুষটি প্রকাণ্ড বড় ভুঁড়ি, মাথা জোড়া টাকের ওপর এক গোছা পাকা চুল, সরু লিক লিকে চর্মসার দুই ঠ্যাং, কেবল উঠছেন বসছেন আর ছট্‌ফট্‌ করছেন। চেহারা খানা দেখতে ঠিক দাঁড়কাকের মতো ; গলাটা অস্বাভাবিক মোটা। প্রধান বিচারপতির মুখটি ক্ষৌরচিক্কণ ; গিল্টি-করা কলার গলায় চেপে বসায় কান দুটো নীল হ'য়ে যেন ছিট্‌কে উঠে আসতে চাইছে ; চ্যাপটা মুখখানা খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে এবং গলার চাপে এমন লাল হয়ে আছে, মনে হয় যেন ফেটে পড়বে। গলার স্বর মৃদু হয়তো কোমলও। বললেন :

'তাহলে আপনারা স্বীকার করছেন যে নিহত মহিলাকে আপনারাই প্রথমে ডাইনী ব'লে জানতে পারেন।'

যে আসামীটি হাত পেটের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে ছিল, সে অত্যন্ত রেগে জবাব দিল:

'প্রথমে আমরা জানব কেন? গোটা গ্রামটাই জানতো। আমি শুধু ওর লেজটা প্রথম দেখেছিলাম : ও নদীতে কাপড় ধুচ্ছিল। আমি নৌকা মেরামত করছিলাম। হাওয়া উঠল। ওর পেছনের কাপড়টা স'রে গেল। তাকিয়ে দেখি কি—ইয়া এক খানা লেজ!'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! আচ্ছা আপনি কি জানতেন না যে মল-দ্বারের কাছে চুল গজায়?'

'সে আবার কি?' সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞেস করে আসামী।

বিচারক ব্যাখ্যা করেন। সামঘিনের আশে-পাশের দর্শকেরা নতুন কিছু শুনবার আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। গম্ভীর ভাবে মন দিয়ে বিচারকের কথা শুনল আসামী। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নালিশের সুরে বলল :

'তা জানব না কেন? কিন্তু ও মেয়েটার তো তা নয়। সত্যিকার লেজই ছিল। ঠিক ঝাঁটার মত। গরুর বা খরগোশের যেমন গোছা-করা লেজ থাকে তেমনি আমি স্পষ্ট দেখেছি।'

হোঃ হোঃ ক'রে জুরীরা হেসে উঠল, দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন ছড়িয়ে গেল।

প্রধান-বিচারপতি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন:

'চুপ, নইলে সবাইকে বের ক'রে দিতে বাধ্য হবো।'

তারপর গলার কলারটা একটু ঢিলে ক'রে আরও দু'একটা মামুলী প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে বিরতি ঘোষণা করলেন।

সামঘিন অবসন্ন পীড়িত মনে বেরিয়ে এল। দিন কয় পর মানসিক বাধা দুই হাতে ঠেলে ফেলে আবার আদালতে এল। এবার একটা পিতৃহত্যার মামলা। আসামী ছেলেটির বয়স অল্প, বলিষ্ঠ চেহারা, এক মাথা কালো চুল। ওর পক্ষ সমর্থন করছেন মোটা থস্‌থসে চেহারার বিখ্যাত এক জন এটর্ণী। মানুষটার গলার স্বর মৃদু, তাতে নমনীয়তা আছে, আছে হৃদয়গ্রাহী একটা ঝঙ্কার। মামলা পরিচালনার সময় কথা বলেন অত্যন্ত হিসেব ক'রে-অর্থাৎ ঠিক যে কটি কথা না বললে নয় এবং বাদী পক্ষের এটর্ণীকে ঘায়েল করার মতো জোরদার যুক্তির জন্য বাছা বাছা যে কটি দরকার।

বাদীর এটর্ণীর চেহারা খানা এইমাত্র "পিতার মার্জনা-পাওয়া অমিত-ব্যয়ী পুত্রের মত।' কিন্তু প্রতিবাদীর এটর্ণীর চাল চলন ভাব-ভঙ্গি অনেকটাই অভিনয় যা মানুষের মন ভোলায়। লোকে ওকে মস্ত বড় আইনজ্ঞ ভাবে। মামলা দেখতে বহু লোক এসেছে। ঘর লোকে লোকারণ্য। সবারই নজর প্রতিবাদীর এটর্ণীর দিকে। আসামী বেচারা দুইজন খোলা-তলোয়ার-ধারী সেপাইয়ের মাঝখানে বিরস মুখে দুই হাঁটুর মধ্যে হাত গুঁজে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ভয়ে ভয়ে আড় চেখে পিট্ পিট্ ক'রে চারিদিকে তাকাচ্ছে। ভয়ে বিবর্ণ শিলীভূত দুই চোখ, ওর নীচু কপাল, আলকাতরার প্রলেপের মতো লেপ্টে থাকা একা এক রাশ ঘন-কৃষ্ণ চুল, ওর ভারী-গঠনের চোয়াল, কঠিন-বদ্ধ ওষ্ঠ—গভীর ভাবে দাগ কেটে যায় সামঘিনের মনের মধ্যে। এবং এর পর থেকে যত মামলা ও দেখেছে, ওর মনে হয়েছে সর্বত্র ফরিয়াদীদের সঙ্গে এই পিতৃহত্যার মামলার ফরিয়াদীর কোথায় যেন একটা মিল আছে। লম্ব্রোসো হয়তো ঠিক কথাই বলেছেন। ড্রিল্ এ কথা স্বীকার করেন না। কারণ হয়তো তাঁর গভীর মানবতা-বোধ। কিন্তু জঘন্য দুষ্কৃতির ব্যাপারে মানবিকতার স্থান নেই। শুধু স্থান নেই তা নয়, থাকা ক্ষতিকর।

এরপর ও নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলে; আদালতে যাওয়া ও ছেড়ে দিল। ওর মনে হয় ভারাভ্কার কথা শুনে ইন্জিনীয়ারিং ইন্স্টিটিউট-এ পড়লেই পারত।

আর একটা ভারী অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হলো সামঘিনের। সেদিন ভারভারার ওখানে থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিল একটু বেশী রাতেই। শুক্লপক্ষ। ঘন্টা খানেক আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে শুকনো মাটিকে সরস ক'রে দিয়ে গেছে। ভেজা বাতাসের উষ্ণতায় নব-কিশলয়ের সৌগন্ধ। চাঁদ পত্র-জালের ছায়া দিয়ে ধুলোর বুকে রচনা করেছে সূক্ষ্ম চিত্রালি। সামঘিনের মনটা বেশ ভালো ছিল। ভাবছিল—চলেই আসবে, উঠবে ভারভারাদের ওখানে। ভারভারা তো খুব তাগিদ দিচ্ছে। সুবিধা সত্যি হবে। ও আর এমর্ফিভিয়েভ্না দুজনে মিলেই ওর খুব যত্ন করবে। ও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে ভারভারার মধ্যে—আরামের ছোট একখানি গৃহ চায় ভারভারা-সমস্ত অন্তর দিয়ে। নিজের নীড় খানা ও সাজায় গোছায় নিরলস ভাবে। সামঘিন ভাবে-গৃহ শুধু নয়, গৃহীও চায়। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে : 'সে-গৃহী কি তুমি সামঘিন?'

কে যেন ডাকল। এই মাত্র একটা লোক গেল পাশ দিয়ে। সেই। এবং নিমেষেই ওর হাত বাধা পড়ল তাঘিলস্কির হাতে। ছাই রঙের একটা কোট গায়ে। টুপীটা পেছন দিকে হেলান, এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, পুরো মাতাল। চীনে-মাটির মুখোসের মতো মুখখানায় পড়েছে লালের দাগ্ড়া। চোখ বড় বড় করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন পলক ফেলতে ভয় করছে ওর।

'এত রাতে? মেয়ে শিকারে বেরিয়েছ বুঝি? 'তা এখানে কি মাল পাবে?' অতি বিশ্রী ভাবে কলকল করে উঠল ও। 'এই মেয়েগুলোকে আমার ঘেন্না করে। ফুর্তি টুর্তি করি ওদের নিয়ে, কিন্তু দারুণ ঘেন্না করে। দি সোজা মুখের ওপর শুনিয়ে—ঘেন্না করি কি সাধে? করি তোমরা আমাদের শয্যা-সঙ্গিনী ব'লে। শুনে শুধু বোকার মতো হাসে। যত সব চোর! ওদের সব বেটী চোর!'

সামঘিনের মনে পড়ে দিন কয় আগে মস্কো গেজেট্এ একটা খবর বেরিয়েছিল—একটি ছাত্র নালিশ রুজু করেছে—কোন এক গণিকালয়ের পরিচারিকা তার টাকা চুরি করেছে ব'লে। আসামীর সাক্ষীরা সকলেই সাক্ষ্য দিয়েছে যে সেই দিন গোটা রাত মেয়েটি অন্য আর এক জন মক্কেলের ঘরে কাটিয়েছে। অতএব ছাত্রটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবার সুযোগই ছিল না, সুতরাং টাকা চুরির প্রশ্ন আসতেই পারে না। খবরটা শিরোনামায় ছিল : "ছাত্রের ভুল!"

টুপী খুলে বাতাস করতে করতে অনর্গল বকবক করতে লাগল তাঘিলস্কি: 'আর ব'লোনা ও বেটীদের কাণ্ড। সেই জেলা-এটর্ণী কুচিনা না কিচিনা—কি যেন নাম? তার ওখানে গিয়েছিলাম সেদিন। তোমার মনে আছে ভেরা পেত্রোভা বলে একটি মেয়ে জেলে আত্মহত্যা করেছে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে! কেউ কেউ ব্যাপারটাতে রাজনৈতিক রং লাগাতে চেষ্টা করে। আবার আর এক পক্ষ বলে কিচিনের সঙ্গে না কি ব্যাপার হয়েছিল মেয়েটির। কিন্তু আমার মনে হয় ও সব কিছু না। কিচিন অত কাঁচা ছেলে নয়।'

নিজের কথায় নিজেই খুশি হয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে তাঘিলস্কি। বলে : 'না না, ও মিদ্রিগাইলভ্-এর মতো নয়। মোটমাট—হিংস্র প্রকৃতির নয় লোকটা। কিন্তু অত্যন্ত নীতি-নিষ্ঠ, অত্যন্ত কড়া লোক।'

হঠাৎ পা পিছলে গেল ওর, সামঘিন ধরে ফেলল।

হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল তাঘিলস্কি :

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। ভারী ভালো বই একটা আর আমার দস্তানা জোড়া রেস্তোরাঁয় ফেলে এসেছি—' পায়ের দিকে তাকাতে তাকাতে ও কথাগুলো বলল—যেন দস্তানা ও পায়েই পরে থাকে। 'চল না যাই একবার, দেখে আসি। দূরে নয় বেশী। বরঞ্চ আর একটু বসে গেলাশে চুমুক দিতে দিতে কথাবার্তা বলা যাবেখন কি বল।'

ক্লিমের জবাবের অপেক্ষা না করেই ওকে টেনে নিয়ে চলল তাঘিলস্কি। মাতাল হলেও এমন শক্ত এবং কৌশল ক'রে ধরল যে কিছুতেই হাত ছাড়াতে পারল না ও। তাঘিলস্কি সম্বন্ধে ক্লিমের কৌতূহল ছিল, কারণ প্রেইস-এর আড্ডায় ও সবাইকে টেক্কা দিয়ে পণ্ডিতি চালে চলে। কোনও বিষয়ে ওর মতামত দেওয়া ছিল যেন বড়-লোকের ভিক্ষে ছুঁড়ে দেওয়ার মতো। এ ছাড়াও রীতিমত আকর্ষণের বস্তু ছিল ওর মাজা-ঘষা, সযত্ন-লালিত, লাস্য-ভরা দেহখানি—যার হয়তো স্মার্ট পোশাক পরবার আর ভালো আরাম-দায়ক চেয়ারে বসবার জন্যই বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।

সামঘিন জিজ্ঞেস করে : 'প্রেইস-এর ওখানে বহু দিন যান না?'

'না, এই সামান্য একটু ঝগড়া হ'য়েছিল : বিশেষ কিছু না, অমনি এই একটু সময় কাটাবার জন্য আর কি।' নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দেয় তাঘিলস্কি।

রেস্তরাঁর দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে খুলে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েই একজন ওয়েটারকে চড়া-স্বরে হুকুম দিল ওর বইটা আর দস্তানা জোড়া খুঁজে দেখবার জন্য। তারপর ভেতরে এসে পানীয়ের বোতল সামনে নিয়ে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। এর মধ্যে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে গেলাশে চুমুক দিতে দিতে অনর্গল বক্ বক্ করতে লাগল।

বেশ মজার একটা কথা বলেছিল কিচিন। বলেছিল, মার্ক্সবাদ নিরেট বনেদের ওপর তৈরি ধর্ম-মত হলেও আমার একটু মুস্কিল আছে ও ব্যাপারে যেতে। আমাদের সব বুর্জোয়া কি না। বাপ বুর্জোয়া, ঠাকুর্দা বুর্জোয়া। সবাই তাই।—বুকের পাটা আছে, কি বল! নইলে অমন কথা বলতে পারে!

স্থির চ্যালেঞ্জ-ভরা দৃষ্টিতে ও ক্লিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। রক্ত বর্ণ ফোলা ফোলা ঠোঁট দুটো একটা রূঢ় হাসিতে বাঁকা হয়ে ওঠে। কুকুরের মতো জিব বের ক'রে ঠোঁট চাটতে থাকে। দরজার কাছেই বসেছে ওরা। পাশে রাখা যন্ত্রটা থেকে অবিশ্রাম বাজনা বেজে চলেছে। ধোঁয়ায় আর কোলাহলে সমস্তটা ঘর বিশ্রী হয়ে উঠেছে। কাছেই একটা টেবিলে ব্যঙ্গ-চিত্রের মতো বেমানান রকম বড় নাক-ওয়ালা এক ইহুদী চেয়ারে বসে তার সমস্ত দেহ আর ঝাঁকরা-চুল মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পাশের দাড়িওয়ালা রুশ ভদ্রলোকটির মুখের কাছে উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে কি যেন বলছে চাপা স্বরে। ওর মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন। এক মনে সিগারেট টেনে চলেছে রুশ ভদ্রলোক। আরেকটা টেবিলে মন্ত্রী উইট্রের মতো দেখতে আর একজন রুশ ভদ্রলোক তাঁর প্লেটের শূকর শিশুর মাথাটা ফুটো ক'রে তার ঘিলু বের করবার জন্য গলদ-ঘর্ম হচ্ছেন। তাঁর সামনে বসে ধীরে সুস্থে খাচ্ছেন এক মহিলা—তাঁর মুখ খানা যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। কানে সবুজ পাথরের দুল। তাঘিলস্কি আরো চাপা স্বরে তার গল্প বলে চলেছে :

'বুঝলে, কিচিন বলে—আমাদের এই বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যারা ইতিহাসের এই তত্ত্বকে না মেনে উপায় নেই বলে মনে করে, তারা বোকা। এবং তারা বোকা বলেই তাদের দ্বারা এই বিশ্বাস-ঘাতকতা ঘটে। যেহেতু ইতিহাসের নিয়ম

হলো প্রকৃতি ও মানুষের শক্তির যোগফল। সে-যোগফল যতই হবে নিবিড়, ততই আমাদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হবে দ্রুত। তুমি কি বল? একদল গোঁড়া উদার-পন্থী আছেন—'

ঘটাং ক'রে কলের বাজনাটা থেমে গেল কতগুলো এলোমেলো বেসুরো আর্তনাদ ক'রে। ইহুদীটির এসব দিকে খেয়াল নেই। তার হতাশার সুর সারা ঘরখানায় অনুরণিত হচ্ছে।

'কে ওই জনমানব-শূন্য জায়গায় কারখানা তৈরি করতে যাচ্ছে বলো! রাস্তা-ঘাট কি আছে! লঝ্‌ঝর ঘোড়ায় চড়ে, টিকুস্‌ টিকুস্‌ করো সাত-আট ঘণ্টা।'

উইট্রের মতো দেখতে লোকটি এতক্ষণে সেই দাঁত-বের-করা সাদা মাথাটা ভাঙতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু মাথার ভেতরটা ফাঁকা। সামনের মহিলাকে সেটা দেখিয়ে পরিবেশককে জিজ্ঞেস করলেন :

'ঘিলুটা কি হলো হে! এরকম রদ্দি মাল দাও কেন?'

ইহুদী অপ্রতিভের মতো চারদিকে তাকায়। তাঘিলস্কি ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে দেখে ও মুখ নীচু করে। কলের বাজনাটা আবার বেজে ওঠে। তাঘিলস্কি মদের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে সামঘিনকে বলে :

'খুব সাহস লোকটাব, যাই বল!'

'হয়তো কোন কারণে ওর মনটা বিষিয়ে আছে।'

'তা হবে! কিন্তু তবুও। ভালো কথা, ও আরো কি বলছিল জান? এখন থেকে সরকার নাকি রাজনৈতিক অপরাধীদের মামলা শাসন-বিভাগের হাত থেকে সরিয়ে এনে খোলা আদালতের এক্তিয়ারে আনবে যাতে জনসাধারণ জানতে পারে যারা সত্যের দোহাই দিয়ে শহীদ হচ্ছেন, তারা কি চীজ্‌! বন্দীদের ওপর, সেই কিনা বলে—"লাঞ্ছিত-প্রপীড়িত মানবতা"র ওপর আর যে মহাত্মারা দুনিয়াটাকে উচ্ছন্ন দেবার জন্য পাঁয়তারা করছেন, তাদের জন্য দরদ একেবারে গলে গলে পড়ছে কিনা সবার।'

সরু সরু মেয়েলী সিগারেট-ভরা কেসটা সামঘিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে ও বলে আবার :

'লক্ষ্য করেছ? মার্ক্সবাদ মানুষে মানুষে সম্পর্ককে কি রকম ক'রে তুলেছে!'

সামঘিন নিঃশব্দে কেবল কাঁধ নাড়ে। চশমাটা মুছে নিয়ে ও মন দিয়ে শোনে। ওর মন বলে, এই বর্তুলাকার ক্ষুদ্র মানুষটি তার নিজস্ব কথাই বলছে, শোনা কথা নয়। এও ভাবে ও : 'হয়তো ভুলিয়ে কথার ফাঁকে আমার পেট থেকে কথা বের করতে চাইছে লোকটা।'

তাঘিলস্কির নেশা কমে এসেছে। ঝাঁঝাল স্বর দৃঢ় হয়েছে; জিহ্বার আড়ষ্ট-তাও আর নেই। খুশিতে মুখখানা উদ্ভাসিত।

বাকী মদটুকু সামঘিনের গেলাশে ফেলে দিয়ে ওর দিকে চোখ রেখে তীক্ষ্ন হেসে বলে :

'নিশ্চয় তুমি মানবে যে পোয়ারকভ একগুঁয়ে মানুষ, না নিজে কিছু শেখে, না কাউকে কিছু শেখায়। একেবারে শেখায় না তা নয়, শেখায় সাংস্কৃতিক দুনিয়ার দুশমনি করতে।'

'পোয়ারকভ কাকে কি শেখায় তা আমি জানিনে; কিন্তু এটুকু জানি যে, তোমাদের এই সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় এমন কতগুলি লোক আছে—যাদের থাকাটাই একেবারে মোক্ষম প্রমাণ যে ওই জায়গাটার অবস্থা বিশেষ সুস্থ নয়।'

একথা বলেই আবার সামঘিনের মন চমকে ওঠে : 'এই রে—শুয়োরটা আমার

পেটের কথা বের করার ফন্দী আঁটছে!'

কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বলে : 'তোমার এইটেই তো শেষ পরীক্ষা, তাই নয় ?'

তাঘিলস্কি মাথা নেড়ে জানিয়ে দেয় : 'শেষ পরীক্ষাই এটা,' এবং কি কারণে কে জানে, ওর ছোট লাল হাতটা দিয়ে টেবিলের ওপর একটা কিল মারে।

'পরীক্ষার পর কোথায় যাবে ?'

সামঘিনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিভের ডগা দিয়ে ওষ্ঠ চেপে জবাব দেয় :

'যদি বলি, জেলা-এটর্নী হবার চেষ্টা করছি, খুব অবাক হবে, না ?'

ওর চোখের মণিতে প্রদীপের প্রতিফলিত ছায়াটা অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলছে। পাকানো গোঁফের ডগাগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে।

'অবাক হবার কি আছে ? আমি হবো উকীল, তুমি জেলা-এটর্নী।'

'আচ্ছা, ভাবো তো একবার, কোনো রাজনৈতিক মামলায় তুমি প্রতিবাদী আর আমি বাদীর দিকে।'

'রেয়াত তো নিশ্চয়ই করবে না একটুও।'

'না। কুচিন, না কিচিন—কি জানি! দুত্তোর ছাই!—বলে যে প্রতিবাদী যত বেশী চতুর হবে, তার অপরাধ তত বেশী গুরুতর। তুমি সত্যি খুব চালাক। না, না, সত্যি আমার মনের কথাই বলছি। ওই যে চুপটি ক'রে থাকো, ওই তো প্রমাণ।'

রেস্তরাঁ প্রায় খালি হয়ে এসেছে। যারা এখনও বসে আছে, তাদের দিকে অপ্রসন্ন এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে পরিবেশকরা। একজনকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রুমাল মুখে দিয়ে একটা হাই তুলল সে।

'উঠতে হয় এখন।' সামঘিন বলে।

রাস্তায় বেরিয়ে দু'জনই চুপচাপ যদিও সঙ্গীর আরো খানিকটা পাগলামো শোনার জন্য সামঘিন তৈরি হয়েই ছিল। তাকে নিরাশ না ক'রে খানিকক্ষণ পরে তাঘিলস্কি জিজ্ঞেস করল :

'তোমার মনে পড়ছে কে বলেছিল—নর্দমা পরিষ্কার করার লোক চাই রাশিয়ায় ?'

'তুমি।' সংক্ষেপে জবাব দেয় ক্লিম।

'না, আমি নই। লিওনতিয়েভ। তার কথা আমি পুনরাবৃত্তি করেছিলাম শুধু। না, ঠিক মনে পড়ছে না—হয় লিওনতিয়েভ নয় কাৎকভ।'

'ঠিক বলতে পারি না।'

খানিকটা গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে তাঘিলস্কি :

'যাবে নাকি এক জায়গায় ? বেশী দূর নয়, এই কাছেই। দুটি বোন থাকে। ভালো মক্কেল পেলে দিনরাত সব সময় ওদের দরজা খোলা।'

ক্লিম রাজী হলো না। তাঘিলস্কি তার কঠিন মুঠোর মধ্যে ক্লিমের হাতখানা তুলে নিয়ে কর-মর্দন ক'রে ওকে বিদায় দিল। তারপর নিজের কোটের কলারটা তুলে দিয়ে, টুপীটা টেনে নামিয়ে দিল চোখের ওপর। এবং মাতাল হয়েছে বলে সচেতন মাতালের মতো পা শক্ত ক'রে মোড় ঘুরে চলল। ওর অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে সামঘিন ভাবতে লাগল :

'ওঃ, নালা-সাফ-করনেওয়ালা এসেছেন! ভারী চালাক মনে করে নিজেকে। ভেড়া-কান্ত কোথাকার। টাকাতে-বুড়ীদের আদুরে নাড়ুগোপাল!'

মনের কথাকে কি রকম বাঁকিয়ে মুখে বলা যায়—সামঘিন ভাবে। ওর আবার দুঃখ হয় কেন আইন পড়তে গেল। সংখ্যাতাত্ত্বিক স্মলিন-এর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাঘিলস্কির লম্বা জিভটার কথা। আবার নিজের মনে বলে :

'চালিয়াতী! জেলা-এটর্ণী হবে না, ছাই হবে। ভীতু কোথাকার।'



সামঘিন স্থির করল পরীক্ষা পাশ করে বাড়ি যাবে দু'-তিন দিনের জন্য; তার পর ভল্‌গা ধরে একেবারে ককেশাস পর্যন্ত বেড়িয়ে আসবে। বাড়ি যাবার অবশ্য ইচ্ছে একটুও নেই—কেননা সেখানে লিদিয়া, মা, ভারাভ্‌কা, স্পিভাক্‌রা সবাই আছে। কিন্তু ওদের কাউকেই ভালো লাগে না, দরকারও নেই কাউকে। আরো আছে --আছে "আমাদের এলাকা" কাগজখানা, আর আছে সেই সঙ্গে ইনোকভ, দ্রোনভ। এদের সঙ্গে দেখা হবার প্রত্যাশায় মন তো আনন্দে নেচে উঠছে না। যাই হোক, ঘটনাচক্রে বাড়ি যাওয়া হলো না শেষ পর্যন্ত। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা শেষ, এমন সময়ে মা'র টেলিগ্রাম এলো—'তোমার বাবার ভয়ানক অসুখ, তুমি ভাইবর্গ যাও।'

বাবার কথা ভুলেই গিয়েছিল ওরা। সুতরাং তাঁর অসুখের সংবাদে উদ্বেগ ঘটল না এমন কিছু। তবে বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা আপাততঃ বন্ধ হওয়ায় ও অত্যন্ত খুশি হলো। বাড়তি জিনিসপত্র ভারভারার বাড়ি রেখে ও ফিনল্যাণ্ড রওনা হয়ে গেল।

ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছোট্ট শহর; প্রশস্ত পথ, কোলাহল নেই। শহরের বুক চিরে চলে গেছে তরুবীথিকা। একটা রেস্তরাঁর উল্টো দিকে একটা নিরেট চেহারার গ্র্যানাইটের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সামঘিন। রেস্তরাঁর বারান্দায় ফুলের হাট। তারি মধ্যে বাজছে ব্যাণ্ড। আওয়াজ দিতেই দরজা খুলে এসে দাঁড়াল অনুচ্চ-বক্ষ, দৃঢ়-গঠন, ধূসর-বেশা এক মহিলা। সামঘিন নিজের পরিচয় দিয়ে আসার উদ্দেশ্য জানালে ওকে একটা আধা-অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল সে। খোলা জানালার ধারে প্রশস্ত শয্যায় শুয়ে আছেন ইভান আকিমোভিচ্‌ সামঘিন। জানালার ধারে পর্দা ফেলা। রোগীর মুখ বিকৃত; ডান দিকটা ফোলা ফোলা, অবশ। জিভটা বেরিয়ে আছে; নীচের ওষ্ঠটা বসে গেছে; সোনা-বাঁধান দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। ঘরের এক কোণে এক পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো মার্কারীর একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি। রোগীর ডান চোখটা সেই দিকে স্থির হয়ে আছে। চোখটায় হাসির আভা—পাতাটা কাঁপছে, আর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে ক'দিনের অসংস্কৃত গাল বেয়ে। কি যেন বলতে চাইল বুঝি—গলা থেকে একটা জড়ান আওয়াজ বেরোল।

পিতার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে মাথা নীচু ক'রে চোখ ঢাকল ক্লিম। এ চেহারা দেখতে আর সে পারবে না। শিয়রের দিকে নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে একটি শ্যামলা মেয়ে—যেন গ্র্যানাইট খোদাই-করা মূর্তি। বিরক্তির সুরে কি যেন বলছিল ও। উচ্চারণ অতি বিকৃত, স্বরবর্ণগুলো উচ্চারণ করছিল দু'বার ক'রে।

'দুই-ই বা-আ-র স্ট্রোক্‌......এক এক বা-আ-র খুবই কম।'

মেয়েটির মুখখানা চওড়া, ওষ্ঠ বলতে গেলে নেই, থ্যাবড়া নাক। বাঁ চোখের নীচে গণ্ডাস্থির ওপরে মখমলের মতো একটা জড়ুল।

বাচ্চাদের আঙুল দিয়ে শিং দেখানোর মতো ক'রে হাতের দুই আঙুল উঁচিয়ে বলল :

'দুই-ই-টা বা-আ-চ্চা।'

'এই মেয়েটি কে?' ভাবছিল সামঘিন। প্রাণপণে ও রেস্তরাঁর বাজনা শোনার চেষ্টা করছিল যাতে বাবার গলার আওয়াজ কানে না আসে। কিন্তু বাজনা থেমে গিয়েছিল; আবার আরম্ভ হতেই ঘরে এসে ঢুকলেন আর এক মহিলা।

ছাই রঙের পোশাক, বয়েস অপেক্ষাকৃত কম, দেহখানি অতি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন গঠন; চোখে চশমা। ক্লিমের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে অতি শান্ত মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করেন :

'তুমি—দিমিত্রি নও, ক্লিম। না? বুঝেছি।'

ভালো লাগল ক্লিমের মেয়েটির মুখখানা—বিশেষ ক'রে প্রথমার কঠিন পাথুরে মূর্তির পাশে। হাতের তেলো দিয়ে মেয়েটি রোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল; রুমাল দিয়ে ভেজা চোখ আর গাল মুছিয়ে দিল। এর পরে আর কোন মুস্কিল রইল না ক্লিমের।'

ক্লিমকে তক্ষুণি মেয়েটি রোগীর ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে গেল। রোগীর প্রাণহীন মুখখানা দেখে বড় মুষড়ে পড়ছিল ক্লিম। রেস্তরাঁর বেহালায় ক্লেরিওনেট্-এ মন্থর লাস্যভরা ছন্দে বেজে চলছিল ওয়ল্স্। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠছিল—মৃত্যু-পথ-যাত্রীর গলার ঘর্ঘর।

খাবার ঘরটি হাল্কা কাঠের চৌখুপী করা। টেবিলের ওপর নিকেলের সামো-ভার থেকে উঠছে গুঞ্জন। স্ত্রীলোকটি বললে :

'আমার নাম আইনো—অর্থাৎ আন্না আলেক্সিয়েভনা। আর ও হলো,' রোগীর ঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে : 'আমার বোন ক্রিস্তিনা'।

সিগারেট ধরায় আইনো। দেশলাইয়ের কাঠিটা কিছুতেই নিভতে চায় না কয়েক বার ঝাঁকান সত্ত্বেও। ক্ষুদ্র শিখাটুকুর প্রতিবিম্ব ওর পাঁশনের কাঁচে জ্বলছে। হাতটা পুড়ে উঠতেই কাঠিটা ছাইদানে ফেলে দিয়ে আঙুলটা চুষতে লাগল ও।

'তা তুমি জানলে কি ক'রে? আমি দিমিত্রিকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম।'

ক্লিম বলল যে দিমিত্রি পুলিশের নজরবন্দী থাকায় তার পক্ষে আসা সম্ভব হয় নি। টেলিগ্রাম সে মা'র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

'আচ্ছা!' চা ঢালতে ঢালতে আইনো বলে : 'তাই, টেলিগ্রাম ও পায়ই নি। কেননা নজরবন্দী থাকার মেয়াদ এক মাসের ওপর হলো শেষ হয়েছে। এখন তো সে "মানবজাতির বিবরণ" নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চিঠি একখানা পেয়েছি। লিখেছে শিগ্গিরই আসছে।'

আইনোর গলার স্বর বলিষ্ঠ কিন্তু ব্যঞ্জনাহীন। ভাষায় ভুল অজস্র, কিন্তু তাতে ওর কথা বলায় কিছুমাত্র বাধা হয় না।

এক গেলাশ চা ক্লিমের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে ও বলে :

'তুমি দিমিত্রির জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। সম্পত্তি সম্বন্ধে কথা-বার্তা বলতে হবে তো!'

দিমিত্রি সম্বন্ধে খবর এ মেয়েটির কাছ থেকে পেল বলে অত্যন্ত সংকুচিত বোধ করছিল ক্লিম। ভদ্র অথচ স্পষ্ট ভাষায় ও তাকে জানিয়ে দেয় যে পিতার সম্পত্তিতে দাবী করার বাসনা ওর বিন্দুমাত্র নেই।

মৃদু হেসে ওর দিকে তাকায় আইনো। হাসতে গিয়ে ওর ওষ্ঠের প্রান্তে ওপরের দিকে টান পড়ে, মুখখানাকে হ্রস্ব দেখায়।

'সে হয় না।' আইনো বলে : 'ব্যাপারটা অপ্রীতিকর, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলাই দরকার। সংক্ষেপে বলছি। একখানা উইল আছে। প'ড়ে দেখতে পারো। এই বাড়ি এবং এখানকার যা কিছু সব আমাকে দিয়েছেন—কারণ সন্তান আছে দুটি। সামান্য কিছু দিয়েছেন দিমিত্রিকে। কিন্তু তোমাকে কিছুই দেন নি। খুবই অন্যায় হয়েছে। দিমিত্রি এলেই যা হোক একটা প্রতিবিধান করতে হবে।'

ক্লিম আবার বলল যে, ও কিছুই চায় না। আইনো হাসল। বলল : 'এখনও তো কাঁচা বয়েস কিনা, তাই টাকার দাম এখনও জানো না।'

একটি মুহূর্তের জন্য আইনোর মুখখানা যেন বড় স্নিগ্ধ সুন্দর হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই ওষ্ঠে পড়ল টান। সরু হয়ে এক লহমায় সরল রেখা হয়ে উঠল বাঁকা ওষ্ঠ দুটি। সূক্ষ্ম ভ্রূ-লতিকাতে দেখা দিল ভ্রূকুটি। সারা মুখে উচ্চার হয়ে উঠল একটা তীব্র প্রতিবাদ। বলল :

'তোমার বাবা ছিলেন একজন খাঁটি রাশিয়ান। একেবারে ছেলেমানুষের মতো।' ওর চোখ দুটি লাল হয়ে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কি শুনতে চেষ্টা করে ও। ব্যাণ্ডে একটা খুশির সুর বাজছে। তার ফিকে আওয়াজ আসছে ঘরের মধ্যে। আর কোন শব্দ নেই। বাড়িখানা নিঝুম নিস্তব্ধ—যেন শহর থেকে বহু দূরে।

আইনো ব'লে যায় বৃদ্ধ সামঘিনের কথা। বলার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালি না তুলে আস্তে আস্তে মাটিতে পা ঠোকে। কথার ভঙ্গি যেন কারো সঙ্গে তর্ক করছে।

'মনটা ভারী কোমল ছিল। সব কিছু জানতেন, জানতেন না শুধু নিজেকে। এইখানে বসতেন—ওইখানে বসতেন—' ঘরের নানা দিকে হাত দিয়ে দেখায় আইনো : 'কিন্তু থাকতেন না তো এখানে—কোন সময়েই না। একরকম লোক আছে, যারা বাড়িতে থাকতে জানে না। আমার মনে হয় রাশিয়ানরা ঐ রকমেরই। বুঝলে?'

মাথা নাড়ে সামঘিন। ভাবে, এমনভাবে কথা বলছে যেন মরেই গেছে বাবা।

স্বর আরো নামিয়ে বলে আইনো :

'প্রেফারেন্স খেলতেন—ওদিকে বলতেন খেলে খেলেই ইংরেজ জাতটা বোকা হয়ে গেল। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়তেন আর খেলায় হারতেন। এই হারার জন্যই খেলুড়েরা ওঁকে ভালবাসত। ভারী মজার মানুষ ছিলেন, সত্যি ভারী মজার!'

কটা চোখ দুটি আরও লাল হ'য়ে উঠল; কিন্তু ওর মুখে হাসি। ঝক্‌ঝকে সাদা ঘন-সন্নিবিষ্ট ছোট ছোট দাঁতগুলো দেখা যায় ওষ্ঠের ফাঁকে। ওকে দেখে মনে হয় ক্লিমের—দেহে, মুখায়বে ঠিক যেন ওর মা'র ত্রিশ বছর বয়সের চেহারা। হয়তো এ জন্যই বাবা একে ভালোবেসেছিলেন।

ভালো লাগছে ওকে সামঘিনেরও। কিন্তু সে ওই সাদৃশ্যের জন্য নয়। ভালো লাগছে ওর আশ্চর্য সংযমকে, ওর অনন্যসাধারণ আলাপনের বিশিষ্ট ভঙ্গিকে; ভালো লাগছে ওর সমস্ত পরিমণ্ডলকে—যে পরিমণ্ডল নিঃসন্দেহে এ মেয়েরই হাতের শিল্প-কারী। আসবাবপত্র নিতান্ত সাদা-সিধে, কিন্তু মজবুত; অথচ আশ্চর্য রুচির পরিচয় তাতে। রুচির পরিচয় প্রাচীরের বর্ণোজ্জ্বল পেইন্টিং-গুলিতে। সবকিছু আশ্চর্য পরিচ্ছন্ন, আশ্চর্য একটা আরামের আমেজ। এমনি সুন্দর করে এমনি সংযম দিয়েই বুঝি ওর পিতার মৃত্যুকেও গ্রহণ করবে এ মেয়ে। একটুও বাহুল্য মনে হলো না ক্লিমের। কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর মাথা নেড়ে ভারী বেদনা-জড়িত সুরে আইনো আবার বলল :

'শরীরটা ছিল তো খুব ভালোই, কিন্তু লাল মদ আর ঘি-মাখন বড় বেশী খেতেন। অন্যের ঘোড়ায় চড়লে চাষী যেমন বেপরোয়া হয়ে পড়ে, নিজের সম্বন্ধে উনিও ঠিক অমনি বেপরোয়া ছিলেন।'

আইনোর পাথুরে বোন ছিল ঘরের মধ্যে। এমন করতে লাগল যেন কোমর আর হাঁটু ওর ভেঙ্গে যাচ্ছে। দেহখানা দশা-সই হওয়া সত্ত্বেও ওর সমস্ত নড়াচড়ার ভঙ্গি অতি কুৎসিৎ রকম চোখা চোখা।

সামঘিন কোথায় উঠেছে জিজ্ঞেস করে আইনো। বলে :

'জিনিসপত্রগুলো আনতে পাঠাই।'

সামঘিনের আপত্তি এখানে এসে থাকার। অতি সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে বলল

আইনো :

'বাপ মৃত্যু-শয্যায়, ছেলে তার কাছে থাকবে না, এ লজ্জা আমি রাখব কোথায় ?'

মোটের উপর যতদূরে সম্ভব সহজ এবং আড়ম্বরহীনভাবেই সব কাজ চলতে লাগল। বাবা যে মৃত্যু-শয্যায় সে-কথা যেন ক্লিম বুঝতেই পারল না। পারলেও প্রায় ভুলে গেল। পরের দিন ভোর ছ'টায় চলে গেলেন ইভান সামঘিন। সম্ভবত এক আইনো ছাড়া কেউই জেগে ছিল না। আইনোই এসে সামঘিনের দরজায় ঘা দিয়ে অদ্ভুত একটা চাপা স্বরে চিৎকার করে উঠল :

'ইভান আর নেই—'

অতি শান্তভাবে মৃতের শেষ-কৃত্যের আয়োজন চলতে লাগল। রাশিয়ার মতো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আনুসঙ্গিক হট্টগোল-হল্লা নেই। দুই দিন লাগল সব ব্যবস্থা শেষ হতে। পিতার পরিচিত-মহলের সম্মুখীন হতে হলো ক্লিমকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। বড় বিব্রত বোধ হতে লাগল ওর। বিশেষভাবে বিরক্ত লাগল এক তরুণ যাজক যখন অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে মৃতের সম্বন্ধে কথা বলতে লাগল। লোকটার স্বর মৃদু হলেও তাতে ছিল এই মাত্র যে-মানুষটা অত্যন্ত প্রশংসাজনক কোন কাজ ক'রে এল —তার মত উল্লাস। যাজকটির মুখখানা দেখে ওর তাঘিলস্কির কথা মনে পড়ে গেল, এমন কি তাকে বেশ হাসি-খুশি সুখী মানুষ বলেই বোধ হলো। সহৃদয় মদৃ হাসিতে মুখখানা তার উদ্ভাসিত, উদাত্ত কণ্ঠে গাইল প্রার্থনার সঙ্গীত; প্রতিটি কথা অতি স্পষ্ট ক'রে উচ্চরণ করে পাঠ করল অন্ত্যেষ্টির মন্ত্র। সম্ভবত হয়তো পারলৌকিক ক্রিয়ায় পৌরোহিত্য করার সুযোগ তেমন ঘটে না, কাজেই যোগ্যতা প্রকাশের আজকের এই অবকাশ পেয়ে সে ধন্য।

কালো পোশাকে, ঋজু দেহে, মাথা উঁচু ক'রে আইনো শবানুগমনে চলেছে। স্থির মুখখানায় কিসের একটা প্রতিবাদ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। চোখ শুকনো। এমন কি শবাধার যখন ভূগর্ভে নামান হলো তখনও একটু ভিজল না। শুধু কাঁধ দুটি একবার একটু উঁচু ক'রে মাথা নীচু ক'রে রইল। অন্তর দিয়ে চায় ক্লিম আইনো ওর প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করুক। তাই ফেরার পথে জিজ্ঞেসই ক'রে ফেলল :

'ছেলেপুলেরা কোথায় ?'

'ওরা এখানে নেই। এখনও নেহাৎ শিশু তো! বাবার অমন অসুখ, ওদের মন খারাপ হতো। তা ছাড়া, মৃত্যু দেখাও ওদের পক্ষে ঠিক নয়। এজন্য কিছু দিন হলো আমার মা আর ভাই-এর কাছে ওদের রেখে এসেছি। আমার ভাই কৃষি-বিশেষজ্ঞ। ছেলেপুলে নেই। ওর বৌ বাচ্চা দুটোকে খুব ভালোবাসে। আবার হিংসাও করে। ভারী অদ্ভুত হিংসা।'

চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই যাবার জন্য তৈরি হলো ক্লিম। আশ্চর্য হয়ে গেল আইনো। কিছুতেই যেতে দিল না। বলল :

'সেকি ? কতদিন ভাই-এর সঙ্গে দেখা নেই। দেখতে একটু ইচ্ছেও করে না ? এ তো ভালো নয়। উইলের সম্বন্ধেও তো আলাপ করা দরকার।'

লজ্জিত হলো সামঘিন। বলল যে দাদার আসার আগে ফিনল্যাণ্ডটা খানিক ঘুরে দেখতে চায়।

'আচ্ছা! সুয়োমী দেখবে! বেশ তো! আমি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের ঠিকানা দিচ্ছি। যেখানে ইচ্ছে যাও, ঘুরে-ফিরে দেখে এসো।



সাইমা ক্যানাল ধরে সামঘিন কোটকায় গেল। কোটকা, হেলসিংফোরস ও আরো দেখা শেষ ক'রে মাসখানেক নানা জায়গায় খুব বেড়াল। চমৎকার দেশ; দেখেনি, ইস্কুলের ভূগোলে এবং অন্যান্য বইয়ে শুধু পড়েছে এর বিষয়। কোন্ একটা বইয়ে পড়া একটা লাইন ওর মনে পড়ে :

'একেবারে কেন্দ্রস্থলে এসেছি দেশটার। নিরানন্দ দেশ, এখানে আছে শুধু খানা-ডোবা-জলা-হ্রদ, প্রাণহীন বনভূমি, গ্র্যানাইট পাথর আর বালি। নিষ্করুণ প্রকৃতির কঠোর পোষ্য-পুত্রদের রাজ্য।'

আপাত-সত্য এর মধ্যে আছে কিছু কিছু। কিন্তু ক্লিম দেখল এখানে জলা, জঙ্গল, আর গ্র্যানাইট পাথরের আবেষ্টনে আছে পরিচ্ছন্ন শ্রী-সম্পন্ন ছোট ছোট শহর, যা নেই রাশিয়ায়। আছে সুন্দর সুন্দর স্কুল; বনান্তে চরে বেড়ায় হৃষ্টপুষ্ট গৃহ-পালিত পশু; প্রতিটি জমি সযত্নে চাষ করা, বেড়া দিয়ে ঘেরা। কঠোর অধ্যবসায়ে সর্বত্র চলছে ফিনদের জলা আর পাথরের বিরুদ্ধে বিজয়াভিযান।

ওকে দেখলেই তারা মর্যাদার সঙ্গে ডেকে অভ্যর্থনা জানায় : 'হুভা পেইভা!'

যেখানে পেরেছে, এবং যেখানে ইচ্ছে গিয়ে ঘর বেঁধেছে ফিন্‌রা। দেখে বড় ভালো লাগে ক্লিমের। প্রতিটি গৃহ যেন গৃহীর স্বহস্ত-রচিত আপন স্মৃতি-সৌধ। উমাল আর উক্কু প্রদেশের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে আছে এক গম্ভীর প্রশান্তি—গরুর গলার ঘণ্টার বিষাদ-ভরা শিঞ্জিতে সে-গাম্ভীর্য ঘনতর হয়ে ওঠে। রাশিয়ার অবসাদিত শূন্য মাঠ-প্রান্তরের প্রশান্তি এ নয়—এ প্রশান্তি এক বলিষ্ঠ সংযত-বাক্ মানবগোষ্ঠির স্বকীয় ধারায় জীবনযাত্রা নির্বাহের স্বাধিকারে গভীর আত্ম-চেতনারই ব্যঞ্জনা।

সামঘিন-এর মনে পড়ে ও যখন ছোট ছিল, ওর মা ওকে "কলেবালা" বইখানি উপহার দিয়েছিলেন। পড়েছিল ও। বইখানি কবিতায় লেখা ছিল—একটুও ভালো লাগত না পড়তে, মনেও থাকত না। কিন্তু মা'র জোরে শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়েছিল। আজ ওর জীবনের সমস্ত বিশৃংখলা ভেদ ক'রে সেই মহাকাব্য থেকে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে লাগল সুয়োমীর সংগ্রামী বীরদের মহা-চরিত্র—যারা প্রকৃতির ভৌতিক শক্তি হিয়াইসি (Hiisi) আর লুহির (Louhi) বিরুদ্ধে অনলস সংগ্রাম করেছিল; মনে পড়ে সুয়োমীর অরফিয়ুস-ইলমাতরি-এর পুত্র ভাইনা-মইনেন্-এর কথা—যাকে তার মা সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন; মনে পড়ে ফিন্‌দের বালপুরু লাম্মিকাইনেন্ আর ইলমারাইনেন্-এর কথা। ইলমা-রাইনেন্ সাম্পোকে বন্দী করেছিল—দেশের ঐশ্বর্য-কল্প সাম্পো।

সামঘিন ভাবে : এখানকার মানুষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকার অর্জন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কি প্রশংসাই না করা হয় রাশিয়ার কৃষকদের যারা এখানকার মাটির আদিম বন্ধ্যাত্বের চেয়ে অনেক বেশী দাক্ষিণ্যময়ী ধরণীর বুকে বাস করেও একটু ভালোভাবে থাকতে শেখেনি। রাগে ওর গা জ্বলে যায়।

আইনোর দু'-চারজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি-ঘর দেখে ও উপলব্ধি করল এরা বাঁচতে জানে, জীবন-শৈলী জানে। সাজান-গোছান, ঝক্‌ঝকে তকতকে বাড়ি-গুলি। আইনোর বন্ধুরাও অত্যন্ত ভদ্র অতিথিবৎসল ঋজু স্বভাবের মানুষ—রাশিয়ান শিল্প ও জীবন-শৈলীর সাথে ওদের আছে নিবিড় পরিচয়; নেই পৃথিবীর সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি তা নিয়ে রাশিয়ানদের মতো তার্কিক স্বভাব; নিজেদের দেশ

তাদের কাছে প্রিয় কবির লেখা কাব্যের মতো।

জ্যোৎস্নাময়ী উষ্ণ রাত্রির আশ্চর্য সেই শিলায়িত স্তব্ধতা। আশ্চর্য নিবিড়, আশ্চর্য কোমল তার ছায়ার দল। বাতাসে অনাস্বাদিত-পূর্ব কত নব-সৌগন্ধ। ক্লিমের মনে হয় সব মিলে-মিশে গলে এক হয়ে গেছে—এ যেন স্বাস্থ্য-সুভগা নারীর স্বেদ-সরস অঙ্গ-সুরভি। ক্লিমের চিত্তের তন্ত্রীগুলোকে কে যেন সুরে বেঁধে তাল তুলেছে। মানসলোকে থৈ-থৈ বিপুল এক মধু-স্যন্দী শূন্যতা। অচেনা এই শূন্যতার পাথারে ডুব দিয়ে বসে আছে ক্লিম। চিন্তার দল কখন যে ডানা মেলে উধাও হয়েছে তা টেরও পায়নি ও।

নতুন অনুভূতি, চিত্তলোকে অজস্র রূপছায়ার সম্ভার নিয়ে ভাইবোর্গে ফিরল সামঘিন। নতুন সঞ্চয়ের বিপুলভারে ঈষৎ যেন ক্লান্ত। দপ্তরের একঘেয়ে কাজে অনিচ্ছায় যেন ফিরে এল কোন অফিসার। ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ আসন্ন, কিন্তু ওর তেমন আগ্রহ নেই। বরঞ্চ শঙ্কিত হয়ে উঠল—দাদার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যেতে হবে—রাজনীতি, নির্বাসিতদের জীবনের করুণ কাহিনী, বাবার কথা নিয়ে। কিন্তু বাবার কথা আইনোর চাইতে বেশী জানে না দিমিত্রি।

॥ ৯ ॥

ক্লিমকে দেখে আনন্দ হলো দিমিত্রির। সে-আনন্দ শান্ত সংযত কিন্তু তার প্রকাশের ভঙ্গি মোটা এবং অস্বচ্ছন্দ। ওর লোহার মতো আঙ্গুলগুলো দিয়ে ক্লিমের কাঁধ চেপে ধরে খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে, চোখ মিটমিট করে, হেসে, প্রসন্ন স্বরে বলল :

'খাসা হয়েছিস রে বড় হয়ে। করবো নাকি একটা কোলাকুলি!'

ওর গায়ে উজ্জ্বল রঙের একটা ছিটের সার্ট আর কোঁচকান রঙ-জ্বলা একটা জ্যাকেট। পায়ে গাঁয়ের গৃহিণীদের মতো জুতো। পোশাক দেখে অবস্থার স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। চাষীদের ধরনে বৃত্ত ক'রে চুল ছাঁটা। নাক থেকে মাছের আঁশের মতো চামড়া উঠছে। রোদ-জল-ঝড়ের মার-খাওয়া মুখখানায় বিশাল এক গোছা মিশ-কালো দাড়ি। দুই চোখে কিসের যেন মত্ততা—অপরাধ বোধের জ্বালা।

'এসেছি আজ ছয় দিন,' ও বলে। স্বর অতি মৃদু যেন বাড়ীখানার নীরব প্রশান্তির সঙ্গে সঙ্গতি রাখে। 'কর্তাদের কৃপায় ঘোরা গেল বেশ। প্রায় শ'পাঁচেক ভার্স্ট্। তারও বেশী স্রেফ হণ্টন। আঃ কি গান যে শুনলাম! আর এর মধ্যে বাবা—' কানের পিঠ চুলকে আইনোর দিকে তাকিয়ে বলে : 'এই এত হুট্ ক'রে যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবে তা ভাবতেই পারিনি।'

ক্লিমের বুঝতে বাকী রইল না যে এরই মধ্যে আইনোর সঙ্গে দিমিত্রির যথেষ্ট ভাব হয়ে গিয়েছে। ওর মনে হয় আইনোর চোখ দুটি তারই সিগারেট্-এর ধোঁয়ার কুহেলির মধ্য দিয়ে খুঁজে নিয়েছে দিমিত্রিকে এবং প্লেটোনিক আনন্দ দুলছে সেই চোখের তারায়। দীপ্তিমান তরুণদের জন্য একটি প্লেটোনিক আনন্দই বুঝি কখনও কখনও নারীর চোখে দেখা যায়।

দিমিত্রি উঠে বাইরে গেল একটু। আইনো বলল :

'তোমার বাবার সঙ্গে তোমার চাইতে তোমার দাদার সাদৃশ্য বেশী মনে হচ্ছে।'

দিমিত্রি একটা রুপোর নস্যি-দান হাতে নিয়ে ফিরে এসে ক্লিমকে বলল :

'এই নে, এটা তোর জন্য এনেছি। সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথার সময় উস্তগে তৈরি হয়েছিল এটা। বেশ কাজটি, না? এই শিল্পের ওপর কিছু লিখবার মাল-মশলা সংগ্রহ করে এনেছিলাম। এলেক্সী মিখাইলোভিচের সময়কার একটা পানপাত্র আইনোকে দিলাম।'

পানপাত্রটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দিমিত্রি। ক্লিম জিজ্ঞেস করে :

'খুব একঘেয়ে জায়গা, না?'

'দূর, কে বলল! একটুও না। ভারী চমৎকার জায়গা। দিন-রাত বেশ মেতে থাকা যায়।'

ঠিক আগের মতোই সরল আছে দাদা। বরঞ্চ আরও বেশী প্রাণখোলা হয়েছে। তার ভেতরে-বাইরে পড়েছে কৃত্রিমতাবিহীন গ্রামের মাটির ছাপ। ক্লিম ভাবে পারি-পার্শ্বিকের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে দাদা। এ ক্ষমতা ওর চারিত্রিক নমনীয়তারই সাক্ষ্য।

সমুদ্রোপকূলে যারা বাস করে তাদের জীবনধারার কথা, মাছ ধরার কথা সব গল্প করছিল দিমিত্রি। শুনতে শুনতে ক্লিম ভাবে, দিমিত্রির মতো মানুষদের কাছে জীবন কত সহজ। আত্মকাহিনী বলতে বলতে বগী-গাড়ির চালকের পরিতৃপ্তি দিয়ে স্মিতমুখে চায়ের গেলাসে একটু একটু ক'রে চুমুক দেয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে সর্বত্র সর্বোচ্চ মাত্রার বিশেষণ দিয়ে বলে—সব চেয়ে দুর্ধর্ষ জাত! সবচেয়ে অদ্ভুত। ইত্যাদি।

'এবার বাড়ি যাচ্ছ তো?'

'বাড়ি? দূর্!' চোখ নীচু ক'রে হাতের পিঠ দিয়ে ভেজা গোঁফ মুছতে মুছতে দৃঢ় স্বরে বলে দিমিত্রি। গোঁফের ডগা মুখের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় ওর মুখের ভালোমানুষী ভাবটা নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

'তুই তো জানিস,' দিমিত্রি বলে: 'ভারাভকাকে আমার বিশেষ ভালো লাগে না। আর তা ছাড়া কি বিশ্রী কাগজ "আমাদের এলাকা!" কি না আছে ওটার মধ্যে! আশ্চর্য ক্ষমতা ভদ্রলোকের। ঘর-বাড়ি, জঙ্গল, মানুষ—যাই হোক না কেন—তাই নিয়ে ঝুরি ঝুরি লিখবে। প্রতিভা আছে!'

অচেনা লোকের সামনে দিমিত্রির এই ধরনের কথা ক্লিমের ভালো লাগে না। কিন্তু দিমিত্রির সে-সব খেয়াল নেই।

'আমি পাশ্কভ-এ থাকব। রাজধানী, বিশ্ববিদ্যালয়, এসব জায়গায় আমার যাওয়া নিষেধ। সেইজন্য হেমন্তকাল পর্যন্ত ওই পাশ্কভ-এই থাকতে হবে। তারপর পলতাভায় যাবার জন্য একবার অনুমতির চেষ্টা করব। এখানে চোদ্দ দিন থাকবার অনুমতি পেয়েছি বটে—কিন্তু কি বিশ্রী! রোজ থানায় গিয়ে হাজিরা দাও। তা, তোর খবর কি-রে? আমার মনে আছে, মার্ক্সবাদ তোর পছন্দ ছিল না।'

ক্লিম মৃদু হেসে মনে মনে ভাবে: 'এইবার আসল কথা!' তমিলিন মাস্টারকে মনে পড়ে ওর। বিজ্ঞের মতো জবাব দেয়:

'একটা জিনিস আগে থেকেই যদি মেনে নি, তবে কি আর তা ভালো ক'রে বোঝা যায়? মনে সন্দেহ থাকলেই না বোঝার চেষ্টা হয়।'

মাথা নেড়ে আইনো সমর্থন করে: 'আমিও তাই বলি।'

দিমিত্রি আইনোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ক্লিমের দিকে তাকায়। হঠাৎ ওর মুখখানা অত্যধিক চওড়া দেখায়; সম্ভবতঃ দাঁত চেপে ছিল। গন্ডাস্থির কাছে দাড়ি যেন অতিরিক্ত বেড়ে গেছে মনে হলো। কাঁধের ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে গালে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতে লাগল দিমিত্রি:

'ওখানে সব কিছু নিয়ে বড় ভাবতে হয়। মানুষ সেখানে খুব কমই। প্রকৃতিরই রাজ্য। কি কঠোর দেশ! শুধু ধু ধু শূন্যতা। চারদিকে শুধু শূন্য—অহর্নিশি যেন হেঁকে চলেছে—আমায় পূর্ণ করো। আমায় যখন ওখান থেকে মেজেন-এ পাঠিয়ে দিল—'

'কেন?'

'কে জানে? ওরা ভেবেছিল আমি উস্তাগ্ থেকে পালাবার মতলব করেছি। যাই হোক, আবার তেরোটি মাস পরে আমায় উস্তাগ্-এই ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমার কোন অভিযোগ নেই। অনেকগুলো ভালো ভালো শহর দেখে নিয়েছি।'

হেসে ওঠে ও। মুখে হাত বুলিয়ে দাড়িতে বিলি কাটতে থাকে।

'হাঁ, তারপর ছিলাম তো মেজেন-এ। জায়গাটা একটা গ্রাম। হাজার দুই লোকের বাস। সমুদ্রটা ঠিক যেন মহাসর্প মিড্গার্ডের মতো ঐ জায়গাকে নিজের দেহ দিয়ে জড়িয়ে সমস্ত বিশ্ব থেকে আড়াল ক'রে রেখেছে। ওটার নাম নাকি শ্বেত-সমুদ্র।

ঠিক হয়নি নামটা। রঙটা তো সাদা নয়, টিনের মতো। আর স্বভাব-চরিত্রও ভালো নয়। সমস্তক্ষণ চিৎকার আর গর্জন। বিশেষ ক'রে রাত্তির বেলা। রাতগুলোরও যেন আর শেষ নেই। চলছে তো চলছেই—যেন অনাদি অনন্ত কাল। আর কতই বা তার খেয়ালের খেলা। এই "অরোরা বোরিএলিস্"-এর কথাই ধরো না। সেই প্রথমবার দেখলাম—কি দেখলাম জানো? আগুনের সেই যাকে বলে প্রমত্ত-ডম্বর। এর চেয়ে বড় তাণ্ডব বুঝি হয় না। দেখলাম—লাখো রামধনুর ইন্দ্রজাল যেন স্তব্ধ হয়ে আছে—একেবারে নিথর নিশ্চল। বলতে আমার লজ্জা নেই—ভয় পেয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ আমার কোন চিন্তা শক্তি ছিল না। মন বলে যেন কোন পদার্থই রইল না। ঠিক যেন একটা সাবানের বুদ্বুদের মতো হয়ে গেলাম, ভেতরটা একদম ফাঁকা আর ওপরটায় প্রতিফলিত সেই হিমবহ্নির লীলা। কত অসংখ্য জগত সেই আগুনে জ্বলে পুড়ে গেল। আমি শুধু রইলাম সেই সর্বনাশের এক শূন্য রিক্ত দর্শক হয়ে।

যেন দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেছে—এমনিভাবে ঘন ঘন পলক ফেলে দিমিত্রি। হাত দিয়ে ঘসে কপালের বলিরেখাগুলি যেন মসৃণ করে দিতে চায়। হঠাৎ ক্লিমের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে :

'গোঁড়া মতবাদ থাকাই ভালো, কি বলিস।'

'কেন বলতো?' জিজ্ঞেস করে ক্লিম।

'মানুষ যেন চায় নিজেকে ডুবিয়ে মিশিয়ে দিতে, চায় পরমোৎকর্ষের মধ্যে সমাহিত হতে—'

'ও তো ধর্মশাস্ত্রের কথা হলো, দাদা।'

'তা হবে।' সায় দেয় দিমিত্রি। কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা ক'রে বলে : 'আমাদের 'কনস্টিট্যুশনাল ল'-র মধ্যেও এই একই তত্ত্ব।'

আইনোকে আর একটু চা ঢেলে দিতে বলে ও উচ্ছ্বসিত হয়ে আবার বলতে আরম্ভ করে :

'থাকতাম একজন জেলের বাড়িতে। সেই জেলে একদিন আমায় বললে : দেখ দিমিত্রি ইভানিচ, তুমি প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছ যে মানুষের জীবনযাত্রা আরো ভালো, আরো সহজ হওয়া উচিত। কিন্তু দুনিয়া তার বিরুদ্ধে। আমিও অবশ্য তাই। কারণ কি জান? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যারা বেশ ভালো ভাবে থাকে তারা যাদের জীবন খুবই কষ্টের তাদের চাইতে অনেক খারাপ। সোজা কথা তোমায় বলছি, আমার জন-মজুরেরা আমার চাইতে মানুষ হিসেবে অনেক ভালো। কিন্তু তাই বলে কি আমার জালখানি তাদের হাতে আমি তুলে দেব? উঁহু, কখনই তা দেব না। আর ভগবান যদি না করেন, আমিই কি কখনও জন-মজুরের কাজ করব? সত্যি কথাই বলব, আমার লোকগুলো আমার চাইতে সত্যিই ভালো। কিন্তু আমি তো মালিক; মালিকের যা দস্তুর আমি তো তাদের সঙ্গে খুব একটা ভালো ব্যবহার করি না। মালিকের গদিতে ওদের একবার বসিয়ে দাও দিখিনি—দেখবে, ওই আমি যা করছি ওরাও ঠিক তাই করবে। এই তো হচ্ছে গেরো।'

দিমিত্রি একটু কুণ্ঠিত ভাবেই আরম্ভ করেছিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত না যেতেই যেন পালে হাওয়া লাগল; ওর কথার গতি বেড়ে গেল। কোথাও টেনে টেনে, কোথাও জোর দিয়ে, হাতের আস্ফালনে বাতাসকে যেন চিরে চিরে অত্যন্ত দ্রুতবেগে কথা ব'লে যেতে লাগল। ক্লিমের মনে হ'লো এ যেন কারো কথার প্রতিধ্বনি। কিন্তু অনুকরণ তেমন সফল হয়নি।

'কোন গুণ নেই মানুষটার।' মনে মনে ভাবে ও।

দিমিত্রি থামে। কিন্তু ওর মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখে ক্লিম বাধ্য হয় বলতে :

'মনে হচ্ছে তোমরা যে যাই বল, ও লোকটার কিছুই হয়নি।'

'খুব খারাপ লোক।' আইনো দৃঢ়ভাবে বলে।

'খারাপ?' আইনোর দিকে তাকিয়ে দিমিত্রি বলে।

'নিশ্চয়ই! খারাপ নয় তো কি। ও ছাড়া আর কি বলা যায় জানি না।'

দিমিত্রি ভ্রূ কুঁচকে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে বলে:

'কিছুর যেন একটা অভাব আছে। কিন্তু কি তা জানি না।'

তারপর ভাইকে সম্বোধন ক'রে বলে যায়:

'আমি ওখানকার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিন্তু ওরা কিছুই বুঝতে পারে না। অথবা হয়তো বুঝেছে কিন্তু গ্রহণ করতে চায়নি। প্রচারের কাজে আমি মোটেই দক্ষ নই। ভালো ক'রে বোঝাতেই পারি না মানুষকে। ওখানে প্রত্যেকটি মানুষ এক-একটি আলাদা ব্যক্তিত্ব। তাদের নাড়াবে কার সাধ্য? একজন তো একদিন বলেই বসল: 'আমি কেন লোকের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাব? তারা আমার কথা ভাবে?' আরেক জন বলল: 'আজ আছি, কালই হয়তো যাব সমুদ্রের পেটে। আর আপনি বসে বসে আমার জন্য দশ বছরের হিসেব ছকছেন! এই তো সব!'

ক্লিমের মনে হয় ওর দাদা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ও অবশ্যি খুশি। খুশি এইজন্য যে, যে-সব মোটা মোটা জ্ঞানগর্ভ বইগুলো ওর দাদা পড়ে মুখস্থ করেছে, তার চাইতে সহজ-সরল জীবন যে অনেক বেশী শক্তি ধরে, তা আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল।

সিগারেটে টান দিয়ে আয়েস ক'রে বসে আইনো বেশ একটু জোরেই বলে:

'অত্যন্ত সুচিন্তিত কথা। জোরাল মনের কথা। জোরাল লোক আমি পছন্দ করি। যারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না, তারা তো মরবেই। গাছের যে সব ফালতু ফেকড়ী বেরয়—তাদের যে দশা হয়। যারা নিজেরা হাত-পা নেড়ে খুটে খেতে জানে তারাই বেঁচে থাকে এবং ভালো ভাবেই থাকে। ভালো ভাবে কাজকর্ম করে। আসলে উচিত হচ্ছে খুব ক'রে খাট, আর হাতে দু'কড়ি রাখ। তাহলেই তো হলো। কারো অভাব থাকবে না। আমাদের জীবনটা কি রকম জানো? ঠিক যেন সম্পূর্ণ একটা অজানা দেশের অভিযাত্রায় চলেছি সব যেখানে কোন মানুষের পা পড়েনি কোনদিন। এখন দুর্বল লোকদের নিয়ে ভারী মুশকিল হয়। পায়ে পায়ে বাধা তাদের নিয়ে। এবং বেশ চড়া মূল্যও দিতে হয় তাদের জন্য আমাদের। তারপর ধরো, কারো যদি দু'রকম মত থাকে; দুটোই তো আর চলে না। একটা—কাজেই ফালতু এবং অনিষ্টকর। রাশিয়ানদের গোটা দশেক ক'রে মত থাকে। ফলে কোনটাই তেমন জোরদার নয়। ওদের মাথাগুলি যেন এক একটা মুরগীর খোঁয়াড়।'

শান্তভাবে হাসে আইনো। একটা হাই তুলে বলে:

'উঠি, শুইগে যাই।'

ক্লিমও একটু একলা থাকতে চায়। দাদার কথাগুলো একটু ভাববে। ক্লান্ত লাগছে বলে সেও উঠে পড়ল। কিন্তু ঘরে এসে বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

সকালবেলা কফি খেতে খেতে দিমিত্রিকে জিজ্ঞেস করল ও:

'কুতুজভ ধরা পড়েছে, জানো?'

'সে কি? আবার? কবে?' আতঙ্কিত স্বরে বলে ওঠে দিমিত্রি।

'তারপর ক্লিমের কাছ থেকে সমস্ত খবর শুনে এক গাল হেসে বলল: 'ও তো নজরবন্দী হয়ে নিজ্‌নী-নভগোরদে-এ আছে। বরাবর তো চিঠি-পত্র লিখছি। আশ্চর্য

মানুষ এই স্তেপান।' রুটির ওপর মাখন লাগাতে লাগাতে ধীরে ধীরে বলে ও। একটু থামে; আবার বলে :

'কাল রাতে আইনো বেশ বলল কথাগুলো। বলল—'

'তা ওর নিজের দেশের যেমন আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, তেমনিই বলেছে।' মন্তব্য করে ক্লিম।

'বেশ চমৎকার কিন্তু মহিলা।'

'মারিনার কথা জানো কিছু?'

'কিছ্ছু জানি না।' নির্লিপ্তভাবে জবাব দেয় দিমিত্র : 'প্রথমে কিছুদিন চিঠি-পত্র চলেছিল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল। কি রকম বড্ড ভগবান ভগবান করতে আরম্ভ করল একেবারে ঠিক যেন পুঁথি-পড়া মন্ত্রের মতো ক'রে। ওখানকার লোকেরাও অবশ্য ভগবান ভগবান করে; কিন্তু কি করি বল, কানে তো আর ছিপি এঁটে রাখা যায় না!'

হাসতে হাসতে দাড়ি ঝেড়ে রুটির গুঁড়ো পরিষ্কার করতে থাকে।

'জানিস, একটা বিয়ে প্রায় ক'রে ফেলেছিলাম আর কি ওখানে!'

'পাত্রীটি কি তোমারই মতো বনবাস দেওয়া কেউ?'

'আরে না, না। ওখানকারই এক জেলের মেয়ে। কাল রাতে যার কথা বলছিলাম তারই মেয়ে। গোটা পরিবারটাই অমন জবরদস্ত, তিন ভাই, দু' বোন ওরা।'

ওর মুখটা গম্ভীর থম্‌থমে হয়ে ওঠে। দাড়ি টানতে টানতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে :

'ও সব জায়গায় গেলে কি হয় জানিস্! সমস্ত সত্তা যেন একেবারে রুখে ওঠে—সমুদ্র...তুন্দ্রা...সমস্ত কিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়বার জন্য যেন মন খেপে ওঠে। নারী-সঙ্গের আকর্ষণ দুর্বার হয়ে ওঠে। ও-দেশের মেয়েরাও আশ্চর্য...'

*

হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে ক্লিমকে বলল আইনো :

'তোমার সঙ্গে কে যেন দেখা করতে এসেছে। নিয়ে আসব এখানে?'

'আমার সঙ্গে?' অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায় ক্লিম।

'তোমার সঙ্গেই।' দু'বার মাথা ঝাঁকিয়ে ব'লে চলে গেল আইনো। পরক্ষণেই আবার এল অত্যন্ত ঢ্যাঙ্গা, রুক্ষ চেহারার অপরিচিত একজন লোককে নিয়ে। ঘরখানাকে বিরস মুখে নিরীক্ষণ করতে করতে লোকটা পুলিশী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল :

'আপনি ক্লিম সামঘিন?'

তারপর দিমিত্রিকে আপাদমস্তক দেখে বলল :

'এ কে?'

'দিমিত্রি সামঘিন, আমার ভাই।'

'বেশ, বেশ!' আগন্তুক খুশি হয়ে দোমড়ান মোচকান পুটলী-পাকান একটা কাগজ ক্লিমের দিকে এগিয়ে দিল।

'সমভা দিয়েছে। সাবধানে খুলবেন, খুব পাতলা কাগজ।'

বেশ সহজভাবে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বসল আগন্তুক। ক্লিম কাগজটা

শুনতে শুনতে শুনতে শুনতে গেল সে জিজ্ঞেস করছে :

'কবে ছাড়া পেলেন অন্তরীণ থেকে?'

চিঠিটা পড়তে লাগল ক্লিম :

'পত্রবাহক আমাদের শহরেরই লোক—নাম প্রাতন দলগানভ। ও তোমার কাছে যা দেবে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসো—লু।'

চিঠিটা আবার দোমড়াতে লাগল ক্লিম—ওর ইচ্ছে হতে লাগল মেয়েটাকে মুখের ওপর শুনিয়ে দেয় তাকে ও কি ভাবে। আশ্চর্য! দুর্বিনীত মেয়েটা একেবারে ওর যেন পেছনে লেগে রয়েছে। ওকে তার ফাঁদে ফেলে, তথাকথিত 'কাজের মধ্যে জড়াবার জন্যে যেন হন্যে হয়ে উঠেছে। আগন্তুকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ক্লিম। লেখক কাতিন-এর কাছে আসত কে একজন তার কথা মনে পড়ে এই লোকটাকে দেখে। একে দেখলে মনে হয়, এ যেন 'বিস্মৃতির অন্ধকার' ফুঁড়ে এই মাত্র বেরিয়ে এল।

আইনোর দিকে তাকাতে সাহস হয় না ক্লিমের, কি জানি হয়তো অসন্তুষ্ট হয়েছে আইনো। সাইড্-বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে তৃতীয় দফা কফি ঢালছিল, দিমিত্রিকে কফি দিয়ে দিয়ে যেন কুল পাচ্ছিল না।

'আপনি কফি খান তো?' প্রসন্নভাবে দল্‌গানভ্‌কে জিজ্ঞেস করে আইনো।

'নিশ্চয়ই।' জবাব দিয়ে দল্‌গানভ্‌ তার লম্বা পা দুটোকে একসঙ্গে ক'রে সামনের দিকে ছড়িয়ে দেয় আইনোর টেবিলে আসার পথটা একেবারে জুড়ে। ক্লিম সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কি জানি কি অভদ্রতা ক'রে ফেলে লোকটা। কিন্তু আইনো স্কার্ট একটু তুলে অবলীলায় ওর পা ডিঙিয়ে চলে এল—বোঝা গেল ইচ্ছে করেই। দল্‌গানভ্‌ খুশি হয়ে বলল :

'বেশ বেশ। বুদ্ধি আছে দেখছি। সাংঘাতিক ক্লান্ত লাগছে। ইচ্ছে করছে টেবিলের তলাতেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। অসভ্যতা মাপ করবেন।

'খবরদার! সত্যি সত্যি আবার যেন তাই ক'রে বসবেন না।'

যেন শিশুকে বলছে এমনি মিঠে ভর্ৎসনার সুরে বলল আইনো।

'ফিনিশ?' আইনোকে আপাদ-মস্তক পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করে দল্‌গানভ্‌। আইনো সহৃদয়ভাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

'দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' দল্‌গানভ্‌ বলে।

কথার মাঝখানেই ক্লিম দল্‌গানভ্‌-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে :

'চিঠিতে কি লেখা আছে আপনি জানেন?'

'জানব না কেন?' আপনি ওকে লিখে দেবেন আমার আসতে দেরী হয়েছে। অবশ্যি এত দিনে ও জেনেই গেছে।'

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে বারে বারে মুখ পুড়িয়ে ফেলে দল্‌গানভ্‌। কফি শেষ করে পেয়ালাটা আইনোর দিকে এগিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল দল্‌গানভ্‌—যেন রণ-পাওয়ালা বামন-বীর। ক্লিম ভাবল যাবার জন্যই উঠে দাঁড়িয়েছে সে। কিন্তু তা নয়, লোকটা দেয়ালের কাছে গিয়ে দেয়ালের কাঠের ফ্রেমে টোকা মেরে বলে :

'বেশ বুদ্ধির কাজ হয়েছে। কি কাঠ?'

'মেপ্‌ল্‌।' দিমিত্রি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়।

'না, না, মেপ্‌ল্‌ নয়।' আইনো বলে।

'ও একই কথা হলো।' হাত নেড়ে দল্‌গানভ্‌ বলে। ফ্রক-কোট-এর ঘেরটা ছড়িয়ে আবার বসে পড়ে পা চাপড়াতে থাকে। আইনো হাসতে হাসতে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলে :

'একই কথা যদি হয় তা হ'লে জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

ওর দিকে তাকিয়ে দল্‌গানভ্‌ প্রথমে মৃদু হাসে, পরক্ষণেই উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। শরীরটা হাসির বেগে চেয়ারের মধ্যে যেন আছড়াতে থাকে। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দিমিত্রিকে বলে :

'ভারী মজার মেয়ে তো!'

তারপর দুই হাতে নিজের পাছা চেপে ধরে আইনোকে বলে :

''সত্যি বোকার মতো কথা বলেছি। তা ওরকম কত বোকার মতো কথা কত জনে বলে। আপনিও বলেন।'

আইনোর যেন আরো মজা লাগে। কিন্তু আইনোকে ছেড়ে এবার দিমিত্রির দিকে ফেরে দল্‌গানভ্‌। যেন বহু দিনের পুরোনো বন্ধুর দেখা পেল এমনি স্নিগ্ধ আনন্দে ওর চোখ দুটি ভরে উঠল। খানিকক্ষণ দিমিত্রির দিকে তাকিয়ে থেকে ও বলে :

'রাতে বড্ড কষ্ট পাই ভাই। কি ব্যথা দুই পায়ে! এগারোটি মাস জেলে ছিলাম। কেন যে, তা জানি না। ভারী স্যাঁৎসেঁতে ছিল জায়গাটা। সে কি অবস্থা!'

আবহাওয়াটা হাল্কা হয়ে গেলেও ক্লিমের ভয় গেল না, কখন কি বেয়াদপী ক'রে বসে লোকটা কে জানে। প্রথম থেকেই ওকে ভালো লাগেনি ক্লিমের। হয়তো অভদ্র করার উদ্দেশ্যে পাছার নীচে হাত দেয়নি দল্‌গানভ্‌, তবু চটে গেল ও। অনেক রকমের বিচিত্র লোক দেখেছে ক্লিম। এবং জানে তাদের অদ্ভুত আচরণের মূল উদ্দেশ্য হয় অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মৌলিক হবার অপচেষ্টা। শুধু আচরণেই নয়, দল্‌গানভের বেসবাসও সৃষ্টিছাড়া। সংকীর্ণ কাঁধ দুটির উপর অতি পুরোনো দোমড়ান একটা ফ্রক-কোটের আবরণ; তার নীচে চাষীরা যে রকম পরে সে-রকম একটা নীল রঙের সার্ট। লম্বা ঠ্যাং দুটি ছাই রঙের অতি-কড়া কাপড়ের নতুন পাৎলুনে ঢাকা। নিষ্প্রভ বলি-সংকুল মুখ; মাথায় সাদাটে বিরল কেশ; ছুঁচলো এক গোছা দাড়ি সুপুষ্ট হয়ে উঠছে চিবুকে তারি পরিচয়। নিখুঁত ওষ্ঠ দু'টির প্রান্ত ঢেকে লতিয়ে নেমে-আসা বিরল-কেশ সুদীর্ঘ গোঁফ-জোড়া অমন সুন্দর মুখখানির সমস্ত চারুতা একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। ওর সাবেকী রঙের বাঙ্‌নাময় মুখশ্রীকে আলো ক'রে আছে প্রাণবন্ত হাসি-ভরা সোনা রঙের দু'টি সুকুমার চোখ।

'একেবারে বোকা বোকা মেয়েদের মতো চোখ।' দল্‌গানভের অতি মৃদু নমনীয় কণ্ঠের কথা শুনতে শুনতে সামঘিন ভাবে।

'সর্বক্ষণ জেলারের পেছনে লাগতাম—ওই ক'রে জেল-জীবনের একঘেয়েমীর মধ্যে তবু একটু রস পেতাম। কুঁড়ের বাদশা ছিল লোকটা। এমন ভাব দেখাত যেন ও সাংঘাতিক একটা দৈত্য-দানা কিছু। যখন রোঁতে বেরুত, এমন করত, যেন কাকে ধরে গিলে খাবে তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন হৈ-হল্লা লাগিয়ে দিত যেন শুঁড়ীখানায় এসেছে। আমি ওকে ধমকাতাম : কি গুণ্ডামী করছ। মেজাজ বুঝি শরীফ নেই তাই ঝাল ঝাড়ছ। পদাতিক সৈন্যদলে কাজ করলে কি হবে! লোক তো এমনিতে তুমি ভালোই ছিলে—ভারী চটে যেত ওকে পদাতিক বললে। আগে স্যাপার ছিল কি না! রেগে চেঁচিয়ে উঠত : কি, আমায় বলছ লোক। বড় আস্পর্ধা তোমার। জান, তোমার তিন গুণ আমার বয়েস?...এমনি করে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের ঝগড়া চলত। তারপর বলত : তুমি আমায় মহা অপমান করেছ। ভেবেছ কি তুমি? দু'জনে মিলে খুব হাসতাম,—অবশ্যি আস্তে আস্তে—পাছে আবার ওর অপমান-টপমান হয়! শেষটায় বলতাম : দেখ একটা দপ্তরীর দোকান খোল তুমি।'

টেবিলে কনুই ভর দিয়ে বসে শুনছিল আইনো। ঠোঁট ফাঁক, মুখে কেমন যেন বিমূঢ় ভাব। পরনে মস্ত বড় বড় বোতাম-ওয়ালা কালো রঙের পোশাক। কোমরে হাল্কা সবুজ রঙের কোমর-বন্ধ—তার প্রান্ত মাটিতে লোটাচ্ছে।

ক্লিম বুঝতে পারে এক বর্ণও বিশ্বাস করেনি আইনো। দল্‌গানভ্ হঠাৎ দিমিত্রিকে জিজ্ঞেস ক'রে বসে :

'নারোদনিক ?'

'না, মার্ক্সবাদী।' হেসে সংশোধন করে দিমিত্রি।

'তাই নাকি ?' অবাক হয়ে যায় দল্‌গানভ্। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। 'আপনাকে দেখে তো তা মনে হয় না। কি অদ্ভুত রাশিয়ান মুখ—সাধারণতঃ মার্ক্সবাদীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ফিট্-ফাট। তারা সব বসে থাকে জার্মান দর্শনের সেই মাথায়; আর হেগেল মমসনের চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখে—যে হেগেল কিনা চেঁচাতেন—"মানুষ এবং রাশিয়ান" বলে, আর মমসন বলতেন—"স্লাভদের মাথা ফাটিয়ে দাও!"'

বলতে বলতে ক্লিমের দিকে তাকায় দল্‌গানভ্। ওর চোখে যেন যুদ্ধং দেহি ভাব। দুই হাতে চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে দেয়—বিশ্রী হয়ে খাড়া হয়ে থাকে চুলগুলো। কারণ খানিকটা খাড়াই ওর চুল। মাথার খুলিটা পেরেকের মাথার মতো লাগে। ক্রমে ধর্ম-প্রচারকের মতো ভঙ্গি ক'রে ও ত্রিয়েৎচশ্‌কে, বিসমার্ক এবং আরো অনেক জার্মানদের নাম ক'রে বিষোদ্‌গার করতে থাকে। এদের নামও শোনে নি কখনও ক্লিম।

'অত্যন্ত দুঃখের কথা যে নিকোলাই মিখাইলোভ্‌স্কি এবং দেশের জনসাধারণ সকলেই ভয়ে চুপ। কেউ স্বীকার করতে পারছে না নারোদনিক ও স্লাভোফিল্‌দের মতবাদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। আজ স্লাভোফিল্‌রা দেশ শাসন করছে বটে; কিন্তু তাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। রাদিশ্চেভ, হারজেন, বাকুনিন ইত্যাদি অনেকেই শাসকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কিন্তু রুশ জাতির আসল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছে শুধু স্লাভোফিল্‌রাই। পরিসংখ্যানের অঙ্ক দিয়েই কিছু আর একটা জাতির পরিচয় মেলে না। মেলে লোক-কথার মাধ্যমে। কিরীয়েভ্‌স্কি, আফানাসিয়েভ, সাখারভ, স্নেঘোরিঅভ্—এ'রাই আমাদের জনতার মর্মবাণী শুনতে শিখিয়েছেন।'

ও চোখ-মুখ কুঁচকে খুব রাগ দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু চোখ দু'টিতে ঝলমল করে প্রীতি আর উদ্দীপনার আলো। ওর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ওর সহজ-নমনীয় গভীর স্বরে ও যতই রেগে কথা বলতে চায় ততই ওর রাগের অক্ষমতা বারে বারে প্রকাশ হয়ে যায়। বিনা দ্বিধায় যা খুশি তাই বলে যেতে লাগল দল্‌গানভ্। মার্ক্সবাদকে বলে বসল ইহুদী-জার্মান-মুনাফা-শাস্ত্র। দিমিত্রি নিবিষ্ট মনে শুনছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে ভাইয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে—কেন সে মুখের মত জবাব দিচ্ছে না। জবাব ওর মুখে এলেও কুণ্ঠায় জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। আইনোর মুখে প্রসন্ন হাসি। ও যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। ক্লিম নির্লিপ্তভাবে বলল :

'এসব তো অতি পুরোনো বাসি কথা—কাগুজে বুলি।'

হলদে দাঁতগুলি বের ক'রে কড়া রকম একটা জবাব দিতে গিয়ে গোঁফ ছিঁড়তে লাগল দল্‌গানভ্, যার ফলে মুখটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলতে আরম্ভ করল চেয়ারে দুলে দুলে, হাঁটুর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে :

'চেতনা বস্তুসাপেক্ষ—এর চেয়ে ভুল কথা আর নেই। তাই যদি হবে, তাহলে

মানুষ তো শুধু বস্তুর ছায়াগ্রাহী একটা যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কোন শক্তির বলে বাস্তবের দ্বারা চেতনার ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটে তার ব্যাখ্যা তো মেলে না। মানুষের চাইতে বস্তুজগৎ কখনও বড় হয়নি, হবে না। শুধু বস্তুজগৎ নিয়ে মানুষের তৃষ্ণা কোনকালে মেটেনি, মিটবেও না।'

এসব যে ক্লিম সামঘিন নামে মানুষটার মনের গোপনে যে-কথা রয়েছে তারই অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি! এমনি কত কথাই হয়তো টেনে বের ক'রে আনবে ঐ লোকটা—দেখেই বোঝা যায় তা ও পারে। বিরক্তিতে মন গুলিয়ে ওঠে সামঘিনের। উদ্গত ক্রোধকে ও চাপা দিতেই চেয়েছিল। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ থেকে বেরিয়ে এল :

'আপনি কি ধর্মশাস্ত্রের ছাত্র?'

বল ওপরে ছুঁড়ে দিলে মাটিতে পড়ে যেমন ক'রে লাফায়, চেয়ারের মধ্যে তেমনি ক'রে লাফিয়ে উঠল দল্‌গানভ্‌-এর দেহটা। দুই হাত শূন্যে আছড়ে ও জবাব দিল :

'হাঁ, তাই। তাতে কার কি?'

ক্লিম মনে মনে বলে : 'ঠিক যেন একটা বাচ্চার আঁকা মানুষের ছবি। কিন্তু দিমিত্রি কিছু বলছে না কেন? আশ্চর্য!'

এক ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার চুলগুলি পেছনে সরিয়ে দেয় দল্‌গানভ্‌। কান দুটো প্রকাণ্ড দুই জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো হয়ে বেরিয়ে আসে। ও চিৎকার ক'রে ওঠে :

'আমি ধর্মশাস্ত্রের ছাত্রই। ও ছাড়াও জগতকে যে কল্পনা দিয়েই আমরা বুঝি ও স্বীকার করি, যুক্তি দিয়ে নয়—এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসংশয়। মানুষ প্রথমে শিল্পী। যুক্তি শুধু তার অভিজ্ঞতার মধ্যে খানিকটা শৃঙ্খলা আনে।'

ইচ্ছা না থাকলেও প্রতিবাদ করে দিমিত্রি :

'ও তো ভাববাদের কথা।'

'ধরুন তাই। কিন্তু ভাববাদ ছাড়া আর কিসের বলে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিগুলি মানবীয় পর্যায়ে উন্নত হয় বলুন! আপনি রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনটাকে একেবারে এড়িয়ে গিয়ে শুধু অর্থনীতির গভীরে হাত বাড়াচ্ছেন। কিন্তু জনতা আপনাদের নেতৃত্ব মানবে না। শুনবে না আপনাদের ওই জঘন্য বস্তুবাদের কথা। কারণ তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য বোঝে এবং এমনি নেতাই চায় তারা যারা তাদের উদ্দেশ্য ও ভাবধারার সঙ্গে সহানুভূতিশীল। আপনারা তাদের আদর্শের বিরোধী।'

উঠে দাঁড়ায় দল্‌গানভ্‌। ঝুঁকে প'ড়ে ঘাড়টা টান করে। চুলগুলি কপালে গালে ছড়িয়ে পড়ে। হাত দুটো পেছনে নিয়ে বিজয়ীর হাসি হেসে বলে :

'ব্যাপার কি জানেন? আপনারা মানে ওই মার্ক্সের চেলা-চামুণ্ডারা আসলে নিহিলিস্টদেরই ধর্মপুত্র। অথচ এ কথাটা আপনারা বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু বাধা ওই বংশ-গতি। কাজেই মানুষের গ্রাহ্য কোন বিশ্বাসকেই যখন আঁকড়ে ধরতে পারলেন না—তখন সব চেয়ে সহজ পথটাই বেছে নিয়েছেন।'

দল্‌গানভের হাসিটি দুষ্টুমীর হলেও তার মধ্যে এমন একটা ঔদ্ধত্যের সুর বাজল যা ওর ওই দীর্ঘ দেহ এবং বুড়োটে মুখখানার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ও বলল :

'যত সব ভণ্ডুল পাকাবার দল। যাই বলুন আপনারা, শেষ পর্যন্ত ওই আমাদের পথেই আসতে হবে। আপনাদের ওই রাজনীতি-বিরোধী চাল বেশী দিন চলবে না।'

আইনোর দিকে লম্বা হাত দ্ব'খানা বাড়িয়ে দেয়। আইনো জিজ্ঞেস করে: 'চললেন কোথায় এখন?'

'তরনিওতে। আপনি তো জানেনই।' হাসতে হাসতে জবাব দেয় দল্‌গানভ্‌।

মাথা নেড়ে ওর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে আইনো। ওর যেন কিছুই গায়ে লাগে না এমনি একটা নির্লিপ্ততার সঙ্গে হাত নেড়ে জবাব দেয় দল্‌গানভ্‌:

'ও কিছু না। ওখানেই চুল ছে'টে, পোশাক পরিয়ে দেবে।...'

'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

'আচ্ছা, চলি তবে।' বলে আইনোর সাথে বেরিয়ে যায় দল্‌গানভ্‌।



কে আগে কথা বলে সেই প্রত্যাশায় দিমিত্রি আর ক্লিম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। দিমিত্রি পায়চারী করতে করতে দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলে:

'সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে ভদ্রলোক।'

'অদ্ভুত মানুষ!' চশমা পরিষ্কার করতে করতে ক্লিম বলে।

'যা বলেছিস,' ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় দিমিত্রি। 'আমি যা দেখেছি ওরা সবাই এই লোকটার মতো। নারোদনিকদের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি লোক আছে এই রকমের। উস্তাগ্‌-এ পড়ত একটি ছেলে—কাজান থেকে এসেছিল। আশ্চর্যভাবে ওর কথা শুনত লোকে। আমাকে কেউ গ্রাহ্যও করত না। আমার ভারী অদ্ভুত লাগছে। কি রকম যেন ভীষণভাবে মনে হচ্ছে আমি যে-দিন চলে আসি সে-দিন একে উস্তাগ্‌-এ দেখেছি। তিনজনকে পাঠিয়েছিল ওখানে। সেই সঙ্গে এও ছিল নিশ্চয়ই। আশ্চর্য সাদৃশ্য!'

হঠাৎ ঘুরে গট্‌ গট্‌ ক'রে ভাই-এর কাছে এসে বলল দিমিত্রি:

'দেখ, ব্যাপারটা কিন্তু ভারী বিশ্রী হলো—বাবা তোর জন্যে কিছু রেখে যাননি—'

'ধ্যেৎ!' ক্লিম জবাব দেয়। 'আমি এসব নিয়ে মোটেই আলোচনা করতে চাই না।'

'না না, দাঁড়া,' দুই হাত বাড়িয়ে মিনতি করে দিমিত্র: 'চার,—মানে হাজার পাঁচেক আছে। তুই অর্ধেক নে, কেমন? বাকী টাকাটা আর বাড়িটা আইনোর জন্যই রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আর একটু পড়া শোনা করবার জন্য একটু বিদেশে বাবার ইচ্ছে আছে—'

ক্লিম একটু রূঢ়ভাবে বলে:

'বাস্‌, যথেষ্ট পেয়েছে আইনো। তাই দিয়ে স্বচ্ছন্দে ওর ছেলেপুলেদের মানুষ করার কাজ চলে যাবে। আর আমাকে দিতে হবে না কিছু।'

'এই দেখ—আরে শোন শোন...'

'আর একটি কথাও না,' বলে উঠনের দিক্‌কার খোলা জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ায় ক্লিম। 'বিদেশে গিয়ে তোমার পড়া দরকার।'

বাবার উইল ওকে আঘাত দিয়েছে! অবাক হয়ে নিজের দিকে তাকায় ক্লিম। আনুষ্ঠানিক আলাপের আনুষঙ্গিক স্থৈর্যের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল ও। বাবা যে ওকে কিছু দিয়ে যাননি, এ খবর প্রথম আইনোর কাছে পেয়ে তো এমন

লাগেনি। অন্যায়টা এখন যেন বড্ড বেশী বিঁধছে। তার জ্বালাটা যেন দিমিত্রির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্রমশঃই বাড়ছে।

ধমক দেয় নিজেকে : 'বাঃ, আচ্ছা মূর্খ তো!' কিন্তু তবু মন শান্ত হয় না। দাদাকে খুব কড়া কড়া কয়েকটা কথা শোনাতে বা বাবাকে খুব খানিকটা গাল দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু মনকে শাসন করা এত কঠিন হয়ে উঠল যে ও বলে ফেলল :

'মনের অনুকূল বা প্রতিকূল মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন থাকুক আর নাই থাকুক—'

এমনি সময় আইনো এসে পড়ল। এসেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে আরম্ভ করল :

'একেবারে খাঁটি রাশিয়ান ভদ্রলোক। তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। স্মাতেভ্রাস্কির লেখা "সোনার হৃদয়" বইখানার কথা মনে আছে? জেলের কর্তাদের সম্বন্ধে কি রকম ক'রে বলল, দেখলে না। অনেক কিছু করতে পারে লোকটা। ওর মতো মানুষের কথাই লোক শোনে; আর এ রকম লোককেই লোকে বিশ্বাস করে, ভালও বাসে। আর ও কিনা বলে সেই...হাঁ—সান্ত্বনা বেশ দিতে পারে...'

'যা বলেছেন,' ক্লিম বলে, 'ও কাজটা বেশ পারে।'

'সত্যি। তাই না?' ওর দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে আইনো বলে। হঠাৎ আঙুল নেড়ে বলে উঠল আইনো : 'তুমি ভারী কাঠ-খোট্টা তো। মানুষটার সঙ্গে একটু ভালো ব্যবহার করতে পারলে না?'

'আমি আরো ভাবলাম, ওর আসাটা আপনি একটুও পছন্দ করেন নি।'

'না, না, তা কেন? আমি তো ওর কথা জানতামই। ইভান ওর মতো কত লোককে যে সাহায্য করেছে তার ঠিক নেই। যে যেখানে যেতে চেয়েছে শুধু একবার এসে বললই হলো—আমি অমুক জায়গায় যাব। কত জন যে এখানে এসেছে—শুধু একখানা চিঠি, বাস্—অমুক আসবে।'

'আচ্ছা. আমি এখন পালাই। আবার থানায় হাজিরা দিতে হবে।' উঠে পড়ল দিমিত্রি। আইনোও ঐ সঙ্গে বেরুল—সমাধি-স্থানের জন্য একটা স্মৃতি-ফলকের ফরমায়েস দিতে হবে।

নিজেকে একটা ছবির বইয়ের মতো লাগে সামঘিনের। পুরোনো ছবির বইটা যেমন দেখে দেখে অরুচি ধরে যায়, আর দেখতে ভালো লাগে না, ছবির নামগুলোও পর্যন্ত বিশ্রী লাগে, অনেক সময় ঠিক তেমনি লাগে সামঘিনের। মনটা কি রকম একটা শোকের মতো ব্যথায় ভরে যায়।

বাবা ও দাদার ওপর অমন হঠাৎ রেগে উঠে বড় বিব্রত বোধ করে ক্লিম। রাগটা যেন আইনোর ওপর। ক্ষুব্ধ ওই মনটাকে ও যেন চেনে না। ওটা যেন ওর নয়। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কশাঘাতে অভিমানটাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিতে ইচ্ছা করে ওর। ধমক দিয়ে শাসন করে : 'এসব বাজে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ও সব কি হচ্ছে!' কিন্তু এদিকে আহত হৃদয়টা ফরিয়াদ করে ওঠে : 'বেশী নয় হাজার দুই-তিন রুবল্ হলেও তো হতো। বিদেশটা একটু ঘুরে আসতে পারতাম...।'

ব্যথাটা যেন ড্যালা পাকিয়ে গলার কাছে ঠেলে ওঠে :

মনকে চোখ ঠার দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে : 'তা খারাপ লেগেছে একটু—কিন্তু সে তো টাকার জন্য নয়...? মনে পড়ে কি পাগলামোই না করত বাবা ওকে নিয়ে! ভারী বিরক্ত লাগত ওর। আদর শেখাবার জন্য অত আদিখ্যেতা! কিন্তু ওর সম্বন্ধেই এই রকম। দিমিত্রির সম্বন্ধে বাবা-মা দুজনেই ছিল উদাসীন। আজও যেন ঘাড়ে-মাথায় বাবার আলতো হাতের কোমল স্পর্শটি অনুভব করতে পারে। সেই এক-

দিনের কথা মনে পড়ে যায়। নেক্রাসভ্-এর লেখা "রুশ রমণী" বইখানি নিয়ে তর্ক বেধেছিল বাবাতে আর দিমিত্রিতে। ওরা বাগানেই ছিল। কি সাংঘাতিক চ্যাঁচামেচি দুজনে! হঠাৎ ওর অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—অর্থহীন হিম, কঠোর —'পরিবার—রক্তের সম্পর্কই—রাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ।' 'কিন্তু', মনে মনে ভাবে ক্লিম, 'আমার তো সেই দশ বছর বয়সেই বাবাকে কেমন পর পর মনে হতো। মনে হতো ওই বাবাই আমার জীবনের প্রতিবন্ধক। আমি যেন ওঁর হাতের পুতুল'...আচ্ছা কার সাফাই গাইছে ক্লিম! বাবার না নিজের!

ছোট্ট দাড়ির গোছাটা পাকাতে পাকাতে স্থির দৃষ্টিতে ও তেল-রং-করা দেয়ালের অস্পষ্ট রঙের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক সামনেই ঝুলছে তেল রঙের একখানা প্রাকৃতিক স্টাডি—স্বচ্ছ নীল আকাশ—তার নীচে নীল-শ্যাম যেন শীর্ষ-লহর গৈরিক বালুতটের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ছে।...অতি বলিষ্ঠ রেখা। অতি দুঃসাহসী তুলির টান।

ঘরগুলি বেশ আরামের হলেও কেমন যেন হিমেল, কেমন নীরস মনে হয় ক্লিমের। মস্কোতে ভারভারার ঘরখানা তো এমন নয়। কি উষ্ণতা—কত স্নিগ্ধতা —কত দরদ—সেই ঘরটুকুর মধ্যে! আমি যাব—ফিরে যাব—আজই—নইলে আবার উইল নিয়ে পড়বে ওরা। ওরা উদার—ওরা মহৎ! কিন্তু...। না : যাব, আজই চলে যাব। বাড়ীই যাব।'

সোজা হয়ে দাঁড়ায় ক্লিম। চশমাটা ঠিক করে নেয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মার ছবি—মুখে ঈষৎ বেগুনী রঙের পাউডারের প্রসাধন। মনে বড় দুঃখ—ওর ভেতরকার যৌবনবতী নারী রইল বেঁচে আর ও গেল বুড়িয়ে। ভেসে ওঠে ভারাভ-কার পিপের মতো গোল চেহারাটাও......

'সপ্তাহখানেক থাকব সেইন্ট পীতর্সবুর্গ-এ। তারপর যাব অন্য কোথাও। বলব একটা টেলিগ্রাম এসেছে। আইনো অবশ্য বুঝবে মিথ্যে কথা। তা বুঝুক গে।'

ঠিক করল টেলিগ্রামের কথাই বলবে। বলবে রাস্তায় দিয়েছে পিয়ন। সুতরাং বেরুতেই হলো। এবং খাবার সময় যথারীতি জানিয়ে দিল ও যাচ্ছে। দিমিত্রি অবিশ্বাস করেনি। কিন্তু আইনো ভ্রূকুটি ক'রে উইলের কথা তুলল।

ক্লিম দৃঢ়ভাবে জবাব দিল : 'বাবার উইল বদল করার কোন কারণ আমি দেখছি নে।'

আইনো চুপ ক'রে শুধু কাঁধ ঝাঁকাল।

খাওয়ার পরে দিমিত্রি এল ক্লিমের ঘরে। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে রইল একটা খুঁটির মতো। পাতলুনের পকেটে ঢোকান হাতের আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে পায়ের দিকে তাকিয়ে ভারী বিব্রতভাবে কি যেন বলবার চেষ্টা করতে লাগল :

'কি বিশ্রী কাণ্ড বল তো। ঠিকই বলেছিলি তুই—দরদ-টরদ ওসব স্রেফ্ খামখেয়ালীর ব্যাপার। ওর কোন মাথামুণ্ড নেই। আমার অবস্থাটা কি রকম বুদ্ধুর মতো হয়েছে বল্ তো!'

ক্লিম বোঝে দিমিত্রির মনটা সত্যি সত্যি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছে। মনে মনে বলে : 'এ তো ওর পক্ষে আরও খারাপ।'

আইনো শুকনো ঔদাস্যে বিদায় দেয় ওকে। দিমিত্রির ইচ্ছে ছিল স্টেশন পর্যন্ত যায় ওর সঙ্গে। কিন্তু একটা ট্র্যাভেলিং র‍্যাকের বক্‌লস্-এ লেগে পাতলুনের একটা পা ছিঁড়ে গেল।

আইনো দরদ-ভরা স্বরে বাধা দিল : 'যাঃ, এখন যাবে কি ক'রে? আর আছে পাতলুন? নেই? তাহলে তো স্টেশনে যাওয়া হয় না!'

ভালোই হলো, আসা হলো না দিমিত্রির। ক্লিম মনে মনে খুশিই হলো।

কিন্তু তবু যেন একটা খোঁচা থেকে যায় : 'ওই মেয়েমানুষটাই তো আসতে দিল না দাদাকে। শয়তান কোথাকার! কি চালাকিটাই না খেলল!'

যাই হোক, বেরিয়ে পড়ে ও। খুঁটিনাটি অজস্র চিন্তা তোলপাড় করে মনের মধ্যে। ও চায় না ভাবতে। কিন্তু তবু কোথা থেকে এসে ওই ক্ষুদ্র, অশোভন ভাবনাগুলি যেন চেপে বসে ওর বুকের ওপর। এও বুঝছে ও আজ বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন হলেও ঐগুলিই হয়তো একদিন স্থির সিদ্ধান্তের রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠবে।

সিদ্ধান্ত! কিসের? কি সে সিদ্ধান্ত? সিদ্ধান্ত মানেই তো আত্ম-সংকোচন। হোক সে। দেখাই যাক না কি হয়।



সেইন্ট পীতর্সবুর্গ। রইল ক'দিন এখানে ক্লিম। কিন্তু মনটা বিরক্তিতে ভরে রইল। কোন একটা শ্রী-ছাঁদ নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই এখানকার জীবনধারায়। দিনের বেলায় রাস্তায় বেরুন যায় না। চার দিকে মস্ত মস্ত ইমারৎ উঠছে; তার সুরকী-বালির ধুলোয় গিস্‌গিস্ করছে রাস্তার বায়ুমণ্ডল। ওদিকে নেভ্‌স্কি ফুটপাথের কাঠের পাটাতনে মেরামতের কাজ চলছে। গোটা শহরে সেই পচা কাঠের দুর্গন্ধ। সমস্ত জায়গাটা যেন ভেপ্‌সে আছে। রাতগুলি ওর মনে যেন আগুন জ্বালে—শুভ্র রাত। অসঙ্গতি-ভরা, সুস্থ মানুষের স্নায়ু-বিকলকরা রাত। তার হাওয়া হেমন্তের পচন-ধরা কুয়াশায় ভারী। কুয়াশার কণাগুলি যেন শুকিয়ে অতি-বিশ্রী রকম উজ্জ্বল স্বচ্ছ ধূলি-জালের মত হয়ে উঠেছে।

নিশাচারিণীর দল পথে পথে ঘোরে ছায়ামূর্তির মত। দুঃস্বপ্নের মত তারা লেগে থাকে যেন রাত্রির বুকে। যাকে ধরে ধরে বাত-ব্যাধিতে অসার করে দেয় তার সর্বাঙ্গ। এদেরই একজন সেদিন এগিয়ে এল ক্লিমের কাছে। রোগা লম্বা মানুষটা। মাথায় প্রকাণ্ড একটা টুপী। তার তলা থেকে বেরিয়ে আছে মরা মানুষের নাকের মত একটা বিবর্ণ নাক। বহুদূর চলল ক্লিমের সঙ্গে সঙ্গে। চলতে চলতে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল :

'ছাত্র-বন্ধু, চলনা একটু আমার ঘরে। আসবে না!'

কানের কাছে মুখ এনে গুনগুনিয়ে গাইল :

'ওরে মিঠুয়া আমার রে...
তোমার লাগি...'

ক্লিম পুলিশ ডাকবে বলাতে ত্রস্ত পায়ে হেলেদুলে বাস্তব রাস্তা পার হয়ে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিনের স্মৃতিস্তম্ভটার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্তম্ভটাকে যেন জারের ঘণ্টার মত লাগে ক্লিমের। শহরটাকে রাশিয়ান শহর বলে ওর একটুও মনে হয় না।

নাঃ, এখানে থাকা আর চলবে না। এ পরিবেশ থেকে সরতেই হবে। স্থির করে যেখানে সরল সহজ সুস্থ মানুষের দেখা পাবে, তাদের আরো কাছে আসতে পারবে সেখানেই যাবে। এ সিদ্ধান্ত আর নড়বে না। কোন দিন না।

পরের দিনই বাড়ি যাবে। স্টেশন থেকে সোজা এল ভারভারাদের ওখানে। উদ্দেশ্য ভারভারার সাথে দেখা করা নয়, চাই সমভাকে। ধমকে দেবে ওকে—কোন্ অধিকারে দদ্যুগানভ-এর মত একটা লোককে ওর কাছে পাঠাল সে। কোথাকার কোন্

অন্ধকারের জীব; মাথার মধ্যে যত সাংঘাতিক পদার্থ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই একই ধাতুতে তৈরি সিলউতভ্‌রা, যাজক আর দিওমিদফ্‌রা অর্থাৎ যাদের মস্তিষ্কের যন্ত্রগুলো বিকল।

ঠিক তেমনি আছে আন্‌ফিমিয়েভ্‌না—সেই বিপুল দেহখানা, কালের দ্রংষ্ট্রা সেখানে দন্তস্ফুট করতে পারেনি। ওকে দেখে আনন্দে সে কি যে করবে ভেবে পেল না। ভরভারা কস্ত্রোমায় গেছে। অত্যন্ত রেগে আছে আন্‌ফিমিয়েভ্‌না সেজন্য।

'যত্ত সব! কতগুলি অভিনেতার পাল্লায় পড়েছে আর কি মেয়েটা। থিয়েটার করবেন। কোন স্বর্গ উদ্ধার হবে শুনি থিয়েটার করে। থিয়েটার নয় হাতী—আসলে মেয়েটার টাকা কিছু ওড়াবে হতচ্ছাড়ারা।'

গমের ভূষির মত রঙের মুখখানা এপ্রন দিয়ে মুছে ঠোঁট চাটতে চাটতে ক্লিমকে রীতিমত ধমক দিয়ে উঠল ও :

'তোমাদের বিয়েটা সেরে ফেলছ না কেন, ক্লিম ইভানিচ্? কিসের জন্য বসে আছ শুনি? তোমার যেন কিছুতেই গা-গরজ নেই। মেয়েটা ওদিকে শেকল-বাঁধা কুকুরের মতো তোমার সঙ্গে লটকে আছে। ধৈর্যও আছে তোমার। কলজে তোমার দিব্যি ঠাণ্ডা।'

অমন ভারী দেহখানায় আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা। চোখের নিমেষে নিয়ে এল চা করে। গোল পুঁতির মতো, ঘোলাটে চোখ দুটি বিগ্রহের সামনে জ্বালান প্রদীপের মতো চক্‌চক্‌ করে। দুঃখ ক'রে বলতে লাগল ও :

'এই ধরো না লুবাশার কথাই। মেয়েটা সত্যি সকলের ভালোর জন্য হেদিয়ে মরছে। কতখানি, যে সে আর কি বলব। কিন্তু এই দেখ, কাল রাত্তিতে আবার বাড়ি আসেনি। আরেক দিন ভোরবেলা, জাগাতে এসে দেখি, ওমা! চেয়ারে বসে বসেই কিনা ঘুমুচ্ছে! ঘুমিয়ে একেবারে পাথর! একটা জুতো খোলা হয়েছে। আরেকটা পায়েই রয়েছে। বোধহয় একটা খুলতে-খুলতেই ঘুমে ঢুলে পড়েছে। দঙগলে দঙগলে মানুষ দিন নেই রাত্তির নেই মেয়েটাকে ঘিরে থাকে। কিন্তু কই বিয়ের কথাটি তো কেউ মুখে আনে না! কি রকম লাগে বল তো! আমার প্রাণে আর সয় না। অমন চমৎকার মেয়ে—কি মিষ্টি, টস্‌ টস্‌ করছে রসে—ঠিক যেন কমলা লেবুটি।'

আনফিমিয়েভনার স্নেহসিক্ত সরল হৃদয়, তার মায়ের মতো আদর, তার হাতের তৈরি অপূর্ব কফি, অন্তরঙ্গ গৃহখানির ঘরোয়া পরিবেষ্টন কতকালের বাঁধা এই ঘর, কত কাল ধরে মানুষ নীড় বেঁধেছে এখানে—সব মিলিয়ে অপূর্ব এক মোহ বিস্তার ক'রে মোলায়েম ক'রে তুলল ক্লিমের মন। মনে পড়ে ওর শৈশবের ধাত্রী তানিয়া কুলিকোভার কথা—দ্রনভের ঠাকুরমা, কুলিকোভা। মনে পড়ে পুশকিন এবং আরো অনেক মহামানবের ধাত্রী-জননীদের কথা।

'এই সমস্ত মহামানবীদের কথা লিখতে ভুলে গেছেন নেক্রাসভ। মানবাত্মার সৌকর্যসাধনে এঁদের যে মহাদান রয়েছে, লোক সমক্ষে কেউ তুলে ধরেন নি। কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের জন্য যে ভালোবাসা, যে সুস্থ স্নেহের বীজ এই নারীরা বপন করে গেছেন, এঁদের হাতে মানুষ-হওয়া কোন লেখকের বইতে তো তা চোখে পড়ে না। তারা লিখবে যত—অমুক বীরাঙ্গনা ধাবমান অশ্বকে রুখতে পারে, প্রবেশ করতে পারে জ্বলন্ত গৃহে—ইত্যাদি গালভরা কথা। বেশ লাগে শুনতে। কিন্তু এতে লাভটা কি? বরঞ্চ তার চেয়ে এই সরলপ্রাণা মহিলারা যেভাবে প্রাত্যাহিক জীবনের গভীরে প্রবেশ করে জীবনকে ক্লেদ-মুক্ত করার জন্য নিঃস্বার্থ সাধনা করে গেছেন তাতেই কল্যাণ বেশী।'

ক্লিমের মনে হয়—এসব কথা আর কেউ ভাবেনি। এ চিন্তার প্রথম উদ্গাতা ও এবং এর মৌলিকত্বের কৃতিত্বও ওরই। নিজের পারিপার্শ্বিকের সাথে গভীরতর আত্মীয়তা বোধ করে ও। বুক ওর ভরে ওঠে। মনে হয়—ফিনল্যাণ্ডের চাইতে এ জাগায়টা বেশ গরম। নোট্-বুক খুলে কথাটা লিখেও ফেলে।

"রুস্কায়া ভেদোমস্তি"র (রাশিয়ান সমাচার) কয়েকটা সংখ্যা উল্টে-পাল্টে দেখল খানিকক্ষণ এবং কখন জানি ডিভানের ওপরেই ঢলে পড়ল। হঠাৎ জেগে উঠল লুবাশার ডাকে :

'সর্বনাশ, সাত-দুপুরে একি ঘুম?' বলে কল্ংজভ্-এর গানের নকলে সুর ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে ওর হাত ধরে টানাটানি করছিল লুবাশা।

ডিভানের পাশেই একটা চেয়ারে পা দুটো টান টান ক'রে ছড়িয়ে বসেছে ও। জুতোয় এক রাশ ধুলো—মুখে গভীর ক্লান্তি, কিন্তু আনন্দে ঝলমল করছে। ঘামে-ভেজা কপালের ওপর বিস্রস্ত চুলগুলো এসে সেঁটে বসেছে। রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে এক হাতে চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগল। তারপর গলার নীল রঙের টাইটা ঢিলে ক'রে দিয়ে খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে বলল :

'ক্লিম ভাই, জানো—রাশ্যান সোস্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিবৃতি বেরিয়ে গেছে। কি অদ্ভুত লেখা! ভাবো একবার—আমাদের একটা পার্টি হয়ে গেল!'

'এই "আমরা"টা কারা শুনি?' চশমাটা চোখে দিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্লিম।

'হায় ভগবান! তাও জানো না? আমরা মানে রাশিয়া! এটুকুও বুঝলে না? এর মানে হলো ঝগড়া-ঝাটি, কথা কাটাকাটি এবার খতম। এখন প্রত্যেকটি মানুষ—সে কি করবে, কোথায় যাবে সব জানা। বিবৃতিতে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে—রাজনৈতিক সংগ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং শাসন-ক্ষমতা সোজাসুজি নারোদনিকীদের হাতে আসা দরকার। বুঝলে তো?'

আনন্দে, উত্তেজনায় অজস্র ঘামছিল লুবাশা। এক টান মেরে টাইটা খুলে ফেলে জামার গলাটা ঢিলে ক'রে দিয়ে বলল :

'বাপ্স্! দম বন্ধ হয়ে আসছে!'

খুব জোর দিয়ে দিয়ে, পুতুল নাচের ভঙ্গিতে 'বিবৃতি' থেকে উদ্ধৃতি ক'রে শোনাতে লাগল ক্লিমকে। হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওর স্মৃতির পটে জেগে উঠল একটি ছবি। অনেক দিন আগের কথা। ওদের গ্রামে গির্জার ঘণ্টা খাটান হচ্ছিল যে-দিন সে-দিনের কথা। ওদের গ্রীষ্মাবাসের কাছে অতি গম্ভীরভাবে এল একটি কৃষক রমণী—উস্কু খস্কু চুল, আধা-পাগল গোছের মুখের ভাব। গির্জার সামনে নতজানু হয়ে বসে বার বার ক্রুশের চিহ্ন আঁকছিল বুকের ওপর। একজন শিশি-বোতল-নির্মাতা দাঁড়িয়েছিল ওদিকে তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছিল :

'ভগবান! ভগবান! ভগবান তোমাকে সুখে রাখুন... তোমাকে...'

অদ্ভুত সাদৃশ্য সেই মেয়েটির সঙ্গে লুবাশার। হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠে সামঘিন্। লুবাশা আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। ক্লিমের হাঁটুতে ওর তুলতুলে মাংসল হাত দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে কল্কলিয়ে ওঠে :

'তাই না? বলো না। আসল কথা হচ্ছে ভালো লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি ছেড়ে এখন সত্যিকার কাজে মন দেবে।'

সামঘিন মৃদুভাবে ওর বাহু চাপড়ায়, ইচ্ছে করে খুব ব্যথা দিয়ে মারে কয়েক ঘা। বলে :

'আচ্ছা, বিবৃতির কথা শুনিও। এখন বলতো...'

'ভারভারার খবর?' ক্লিমের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে, 'দেখলে কাণ্ড? তিনি গেছেন অভিনয় করতে। বলে কি না নিজেকে একবার দেখব যাচাই ক'রে।

শুনলে তো।'

'ওর জন্য ভাবছি না। যেমন তুমি অভিনেত্রী, তেমনি ও।'

লুবাশা জিভ বের ক'রে ভ্যাংচায় ওকে।

'তুমি একটি আস্ত গর্দভ। আশা করি সংশয়বাদী নও। ওদিকে মেয়েটা তোমার জন্য মরছে। কি নিষ্ঠুর তুমি! আস্ত একটি ডন্ জুয়ান্। এত গুমর তোমার কিসের শুনি? আরে হ্যাঁ! শুনেছ? লিদিয়াও একটা দলে যোগ দিয়েছে। চলে গেছে ভল্গার ওপারে কেরঝেনেৎস্-এ। লিখেছে ওখানে বেরেনদীয়েভ বলে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে ছেলেটি। লিদিয়াও তাই করছে। হতাশ হয়েই তো ঐ পথে গেল। যত সব! এন্ফিমিয়েভ্না, লক্ষ্মী সোনা, একটু ঠাণ্ডা কিছু খাওয়াবে?'

এক প্রস্থ ধোয়া কাপড় নিয়ে ঢুকছিল এন্ফিমিয়েভনা। বলল :

'ঠাণ্ডা-টাণ্ডা এখন পাচ্ছ না। আগে খাও দেখি কিছু! তারপর বরফ-দেওয়া দুধ নিয়ে আসছি।'

লুবাশাকে কড়া কথা শোনাবার জন্যই ক্লিমের এখানে আসা, কিন্তু সেই অবকাশ জুটল না এখনও। এতক্ষণে সে-ইচ্ছে ওর উবে গেছে। মেয়েটার কলোচ্ছ্বাসে ও রাগ ভুলে গেছে।

'দেখছ ভুলে মেরেছি। জান? মারাকুয়েভের এক বছরের জেল হয়েছে। আর যাজক পাগল সাব্যস্ত হয়েছে। ওকে স্মিত্রভ্-এ ওর বাড়িতে পাঠান হয়েছে। সাপোঝ্নিকভ ছাড়া আর সব শ্রমিকদের জেল হয়েছে। ওর সম্বন্ধেও রিপোর্ট যে বড্ড বেশী কথা বলে। আর একজন আছে—ওদিন্ৎজভ্—তাকেও বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে গেল লুবাশা।

'জামা কাপড় ছাড়িগে। নইলে যে ঘামতে ঘামতে স্রেফ্ ফুরিয়ে যাব।'

দরজার কাছে গিয়েই হঠাৎ আবার ফিরে এসে দুই হাতের মধ্যে ক্লিমের মাথাটা নিয়ে বলতে লাগল :

'ওহো, ক্লিম ভাই! জান? একজন মার্ক্সবাদীর সঙ্গে আলাপ হলো। কি চমৎকার যে মানুষ কি বলব তোমায়। গলার স্বরটা ঠিক ভেলভেটের মতো। ও তো চলে না, যেন একটা পাল-তোলা নৌকো তর্ তর্ ক'রে বয়ে যায়। প্রত্যেকটা ব্যাপারে ওর স্পষ্ট মতামত। হাসছ!... হাসোগে। কিন্তু শুনে নাও আমার কাছে : ওর মতো মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে। ঠিক ঝেলিয়াবভ্-এর মতো দেখতে। সত্যি তাই!'

সামঘিন হক্চকিয়ে যায় লুবাশার সব খবর শুনে। 'বিবৃতি'টা সম্বন্ধে ওর ভারী কৌতূহল হয়। ভাবে :

'হয়তো ছাত্রদেরই ওস্তাদী। একবার প্রেইস্-এর কাছে যেতে হচ্ছে দিখছি।'

লুবাশার অত্যধিক উল্লাসে ওর মন বিরূপতায় ভরে ওঠে। হবে না স্ফূর্তি! বোঝাই তো যাচ্ছে। ওই মখমল-পানা মার্ক্সবাদীর আশায় যে গোলগাল বপুখানা চঞ্চল হয়ে উঠেছে! হোক—আচ্ছা ক'রে দিচ্ছি শুনিয়ে!

আবার দরজায় দেখা দেয় লুবাশা, গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে। দু'খানা চিঠি ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর :

'অনেক দিন হলো এসেছে চিঠি দুটো।'



দু'খানাই মার চিঠি। এক খানাতে বুঝিয়ে লিখেছেন ফিন্‌লাণ্ড যাওয়া কেন দরকার। চিঠি খানার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন রাগ রয়েছে বৃদ্ধ সাম্‌ঘিনের ওপর— কেন তার অসুখ হলো। আবার যেন বুঝতেও পেরেছেন যে অসুখটা সত্যি শক্ত। শেষের দিকটা পড়ে হাসি পেল ক্লিমের। লিখেছেন :

'ইভান আকিমোভিচ্ উইল করেছেন বলে মনে হয় না। সে-চরিত্রের মানুষই নয়। তোমার ভাই বা তুমি যদি খোঁজ করতে চাও তোমাদের বাবার কি আছে না-আছে—তিমোফি স্তেপানোভিচ্ একজন ভালো উকিলের খোঁজ দিচ্ছেন, দেখতে পারো।' এর পর রয়েছে নাম-করা একজন দেওয়ানী আদালতের এটর্ণীর নাম ও ঠিকানা।

দ্বিতীয় চিঠিটা আরো বৈষয়িক।

'তোমায় মস্কোর ঠিকানায়ই লিখতে হলো, কেন-না ভাইবর্গ্-এ কোন হোটেলে থাকবে তার ঠিকানা দাওনি। আমার মন বড় খারাপ। কি যে হবে জানিনা। এলিজাবেথা স্বোভনা একটা বিশ্রী কেলেংকারীতে জড়িয়েছে। ইনোকভকে তুমি চেন। সেই এই ব্যাপারে জড়িত। বোধ হয় জেল হয়ে যাবে লোকটার। ওর মাথা নিশ্চয়ই খারাপ। আমাদেরই উঠনে দাঁড়িয়ে কয়ার-মাস্টারকে ঠেঙিয়ে থেৎলে দিয়ে গেল সে-দিন। তুমি জান লিজা "কোরাল-সঙ্গীত-প্রেমী সমিতি"তে কাজ করছিল। কয়ার মাস্টার ওকে বেশ সাহায্য করছিলেন। এবং বলাই বাহুল্য, লিজার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। লিজা তা অস্বীকার করে না। বরং স্পষ্ট বলে। পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে আশনাই করেই, হেন পুরুষ নেই তা করে না। তবে ও বড় ঘাবড়ে গেছে এ ব্যাপারে। কিন্তু গুমর আছে ষোল আনা। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। বিশপ জোসেফ হস্তক্ষেপ করেছেন ব্যাপারটার মধ্যে। ইনোকভের পক্ষে এর ফল ভালো হবে না। ও আবার বড্ড বেশী সত্যবাদী কিনা। অত সত্যবাদী হওয়া কোন কাজের নয়। নেহাৎ বোকামী। ইনোকভ তার পক্ষ সমর্থন করতে নিযুক্ত করেনি কাউকে। নিজেই করছে। জবানবন্দীতে জোর গলায় বলেছে কয়ার মাস্টার লিজাকে হুমকী দিচ্ছিল যে পুলিশের কাছে এই বলে রিপোর্ট দেবে যে ও কয়ারের গাইয়েদের সঙ্গে রাজনীতি চর্চা করছিল। গাইয়েরা বেশীর ভাগই দোকান-কর্মচারী আর মিস্ত্রী। লিজাকে আমি ভালো ক'রে জানি। কোন গুজব তাই বিশ্বাস করি না। কিন্তু সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার কি হলো জানো, আমার ইস্কুলটার মারাত্মক ক্ষতি হলো। এ কথা ইনোকভকে বিশ্বাসই করান গেল না। আর লিজাকেও বলিহারী! অমন একটা বদরাগী লোককে ও আমল দিল কি করে? তা এদিকে লিজার বড় কৌতূহল। মানুষ দেখলেই তাকে জানতে হবে। দিন-কাল যা খারাপ পড়েছে, তাতে এ অভ্যাস অত্যন্ত বিপজ্জনক। তুমি সত্যি বলেছ, দিনকাল ক্রমশঃ খারাপ হয়ে উঠছে। আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষ যদি একটুও দুর্বলতা দেখায় কি যে হবে এ অবস্থায় তা বলা যায় না।'

এর পর আইন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে লম্বা বক্তৃতা চিঠি ভরে। কিন্তু পড়া তখনও শেষ হয় নি। দরজায় কার কাশির ও থুথু ফেলার শব্দ শোনা গেল। ছোট্ট একটি মানুষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল :

'আসতে পারি?'

'আসুন আসুন।'

'সমভা আছেন!'

দরজাটা একটুখানি ফাঁক ক'রে লুবাশা বলে :

'আসছি। এই এলাম বলে।'

আলোর ঋজু রেখাটা যেখানে এসে পড়েছে সেখানে সরে এল আগন্তুক। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে এগুতে লাগল। সামঘিন উঠে আত্ম-পরিচয় দিল। ভদ্রলোক নিজের রুক্ষ, কঠিন হাতখানা তার হাতের মধ্যে রেখে জিজ্ঞেস করল :

'আচ্ছা, জেকব আকিমোভিচ কি আপনার কেউ হন?'

'আমার জ্যাঠামশাই।'

'আচ্ছা! সারতভ্ জেলে একসঙ্গে ছিলাম আমরা।'

'জ্যাঠামশাই মারা গেছেন।'

'জানি, আমি কাছে ছিলাম।'

ক্লিমের ঠিক মুখোমুখি একখানা চেয়ারে বসল আগন্তুক। তারপর ইঁদুরের মতো চোখ দুটো দিয়ে বিব্রতভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে এসে বসল ডিভানে। এবং ছবি আঁকার আগে শিল্পী যেমন ক'রে মডেলকে দেখে ঠিক তেমনি ক'রে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি দিয়ে যেন শুষে নেবে ওকে। রোগা লবা মানুষটি; হৈমন্তিক মেঘের রঙের তলস্তয়ী নমুনার একটি ব্লাউস্ গায়ে, অকালে দাড়ি-গজান কচি মুখের মতো মুখখানা। অত্যন্ত টিকল নাকটি; দাঁত প্রায় নেই বললেই হয়! ওষ্ঠের ওপরে গোঁফের অতি সূক্ষ্ম শুভ্র একটি রেখা।

'এইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন?'

'আজ্ঞে!'

'আইন পড়া হয় নিশ্চয়?' বলে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে পকেট থেকে তামাকের থলি আর কাগজ বের করে নেয় আগন্তুক। একটা সিগারেট তৈরী করে নিয়ে বলল : 'কে আইন পড়ে আর কে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ে চেহারায়ই বেশ মালুম হয়।'

ক্লিমের রাগ হয়। ভাবে : 'এরা সব্বাই দেখছি নিজেকে ছোট করবার জন্য ব্যস্ত।' কিন্তু এই লোকটিকে আর চেষ্টা করে নিজেকে ছোট করতে হয় না। প্রকৃতিই ওকে ছোট ক'রে রেখেছে।

পায়ে চটি, আপাদ-মস্তক সাদা পোষাকে লুবাশা এসে ঢুকল।

'আরে একি ব্যাপার? মিশা কাকু যে।'

'হলো না রে, ওরা রাজী হলো না।' মাথা নেড়ে জানাল আগন্তুক।

'ভীতু কোথাকার।'

নিজের বেনীটা গায়ের জোরে টানতে টানতে উত্তেজিতভাবে লুবাশা বলে উঠে। ওর মুখখানা বেদনাক্ত হয়ে ওঠে।

'তাহলে তোমার কথামতোই হচ্ছে!'

'তাই তো দেখছি।' শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দেন মিশা কাকা। খোশ মেজাজে বসে বসে ওপরের দিকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে থাকেন। সামঘিনের দিকে ফিরে লুবাশা বলে :

'ডীকন ইপাতিয়েভ্স্কিকে খুব ভালো ক'রে চেনেন মিশা কাকু।'

'বাপ-ব্যাটা দু'জনকেই চিনি।' আঙুল নাচিয়ে মাঝখানেই ব'লে ওঠেন মিশা কাকা। 'ভ্লাদিমির জেলে এক সঙ্গেই ছিলাম ওর ছেলে আর আমি। খুব চালাক-চতুর ছেলে। কিন্তু ভারী রগচটা—আর গোঁয়াড়। আবার ওদিকে অতিরিক্ত রকম

দার্শনিক—ওই শাস্ত্র-পড়ুয়াদের যা হয়। বাপটা একটা লক্ষ্মীছাড়া। কিছুই করতে পারল না। ছিল পাদরী, কিন্তু মদেই ওকে খেল। তারপর এসব মানুষের যে গতি হয়। দরবেশ সন্ন্যাসী বনে মঠে মঠে ঘুরবে; ধর্মভীরু বেনে-গিন্নীদের মাথায় হাত বুলিয়ে খাবে। আর ধর্মের নাম করে যত সব রাবিশ ছড়াবে।'

মিশা কাকার স্বর শান্ত; কিন্তু স্বচ্ছ-তোয়া, নিরন্তরোৎসারী ভোগবতীর মতোই তা প্রসাদময় আর অফুরন্ত।

অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে সমভা জিজ্ঞেস করে :

'বিবৃতিটা পড়েছ ?'

'পড়েছি এবং নির্দেশমত তা বিলিয়েওছি।'

'তারপর ?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা। একটা ঐতিহাসিক ঘটনাই বলা চলে।' মিহি ওষ্ঠ দুটিকে শিস দেবার মতো ক'রে মিশা বলে :

'সত্যি তাই।'

'কিন্তু দুঃখের কথা কি জান ? এমন চোস্তভাবে লেখা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিটা যে শ্রমিকদের পক্ষে দন্তস্ফুট করাই দায়। তারপর ওই যে ফ্যাশন ক'রে অর্থনৈতিক-বিজ্ঞানের দোহাই পারা—আরে বিজ্ঞান তো বিজ্ঞানই। কিন্তু টমাস্ হব্স্ কি বলছেন ? তাতে ভুললে চলবে না। তিনি বলছেন, বিজ্ঞান হচ্ছে একটা আপেক্ষিক তত্ত্ব মাত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানের বাহক হচ্ছে অনুভূতি। মস্তিষ্কের ওপর বেশী চাপ পড়লে হৃদয়যন্ত্রের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হবেই। মিখাইলভস্কি ভারী চমৎকার ভাবে এটা পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন হার্বার্ট স্পেন্সরের ওপর...'

শুধু অভদ্র ভাবেই বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে লুবাশা জিজ্ঞেস করল মিশা কাকা কিছু খাবে কি না। নিঃশব্দে সম্মতি জানিয়ে টেবিলে এসে বসে মিশা। একখণ্ড যবের রুটি তুলে নিল, দুধ ঢেলে নিল এক গেলাশ। এবং পরক্ষণেই লাফিয়ে উঠে ছুটোছুটি করতে লাগল কোথায় সিগারেটের ছাই ফেলবে। এই পাগলের মতো ছাইদান খোঁজার মধ্য দিয়ে সহজ মানুষটাকে যেন দেখতে পায় সামঘিন। বহু মানুষ দেখেছে ও। এমনিই হয়। এমনি তুচ্ছ বস্তুকে উপলক্ষ্য করেই যে কত মানুষের সহজ সত্তার পরিচয়টি খুলে যায়।



যেন ভাড়াটে গাড়ীর মধ্যে ঢুকছে এমনি ক'রে কাত হয়ে খাবার ঘরে এসে ঢুকল মাঝারী আকারের একটি মানুষ—পেটান গড়ন, কাল দাড়ি, ভেজা-ভেজা-চোখ, গোমরা মুখ।

'পিমেন গুসারভ।' পরিচয় করিয়ে দেয় লুবাশা।

বার-দুই মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে একগোছা পত্রিকা ওর সামনে ফেলে দিয়ে খনখনে স্বরে অতিথি বলল :

'মলাটের ওপরে পাতার নম্বর দেওয়া আছে।'

অত্যন্ত উত্তপ্তভাবে বিবৃতির সমালোচনা নিয়ে পড়ে গুসারভ্ : 'সবাই হাতড়ে বেড়াচ্ছে কি ভাবে, কি বলে, কি করে, আর কি না এই দেরী ! বহু আগেই এটা বেরুন উচিত ছিল।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় মিশা। কিন্তু গুসারভ ঠাণ্ডা হয় না। তেমনি গরম

হয়ে বলে :

'এভাবে জীবন আর চলে না, অসম্ভব—বলে উদারপন্থী বুড়োরা এখনও চুপি চুপি কাৎরাচ্ছে। আমাদের এ জেনারেশনের মানুষদের বাবা সে-সব সমস্যা নাই। আমরা সব ঠিক ক'রে নিয়েছি। আমাদের জীবনযাত্রা কেমন হবে, কি তার লক্ষ্য —সব। কিছু নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।'

ক্লিম জিজ্ঞেস করে : 'আপনি কি মার্ক্সবাদী?'

এক চোখে একবার এর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় গুসারভ; একটা প্লেটের ওপর চোখ রেখে জবাব দেয় :

'এই পাঁচমিসেলী আর কি। ইতিহাসের মধ্যে অর্থনীতির ভূমিকাকেও স্বীকার করি; আবার ব্যক্তির ভূমিকাকেও অস্বীকার করি না। আর জড়বাদের কথা যদি বলো, তা যেমন খুশি তার ব্যাখ্যা করো। ও তো একটা দুঃখবাদী তত্ত্ব। কিন্তু আবহমান কাল থেকে বিপ্লব ঘটিয়েছে তো আশাবাদীরাই। সামাজিক আদর্শ একটা না থাকলে, মানুষকে ভালোবেসে দেওয়ানা না হতে পারলে কি আর বিপ্লব হয়? জড়বাদের মধ্যে সে আবেদন কোথায়? জড়বাদের সিনিসিজ্‌মুই অত্যন্ত শোচনীয়।'

কথাগুলো যেন কেমন বিষণ্ন। কিন্তু অনর্গল কথা বলছে গুসারভ। বলতে বলতে একবার মিশা, একবার সমভা, একবার ক্লিমের দিকে তাকায়। উচ্চারণে 'ও'র ওপর একটা অশোভন ঝোঁক। এ মানুষটার সঙ্গে তর্ক করা সুবুদ্ধির কাজ হবে না জেনেও অতি সন্তর্পনে ক্লিম জিজ্ঞেস করল : 'সিনিসিজম্‌ দিয়ে কি বোঝাতে চান।'

গুসারভ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে জবাব দিল :

'আমি তর্কের ধার ধারি না। আমার যা মত বলে দিয়েছি। এখন তোমরা তা রাখো আর ফেলো। আমার মতে সর্বপ্রথম স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ দরকার। তার-পর অন্য কথা।'

আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছে সমভা। ও যে এ লোকটার ওপর প্রসন্ন নয় তা ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মিশা কাকা চুলের কাঁটা দিয়ে নিবিস্ট মনে পাইপ পরিষ্কার করছেন বসে বসে। গুসারভ দুধ আর রাস্প-বেরী খাচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুত চলছে ওর মুখ আর হাত। খেতে খেতে মুখটা বিকৃত হয়ে উঠছে যেন ভিনিগার মুখে পড়েছে। ওর ওষ্ঠ দুটি উজ্জ্বল; মুখ আর ঘাড়ের বর্ণে নীরক্ত পাণ্ডুরতা, যেন পাউডারের প্রলেপ লাগান—ব্যতিক্রম শুধু যেখানে যেখানে দাঁড়কাকের পালকের মতো ঘন কালো নিবিড় কেশোদ্গম। পরনে তামাক রঙের স্যুট, অত্যন্ত আঁটো; নড়াচড়া করতে হয় অতি সন্তর্পণে। মাঝে মাঝে কড়া কলপের সার্টটা মচ্‌মচ্‌ ক'রে উঠছে। যখন তখন ওয়েস্ট-কোটের তলায় হাত গলিয়ে পাৎলুনের সাস্‌-পেণ্ডার ধরে টানাটানি করা ওর মুদ্রাদোষ। সার্টের কড়া ইস্ত্রি করা ছাতির ওপর সশব্দে গিয়ে পড়ে সাস্‌পেণ্ডারটা। ভরা দুই প্লেট্‌ রাস্পবেরী নিঃশেষ ক'রে, রুমাল দিয়ে ঠোঁট আর দাড়ি মুছে গুসারভ উঠে পড়ে। আয়নায় চেহারাটা দেখে নিয়ে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ বেরিয়ে যায় ভীষণ দেরী হয়ে গেছে ব'লে।

মিশা কাকা বলেন : 'বেশ ছেলেটি।'

সামঘিন মনে মনে ভাবে—বাপ্‌রে, কি তাড়া! কি এমন জরুরী কাজের ডাক! যেন প্রেম-করা মেয়েকে বিয়ে করতে এল; নয় তো বৌ গেছে পালিয়ে—এল তার পেছনে ধাওয়া ক'রে ইস্টিশন থেকে এইমাত্র—এসে পা দিল এখানে; জিনিসপত্রগুলি এক পলক দেখে নিয়েই তড়বড় ক'রে ছুটে পালাল বিয়ে করতে, বা বৌ খুঁজতে—

যাই হোক একটা।

একটু পরে মিশা কাকাও উঠে পড়ল। সামঘিনের সঙ্গে গভীর প্রীতিতে করমর্দন ক'রে, এক মুখ দিল-খোলা হাসি হেসে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে হেসে লুবাশাকে বলল :

'এত তাড়া কিসের রে?'

দরজা পর্যন্ত মিশাকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে লুবাশা বলল : 'চেনো নাকি মিশাকাকুকে?'

চেনে না সামঘিন...এমনভাবে ভ্রু-জোড়া কপালে তুলে তাকাল ও যার অর্থ—ও মানুষটার কথা আলোচনার এমন কি জরুরী দরকার এখন? তবু পরিচয় পেল —বাড়ি রঙ-করনেওয়ালা এক ঠিকাদারের উড়নচণ্ডী পুত্র গুসারভ; বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ত। তারপর কোন একসময়ে কাজান-এর পশু-চিকিৎসালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়। বছরখানেকের মধ্যেই সেখান থেকে তাড়া খায়। তারপর কিছুদিন রইল ভল্গা নদীর এক জাহাজের নাবিক হয়ে। বর্তমানে বেকার। কোন্ একটা কারখানায় ফোরম্যানের কাজের জন্য চেষ্টা করছে। পাবে বলে আশা করছে কাজটা।

'প্রচারের কাজে নাকি ওস্তাদ লোকটা। কিন্তু আমার ওকে একটুও ভালো লাগে না,' সমভা বলে : 'ভারী অভদ্রভাবে কথা বলে। আর দারুণ অহঙ্কার। কি রকম বড় বড় দাঁত দেখেছ? যেন একর্ডিয়নের চাবি।'

'কি রকম বোকা বোকা চেহারা না?' সামঘিন বলে।

'না গো না। বোকা-টোকা নয়। ও ওর গুমর। দরদী যদি কেউ থাকে তো সে দল্‌গানভ্। তোমার ভালো লাগেনি ওকে? কি বলবে ক্লিম! কত রকম লোকই যে আছে। জীবন...'

অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে সামঘিন :

'"...ছুঁড়ে ফেলে দেয় অযোগ্যকে; যে অনাবশ্যক তাকে আর যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় তাকে।"'

সমভাকে খানিকটা বকুনি দেবে ভেবেছিল ও—এতক্ষণে মাত্র তার ভূমিকা হলো। কিন্তু ততক্ষণে লুবাশা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠেছে।

'সর্বনাশ! কি ভীষণ দেরী হয়ে গেছে। সেই পেত্রভ্‌স্কী পার্কে যেতে হবে। আমি পালাই।'

দৌড়ে বেরিয়ে গেল ও। এক পাটি পলাতক চটি ছিট্‌কে পড়ল দোরগোড়ায়।

॥ ১০ ॥

সামঘিন পায়চারী করছে ঘরের মধ্যে। মা, ইনোকভ, স্পিভাকের কথা আবছা-ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে মনের মধ্যে। ওর কাছ থেকে বহু দূরে যেন সরে গেছেন তাঁরা। কোন আসঙ্গ নেই ওর এই মানুষগুলির প্রতি। ওই 'বিবৃতি'টাই ওক বড় চঞ্চল ক'রে তুলেছে। তাৎপর্য কি ওটার! সত্যি সত্যি একটা রাজনৈতিক দল কি সম্ভব—বাক্-সর্বস্ব, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত আর এনার্কিস্টদের দাবিয়ে বুদ্ধি-জীবীদের সংগঠিত করতে সমর্থ হবে, পরিচালিত করতে পারবে ছাত্রসমাজ এবং শ্রমিক-আন্দোলনকে! অহলে ওর একটা স্থান অবশ্যই হবে মার্জিত, কৃষ্টিবানদের সেই পার্টিতে। ক্লিম প্রেইস্-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। হিস্টোলিতা কাজিয়া জানাল মালিক বাড়ি নেই, বিদেশে গেছে। খানিকক্ষণ একটা রেস্তরাঁয় কাটিয়ে দিল; ঘণ্টা দুই বসে রইল একটা বাজে অপেরায়, বাড়ি ফিরল মাঝরাত গড়িয়ে গেলে। আনফিমিয়েভনার কাছে শুনল লুবাশা অনেকক্ষণ বাড়ি ফিরেছে। শুয়ে পড়েছে সে। ও-ও গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল—একটা অন্ধকার শূন্য হলের মঞ্চে বসে আছে ও। সেই শূন্যতার মধ্য থেকে একটা অশরীরী স্বর গুরুগম্ভীর স্বরে ওকে আদেশ করছে :

'ওঠ! ওঠ!'

কিন্তু উঠতে পারছে না ও জামা-কাপড়ের ভারে। তারপর স্বরটা একটা দমকা তুফানী হাওয়ার মতো আছড়ে পড়ে ওকে একেবারে কানের মধ্যে হাঁক দিয়ে উঠল :

'ওঠ! ওঠ বলছি!'

চমকে বিছানায় উঠে বসল ক্লিম।

'আপনার নাম?' জিজ্ঞেস করল একজন পুলিশ অফিসার। এবং একটু পেছনে সরে গিয়ে বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীর ইউনিফর্ম পরা যে লোকটি ছিল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। ওইদিকেই একটি অল্প-বয়স্ক সৈন্য একটা মোম-বাতি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারি আলো এসে পড়েছে সামঘিনের মুখে। খাবার ঘরে যাবার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন পুলিশ।

'আপনার নাম?' কঠোর স্বরে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে পুলেশ অফিসার। অফিসারটির বয়স বেশি নয়, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখ আর প্রদীপ্ত দুই চোখ। হাতড়াতে হাতড়াতে চশমাটা খুঁজে নিয়ে নামটা বলে সামঘিন।

'কি?' অবিশ্বাসের সুরে চিৎকার ক'রে ওঠে অফিসার। ক্লিমের পরিচয়-পত্র চায়। ক্লিম অনেকক্ষণ ধরে জ্যাকেটটার পকেট খোঁজাখুঁজি ক'রে কাগজগুলি পেল এবং গোছা ধরে সব অফিসারের হাতে তুলে দিল।

'আলো!' সৈন্যটিকে হুকুম করে কাগজপত্র খুলতে খুলতে। খাবার ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল। একটা শান্ত স্বর শোনা গেল :

'এই দিকে আসুন।'

লুবাশার দুঃসাহসী কণ্ঠের ঝঙ্কার বেজে উঠল :

'এ সব কি ব্যাপার জানতে পারি?'

'বাড়ি তল্লাসী হচ্ছে।' জবাব দিল সেই প্রশান্ত কণ্ঠ—'আপনিই কি ভারভারা আাত্রোপোভা ?'

'আমার নাম লুবভ সমভা।'

'এ ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন, তিনি কোথায় ?'

'আর এই বাড়ির মালিক ?' কে একজন ব'লে ওঠে মোটা গলায়।

'কি ?'

'এই বাড়ির মালিক—বলেইছি তো কস্ট্রোমায় গেছে।'

'আর কে থাকে এই ফ্ল্যাটে ?'

'আর কেউ না।' ঝেঁকে উঠে জবাব দেয় সমভা।

জামা-কাপড় পরতে পরতে সামঘিন লক্ষ্য করে যে পুলিশ অফিসার এবং বিচার-বিভাগীয় অফিসার নিজেদের মধ্যে কি যেন চোখের ইশারা করল। তারপর ক্লিমের কাগজপত্রের গোছাটা দিয়ে নিজের হাতের তেলোয় বাড়ি মেরে অফিসার বলল :

'আপনি কি বহু দিন আছেন এখানে ?'

'ফিনল্যান্ড থেকে সবে ফিরেছি। একদিনের জন্যই এখানে এসেছি।'

অফিসার ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে : 'কোত্থেকে ?'

'ভাইবর্গ থেকে। আরো কয়েক জায়গায়ও গিয়েছিলাম।'

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বিচার-বিভাগীয় অফিসার। গোঁফ পাকাতে পাকাতে খাবার ঘরে আসে। পুলিশ অফিসার একদিকে সরে গিয়ে ওই দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে বলে : 'এই দিকে।'

খাবার ঘরে টেবিলে বসেছিলেন খাটোমত আর একজন অফিসার। কালো মুখ, টিকলো নাক, মাথাজোড়া টাক। একেবারে চাঁছা-ছোলা সব, শুধু দুটি জায়গা ছাড়া। ব্রহ্মতালুর ওপর একটুখানি রুপোলী খোঁচা-খোঁচা চুল; এবং ওষ্ঠের ওপরও তেমনি। চেহারাটায় অফিসারী জলুষ নেই। ফ্রক-কোটটা পিঠের ওপর উঠে আছে। কলারটা ঘাড় ডিঙিয়ে মাথার ওপর পর্যন্ত উঠেছে। বসে বসে কি কতকগুলি কাগজপত্র দেখছিল। ক্লিম ঢুকতেই সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বলল :

'বেশ নাটকীয় ব্যাপার, কি বলেন ?'

নিজের মনেই বলতে লাগল টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে :

'কতকগুলি বক্তৃতার কপি দেখছি।'

গোমরা মুখে ডিভানের এক কোণে বসে রাগে ফুলছিল লুবাশা। চোখ তুলে একবার সেই দিকে তাকাল অফিসার। এমন সময় পুলিশ অফিসারটি ক্লিমের কাগজপত্র এনে টেবিলের উপর রাখল এবং অনেকক্ষণ ধরে প্রধানের কানে কানে কি যেন বলল। ইশারা ক'রে ওকে থামিয়ে দিয়ে ক্লিমকে জিজ্ঞেস করল প্রধান :

'ফিন্‌ল্যান্ড থেকে এসেছেন বললেন। কবে এসেছেন ?'

'আজ ভোরে।'

'তা, সেখানে কি করতে গিয়েছিলেন ?'

'বাবার শেষ কাজ করতে।'

প্রধান উঠে একটু কেশে ক্লিমের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। পেছন পেছন এল বিচার-বিভাগীয় কর্মচারী; এবং মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে গোঁফ টানতে টানতে তার পেছনে এল পুলিশ অফিসারটি। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল ওরা। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লিম ভাবতে লাগল :

'আমাকেও একদিন অমনি ক'রে বাড়ি তল্লাসীর সময় পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে

॥ ১০ ॥

সামঘিন পায়চারী করছে ঘরের মধ্যে। মা, ইনোকভ, স্পিভাকের কথা আবছা-ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে মনের মধ্যে। ওর কাছ থেকে বহু দূরে যেন সরে গেছেন তাঁরা। কোন আসঙ্গ নেই ওর এই মানুষগুলির প্রতি। ওই 'বিবৃতি'টাই ওক বড় চঞ্চল ক'রে তুলেছে। তাৎপর্য কি ওটার! সত্যি সত্যি একটা রাজনৈতিক দল কি সম্ভব—বাক্-সর্বস্ব, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত আর এনার্কিষ্টদের দাবিয়ে বুদ্ধি-জীবীদের সংগঠিত করতে সমর্থ হবে, পরিচালিত করতে পারবে ছাত্রসমাজ এবং শ্রমিক-আন্দোলনকে! তাহলে ওর একটা স্থান অবশ্যই হবে মার্জিত, কৃষ্টিবানদের সেই পার্টিতে। ক্লিম প্রেইস্-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। হিল্লোলিতা কাজিয়া জানাল মালিক বাড়ি নেই, বিদেশে গেছে। খানিকক্ষণ একটা রেস্তরাঁয় কাটিয়ে দিল; ঘণ্টা দুই বসে রইল একটা বাজে অপেরায়, বাড়ি ফিরল মাঝরাত গড়িয়ে গেলে। আনফিমিয়েভনার কাছে শুনল লুবাশা অনেকক্ষণ বাড়ি ফিরেছে। শুয়ে পড়েছে সে। ও-ও গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল—একটা অন্ধকার শূন্য হলের মধ্যে বসে আছে ও। সেই শূন্যতার মধ্য থেকে একটা অশরীরী স্বর গুরুগম্ভীর স্বরে ওকে আদেশ করছে :

'ওঠ! ওঠ!'

কিন্তু উঠতে পারছে না ও জামা-কাপড়ের ভারে। তারপর স্বরটা একটা দমকা তুফানী হাওয়ার মতো আছড়ে পড়ে ওকে একেবারে কানের মধ্যে হাঁক দিয়ে উঠল :

'ওঠ! ওঠ বলছি!'

চমকে বিছানায় উঠে বসল ক্লিম।

'আপনার নাম?' জিজ্ঞেস করল একজন পুলিশ অফিসার। এবং একটু পেছনে সরে গিয়ে বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীর ইউনিফর্ম পরা যে লোকটি ছিল, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। ওইদিকেই একটি অল্প-বয়স্ক সৈন্য একটা মোম-বাতি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারি আলো এসে পড়েছে সামঘিনের মুখে। খাবার ঘরে যাবার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল আরেকজন পুলিশ।

'আপনার নাম?' কঠোর স্বরে প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে পুলেশ অফিসার। অফিসারটির বয়স বেশি নয়, অস্বাভাবিক পাণ্ডুর মুখ আর প্রদীপ্ত দুই চোখ। হাতড়াতে হাতড়াতে চশমাটা খুঁজে নিয়ে নামটা বলে সামঘিন।

'কি?' অবিশ্বাসের সুরে চিৎকার ক'রে ওঠে অফিসার। ক্লিমের পরিচয়-পত্র চায়। ক্লিম অনেকক্ষণ ধরে জ্যাকেটটার পকেট খোঁজাখুঁজি ক'রে কাগজগুলি পেল এবং গোছা ধরে সব অফিসারের হাতে তুলে দিল।

'আলো!' সৈন্যটিকে হুকুম করে কাগজপত্র খুলতে খুলতে। খাবার ঘরে একটা আলো জ্বলে উঠল। একটা শান্ত স্বর শোনা গেল :

'এই দিকে আসুন।'

লুবাশার দুঃসাহসী কণ্ঠের ঝঙ্কার বেজে উঠল :

'এ সব কি ব্যাপার জানতে পারি?'

'বাড়ি তল্লাসী হচ্ছে।' জবাব দিল সেই প্রশান্ত কণ্ঠ—'আপনিই কি ভারভারা আঁত্রোপোভা?'

'আমার নাম লুবভ সমভা।'

'এ ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন, তিনি কোথায়?'

'আর এই বাড়ির মালিক?' কে একজন ব'লে ওঠে মোটা গলায়।

'কি?'

'এই বাড়ির মালিক—বলেইছি তো কস্ত্রোমায় গেছে।'

'আর কে থাকে এই ফ্ল্যাটে?'

'আর কেউ না।' ঝেঁকে উঠে জবাব দেয় সমভা।

জামা-কাপড় পরতে পরতে সামঘিন লক্ষ্য করে যে পুলিশ অফিসার এবং বিচার-বিভাগীয় অফিসার নিজেদের মধ্যে কি যেন চোখের ইশারা করল। তারপর ক্লিমের কাগজপত্রের গোছাটা দিয়ে নিজের হাতের তেলোয় ঝাড়ি মেরে অফিসার বলল:

'আপনি কি বহু দিন আছেন এখানে?'

'ফিনল্যান্ড থেকে সবে ফিরেছি। একদিনের জন্যই এখানে এসেছি।'

অফিসার ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে: 'কোত্থেকে?'

'ভাইবর্গ থেকে। আরো কয়েক জায়গায়ও গিয়েছিলাম।'

হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বিচার-বিভাগীয় অফিসার। গোঁফ পাকাতে পাকাতে খাবার ঘরে আসে। পুলিশ অফিসার একদিকে সরে গিয়ে ওই দিকে আঙুল নির্দেশ ক'রে বলে: 'এই দিকে।'

খাবার ঘরে টেবিলে বসেছিলেন খাটোমত আর একজন অফিসার। কালো মুখ, টিকলো নাক, মাথাজোড়া টাক। একেবারে চাঁছা-ছোলা সব, শুধু দুটি জায়গা ছাড়া। ব্রহ্মতালুর ওপর একটুখানি রুপোলী খোঁচা-খোঁচা চুল; এবং ওষ্ঠের ওপরও তেমনি। চেহারাটায় অফিসারী জলুষ নেই। ফ্রক-কোটটা পিঠের ওপর উঠে আছে। কলারটা ঘাড় ডিঙিয়ে মাথার ওপর পর্যন্ত উঠেছে। বসে বসে কি কতকগুলি কাগজপত্র দেখছিল। ক্লিম ঢুকতেই সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বলল:

'বেশ নাটকীয় ব্যাপার, কি বলেন?'

নিজের মনেই বলতে লাগল টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে:

'কতকগুলি বক্তৃতার কপি দেখছি।'

গোমরা মুখে ডিভানের এক কোণে বসে রাগে ফুলছিল লুবাশা। চোখ তুলে একবার সেই দিকে তাকাল অফিসার। এমন সময় পুলিশ অফিসারটি ক্লিমের কাগজপত্র এনে টেবিলের উপর রাখল এবং অনেকক্ষণ ধরে প্রধানের কানে কানে কি যেন বলল। ইশারা ক'রে ওকে থামিয়ে দিয়ে ক্লিমকে জিজ্ঞেস করল প্রধান:

'ফিন্‌ল্যান্ড থেকে এসেছেন বললেন। কবে এসেছেন?'

'আজ ভোরে।'

'তা, সেখানে কি করতে গিয়েছিলেন?'

'বাবার শেষ কাজ করতে।'

প্রধান উঠে একটু কেশে ক্লিমের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। পেছন পেছন এল বিচার-বিভাগীয় কর্মচারী; এবং মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে গোঁফ টানতে টানতে তার পেছনে এল পুলিশ অফিসারটি। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল ওরা। বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লিম ভাবতে লাগল:

'আমাকেও একদিন অমনি ক'রে বাড়ি তল্লাসীর সময় পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে

ঘুরতে হবে মুখে অমনি বাঁকা হাসি টেনে।'

যাই হোক তল্লাসীর হেতু যে ও নয় একথা বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে এল; ঝিমিয়ে এল আধা-ঘুমের আচ্ছন্নতায়। হাতের তলোয়ারকে দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজে লাল টুকটুকে হাত দুখানাকে তার কাঁধের ওপর রেখে দরজায় বসেছিল আর একজন পুলিশ কর্মচারী। সাক্ষী হিসেবে সাধারণ দু'জন ভদ্রলোকও এসেছেন। তাঁরা স্থির হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে পাষাণ-প্রতিমার মতো। পুলিশের তাণ্ডব চলছে ঘরে ঘরে। শুকতলার পেরেক মেজেতে লেগে একটা ধাতব শব্দ উঠছে। আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন ক'রে দেখছে ওরা। আসবাবপত্রগুলি টেনে হিঁচড়ে, দেয়ালে টাঙ্গান ছবি গুলো অবধি পেড়ে নামিয়ে রীতিমত লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলল ওরা। সামঘিনের অবশ্য এ হেন ব্যাপার মোটেই নতুন নয়।

দুত্তোর ছাই—বলে লুবাশা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। সামঘিন একটু সরে গিয়ে বসল। আবার চেঁচিয়ে উঠল লুবাশা—একেবারে পুরোদস্তুর হুকুম :

'ওহে পুলিশ মশাই, শুনছ? কর্তাদের বলগে যাও আমার তেষ্টা পেয়েছে।'

পুলিশটির কোন অঙ্গ এতটুকু নড়ল না। তেমনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পেছনে যে ছিল তাকে বলল :

'বলে দাও তো, পেত্রভ।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আনফিমিয়েভনা একটা ট্রেতে ক'রে এক বোতল জল নিয়ে এল। সমভা বোতলটা বেশ উঁচু ক'রে ধরে জল ঢালতে লাগল। ক্লিম বেশ শুনতে পাচ্ছে জল ঢালার শব্দের আড়ালে কি যেন বলছে ও। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল ক্লিম। কি জানি আজ কি সর্বনাশ ঘটাবে মেয়েটা!

দরজায় দাঁড়ান প্রহরীটি জিজ্ঞেস করল :

'এখানে কোথাও টেলিফোন আছে?'

'আজ্ঞে না।' ব'লে জবাব দিতে গেল পুলিশটি। কিন্তু ওর মুখ থেকে কথা বেরুবার আগেই সমভা হেঁকে উঠল :

'খুঁজে দেখগে না বাপু।'

সাক্ষীরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আনফিমিয়েভনা যাবার সময় হুড়-মুড় ক'রে তাদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল, যেন দেখতেই পায়নি।

'চোখের মাথা খেয়েছে সব। দেখতে পাচ্ছ না ট্রে-ভরা বাসন নিয়ে যাচ্ছি।' গর্জন করে উঠল আন্‌ফিমিয়েভ্‌না যদিও ট্রে'র ওপর একখানা প্লেটও ছিল না।

এবারে খাবার ঘরে প্রবেশ করল টাক-মাথা প্রধান এবং সরকারী জেলা এটর্ণী। ওদের মুখ দেখে মনে হয় দু'জনে যেন ঝগড়া করেছে। প্রধান টেবিলে বসে কি যেন লিখত লাগল। এটর্ণী ভদ্রলোক জানালার কাছে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। লুবাশার কাছে গিয়ে প্রধান বলল :

'আপনি তৈরি হয়ে নিন দয়া ক'রে।'

অত্যন্ত স্থির ভঙ্গিতে লুবাশা উঠে ঘরে চলে গেল।

ক্লিমের জন্য অনুরূপ আদেশ হলো।

অবাক হয়ে গেল ক্লিম। ও ভাবতেই পারেনি যে ওকেও যেতে হবে।



ঘণ্টা দেড়েক পরের কথা। সামঘিন চলেছে রাস্তা দিয়ে, ওর সামনে টলে টলে চলেছে সাক্ষীদের একজন; জ্বতোর লোহার কাঁটা বাজিয়ে পেছনে চলেছে একজন প্বলিশ। প্বে আকাশের কালোটা ফিকে হয়ে এসেছে। আসন্ন প্রভাতের বার্তা এসে পোঁছেছে। কিন্তু ঘ্বমন্ত শহরটির অঙ্গে তখনও একটা কবোষ্ণ থম্থমে আঁধার জড়ান। অত্যন্ত স্থির শান্তভাবে চলেছে ক্লিম। যদিও এই জনহীন শ্বন্য রাস্তায় এমনি ভাবে ঐ লোকটার পেছনে পেছনে চলতে ভারী বিশ্রী লাগছিল ওর। পকেটে হাতদ্বটো ঢ্বকিয়ে বোবার মতো নিঃশব্দে চলেছে লোকটা —মনে হচ্ছে ওর পা মাটিতে পড়ছে না; কোমরে হাতের ভর দিয়ে যেন শ্বন্যে ভেসে চলেছে ও। নিজের এই আশ্চর্য ধৈর্যের প্রশংসা না ক'রে পারছিল না সামঘিন।

মনে মনে ওর দ্বঢ় বিশ্বাস ওকে ভুল করে ধরা হয়েছে। বিশ্বাসটা সমর্থন পেয়েছে সরকারী জেলা-এটর্ণীর ব্যবহারে। কিন্তু ধরা পড়ে বেশ গর্বিত বোধ করছিল ও। মনে মনে বলল—তাহলে শ্রীঘরে ডাক পড়ল এবার। এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে চলছে ওরা। এমনি একটা গলিতে সামঘিনের প্রায় সামনেই একটা বাড়ির দরজা খ্বলে গেল। বিরাট একটা ট্বপী মাথায়, এবং ধ্বসর রঙের কোট গায়ে জনৈকা মহিলা বেরিয়ে এলেন। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে যেতে একটা গলা শোনা গেল : 'তাহলে ভুলবেন না কিন্তু, লক্ষ্মীটী।'

মান্বষটাকে দেখা গেল না।

স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এল ক্লিমের দিকে। ক্লিম এক দিকে সরে গেল। চিনতে পারল লিউতভেরই প্বরোনো পরিচিতা। মহিলাও চিনতে পারল ওকে।

'বোঝা যাচ্ছে কাল সবাই জানতে পারবে আমি গ্রেপ্তার হয়েছি।' গর্বে ব্বক ফ্বলে উঠল ক্লিমের। মনে মনে জল্পনা চলতে লাগল :

'আচ্ছা, ওই লোকটা তো মহিলার সঙ্গে খ্বব অন্তরঙ্গ ভাষায় কথা কইল না তুমি তুমি ক'রে। তাহলে প্রেমঘটিত কিছ্ব নয়; নিশ্চয় গ্বপ্ত দলের কোন সংকেত।'

ও ভেবেছিল ওকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু আশ্চর্য! তা না হয়ে ওকে নিয়ে এল প্বলিশ বিভাগের প্রশাসনিক দপ্তরে। মাটির নীচে ছোট্ট একটা কুঠ্বরী—একটা মাত্র জানালা, বাইরের দিকে মোটা লোহার গরাদ দেওয়া; জানালাটার নীচের অংশ দিয়ে দেখা যায় বাইরের পাঁচিলের রুক্ষ ইটগ্বলি; আর আকাশের ছোট একটা গোলাপী চৌক ট্বকরো।

'নতুন দ্বনিয়ায় এলাম তাহলে!' হাসতে হাসতে মনে মনে বলে ও। ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে। কোন রকমে কাপড় ছেড়ে একেবারে বিছানায় গিয়ে পড়ল। ঘ্বম ভাঙ্গল পরের দিন—উত্তাপের পরিমানে মনে হলো দ্বপ্বর। দেয়ালের রং ফেরান হয়েছে বহ্ববার কিন্তু বহ্ব হাতের বহ্ব লেখায় তা বিচিত্র হয়ে রয়েছে। চার দিকে কারবলিক আর ছ্যাৎলার গন্ধ। বোধ হয় ওর ঘ্বম ভাঙ্গার প্রতীক্ষায়ই ছিল সব—খ্বট্ করে দরজাটা খ্বলে গেল; একজন ব্বড়ো মতো সেপাই এসে ওকে হাত ম্বখ ধ্বতে বলে গেল। তারপর এল চা—ঠিক সরাইখানায় যেমনি করে দেয়—দ্বটো চা-দানী, আধখানা ফরাসী রুটি, এক ট্বকরো লেব্ব, আর চার খণ্ড চিনি। চা খেয়ে ও প্রতীক্ষা করতে লাগল

জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য এবার বুঝি ওর ডাক আসবে। কিন্তু কোথায় কি? কোন ডাক এল না। যাই হোক দেখাই যাক। দুপুরবেলা কোন একটা রেস্তরাঁ থেকে এল খাবার—ঠাণ্ডা হলেও রান্না ভালো। প্রথম দিনটা চলে গেল বেশ তাড়াতাড়িই কিন্তু দ্বিতীয় দিনটা যেন বড় লম্বা মনে হলো, তৃতীয় দিনটা আরো। এমনি ভাবে পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার সমস্ত নৈসর্গিক নিয়মকে অতিক্রম ক'রে দিনগুলো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে চলল। বেড়ে উঠতে লাগল অবসাদ, তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল আত্মার মধ্যে একটা সব-খোয়ান রিক্ততার অনুভূতি। সেই শূন্যতার বোধ থেকে এল এক তীব্র ক্রোধের জ্বালা যা দিনে দিনে বেড়েই চলল। এক আশ্রমিক নৈঃশব্দে সারা বাড়িখানা স্বব্ধ—কদাচিত এক-আধবার দরজার ওধারে জুতোর কাঁটার গা-শিরশির-করা শব্দ বেজে বেজে ওঠে, আর শোনা যায় কাদের যেন বিক্ষুব্ধ কণ্ঠ। একবার কে যেন তিরস্কার ক'রে উঠল কাকে :

এমনি ক'রে দশ দিন চলে গেল। এগার দিনের দিন কে একজন দরজা

'না অসিলিন নয়, ওসিনিন। কি বলছি শুনছ? ওরা।'

খুলে ঘরে ঢুকল। ভাল করে তাকিয়ে দেখল ক্রিম অজস্র পদক শোভিত এক সার্জেণ্ট।

ক্রুর দৃষ্টিতে ওকে নিরীক্ষণ করছে। কিছুক্ষণ পর বিরাট একটা সোনার পদক দাড়ির তলা থেকে বের ক'রে ঠিক করতে করতে হুকুম দিল :

'এই যে এই দিকে আসুন।'



মিনিট খানেকের মধ্যেই ওরা বড় অফিসারের পড়ার ঘরে এল। অফিসারের মুখোমুখি ডেস্কের সামনে আলোর দিকে মুখ ক'রে বসল সামঘিন। বসে বসে ভাবতে লাগল—আবার সেই রাতের পুনরাবৃত্তি।

এ ঘরখানার সজ্জায় কর্ণেল পপোভ-এর স্টাডির মতো ঘরোয়া মেজাজ নেই। এর পরিবেশের মধ্যে অনেক খানি বেশী গাম্ভীর্য, আর কড়া আধুনিকতা। খানা-তল্লাসী করবার জন্য যে অফিসারটি গিয়েছিল, এ ব্যক্তি তার চাইতে অনেকখানি বেশী স্মার্ট। উত্তরের মানুষেরা ফর্সা। তারা বহুদিন দক্ষিণে থাকলে যেমন কালো হয়ে যায়, তেমনি শ্যামলা এর মুখের রং। চোখ দুটি ভারী স্বচ্ছ; চক্‌চক্‌ করছে—হয়তো খুশিতে। মানুষটাকে দেখে সামরিক বিভাগের লোক ব'লে একটুও মনে হলো না ক্রিমের। চেহারায় এতটুকুও জঙ্গী ছাপ খুঁজে পেল না ও। যাক্‌ ভালোই হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ও। ভদ্রলোকও অমায়িক ভাবেই আলাপ শুরু করলেন।

'খুব বিশ্রী লাগছে তো।'

'তাতো লাগছেই।' ক্রিম জবাব দেয়। 'কিন্তু আমাকে কেন...?'

ওর কথা শেষ হলো না। প্রসঙ্গান্তরে চললেন অফিসার :

'কি রকম গুমট্‌ চলছে দেখছেন? এক ফোঁটা যদি বৃষ্টি হয়। সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস আছে তো?'

হঠাৎ কনুই দুটো টেবিলে ঠেকিয়ে এক হাত দিয়ে আর এক হাতের আঙুল মোচড়াতে লাগলেন। তারপর অত্যন্ত চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন :

'আচ্ছা, ব্যাপার কি বলুন তো?'

কিছুই বুঝতে পারল না সামঘিন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ও-পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যা না পেয়ে জিজ্ঞেস করল :

'কিসের ব্যাপার?'

'এই আপনার!'

অফিসার মাথাটা পেছনের দিকে হেলিয়ে, পা দুটো ডেস্কের তলায় টান ক'রে দিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে আয়েস ক'রে বসলেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর একটু নাক টেনে একটু কেশে শান্ত ভাবে ধীরে ধীরে বোঝাতে লাগলেন।

'আপনার মায়ের লেখা কখানা চিঠি পড়লাম। অর্থাৎ পড়তে হলো। কি করি বলুন—কর্তব্য। আপনার লেখাও পড়েছি। অবশ্যি সব নয়। কিছু কিছু তবে সত্যি কথাই বলছি যা চাইছিলাম তা পেলাম না। ভারী আশ্চর্য লাগছে—যে মানুষটার মধ্যে এমন সুস্থ চিন্তা-ধারা, যে এত বোঝে, সে কি ক'রে শুধু একবার নয়, দুই-দুইবার পুলিশের হাতে পড়ে?'

সামঘিন হেসে ফেলে বলে : 'আপনি তা জানেন দেখছি।'

বলেই বুঝতে পারল ও উত্তরটা বেহিসেবী হয়ে গেছে। হাসাও ঠিক হয়নি।

'ঘটনাটাই না হয় জানি। কিন্তু তার উদ্দেশ্য? ওটাতো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনে।' বলে অফিসার পকেট থেকে হাত বের ক'রে টেবিল থেকে কাঁচিটা তুলে নিয়ে ওটা দিয়ে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করতে লাগলেন। এবং ভ্রূ কুঁচকে বলে যেতে লাগলেন :

'দেখুন আমি জানি আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ-কেউ ছাত্রদের শাসনের ব্যাপারে বাপ যেমন ক'রে ছেলেকে বোঝায় তেমনি ক'রে বুঝিয়ে ওদের পথে আনতে চেষ্টা করেন। কখনও নরম, কখনও গরম—অর্থাৎ কিনা—এক কথায়—ভাবুকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমি দেখুন সে পাত্রই নই।' উত্তেজিত হয়ে ওঠেন অফিসার। কাঁচিটাকে টেবিলের তলায় নিয়ে যেন ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ ক'রে নিজের রূঢ় কথা গুলোকেই কাটতে থাকেন। 'আমার কাজ হচ্ছে এ রাজ্যের শৃংখলা রক্ষা করা; যথেষ্ট নিষ্ঠা দিয়েই তা আমি ক'রে থাকি। নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গকারীদের আমি ছেড়ে দিনা। না, মশাই না। সত্যি ছাড়ি না। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। শাস্তি পাবার মতো কাজ করলে তার অপরাধ অনুসারে শাস্তি যাতে সে পায় তার জন্য আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা ক'রে থাকি। শুধু যেমন কর্ম তেমনি ফল কেন—মাঝে মাঝে একটু হিসেবের বাইরে গিয়ে একটু বেশ ক'রে ঝেড়ে দিলে ভারী উপকার হয়। বেশীটা অগ্রিম দাদন হিসেবে জমা থাকবে এবং ভবিষ্যতের লেনদেনের হিসেবের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেয়া যেতে পারে।

সামঘিন সায় দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন মতে সামলে নিয়ে বলল : 'বুঝতে পারলাম।'

খুব জোরে খটাস্ ক'রে কাঁচিটা বন্ধ ক'রে ডেস্কের ওপর ছুঁড়ে দিলেন অফিসার। তাঁর চোখ দুটো যেন তাদের সীমা-বন্ধনী ভেঙ্গে চুড়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল এবং চ্যাপ্টা দেখাতে লাগল।

'আচ্ছা দেখুন, এই রাজনৈতিক-সন্দেহভাজনদের ওপর তো আপনি মোটেই প্রসন্ন নন দেখছি। অথচ তাদের সঙ্গে মিশে কেন যে নিজের বিপদ ডেকে আনছেন তা আমি বুঝতে পারছি না।'

তীক্ষ্ণভাবে অফিসারের দিকে তাকিয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সামঘিন বলে :

'আমার লেখার মধ্যে তার কোন প্রমাণ নিশ্চয়ই পাননি।'

'কিসের প্রমাণ পাই নি বললেন?' অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

ক্লিম জবাব দিল না। মানুষের উদ্দেশ্যের প্রতি যে সহজাত অবিশ্বাস ধীরে ধীরে ওর মনে পুষ্টি লাভ করেছে, তারই বলে বুঝতে পারল নিজেকে যতটা সাংঘাতিক বলে পরিচয় দিতে চেষ্টা করছে লোকটা ততটা সাংঘাতিক নয়।

'নিশ্চয়ই মানুষের চোখে ধুলো দেবার জন্য এসব নোট লিখে রাখেন নি।' বলে উঠলেন অফিসার। 'রাজনীতিবাজদের সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা-মূলক সুর বেশ স্পষ্ট আপনার লেখায়। আর নাম-টাম লেখেন নি বটে, কিন্তু আমি জানি আপনি মারাকুয়েভের আড্ডায় যেতেন...।'

'তাই বলে একথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না যে আমি ঐ দলের সভ্য, বা আমার মতবাদ...'

'দেখুন, বহু কিছু খবর রাখি আপনার সম্বন্ধে। হয় তো সব খবরই রাখি।' ওকে বাধা দিয়ে অফিসার বলেন। আবার বুঝি একটা বাজে কথা বলে ফেলেছে সামঘিন, ওকে থামিয়ে দেওয়াতে অফিসারের ওপর খুশিই হলো ও। সামঘিন লক্ষ্য করে ক্ষণে ক্ষণে মুখের ভাব বদলায় ভদ্রলোকের, যেন মুখের পেশী-গুলো অস্থির বদলে উপাস্থির সঙ্গে সংযুক্ত। সমস্ত মুখটা অন্ধকার হতে হতে ছুঁচল হয়ে যেন নাকে পর্যবসিত হয়েছে। অতি গম্ভীর কঠোর চোখ দুটির জন্যই বুঝি মুখখানার অবয়াবিক পরিচয় মুছে যায় নি।

'এবং ওই টুকুর জন্যই আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া বন্ধ, মস্কোতে থাকা—সব বন্ধ হয়ে, পুলিশের নজর-বন্দী হয়ে বাড়ি গিয়ে বসে থাকতে হতে পারে।'

বলে, একটু থেমে মুখের মাংস-পেশী ও উপাস্থিগুলো একটু শিথিল ক'রে বড় বড় ক'রে তাকিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলেন। তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলেন :

'কিন্তু আমাদের সরকার বড় সদাশয়। মানুষকে পঙ্গু ক'রে দিয়ে অক্ষমের সংখ্যা বৃদ্ধি ক'রে নিজেদের ব্যর্থতায় যাদের জীবন এমনিতেই বিষিয়ে আছে তাদের দল ভারী করতে চান না সরকার। এই বিপ্লবীরা কি। তাদের প্রত্যেকটিই ওই দলের।

কাঁচিটা নাড়াচাড়া করতে করতে হাতের ছোট কাগজের টুক্‌রোটার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন :

'এই যে আপনি লিখেছেন—আমি যোদ্ধা, কিন্তু কোন শিবির ভুক্ত নই। এমন কি দুটির কোনটির মধ্যে দৈবাৎ অতিথি হিসেবেও থাকতে রাজী নই। অবশ্য আজকালকার দিনে তো তা সম্ভব নয়। আপনার লেখা এবং আরেক জায়গায় যেখানে অত্যন্ত দরদ দিয়ে কজলভের রাশিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান ও রাশিয়ার প্রতি তার গভীর ভালেবাসা সম্বন্ধে প্রশংসা ক'রে লিখেছেন—এ দুটো লেখা কিন্তু একেবারে বিপরীত। কিন্তু বৃদ্ধ কজলভ্‌-এর এমন দরদভরা ছবি আর কেউ আঁকতে পারেনি। ভালোবাসারও বিশ্বাসের মতোই কাজে না দেখিয়ে শুধু মুখের কথায় কোন দাম নেই।

আবার মুখটাকে ছুঁচল ক'রে স্নেহ-গদগদ স্বরে বলেন :

'না না, এবার ঠিক ক'রে নিন—আমরা না তারা ?'

'ঘটে যদি একটুও বুদ্ধি থাকে !' মনে মনে বলে সামঘিন।

'আমরা—মানে হলো বুঝলেন—যে-সব শক্তির দৌলতে রাশিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অমন গৌরবের স্থান পেয়েছে, এমন আভ্যন্তরীন সৌন্দর্য, এবং মৌলিক সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে—আমরা মানে সেই সব শক্তি।'

সেই রকম পিতৃসুলভ স্নেহে গদগদ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে কৃষি-ব্যাঙ্ক, মাইগ্রেশন বোর্ড, গির্জা পরিচালিত স্কুলের কার্য-কলাপ, শিল্পের ক্রমোন্নতি এবং শ্রমিকের ক্রম-বর্ধমান চাহিদা শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সরকারী মধ্যস্ততার

প্রয়োজনীয়তা—এবং কি ভাবে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ইতিমধ্যেই নাকি শ্রমিক-দের কাজের ঘণ্টা কমে গেছে, কারখানা-পরিদর্শন-ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে; স্বাস্থ্য ও বীমা ব্যবস্থার পরিকল্পনা চলছে—ইত্যাদি বিষয়ে অনেক ক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন।

'আমি জানি, সরকার অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে উঠতে কিছুতেই দেবেন না। কোন মতেই না।' ব'লে সামঘিনের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন :

'তাহলে সেই ব্যাপারটা?'

'আপনার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারছি না।' ক্লিম বলে। নিজেকে এ ব্যক্তির চাইতে অনেক বেশী চালাক মনে হয় ওর। এ জন্যই ওর বেশ ভালো লাগে লোকটাকে—ভালো লাগে ওঁর ঋজু ব্যবহার, ওঁর বিশ্বাস-নিষ্ঠতা—এমন কি ওঁর চেহারা। ওঁর দৃঢ়তা, ওঁর ভাবালুতা—সব ভালো লাগে।

'বুঝলেন না?' আবার জিজ্ঞেস করেন অফিসার। তাঁর চোখ দুটো আবার যেন চ্যাপ্টা হয়ে গেল। 'অতি সামান্য ব্যাপার। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে—আপনার সত্যিকার মতবাদ ও বিশ্বাসকে কাজে প্রকাশ করুন এবং আইন ও শৃংখলার সমর্থন ক'রে স্পষ্ট ভাষায় আপনার মত ব্যক্ত করুন।

ক্লিম এমন প্রস্তাব হবে তা আশা করতে পারেন নি। তবু বিশেষ চটল না বা ঘাবড়াল না। নিঃশব্দে হেসে একটুখানি কাঁধ ঝাঁকাল শুধু। অফিসার কাঁচিটার একটা ঝাঁকানি দিয়ে ডেস্কের ওপরকার কাগজ পত্রের স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এবং উঠে ওর দিকে ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন :

'আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আপনি আমাকে খবরাখবর এনে দেবেন...'

লাফিয়ে উঠল সামঘিন। অফিসার ব্যস্ত হয়ে বললেন :

'আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান—এ কি?'

'আপনি আমায় অপমান করছেন। গোয়েন্দাগিরি আমি করতে পারব না।' শান্ত স্থির স্বরে জবাব দেয় সামঘিন।

'আরে ছিঃ ছিঃ—' যেন একটু অসন্তুষ্টই হলেন অফিসার : 'আমি মোটেই সে-প্রস্তাব করি নি। কার সঙ্গে কথা বলছি তা আমি যেন জানি না! কি যে সব বলছেন! আচ্ছা, বলুন তো গোয়েন্দা আপনি কাকে বলেন? প্রত্যেকটি দূতাবাসে একজন ক'রে সামরিক সহকারী থাকে। আপনি কি তাকে গোয়েন্দা বলবেন? মিজ্‌কেভিক-এর সেই যে কবিতাটা—"কন্‌রাদ ভালেনরদ্‌"—পড়েছেন ওটা? আর—' অত্যন্ত দ্রুত ভাবে বলেন : 'আপনাকে তো চাকরি করতে বলছি না। শুধু আপনার সহযোগিতা চাইছি। আপনার নিজস্ব যা মত, সেদিক থেকেই।'

ব'সে প'ড়ে সুদক্ষ নরসুন্দরের মতো ক'রে কাঁচিটা নাড়তে নাড়তে কোমল শান্ত স্বরে বলেন :

'আমরা এমন কয়েক জন শিক্ষিত লোক চাই যাঁরা বিপ্লবী-চিন্তাধারার গতি-প্রকৃতি জানেন। খেয়াল রাখবেন, আমি শুধু চিন্তা-ধারার কথাই বলছি। আইন-শৃংখলা বিরোধীদের দমনের জন্য এই ধরনের সংবাদ-দাতাদের যত না দরকার, তার চেয়ে বেশী দরকার এই জন্য যে আমরা চাই—দেশে ন্যায়ের শাসন বজায় থাকে, কোন ভুল ভ্রান্তি না ঘটে, আর ছাগলগুলোর কাছ থেকে ভেড়া গুলোকে যাতে দূরে রাখা যায়। এই ছাত্র-আন্দোলনের কথাই ধরুন না—কত কাঁচা বয়সের ছেলেকে যে ভুগতে হয়েছে—'

সামঘিন বসেই পড়েছিল। সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল ও। ওর পা কাঁপতে লাগল। ও বসে বসে শুনতে লাগল—অফিসার বক্‌বক্‌ ক'রে যেতে লাগল : 'বিবৃতির

কথা, নারোদনিকদের কথা—তারা যে দেশে নিজেদের নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে—এবং সঠিক খবর না পেলে আসল ব্যাপারটা যে কি—তাদের কতটাই বা মুখের আস্ফালন এবং কতটাই বা তারা কাজে করছে এসব যে কিছুই বোঝার উপায় নাই; কাজেই দেশের তরুণদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে তাকিয়ে ওই লোকগুলোকে বেশ ভালো ক'রে সব সমঝে দেওয়া দরকার, কারণ কাঁচা বয়সের ছেলেগুলো উৎসাহে আর উচ্ছ্বাসে টগ্‌বগ্‌ করছে। কিন্তু মনের জোর নেই, রাজনীতির ক-অক্ষরের জ্ঞান নেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আচ্ছা—তাহলে বলুন এবার কি বলছেন।'

প্রশ্নটা যেন অফিসারের জিভের ডগায় লেগে ছিল। যতটা সম্ভব শান্ত ভাবেই জবাব দেয় ক্লিম :

'দেখুন, আমার দ্বারা হবে না।'

'ঠিক বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু হেসে মাথা নেড়ে উঠে পড়েন অফিসার।

'আপনার এত অনিচ্ছা কেন তা আর জিজ্ঞেস করতে চাইনে। কিন্তু সত্যি বলছি, ও আপনার মনের কথা নয়। আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিনে। আমি যে পথ বাত্‌লে দিলাম, তা হচ্ছে—দেশের সেবার ও দেশের জন্য ত্যাগের পথ—এবং ওই হচ্ছে আপনারও পথ। ভেবে দেখুন—সেবা আর ত্যাগ।' ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করেন অফিসার কথাগুলো। 'আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন এখন, আপনি—মুক্ত—তবে মস্কোর বাইরে যেতে পারবেন না। এটা অল্প দিনের জন্যই। আপনি মস্কোর বাইরে যাবেন না এই মর্মে আপনাকে দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া উচিত হলেও আমি তা চাই নে। আপনার কথাই যথেষ্ট। তাহ'লে এই ঠিক রইল তো—আপনি মস্কোতেই থাকবেন!"

'হ্যাঁ।' একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ক্লিম।

'হ্যাঁ, আপনার এই সব কাগজপত্র—কিছু কিছু নিয়ে যেতে পারেন। আপনি আঁদ্রোপোভার বাসায় থাকছেন তো? ভালো কথা লুবা সমভার সঙ্গে আপনার অনেক দিনের পরিচয় বুঝি?'

'সেই ছোট বেলা থেকে।'

'আচ্ছা, মানুষটা কেমন বলুন তো।'

'মনটা—ভারী নরম।' একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দেয় ক্লিম।

'ও! আচ্ছা, আসুন তাহলে। নমস্কার।' ব'লে হাত বাড়িয়ে দেন অফিসার। একটা কঠিন বলিষ্ঠ হাতের সবল পেষণ অনুভব করে ক্লিম।

'একবার ভালো করে ভেবে দেখবেন ক্লিম ইভানিচ্‌। নির্ভয়ে ভাবুন, স্বদেশের প্রতি দরদ দিয়ে ভাবুন।' উপদেশ দেন অফিসার। ওঁর কণ্ঠস্বরে ক্লিম যেন একটা আন্তরিক সহানুভূতির আভাস পায়।



পথ বেয়ে চলেছে ক্লিম। মাথা নীচু ক'রে হাঁটছে—যেন একবার আঘাত পেয়ে মাথাটা আরেকটা আঘাতের প্রতীক্ষায় আছে। দিনটা গরম। একটা ভ্যাপ্‌সানো গরম হাওয়া শহরের ওপর দিয়ে হু হু ক'রে বইছে ধুলোর ফাগ উড়িয়ে। জেলের সেই জমাদারটার কথা মনে পড়ছে ক্লিমের—ইচ্ছে ক'রে কয়েদীদের গায়ে ধুলো

উড়িয়ে দিত ঝাঁট দেবার সময়। আর মনে পড়ছে একজন কয়েদীর কথা—'ল্যাজারাস্-এর পুনরুত্থান হয়েছে' বলে চিৎকার করত সে। চিৎকারটা ওর মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ফিরছে।

ক্লিমের মনে হয় মৃতের পুনরুত্থান সম্পর্কে খৃষ্টীয় ধর্মোপখ্যানগুলি যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ওগুলি না ছোঁয় মনকে, না হৃদয়কে। গৃহ-শীর্ষের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে মেঘের দল। মস্কো নদীর ওপর দিয়ে নীল বজ্ররেখায় ঝলক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। শহরের কোলাহল ছিন্ন ক'রে উঠবে বজ্র-নির্ঘোষ—কান পেতে থাকে ও সেই বজ্র-নির্ঘোষ শুনবে বলে। কিন্তু বৃথাই কান পাতা। বজ্র বুঝি মেঘের জালে বাঁধা পড়েছে। ওর চারদিকে চলমান জনসমুদ্র। কখনও ওকে ধাক্কা দিয়ে, কখনও ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে তারা। ভিড় এড়াবার জন্য ও গির্জার মাঠে নেমে প'ড়ে একটা বেঞ্চিতে এসে বসে। চিন্তাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠার অবকাশ পেয়ে প্রথমেই ওর মনে প্রশ্ন জাগে—অত ভয় পাবার মত কি ছিল ওই পুলিশ অফিসারের মধ্যে? হয়তো ও আগেই বুঝতে পেরেছিল লোকটা ওর কাছে গোয়েন্দাগিরি করার প্রস্তাব করবে। ওই হীন প্রস্তাবেই যে ভয় পেয়েছিল তা নয়, অন্য কোন কারণ ছিল। অবশ্য পুলিশ অফিসার ওই প্রস্তাবটা করেছেন—ওর লেখাগুলো থেকে ও রকম একটা ধারণা ক'রে নেওয়া অযৌক্তিক নয় তাঁর পক্ষে। নিজের মনে এ স্বীকার করতেই হয় নিজেকে। পকেটের কাগজগুলোতে হাত ঠেকে যেতেই ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে: এগুলো এবার পুড়িয়ে ফেলব। আর লেখা নয়। বাস্, এই শেষ। চিন্তাগুলো বিস্রস্ত, একটা নামহীন অবসাদের গায়ে গিয়ে আছড়ে মরছে। দু'টি মেয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে। ওর দিকে তাকিয়ে একজন আর একজনকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিয়ে কানে কানে কি যেন বলল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় জন ওর দিকে তাকিয়ে কি দেখল। এবং দু'জনেরই গতি শিথিল হয়ে এল।

'নির্বোধ কোথাকার। আমি কি আত্মহত্যার লাশ? তবে নিশ্চয় আমার মুখটা খুব সাঙ্ঘাতিক দেখাচ্ছে।'

'উঠে প'ড়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় ক্লিম। যেতে যেতে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়:

'অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি বৈকি—যে কোন মার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষই মর্মাহত হবে।'

ওর মনে সংশয় জাগে, এ সান্ত্বনার প্রয়োজন কি? এ তো যেন বিপরীত সাক্ষ্যই দিচ্ছে। হয়তো গোয়েন্দা হবার প্রস্তাব ওর একটুও খারাপ লাগেনি। সন্দেহটা চাপা দেবার জন্য ও তাড়াতাড়ি একটা যুক্তি খাড়া করে:

'একটা মতামত থাকা মানেই যদি তা কাজেও করা বোঝায়, তাহ'লে তো শোপেনহাওয়ার আর হার্টমান-এর আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। লেনো, লেপাদি—'

কিন্তু বুঝতে পেরেছে সামঘিন, গোয়েন্দা হবার প্রস্তাবে অপমান বোধ না হওয়াটাই ওর আসল ভয়ের কারণ ছিল। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে ও, ঘটনাটা ভুলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'আমি নিজেই নিজের কুৎসা করছি।' ও ভাবে: 'আর ওই কর্নেল না ক্যাপটেন কে জানে—ওটা একটা মূর্খ! অসভ্য কোথাকার! ত্যাগ! না আরো কিছু! লুবাশার বিরুদ্ধে যাবো? হুঃ। মূর্খ কোথাকার।'

ধীরে ধীরে হাঁটে ও। সারা দেহ ঘামে ভিজে ওঠে। গলা মুখ শুকিয়ে তেঁতো হয়ে ওঠে।

ওকে দেখে আনন্দে আনফিমিয়েভনার মুখে কথা সরে না। কি যে করবে ও ঠিক পায় না।

'ও মা! ছাড়া পেয়েছ তুমি! ভগবান আছেন যে! কি যে ভয়ে ভয়ে ছিলাম —মারাকুয়েভের মতো তোমারও বুঝি ওরা অনেক দিন আটকে রেখে দেবে।'

ক্রুশের মুদ্রা এ'কে, চোখের জল মুছে সন্তর্পণে বসে ও চুপি চুপি বলে :

'লুবাশা, লুবাশা কেমন আছে? দেখ দিকিন্ কি ঝঞ্ঝাট বাধাল। ওই ধিঙিপনা করেই না এমনটা হলো। মানিকের টুকরো সব কাঁচ কাঁচ ছেলেমেয়েগুলো মানুষের জন্য বেগার খাটতে গিয়ে কি সর্বনাশটা তোমরা করছ নিজের বলতো!'

স্টীম ইঞ্জিনের মতো ভোঁস ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জামার হাত গুটিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে আনফিমিয়েভনা :

'সেই তোমায় নিয়ে গেল—তার পরে তো বেরুলাম। যেন বাজারে যাচ্ছি এমনি ভাবে বাজারের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে গেলাম সীমিওঁ ভাসিলিচ্ আর আলেক্সি সীমিওনিচ্-এর ওখানে। বলে এলাম সব বৃত্তান্ত। সেইদিনই তানিয়াকে পাঠিয়ে দিলাম কস্ত্রোমায়, ভারভারা কেমন আছে দেখতে।'

আর একবার একটু চোখের জল ফেলল ও। মুখখানা আশ্চর্য রকম মসৃণ— বয়সের কোন চিহ্ন তাতে পড়েনি। উঠে পড়ে আনফিমিয়েভনা। জিজ্ঞেস করে : 'খাবে নাকি কিছু? একটু চা?'

কিছু খাবার ইচ্ছে ছিল না সামঘিনের। কিন্তু তবুও আনফিমিয়েভনার পেছন পেছন রান্নাঘরে চলে এল ও।

'এই কাগজগুলো পোড়াতে হবে।'

'দাও আমার কাছে, পুড়িয়ে ফেলি।'

উনুনে পুড়ে ছাই হতে লাগল লেখাগুলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ক্লিম। ছাইগুলো ময়লা ফেলার ঝুরিতে ফেলে দিয়ে আনফিমিয়েভনা ঝাঁটা দিয়ে ঘেঁটে গুঁড়িয়ে দিল। ভারী বিরক্ত বোধ হতে লাগল সামঘিনের। গলার কাছে ড্যালা পাকিয়ে উঠতে লাগল মৃগী-রোগীর মতো। ওর চিৎকার ক'রে গাল দিতে ইচ্ছে করতে লাগল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারী করল উদভ্রান্তের মতো। দেয়ালে টাঙান মহাজনদের ছবির নিষ্প্রাণ মুখগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে দেখতে লাগল। তারপর ঠিক করল ও একবার স্নান করবে।



ঘণ্টা দুই পরে। স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হয়ে টেবিলে এসে মায়ের কাছে চিঠি লিখছে ক্লিম। সামনে সামোভার ফুটছে টগ্‌বগ্ ক'রে। কলমের মুখে যেন কথা ফুটছে—যা আসছে তা বড় গম্ভীর বেদনান্ত। পর পর কয়েকখানা লিখে ছিঁড়ে কুটি কুটি ক'রে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে ও। পায়চারি করে ঘরময়। এক-এক বার দেয়ালের কারুকার্য আর টাঙান ফটোগুলির সামনে এসে দাঁড়ায়।

বেলিন্‌স্কীর ছবি। যক্ষ্মা-রোগীর মতো বিকীর্ণ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ও মনে মনে ভাবে : 'ত্যাগ ব্রত! যত সব!'

কে যেন হলের মধ্যে হেসে উঠল। 'যাক্‌গে কিছু মনে করো না গো মেয়ে। একটু অভ্যেস ক'রে নাও।' মস্কোর কিষাণদের ধরনে কে যেন কাকে বলে উঠল।

জনৈক যুবক এসে ঢুকল খাবারঘরে। ফাজিল ফাজিল চেহারা; অতি চমৎকার

মাথাভরা চুল, মসৃণ ক'রে আঁচড়ান। গায়ে ফ্লানেলের সার্ট, হাতে খড়ের টুপী, তার মধ্যে এক জোড়া দস্তানা পোরা।

'আলেক্সি সেমিনোভিচ গোঘিন,' হাসতে হাসতে আত্ম-পরিচিতি পেশ ক'রে, টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে টেবিলে এসে বসে আগন্তুক। দস্তানা জোড়া মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে গেল।

আনফিমিয়েভনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল।

'আরে থাকনা ওটা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন?'

আনফিমিয়েভনাকে লক্ষ্য ক'রে গোঘিন বলল, যদিও দস্তানার জন্য কিছু মাত্রও ব্যস্ত দেখা গেলনা আন্‌ফিমিয়েভনাকে। হাতদুটো পেটের ওপর আড়াআড়ি ক'রে রেখে সে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল।

ক্লিমের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পুরোনো বন্ধুর মতো অন্তরঙ্গ সুরে গোঘিন বলল :

'খুব তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে গেলেন দেখছি! কোন্ শনিটির হাতে পড়েছিলেন?'

গোঘিন্‌কে দেখে ক্লিমের মনে পড়ে যায় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনও এক অভিজাত আসবারের দোকানের একজন কর্মচারীর কথা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত মহিলা আসত দোকানে—যুবতী বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মুখ ভরা হাসি নিয়ে কথা কইত সে। এ লোকটিরও নীলচে চোখদুটিতে উপচে-পড়া সৌজন্যের প্রসন্নতা; এই খানেই ওর সঙ্গে দোকান-কর্মচারীর বিশেষ সাদৃশ্য। ছন্নছাড়া চাষী ছেলের মতো আত্মতৃপ্ত বোকাটে চেহারা গোঘিনের। এমনি অজস্র ব্যক্তিত্ব-হীন চেহারা ছড়িয়ে আছে চারদিকে—যাদের সহজেই ভুলে যায় মানুষ।

'তাই বলুন! কর্নেল ভাসিলিয়েভ্! বেটা মূর্তিমান শয়তান! মুখটা যেন ঠিক বেদেদের মতো। বেটাকে ঘোড়ার ব্যাপারী হলেই বেশী মানাত।'

'চেনেন নাকি আপনি?' ক্লিম জিজ্ঞেস করে।

'তা চিনি বৈকি! ওই তো আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়াল।' হ্রস্ব দৃষ্টি দিয়ে ক্লিমের দিকে তাকিয়ে কলোচ্ছ্বাসে হাসতে লাগল গোঘিন। ওর রোগা দেহটিতে হাসির শব্দটা মোটা মানুষের হাসির মতো গম্ গম্ করতে লাগল।

এই প্রগল্ভ লোকটাকে ছাত্র মনে করতে ওর মন সায় দেয় না। ক্লিম ভাবে কর্নেল ভাসিলিয়েভ-এর টিকটিকিরা নিশ্চয় ঠিক ওর মতো ব্যক্তিত্ব-হীন বৈশিষ্ট্য-হীন জীব।

'তা, শয়তানটা লুবাশার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞেস করল?'

'লুবাশার সম্বন্ধে? নাতো, কিছুই জিজ্ঞেস করেনি।'

'কিছু না?'

মাথা নাড়ে সামঘিন্।

'শুধু জানতে চাইল আমার সঙ্গে ওর কত দিনের পরিচয়।'

'বা-স্—! সোনালী গোঁফ জোড়া তা দিতে দিতে গোঘিন বলে। 'লুবাশা হচ্ছে আমার বাবার ভাগ্নী। বাবা ওকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করছেন।'

'লুবাশা তাহলে আপনার পিসতুত বোন্।' কতকটা নেহাৎ কথা বলার খাতিরে, কতকটা কৌতূহল বসে সামঘিন বলে। লুবাশার সঙ্গে এ লোকটির যেন সত্যি সাদৃশ্য আছে বলে ওর মনে হয়।

খুব সহজ ভাবে গোঘিন্ উত্তর দেয়।

'আরে না না। ও-সব কিছু নয়। আমি তো বাবার পালিত পুত্র। একটা

অনাথ আশ্রম থেকে আমাকে এনেছিলেন। জানেন, বাবাকে ভারী ভয় দেখাচ্ছে কর্তারা—মানে এই যারা রাজ-তখতের আর দেশের খবরদারী করেন। লুবাশা নাকি সাংঘাতিক মেয়ে, মস্ত বড় দেশ-দ্রোহী একজন। বাবার ভেতরে যেটুকু বা মায়া-দয়া ছিল ওর জন্য এসব শুনে তাতো ঠান্ডা মেরে দিচ্ছে। আমরা ভাবছিলাম আপনার কাছ থেকে জানা যাবে কিসের অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে। ওতো শুধু রেড্‌ক্রসের কাজ করে বলেই জানতাম।'

একটু রূঢ় ভাবে জবাব দেয় :

'ওসব খবর আমি রাখিনা।'

কিন্তু গোঘিনের ভ্রূক্ষেপ নেই। ও বলে চলে :

' ও তো নিজনী-নভগোরদ-এ ছিল। সেখানে থেকেই কোন গোলমাল পাকিয়ে আসেনি তো? আপনিও তো ওখানেই থাকেন, তাই না?'

'না।' প্রতিবাদ ক'রে ভারভারা সম্বন্ধে পাল্টা জিজ্ঞেস করে ওকে সামঘিন।

সামোভারের গায়ে ওর প্রতিচ্ছবি পড়েছে। সেই দিতে তাকিয়ে মুখভঙ্গি করতে করতে জবাব দেয় গোঘিন্ :

'আছে ভালোই। কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে লুবাশার ব্যাপারটা শুধু এখানকার পুলিশের কাজ নয়। আরো দূর থেকে আরম্ভ হয়েছে।'

সামঘিন শোনে, আর ভাবে—ও ঠিকই ধরেছে—লোকটাকে বাইরেই অমন সাদা-মাটা দেখালে হবে কি; আসল চেহারাটা কথায় বেরিয়ে পড়ছে। যত ভালোমানুষী চাল চালছেন, মশায় ততটা ভালোমানুষ নন। কথায় ঝাঁঝ আছে, অদ্ভুত ভাষা। লুবাশার সম্বন্ধে বলে : 'স্বয়ং-লাফানো চরিত্রের মানুষ।' পালক-পিতার সম্বন্ধে ওর মন্তব্যের ভাষা : 'লিবারেল মধ্যে ইথে যে করিছে বাস।' তারপর "রাশিয়ান রেকর্ডস্"-খানার ওপর সজোরে একটা কিল মেরে বলে :

'এই যুগে ভাই উদার নীতির কানাকড়ি ভাঙিগয়ে আর চলবে নি।'

লোকটা চাল-চলন ব্যবহারে একেবারেই বেহিসেবী। অত্যন্ত বেশী কথা বলে; ঠাট্টা-তামাশায় তীক্ষ্ম চাতুর্যের পরিচয় না থাকলেও মাঝে মাঝে বেশ বুদ্ধিমানের মতো কথা বেরয়। কথায় কথায় একবার সামঘিন বলে ফেলল : 'মানুষের বিপ্লবী মনোভাব বাড়ছে।' অত্যন্ত শান্তভাবে গোঘিন্ টিপ্পনী কাটল।

মানুষ কি আর সব সময়ে বেশ বুঝে-সুঝে বিশ্বাস নিয়ে কাজ করছে। কোন একটা ধারণা হয়ে গেল—বাস, ঐ নিয়েই কারবার। ধারণা আর বিশ্বাসে ফারাক করা ভারী মুস্কিল। ধারণা বিশ্বাসের জারজ মেয়ে কিনা?

গোঘিন চলে গেলে খুশি হলো সামঘিন। আনফিমিয়েভনাকে জিজ্ঞেস করল : 'লোকটা কে বল তো?'

'ও মা! জান না? ওর বাবা সিমিওন ভাসিলিচ যে মস্কোর নাম-করা মানুষ!'

'কিসের নাম?'

'মস্ত বড় লোক! বাচ্চাদের জন্য একটা হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছেন।'

'ডাক্তার নাকি?'

'মা গো! কি যে বলে তার ঠিক নেই। ডাক্তার হবে কেন? নিজের কত বড় ব্যবসা!' যেন কতকটা আহত হয়েই জবাব দেয় আনফিমিয়েভনা।'



পরের দিন শ্রান্ত ক্লান্ত ধূলি ধূসর হয়ে এলেন মিশা কাকা। ওঁর স্বাভাবিক দাক্ষিণ্যের প্রসন্নতা নিয়ে সামঘিনের হাত নেড়ে আনফিমিয়েভনাকে বললেন :

'এক গেলাস জল দাও তো,—আর জ্যাম থাকলে একটু জ্যাম, নয়তো একটু চিনি এনো সঙ্গে।'

ক্লিমকে জানালেন লুবাশার সম্বন্ধে একটা ভালো খবর আছে। তারপর বললেন :

'লুবাশার বইগুলো একটু খুঁজে দেখতো হে—"ফিলসফি অফ্ মিসটিসিসম্" —ব'লে একখানা বই আছে কিনা। নামটা হয়তো ঠিক ক'রে বলতে পারলাম না। রহস্যবাদের আবার দর্শন কি হয় হে?'

সামঘিন দুপ্রেল্-এর লেখা মোটা বইখানা নিয়ে এলে বিস্ময় ও অসমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন :

'আছে হে, সত্যি ও-রকম দর্শন আছে, বিশ্বাস করবে!'

বইখানা খুলে এক চোখ বন্ধ ক'রে আর এক চোখ দিয়ে বই-এর পেছনের অংশের মলাটের ভেতরে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

'একটা লম্বা কিছু দেখি তো।'

'একটা পেন্সিল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওষুধের পুরিয়ার মতো ক'রে ভাঁজ-করা একটুকরো কাগজ বের করলেন। ওটা খুলে পড়ে বেশ খুশী হয়ে উঠলেন বোঝা গেল। কারণ মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল :

'এতেই প্রমাণ হয়ে গেল রহস্যের মধ্যেও দরকারী জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়।'

মিশা কাকার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও ভাবতে লাগল পঞ্চাশের কম হবে না এই মানুষটার বয়স। মানুষটার এতক্ষণের আচরণ, আর কিছুক্ষণ আগে হলে ওর ভারী বিশ্রী লাগত, ঐ বয়সের একটা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত হাস্যকর ও অশোভন বলে মনে হতো। কিন্তু কর্নেল ভাসিলিয়েভ-এর কথা মনে ক'রে আর বিশ্রী লাগল না। মিশা কাকার দিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই ওর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল না।

চিরকুট্‌টাকে পাকিয়ে বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চেপে ধরে মিশা কাকা বলেন :

'বাড়িটার পেছনে টিকটিকি লেগে নেই তো? খেয়াল করেছ?'

'কি জানি, চোখে তো পড়েনি।'

'টিকটিকি আবার থাকবে না!' ওঁর কথায় নিশ্চয়তার চেয়ে দাবীর সুরই যেন বেশী। তারপর চামচ দিয়ে গেলাসের বাকী জ্যামটুকু নিঃশেষ ক'রে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিলেন। মুখে একটা শ্লেষের আভাস ফুটে উঠল, যার জন্য ওই প্যাঁচার মতো মুখ খানাও অনেকটা সরস হয়ে উঠল। সামঘিন-এর বুকে খোঁচা মেরে মিশা কাকা বললেন :

'ব্যাপার কি হে তোমাদের? এদিকে "রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট্ দলের" বিবৃতি বার করলে, আবার ওদিকে আরও কড়া সুরে "শ্রমিকের ঝাণ্ডা"ও বার করছ ঐ দলের নাম দিয়ে। এ কি করে হলো?'

ক্লিম জানাল যে দুটোর কোনটাই সে এখনও দেখেনি।

'আচ্ছা!' ব'লে উঠলেন মিশা কাকা। ছোট ছোট কালো চোখ-জোড়া খুশিতে চক্‌চক্‌ করতে লাগল। 'এত তাড়া, যে নিজেদের মধ্যে একটু বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে এক মত হবে, সে সময়ও তোমাদের নেই?'

জানালা খুলে তাকিয়ে রইল সামঘিন। ধীর মন্থর গতিতে আঙিনা পার হয়ে চলেছেন মিশা কাকা—চড়ুই পাখীর মতো ছোট্ট এতটুকু একটু মানুষ; কোন্ মান্ধাতার আমলের ছ্যাৎলা-ধরা একটা টুপী মাথায়। ধাত্রী মিস্ গান্টার-এর রান্নাঘরের দোরে বসে একটা ছেলে ইঁট দিয়ে ঘষে ঘষে খাবার ছুরিগুলো পরিষ্কার করছে। থখ্ ক'রে খানিকটা থুথু ফেলে—থুথু দিয়েই ছুরিগুলো ঘষতে লাগল ছেলেটা। দেখে মনে মনে ভাবতে লাগল সামঘিন :

'জীবনই মানুষের চিরন্তন অমর্যাদা। কর্নেল নিশ্চয়ই আবার আমাকে স্পাই হবার জন্য খোঁচাবেন। কার কাছে বলি—একমাত্র কুতুজভের কাছেই বলা যায় এসব। সে-ই আমাকে বাঁচাতে পারে...'

আঙিনা থেকে সাবান আর চর্বির পচা গন্ধ আসছে। গুমট হাওয়া স্তব্ধ হয়ে আছে। হঠাৎ সেই ছেলেটা চিৎকার ক'রে উঠল—যেন আগুন লেগেছে। কিন্তু চিৎকার নয় ও—গান :

'কিসের দুঃখ, বন্ধু তোমার,
আঁধার কেন মুখ?
ওগো আমার পীতম—'

একটা লাল হাত রান্না ঘরের জানালা থেকে বেরিয়ে এসে গায়কের মাথায় এক জগ ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেটা চিৎকার ক'রে উঠনের ঐ দিকে পালিয়ে গেল।

'কর্নেল নিশ্চয় ভয় পেয়েছে, তাই—।'

ভাবতে ভাবতে ক্লিম দেখতে লাগল ভেজা ন্যাতা নিয়ে ঝি তাড়া করছে ছেলেটাকে আর ও উঠনের চার দিকে পরিত্রাহি ছুটছে। ভারী মজা লাগছে ক্লিমের। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা কোণঠাসা হয়ে ধপাস্ ক'রে ঝির পায়ের ওপর এসে পড়ল। তারপর খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে এক লাফে উঠে ছুটে একবারে রাস্তায়। এমন সময় রাস্তা থেকে গেটের মধ্যে এসে ঢুকল সেইণ্ট্ নিকোলাস্-এর মতো চেহারা-ওয়ালা দারোয়ান জাখার; ধমকে উঠল ঝিকে :

'ও কি হচ্ছে, মাশা! খেলতে হয় ওই পুঁচকে ছোঁড়ার সঙ্গে না খেলে জোয়ান মন্দ কাউকে খুঁজে নাও!'

'নেব বইকি। তোমার বলার জন্য আটকে থাকবে না।' ঝি জবাব দিল।



মন খারাপ হলেই সামঘিন ভারী ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কতক্ষণে আবার ও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কারণ, মন খারাপ হলে ও নিজের মৌলিকতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আজ ও আরো অস্থির হয়ে উঠল কি ক'রে মনটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে, কেন-না বেশ ক'দিন থেকে নিজেকে ওর কি রকম মনে হচ্ছে, যেন সামরিক বিভাগে ওর নাম লেখান হয়ে গেছে—ফিরে আসার আর কোন উপায় নাই। ও জানতেও পারেনি কখন যে একটু একটু ক'রে বিপ্লবী চিন্তাধারা ওর মনের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়েছে—ঠিক যেমন ক'রে হেমন্তের গতিহীন বৃষ্টি মানুষের

অভ্যাস হয়ে যায়; অভ্যাস হয়ে যায় অনভ্যস্ত স্থানীয় ভাষা। আর মনে পড়ে না—'ফের ইতরামো করেছ তো' বলে সেই ছোট্ট কুব্জা মেয়েটির গাল। কিন্তু ভোলেনি সেই কার যেন সংশয়ের কুণ্ঠা—সত্যি সত্যি কি ছিল একটি ছেলে? না, কোন ছেলেই বোধ হয় ছিল না...। ক্লিম-এর দৃঢ় বিশ্বাস নিজেকে ও এই কথাটা বোঝাতে পেরেছে। তাই ও উৎসাহিত হয়ে ওঠে ওর জীবনের যত প্রতিকূলতা সব নিজের পাঁকে ডুবে যাবে যেমন ক'রে ডুবেছে বরিস ভারাভ্কা। আর একই ভাবে প্রবাহিত হবে গভীর-শায়ী জীবন-প্রবাহ।

ভারভারার বাসায় এই তিনটি সপ্তাহ ওর একলা কাটল। এই সময়ের মধ্যে লুবাশার নতুন পরিচয় পেল ও। জানল যতটুকু ওরা জানত তার চেয়ে অনেক বৃহৎ ও গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লুবাশার। একদিন এক ফাশান-দুরস্ত মহিলা এলেন—মুখে অবগুণ্ঠন, হাতে লেসের ছত্রিকা। লুবাশার গ্রেপ্তারের কথা শুনে ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন, ভয় পেলেন। ছাতাটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে ভারী কাতর ভাবে বললেন :

'বহু দূর থেকে আসছি, ভিন্ন শহর থেকে। ওর কি কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবও নেই—আমার যে একটু দেখা করা বড় দরকার!'

'ঘনিষ্ঠ' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিলেন মহিলা। আলেক্সি গোঘিন-এর ঠিকানাটা দিয়ে দিল ক্লিম।

এর পর এল বিশ্রী এক গুরু-গম্ভীর কাঠখোট্টা লোক। পরনে বিশ্রী জামা-কাপড়। চেহারা দেখে মনে হয় গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত। লুবাশার গ্রেপ্তার হওয়া শুনেই তো ভদ্রলোক লাল হয়ে গেল।

'ধরা পড়েছে! আচ্ছা মারিয়া ইভানোভ্নাকে পাওয়া যায় কি করে বলতে পারেন?'

ক্লিম বলতে পারল না। লোকটা গজরাতে গজরাতে চলে গেল : 'আশ্চর্য! এমনি হলে কাজ-কর্ম চলে কি ক'রে?'

তারপর এল এক ছাত্র; তাজা সরস—ঝলমল করছে। সবে বুঝি শহরে এসেছে। এল আর একটি মেয়ে—সাদাসিধে, নম্র—এক প্রস্থ বই আর কয়েক গজ ঘরে-বোনা কাপড় নিয়ে। আরও দু'তিন জন কারা যেন এল। এদের দেখে শুনে সামঘিনের মনে হলো লুবাশা যে-বিপ্লব নিয়ে ব্যস্ত তা এমন কিছু ভয়ানক নয়। একই সময়ে দুটো ডেমোক্র্যাটিক পার্টি হওয়ার ব্যাপারটা তার প্রমাণ।

তেইশ দিনের দিন ওর আবার ডাক পড়ল পুলিশ দপ্তরে। অভ্যর্থনা করলেন পুরো ইউনিফর্ম সজ্জিত বহু পদক বিভূষিত স্বয়ং কর্নেল।

আবার সেই প্রশ্ন : 'তারপর?' এ প্রশ্নটা যেন ওঁর মুখ থেকে যখন তখন অমনি টুপ করে পড়ে। বিশেষ কোন অর্থ নেই। পরক্ষণেই গলা পরিষ্কার ক'রে একটা শুষ্ক দ্রুততার সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলেন :

'এই নিন, আপনার কাগজপত্র যে ফেরৎ পেয়েছেন তার জন্য এই রসিদটা সই করুন। হ্যাঁ, এগুলো খুব ভালো করে পড়লাম। এবং পড়ে আমার আগের ধারণা আরো দৃঢ় হলো। তা, আপনি কি ঠিক করলেন? মত বদলাল?'

'না।' দৃঢ়ভাবে জবাব দেয় সামঘিন।

নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কর্নেল বলেন : 'দুঃখের কথা। যাক্গে, আপনি সাংবাদিকতার পথে যান না। আপনার লেখার ক্ষমতা আছে। তা ছাড়া, কোন কোন বিষয়ে আপনার চিন্তাধারাও চমৎকার। এই ধরুন না, ছাত্র-আন্দোলনের মানসিক দিকটা নিয়ে যা বলেছেন—অতি খাঁটি কথা।'

'একাজের জন্য আমার যথেষ্ট যোগ্যতা হয়েছে বলে আমি মনে করি নে।'

কর্নেল-এর ফুলো ফুলো হাঁড়ির মতো মুখটার দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে জবাব দেয় সামঘিন। বাড়ি যে-দিন খানাতল্লাসী হয়েছিল সে-দিনের মতোই গভীর ক্লান্তির ছাপ কর্নেলের মুখে চোখে ফুটে উঠেছে—যেন কোন সুদূরে তাকিয়ে আছে। ওর সমস্ত শরীরটা যেন বড় নরম; ইউনিফর্মের ভার আর বুঝি বইতে পারছে না।

'তারপর, এই ধরুন না, নার্সদের বিষয় যা লিখেছেন, চমৎকার! বড় ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখুন না।'

'ত্যাগব্রত!' মনে মনে বলে সামঘিন। ওর কথায় বিজয়ীর গর্বিত সুর। একবার ইচ্ছে হয় বলে :

'অত ভাবছেন কেন? লুরাশা সমভাই বিপ্লব ঘটাবে।'

ঠাট্টার প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে বড় হাসি পেতে লাগল সামঘিনের।

মাথার টাকে হাত বুলোন কর্নেল। ওর মনের কথা যেন বুঝতে পেরেছেন। একটু চিন্তান্বিত ভাবে বলেন :

'ভালো কথা। লুবভ আন্তোনোভা সমভা অনেক দিন থেকেই নাকি ভৌতিব ব্যাপার নিয়ে পড়েছেন?'

'তা সেই ছোটবেলা থেকেই ওর ওদিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল।' ইচ্ছে করেই স্বরে ঔদাস্য ঢেলে বলে সামঘিন।

কর্নেল মাথা নাড়েন ওর দিকে তাকিয়ে।

'না, ও ঠিক হলো না। ওটা আসল ছবি নয় শ্রীযুক্তা সমভার।' তাকিয়ে থাকেন ক্লিম-এর দিকে কর্নেল। উত্তেজনায় চোখ দুটো চক্‌চক্ ক'রে উঠে। আবার বলেন :

'বলছি, ওটা আসল ছবি নয়।'

সামঘিন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে :

'আচ্ছা, আমায় কেন গ্রেপ্তার করা হলো বলুন তো?'

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল পা বদল ক'রে। তীক্ষ্নভাবে তাকালেন ওর দিকে। তারপর গর্বের হাসি হেসে বললেন :

'দেখুন, বলা তো আমার উচিত নয়। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যে আনন্দ পেয়েছি তার জন্য আপনার কাছে আমি ঋণী। এবং সে-জন্যই বলছি। আপনাকে যে গ্রেপ্তার করা হলো সে-এক বিরাট কাহিনী। এর জন্য দায়ী খানিকটা আপনার ভাই, আর খানিকটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনার ভাই যেখানে আটক ছিলেন সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—ওঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে—উনি একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। অনুমতিটা ওঁকে দেওয়া হলো। তার আগে প্‌স্‌কভ্-এ যাবার জন্য একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ওঁকে। কিন্তু ওটা হস্তান্তরিত হয়; এবং ব্যবহার করে অন্য আরেক জন।'

একটু থেমে, আঙুল মটকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলেন কর্নেল : 'অবশ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সার্টিফিকেটটা বেহাত হওয়ার ব্যাপারে আপনার ভাইয়ের কোন হাত ছিল না।'

'আচ্ছা, সেই লোকটি কি পালিয়ে গেছে?' সামঘিন জিজ্ঞেস করে। ওর কেন জানি দোলগানভ্-এর কথা মনে হয়।

কর্নেলের চোখের তীক্ষ্নতা কোমল হ'য়ে আসে। টেবিলের কিনারে বসে আস্তে আস্তে বলেন :

'আপনি কি ক'রে জানলেন ?'

'না, না আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি।'

'কিন্তু...মনে হচ্ছে আপনি জানেন।'

ক্লিম শুষ্কভাবে জবাব দেয় : 'একজন যদি আরেক জনের কাগজ পত্র ব্যবহার করে...'

'হ্যাঁ, তা ঠিকই বলেছেন।' পদকগুলি নাড়া চাড়া করতে করতে নির্লিপ্তভাবে কতকটা মিনতির সুরে বলেন কর্নেল। 'নেহাৎ বাজে ব্যাপার, ওসব নাড়াচাড়ি করে লাভই বা কি ?'

উঠে হাত বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু ক্লিম বলে : 'তবু ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।'

'ওঃ হোঃ। হ্যাঁ, সার্টিফিকেটটা বেহাত হওয়ায় আপনাকে সেই লোক বলে ভুল করা হয়।'

'গাঁজাখুরী গল্প !' সামঘিন মনে মনে বলে।

'তবে সেই লোকটা অবশ্য ধরা পড়েছে ইতিমধ্যে।'

'মিথ্যুক।' মনে মনে বলে সামঘিন।

'আচ্ছা, চলি তাহলে,' দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলেন কর্নেল। 'ভালো কথা, আমি মাস কয়েকের জন্য চলে যাচ্ছি। যদি কোন ব্যাপারে কিছু গোলমাল—মানে যদি আপনার কখনও কোন দরকার পড়ে—ক্যাপটেন রোমানে লিওনতোভিচ রইলেন ওঁকে বলবেন। আচ্ছা, শুভ কামনা রইল।'

'সামঘিন বেরিয়ে এল রাস্তায়। লোকটা ওর কাছে হেরে গেছে। ও খুশি চাপতে পারছে না। হেরে-যাওয়া মানুষটার ওপর ওর কেমন একটা শ্লেষাক্ত করুণা হয়।

'আমাকে টিক্‌টিকি বানাবার দুরাশা এখনও ঘোচেনি মুর্খটার। দোলগানভ্‌ ঠিক পালিয়েছে। আমার ওপর আদতে কর্নেলের কোন সন্দেহ নেই, শুধু চান আমি ওঁর গোয়েন্দা হই।'

নতুন ক'রে শক্তি পায় সামঘিন, চেতনায় তারই উদ্ঘোষণা শোনে। এই একটি মাসের অভিজ্ঞতা জীবন ও মানুষের প্রতি ওর দৃষ্টিকোণ স্থির নির্ণয় ক'রে দিয়ে গেছে। এমন কি সাময়িক ভাবে ওর মনে হলো ও সম্পূর্ণ স্বাধীন; যে দুটো পথ ওর সামনে রয়েছে, নিজের ইচ্ছে মতো তার যে-কোন একটা বেছে নেবার পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ওর আছে; তবে পুলিশের দাসত্ব ও কখনই করবে না—তা একেবারে নিশ্চিত। অবশ্য অদলীয় এবং দলিয়তা নিরপেক্ষ কোনো সংবাদপত্র থাকলে তাতে হয়তো লিখতে পারে। কন্‌স্তানতিন লিওনতিয়েভ্‌ এবং মিখাইল বাকুনিনের আধ্যাত্মিক সাযুজ্য সম্বন্ধে চমৎকার একটা প্রবন্ধ লেখা যায়।

জীবন যেন সরল জমকালো সাজ-পরা মেয়ে ভারভারারই মতো—যে রংবাহারী কথা আর কাব্যের ছটা তুলে খুঁজে ফিরছে—কে আছে শক্তিমান যে ওকে প্রীতি দেবে, ফলবতী করবে। ওর বাড়ির খানাতল্লাসীর কথা নিয়ে লিদিয়া আর আলেনার কাছে কি হাস্যকর রকমের বড়াই করেছে ভারভারা। সেই কথা মনে পড়ে সামঘিনের। আর মনে পড়ে মিশা কাকার সেই—'আমি অমুকের সঙ্গে এক সাথে জেলে ছিলাম; অমুকে আমার সাথে ছিল'—সেই একই কথার অনর্গল ঘ্যানঘ্যানানী।

বেশী আর কম—মানুষ মাত্রেই নির্বোধ, দাম্ভিক। যা নিয়েই হোক সুবিধা পেলে প্রত্যেকেই বড়াই করতে চেষ্টা করে। এমনকি শ্রীমতী আন্‌ফিমিয়েভ্‌না অবধি গুমর করেন তার নাকি কখনও অসুখ করে না। কিন্তু আসল ব্যাপার অন্য রকম।

সামান্য একটু দাঁত ব্যথা হোক শ্রীমতীর, শোনা যাবে ও-রকম দাঁত ব্যথা আর কারো হলে নাকি কপাল মাথা কুটত, ইনিই কেবল মুখ বুজে তা সহ্য করতে পারছেন। শুধু আন্‌ফিমিয়েভ্‌না নয়; দাঁত ব্যথাই হোক আর যাই হোক, বাড়িয়ে বলাই মানুষের রীতি। প্রত্যেকেই তাই করে। লিউতভ বড়াই করে তার কুৎসিৎ ব্যর্থ প্রেমের বৃত্তান্ত নিয়ে, ইনোকভ করে তার কর্মবিমুখকতা নিয়ে; ভারাভ্‌কা তার শোষণ-ক্ষমতা, গঠন শক্তি ও ধন সঞ্চয়ের ক্ষমতায় বক্তৃতা শোনায়। লেখক কাতিন খোলাখুলি অহংকার করে তার পুলিশের নজর-বন্দীত্ব নিয়ে। সর্বত্রই ওই এক ব্যাপার। ওদিকে কুতুজভ তার সুকণ্ঠ নিয়ে অহংকার করতে পারে; কিন্তু সে বিশেষ হতে চায় নিজের সংগীত প্রতিভার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

॥ ১১ ॥

করেক দিন পরের কথা। সামঘিন বাড়ি এসেছে। রাতে এক সঙ্গে খেতে বসেছে ও, মা আর ভারাভকা। মোটা দেহটা নিয়ে একটা চেয়ার জুড়ে বসেছে ভারাভকা। খেতে খেতে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলছে :

' কি হে, ফের পড়েছিলে পুলিশের খপ্পরে? তুমি হচ্ছো একটি—তা কে জানে, হয় তো বিপ্লবের সত্যি দরকার আছে। এ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার না হ'লে এখন চলছে না,—মানে, থাকবে শ'তিন চার ব্যবসায়ী যারা গভর্নর আর কর্তা ব্যক্তিদের কান ধরে ঘোরাতে পারবে। 'ত সব চোর-জোচ্চোর. আর জেলা-ঘুঘুরাই তো সব কর্তা হয়ে বসেছেন।' ভারাভকার ফোলা ফোলা মুখটা লাল হ'য়ে উঠতে থাকে।

'আমাদের এক হতভাগা দেশ। একে সজুত করতে হলে আদর, চোখরাঙ্গানী, ডাণ্ডা সব চাই। একটা ভূমিকম্প, স্রেফ ভূমিকম্প দরকার। সব যেন বাসি, টোকো, আটার ডেলা বনে গেছে। আচ্ছাসে ঝাঁকুনী আর রাম-ঠাসন পড়লে তবে গে সব ব্যাটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে কুঁড়েমী ছেড়ে কাজ করবে। ঈজিপসিয়ান আর রোম্যানরা যা করে সে-হলো আসল ওষুধ—চাবুক আর বেত। বুঝলে হে। এদের ওই দরকার। আমাদের রাস্তা বলতে আছে কিছু? কিস্সু নেই। বাস্, চলা ফেরা বন্ধ। এই দেখনা, সে-দিন কটা জঙ্গল কিনলাম। চমৎকার জঙ্গল। আর দর কি, জলের দর। মাত্র সাত কোপেক। ইচ্ছে ছিল একটা কাগজের কল, করাত কল, আর একটা মদের ভাঁটি করব। কিন্তু পাজীরা আমায় আচ্ছা ঠকিয়েছে। বাড়ি তুলব কি—তার আগে সতের ভার্স্ট্ লম্বা একটা খাল খুদতে হলো, তারপর না বাড়ি! ভাবতে পার কি কাণ্ডকারখানা! আমি আর আমার বন্ধু ছোটলোকের মতো চ্যাঁচামেচি করলাম...।'

মাথা নেড়ে, নিষ্প্রভ চোখ দুটি বন্ধ ক'রে ভেরা পেত্রোভনা বলে উঠলেন : 'সাংঘাতিক।'

'মহাশয়া, কাজ যদি ক'ত্তে হতো আপনাকে, ওই শ্রীমুখ থেকে কি অমৃত বেরুত দেখা যেত!' দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে ভারাভ্কা।

'আমি কিসের কথা বললাম, আর তুমি কি বলছ। আমি তোমার চ্যাঁচামেচির কথা তো বলিনি।'

'সবই তোমার এই নয় আর সে নয়।'

ন্যাপ্কিনের তলা থেকে দাড়ির গোছা বের ক'রে হাত বুলোতে বুলোতে যেন খুশি হ'য়ে ওঠে ভারাভ্কা। আগের মতোই বক্ বক্ করতে করতে খেয়ে চলে।

সামঘিন মনে মনে ভাবে, আগের সেই লোভীর মতো গেলা যায়নি লোকটার। তখন খেত শান্ত ভাবে নিশ্চিন্ত মনে। ও যেন জানত যা খুশি সবই নির্ভাবনায় পেটে পুরতে পারা যায়। কিন্তু আজ আর সে নির্ভাবনার ভাব যেন নেই।

বিশ্রীরকম তাড়াতাড়ি করে ফেলে ছড়িয়ে খায়, যা হাতের কাছে আসে ছোঁ মেরে সাপটে সব তুলে নেয়। কি রকম গা ঘিন্-ঘিন্ করে দেখে। সাংঘাতিক মোটা হয়ে পড়েছে। গাল দুটো হয়েছে ফোলা বেলুনের মতো। চোখের তলা

দিয়ে থল্ থল্ ক'রে চামড়া ঝুলছে। অবশ্যি চোখ দুটো আগের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে। দাড়ির রংও কেমন যেন জ্বলে গেছে। আগে ছিল চক্‌চকে তামার রং। জ্বল্ জ্বল্ করত।

'এই তো একটু আগে আমার একজন কর্মচারীকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল। চমৎকার ছেলেটা। আমেরিকান। মার্ক্সিস্ট। একটা আস্ত জ্যান্ত বিদ্যুতের তার, বুঝলে হে। তারপর রাদিয়েভ আর আমাতে মিলে জেলার এটর্ণী আর গভর্নরকে য়্যায়সা হাত করলাম—যে ও-ব্যাটা গাধার—মানে কর্নেল পপোভ্-এর জল-ভাত উঠল এখান থেকে। শুনছি সেইন্ট পীতর্সবুর্গ, নয় মস্কো থেকে কে এক ভাসিলিয়েভ্ না কি নাম—আর এক ব্যাটা গাধাকে পাঠাচ্ছে ও-ব্যাটার জায়গায়। এই নরকে মগজ-ওলা কোন লোক পাঠাবে না ওরা। যাক্‌গে, দেখবে এস জেলা-এটর্ণীর জন্য কি চমৎকার একটা বাড়ির নক্‌শা করেছি। ভদ্রলোক নাকি চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নামবেন। চমৎকার বাড়ি হবে কি বলো?'

'কি সাংঘাতিক!' বেগুনী মুখখানাকে বাঁকিয়ে চাপা গলায় আবার বলে উঠলেন ভেরা পেত্রোভ্‌না। 'রক্ষিতার জন্য আবার বাড়ি?'

'যার জন্য খুশি হোক, তার জন্য আমার কি?' আমার মক্কেল। একটা জার্মান পত্রিকা দেখিয়ে বললে, এ রকম একখানা বাড়ি ক'রে দিতে পারো? বললাম, আলবৎ! হুজুরে হাজির। জান্‌ভি দেগা! যা বলবেন—কুকুরের খোঁয়াড়, শুয়রের খোঁয়াড়, ঘোড়ার আস্তাবল যো বোলেগা—বনা দেগা...'

'এসব কথা সত্যি বলেছ নাকি?' আঁৎকে ওঠেন পেত্রোভ্‌না!

'না, না বলিনি। তবে বলতে পারতাম। আমি সব বলতে পারি।'

চেয়ারের হাতলে দুই হাতের ভর দিয়ে ভারী দেহখানাকে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল ভারাভ্‌কা—একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। ক্লিমকে বলে গেল :

'যাই হে, আধ-ঘণ্টার মধ্যেই উঠে ছুটতে হবে ক্লাবে। সেখানে গিয়ে আবার চেঁচামেচি করতে হবে মেলাই।'

গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে পড়ে-যাওয়া পথিক যেমন ক'রে পলায়নপর গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকে, ধীরে ধীরে মাথাটা ঘুরিয়ে ভারাভ্‌কার চলন্ত মূর্তিটার দিকে ঠিক তেমনি ক'রে চেয়ে রইল ভেরা পেত্রোভ্‌না। বলল বেদনার্ত স্বরে : 'দিন-রাত্তির খাটছে। কাজ আর কাজ। কাজ যেন ওর নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লিদিয়ার জন্য কত টাকাই যে রেখে যাবে তার ঠিকানা নেই। চল্, আমার ঘরে বসবি চল।'

পুরোনো জিনিসের দোকানের মতো আসবাবে ঠাসা ঘরখানা। সেন্ট-পাউডারের গন্ধে ভেতরের বাতাস ভারী। ডেভিড্-এর আঁকা ছবিতে যে ভঙ্গিতে বসেছেন মাদাম রেকামিয়ে, সেই ভঙ্গিতে কোচের ওপর বসে ক্লিমকে তার বাবার খবর জিজ্ঞেস করতে লাগল ভেরা। ক্লিম বলল, ও যখন গিয়ে পৌঁচেছে তখন ওর বাবার কথা বলার শক্তি ছিল না। শুনেই নাকি-সুরে জিজ্ঞেস করল ভেরা :

'সেই মেয়েমানুষটা তোকে কোন উইল দেখায় নি? না? তুমি একটি আস্ত হাঁদা।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে ভেরা পেত্রোভ্‌না : 'রক্ষিতারা বড় লোভী হয়। তা দিমিত্রি আছে কেমন? ভালো আছে তো? শুনি দক্ষিণের চাইতে উত্তরেই স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আমাকে কয়েকটা সিগারেট আর দেশলাই দে তো!'

সিগারেট জ্বালাবার সময় দেখিয়ে দেখিয়ে ইচ্ছে করে অত্যন্ত হাস্যকর ভাব-ভঙ্গি করতে লাগল ভেরা। ক্লিম-এর মনে পড়ে যায় ডিকেন্স-এর উপন্যাসের একটি নারী চরিত্রের কথা—এমনি দীন, এমনি হাস্যকর, এমনি করুণ। সহ্য করতে পারে না ও। ভুলতে চায় এ সাদৃশ্য। কথার মোড় ঘোরাবার জন্য ও জিজ্ঞেস করে

এলিজাবেথা স্পিডাক্-এর কথা। ওর মা বলে :

'ভগবান! এতটুকু যদি বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে ও-মেয়ের! ও এতটুকু ভাবে না যে আমারি ইস্কুলে সব ভালো ভালো ঘরের মেয়েরা আসে গান শিখতে।' হঠাৎ যেন সাংঘাতিক দাঁত কন্‌কন্ ক'রে উঠল এমনি কথার সুর। 'সেবার স্বামীকে নিয়ে গেল একটা গ্রীষ্মাবাসে। সঙ্গে ইনোকেন্তিকেও নিয়ে গেল। আশ্চর্য! কিয়ে দেখেছে ও ইনোকেন্তির মধ্যে! মনে করে মস্ত বড় একটা প্রতিভা, এবং কেউ-কেটা একটা কিছু হবে। ভাবো, অত বড় হাঙ্গামা-হুজ্জুত করল—মানুষটার জেলের দোরে এক পা রয়েছে, আর তাকে নিয়ে কিনা এসব আদিখ্যোতা! নিশ্চয় আছে কিছু ব্যাপার দুজনের মধ্যে। বুঝতে পারিনে কিছু। এদিকে মেয়েটার স্বভাবটি অত শান্ত, এত ধীর-স্থির। কিন্তু সে যাই হোক, ওকে আমার এখনও ভারী ভালো লাগে। ভালো বংশের মেয়ে। বংশের একটা আলাদা দামই আছে, ক্লিম।'

একটু মলিন হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে ভেরা :

'আচ্ছা বল তো,, আলেনা কি সত্যি সত্যি থিয়েটারে নেমেছে? শুনছি স্বভাবও ভালো নেই তেমন। কি বল্লি? সত্যি? কি সাংঘাতিক! ওর এই অধঃপতন হবে কে ভেবেছিল।'

বিজ্ঞের মতো জবাব দেয় ক্লিম : 'কেন? ওকে দেখে যাদের মনে রঙ ধরেছিল, সব্বাই ভেবেছিল।'

'বেশ খোঁচাটি মেরেছিস।' না হেসে জবাব দেয় ভেরা।

চারটি মাত্র দিন—এর মধ্যেই ক্লিম মা আর ভারাভ্‌কার মাঝখানে নিজের অবস্থাটা বেশ বুঝে নিল। দুটি বিরোধী ব্যক্তিত্বের মানুষ তোমাকে ধরে নিজের নিজের দুঃখের কথা শোনাবেই—তখন তোমার যে অবস্থা হবে ঠিক তেমনি অবস্থা ওর। ভারভ্‌কা দিন-রাত ব্যবসায়ীদের, সরকারী কর্মচারীদের, নিজের কর্মচারী-কুলি-মজুরদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে; ভেরা পেত্রোভ্‌না যে সামনে রয়েছে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ খেয়াল-শূন্য হয়ে অদ্ভুত রসিয়ে রসিয়ে অশ্লীল কথা বলে। আর ওদিকে ভেরা পেত্রোভ্‌না ভারাভ্‌কার কাণ্ডকারখানায় কেবলি "সাংঘাতিক" অবাক হন; লোকটাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। এবং তার সঙ্গে ওর ব্যবহার ঠাকুরমা আকিম-জ্যাঠার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতেন সে রকম।



সন্ধ্যার দিকে একটু বেড়াতে যায় ক্লিম। নির্জন নিরালা দিকেই বেছে বেছে যায় যাতে চেনা-মুখের সঙ্গে দেখা না হয়। "আমাদের এলাকা" পত্রিকার দপ্তরে যাবার ওর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। ভারাভ্‌কা বলে :

'এটা একটা খবরের কাগজ? রাবিশ একটা। ছাপা তো হয় কতকগুলি পাদ্রীর সারমন। সম্পাদকটা নিজেই একটা পাদ্রী। রীতিমত কাজের কথা নিয়ে একটা জাত-খবরের কাগজ বের করার মতো সাবালক এখনও রাশিয়া হয়নি।'

গত পঁচিশ বছরে ভারাভ্‌কা যে-সব পাথরের বাড়ি তৈরি করেছে ক্লিম সেগুলো নিরীক্ষণ করে দেখে। দারুময় পুরোনো শহরটির বুকে এই ইমারত-গুলোকে ছেঁড়া জামার তালির মতো দেখায়, যার ফলে শহরটির শ্রীটুকু নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যি নিজস্ব ধরনে ভারী সুন্দর ছিল ছোট্ট শহরটি—অতি পরিপাটি কজলভের লালিকা ভূমি—যার অতীত গৌরবে মুগ্ধ কজলভ; ঐতিহাসিক চিন্তা-

যারাসম্পন্ন কজ্জলত। ক্রম হিসাব করে, এমনি শহর আছে পঞ্চাশের বেশি—ডজনখানেক ক'রে 'জেলা-সদর,' আর জলা-জঙ্গলে ঢাকা, সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানব-সন্তান-অধ্যুষিত শতাধিক এঁদো গ্রাম পরিবেষ্টিত যার প্রত্যেকটি। এইসব হলো রাশিয়া। এবং ওর ভাবতে অবাক লাগে এই রাশিয়ারই প্রয়োজন হচ্ছে বড় বড় জাঁদরেল পুলিশ, লুবাশা, দোলগানভ্, মারাকুয়েভ্‌দের—যাদের প্রেরণার উৎস সম্ভবতঃ মার্ক্সবাদের বাগাড়ম্বর জন-জীবনের আহ্বান নয়; যারা 'জনগণ' কথাটার অভিধাকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। আরও বিসদৃশ কুতুজভ্‌রা যাদের হাতের রচনা ওই "বিবৃতি" ও "শ্রমিকের ঝান্ডা।" এবং মুখের আঁচিলের মতোই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ওই প্যাগলাটে ডীকন, লুবভ এবং ইনোকভরা।

শহরের সীমান্তে চলছিল পাহাড়-কাটার কাজ। তিনশ' শ্রমিকের কোদাল চলেছে, লাল-সবুজ বালিমাটির বুক চিরে চিরে। নদী পর্যন্ত রাস্তাটা এবং রেল-স্টেশনের জন্য নির্বাচিত স্থানটি সাফ করছে ওরা। কুঁজো হয়ে যাওয়া মানুষগুলো নড়া-চড়া করছে উবু হয়ে; ওদের পরনে বেল্টহীন প্যাণ্ট, খোলা গলার সার্ট; রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলো গাছের বাকলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো গুঙিয়ে গুঙিয়ে চলছে ঠেলাগাড়ীগুলো। ভ্যাপ্‌সা বাতাস কাদা মাটির আঁসটে গন্ধ আর কাজের হট্টগোলে চুর চুর হয়ে আছে। অতি কুৎসিত দেখতে লোহার কি একটা জিনিস যেন টেনে আনছিল একদল মজুর। চিৎকার উঠছে তাদের একজনের গলা থেকে :

'চলরে জোয়ান, হেঁইও !
জোরসে চল, হেঁইও!'

আরেক দল মেক গাড়ছিল মাটিতে। একটা কর্কশ গলা বিরক্তভাবে প্রাণপণে চেঁচিয়ে চলেছে :

'মারো জোয়ান, হেঁইও !
চালাও হাত, হেঁইও !
মালিকের হুকুম, হেঁইও !
ঠাসরে আটা, হেঁইও... !'

অন্যরা সমস্বরে ধুয়া ধরে :

'মারো জোয়ান, হেঁইও... !'

লোহার বিরাট মুগুরটা বিপুল আওয়াজ তুলে মেকের ওপর পড়ে। সামঘিনের পায়ের তলায় মাটি যেন কেঁপে উঠে ঝন্ ঝন্ করে বাজতে থাকে।

সারা জীবন ধরেই এ গান শুনে এসেছে সামঘিন। বড় করুণ লাগে ওর—লেনটেন্ (Lenten) ঘণ্টার শিঞ্জিনীর মতো, সমাধিস্থানের অন্ত্যেষ্টি-সঙ্গীতের মতো। গভীর প্রশান্তিভরা একটা বিষাদ নিঃশব্দ সঞ্চারে ছেয়ে ফেলল ওর সর্ব-চেতনা; কোথা থেকে এল যেন সান্ত্বনারও নিষেক। মনে মনে ভেবে দেখল কদাকার বেঁটে বেঁটে কোদাল দিয়ে মাটি-কোপান এই শ'য়ে শ'য়ে মানুষ; ওদের পরিশ্রান্ত কণ্ঠের এই গান; এমন কি নদীর ওপর দিয়ে চলে-যাওয়া টেলিগ্রাফের তারের গায়ে গায়ে লটকে থাকা এই কালো কালো মেঘের টুকরোগুলিও বেঁচে থাকবে বহুকাল —হয়তো চিরকালই। ওই ওদের ভবিতব্য। নিয়তি যে অপরাজেয় তারি এক তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ এই দৃশ্যটি।

সুদূরে দিগন্তে, ফার গাছের সারির বন্ধুর শীর্ষের ওপারে ক্লান্ত সূর্যের রক্তায়মান রূপ-মহিমার দিকে চেয়ে রইল সামঘিন। সহস্রবার এ রূপ দেখেছে, তবু পুরোনো হয় না। মেঘের দল ফেনিয়ে উঠে জমে জমে ঘনীভূত হয়ে যেন লোহার মতো কালো আর কঠিন একটা বস্তুপিণ্ডের হয়ে উঠছে। তার ওপারে

আর কিছু নেই—শুধু অন্ধকার, "হিম-কালো আদিম অন্ধকার।" ভয়ে কালো হয়ে এই অন্ধকারের কথাই বলেছিল সেরাফিমা নেখায়েভা।

মস্কো যাবার আগে শেষ সন্ধ্যাটি সামঘিন এসে বসল নদীর ওপারে মনাস্টারীর বাগানে। গির্জার ঘণ্টায় বাজছে সান্ধ্য আরাধনার মধুর আহ্বান। শুনতে শুনতে নিজের ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে লাগল ও। পড়া শেষ ক'রে বিয়ে করবে—সহজ-সরল ঘরোয়া একটি মেয়ে, যে ওর জীবন-চর্যায় কখনও প্রতিবন্ধক হবে না। থাকবে কোলাহলহীন কোনও একটা মফঃস্বল শহরে। কিন্তু এখানে নয়—বহু স্মৃতি ছড়িয়ে আছে এ শহরে। এ রকমই আরেকটা জায়গা খুঁজে নেবে যেখানে মানব-জীবনের রূঢ় সত্য চিকন কথা আর রঙীন স্বপ্নে ঢাকা পড়ে না; যেখানে মানবিক অহংকৃতি বুদ্ধি-মার্জিত এবং সহজ। জীবন যেখানে গগোলের রূপকের মতো শুধু উদ্‌ভ্রান্ত উর্ধ্বশ্বাস নয়—বরঞ্চ বুড়ো ঘোড়ার মতো ভার বয়, আর বহু পায়ের চলায় চলায় যে-পথ তৈরি হয়েছে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আস্তে আস্তে, সেই পথ দিয়ে চলে কোন গর-ঠিকানায় কে জানে। কে যেন বলেছিল যারা নিজেদের মহাপণ্ডিত এবং আর্কিমিডিসের মতো মনে ক'রে, তারা ছাড়া আর সকলেই বুদ্ধিমান। ঠিক কথাই বলেছিল।

ওর কাছ থেকে কিছুটা দূরে হেজেলঝোপের ওধার থেকে দুটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। একজন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে; বৃষ্টি-ভেজা মাটির মতো শ্যামলা রঙ। আর একজনের বয়স বোধহয় বছর চল্লিশেক হবে; স্থূলাঙ্গী; এত বড় একখানা মুখ; টক্ টক্ করছে দুই গোলাপী গাল। ঝোপের পাশে এসে বসল দুজনে। দ্বিতীয় মহিলা পকেট থেকে ছোট এক বোতল ভদ্‌কা, একটা ডিম আর একটা শসা বের করল। বোতলটা থেকে এক ঢোক নিজের গলায় ঢেলে শসাটা বুড়ীর দিকে সরিয়ে দিয়ে ডিমটা ছাড়াতে বসল। হাতের সঙ্গে চলতে লাগল মুখ, একটানা ঝিমোন স্বর—যেন পরীর গল্প বলছে :

'তারপর হলো কি...বেরুল, যে ওর স্বামীটা রুগ্ন, ম্যাঁদামারা একটা মানুষ; তেমন রুজি-কামাই নেই...'

বুড়ী গম্ভীর হয়ে শুধায় : 'কোন বাচ্চা-কাচ্চা হয়েছে নাকি ও-লোকটার ঘরে ?'

'ওমা! তা আবার হয়নি! ওই বাচ্চাগুলোর জন্যই তো শেষে মেয়েটা নিজনী-নভ্‌গরোদ্-এর মেলায় যেতে আরম্ভ করল যদি দু'পয়সা উপরি কামাই হয়। আর সে মেয়ে কি অমনি? ওই এতখানি গড়ন, তেমনি হাসিয়ে ঢঙিয়ে।'

ফোঁকলা মাড়ী দিয়ে শসার নরম বুকটা চুষতে চুষতে বুড়ী বলল :

'তা বৈকি। সত্যি মেয়েটা বেশ হাসি-খুশি ছিল।' বলে আর এক ঢোক ঢালল গলায়।

'তা অমনি ক'রে গেল বছর চারেক। দুটো পয়সারও মুখ দেখল। ঘরের চাল ছাইল, দু-দুটো গাইগরু কিনল, বাচ্চাগুলোর জন্য জামা-জুতোও হলো। কিন্তু পাঁচ বছরের মাথায় ওকে খারাপ রোগে ধরল...কে জানে কার সঙ্গে আশনাই করতে গিয়েছিল...'

'তা, নিয়তি কে খণ্ডাবে বল।' শসার শক্ত অংশটার দিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকাতে তাকাতে বৃদ্ধা বলল।

'কি বললে ?'

'বলছিলাম, ভাগ্য কে খণ্ডাবে...'

'তা যা বলেছ,' সায় দেয় কনিষ্ঠা : 'ঐ জন্যই শেষে ধরল মদ। মাতলামী করে, চ্যাঁচায়, গান করে। একটা গাই বেচে দিয়েছে...'

'আরেকটাও বেচল ব'লে,' নিশ্চিততার সুরে বৃদ্ধা মন্তব্য করে।

উঠে পড়ে সামঘিন। এখানে ভগবানেও বিশ্বাস আছে; পেগানদের মতো অদৃষ্টেও বিশ্বাস আছে।

'কাতিন্-এর মতো বা নিকোদিম, ইভানোভিচ্-এর মতো লেখক থাকলে এ নিয়ে চমৎকার গল্প লিখতে পারত।' শহরতলীর পথ বেয়ে যেতে যেতে ভাবতে লাগল ক্লিম। পথের দুধারে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ছোট ছোট কুঁড়েঘর—যার মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকে নিঃস্ব দরিদ্রের দল—যাদের খবর কেউ রাখে না; জানে না এরা কি ক'রে বেঁচে আছে আর কেনই বা আছে।



ভারী খুশি খুশি অবাক হয়ে-যাওয়া গলায় কে যেন ডাকল। থেমে পড়ল ও।

'আরে, এখানে কি ক'রে?'

গেটের কাছের একটা বেঞ্চ থেকে লাফিয়ে উঠল দুনায়েভ। ক্লিমের হাত ধরে এমন জোরে ঝাঁকুনি দিল যে ওর হাত ব্যথা ধরে গেল।

'আমি তো এখানকারই মানুষ!' জবাব দিল ক্লিম। তেমন অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠল না ওর স্বরে।

'তাই নাকি? আমিও তাই। এখানে আমার মাসীর বাড়ি। চল না একটু বসা যাক।' বলে দুনায়েভ একটা আউট-হাউসের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। মাটির বাড়ি, দুটো জানলা, ঢালু ছাদ; একটা অর্ধ-সমাপ্ত বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানালাগুলি সব হাট ক'রে খোলা, বাড়িটার সামনের দিকটা পোড়া।

বেঞ্চির ওপর থেকে কতগুলি কাঠের টুকরো, তার ইত্যাদি ঠেলে ফেলে দিয়ে জায়গা ক'রে ক্লিমকে পাশে বসাল দুনায়েভ। ক্লিমের চশমা আর মুখে লেগে থাকা হাসির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নের তুফান তুলল ও :

'শুনলাম তুমি গ্রেপ্তার হয়েছিলে এবং অল্প দিন পরেই ছাড়া পেয়েছ; তা এখানে কি অন্তরীন হয়ে এলে? আমি তো নজরবন্দী আছি।'

ডাইনে-বাঁয়ে তাকায় সামঘিন। কোথাও কোন জনমনুষ্য নেই। কেবল দুটো মুরগি ছুটোছুটি করছে আর একটা ঘেয়ো কুকুর শুয়ে শুয়ে আড়চোখে কিসের দিকে যেন তাকিয়ে আছে।

'মার্ক্সবাদীরা নাকি একটা "বিবৃতি" বের করেছে? সত্যি নাকি? আছে তোমার কাছে একখানা? নেই? আমাকে আনিয়ে দিতে পারো একখানা? পারো না? তবে...'

'কি করছ তুমি আজকাল?' সাক্ষাৎটাকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে সামঘিন।

'ইঁদুরের খাঁচা বানাই। নেহাৎ বাজে তুচ্ছ কাজ। তা দিন সত্তর-আশী কোপেক হয়; কখনও এক রুবল পর্যন্তও হয়। তা এসেছ যখন থাকবে নিশ্চয়ই কিছু দিন?'

'না, কাল যাচ্ছি।'

'সত্যি?'

দুনায়েভের পায়ে জুতো নেই। গায়ের সার্টটি অতি পুরোনো, শতছিন্ন।

ময়লা একটা পাৎলুন পরনে। হাঁটুর ওপর এক টুকরো চামড়া বাঁধা। আপাদ-মস্তক এলোথেলো; চুল-দাড়ি জট পাকান। ওকে ক্লিমের বেশ ভালো অবস্থার, চালাক-চতুর লোক ব'লে মনে হলো, যারা কখনও কোন কাজে বিফল হয় না। ভারাভ্‌কার মতো। এরা আত্মবিশ্বাসী; অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না; হয়তো সাফল্যের চাবি-কাঠিটি এখানেই। ওর চোখের তারায় প্রচ্ছন্ন হাসিটি যেন বলে :

'আমি তোমাদের মর্মস্থল অবধি দেখতে পাই!'

ক্লিমকে দেখে ও যে আন্তরিক খুশি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর উচ্ছ্বসিত কথা, ব্যস্ত-ব্যগ্র প্রশ্নের মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে।

ক্লিম বলল :

'তুমি তো অনেক দিন জেলে ছিলে?'

'অনেক দিন! তা বেশ কিছুদিন বৈকি। লাভই হয়েছে। সেলটায় আমরা পাঁচজন ছিলাম। বিস্তর পড়াশোনা করেছি। তারপর আরেকজন এল। আমরা ভ.বলাম বুঝি টিকটিকি। কিন্তু তা নয়। সে ভদ্রলোক একজন প্রাক্তন ছাত্র এবং বন-পরিদর্শক। বছর চল্লিশেক বয়স। ভারী শান্ত। কখনও কখনও কি রকম যেন অদ্ভুত ব্যবহার করত। কিন্তু দেখেছি নিজের কাজের বেলায় সে অদ্ভুত করিতকর্মা ছিল।'

'ব্যবসায়ই সবচেয়ে আগে! ও দোকানদার হবে।' সামঘিন ভাবে।

ওর ছোটবেলাকার পড়া জ্ল্যাতোভ্রাৎস্কির লেখা "বুনীয়াদ" ব'লে উপন্যাসখানার কথা মনে পড়ছিল। গল্পটা হলো : কয়েকজন বুদ্ধিজীবী মিলে এক চাষী ছোকরাকে বিপ্লবের পাঠ পড়াতে আরম্ভ করল। কিন্তু লোকটা একটা আস্ত কুলাক হয়ে উঠল।

দুনায়েভ বলতে লাগল : 'চমৎকার কথা বলত লোকটা! রীতিমত যাকে ব'লে বক্তৃতা সব পড়ে পড়ে শোনাত আমাদের কি ক'রে আগাছা মাটির রস শুষে নেয়; কি ক'রে এল্‌ডার, য়্যাসপেন্‌, উইলোর মতো সস্তা কাঠ মেলাই জন্মায়, কিন্তু মানুষের কোন কাজে আসে না—যত সব পরগাছা, ঝাড়ে-মূলে শেষ ক'রে দেওয়া উচিত। তারপর যেসব জ.য়গায় কাঁটাগাছ, বুনোমূলে আর বিষকণ্টক জন্মায় কি ক'রে সেসব জায়গায় সূর্যমুখী আর তরকারী ফলানো যায়; যেসব গাছ জ্বালানী হিসাবেও অচল, সেসব গাছের জায়গায় ওক, বার্চ, লাইম, মেপল্‌-এর মতো দামী দামী কাঠের চাষ করা উচিত'...ইত্যাদি ইত্যাদি। ওর মতে পরগাছা বাড়তে দেওয়া মূর্খতা এবং আর্থিক দিক থেকেও ক্ষতিকর।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দুনায়েভ নিপুণ হাতে সাঁড়াশী দিয়ে তার কেটে চলেছে। তারের গোছা রাখা আছে ওর চামড়ামোড়া হাঁটুর ওপর। ক্ষুধার্ত সাঁড়াশীর মুখে সেগুলো সমান মাপের টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ছে।

'আমরা বলতাম, সোজা কথা কওনা কমরেড্‌ আগাছা পরগাছার ছেঁদো কথা রেখে। পরগাছা কাকে বলছ, বেশ বুঝছি। এবার এটুখানি বুর্জোয়াদের কথা কও দেখিনি। কিন্তু ভারী 'সেয়ানা ছেলে,' সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে দুনায়েভ্‌ ব'লে চলে : 'ভারী সেয়ানা, বলত, ওসব কি বলছ, ভাই, তোমরা। এতো রাজনীতি নয়। ওসব আমার বিকারের খেয়াল। তোমরা হয়তো আর কারো সঙ্গে আমায় ভুল করছ। আমি কখনও রাজনীতি করিনে। আমি জঙ্গলের ব্যবসায় আছি 'জেম্‌সৃংভোর' তরফে। ...আমরা বলতাম : বেশ, বাবা, বেশ। কিন্তু কি বলতে চাইছ তাতো বুঝতে পারছিনে। যাই হোক, আগে বাড়। আমরা টিকটিকি নই। আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ দেখতেই পাচ্ছ। সুতরাং তোমার কোন

ভয় নেই।... কিন্তু আমাদের সেল থেকে কদিনের মধ্যেই ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল।'

বিশেষ ভালো লাগল না ক্লিমের দ্নায়েভ্-এর কাহিনী। নিশ্চয় এসব ওর বানানো কথা। ও উঠে পড়ল। দ্নায়েভও উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল :

'আর কেউ এখানে অন্তরীন আছে কিনা জানো?'

'তুমি তো জান আমি এখানে থাকিনে, মস্কোয় থাকি।' বলে বিদায় নিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে দিল ক্লিম এমনি ভাবে যেন কোথায় যাবার আছে বড্ড দেরী হয়ে গেল। ও জানে চোখ ফেরালেই দ্নায়েভ-এর সঙ্গে চোখাচোখি হবে—শিকারীর নিশানা করা চোখ।

'করে খেতে পারবে লোকটা... না ভাবাই ভালো দ্নায়েভের কথা।



মস্কোতে ফিরে এসে ক্লিম তার আগের ঘরখানাই আবার ঠিক করে ফেললে। তারপর ভারভারাদের ওখানে এল ওর জিনিসপত্র আনবার জন্য। ভারভারা বেরিয়ে এসে ওকে দেখে আনন্দে একেবারে আট খানা। হাসতে হাসতে দুই হাত বাড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল। খুশিতে কি যে করবে ঠিক পেল না। এক মুহূর্তের জন্য ওকে বেশ লাগল ক্লিমের।

'মাত্র পরশু দিন ফিরছি। এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছি। ইচ্ছে করছে আবার যাই চলে কোন রিহার্সেলে।' জমকালো রঙের শালটা কাঁধের ওপর টেনে দিতে দিতে বলে ভারভারা। ঘরখানা বেশ গরম; এবং গায়ের জামাটা থুতনী পর্যন্ত বোতাম আঁটা থাকা সত্ত্বেও ওর শীত লাগছে।

'আমার অভিনয় কি রকম হলো?' ক্লিমের প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি ক'রে মাথা নেড়ে, অপরাধীর মত হাসতে হাসতে জবাব দেয় ভারভারা : 'খুব খারাপ!'

আরও যেন সুন্দর হয়েছে ভারভারা। জামার কলারের জন্য ওর গলাটা যেন আরও খাটো দেখাচ্ছে। হাত দুটো কি রকম বিব্রত ভাবে নড়ছে যেন ও দুটো ওর বশে নেই। ভারী অদ্ভুত লাগছে সামঘিনের।

'যাই হোক আমার শিক্ষা হয়েছে। বুঝলাম রঙ্গমঞ্চ আমার জন্য নয়। অভিনয়ে আমার কোন প্রতিভা নেই। প্রথম দিন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াতেই কথাটা বুঝেছিলাম। তাছাড়া—বাপ্‌স্! কখনও অস্ত্রভ্‌স্কির বেনে-বউদের দুঃখ ফুটিয়ে তুলতে হবে, কখনও শপাঝিন্‌স্কির নায়িকা ফরাসী গিন্নী আর কুমারীদের ভূমিকায় নামতে হবে—সে ভারী বিচ্ছিরী। আমার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়।'

হাসতে হাসতে ও শোনাতে লাগল : "লা দাম অ ক্যামেলিয়াস্" নাটকে অভিনয় করার সময় কিছুতেই ও ভাবতে পারল না যে ও মরছে। অন্যদের সামনে সে কি সাংঘাতিক লজ্জা। তারপর "বিমুগ্ধা" নামক নাটকটায় চুলের বেণী দিয়ে গলায় ফাঁস লাগাবার কথা—সে কি ও কিছুতেই পারল! ভয়েই মরল বেণীতে যে আলগা চুলের গুছি লাগান ছিল পাছে তা টানে খুলে আসে। এক নিশ্বাসে নিজের খবর শুনিয়ে ও ক্লিমের গ্রেপ্তারের খবর জিজ্ঞেস করতে বসল।

'আচ্ছা ওখানে তোমার জ্বালাতন করেনি তো?' ক্লিম জিজ্ঞেস করল।

'না, একজন পুলিশ অবশ্য এসেছিল একদিন। খালি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল আমি কবে মস্কো থেকে এসেছি। যখন শুনলাম যে তুমি—মাগো, আমার তো চক্ষু ছানাবড়া। তুমি জেলে এ আমি ভাবতেই পারিনে। রাগে গর্‌ গর্‌

করতে করতে ভারভারা বলে।

সামঘিন হেসে জিজ্ঞেস করে : 'কেন নয় বলতো।'

'জানিনে বাপু; পারি না তো পারি না।'

ক্লিম বুঝল ভারভারার রঙ্গ-মঞ্চের অভিজ্ঞতার ফলটা ভালো হয়েছে। অনেক সহজ হয়েছে ও। আগের মতোই হাল্কা সুরে নির্লিপ্তভাবে কথা কইতে লাগল সামঘিন। ভারভারা চটে গেল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকিয়ে ও যেন নিজের মধ্যে কুঁকড়ে গেল। গম্ভীর হয়ে বসে রইল। এরপর দু'এক বার দেখা হতেই সামঘিন পরিষ্কার বুঝতে পারল এ মেয়ের সঙ্গে আগের মতো ব্যবহার করা আর সম্ভব নয়। ওর ঠাট্টা, বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য বরদাস্ত করতে রাজী নয় ভারভারা; মৌনতায় প্রতিবাদ তুলে, ওষ্ঠে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত ক'রে, চোখ নীচু ক'রে ও চুপ ক'রে বসে থাকে। সামঘিনের অহমিকা আহত হয়; মন চঞ্চল হয়ে ওঠে—আর কারো সঙ্গে প্রেমে পড়ল না তো ভারভারা!

কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করল ক্লিম ভারভারাকে অতটা হাল্কাভাবে গ্রহণ না করাই ওর নিজের পক্ষে মঙ্গল। ভারভারাই হোক ওর আরশী যাতে প্রতিফলিত হবে ওর ধ্যান-ধারণা, ভাবানুভাব।

সামঘিন বলছিল : 'তর্ক-শাস্ত্রে বিকল্পের বিধি আছে। কিন্তু জীবন তো তর্ক-শাস্ত্রের নিয়মে তৈরি হয় না। যথা—জীবন-সংগ্রাম যদি অনিবার্যই হয় তবে মানবতাবাদ প্রচারের সার্থকতা কোথায়? আর তুমি দিব্যি বসে আছ এখানে—না মানবতাবাদের প্রচার করছ, না কারো গলা টিপে ধরছ।'

ভারভারা জবাব দেয় : 'বাঃ কি সহজ সরল কথা!'

বোঝাতে দেরী হলো না ভারভারাকে যে কনস্তানতিন লিওনতিয়েভ্ মিখাইল বাকুনিনের মতই বিপ্লবী ছিলেন। ভারভারার কাছ থেকে নিজের বুদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রশংসা শুনে শুনে ক্লিম ওকেই নিজের কষ্টি-পাথর মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এই কষ্টি পাথরে ঘষে ঘষে ও নিজের চিন্তায় শান দেন। কখনও কখনও মতদ্বৈধও হয়। প্রথম হলো যেবার আলেনা তেলেপনেভা "লা বেল হেলেন" নাটকে অভিনয় করতে নামল।



নোংরা, ধুলো-বালি ভরা এইটুকু একটা থিয়েটার। কিন্তু এক অপূর্ব মহিমাময় বিশ্বজয়ী রূপ নিয়ে আলেনা মঞ্চে এসে দাঁড়াল, বিস্ময়ের একটা চাপা গুঞ্জনের লহর তুলে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। সবাই ঝুঁকে পড়ল রঙ্গমঞ্চের দিকে। পুরুষদের টাক মাথা আর মহিলাদের নিরাবরণ বাহুগুলির একটা ধূসর ছায়ায় ঢেকে গেল। অভিনয় আরম্ভ হলে যেন সারা প্রেক্ষাগৃহ তরঙ্গের মতো ফুলে উঠে রঙ্গমঞ্চের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু আলেনা গান গাইল অতি বিশ্রী—অত্যন্ত মোটা, কর্কশ, উঁচু পর্দার গলা; গানের আদিরসাশ্রিত কথাগুলির ওপর অশোভন ঝোঁক। গায়ের জামাটা কোমর থেকে পা পর্যন্ত এক দিক খানিকটা খোলা। তার মধ্য দিয়ে ওর বে-আব্রু অঙ্গ-ভঙ্গি আরো অশ্লীল হয়ে উঠল।

দেখেই ভারভারা সোল্লাসে কানে কানে বলল :

'এ মা গো! কি বেহায়াপনা!'

সাধারণতঃ ভারভারার কথার প্রতিবাদ করাই ক্লিমের অভ্যাস, কিন্তু এখন শান্ত-

ভাবে বলল : 'মনে হচ্ছে "নানার" প্রথম অভিনয়েরই দ্বিতীয় সংস্করণ এটা।'

আলেনার গলার স্বর, ওর লাস্যভরা অঙ্গ-ভঙ্গি, ছবির মতো সুন্দর মুখখানা যেন সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটিকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখল। ওর প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনে, প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি কথায় বিকীর্ণ হতে লাগল ওর দেহের দুর্বার মোহময়ত্ব। রানীর ভূমিকায় নয়, মেনেলস্-এর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছে আলেনা। বেশ বোঝা যেতে লাগল আদিরসের দিকেই ওর ঝোঁক বেশী, এবং একটু সুবিধা পেলেই হলো। কোরাসের দলে ওর কোন দরকার নেই, তবু সবাইকে কোমর দিয়ে কাঁধ দিয়ে ঠেলেঠুলে গাইয়েদের সরিয়ে ও এসে তাদের মধ্যে দাঁড়াবেই। ক্লিমের মনে হয় ও যেন এক গাঁজিয়ে-ওঠা তীব্র-তীক্ষ্ন-কামরস-সর্বস্ব কোনও সঙ্গীতের উন্মত্ত উচ্ছ্বাসের তালে তালে ঢুলে ঢুলে একা একা নেচে চলেছে।

শ্রোতারা স্থির নিস্পন্দ। চারদিকে তাকিয়ে ক্লিম নিজের মনে মনে আবৃত্তি করে : 'নানার' প্রথম অভিনয়। হঠাৎ লক্ষ্য করল অত্যন্ত অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ভারভারা ওকে অপাঙ্গে দেখছে। ক্লিমও ভারভারাকে লক্ষ্য করতে লাগল। ভারভারার কান গাল লাল হয়ে উঠেছে। ও মাটিতে জুতোর গোড়ালি ঠুকে আর হাঁটুর ওপর আঙ্গুল পিটে পিটে বাজনার সঙ্গে তাল দিচ্ছে। আলেনার দুর্বিনীত দেহ-লাস্যের চেয়েও ওর এই উত্তেজনায় ক্লিম আরো বেশী অভিভূত হয়ে পড়ল। প্রথম অংকের পর শ্রোতারা তুমুল হর্ষধ্বনি ক'রে অভিনন্দন জানায় আলেনাকে। উদ্ভ্রান্তের মতো হাততালি দেয় ভারভারা। ওর চোখ দুটি যেন নেশার ঘোরে হাসতে থাকে। এমন একটি উদ্যত ভঙ্গিতে বসে আছে ও, যেন রঙ্গমঞ্চের ওপর শ্রোতারা সবাই যেন শিশু, এমনি একটা ভাব ওর মুখে। পাদপ্রদীপের এধার থেকে, বাদক-বৃন্দের তরফ থেকে উপহার এল—মস্ত বড় একটা ফুলের তোড়া। তারপর নারঙি রঙের রেশমী ফিতের ফুল বাঁধা মস্ত একটা অর্কিডের সাজি। সামঘিন বারান্দায় বেরিয়ে এসে ভারভারাকে বলল :

'তোমার ভারী পছন্দ হয়েছে দেখছি আলেনার অভিনয়।'

'নিশ্চয় !'

প্রথমে তো বেহায়া টেহায়া কত কি বলেছিলে।'

'তা বলেছিলাম। কিন্তু এতো মাদকতাময় বাখীয় অশ্লীলতা। ইলিউসিস-এ ফ্রাইন নিশ্চয় এ রকম ছিল। আমি একে অশ্লীলতাও বলতে চাইনে। এ এক-রকম পবিত্র নির্লজ্জতা—ক্ষমতার, আদিম শক্তির...'

অতি দ্রুত বলে গেল ভারভারা। ওর স্বরে কেমন যেন বিক্ষিপ্ত-চিত্ততা, একটা বিষাদ। হিংসা মনে হয় সামঘিনের।

তীর্যক বিদ্রূপে বলে ওঠে ও : 'আচ্ছা।' শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় ভারভারা। কয়েক-জন বন্ধু-বান্ধব দেখা দিল—ছুটে চলে গেল ও। সামঘিন ফিরেই দেখল ভোজন-কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লিউতভ্ সান্ধ্য-বেশে—মুখে সিগারেট, চুল বিস্রস্ত, গালে ছোপ ছোপ লাল। লিউতভ এতদিন সিগারেট খেত না, এখনও ওর ঘন ঘন ধোঁয়া গেলা, কাগজ চিবোন এবং মুখ বাঁকান দেখে কায়দাটা বিশেষ রপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় না; জামার দুদিকে ছাইয়ে ভরে গেছে। সকলের রাস্তা বন্ধ ক'রে ঠিক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। যারা ভেতরে আনাগোনা করছে তাদের গায়ের ওপর ধোঁয়া ছাড়ছে ও। ওকে ধাক্কা দিয়েই চলতে হচ্ছে তাদের ক্ষমা চেয়ে। ও নিঃশব্দে শুধু আঙ্গুল দিয়ে দাড়ি পাকায় অতি হাল্কা ক'রে, দীঘল ছাঁদের ছাঁটা দাড়ির গোছা ওর ফোলা ফোলা নেড়া মুখটার মধ্যে নেহাৎই বাহুল্য দেখায়। কটমটু ক'রে সামঘিনের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে তন্দ্রালু স্বরে ডাক দেয় :

'হ্যালো! আরে সামঘিন্ যে! তারপর কেমন লাগল! রীতিমত শিল্পী, কি বল, মেয়েটা! সত্যি শিল্পী। চলনা একটু কইনাক গেলা যাক!'

চৌকাঠের গায়ে এলিয়ে পড়ল লিউতভ। ওর পা টলছে, কোন মতে সামঘিনের ওপর ভর দিয়ে রইল। দাঁড়াতে পারছেনা এত বেশী মাতাল হয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত একটা সন্ধানী দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে আছে সামঘিনের দিকে; মুখে একটা ভয়াবহ অভিব্যক্তি।

'মাকারভ্... ওকে যা তা... বলে। পাগলটা চলে গেছে। আমি আলেনাকে অর্কিডের সাজিটা পাঠিয়েছি।' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল ও। জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে চেপে দুমড়াতে লাগল। ওর হাতের তেলো পুড়ে উঠল। ওই দিকে তাকিয়ে সিগারেটটা পকেটে ফেলে আবার বলল :

'চলনা, একটু কইনাক খাইগে। বেশী না, এই একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠা...। য়্যাঁ : কি বল! বাপ্স্, কি দারুণ সুন্দর চেহারা! কি সুন্দর... ওঃ...।'

অন্ধের মতো ডাইনে বাঁয়ে ধাক্কা দিতে দিতে ও টলতে টলতে ভোজন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

'কি শাচনীয় অবস্থা!' আবার প্রেক্ষাগৃহে ফিরে যেতে যেতে সামঘিন ভাবতে লাগল।

অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত ভারভারাকে দেখে মনে হলো যেন ভীষণ গম্ভীর, ভীষণ দুঃখের একটা নাটক দেখল ও। আলেনার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে একেবারে দুর্বার হয়ে উঠল অভিনেতারা। প্রম্পটর-এর ওখান থেকে কালচাস তিন গেলাস ভদকা নিয়ে এসে রাজা আগামেমননকে আর রাজা মেনেলসকে ডাকল, এবং তিনজনে মিলে মদটা খেয়ে স্ফূর্তির চোটে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে একটা রাশিয়ান নাচ নাচতে লাগল। দেখে ভারভারা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

সামঘিন বলল : 'জঘন্য।' ভারভারা কোন উত্তর দিল না। মঞ্চের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একেবারে মাথা নীচু ক'রে বসে রইল। ক্লিমের মনে হলো, ওর দুই চোখ জলে ভরে এসেছে। ভারী মজা লাগল ক্লিমের। হাসি চাপতে চাপতে জিজ্ঞেস করল :

'তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?'

'না না, ও কিছু নয়। তোমার ভাবতে হবে না।' ভারভারা বলল।

'হিংসা, হিংসা, নির্ঘাৎ হিংসা!' সামঘিন সিদ্ধান্ত করল।

অভিনয় শেষ হলে সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন আলেনাকে নিয়ে পাগল হয়ে উঠল।

সামঘিন জিজ্ঞেস করল : 'যাবে নাকি সাজঘরে? আলেনার সঙ্গে দেখা করতে।'

ওর কথা শেষ না হতেই ভারভারা চিৎকার ক'রে উঠল : 'না-না-না!'

রাস্তায় বেরিয়ে সামঘিন বলল : 'ম্যুজিক্যাল কমেডী দেখে তোমার মন খারাপ হয়ে যায়!'

তোমার বুঝি স্ফূর্তি লাগে!' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করে ভারভারা। তারপর সামঘিনের হাত ধরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয়। চলতে চলতে বলে :

'আমি জানি, ওটা কমেডী; স্ফূর্তি লাগারই জিনিস। কিন্তু আমি যদি পুরুষ হতাম, আমার খুব আঘাত লাগত। আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম। এতদূর জঘন্য...!'

ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে সামঘিন কোমলভাবে বলে :

'একটু হিংসা হচ্ছে, না?'

'হিংসা? কিসের জন্য? ও-মেয়ের কি প্রতিভা আছে? আর যে-রূপের ওই অধঃপতন সে-রূপ নিয়ে হিংসা করব? ছিঃ!'

বারে বারে ভারভারা ক্লিমের গায়ের ওপর এসে পড়তে লাগল। ওর হাত ধরে চলা কঠিন হয়ে উঠল ক্লিমের। ওর কথা শুনতেও বিরক্ত লাগতে লাগল।

'তুমি তো জান, লিদিয়া সর্বদাই বলত যে, মানুষের প্রকৃতি আর সহজাত প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তখন আমি ওর কথা তেমন বুঝিনি। ঠিক কথাই বলত ও। আলেনা অপূর্ব সুন্দরী। ওকে দেখে চোখ ফেরান যায় না। এত সুন্দর! ওর রূপ দেখে চোখ জলে ভরে উঠতে চায় আনন্দে, ব্যথায়। সত্যি বলছি। কিন্তু কি প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলছে ও! ও তো পাশবিক। তাই না?'

'ওই দিয়েই তো মেয়েরা বিশ্ব জয় করে!' সামঘিন বলে।

'তুমি স্ফূর্তির মেজাজে রয়েছ। কি আর বলব।' ভারভারা বলে। সারা রাস্তা ও আর একটিও কথা বলল না। মাফলারে মুখ ঢেকে রইল। বাড়ির দরজায় এসে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল :

'বোধ হয় খুব পরিষ্কার ক'রে বোঝাতে পারিনি কি বলতে চেয়েছিলাম।'

*

ভারভারার ব্যবহারকে ওর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা বলেই মনে হলো সামঘিনের। ও একটু গা ঢাকা দিল। দেখাই যাক না। প্রায় সপ্তাহ খানেক আর ও বাড়ি গেল না। খুব বিশ্বাস ছিল ভারভারা কিছুতেই থাকতে পারবে না। ওর খোঁজ করবেই। কিন্তু কোন সাড়া এল না ও-পক্ষ থেকে। সামঘিন অস্থির হয়ে উঠল। ও মানুষটিকে না হলে যে ওর কিছুতেই চলবে না। সে যে ওর মনো-মুকুর! তাকে ওর চাই-ই। ও ভাবতে লাগল আলেক্‌সি গোঘিন্‌ ব'লে সেই যে লোকটা আছে তার কথা—ফুলবাবু গোছের চেহারা; অনেকটা দোকান-কর্মচারীর মতো যে কারণে সে তরুণী-মনোহারী। শেষ পর্যন্ত ভয় হলো—অসুখ হয়নি তো। ছুটে চলে এল ভারভারাদের বাড়ি। হলে ঢুকেই দেখা হলো লুবাশার সঙ্গে। গায়ে ফার-কোট, মাথায় টুপী, আর বগলে যথারীতি বইয়ের বাণ্ডিল।

'আরে তুমি! আমি যে যাচ্ছিলাম তোমার কাছে!' লাফিয়ে উঠল লুবাশা। গায়ের কোটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এক দিকে। এক ঝট্‌কায় ছিট্‌কে ফেলে দিল বরফ-ত্রাণ জুতো জোড়া। 'তারপর বেশ কটা দিন হাজত বাস ক'রে এলে? আচ্ছা তোমাকে পুলিশের দপ্তর-বাড়িতে রাখল কেন? এস এস, খাবার ঘরে গিয়ে বসিগে। আমার ঘরটা এখনও গোছান হয়ে ওঠেনি।'

খাবার ঘরে এসে ধপাস্‌ ক'রে দিভানে ব'সে প'ড়ে চুল খুলতে লাগল লুবাশা।

'বড্ড ঘা হয়েছে মাথায়। চুলগুলো কেটে ফেলতে হবে দেখছি। যে সেল্‌টাতে রেখেছিল—কি স্যাঁতসেঁতে! তারপর নখ কামড়ে বসে থাকা! আমার সে-ধাতই নয়। কিছুতেই পারিনে।'

গোলাপী গালগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বোধ হয় তা জানে বলেই বসে বসে দুই হাতে গাল কপাল আর চোখের কালির ওপর হাত বুলতে লাগল।

'এই তো পরশু ছাড়া পেলাম। এখনও ধাতস্থ হতে পারিনি। জান, ওরা আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দেবে—আমার বাড়ি থাক আর নাই থাক, বোক্‌চন্দর যত সব! মাত্র চারটি দিন। তারপরই তল্পী গোটাও। কিন্তু আমার যে এখানে না থাকলেই নয়! দেখি, কেউ নিশ্চয় একটু চেষ্টা করবে যাতে আমি মস্কোতে থাকতে পারি। কিন্তু...'

ক্লিম বুঝতে পারে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়েছে লুবাশা। জিজ্ঞেস করল : ‘ভাসিলিয়েভ তোমায় জেরা করেনি?’

লুবাশা ডিভানের ওপর লাফিয়ে উঠল। তারপর নিজের কোলে কিল মারতে মারতে বলল : ‘কি গর্দভ সব জানো! ভাবো একবার, আমাকে সব ভয় দেখাবেন! যেন পোনের বছরের খুকী আমি! কি বললাম জান? বললাম : দেখুন কর্নেল রেড্ ক্রসের জন্য টাকা তুলছিলাম বৈকি। কিন্তু সে-টাকা কাকে দিয়েছি তা আমি বলব না। বাস্। আর কোন কথা নেই।—তারপর আরম্ভ করলেন তিনি—হ্যাঁ, এই দেখুন, আপনি মানুষ, আমি মানুষ, সে মানুষ—আমরা মানুষ, আপনারা মানুষ...আর তোমার সম্বন্ধে...’

‘কি? আমার সম্বন্ধে?’ লাফিয়ে উঠল ক্লিম। ওর হৃদ্‌পিন্ডটা অত্যন্ত অস্থির গতি হয়ে উঠল।

‘এই তুমি নাকি মেয়েদের নার্সের কাজ, ধাত্রীর কাজ করতে বল...হেন তেন। মোটমাট এমনি সব গাধার মতো কথা। একেবারে অকথ্য। আরো আছে,—তুমি নাকি বল দয়া করা অন্যায়, স্রেফ পাপ। এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল সব জানোয়ার কাঁহাকার।’

‘আমার কথা আর কি বলল?’ জিজ্ঞেস করে সামঘিন।

‘আরে ছেড়ে দাও। যত সব বাজে কথা।’

সামঘিন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বসে পড়ল। কর্নেলকে মনে মনে গাল দিতে লাগল : ‘শয়তান!’

ক্লিম দেখতে লাগল—কাঁধ ছেয়ে পিঠ ছড়িয়ে পড়া চুলে বিলি কাটতে কাটতে লুবাশা বসে বসে ঠোঁট চাটছে আর ভ্রূ-কোঁচকাচ্ছে। ওর কথাগুলো কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ক্লিমের। দেখতে তো ওই চেহারা, বুদ্ধিও তেমনি—সে আবার অমন ঘাড় বাঁকিয়ে কথা কইবে পুলিশের সঙ্গে। অত সাহস নেই। নিশ্চয়ই পুলিশের ধমক খেয়ে বসে বসে কেঁপেছে, একটিও কথা বেরয়নি মুখ দিয়ে।

‘সত্যি সত্যি ভয় পাওনি?’ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে ও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দেয় লুবাশা :

‘সেই যে কথায় বলে না—বাঘের ভয় করে যে, জঙ্গলে পা বাড়ায় না সে।’

‘ভেত্রোভার কথা মনে হয়নি?’

‘ভেত্রোভা? ওসব হিস্টিরিয়ার ব্যাপার। বলাৎকারের গল্প আমি বিশ্বাস করি না।’

“কারা” (Kara)-তে যে মেয়েদের চাবুক মারা হয়েছে, সে-কথা ভুলে গেছ?’ সামঘিন তবু বলে।

‘সে তো একদার কথা। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও। এক মিনিট,’ ক্লিমের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বলে : ‘আচ্ছা, আমার সঙ্গে অমন ক’রে কথা বলছ কেন? ক্ষ্যাপাচ্ছ না কি?’

‘একটু একটু।’ লুবাশার চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ও স্বীকার করে।

‘বাঃ ইচ্ছেটা তো মন্দ নয়।’ অভিমানের সুরে জবাব দেয় লুবাশা : ‘ভীষণ রেগে গেছ মনে হচ্ছে,’ যেন ভীষণ ক্লান্ত এমনি ভাবে এলিয়ে বলে : ‘প্রথমে যখন জেরা করতে আরম্ভ করল, সত্যি সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, নিশ্চয় কিছু ঠিকানা টিকানা ওদের হাতে পড়েছে খানাতল্লাসীর সময়। তা সত্যি কথা বলতে ব্যাপারটা যে এত খানি হাল্কা আর বুদ্ধু-মার্কা হবে, মোটেই আশা করিনি। আর একটু ভালো আশা করেছিলাম। কি জিজ্ঞেস করল জান?—আপনি লাসেল পড়েছেন?—আমি পাল্টা ছাড়লাম : আপনি পড়েননি? জবাব দিলে,—কাজের

খাটিয়ে পড়তে হয়েছে বৈকি। কিন্তু আপনার মতো মেয়ের কিসের দরকার পড়ল?—এই তো এমনি সব কথা।'

'ভারভারা কোথায়?' সামঘিন জিজ্ঞেস করে।

গোঘিনদের ওখানে গেছে। ভীষণ মন খারাপ বেচারার; রীতিমত কান্নাকাটি করছে—আন্নেনা কেন অভিনয়ে নামল।'

'এই গোঘিন্‌টি কে?'

'আমার মেসো গো। মানে আমার মায়ের এক বোনের সঙ্গে ভদ্রলোকের বিয়ে হয়েছিল। আত্মীয়তার জন্য ভারী আগ্রহ বেচারার। খুব চান আমি ওঁর সাথে আত্মীয়তা করি। আমার আর আপত্তিটা কিসের? তা আমার মেসোটি লোক ভারী ভালো। অনেক কাজ ক'রে দেন। একটু কুঁড়ে আছেন আর ঘুরন্তী বাই আছে এই যা। নইলে বেশ মজার লোক।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নালিশের সুরে আবার বলে লুবাশা:

'উঃ ক্লিম ভাই, যদি জানতে মস্কো থেকে চলে যেতে আমার কি রকম যে লাগছে!'

কি জবাব দেবে ক্লিম। ভারভারার কথা ভাবছিল ও। ভারভারার সঙ্গে এতদিন যে খেলা ক'রে এসেছে ও, তা এখন এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে যে আর চলছে না। হয় খেলাই বন্ধ করতে হবে, নয় বদলাতে হবে।

হন্তদন্ত, উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘরে ঢুকল ভারভারা কোট গায়েই। হিমেল হাওয়ায় গাল দুটো টক্ টক্ করছে। ক্লিম উঠে দাঁড়িয়ে অমায়িক হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল ওকে। কিন্তু ও একটা 'হ্যালো' ছুঁড়ে দিয়েই উল্লসিত হয়ে ছুটে গিয়ে সমভাকে জড়িয়ে ধরল:

'আমরা জিতেছি রে জিতেছি! এখন দেড়টি মাস তো চোখটি বুজে থাকো এখানে। তোমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা চলবে, বুঝেছ...'

'সত্যি?' চিৎকার ক'রে ওঠে লুবাশা।

'সত্যি নয় তো কি! সত্যি গো, সত্যি! তিন সত্যি! শুধু ও লোকটার কাছে তোমার একটিবার যেতে হবে।'

'বাবাঃ, এখন আর্কবিশপের কাছে যদি যেতে বল, তাও যাব।'

'তাহলে লাগাও ভোজ। গোঘিন্‌রা এল ব'লে। আমি ভালো ভালো খাবার-টাবার একেবারে কিনে নিয়ে এসেছি।'

*

খুশির পাগলা-ঝোরা ছুটল। মেয়েরা ওয়ালট্‌স্ নাচে উন্দাম হয়ে উঠেছে। আনফিমিয়েভনা টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে হল্‌দে দাঁতগুলো বের ক'রে গন্‌ গন্‌ করছে:

'নাচ হচ্ছে এখন! নাচতে নাচতেই সব যাবে!'

ওর আঁট-সাঁট মুখখানা আনন্দে চক্‌চক্ করছে। এমন ক'রে নিশ্বাস নিচ্ছে যেন সুগন্ধি বাতাস। আবার ঘরের দরজায় গোঘিনের মুখ দেখা যায়; গুনগুন ক'রে মার্চিং সুরের কয়েকটা কলি ভাঁজে খানিকক্ষণ, গাল দুটোকে ফুলিয়ে দুই আঙুল দিয়ে টিপে দেয়; চিক্ চিক্ ক'রে একটা শব্দ বেরোয় সুন্দর গোঁফজোড়ার মধ্য

দিয়ে। সঙ্গে একটি মেয়ে, সোনালি রঙের এক মাথা ঝাঁকড়া চুল উঁচু কপালটার ওপর এসে পড়েছে। অবাধ্য চুলের রাশ। ক্লিমের দিকে তাকিয়ে চোখের সোনালি তারায় ঝলক ফুটিয়ে বলল :

'সামঘিন না? আপনার কথা শুনেছি। আপনি একটি রহস্য।'

'কে বলেছে, বলুন তো?'

'যাকব তাঘিলাস্কি। অবশ্য ও ও লোকটার কথা আমরা বিশ্বাস করিনে। কিন্তু দেখছি মিছে বলেনি ও। আপনার চেহারাটা বিদ্বানের মতো। তাতে আবার খানিকটা সংসারী ছাপ পড়েছে এই দাড়ির জন্য। আপনার ওপর শ্রদ্ধায় আমরা ফেটে যাচ্ছি। য়্যাই, য়্যাই আলিওশকো, ফাজলামী করো না। থামো বলছি।'

শেষের কথাটা বলল গোঘিনকে। গোঘিন ওকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে সামঘিনের কাছ থেকে অনেকটা দূরে ছেড়ে দিল।

'অবাক হচ্ছেন আপনারা? এ মেয়েটা একটা পুতুল। ওর ভেতরে শুধু করাতের গুঁড়ো ঠাসা। ও কথা বলে...'

'ওর একটা কথাও বিশ্বাস করো না। মিথ্যুক কোথাকার।' ভাইকে কাঁধ দিয়ে ঠেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল তাতিয়ানা। লুবাশা গোঘিনকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে গেল। ভারভারা তাতিয়ানাকে নিয়ে কাজে লাগল। সামঘিনও ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কারণ এই ধরনের মানুষের সামনে কিভাবে চলতে হয় ও ঠিক জানে না, বড় বিব্রত বোধ করে। ওর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এরা নিজেদের যথাযথ চেনে না। পেশাদারী ওদের স্ফূর্তি; ঠাট্টা-তামাশা করা এদের ব্যবসা। যে হাসি-মস্করায় বিন্দুমাত্র হাসি নেই, তাতে হাসতে বাধ্য হওয়া সীরিয়স্ লোকেদের পক্ষে বিড়ম্বনা। এই তো গোঘিন্ লুবাশাকে হুকুম ক'রে চলেছে :

'এই অমন গাঁ গাঁ ক'রে চেঁচাবে না। প্রমাণ হয়ে গেছে রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির মেয়ে। সুতরাং বাবা তো মেয়ের পিছন পিছন ছুটবেই...'

ভারভারাকে উপদেশ দেয় ঠিক যেন পাদ্রী বাইবেল পড়ছে :

'মহাত্মা আরিস্ততল সত্যই বলিয়াছেন—মনুষ্য যদি চন্দ্রলোকের ঊর্ধ্বে উত্থান করে, তবে উহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। অতএব হে আমার প্রিয় ভারভারা, অধিক উদ্ধত হইও না!'

তাতিয়ানা সর্বদা 'আমরা' বলে কথা বলে, 'আমি' বলে না। সামঘিন কারণ জানতে চাইতে বলল :

'আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মধ্যে মেলা-মেলা মানুষ আছে যারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটকাটি করে মরছে।'

'শুনে একটুও হাসি পেল না সামঘিনের। পরে অবশ্য কথাটা মেনে নিয়েছিল ও। এত বেশী রকম হৈ-হল্লা করে তাতিয়ানা, সামঘিনের মনে হয়, ওর মনের মধ্যে বড় অশান্তি, বড় চাঞ্চল্য, তাই ঢাকতে চায় ও। তাতিয়ানার মতো মানুষেরা একলা থাকলে কি রকম হয় ও ভাবতেই পারে না। অথচ ওর বিশেষ গর্ব আছে যে নিজের একান্তে গর্ব-অহংকার সমস্ত আবরণ ঘুচিয়ে একলা হয়ে নিজস্ব রূপটিতে ফিরে যাওয়ার নিখুঁত ছবি ও আঁকতে পারে। কিন্তু তাতিয়ানাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। ওর কথার মন্থর গতির সঙ্গে একটুও মিল নেই ওর অতিদ্রুত স্নায়ু-ক্ষুব্ধ ভাব-ভঙ্গির; ওর হলদেটে ধাতব অসুন্দর চোখ দুটির অবিশ্বাসের দৃষ্টিকে মিথ্যে ক'রে তোলে ওর ভাঁড়ামী। অতি মনোরম ওর দেহের গঠন, কিন্তু সুষ্ঠু গভীর ধোঁয়া রঙের যে পোশাকটা ও প'রেছে সেটি শ্রী-ছাঁদহীন, যেমন তেমন ভাবে আলখাল্লার মতো দেহটার ওপর লটকে আছে। সোজা সোজা খ্যাঙড়া কাটির মেটে রঙের চুলগুলো ওর রুগ্ণ শীর্ণ মুখখানাকে ঘিরে লেপ্টে পড়ে আছে।

লুবাশার কাছে ও নরম সুরে কাকুতি করে : 'আলিওশার সঙ্গে অমন ক'রে লেগো না ভাই।' একই নিশ্বাসে ভাইকে ধমক দেয় : 'থামোতো এখন, যথেষ্ট ইয়ারকী হয়েছে।' সেই সঙ্গেই নিজের আধা-খালি কাপটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে : 'ভারিয়া, খুব কড়া এক পেয়ালা চা ঢালো দেখি।' ক্লিমের মনে হয় স্রেফ্ কথার খাতিরে কথা বলছে তাতিয়ানা, কিছু মানে ক'রে বলছে না। আদরে আদরে ওর মস্তিষ্কটি চর্বন করা হয়েছে, তাই ও অমন খেয়ালী, মেজাজী। ওর ঠিক পাশেই বসেছে তাতিয়ানা। ওর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল :

'ওহে মহাগম্ভীর, একটা কথা বুঝিয়ে দেবেন? আমি বুর্জোয়া পরিবারের মানুষ। দিব্যি আরামে-আয়েসে তো আছি। কিন্তু হাঁপিয়ে উঠেছি। এসব একটুও ভালো লাগছে না আর। কেন বলুন তো?'

'হয়তো মাথা খুব বেশী ব'লে। দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।' হিসেব না করেই কথাটা বলে ফেলল সামঘিন। ওর মনে হলো, তাতিয়ানা যেন কোন গম্ভীর আলোচনা করতে চায়।

'মাথা-টাথা আমার নেই।' একটা চামচ নিয়ে খেলা করতে করতে তাতিয়ানা বলে : 'আমার মনে হয় মাথা নয়, মন। তা কি করি বলুন তো?'

ওদিকে শ্রীমতীর ভাইটি লুবাশা আর ভারভারার সঙ্গে বেশ জমিয়ে তুলেছে, সেদিকে নজর রাখতে পারছে না ও মেয়েটার জ্বালায়। ভারী বিরক্ত লাগছে ওর। চশমার মধ্য দিয়ে তাতিয়ানার দিকে তাকিয়ে ও বলে :

'একটু চেষ্টা ক'রে জেলে থেকে আসুন না ক'টা দিন।'

'তাতে সারবে রোগ?'

'তা কিছু সাহায্য হবে বৈকি। মুখ বদলাবে, বুর্জোয়া জীবনের আরামটা হয়তো ভালো লেগে যাবে।'

একটু হেসে তাতিয়ানা বলে : 'মানুষের সম্বন্ধে আপনার ধারণা তো খুব উঁচু নয়!'

'নয়ই তো।' বলে ও উঠে পড়ে আলেক্সির হাতের দিকে তাকিয়ে। হাত তুলে বলছে আলেক্সি :

'ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ, এখানে যাদুর কিছুই নেই। শুধু হাত সাফাইয়ের ব্যাপার—তাও রীতিমত বৈজ্ঞানিকভাবে। আচ্ছা, এই দেখ, আমার জামার দুই ধারে তিনটে ক'রে বোতাম আছে—আছে তো!'

তারপর জামাটার বোতাম লাগিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে :

'ফুস মন্তর ফুস!'

বলেই জামার বুক খুলে দেখায়—এক দিকে দুটো, আর এক দিকে চারটে বোতাম। বুক ফুলিয়ে বলে : 'আমি নিজে এটা মাথা থেকে বের করেছি।'

'কি ক'রে করলে আলিওশা!' ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে লুবাশা। ভারভারা ওর হাত ধরে টানাটানি লাগিয়ে দেয় :

'দেখি তোমার জামার আস্তর!'

তাতিয়ানা পিয়ানোতে গিয়ে বসে। কার যেন নকল ক'রে চাপা সুরে গান ধরে :

'বনে উপবনে কুসুম কাননে
বিহার করিনু কত,
বিশ্বভুবনে এ হেন কুসুম
না হেরি তোমার মত!'

যেমন কথা তেমনি সুর। ভারভারা একটা সিগারেট-কেস নিয়ে হিম্‌সিম্‌

খাচ্ছে, কিছুতেই খুলতে পারছে না। অথচ এইটেই কড়ে আঙুলের শুধু একটু-খানি ছোঁয়ায় বার বার খুলেছে গোঘিন্। সুবোলা ওর কাণ্ড দেখে হেসে কুটিপাটি। কেসটা গোঘিন্ কাঁধে রেখে একটুখানি কাঁধ নাড়তেই ওটা টুপ ক'রে ওর পকেটে পড়ে গেল। তারপর দুই হাতে মাথার চুলগুলো আলুথালু ক'রে রাগ-রাগ মুখ ক'রে চোখ পাকিয়ে বোনের কাছে গিয়ে হাঁক দেয় :

'এইও! ম্যাস্কট্ বাজা। এই, ধর সবাই।'

মিষ্টি গলা গোঘিনের। আরম্ভ করে ·

'এক টেবিলে তিনটে বাতি
শোনরে ভাই কথা খাঁটি
কাউকে রে যম টানবে দেখিস
বলে দিলাম সার.কথাটি।'

গম্ভীরভাবে কোরাস ধরে সবাই—'মরণ আছেই! '

তক্ষুণি আবার খুশির জোয়ার উথলে ওঠে :

'হাঁচি কাশি টিকটিকি
কোনটাই ভাই নযরে মেকী।—'

তার পরের পদটি একলা গায় গোঘিন্ .

(তোর) মনের মধ্যে নাই পদার্থ
(তাই) কুসংস্কার তোর পরমার্থ।
(রাতের বেলা) সব বেড়াল তুই কালো দেখিস্
(আর) মেয়েগুলো সব অপ্সরী।

তাতিয়ানা ওর মাথায় চাঁটি মেরে বলে উঠল :

'যাচ্ছে তাই!' চোখের নিমেষে অদ্ভুত শক্তিতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে তাতিয়ানাকে একেবারে কাঁধে তুলে নিল গোঘিন্। এ কসরৎ যেন ওর বহু অভ্যাসে রপ্ত। তাতিয়ানার বান্ধবীরা ওর হয়ে রুখে উঠল। চারজনে মিলে এক ভীষণ হুটোপাটি শুরু হলো। সামঘিন দেখল এই বৃত্তের মধ্যে ও বাহুল্য। সুতরাং এক অলক্ষ্য মুহূর্তে নিশব্দে সরে পড়ল।

॥ ১২ ॥

হাল্কা ধূসর রঙের একটা কুয়াশা সারা শহরের বুক চেপে রয়েছে। তার মধ্যে গাছে পাতায় সর্বত্র তুহিন-চূর্ণের কারুকার্য। গাছের ডাল টেলিগ্রাফের তারে ঝুলে আছে বিন্দু বিন্দু তুহিনকণা। হিমেল হাওয়া ক্রুদ্ধ চাবুকের ধার নিয়ে ক্লিমের চোখে-মুখে মারছে। ক্লিম ভাবতে ভাবতে চলেছে; ভারভারা ওর অধিকারগত হলেও ওর সাহচর্য তার পক্ষে মোটেই সুখের হবে না। মারাকুয়েভ বা কোন অভিনেতার সাহচর্যে ভারভারার নিশ্চয়ই সব রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং ক্লিমের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেমে-পড়া কুমারী মেয়ের মতো ব্যবহার ওর কোনমতেই সাজে না। অথচ অই ক'রে চলেছে মেয়েটা। সুতরাং একটু শাস্তি পাওয়া ওর দরকার। মনকে ও ঠিক করেই নিল :

'আর দেরী নয়, দয়ামায়াও নয়।'

দু'চার দিনের মধ্যেই সানন্দ বিস্ময়ে ও দেখল অতি সুস্পষ্ট বিশিষ্ট একটি ইচ্ছেকেই কেন্দ্র ক'রে সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে উঠছে। যে আকর্ষণে ওর মন অমন উন্মাদের মতো লিদিয়ার পেছনে ছুটেছিল তার সঙ্গে ওর আজকের অনুভূতি ও তুলনা করতে গিয়ে ও দেখল যে ওর মন বলছে সেদিন ওর সহজাত প্রবৃত্তি নির্লজ্জ-ভাবে ছলনা করেছিল। যার ফলে ও অমন রোমান্স আর অসম্ভবের আশায় পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই। আজ আছে শুধু আত্মসমর্পণোৎসুক একটি নারীকে লাভের কামনা—যে-কামনা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বুদ্ধিমার্জিত। আত্মস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস ক্রমশঃই ওকে কঠিন ক'রে তুলছে। শেয়ালের ওপর শিকারী কুকুরের দৃষ্টি দিয়ে ও ভারাভারার ওপর প্রহরা রাখে। একাধিক বার ও সঙ্কল্প করেছে : 'আজই।'

কিন্তু বাধা এসেছে প্রতিবার। ও বোঝে প্রতিটি বাধা ওকে ভারভারার ওপর আরও ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছে; ভারভারার সঙ্গে ওর বাঁধন আরও শক্ত করছে। কখনও ওকে একা পায় না ক্লিম। ওকে নিজের বাসায় নিমন্ত্রণ করে যে ডেকে আনবে, সে সাহসও পাচ্ছে না; এমনিতে ও কখনও আসেনি ক্লিমের বাসায়। ক্লিম যখনই আসে, গোঘিন্‌রা থাকবেই। ভাই-বোন দুটি মানিকজোড়—এক সঙ্গেই আসে। নয় তো রয়েছে সেই প্যাঁচামুখ গুসারভ্—যার মহা ভাবনা সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের "ইস্তাহারটাতে" নারোদনিক আর মার্ক্সবাদীদের মধ্যে আপোষের কোন চেষ্টা করা তো হয়ই নি, বরঞ্চ তাদের বিরোধিতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

কখনও ভারভারা, কখনও তাতিয়ানার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে ও মনে মনে গজ গজ করে : 'যেখানে অন্ন-চিন্তা চমৎকারা, সেখানে আবার অত ইণ্টেলেকচুয়েল সূক্ষ্মতা কেন?'

তাতিয়ানা ওর দিকে একবারও তাকায় না। গুসারভ্ গোঘিন্-এর সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে তুলেছে। 'আপনি' ছেড়ে একেবারে 'তুমি'তে নেমে এসেছে। ছাত্রের মতো মনোযোগ দিয়ে ওর ভাঁড়ামো শোনে। আলেক্সি চোখ মিচ্‌কিয়ে ওকে বলে :

'আরে চটছ কন? সব ঠিক হ্যায়। মার্ক্সবাদীরা বড় চালাক। তোমাদের ভাবখানা ওরা ঠিক বোঝে। রাগী "হৃদয়ের" সঙ্গে হিসেবী "মস্তিষ্কের" জুড়ী বাঁধতে ওদের লেশমাত্র আপত্তি নেই।'

গোঘিন্‌কে ও যতই দেখে, ততই যেন তার প্রতি ওর মনের অপ্রেমটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষটার সৌন্দর্যহীন চেহারা, হ্যাব্‌লামো, আঁট পাৎলুন, স্বচ্ছন্দ চলাফেরা সবই অতি বিশ্রী লাগে ওর। কিন্তু স্বীকার করতে বুকে জ্বালা ধরলেও স্বীকার ওকে করতেই হয় যে অত্যন্ত ইণ্টারেস্টিং মানুষ এই গোঘিন্—অনেক পড়েছে, অনেক জানে, এবং জামা-কাপড় পরার মতোই সহজ নৈপুণ্যে অধিগত বিদ্যার প্রয়োগ করে। বোঝা যায় বিপ্লবী আন্দোলনের সব খবরই ও রাখে। তবে নিজে কোন দলভুক্ত কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ রকম একটা চালবাজ ভাঁড় যে কোন ক্ষুদে পার্টিরও সভ্য হতে পারে, তা ক্লিমের ধারণার বাইরে। অবশ্য গোয়েন্দা-টিকটিকিরাও ঠিক এমনি। ওরাও সবজান্তা হয়; বিদ্যের মুখোস পরিয়ে নিজস্ব সত্যটাকে কেমন ক'রে ঢেকে রাখতে হয় তা জানে।

গুসারভ্-এর একটুতেই মনে আঘাত লাগে। ওটা ওর বিলাস। ক্লিম শোনে, ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য গোঘিন্ নারোদনিক আর মার্কসিস্ট—দুদলেরই ওকালতী করে। বলে :

'ছোটখাট হলেও একটা দলে ভিড়ে পড়তেই হবে। লিবারেলদের আর কিছু না হোক শুধু ওদের উড়নচণ্ডে ছেলেগুলোকে একটু শিক্ষা দেবার জন্য আর অবাধ্য চেলাচামুণ্ডাদের ঢিট করবার জন্য হলেও ও-কাজটা করতেই হবে। সব ঠিক হো জায়গা। গজ গজ করো না।'

গোঘিন্ ক্লিমের সঙ্গে যথারীতি ভদ্র ব্যবহার করে; কিন্তু তার মধ্যে অন্তরঙ্গতার কোন আগ্রহ নেই। ভারী খারাপ লাগে ওর। লুবাশা আর ভারভারার সঙ্গে ওর ব্যবহার ও যেন একট বাচ্চা ছেলে, বহু পুতুলের মালিক এবং প্রত্যেকটি নিয়েই ও ভারী খুশি। এরাও যেন ওর খেলনা। ভারভারা খোলাখুলিই ওর সঙ্গে ঢলাঢলি ক'রে। সামঘিনের মনে হয় এ যেন একটু বাড়াবাড়ি।

তাতিয়ানা ওকে প্রশ্ন ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে :

'আচ্ছা "ক্ষরিফু"দের সম্বন্ধে আপনার মত কি? কথাটা ফরাসী ভাষা থেকেই অনুবাদ যদিও বহু বিলম্বিত—আর জনসাধারণকে চমকে দেওয়ার একটা ফন্দী —শুধুমাত্র এইটুকু? আর কিছু না? কিন্তু আপনি কি জানেন না যে অদ্ভুত হলেও ভারলালেইন আর ভারহাররীন দুইয়ের ওপরই আগ্রহটা সমান?'

সামঘিন বুঝতে পারে যে ওকে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না এই আয়ত-নয়না; তাই এই পরীক্ষার আয়োজন। কিন্তু বুঝতে পারে না 'পোষ্য' ভাইটির ওপর ওর সত্যিকার মনোভাব কি? বারে বারেই ওর চোখ দুটি অলেক্সির মুখের দিকে ফিরে আসে—দৃষ্টিতে কিসের যেন অস্থিরতা। হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় পীড়িত স্বামীর দিকে এমনি চোখেই চেয়ে থাকে স্ত্রী। স্বামী অপ্রত্যাশিত একটা কিছু করবার মুহূর্তেও তার চোখে এমনি দৃষ্টিই বুঝি ফুটে ওঠে।

অঘটন ঘটে গেল একদিন। ভারভারাদের বাড়ি এসেছিল সামঘিন। যাবার সময় ওকে এগিয়ে দিতে এল ভারভারা। কিন্তু বিদায়-বেদনায় কাতর না হয়ে বুঝি খুশি হয়ে উঠল ও-মেয়ের চোখ। সামঘিন সইতে পারল না। হঠাৎ ওকে ধরে এক হাতে গলাটা জড়িয়ে, আর এক হাতে ওর মাথাটা পেছনের দিকে উল্টে ধরে ওর ওষ্ঠের ওপর নিজের মুখ চেপে ধরল। ভারভারা ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ে কাঁপতে আর হাঁপাতে লাগল। দুই চোখে উথলে উঠল জল। আর সামঘিন—যেন এইমাত্র প্রতিপক্ষের ওপর বেশ সাফল্যজনকভাবে প্রতিশোধ নিয়ে বাকীটুকুর জন্য আতে রীতিসঙ্গতভাবে সাবধান ক'রে দিল—এমনি একটা ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

*

এ ঘটনার কয়েক দিন পরের কথা। সামঘিন ভারভারাদের ওখানে গেল। ভারভারা বাড়ি ছিল না। খাবার ঘরে গোঘিন্‌রা আর ল্‌বাশা বসেছিল। ওকে দেখেই ল্‌বাশা চিৎকার ক'রে উঠল :

'আরে ও-মন্‌ষটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম!' এক নিশ্বাসে বলে গেল ও, লিউতভ্‌দের বাড়িতে একটা নাচ-গানের জলসা হচ্ছে, লেখকরা আসবেন। বোধহয় এরমোলোভা নিজেও আসবেন।

'আলেনাও আসছে, জানো? মোটকথা গ্র্যান্ড পার্টি হবে। ফ্যান্সিড্রেসও হচ্ছে। অবশ্যি যার খ্‌শি ফ্যান্সি ড্রেস পরবে। টিকিট পাঁচ র্‌বল-এর কম কিছ্‌তেই রাখা হবে না। এবার বল, তুমি ক'খানা টিকিট বেচে দিচ্ছ।'

'কি ব্যাপার, কিসের জন্য জলসা করছ, টাকাটা কোথায় যাবে এসব না জেনে কি ক'রে বলি?' টিকিট বেচা কি ক'রে এড়ানো যায় তারই একটা উপায় খ্‌জতে খ্‌জতে ও বলে। তাতিয়ানা কি যেন লিখছিল একটা কাগজে। জবাব দিল :

'যে সব কামচাদাল (Kamchadal) অন্ধ হয়ে গেছে তাদের সাহায্যের জন্য।'

কতকগ্‌লি কাগজের ট্‌করো গ্‌ণছিল ওর ভাই। সে জানাল :

'একটা উদ্দেশ্যও আছে। ক্রেমলিনের ভাঙ্গা দেয়ালগ্‌লি আবার তোলা দরকার।'

টিকিট বেচার কাজটা যতই বিশ্রী লাগ্‌ক, এতগ্‌লি লোকের সামনে অস্বীকার করতে সাহস হলো না সামঘিনের। পাঁচখানা মাত্র ও নিল, মনে মনে ঠিক করল, প্‌রো টাকাটা নিজেই দিয়ে দেবে। কিন্তু জলসাতে যাবে না।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলাল। এবং নির্দিষ্ট দিনে হেকিম সেজে ও লিউতভ্‌দের বাড়ি এল। অতি পরিচিত হল্‌টার দোরের কাছে বসে টিকিট নিচ্ছিলেন একজন সন্ন্যাসিনী। ম্‌খে ম্‌খোস থাকা সত্ত্বেও ওষ্ঠের অনিচ্ছ্‌ক হাসিতে গোপন রইল না মান্‌ষটি কে। বড় হলের প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে আছে লিউতভ্‌ নিজে জড়ির কাজ করা জামা গায়ে, হাতে একটা বাঁকা তলোয়ার, মাথার ওপর ছাতার মতো ক'রে ধরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খ্‌ব হাঁচছে আর কাশছে আর লম্বা সেলাম ক'রে একটানা স্‌রে 'আস্‌ন! আস্‌ন!' ব'লে অভ্যাগতদের স্বাগত করছে।

ওর বাঁকা চোখ দ্‌'টি যেন আজ আরও চঞ্চল হয়ে কেবলি এদিক ঘ্‌রছে। ওর দৃষ্টি দেখে মনে হয় ও যেন এই ভাঁড়ের সাজ দ্‌ই হাতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ঘামে ম্‌খখানা ভিজে গেছে। র্‌মাল বের ক'রে ম্‌খ ম্‌ছে র্‌মাল ঝাড়ছে ধ্‌লো ঝাড়ার কায়দায়। সামঘিনের মনে হয় এই পোশাকের চেয়ে হাতের তলোয়ারটার বদলে কোমরে দোয়াত ঝ্‌লিয়ে সেকেলে কেরানীর পোশাকে যেন ওকে মানাত বেশী।

নাটকীয় ভঙ্গিতে লিউতভ্‌কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দরজার কাছে আসতে বাধা পেল ক্লিম :

'কে? পারাসেলসাস্‌? এগ্রিপ্পা? হ্যাঁ!' লিউতভ্‌-এর কাঁধের কাছে ম্‌খ এনে অচঞ্চল উদ্বেগে বলতে লাগল : 'আস্‌ন, আস্‌ন—হিঃ হিঃ হিঃ—'

পথ বন্ধ ক'রে জটলা করছে এক দল। তার মধ্যে ওরই চেনা দ্‌'জন আইনজীবী

আয়েন—পুরো এজলাসী পোশাকে এসেছেন। এঁদের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন রোগা টিকটিকে এক যুবক, পরনে নীল ডুরিদার সার্ট আর নীল প্যান্ট, কোমরে দড়ি বাঁধা; পায়ে চামড়ার জুতো, মাথায় খড়ো রঙের পরচুলা। মজার দেখতে। এলোপাতাড়ি আঠা দিয়ে লাগান এক মুখ দাড়ি। সব মিলিয়ে চেহারাটা সস্তা শুঁড়িখানার ভাঁড়-গাইয়ের মতোই লাগছে বেশী। লোকটাকে চেনে ক্লিম —চমৎকার গলা। চেখভের গল্প ওর মতো অমন সুন্দর ক'রে কেউ পড়তে পারে না। মনটা চমৎকার, পাকা বোহেমিয়ান গোছের মানুষ। দাঁড়িয়ে ব'লে চলেছে :

'কররুনভ? সে তো ইস্কুলের ছেলেদের জন্য। আচ্ছা, তার কথাই বলছি।... পথ ছাড়, পথ ছাড়, ম্যাজিশিয়ান এসেছে! পথ দাও—' বলে চিৎকার করতে করতে ক্লিমের জন্য পথ করতে লাগল।

হলের মধ্যে জনচল্লিশেক লোক। দরজা-জানালার ফাঁকে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গান আবছা আয়নার প্রতিফলিত হয়ে চল্লিশ জনই বহু গুণ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার পাঁচিলের গা থেকে জীপ্‌সী জমিদার ভাঁড়ের দল কিলবিল ক'রে বেরিয়ে আসছে। ঘব ভরে উঠল, নাচের জায়গা বুঝি কুলোবে না। আয়নার প্রতিচ্ছবি থেকেই বুঝতে পারল সামঘিন বাজনার শব্দ আসছে হলের একটা কোণ থেকে; পুতুল রাক্ষসের মতো ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা কালো একটা লোক চেয়ারে বসে একে বারে পিয়ানার চাবির ওপর এমন লম্বা লম্বা আঙুল চালাচ্ছে যেন ময়দা ঠাসছে। এতগুলো মানুষের পায়ের শব্দ, হাসি, গল্প চিৎকারে বাজনা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। কিন্তু ঝাড়-লণ্ঠন দু'টির স্ফটিকের ঝালরগুলি যেন ভয় পেয়ে ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠছে। সেই শব্দ কানে আসছে সব ছাপিয়ে।

নাচিয়েদের মধ্যে ভারভারাকে ও এক মুহূর্তেই চিনে নিল। সবুজ রঙের পোশাক ঘাসের মতো করে সবুজ ফিতে লাগান; পায়ে রুপোলী বুটি-দেওয়া মোজা আর এলো চুলের ওপর হলদে ফুল দেওয়া ঘাসের মালা। মুখে মুখোসের আবরণ নেই, আছে নিপুণ হাতের মণ্ডন—আকর্ণ-বিস্তৃত বসে-যাওয়া দুই চোখ, অস্বাভাবিক বাঁকা ভুরু, বিবর্ণ ঠোঁট—সব মিলে সারা মুখে একটা ব্যথার রঙ ঢেলে দিয়েছে; দিয়েছে এক নেশা-ধরানো অমানুষী রূপ। আশ্চর্য লঘুছন্দে ওকে চরকির মতো বাঁই বাঁই ক'রে ঘুরিয়ে নেচে চলেছে মোটা এক চীনা-ম্যান নীল জামে গায়ে, গোল মাথা, হুলো বেড়ালের মতো মুখ; ওর লম্বা বেণীটা ভারভারার নিরাবরণ পিঠে কাঁধে সপাং সপাং ক'রে বাড়ি মেরে চলেছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে এমনি হাসতে হাসতে নেচে চলেছ ভারভারা; পা বুঝি মাটি স্পর্শ করছে না। বুনো লতায় জড়ানো মাথাভরা চুলের রাশ—তার ভারে মাথাটি হেলে আছে পেছন দিকে। মাছের দাঁতের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতের সারি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

এক বৃষ-স্কন্ধ নাবিক সামঘিনের সামনে এসে বলতে আরম্ভ করল :

'এই যে মশায়, মাফ করবেন—শুনুন! পেত্রাঝিৎস্কির মধ্যে ব্যবস্থা-বিজ্ঞানের...'

সামঘিন তার যাদুকরের দণ্ড ওর কনুইতে ঠেকাতেই লোকটা পাক খেয়ে সরে গিয়ে চেনা কাকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে উঠল :

'ভাগ বুজরুক কোথাকার!'

'এই ও, বুজরুক বলবে না, আমি ম্যাজিশিয়ান।' কঠিন স্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠল কে একজন।

'আমার অচ্ছেন্দা গ্রহণ করুন।' গম্ভীরভাবে বলে উঠল ক্লিম।

দুবাশা হয়েছে কৃষকবালা। গোল মুখটা বহুরূপীর মতো ক'রে চিত্র করা।

রঙগীন একটা বলের মতো গড়িয়ে লাফিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ভিড় ঠেলা ঠেলে ছট্‌ফট্‌ ক'রে বেড়াচ্ছে ও আর চিৎকার করছে :

'আমার নাগর কে? আমার নাগর কে হবে গো?'

সামঘিন ঘুর-ঘুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাচের আসরের মধ্যে নাচিয়েদের বাধার সৃষ্টি ক'রে; ছদ্ম-দৃষ্টি মানুষের মতো ক'রে দেখছে সবাইকে। ওর পোশাকটা বারে বারে জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে। রাগ হচ্ছে নিজের ওপরই, কেন এমন একটা অসুবিধার জিনিস ও বেছে নিল। মুখোস-পরাদের মধ্যে গোঘিন্‌কে চিনতে পারল ও। ফাউস্ট-এর ছদ্মবেশে এসেছে ও। ওর হাতে-ধরা ক্লাউনটি নিশ্চয় তাতিয়ানা। ওকে এক ধাক্কা দিয়ে টুটি চেপে ধরে দাঁড়াল এক ভাঁড়—এলোমেলো জটপাকান একটা পরচুলা মাথায় আর ইতালীয় দস্যুদের মতো টুপী পরা। চাপা স্বরে ক্ষমা চাইল :

'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন কুসংস্কার কুমার। আপনি কুসংস্কার কুমার তো?'

জবাব না দিয়ে সামঘিন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। ওদিকে জানালায় বসে তামাক খাচ্ছে আধখানা মুখোস আর ঝুটো দাড়িপরা দশাসই চেহারার কে একজন। মধ্যযুগীয় গিল্ডের কামার-কুমোরের মতো পোশাক পরা। ওর চামড়ার তৈরি এপ্রনটি চারদিকের রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ওকে বিশিষ্ট ক'রে তুলেছে। নাচ শেষ হলে চীনাম্যানটি সযত্নে ভারভারাকে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল। আগের লোকটা ছুটে গিয়ে ওর ওপর ঝুকে পড়ে দাড়ি বাগিয়ে বলতে লাগল :

'জল-কন্যে, অমন দুটি আঁখিপল্লব নিয়ে জলে থাকা তোমার সাজে না। এস এস, ওগো সুন্দরী, জল ছেড়ে এস আগুনে, এস নরকের...'

'নরক আমার আত্মায়। কিন্তু আমি তো জলকন্যা নই, আমি বনদেবী।'

স্বরে চিনতে বাকী রইল না—লোকটা কুতুজভ্‌। ক্লিমের মনে হয় ও ঠিক যেন হান্‌স্‌ শাখৎস্‌-এর মতো। মনে মনে বলে ও :

'ক্ষয় নাই ওর, লয় নাই।'



ভারভারার চারদিকে ভিড় জমে গেল। বুনো পাতার তৈরি পাখা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে ভারভারা সকলের দিকে তীক্ষ্ম চঞ্চল দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে সকলের হাসি-ঠাট্টার জবাব দিতে লাগল, একটু চিৎকার করেই।

সামঘিন বোঝে ওকেই খুঁজছে ভারভারা। উঁচু গলায় নিজের হদিস দিচ্ছে ও। বিশেষ যে খুশি হলো সামঘিন তা নয়। এ যেন ওর জানাই ছিল। কিন্তু এই রঙবাহারী, বিচিত্র-বেশ মানুষগুলি থেকে নিজের একটা দূরত্ব বোধ ওকে মনে মনে বড়ই বিব্রত, বিরক্ত করতে লাগল। এই দূরত্ব বোধ ওকে আর কখনও এমনি ক'রে ক্লিষ্ট করে নি; বরং সবার থেকে নিজের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিকে স্ফীত ক'রে মনকে প্রসন্ন করেছে। আজ এই যে বিসদৃশ বেমান পোশাক অঙ্গে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে—যার জন্য তুর্কী হাঁসের মতো বুক ফুলিয়ে ঠাট ক'রে চলতে বাধ্য হচ্ছে ও—এই অস্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে ও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের একটা ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করল ক্লিম। কিন্তু ও মনে মনে জানে ব্যাপারটা তা নয়। কুতুজভের কাছে ধরা পড়ে গেলে ওর যে অত্যন্ত বিশ্রী লাগবে ও অস্বস্তি বোধ হবে, আসলে এইটেই ও চাপা দিতে চেষ্টা করছে নানান ভাবনা দিয়ে।

'নিশ্চয় ও বে-আইনীভাবে এই মস্কোতেই আছে।'

আবার পিয়ানো ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠল। চীনাম্যানটি পড়ে যাবার ভঙ্গী ক'রে হাত বাড়িয়ে ভারভারাকে ধরে ফেলল। সৈন্য-পুতুলের মতো সাজকরা লোকটি একটি স্থূলকায়া হারেম-বাঁদীকে বাহুবন্ধ ক'রে নিল। কিন্তু সে হাঁটুর বক্‌লস্‌টা একটু আঁট করবার জন্য একটু উপুড় হতেই শ্রীমতী ডুরীদার পোশাক পরা আর একজন ক্লাউনের সাথে পালিয়ে গেল।

'দুত্তোর ছাই!' ব'লে হাঁটুর বক্‌লস্‌টি ছিঁড়ে ফেলে সৈন্য-পুতুলটি একটা আরশীর পেছনে গিয়ে লুকোল। যাবার সময় সামঘিনকে লক্ষ্য ক'রে বলে গেল : 'বিশ্রী একটা পুরোনো পচা বাড়ি—হাওয়া আসবার কোন রাস্তা নেই।'

সামঘিনের কিছুই ভালো লাগছে না। ঘুরতে ঘুরতে খাবার ঘরে এল। লম্বা টেবিলে স্তূপাকৃতি সাজান রয়েছে স্যাণ্ডউইচ্ আর মদের বোতল। দু'জন মহিলা ভারী ব্যস্তভাবে ছুটো ছুটি করছেন। একজনের চেহারা স্পেন-দেশীয়, চমৎকার গড়ন, গভীর কালো ভ্রূ। দ্বিতীয় মহিলাটির ফুলো গাল, পরনে রুশ কৃষাণীর সারাফান ক্লোক, মাথায় রুশ দেশীয় আচ্ছাদন, চোখে পাঁশনে। নাকটা অতি মাত্রায় চ্যাপ্টা হওয়ায় পাঁশনেটা ঠিক মতো বসেনি, বার বার খুলে পড়ছে। মহিলা ভীষণ রেগে গিয়ে ওটা চেপে ধরে জনৈক ওয়েটারকে উপদেশ দিচ্ছেন :

'দেখো বাবা একটু, কেউ যেন না খায়।'

এক ধারে বিরাট এক সামোভার টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটছে। স্প্যানিশ মহিলা গেলাশে গেলাশে চা ঢালতে ঢালতে বলছেন :

'ভুল হলো প্লেঘেয়া পেত্রোভ্‌না। একর্ণ দিলে তো মাংস তোতো হয়। মল্ট দিলে ভারী সুন্দর নরম হয়।'

দ্বিতীয় মহিলা জবাব দিলেন : 'মল্টে বেশ ক'রে নুন দিতে হয়।'

একটা বোতল তুলে নিয়ে সামঘিন জানালার ধারে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। আলমারী আর দেয়ালের মাঝখানের জায়গায় তাঘিলস্কি বসে দোমড়ান মুখোসটা দিয়ে হাঁটুর ওপর তাল ঠুকছে। ওর পরনে নীল পোশাক, মাথায় অগ্নি-নির্বাপকদের মতো শিরস্ত্রাণ, পায়ে তাদেরই মতো ভারী বুট। মুখখানা যেন চীনামাটির তৈরি। পোশাকটা তার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। দেখে বোঝা যায় পানের মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছে। সামঘিনের দিকে ঠায় তাকিয়ে বসে বসে দাঁত বের ক'রে হাসে।

'ম্যাজিশিয়ান সাহেবের দিল শরীফ তো?' কথা পাড়ল ও।

ক্লিমের গলায় স্বরটা বদলে গেল, কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। জবাব দিল :

'তা দিল-শরীফ র‍্যাখার মন্তর আমার একটু বেশী রকমই জানা আছে।'

'আমারও।' মাথা দুলিয়ে বলল তাঘিলস্কি। মাথার টুপীটা খসে কানের কাছে এসে পড়ল। কান দুটো খাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

তাঘিলস্কিকে এত মাতাল আর কখনও দেখেনি ক্লিম। ভালো খায় দায়, ভালো ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, মানুষটা কেন অত বেশী মদ খেল জানতে কৌতূহল হয় ক্লিমের।

'এ ব্যবস্থা কি নারোদনিকেরা করেছে?' তাঘিলস্কি জিজ্ঞেস করে। ওর সামনে একটা খালি বোতল।

'আমি জানি না।' জবাব দেয় ক্লিম। ও বসে বসে দেখে—দেখা যায় খোলা দরজার পথে সজ্জার জলুষে চোখ ধাঁধিয়ে নিমন্ত্রিতের দল নেচে চলেছে। তাদের প্রতিবিম্ব আরশীর বুকে ঝিলিক জাগিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এক রজত-শুভ্র শূন্যতায়। লুবাশার খাটো খাটো পা দুটি ঘুরে ঘুরে উদ্দাম হয়ে নাচছে হানস্ শাখ্‌স-এর

সংগে। তাদের পিছনে আসছে তাতিয়ানার সাথী চীনাম্যানটি।

তাঘিলস্কি ব'লে উঠল : 'খুব স্ফূর্তি লুটছে, বাবা! পোশাক বদলে ভোল বদলেছে সব। বেজায় খুশি দেখছি। তাকিয়ে দেখ একবার মাজিশিয়ান্ মশাই, দেখছ। কতগুলো সাদামুখো বহুরূপী ভাঁড় আর গাধা এসেছে। এর অর্থ কি বলতো ?'

কোন জবাব দেয় না ক্লিম। নিঃশব্দে তাঘিলস্কির গেলাস ভরে দেয়। মুখোস-ধারীদের সংখ্যা বেড়েছে। বেড়েছে অতিথিদের সাজ-পোশাকের রংবাহারী আর স্ফূর্তির কলোচ্ছ্বাস!। দরজার কাছাকাছি কোথা থেকে যেন আসছে লিউতভের প্রগলভ চিৎকার :

'পনতিয়াস্ পাইলেৎকে কি জবাব দিতে শুনি? স্বয়ং যীশুখৃষ্টের সাহস হয়নি বলতে যে : আমিই সত্য। আর তুমি বলবে সে-কথা?'

লেখক নিকোদিম ইভানোভিচ্‌কে দেখা গেল। খুব মোটা একটা ব্রাউন রঙের গরম জ্যাকেট গায়ে, গলায় চৌখুপী-কাটা স্কার্ফ; মুখে হাত দিয়ে কাশতে কাশতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভিড়ের মধ্যে ঠেলেঠুলে নিজের পথ ক'রে এবং অন্যের পথ ছেড়ে দিয়ে। তাতিয়ানার সাথে বাহু-বন্ধ হয়ে পাখা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে এল ভারভারা। টেবিলের তলায় নিজের আইস লাগান পা দুটি ছড়িয়ে ক্লিমের পাশ ঘেঁসে ব'সে পড়ে হাঁকল—'চা লাও।' তাঘিলস্কি তাড়াতাড়ি মুখোসটা পরে নিল। মুখোসের নাকটা উড়ে গেছে এরি মধ্যে। তাতিয়ানা স্যান্ডউইচ্ চিবোতে চিবোতে বলল :

লোকটার অভিনয়ে যেন একটু উদ্ধত ভাব। শুনেছি ইনি নাকি একজন উঠতি তারকা। সেই আশায় বাবড়ি চুল অবধি রেখে ফেলেছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধমক দেয় ভারভারা .

'এ তোমার হিংসের কথা।'

'হিংসে তো হচ্ছেই। উঠতি তারকাদের মধ্যে শতকরা পচাত্তর জন তো হাজির আছেন এখানে। আর আমি? হিংসে হবে না কেন শুনি?'

তাতিয়ানা তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে প্রথমে ক্লিমের দিকে তারপর তাঘিলস্কির দিকে তাকায়। কি যেন মনে করতে গিয়ে ওর ভ্রূ-দুটো কুঁচকে উঠতে লাগল। তারপর চুপি চুপি ভারভারাকে বলল :

'তোমারও দেখছি দিব্যি পসার জমেছে এখানে।'

'সে আমার এই খাটো পোশাকের দৌলতে।' শান্ত ভাবে জবাব দেয় ভারভারা দরজার কাছ থেকে কোলাহল করতে করতে এল লুবাশা :

'ভারী মজা লাগছে, তাই না? কোথায় গো প্লেঘেয়া পেত্রোভ্‌না, এবার যে তোমার গাইবার পালা।'

রুশ ধরনের মাথায় রুমাল বাঁধা মহিলাটি ছুটল, লুবাশা দৌড়ল পেছনে পেছনে।

'কুমড়ো-পটাশ!' ঐ দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল তাতিয়ানা।

কোন রকমে পথ ক'রে বড় হলের দরজায় এল সামঘিন। দেখল চেয়ারগুলো সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। চারদিক থেকে চুপ্ চুপ্ হাঁক উঠছে। পিয়ানো-বাজিয়ে পিয়ানোর চাবি টিপে চলেছেন এমন ভাবে যেন চাবিগুলো গরম, হাতে ছেঁকা লাগছে। পাশে জঙ্গী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে কালো ফিতেয় ঝোলান পাঁশনে দুলিয়ে দুলিয়ে রাগের সুরে আর ভীষণ চিৎকার করে গান জুড়লেন রাশ্যান্ পোশাক পরা মহিলা।

'মাঠের বুকে ছিলাম আমি সবুজ তৃণ হয়ে...' মুখের ভাব যেন বাজিয়ে বাজাতেই

পারে না। তাতিয়ানা সামঘিনের পেছনে দাঁড়িয়ে তার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নিষ্ঠুর টিপ্পনী ছুড়ে মারছিল গায়কের সম্বন্ধে। লিউতভ্ তলোয়ারখানাকে পেটের কাছে আড় ক'রে ধরে আঙুলের ডগায় ভর করে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লেখক ভদ্রলোক ওর গায়ে ঢলে পড়ে সখেদে বলে চলছিল :

'কুরিয়ে'-তে লিখল এক কড়া রসের গল্প। ভারী আদিখ্যেতা করল তা নিয়ে সবাই। তারপর বছর গেলে লিখল একখানা বই। দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে সবাই বললে—চমৎকার! বুঝলে না যে এতে ওর মস্তকটি চর্বিত হচ্ছে।...'

মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে কথার মাঝখানেই সামঘিনকে বলে উঠল লিউতভ :

'ওহে গণক-ঠাকুর, আপনার যৌবন-প্রভাতে কইনাক না ভদ্‌কা কোনটা সেবা হতো ?'

ক্লিম জবাব দিল : 'বাইল।'

'ও-পদার্থটা বিশেষ সুস্বাদু নয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে লিউতভ্ বলে।

নিকেদিম ইভানিচ্ বলে : 'ঝোলা-গুড়ে পড়া মাছির মতন উনি এখন যশ-সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন।'

পণ্ডিত-প্রবর আমাদের সঙ্গে বসে একটু গলা ভেজাতে আজ্ঞা হয়।' লিউতভ্ সাধাসাধি করে সামঘিনকে।

সামঘিন আপত্তি জানিয়ে হলের দিকে পা বাড়ায়। খুব হাততালির শব্দ আসছিল হলের দিক থেকে।

মাথায় রুমাল-বাঁধা মহিলা গান থামিয়েছেন। এবার যিনি উঠলেন—বেশ তাঁর উক্রানীয়; ফুলে, রিবনে, সর্বাঙ্গে রঙের জলুষ। ভাবলেশহীন মুখ। পাশে দাঁড়িয়ে কুতুজভ। মুখে মুখোস নেই। সামঘিনের মনে হয় মুখোসের কোন দরকার নেই, নকল দাড়িতে মুখখানাকে যা বুড়িয়ে দিয়েছে, চেনে কার সাধ্য। সামঘিনের সামনে সেই মোটা মারকুইস্। টিপ্পনী কাটলেন :

'বেড়ে গলা। খুব নাম করেছে গেয়ে। গাঁয়ের মাস্টারনী না কি যেন।'

চমৎকার গাইল : "নিশীথিনীর বুকে সোনালী মেঘ" এই সংগীতটি। তারপর আরম্ভ হলো কুতুজভ্ আর শিক্ষয়িত্রীটির দ্বৈত সংগীত : "আমায় ভুলাও না"... কোমল হয়ে উঠল কুতুজভের মুখ। কিন্তু এমনি গাম্ভীর্য দিয়ে গাইল ও যে কবির হতাশার ভাষার সঙ্গে তা মানাল না। ওর সঙ্গিনী গাইছে সত্যিকারের শিল্পীর মতো—গভীর নাটকীয় অনুভূতি দিয়ে। ক্লিম লক্ষ্য করে মেয়েটি বার বার তাকাচ্ছে কুতুজভের দিকে বিরক্ত কিংবা আশ্চর্য হয়ে। হলের মধ্যে চার দিক এমনি স্বব্ধ যে ভারভারার পোশাকের খস্‌খসানি শুনতে পায় ক্লিম। তাতিয়ানার কোমরে হাত রেখে ঠিক ওর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ভারভারা। লিউতভ্ তার তলোয়ার-খানা বগল-দাবা ক'রে গলা বাড়িয়ে হলের দিকে পা বাড়াল। পেছন পেছন চলল লেখক হাতের স্যাণ্ডউইচ্‌খানা সংগীত-পরিচালকের মতো দোলাতে দোলাতে। গান থামলে হাততালির ঝড় উঠল। ছুটতে ছুটতে এল সমভা। ওর চোখে জল, মুখ উজ্জ্বল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগল :

'গলার মতো গলা একখানা। তাই না? এর কথাই বলেছিলাম তোমাকে। মনে আছে ?

'গলা আছে, কিন্তু গানে প্রাণ নেই।' তাতিয়ানা বলে।

'চুপ্ চুপ্.' তলোয়ারটা পেছনে সরিয়ে লিউতভ্ বলে উঠল। পেছনে ল্যাজের মতো দুলতে লাগল তলোয়ারটা। দাঁত চেপে রইল শক্ত ক'রে, ঘাম ঝরতে লাগল দুই কষ বেয়ে। বাঁ পা মাটিতে ঠুকতে লাগল। ওর ঠিক পেছনে ওর কাঁধে ছেলে-মানুষের মতো ক'রে থুতনি ঠেকিয়ে আর ওর মাথায় হাত রেখে এক ডোরা-কাটা

ভাড় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুঠো পাকাচ্ছিল আর খুলছিল। কুতুজভ্ গাইছে :

'শান্ত হোক, শান্ত হোক
কামনার উদ্বেল সাগর...'

লিউতভ্ করতালি আর অভিনন্দনের কোলাহলের মধ্যে দৌড়ে এসে চিৎকার ক'রে বলল :

'ভারী চমৎকার গলা। সত্যি বলছি।' উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে, ক্রমাগত পা বদল করতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর দাড়ির গোছা কুতুজভের মুখে বুলিয়ে রুমাল নাড়তে নাড়তে আবার চিৎকার ক'রে উঠল :

'কিন্তু ওকি গান? গান গাইতে তুমি স্রেফ জানো না।'

শ্রোতারা শুনে থ' হয়ে গেল।

'গাইতে জানি না? মানে?' কুতুজভ জবাব দেয়।

'গানের অর্থটাকে তো নস্যাৎ ক'রে দিলে পরিষ্কার ঠাট্টার সুরে...'

লুবাশা হেঁকে উঠল : 'ভাবছাড়া গান গাইলে আর তাই নিয়ে বাহাদুরী করছ।' কুতুজভ্ হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল।

'সত্যি কথাটাই বলে ফেল না—বল যে গান খুব খারাপ হয়েছে।' কর্তৃত্বের সুরে নিকোদিম ইভানোভিচ্ বলল : 'আমি বুঝিয়েদি, শোন তাহ'লে।' লিউতভ্ আড় চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে একেবারে চুপ হয়ে গেল। আর লুবাশা ভ্রূ-কুঁচকে মুখ বাঁকিয়ে লাফ দিয়ে এক দিকে সরে গেল। লেখক মুখে হাত দিয়ে কেশো গম্ভীর সুরে বলতে আরম্ভ করল :

'গান ভালোই গেয়েছেন—তবে যতটা ভালো গাওয়া উচিত ছিল ঠিক ততখানি নয়। গানটা হলো মানুষের দুঃখ কষ্ট, তার উদ্বেল কামনা বাসনা নিয়ে...'

কুতুজভ হেসে বলে : 'আমি চাটনি আচার ভালোবাসিনে। এমন কি গোল মরিচের গুঁড়ো টুকু অবধি খাইনে। আমি ভালোবাসি সংগীত—তার মধ্যে জুড়ে-দেওয়া কথাগুলো নিয়ে মাথা ঘামাইনে...'

লিউতভ বুফের দিকে তাঁকিযে হাঁক দিল :

'নিকোলাই—একটা টেবিল——না না, দুটো!'

তলোয়ারের বেল্টটা টানাটানি ক'রে ভাঁড়কে বলল : 'নিকুচি করেছে তলোয়ারের। দাওনা ভাই এটা একটু খুলেই।'

সামঘিনের মনে হলো, ভাঁড় লোকটি হলো মাকারভ।

কুতুজভের দিকে ভিড় ঠেলে আসছে। ভিড়ের চাপ ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে খাবার ঘরের দিকে। লেখক কঠোর স্বরে বলে উঠল :

'তার মানে? কি বলতে চান আপনি? ইতিহাস তৈরিই হয় কামনা, আবেগ, দুঃখ-কষ্ট. .'

একজন পরিবেশক ভিড়ের মধ্য দিয়ে কোন মতে দুটো টেবিল এনে পাতল এবং বাজীকরের মতো কৌশল ও ক্ষিপ্রতায় কয়েকখানা চেয়ারও এনে ফেলল। তারপর টেবিলের ওপর বোতল ও গেলাস সাজাতে আরম্ভ করল। কার হাতের ঠেলা লেগে একটা বোতল মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

ধমকে উঠল লিউতভ্ : 'এই পাজী কোথাকার! যদি না পারিস...'

তারপর কি একটু ভেবে আস্তে আস্তে বলল :

'একটু হাত চালাও হে! আসুন, আসুন আপনারা সবাই। আসুন শ্রীমতীরা, আসতে আজ্ঞা হোক। বিষয়টা আলোচনা...'

গরমে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। হলে কোথায় কে যেন আর্মেনীয়ন হাস্য-কৌতুক পরিবেশন করছিল। হাসির রোলে হল্ ঘরটি যেন ফেটে পড়ছিল।

ক্লিমের পরেই দাঁড়িয়ে ছিল এক বালক-ভৃত্য। সুন্দর চেহারা, কোঁকড়া চুল। টুপী নেড়ে উক্রানীয় মহিলাটিকে বলছিল :

'মানুষের মধ্যে সংগ্রাম অপরিহার্য একথা আমাকে কেউ প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারবে না।'

পরীক্ষা-কারিণী সন্ন্যাসিনী বেশীনীর কানে কানে বলছিল এক কৃষক :

'না না, আমাদের দেশের লোকের বস্তুবাদের ছোঁয়াচ কিছুতেই লাগবে না।'

সামঘিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে লিউতভ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে গেলাশে মদ ঢেলে ঢেলে অতিথিদের দিচ্ছে। তাড়াহুড়োয় মদ ছলকে পড়ে যাচ্ছে। ও অনর্গল কুতুজভের সঙ্গে বক্‌বক্‌ ক'রে চলছে।

'ও-লোকটা নাইটের পোশাক পড়েছে কেন? শুনি? এত জিনিস থাকতে নাইটের পোশাক কেন?'

গেলাশ হাতে নিয়ে হোঃ হোঃ ক'রে হাসছে কুতুজভ্‌; মাথাটা হাসতে হাসতে পেছন দিকে হেলে পড়ছে এবং নকল দাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ছে আসল দাড়ি। বেহিসেবী কিছু বলে থাকবে ও; হৈ হৈ ক'রে উঠেছে সকলে। কৃষক বেশ-ধারী চিৎকার করছে সব চেয়ে বেশী :

'ও আবার একটা খবর হলো নাকি? আমাদের মহর্ষিরাও তো আমাদের আশা দিয়েছিলেন যে—অধার্মিকদের ধন-সম্পদ গাড়ীর চাকায় লাগা ধুলোর মতো হাওয়ায় উড়ে যাবে।'

বড় হল্‌ ঘরে আবার ঝংকার দিয়ে উঠল পিয়ানো। চঞ্চল হয়ে উঠল নাচিয়েদের পা। ঝলমলিয়ে উঠল মৎস্যকুমারীর হরিৎ রূপ। চীনাম্যানের হাতা ধরে বহু বক্ষে দোলা লাগিয়ে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে দিয়ে নেচে চলল সে। ক্লিমের পাশে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নান; পরম ভক্তিভরে হাতদুখানি বুকের কাছে আড় ক'রে রাখা। ওর মুখের আধা-মুখোসের ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সামঘিন বলল : 'আমি চিনি আপনাকে।'

'তাই নাকি?' পরম ঔদাস্যে জবাব দিলেন মহিলা।

'আপনার নাম মারিয়া ইভানোভনা। আপনি থাকেন...'

ধর পড়ে—থানায় যাবার পথে মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। রাস্তাটার নাম করল ও। মহিলা পকেট থেকে জপের মালাটি বের ক'রে সরু সরু কোমল আঙ্গুল দিয়ে মালাটিকে যেন আদর করতে করতে মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে এনে বলল : 'আর কি?'

'আমি সব জানি আপনার বিষয়ে।'

'তাই বুঝি? তাহ'লে তো দেখছি আমার সম্বন্ধে আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানেন।'

টেবিলের কাছে যেখানে কুতুজভকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ভিড় জমেছে সেই দিকে পা বাড়ালেন মহিলা। কোলাহল থেমে গেছে। কুতুজভের গলা থেকে মেঘমন্দ্র-স্বর উঠছে :

'এই শতকের আট-দশকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে গেছে যে-সব বুদ্ধিজীবিরা জনতার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা একেবারেই বিপ্লবী ছিলেন না...'

'ও কথা ঠিক নয়।'

'নিশ্চয়ই ঠিক।' অন্ধ যে ভাবে ভিক্ষা পাত্র বাড়িয়ে ধরে ঠিক সেই ভঙ্গিতে নিজের শিরস্ত্রাণটি ধরে তাঘিলস্কি বলল জোর গলায়।

সামঘিন মাথার ছুঁচল টুপীটা এবং মুখোসটা ঠিক করে নিয়ে টেবিলের দিকে চলল। মদে এবং ঘামে ভিজে গিয়ে মুখোস-বাঁধা ফিতেটা থুতনিতে চ্যাট্‌ চ্যাট্‌

করছে। গায়ের ঝোলা জোববাটার জন্য হাঁটতে ওর ভয়ানক অসুবিধা হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে ও খুব ঠাণ্ডা দেখে এক বোতল বীয়ার টেনে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে গেলাসের পর গেলাস গিলতে লাগল আর বসে বসে শুনতে লাগল কুতুজভের শান্ত কথাগুলি। নেহাৎ অনিচ্ছায় বলে যাচ্ছিল ও :

'বুদ্ধিজীবিরা বেআইনীভাবে যে-সব খেলাত খেতাব আর আমিরী পেয়েছিল মার্ক্সবাদের দৌলতে তাতো সব গেছে—'

'বুকের পাটা আছে...' চিৎকার ক'রে উঠল কে যেন ক্রুদ্ধ স্বরে।

'এই চুপ্ চুপ্!'

'একটা কথা। ওই যে বেআইনীর কথা..'

মদের ঝোঁকে হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল একটা লোক : 'নিহিলিস্টরা নিপাত যাক।' লোকটার গায়ে নীল জামা, মাথায় শাদা পরচুলা, আর পায়ে হাঁটু পর্যন্ত শিকারের জুতো। বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

ক্রুদ্ধ কোলাহল ছাপিয়ে উঠল ক্ষিপ্ত নদীর কলোচ্ছ্বাসের মতো লুবাশার তরল কণ্ঠ নেহাৎ অশোভন ভাবেই :

'রাজনীতিওয়ালাদের পাঁচটা রুব্‌ল দিয়ে যে ভাবছেন ইতিহাসে ঠাঁইটা কায়েম হয়ে গেল।'

আলমারীর পেছন থেকে নাইটের বর্মের ঠোকাঠুকির সঙ্গে স্ত্রাতলভের চাপা কণ্ঠ শোনা গেল :

'প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ আইন-সম্মত। প্রতিক্রিয়ার যুগেই তো সাংস্কৃতিক বিজয়ের ভিৎ পাকা হয়..'

সবাই এক সাথে কথা বলছে যেন কথা না কইলেই বোবা হয়ে যেতে হবে। কুতুজভের দিকে ঠেলে আসছে ভিড়; যেন চিড়িয়াখানার কোন জন্তুকে খুঁচিয়ে মজা দেখতে ছোটা। লেখক রেগে গিয়ে চেঁচাচ্ছে :

'ও! অপনাদের সেই ঘোষণাপত্র? ও তো স্রেফ্ কোন গাঁজা-খোর কম্যুনিস্টের গল্প।'

কুতুজভ লেখকের মাথার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে থেকে বলল : 'যেমন করে সখের থিয়েটার দেখে আমাদের সমাজ নামধারী বস্তুটি, ঠিক তেমনি ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণশক্তির সংগ্রাম।'

তাঘিলস্কি এক লাফে সামঘিনের সামনে এসে ওর মাথার পেতলের টুপীটা ধরে গায়ের জোরে টানাটানি করতে লাগল। কুতুজভ আর দু'তিনজন হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠল। কুতুজভ বলে উঠল :

'আমরা তো বাবা ফুর্তি লুটতে এসেছি, ফুর্তি করো, ফুর্তি—'

সামঘিনকে একধাবে ঠেলে সরিয়ে দিল। চীনাম্যানটা কনুই দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে ভোজনালয়ের কোণে এগিয়ে চলেছে। সামঘিনও চলল তার পেছন পেছন, শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত গলায় ও এক গেলাস ঠাণ্ডা চা ঢেলে দিয়ে ছুঁড়ে দিল একটা অপরিচ্ছন্ন রুবলের নোট। তারপর ও উঠে চলল বড় হলটার দিকে। লেখক শান্ত হয়ে গেলাসে বীয়ার ঢেলে নিলেন। সামঘিন ভাবে, অসহিষ্ণু কুতুজভের মতো যদি ও বেপরোয়াভাবে সকলের মুখের ওপর বলতে পারত : 'বোকার দল; কী চাস তোরা? বাছুরকে খাওয়ানোর মতো সাধারণ লোক তোদের শুধু খাইয়েই যাবে, তোদের এই বচন-সর্বস্ব জীবনকে দেশের শ্রমিকশ্রেণী বাঁচিয়ে রাখবে?' কত কথাই না সামঘিন এইসব কেতাবী আর ধর্মপ্রাণ লোকগুলোকে শুনিয়ে দিতে পারত!

'হ্যাঁ, সময় আমি পাব—এবং তখন ওদের শুনিয়েও দেব!'

*

সামঘিন হল্ ঘরে প্রবেশ করে। পিয়ানো-বাদক রুশ নৃত্যের সঙ্গে প্রাণপণে বাজিয়ে চলেছে; মাঝখানে পা মিলিয়ে নাচছে চীনাম্যান ও এক জর্জিয়ান; তাদের ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা সেই সঙ্গে হাত দিয়ে তাল দিচ্ছে।

অদ্ভুত ঋজু দেহভঙ্গী সহকারে চীনাটি বলল : 'আপনার নাচের উন্নতি আমি করিয়ে দেব!'

মাথার ওপরে হাতদুটো তুলে ধরে, কোমরটা দুলিয়ে ভারভারা এগিয়ে গেল চীনাম্যানের কাছে। তখনও দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে তার; মুখের রং গলে গলে সমস্ত মুখে এক অদ্ভুত কামনার ছাপ ফুটে উঠেছে। চীনাম্যানটার সামনে এসে ও এমন লজ্জাহীনার মতো শরীর বাঁকিয়ে দাঁড়াল—চীনাম্যানটি তখন হাঁটু ভেঙে নাচের ভঙ্গিমায় ছিল—এমন হাসিমাখা মুখে স্মরাতুর দৃষ্টিতে ভারভারা তাকাল তার দিকে যে তা দেখে সত্যিই সামঘিনের ভারী বিশ্রী লাগল, এ বিরক্তি যেন, সামঘিনের মনে হলো, ওকে মাতাল ক'রে দিচ্ছে।

নৃত্যের তালে তালে ভারভারা এমনভাবে ওর পা নাড়ছে যে হাঁটুর ওপর ড্রয়ারের লেসগুলো ভেসে উঠল।

চোখ বোঁজে ক্লিম, দাঁতে দাঁত চেপে এমন এক শিক্ষা দেবার বাসনা জাগে মনে যে, লিদিয়ার সঙ্গে ওর সেই ঘটনার যেন প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে যায়। 'কিন্তু এ-মেয়ে তো এই মুহূর্তে ওর কথা একটুও ভাবছে না,—একটুও না. .'

নাচ থামল; চিৎকারের ঢেউ বয়ে গেল। চীনাম্যান মেয়েটিকে প্রায় বগলদাবা ক'রে নিয়ে হাজির হলো বুফেতে.. । যেন বাজার বসেছে—এমন চিৎকার হৈ হুল্লোর। চীনাটি গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভারভারার চোখের দিকে কি যেন বলছে বিড়বিড় ক'রে...লোকটার মুখখানা যেন গলে গলে পড়ছে; হাসছে, হাসিতে ঠোঁটদুটো কুৎসিত লম্বা রেখায় পরিণত হয়েছে। ক্লিম কক্ষের কোণার দিকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে।

তাঘিলস্কি, মাতাল তাঘিলস্কি এসে দাঁড়াল ওর সামনে। 'আরে, বন্ধু আমার, একেবারে এ-কা—! আমি-ও এ-কা—! চলো দু'জনা দু'জনারে বেঁধে বাহুডোরে—! শালার সব কিছুর দাম বেশী এখানে—! সে-যাক—, কুছ্ পরোয়া নেই! ইনকেলাবের জন্য সব কিছু ফুঁকে দেব।' দু'হাতে ক্লিমকে জড়িয়ে ধরে তাঘিলস্কি ওর কাঁধে চুমো খায় আর বলে : 'সত্যিই তোমাকে আমি পেয়ার করি।'

কড়া মদ পান করে ক্লিম তাঘিলস্কির সঙ্গে ব'সে। তাঘিলস্কি বলে : 'তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম—তোমাকেই খুঁজছিলাম—'

হঠাৎ কক্ষের গোলমাল মুহূর্তে থেমে যায়, লিউতভের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'তারকা, আমাদের তারকা, আমাদের ভেনাস এসেছে—হুর্‌রে!'

দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আলেনা। শ্বেতশুভ্র সজ্জায় ভূষিতা কন্যা, কোমরে ফুলের গুচ্ছ, স্কার্টের ঘের পর্যন্ত নেমেছে ফুলের মালা, নিতম্বের দোলায় সে-মালা দুলছে, মাথায় পুষ্পের মুকুট; হাতে একখানা চকচকে পাখা—আলেনার সর্বদেহ যেন ঝিকিমিকি করছে মাছের মতো। ক্লিম চোখ নামিয়ে নেয়। চারদিকে নীরবতা বিরাজ করছে, শুধু লিউতভের কথা শোনা যায় :

'স্যাম্পেন ঈগর, স্যাম্পেন! কোস্তিয়া কোস্তিয়া, কোথায়?'

নেশার মধ্য দিয়েও ক্লিমের মনে তীব্র বাসনা জাগে, এই মেয়ে যে তার রূপে সবাইকে সম্মোহিত ক'রে ফেলেছে, তার যে কোন মূল্যই নেই ওর কাছে, তা একবার চেঁচিয়ে বলার। ও এগিয়ে যায় আলেনার দিকে, কিন্তু কিছু বলার আগেই ও-মেয়ে বলে ওঠে :

'আর ক্লিম যে, নেশায় চুর! তুমি তো বাপু নেশা কোনদিন করতে না। যাই বলো, তোমার পোশাক কিন্তু বেড়ে মানিয়েছে!'

'হ্যাঁ, আমি মদ খাই, নেশা করি।' কত কথাই না বলবার বাসনা জাগছে ক্লিমের মনে, কিন্তু কথাগুলো সব কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে জিহ্বের সঙ্গে কিছুতেই সেগুলো আর বেরোতে চায় না ঠোঁট পেরিয়ে। তবু ও বলল :

'হ্যাঁ, আমি মদ খাই, নেশা করি একা। এই যে আমার "ইস্তাহার"। পড়েছ? না? আমিও পড়ি নি।'

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছে ক্লিম। ভারভারা নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে : 'তোমার ভাল লাগছে না?'

'ভাল লাগছে? তোমার নাচও ভাল না। বিশ্রী—বিশ্রী...'

কে যেন বললে : 'একটি "এরশিক" দেব?'

কইনাকের সঙ্গে লেমনেড মিশিয়ে খেল ক্লিম। কিছুটা সুস্থ মনে হয়। প্রশ্ন করে : 'চীনাম্যানটি কে?'

একটি সংবাদপত্রের নাম করল ভারভারা, তারই সম্পাদক। ক্লিম সে-কথা শুনে আরও যেন মুষড়ে যায়।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলে : 'ইহুদি, ব্যাটা ইহুদি!'

তারপর আর কিছুই ওর মনে থাকে না, নেশায় ও ডুবে যায়।



নেশা টুটে ওর যখন জ্ঞান ফিরে এল, ও দেখল এক অচেনা ঘরে শুয়ে আছে। কিন্তু বুঝতে পারল দেয়ালের ফটো দেখে যে ঘরখানা ওর পরিচিতই। বাতায়ন দিয়ে যে টুকরো আকাশ চোখে পড়ে, তা ওকে গোয়েন্দা পুলিসের সেই ঘরের কথা মন করিয়ে দেয়।

সময় গড়িয়ে চলেছে—দু'মিনিটও হতে পারে, কুড়ি মিনিটও হতে পারে। দোরের ও-পাশে কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ শোনা যায়; গেলাসে চামচের শব্দ। কে যেন ফিস্‌ফিসিয়ে বললে : 'হ্যাঁ, নিয়ে এস!' সামঘিন বোঝে ভারভারা দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে।

'ঘুমোচ্ছ?'

'না। কিন্তু বড় বিব্রত বোধ করছি।' চোখ খুলে ক্লিম বলে। ছোট ছেলের দোষ-স্বীকারের মতো যেন শোনাল ওর কথা। ঠিক এইভাবে তো ও বলতে চায় নি, ও চেয়েছিল কঠিন কণ্ঠে বলতে। নিজের ইচ্ছায় তো ও এই ঘরে আসে নি।

ক্লিম বুঝল যে ভারভারা ওর কথা শুনতে পায় নি। মধু-ঝরা কণ্ঠে ভারভারা বলে :

'বাঃ, সত্যিই তুমি বড় নরম। তোমাকে এখানে এনে অন্যায় করেছি? ভোর চারটায় তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলা আমার ভাল মনে হয় নি, নিয়ে এলাম এখানে। বার ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। উঠো না এখন, শুয়ে থাক। তোমার কফি নিয়ে

আসছি—'

সামঘিন উঠে বসে। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে চশমা চোখে দেয়, আবার পর-মুহূর্তে খুলে ফেলে।

আনফিমিয়েভনা দরজা খুলে দিল। একটা ট্রেতে ক'রে স্পিরিট-স্টোভের ওপর কফি চাপিয়ে অতি সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করল ভারভারা। তার সমস্ত নজর নিবদ্ধ রয়েছে স্টোভের নীল আলোর ওপর, ঠোঁট দুটো সে দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে। কফির কাপ যখন সে ক্লিমের হাতে তুলে দিল, ক্লিম লক্ষ্য করল যে ভারভারার হাত কাঁপছে, বুকটা তার স্পন্দিত হচ্ছে অনিয়মিতভাবে। মুখখানা পাণ্ডুর, চোখের নীচে কালি। ক্লিমের চোখে চোখ পড়তে ভারভারার চোখ নেমে যায়। ধীর কণ্ঠে বলে :

'লুবাশা এখনও ফেরে নি। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে পর ও-জায়গায় তাণ্ডব শুরু হলো। গোঘিন আর আলেনা মিলে কি কাণ্ডই না শুরু করলে!...আরেকটু কফি দেব?'

ক্লিম কাপটা ভারভারার হাতে দিতে গিয়েছিল, হাত ফস্কে মেঝেতে পড়ে গিয়ে কাপটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।

'আ—!' মৃদু কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে ভারভারা। হাসতে হাসতে ক্লিম বলে : 'শুভ লক্ষণ!'

সামঘিন বেড্-কভারটা সরিয়ে দিয়ে মেঝেতে পা নামায়। ভারভারা দূরে সরে যাবার আগেই ওকে দু'বাহুতে জড়িয়ে ধরে।

'না—তুমি ধরবে না আমাকে—তুমি তো আমাকে ভালোবাস না...' ভারভারা চেষ্টা করে নিজেকে ক্লিমের দু-বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে।

হঠাৎ ও ক্লিমের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে :

'আমায় ক্ষমা করো—ক্ষমা করো—!'

নীরব সামঘিন ভারভারাকে বক্ষে চেপে ধরে, আলিঙ্গনবদ্ধ ভারভারাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়।



ভারভারা কুমারী, তার কৌমার্যই ক্লিমকে আরও বিস্মিত করেছে। এ যেন ও ঠিক চায় নি, আশাও করে নি। এ মেয়ে নিজেকে ফুলের মতো পবিত্র রেখেছে কি ওরই জন্য? এ-কথা ভাবতেও ভাল লাগে ক্লিমের। ভারাভারা মা হতে চায় না, অর্থাৎ ক্লিমকে বন্ধনের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে চায় না। সহজ সরল ভাবেই ভারভারা বলেছে এ-কথা ক্লিমকে। নারীর পর্যায়ে উন্নীত ভারভারা আজ সত্যিই সুখী, সুভগা; নতুন জীবনে ও যেন সত্যিই খুশী, গর্বিত। ও যেন আজ শ্রীমতী। আগের মতো ওর গোড়ালি তোলা চলন আর এখন যেন কামনা উদ্রেকের জন্য নয়, ওর দেহ যেন নতুনভাবে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ক্লিমের প্রতি ওর আকর্ষণের মধ্যেও ফুটে উঠেছে এক সহজাত স্নেহসিক্ত মধুর প্রেম। ভারভারার দেহবল্লরী সত্যিই সুন্দর, কিন্তু ক্লিমের মনে হয় ওর নিম্ন জানুর ত্বক যেন কিছুটা অমসৃণ এবং এ-কথা ও সুযোগ বুঝে বলতেও চেয়েছে ভারভারাকে। ক্লিমের হাঁটুর ওপর শুয়ে একদিন ভারভারা বলল ক্লিমকে : 'আমার অনুভূতি তোমাকে বলতে চাই কিন্তু ভাষা পাই না।'

মন্দ লাগে না ক্লিমের। ভারভারার এই আত্মনিবেদনের সীমা খুঁজতে চায় ও। 'একদিন হয়তো এ মেয়ে চাইবে বিয়ে করতে, চাইবে বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামত জানতে। আচ্ছা, লিদিয়া কি ভাববে আজকের ঘটনা জানতে পারলে?'

লিদিয়ার কথা ক্লিম ভুলে থাকতে চায়; ও-মেয়ের চিন্তা ওর মনে এখনও আঘাত দেয়। একদিন বিশেষ মুহূর্তে ওর ইচ্ছে জাগে ভারভারাকে ওর পূর্বজীবনের রোমান্স সব খুলে বলতে। সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয়, এ-কথা শুনলে ভারভারার কাছে ওর সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো। বিরক্ত হয় ও মনে মনে, হঠাৎ ও বলে ওঠে:

'তুমি বোধহয় মাবাকুয়েভকে ভুলেই গেছ?'

বিস্মিত ক্লিম দেখে ভারভারার দু'চোখ অশ্রুতে ভবে উঠল: 'তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছ এ-কথা? কেন? তোমার জন্যই কি—' ক্লিমের কোলে মুখ গুঁজে ভারভারা বলে: 'কেন তুমি এ-কথা বলছ? কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?'

সামঘিন ভারভারাকে তুলে ওর কোলে বসাল; ক্লিমের মনে হয় যে ভারভারার কথার মধ্যে যেন নাটুকেপনা রয়েছে; ওর মন ব্যথা দেবার জন্য তো কোন কথা বলেনি ক্লিম: কাঁদবাব মতো, দীর্ঘশ্বাস পড়বাব মতো তো কোন কথাই ও বলে নি।

আনফিমিয়েভনা একদিন বলল: 'তোমাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে বেশ লাগে কিন্তু। কিন্তু এভাবে আলাদা বাসা আর কেন? খরচও তো অনেক। আর উচিতও নয়। এখানে এসেই থাক না কেন ক্লিম ইভানিচ?'

ভারভারা কোন অনুরোধই করল না। কিন্তু ক্লিম বুঝল যে ও যদি এ-বাড়িতে উঠে আসে, এ-মেয়ে সত্যিই খুশী হয়। আনফিমিয়েভনার আর বার কয়েক অনুরোধের পর ক্লিম উঠে এল ভারভারাদের বাড়িতে, এল সেই ঘরখানাতে যেখানে ইতিপূর্বে বাস ক'রে গিয়েছে লিদিয়া, আব লুবাশা। ওর জন্য চিত্তহারী কাগজ সেঁটে ঘর সাজিয়েছে ভারভারা।

॥ ১৩ ॥

মস্কো থেকে লুবাশা নির্বাসিত হলো, এবং শহর ছাড়বার আগে ভারভারাকে তার কিছু কিছু কাজ সে দিয়ে গেল। ভাল না লাগলেও ক্লিম আপত্তি করল না। মস্কোতে কি সব কাজকর্ম চলেছে তা জানার প্রয়োজনেই ও ভারভারার কাজে আপত্তি করে নি। ভারভারাকে লুবাশা পরিচয় করিয়ে দিল মারিয়া ইভানোভনা নিকোনো-ভনার সঙ্গে। ক্লিমকে বলল শুধু : 'মহিলা সত্যিই সুন্দরী, বিনয়ী, আমরা যাকে ভদ্রমহিলা বলি ইনি হলেন তাই।'

ক্লিম শুনল, মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই নাম ভাঁড়িয়ে ভুয়া পাসপোর্টে আছেন ইনি। লিউতভের পূর্বপরিচিতা। এ মহিলাকে দেখে ওর তানিয়া কুলিকোভার কথা মনে পড়ে। এরা হলো সেই জাতের মানুষ যারা কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের প্রভাবে কিংবা কোন অঘটনের চাপে প'ড়ে কাজ ক'রে যায় যন্ত্রের মতো, নিজের ইচ্ছা কিংবা বুদ্ধি এদের বিশেষ থাকে না, এবং তারই ফলে এদের এই নির্দিষ্ট জীবনপথ আর কর্মসাধনার পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে না সহজে। লুবাশার কথায় ক্লিমের এই জাতীয় লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা আরও দৃঢ় হলো। ভাঁড়ানো নাম নয়, মহিলার নাম সত্যিই নিকোনোভনা। এক ধনী জমিদার-তনয়া, যৌবনে পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছিল, মাস কয়েক শ্রীঘরে বাস ক'রে সম্প্রতি এক সস্তা পুস্তক-প্রকাশনীতে হিসাব-রক্ষকের কাজ করছে। ঠিক যেন ক্লিমের ছক মতো সব মিলে যাচ্ছে : বিশেষত্বহীন চেহারার লোকেদেরই তো সাধারণতঃ দেখা যায় সস্তা বই যারা প্রকাশ করে সেইসব প্রকাশকদের আড্ডায়।

মহিলার বসন গাঢ় রঙের, যেন সদ্য-বিধবা, এখনও বেদনা-বিধুর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সুঠাম দেহখানা প্রথম দর্শনে অসুন্দর মনে হবে না, কিন্তু সেই প্রথম নজরেই পড়বে এক কাঠিন্যের আবরণ যেন তাকে ঘিরে আছে। দীর্ঘাঙ্গী বলা যাবে না, তবে বসাবস্থায় দেখলে দীর্ঘাঙ্গী বলেই মনে হবে। কাঁধ দুটো ঈষৎ ঢালু, সুস্তনী নয়, কিন্তু কোমরের বন্ধন দৃঢ়; কালো মোজায় পদযুগল নয়নাভিরাম, পায়ের পাতা একটু খাটোই মনে হবে। মহিলা যেন জোর ক'রে হাসে; সেই সঙ্গে তার মাপা উত্তর শুনলে নিরুৎসাহই হতে হয়।

ক্লিম জিজ্ঞেস করল লুবাশাকে : 'কি ধরনের লোক মহিলা বলো তো?'

'বেশ ভাল।'

'তবুও—'

'খু-উ-ব ভাল।'

'আরেকটু বিস্তৃতভাবে কিছু বলতে পারছ না?'

মুরগীর মতো খেঁকিয়ে ওঠে লুবাশা : 'বাপ্‌রে বাপ, তোমার প্রশ্নের যেন শেষ নেই বাপু! যেন খবরের কাগজের রিপোর্টার মৃত্যু-সংবাদ লিখতে বসেছে।'

নিকোনোভনার সঙ্গে ক্লিমের সাক্ষাৎকার ঘটল অচিরেই। ও বলল :

'মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।'

নিকোনোভনা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় ক্লিমের দিকে, কোন কথা বলে না। তার চোখের সাদাটা যেন ধূসর রঙের, যেন ছাই মেশান, মণির নীল থেকে নজরটা একটু সরিয়ে দেয়।

'মনে পড়ছে না তো।'

ক্লিম বলে যায় : সামার হাউসে প্রথম দেখা, সেখানে আপনি এসেছিলেন লিউতভকে বলতে "নারদোপ্রাভংজী"র গ্রেপ্তার সম্বন্ধে।

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।' মনে করতে করতে মাথা ঝাঁকায় মহিলা।

ক্লিম আবার মনে করিয়ে দেয় জারের আগমনের সময়ে লিউতভের বাড়িতে খানাপিনার কথা; মনে করিয়ে দেয় সেই রেস্তরাঁর কথা যেখানে নিকোনোভনা একখানা চিঠি পড়ছিল।

একখানা বই তুলে নিয়ে তার পাতা উল্টোতে উল্টোতে মহিলা বলে : 'হবে হয়তো, ঠিক মনে পড়ছে না।'

সামঘিনের কাছে মহিলার এই উত্তর দেবার ধরন যথেষ্ট ভদ্র মনে হয় না।

'কিন্তু আমাকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই আমাকে দেখেছিলেন?'

ক্লিম লক্ষ্য ক'রে যে মহিলার চোখ দুটো গভীর হয়ে উঠল, ঈষৎ কাঁপল, বিস্ফারিত হয়ে উঠল, এবং মুহূর্তে নীল ঝলকানি দেখা দিল চোখের মণিতে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—' মহিলার মুখখানা সত্যিই সুন্দর দেখায় : 'কোথায় যেন?'

ক্লিম গলির নাম করে, মৃদু হেসে বলে : 'শেষ রাত্তির, চারটা বেজেছে তখন, আপনি যাচ্ছিলেন. সঙ্গে ছিল একজন...'

মুখের নিম্নভাগ বইখানা দিয়ে আড়াল ক'রে মহিলা বলে : 'না।' ক্লিম তার চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছিল।

'আপনিই যাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম—'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বইখানা ডিভানের উপর ছুঁড়ে দিয়ে মহিলা ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে : 'লোকটি আমার সঙ্গী ছিল না, দরজা খুলে দিয়েছিল মাত্র। হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমার। রাত্রে আমায় এক জায়গায় খেতে যেতে হয়েছিল এবং পরদিন খুব ভোরেই আমাকে বেরোতে হয়েছিল। ও, তাহলে আপনাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারি নি, আমি ভেবেছিলাম কোন ছাত্র-টাত্র হবে যা আজকাল হরবকৎ দেখা যায়।'

'আমার ধারনা হয়েছিল যে আপনি আমাকে বিলক্ষণ চিনেছেন।' একটু দৃঢ় কণ্ঠেই বলে সামঘিন।

'না, সাধারণভাবে আমার মুখ মনে থাকে।'

মহিলার চোখের সেই নীল ঝলকানি মুছে যায়; বইখানা আবার হাতে তুলে নিয়ে মুখ নামিয়ে দেয় মহিলা বইয়ের পাতায়। বোঝা গেল মহিলা আর এগোতে রাজী নয়।



এই ঘটনার কথা সামঘিনের মনে আর রইল না, নিকোনোভনার কথা সে ভুলে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। ছাত্র-আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছে, এবং কোন রকম অর্থহীন কারণে এ-সবের মধ্যে জড়িয়ে প'ড়ে শ্রীঘরে না যেতে হয় তার জন্য রীতিমত সাবধানেই চলতে হয়। কিন্তু ক্লিমের পরিচয় হয়ে গিয়েছে সিরিয়স যুবক হিসেবে, সুতরাং ওর বহুকাল পূর্বে সেণ্ট পীতসবুর্গে পরিচিত পপোভ-এর সঙ্গে মিলে কাজ দেওয়া হলো ভবিষ্যৎ সরকারী অফিসারদের মধ্যে চেতনা

আনয়নের। পপোভ এ-কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে সম্পূর্ণভাবে। সামঘিন তর্ক তুলল ছাত্র-আন্দোলনের ভিত্তি সম্বন্ধে। এ আন্দোলন তো বুর্জোয়া ভাব-ধারায় সৃষ্ট, শ্রমিক আন্দোলনের পরিপন্থী, এ-কালের যুবকদের শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হতে না দিয়ে ভিন্ন কাজে নিয়োগ করা।

'তুমি কি সব ছাত্রকেই কারখানাতে পাঠাবে নাকি? তা কি হয়?' বিস্মিত পপোভ বলে ওঠে।

দু'চারদিন মস্কো নগরীতে বাস ক'রে পপোভ চলে গেল।

ভারভারাকে সামঘিন আরও আপন ক'রে পেয়েছে, এ মেয়ের সঙ্গ ওর অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে : ভারভারা আর আনফিমিয়েভনা ওর সর্বযত্ন করে কায়মনে। কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য করে ভারভারা আজকাল কেমন যেন কী এক ব্যাপারে সন্ত্রস্তাবস্থায় থাকে, ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়, সর্বদা আনমনা। কী এমন সমস্যায় ও এভাবে উতলা হয়ে পড়েছে? অর্ধনিমিলিত চোখে ডিভানের ওপর বসে কী অত ভাবে, কী যেন শোনবার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্তিরে। সাহস ক'রে সামঘিন ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না, কি জানি যে-বিষয় শুনতে চায় না, তাই হয়তো ওকে শুনতে হবে। ক্লিম নিজের মনে মনে একটা কথা ঠিক ক'রে নিয়েছে যে, এ-মেয়ের দৈহিক পরিচিতি ওর কাছে যত ঘনিষ্ঠই হোক না কেন, ভবিষ্যতে একে নিয়ে ঘর বাঁধা চলবে না। এর সঙ্গে মন-খোলা আলাপ-আলোচনাও সীমিত, সে-আলাপের সঙ্গিনী খুঁজে পেতে হবে আরও বুদ্ধিমতীদের মধ্যে। সন্দেহ নেই যে সে-জাতীয় বুদ্ধিমতীর সাহচর্য ও পাবেই ভবিষ্যতে।

'তবে কি ভারভারা নতুন প্রেম শুরু করেছে কোথাও?' ভারভারার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে ক্লিম। 'না, তা মনে হয় না।' যদি ভারভারার সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ এখুনি ঘটে, তবে কি কি অসুবিধা ওর হতে পারে তা মনে মনে খতিয়ে দেখে ক্লিম।

সামঘিন হেঁসেলে এসে আনফিমিয়েভনার কাছে কিছু খাবার চাইল। খাবার ঘরে ডিভানের ওপর ভারভারা বসে আছে। ভারী পা ফেলে আনফিমিয়েভনা ট্রে সাজিয়ে ঘরে ঢুকল। ভারভারা উঠে অন্য কক্ষে চলে গেল। টেবিল সাজানোর পর ভারভারার ঘরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলল :

'এসো, খাবার তৈরি।'

'আমি খাব না।'

'তুমি কি অসুস্থ?'

'একটু।'

খাবার সমাপনান্তে ক্লিম গিয়ে বসল ওর ঘরে ব্রুজভের একখানা কাব্যসংগ্রহ নিয়ে। এ কবিকে ও জনসমক্ষে নিন্দাই ক'রে থাকে, কিন্তু নিজের মনে পছন্দ করে। কিছুক্ষণ পরে ও উঠে গেল ভারভারা কেমন আছে দেখতে। দেখল ভারভারা বেরিয়ে গেছে।

'আশ্চর্য!' জানালার শার্সিতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়েছে, ক্লিম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সমস্ত বাড়িখানা হিমেল মনে হয়। আনফিমিয়েভনাকে ডেকে ক্লিম বললে ওর ঘরে আগুন-রাখায় আগুন জ্বালিয়ে দিতে। ও গিয়ে বসল সারঘিভিচের "জেম্‌স্ত্‌ভো পরিষদ" বইখানা নিয়ে। মস্কো স্টেটের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা লেখক গ্রহণ করতে অপারগ বলে, এ বইখানা ক্লিমের বিশেষ পছন্দ নয়। আইনের ইতিহাসবেত্তার আলোচনা বড ভারী মনে হয়। বাইরে বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে চলেছে, ঘরের মধ্যে আগুন-রাখায় কাঠ ফাটছে। আরামদায়ক উষ্ণতা। উঠে এক-

খানা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে ও বসল আগুনের অদূরে। চিবুকের দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে ও ডুবে গেল চিন্তার সমুদ্রে।

'লিদিয়ার থেকে কত সহজ ভারভারা...বোধহয় ওর প্রতি আমার ব্যবহারে হিমেল ভাব ফুটে উঠেছে...'

ভারভারা যদি এখন থাকত ওকে আদর করে বসাত ক্লিম। চুম্বনের স্পর্শে ওর স্তন রোমাঞ্চে শিউরে ওঠে, সর্বদেহে ওর জাগে স্পন্দন, ঘুমন্ত শিশুর মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে ওঠে।...গোঘিন লোকটা কিন্তু বেশ আমুদে। কিন্তু এদের মতো লোকেরা বিপ্লবীদের সাহায্য করে কেন? স্ফূর্তি? জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য? তুর্গেনিয়েভ আর নেক্রাসভ শিকার-প্রিয় ছিলেন, সুতরাং লেখক কাতিনও শিকার-প্রিয় হয়েছেন!

'আমি কি ওদের হিংসা করি?' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করে ক্লিম। ভারভারা সেই কখন বেরিয়েছে, এখনও ফিরছে না কেন?

খাবার ঘরে এসে ঢোকে ক্লিম, ডিভানের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ও বাইরের হাওয়ার শব্দ শোনে। বৃষ্টি থেমে গেছে। বাতাসের গতিও কমে এসেছে; নগরের ক্ষীণ কোলাহল শোনা যায়; ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজে। তখন থেকে ন'টা পর্যন্ত রাত্রি অত্যন্ত অদ্ভুদভাবে বিলম্বিত, যেন তার শেষ নেই; শূন্যতা চারদিক থেকে ছুটে আসছে,--এ অভিজ্ঞতা ওর জীবনে এই প্রথম। তবুও তারই মধ্যে নিজেকে সব চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে ভাবে যে ও স্বতন্ত্র। কিন্তু ওর এই স্বতন্ত্রতা-বোধ ওর এই আত্মকেন্দ্রীক চিন্তা মুহূর্তের, তার কোন প্রয়োজনই ও আর পায় না।

রাত্রি এগারটাব পর ভারভারা বাড়ি ফিরল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনে ক্লিম উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। একটি কথাও নয়, জুতো পর্যন্ত না খুলে ও সোজা গিয়ে ঢুকল ওর নিজের ঘরে। টলে টলে হাঁটছে, শূন্যে হাত মেলে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। মিনিটখানেকের জন্য ক্লিম হল্-ঘরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, ভারভারার এই উপেক্ষায় নিজেকে অপমানিত মনে হলো। 'বোধহয় টেনে এসেছেন, এবং তার মানে হলো—'

খাবার ঘরে কিছুক্ষণ পায়চাবি করল, পকেটের মধ্যে ওর হাত দুটো বার বার মুষ্টিবদ্ধ হয়; ও চাইল ভারভারার সঙ্গে কথা বলতে। 'না, কাল কথা বলব, আজ তো উনি শোনবার অবস্থায় নেই।'

ভারভারার কক্ষ অন্ধকার।

'আলোটা পর্যন্ত জ্বালিয়ে নিতে পারে নি। তা ভালই হয়েছে, আলো জ্বালাতে গিয়ে হয়তো জামাকাপড়ে আগুন ধরিয়ে বসবে।'

আলোটা হাতে নিয়ে গম্ভীর মুখে সামঘিন ভারভারার ঘরের দরজা খুলে ফেলল। সামনে আয়নায় দেখা যাচ্ছে অপরিচিত লম্বা কুৎসিত মুখ একখানা,.. চোখের জায়গা দুটো যেন দুটো গর্ত, মুখখানার গর্তটা আরও প্রশস্ত, যেন নীরব চিৎকারে রত। হাত দুটো তুলে ভারভারা একখানা চেয়ারের হেলানটা জোরে চেপে ধরেছে, মাথাটা পেছন দিকে হেলান, চিবুকটা কাঁপছে।

ড্রেসিং টেবিলের ওপর ল্যাম্পটা রেখে বিস্মিত ক্লিম জিজ্ঞেস করে: 'কি হয়েছে তোমার?'

ভারভারা অতি ক্ষীণকণ্ঠে ঘর্ঘরকণ্ঠে জবাব দেয়: 'দরজটা বন্ধ করো। আমার জামাকাপড়টা খুলে দাও তো।'

অত্যন্ত ভীত ভারভারা, কি যেন বুঝতে চাইছে সে। ড্যাব-ড্যাবে চোখ দুটো, কি অদ্ভুত এক দৃষ্টি তার মধ্যে, ক্লিম দেখে কোটরে ঢুকে যাচ্ছে সে-চোখ। ঠোঁট দুটো ঝুলে পড়ছে। টুপী আর কোট্টা খুলে নিয়ে ভীত সামঘিন জিজ্ঞেস

করে : 'কি হয়েছে বল তো?'

'শীতে কাঁপছি।' অতি সন্তর্পণে নিজেকে বিছানায় তুলে নিতে নিতে বলে ভারভারা, উঠতে গিয়ে এমনভাবে নিতম্বটা টেনে তোলে, ক্লিমের মনে হয় যেন ও আঘাত পেয়েছে।

'তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে? আঘাত পেয়েছ?' ক্লিম ভয় পেয়ে প্রশ্ন করে।

'ওভার-কোটের পকেটে একটা শাদা পাউডার আছে, ওটা দাও তো।' দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে ভারভারার, তারই মধ্যে অতি কষ্টে ও এ অনুরোধ করে ক্লিমকে। বাহু দুটো ছড়িয়ে পড়েছে বিছানার ওপর, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে বার বার। 'আর কিছু জল আনো, দরজাটা ভাল করে আটকে দাও।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভারভারা : 'আঃ ভগবান...'

'এই যে,' পুরিয়াটা ভারভারার দিকে এগিয়ে দিয়ে বির-বির করে বলে ক্লিম : 'কিসের পাউডার? আমি ডাক্তার ডাকি। কেউ কি তোমাকে বিষ খাইয়েছে?'

'শ্-শ্! বদহজমের অসুখ। গর্ভপাত হয়েছে আমার। আঃ দরজাটা বন্ধ করো না। আনফিমিয়েভনা জানুক, আমি চাই না।'

হতভম্ভ সামঘিন থ' হয়ে যায়। হাত থেকে মেঝেতে ওভারকোটটা পড়ে যায়, ওর হাত দুটো যেন অবশ হয়ে গেছে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে। গেলাসে জল ঢেলে নিয়ে পাউডার ওর হাতে দেয়। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।

'কেন করলে—আমাকে না বলে? তুমি তো জান এ বিপজ্জনক। অনেক সময় সর্বনাশাও। কী হতো ভেবে দেখ। কী ভয়ংকর।'

ভাল ক'রেই জানে যা বলছে তা ভুল। ভারভারা ওর হাত টেনে নেয়, আগুনের মতো গরম গালে চেপে ধরে।

'ওগো যাও!' ফিসফিসিয়ে বলে, দাঁতে দাঁত চেপে। 'ভয় পেয়ো না। তিন মাসে বিপদ নেই। আমি এখন পোশাক বদলাব। একটু জল দাও না—সামো-ভারটা নিয়ে এস। আনফিমিয়েভনাকে জাগিও না যেন—ভয়ানক লজ্জায় পড়ব, ও যদি...'

ক্লিম টের পায় হাতের ওপর চোখের জল পড়ল। ভারভারার চোখ দুটো এমন অস্বাভাবিক কাঁপছে যেন কোটর ঠেলে বেড়িয়ে আসবে। চোখ দুটো বন্ধ ক'রে রাখলেই যেন ভাল হয়। সামঘিন অন্ধকার খাবার ঘরে প্রবেশ করে। পাশের তাক থেকে গরম সামোভারটি তুলে নিয়ে আসে। ভারভারার বিছানার কাছে সেটা রেখে দেয়। তার দিকে একবারও না তাকিয়ে আবার খাবার ঘরে ফিরে গিয়ে দরজার কাছে বসে পড়ে।

'কেন এ কাজ করল? যদি মরে যায়—কী হবে আমার?—নাঃ, ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছে ভারভারা!'

বেশ বুঝতে পারে শুধু নিজের কথাই ভাবছে ক্লিম। যন্ত্রের মতো, অভ্যাসের বশেই সে ভাবছে। মনের মধ্যে আকস্মিক ভয়ের প্রচণ্ড বেগ; অক্ষমতার বোধটা শুধু পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে। ও তো গড়ে-পিটে তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে, যাদেরকে সহজেই বোঝা যায়। তবু ভারভারার কাজের উদ্দেশ্য এখন না বুঝে শুধু সহজাত ধারণাতেই ওকে সমর্থন ক'রে।

ভাবে : 'এ-রকম একটা কাজ করতে গেলে সাহস চাই।' বেশ বুঝতে পারে ভারভারার ওপর ওর মনে নতুন এক মনোভাব জাগছে।

ভারভারা পায়ের জুতো খুলে ফেলে ঘরের চারপাশে সাবধানে ধীরে ধীরে ঘুরছে। ঘরের জিনিসগুলোও যেন ওর সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে। দেরাজ খুলবার শব্দ শুনল ক্লিম। কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ উঠল; পরমুহূর্তে কাঁচির শব্দ আর কাপড় ছেঁড়ার

শব্দ কানে এল, মেঝের ওপর একটা চেয়ার টেনে নিল ভারভারা...তারপর সামো-ভারের নল দিয়ে জল ঝরার শব্দ শুনতে পেল ক্লিম। জ্যাকেটের একটা বোতাম মুচড়ে ছিঁড়ে পকেটে রাখল ক্লিম। রুমাল বের ক'রে সেটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে মুখ মোছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, জানলার ওপাশে আরো অন্ধকার। মনে হয় জানালা ভেঙে হয়তো বাইরের অন্ধকার ঢুকে পড়ে ঘরটাকে তার ঠাণ্ডা অবয়ব দিয়ে ভাসিয়ে দেবে।

'কী বোকামী! কী ভীষণ বোকামী!' বিড়-বিড় করে প্রায় উচ্চৈস্বরেই,—ঝুঁকে পড়ে, মাথাটা আঁটো ক'রে ধ'রে, সামনে পেছনে দুল্‌তে দুল্‌তে।

'কী হবে?'



ভারভারা দরজা একটু সামান্য ফাঁক ক'রে মৃদুস্বরে ডাকে :

'ভেতরে এস।'

কথাটা মানে কিন্তু তক্ষুনি নয়। ভারভারা বিছানায় শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, গাল দুটো শুকিয়ে গেছে। নাকটা খাড়া।...কয়েক মিনিট আগেই কুঁকড়ে ছিল। এত ছোট যে দয়া জাগত।...কিন্তু এখন অস্বাভাবিক ভাবে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। খুব টান্‌টান্‌। মুখটা ভয় পাবার মতোই কঠোর। সামঘিন বিছানার পাশে একটা চেয়ার টেনে বসল। ওর কাঁধ থেকে কনুই অবধি হাত বুলিয়ে দিল। ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে এমনভাবে কথা বলল যেন ওর গলার স্বরই নয়, অন্য কারো কথা।

'ব্যাপারটা ভয়ানক। আমাকে আগে বললে না কেন? এমন কিছু মূর্খ নই নিশ্চয়ই। সন্তান হতো—তাতে কী? তাই বলে জীবন সংশয় করবে, স্বাস্থ্যও বিপন্ন করবে..'

অক্ষমতার আর্ত-অনুভূতিটা আরো বাড়ে। এই মেয়ে-মানুষটার সম্পর্কে এক অপরাধ-বোধের সঙ্গে তা মিশে যায়। এখন মনে হচ্ছে ও কত অজানা। আড়-চোখে, সতর্ক হয়ে, আলুথালু মাথার দিকে তাকায়. ঘামে ভিজে গেছে কপাল। চোখ দুটো গভীরে। দেখলে মনে হয় নিভে-আসা গন্‌গনে ছাই। নীল নীল শিখা এখনো প্রায়-অদৃশ্য হয়েও কেঁপে কেঁপে জ্বলছে যেন।

'একজন ডাক্তার ডাকি, ভারিয়া। আমার ভয় হচ্ছে। কী পাগলামো!' মৃদু-স্বরে বলে ক্লিম, কথাগুলো কানে আসতে কিন্তু নিজের কাছেই এত সকরুণ ঠেকে যে হঠাৎ কান্না পেয়ে যায়।

'পাগলামো!' ক্লিম আবার বলে : 'কেন জটিল ক'রে তুলছ...'

চোখ থেকে খুব বেশী জল ঝরেনি তবু সেই জলই দৃষ্টি ঝাপসা ক'রে দেয়। চশমা খুলে ফেলে। ভারভারার পায়ের কম্বলে মাথা গুঁজে দেয়। শিশু বয়সের পরে এই প্রথম ও কাঁদে। লজ্জা পায় ভালও লাগে। কিন্তু চোখের জলের নীচে যেন একটা মানুষের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পায়, সামঘিন তাকে চেনে না। যে নারীটি খুব কাছের আবার বহু দূরেরও বটে, তার ওপরে নতুন ক'রে এক অন্তরঙ্গতা জন্মাচ্ছে। ওর হাত ঘাড়ের কাছে আল্‌তো দাগ কাটছিল। শুনতে পেল মৃদু ভগ্ন কণ্ঠস্বর : 'আঃ—কী সুন্দর...এই চোখের জল।...ভয় পেও না গো, কোন বিপদ নেই।'

আঙুলগুলো ক্লিমের চুলের আরো গহনে গিয়ে পৌঁছয়। গলায় আর গালে

আরো গভীর ক'রে হাত বুলোয়।

'তোমার ওপরে ভার চাপাতে চাইনি। তুমি কত বড়, কত সুন্দর। শুধুই যারা মেয়েমানুষ, তাদের চেয়ে যে-কোন মা অনেক বেশী স্বার্থপর। বুঝেছ গো—'

'কথা বলো না', ক্লিমের কণ্ঠে অনুনয় : 'খুব কষ্ট হয়েছে— ?'

'না। কিন্তু আমি—বড় ক্লান্ত। প্রিয়তম আমার, সবকিছু তুচ্ছ করি—যদি তুমি আমায় ভালোবাসো। আর এখন তো আমি জানি—তুমি আমাকে ভালোবাসো, বাস না ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমাকে সন্তান নষ্ট করতে দিতে না, যদি তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতাম ?'

'কক্ষণো না,' মাথা তুলে ক্লিম বলে : 'নিশ্চয়ই দিতাম না। এতখানি ঝুঁকি। আর কীসের জন্যে ? একটি শিশু ? সে তো—স্বাভাবিকই।'

ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে। এমন সুরে বললে যেন অন্তরের কথা আরো ভাল শুনতে পায়, জোরে কথা বলার চাইতেও ভারভারা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে।

'আমার পা দুটো একটা কিছু দিয়ে ঢেকে দাও না গো। আনফিমিয়েভনাকে বলো আমি পড়ে গিয়েছিলাম, চোট পেয়েছি। ওকে, আর তাতিয়ানা যখন আসবে, তাকেও। রক্তলাগা অন্তর্বাসটা—আচ্ছা, আমি নার্সকে বলব নিয়ে যেতে। সে কাল আসবে...'

মনে হলো এই বার বোধহয় প্রলাপ বকতে শুরু করবে। কিন্তু ঠিক তক্ষুনি কথা বন্ধ। অদ্ভুত লাগে, মনে হয় যেন ঘরের বাইরে চলে গেছে। সামঘিনের আবার ভয় হয়। কয়েক মিনিট বসে থেকে, ওর উগ্র হয়ে ওঠা আকৃতি নিরীক্ষণ করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনে আর তারপর উঠে এসে ঢোকে খাবার ঘরে, দরজাটা খোলা রাখে।

জানালার ফ্রেমে চাঁদের ছোট্ট ক্ষীণ আকার যেন নীল মখমলের ওপর সুতো দিয়ে তোলা। হাত দুটো ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। নতুন উপলব্ধির স্পন্দন শোনে। অবিশ্বাসের সুরে নিজেকে জিজ্ঞেস করে :

'সত্যিই কি ও রকম ?'

আরেকবার অনুভব করে অবিশ্বাসটা ওর যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে,—যেন চিন্তার অভ্যস্ত ভঙ্গী। আজ রাতে চিন্তার প্রকৃত ধারাটা ওর বেশ ভালই লাগছে।

'ও আমাকে গভীরভাবে সত্যিই ভালোবাসে। এটা আমি অন্যায় করেছিলাম। কখনো কী ভাবতেও পেরেছি এত বড় ঝুঁকি নিতে ও পারবে ? সন্দেহ নেই, এমন জিনিস নিশ্চয়ই আছে যার নাম দেওয়া যেতে পারে—'উৎসব-আনন্দ'। সেবারে, সামার-হাউসে, লিদিয়ার সামনে হাঁটু গেড়ে আমি ভুল করিনি। নতুন কিছু খুঁজে বার করিনি, লিদিয়াও আমাকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করেনি, নিঃশেষও করেনি...'

শূন্যে তোলা হাতটা ভারী হয়ে উঠছে। হাত দুটো নামিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে টেবিলের পাশে বসে।

'ভারভারার জন্যেই যেন আজ নিজেকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি।'

ওর সেই কান্নার কথা মনে হতেই লজ্জা হয়।

'নিশ্চয়ই সন্তান ওর কাছে একটা ভার হতো। ওর পছন্দ, আমোদ-আহ্লাদ, স্বাধীন চলাফেরা—সব সীমিত হয়ে যেত। জীবনটাকে ও চায় স্বচ্ছন্দভাবে। কি মেয়েমানুষ...'

টেবিলে ভর দিয়ে ঢুলছিল। আনফিমিয়েভনা জাগিয়ে দিল।

'স্‌-স্‌ ! ভারিয়ার শরীর ভাল নেই।'

'তাই নাকি? কি হয়েছে?' চাপা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, ওর পাশে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে: 'গর্ভপাত কি, ঈশ্বর না করুন?'

'উঃ, কী যা-তা বলছ! কেন?'

'রক্তের গন্ধ না?' আনফিমিয়েভনা জিজ্ঞেস করে। নাসারন্ধ্র এদিক-ওদিক নড়ে। থামাতে না থামাতেই, কিন্তু নরম-পায়ে, পালকের মত নিঃশব্দে ভারভারার ঘরে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে এল ঠিক তেমনি নিঃশব্দ চরণে। খোলা হাতদু'টো গায়ের দু'পাশকে কনুই পর্যন্ত আঁকড়ে ধরেছে। কনুই-এর ওপর উঁচুতে উঠে তারা ভার্জিন মেরীর অ্যাপারিশনের আবালাৎস-আইকনকে চেপে ধরেছে। লোহার মতো ছোট আঙুলগুলো নড়ে বেড়ায়। ঠোঁট কেঁপে কেঁপে ওঠে। ফোঁস ক'রে বলে:

'ওঃ, এই পরামর্শ যদি তুমিই দিয়ে থাক—আমি দুঃখিত। জানি না কি বলব...'

হাতদু'টো তোলা অবস্থাতেই রান্নাঘরে সে চলে গেল। হিস্‌হিসে গলার স্বরে সামঘিন ভয় পেয়েছে। কথার অন্তরঙ্গতায় ও মনে মনে চটেনি তা নয়। এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পেছনে পেছনে ক্লিমও রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। ঊষার আধো-আলোয় আনফিমিয়েভনার বিশাল অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের মাঝখানে চেয়ারে বসে রয়েছে হাঁটুতে ভর দিয়ে। টানটান বাদামী মুখে অবিরত কান্নার বিন্দু।

'আমি কিছু জানিনা। সব তো ও নিজেই করেছে।' নিজের থেকেই নিম্ন কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে সামঘিন। আনফিমিয়েভনার ভিজে মুখের দিকে ও তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধার অবিশ্বাসী চোখ দু'টোর দিকে, যেখান থেকে অশ্রুবিন্দু ঝড়ে পড়ছে তার আধখোলা বুকের মাংসল স্তূপের ওপর।

'উঃ. আমি কী বোকা! কী পাগল! যেমন ভাবতে গিয়েছিলাম এই বাড়িতে শিশু আসবে, তার দেখাশোনা করব আমি! তার জন্যে রান্নাঘরও ছাড়ব। আইনের চোখে এ কাজ ঠিক নয়। তবু তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু কাজটা ঠিক নয়।'

তারপরই সস্নেহ উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করে:

'জানি, সারারাত নিশ্চয়ই ঘুমোও নি, না?

ক্লিম ওর হাতটা জড়িয়ে ধরে। বিড়বিড় করে বলে: 'ইচ্ছে করছে,—' উচ্ছ্বাসে যেন হঠাৎ মাতাল হয়ে পড়েছে ও: 'তোমার কর মর্দন করি। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'হাতটাত বাদ দাও।' আনফিমিয়েভনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বিশাল হাতে ক্লিমকে বুকে চেপে ধরে, অস্ফুট গলায় বলে:

'আহা গো বাছারা, তোমরা সত্যিই ভগবানের বাছা!'

নিজের ঘরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সামঘিন অপ্রতিভের হাসি হাসে:

'আমার ব্যবহারটা খুবই অদ্ভুত হয়েছিল।'

তবু মনে শিহরণ জাগে, অমন অদ্ভুত আচরণ করতে পেরেছিল ব'লেই যা আর কেউ পারতো না।



দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে চলেছে...চমৎকার...

সব কিছু আশ্চর্য রকম সুন্দর। ক্লিম সামঘিন নিজেকে নিয়ে ভয়ানক মোহিত। কবিত্ব যেন ওকে ঘিরে ধরেছে। ভারি ইচ্ছে করে লোকজন্যের সঙ্গে কথা বলে নতুন কোনো ধরণে, নরম সুন্দর ভঙ্গীতে। এমন কী যে তাতিয়ানা ওর 'পরে বিরূপ, তার সঙ্গেও শক্ত হ'তে পারল না। ভারভারার বিছানার পাশে পা মুড়ে বসে একটা পা দোলায় আর অনর্গল মিশা-কাকার গল্প করে।

'যারা কঠিনতার অতি-ভক্ত তারা, আমলারা আর এক কথায় বলতে গেলে ঘন-গুঁড়ি কুঁদে বেড়িয়ে এসেছে, তারা সব্বাই আমার দু'চক্ষের বিষ। কাল ও আমাকে বোঝাতে চাইছিল কি জানেন, বিপ্লবী আর কঠোর পরিশ্রমে দণ্ডিত ইয়াকুবোভিচ্-মেনশিনের উচিত ছিল বোদলেয়র অনুবাদ না ক'রে পল লুই ক্যুরিয়ের দ্বিমাত্রিক অনুবাদ করা। কি বিচ্ছিরি!'

'সঙ্কীর্ণ', সবিনয়ে শুধরে দেয় ক্লিম। 'প্রচারক মাত্রই সংকীর্ণ হ'তে বাধ্য।'

'ওসব জানি না', তাতিয়ানা বলে। 'কিন্তু এইসব প্রাচীন-বিপ্লবী বহু দেখেছি, এখনো দেখছি। রোমান্টিক বাতাস কবে তাদের ছেড়ে উধাও হয়েছে, এখন দেখবেন শুধুই ব্যক্তিগত কামড়াকামড়ি। দেখুন না তরুণ মার্ক্সিস্টদের কথা বুঝে দেখতেও তারা অস্বীকার করল। স্রেফ অস্বীকার করল।'

ভারভারা ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করে। রক্তহীন মুখটা কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। তাতিয়ানার হাতটা আস্তে ছুঁয়ে সামঘিন দরজার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ায়। খাবার-ঘরে এসে মেয়েটা ক্লিমকে প্রশ্ন করে, কোথায় এবং কি ভাবে ভারভারা পড়ে গিয়ে-ছিল। ডাক্তার ডাকা হয়ে ছিল কিনা, তিনি কি বলেছেন? একের-পর-এক এত তাড়াতাড়ি প্রশ্নগুলো করে, ক্লিম উত্তর দিতে পাবে না। ভারভারা ওকে ডাকল। ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। ওর হাতটা নিয়ে, রক্তহীন ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ভারভারা মৃদুস্বরে বলে :

'দেখ একটা আবদারেব কথা বলি?' পাল্টা হেসে ও মাথা নাড়ায়।

'তানিয়ার সঙ্গে বেশী কথা বলো না, ও খুব ছলাকলা জানে।'

'না, বলব না,' মাথা উঁচু ক'রে প্রতিজ্ঞা করে, যেন শপথ নিচ্ছে। চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে :

''ক্যাপ্রীস্' কথাটার অর্থ, যদি ভুলে না গিয়ে থাকি, 'তিড়িং, তিড়িং নাচ' লাতিন 'কেপার' শব্দ থেকে, যাব মানে ছাগল।'

ওর জবাবের জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করে। তারপর জিজ্ঞেস করে :

'কি ভাবছ?'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলে : 'সুবিচার। একটাই সুবিচার আছে, প্রেম'।

ক্লিম সামঘিন আকস্মিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠে :

'পরীক্ষায় পাশ করলেই আমরা মায়ের ওখানে যাব। যদি চাও তো ওখানেই আমাদের বিয়ে হবে। চাও না?'

ভারভারা কিছুই বলল না। চুপ ক'রে শুয়ে আছে। ক্লিম দেখল ওর চোখের ভোঁয়ার মধ্যে কি চমৎকার আলোর রশ্মি। ঝক্‌মক্ করছে। উদারতার ঢেউয়ে ভেসে যেতে যেতে ক্লিম বলল :

'তারপর আমরা ওকার ওপর দিয়ে, ভল্‌গার ওপর দিয়ে, ক্রিমিয়ায় যাব, না?'

কাতরাতে কাতরাতে ভারভারা কোন মতে একটু উঁচু হয়ে ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে সেটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে :

'কিছু যায় আসে না, বুঝেছ...?

'না, না উত্তেজিত হ'য়ো না', অনুনয় করে। বেশ গর্ব যে অমন একটা অনুভূতি জাগাতে পেরেছে।

তিন সপ্তাহ পরে ও ভাবছিল : 'এই তো আমার মধু-চন্দ্রিকা।' অমন ভাবার কারণও ছিল। স্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে ভারভারা অনেক বেশী হাসিখুশী, অনেক বেশী সুন্দর হ'য়ে উঠেছে। কোমল ও ব্যগ্র অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। ক্লিমের ওপর তা' কিন্তু এতটুকুও গুরুভার চাপায় নি। আচরণে আগের চাইতে বেশী ক'রে যত্নের ছোঁয়াচ। এত যত্ন যে এক সময় ক্লিম বলে :

'জান ভারিয়া, তুমি অদ্ভুত স্নেহশীল মা হ'তে পারবে!'

মে মাসের মাঝামাঝি। পেত্‌রভ্‌স্কি-পার্কের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ছে। পুকুরের আরশীতে নীল-আকাশ আর সফেন দুধ-ফুটানো মেঘ। গাছের শাখায়-শাখায় ঈষৎ-সবুজ আভা আঁকবার জন্যে উষ্ণ বাতাস সূর্যকে প্ররোচনা দিচ্ছে। ভারভারার চোখেও অমনি আলোর ঝল্‌কানি।

'চল বাড়ি যাই। সময় হ'লো।' বেঞ্চি থেকে উঠতে উঠতে বলে।

'বলছিলে না, কালকের মধ্যে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা পড়তে হবে। খুব আনন্দ হচ্ছে কিন্তু তুমি ইউনিভার্সিটির পড়ার মধ্যে আছ। অনর্থক ওই হাঙ্গামা গুলো ..'

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই দীর্ঘনিঃশ্বাস দিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে বলে : 'লেরমন্‌তভ কি সুন্দর বলেছে না, "একটি উৎফুল্ল দিন!"' সামঘিন ওকে নিয়ে পুকুরের ধার দিযে বেড়ায়। চেয়ে চেয়ে দেখে কাঁচের মতো এখনো—নীল জলে ওর ছাযা। সুঠাম তনু ঘিরে নীল জ্যাকেট। তার ওপরে ওর সুন্দর টুপী। কখনো বা লাস্যভরে সেটা সামান্য একটু আন্দোলিত হচ্ছে।

'আমার কিন্তু মনে হয় মস্কোর মতো চমৎকার বসন্ত আর কোথাও নেই। অবশ্য স্বীকার করছি আর কোথাও আমি যাইও নি। বিশ্বাস করো বা না করো, যেতে আমি চাইও না। ভয় হয়, মস্কোর চেয়ে ভাল যদি কিছু দেখে ফেলি, এখনকাব ভালোবাসাটা যদি কমে যায়।'

'ছেলেমানুষী ধাবণা,' সামঘিন বলে। গম্ভীর কিন্তু অমাযিক ওর কণ্ঠস্বর। অমাযিক হ'তে পেবে আনন্দ পায়। নতুন আলোতে নিজেকে দেখতে পায়।

'ছেলেমানুষী একশ'বার—' স্পষ্ট স্বীকার ক'বে ফেলে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে :

'আচ্ছা, তোমার মনে হয না প্রেমের ক্ষেত্রে সাবধানী হ'তে হয, মনোযোগী হতে হয?'

'কিন্তু অন্ধ তো আর হ'তে হয় না।' ক্লিম বলে।



কয়েক সপ্তাহ পরে। ক্লিম সামঘিন এখন 'বিচার-বিভাগে কর্মপ্রার্থী'। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বাড়িতে ব'সে ব'সে ভারাভকার কথা শোনে :

'তা'হলে তুমি এখন এটর্নী, সম্ভবতঃ ভাবী জেলা-এটর্নী, হ্যাঁ? এসব আমার ভাল লাগে না কিন্তু। ভবিষ্যত তো এখন ইঞ্জিনীয়ারদের কবলে।'

মুখটা ফুলো-বেলুনের মতো। ভেতরে ভেতরে যেন লাল আলোর রোশনাই। মাতালদের মতো রক্তিম কান। চোখ দুটোকে সংকুচিত ক'রে ভারভারাকে দেখে। অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে টপাটপ্ বিস্কুট খাচ্ছে। সোনা বাঁধানো দাঁত ঝিলিক-দিয়ে দিয়ে ওঠে। সোডা পান করে,—যখন-তখন তাতে শেরীও মেশায়। ভারভারার ওপর ক্লিমের মায়ের আচরণ যেন ইংরেজ গভর্নেসের। বলছিল :

'তিমোফেই স্তেপানোভিচের ছুটোছুটিকে ধন্যবাদ! আমাদের এখানে ইলেক্‌ট্রিক আলো বসেছে...'

হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ভারভারা সশ্রদ্ধভাবে শোনে। আলাপের ঠিক সুরটা ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ আগ্রহে ওর মনে স্পষ্টই টানাপোড়েন চলে।

'বেশ সুন্দর শহর', কথায় কেমন বিজড়িত ভাব। সঙ্গে সঙ্গেই ভারাভকা প্রতিবাদ তুলল :

'আহাম্মুকে শহর একটা। এখানে শতকরা প'চাশীজন মুর্খ, দশজন বদমাশ, আর প্রায় তিনজন কাজের হলেও হতে পারত, যদি না শাসন-ব্যবস্থা তাদের বিগড়ে দিত। আর তারপর আছে অতি-চালাক—সব অপদার্থ ভাবুক।'

হাতটা নাড়িয়ে আরেকবার সামঘিনের দিকে ফেরে।

ক্লিম, আমি তোমাকে কিছু কাজ দিতে চাই...'

ভারভারাকে লক্ষ্য করতে করতে সামঘিন শোনে। মায়ের সামনে ওর অস্বস্তিটা বুঝতে পারছে। ভেরা পেত্রোভনা অসহজ ভদ্রতায় ওকে গ্রহণ করেছিল। যেমনটি লোকে করে যে-কোনো অপরিহার্য সাক্ষাতের বেলায়। বিশেষতঃ, সেই আসন্ন সাক্ষাতে আনন্দের প্রতিশ্রুতি যদি খুব কমই থাকে।

'কিন্তু তুই যে লিখেছিলি ওর সবুজ চোখ!' ক্লিমকে অনুযোগ জানিয়েছিল, 'খুব আশ্চর্য হ'য়েছিলাম। সবুজ চোখ তো শুধু রূপকথায় পাওয়া যায়।' সঙ্গে সঙ্গে আবার যোগ করেছিল :

'জানিস, বাড়ির ওপাশটায় একটা লোক মরতে বসেছে। এলিজাবেথার স্বামী।'

'এখানে নিশ্চয়ই ওর অদ্ভুত লাগছে,' সামঘিন ভেবেছিল। নিজেকেও ভয়ানক বিদেশী ঠেকেছিল এই বাড়িতে। এমন তো কোন দিন হয়নি।

ভারাভকা তখনো কানের কাছে চিৎকার করছে :

'তুমি মাসে একশ' কি বড়জোর দেড়শ' কামাবে .'

ডাক্তার লুবোমুদ্রোভ প্রবেশ করল। দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল : 'তোমাদের ঘড়িটা দেখছি আট মিনিট ঢিমে তালে চলছে।'

ক্লিমকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায় এমনভাবে যেন সে তার পূর্বপরিচিত। ভারভারাকে মাথা নুয়ে অভিবাদন জানায়। কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য করে ভদ্রলোকের চোখ দু'টো বন্ধ। টেবিলের একধারে বসতে বসতে একটা খালি গেলাস ঠেলে দেয় ভেরা পেত্রোভনার দিকে। ডাক্তারের এলো মেলো চেহারার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভেরা তাকিয়ে দেখে।

'আজ রাতটা টিকবে কিনা সন্দেহ', ডাক্তার বলে। 'কি কঠিন প্রাণ, অবাক কাণ্ড। একটা ফুসফুস নেই, যা আছে তাও অকেজো।। রোগীর এই বেঁচে থাকাই যেন বেআইনী।'

'লোকটিব প্রতিভা ছিল না বটে, তবে সংগীতে জ্ঞান ছিল খুব,' সামঘিনের মা ভারভারাকে বলে।

'ছিল কি, আছে!' চায়ের গেলাশে চিনি নাড়তে নাড়তে ডাক্তার শুধরে দেয়।

'এখনো আছে,—নিশ্চয়ই আছে। আমরা ডাক্তারেরা খুব কম জিনিসেই বিস্মিত হই। কিন্তু এ রোগীর মরণ—বেশ ভদ্রগোছেরই বলতে হবে। যেন বাসাবদল করছে, এমন ভাব। মানসিক উদ্বেগ থাকা উচিত, কিন্তু একেবারে নেই।'

একে একে সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয় ডাক্তার। ভয়ানক অবাক ভাব। ওর গল্পে সবাই বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছে দেখে কাশে। ক্লিমকে জিজ্ঞেস করে :

'তারপর, এখনো বিদ্রোহ-টিদ্রোহ করছ? আমাদের সময়ে আমরাও বিদ্রোহ করেছিলাম হে! কিছুই হলো না, তবে রাশিয়া কয়েকজন অসাধারণ লোক হারাল।'

ভেরা ছেলেকে পরামর্শ দেয় :

'লিজার খবর নেওয়া উচিত কিন্তু তোমার—বিশেষ ক'রে কিছু ঘটবার আগেই—'

এখান থেকে উঠতে পেরে ক্লিম সত্যিই খুশী হয়।

উঠোনে যাবার পথে চত্বরটাকে ভাল ক'রে দেখতে দেখতে ভাবে, 'কি রকম অদ্ভুত গলায় অথচ কেমন কায়দা ক'রেই না মা বললে—কিছু ঘটবার আগেই।' দরদালানের ওপাশটা, মনে হলো, আগের চেয়ে ওজন বেড়েছে, নীচু হ'য়ে পড়েছে। ছাদটা যেন একটু ঝুঁকে পড়েছে, বোধহয় বুড়ো বয়সের চাপে। দেয়ালগুলো থেকে গরম লোহার পাতের মতো উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ক্লিম প্রবেশ করল বাগিচায়... চারধারে ফুলে ফুলে ভরে আছে। পাখীর কাকলি আর রং বেরঙের ফুলের সমারোহ। এত রোদ যে মনে হয় বাগানটা যেন পৃথিবীর বুকে সূর্যের প্রিয় আবাস।



দালানের জানলায় স্পিভাককে দেখা গেল। পরনে সাদা ড্রেসিং-গাউন। একটা বোতল খালি করছিল। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্লিম:

'ভেতরে আসব কি?'

'আসুন।' উচ্চ কণ্ঠেই উত্তর দিল মহিলা।

তোয়ালে জড়ানো দু'টো বোতল ছোট্ট ছেলের মতো বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে স্বাগত জানায় মহিলা। মুখে চোখে যন্ত্রণার ছাপ দেখে মনে হলো বোতলগুলোর উষ্ণতা যেন তার দেহ পুড়িয়ে দিচ্ছে।

সামঘিনের দিকে নজর না দিয়ে মহিলা বলল : ওঁর ঘরে যাবেন? ক্লিম নীরবে পেছনে পেছনে যায়। মরণোমুখ লোকটাকে দেখবার বিশেষ উৎসুক্য ওর নেই।

শিল্পী বিছানায় ঠেসান দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে জানলা খোলা। সাদা-কালো চেকের একটা গরম চাদর বুক পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া। ওপরের দিকের সার্ট খোলা। সেখানটায় রোদ্দুর প'ড়ে ধূসর চামড়া আর তার ওপরের কোঁকড়ানো কালো চুল চক্‌চক্‌ করছে। শিশুদের মতো ছোট্ট বুকের খাঁচাটা চামড়ার নীচে ওঠানামা করছে থেকে থেকে চামড়াকে আঁটো ক'রে তুল্‌ছে। এক দিক্‌কার কণ্ঠার হাড়ের গভীর গর্তটায় উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে, অন্য দিকটায় ছায়া। রুগ্ন স্পিভাক আরও শুকিয়ে ছোট্ট হ'য়ে গেছে। দেখে ক্লিমের মনটা শিরশির ক'রে উঠল! আর এক মুহূর্ত রোগীর মুখের দিকে তাকানোর সাহস ও যেন হারিয়ে ফেলে। স্পিভাক অসুস্থ চিঁ-চিঁ ক'রে বলল :

'ওঃ, তুমি! দেখছ তো এখনও টিকে আছি—এমন একটা দিনেও। দিনটার

জন্যে দুঃখ হচ্ছে...'

— ঝুঁকে প'ড়ে ওর স্ত্রী পায়ের নীচে গরম জলের বোতল ঠেলে দিল। সাদা বালিশের ওপর কালো 'চুলের আলুথালু মাথাটা ক্লিম দেখতে পায়। ঘামে ভেজা কপাল, বিহ্বল চোখ, হলুদ দাঁত, আধখোলা মুখ।

'মরণকে ভয় পাই না কিন্তু মরতে মরতে আমি ক্লান্ত', স্পিভাক বলে। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ। শীর্ণ ঘাড়টা কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে, দেখে মনে হয় মাথাটা যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। প্রতিটা কথা উচ্চারণ করার জন্য শ্বাস নিতে হচ্ছে। সামঘিন দেখে কি লোভীর মতো রোদ ঝলমলে বাতাস টানছে! শুষবার সময়ে ঠোঁটদুটো এমন কেঁপে কেঁপে উঠছে যে ভয় হয়। আরো ভয় হয় কোটরগত কালো চোখের অর্ধোন্মাদ করুণ হাসিটা দেখে।

এলিজাবেথা দাঁড়িয়েছিল। হাতদু'টো বুকের ওপর আড়াআড়ি ক'রে রাখা। স্থির দৃষ্টিটা স্বামীর মুখে থমকে গেছে যেন পুরোনো দিনের রোমন্থন করছে। ক্লিমের মনে হয় ওর মুখে দুঃখ নেই, আছে উদ্বেগ। বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে। ভীতিকর হলেও এরচেয়ে বোধ হয় অনেক স্বাভাবিক ছিল, ছিল অনেক বেশী সু-বোধ্য।

স্পিভাক্ বলছিল : 'আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না যে আমি একেবারেই মরে যাব। এহচ্ছে নৈঃশব্দের সমুদ্রে ডুবে যাওয়া, পার্থিব শব্দ রাজ্য হতে অনেক দূরে মার্গ সঙ্গীতের রাজ্যে চলে যাওয়া। কার লাইন ওটা—? "ধরার শব্দ সমুদ্র হতে দূরে বহুদূরে ..?"'

রোগীর কথায় সামঘিন জোর ক'রে নিজের ওষ্ঠের কোণে হাসির রেশ ফুটিয়ে তোলে। ওষ্ঠের কুঞ্চন কিন্তু মুখে শুধুই ভীতি নিয়ে আসে, মনে হয় এখানে ও-সব অচল, বোকামী মাত্র। তবুও বলে ওঠে :

'বেশী বাড়িয়ে তুলছেন যেন। আপনার মতো রোগ নিয়েও তো লোকে বহু-কাল বেঁচে থাকে।' পাল্টা জবাব দেয় স্পিভাক : 'বহুকাল মরেও থাকে।' কণ্ঠমণিটা এগিয়ে এল। 'হয়তো আরো কিছুদিন বাঁচতে পারতাম—কিন্তু এই শহরটা আমাকে শেষ করে ফেললে। ধুলো আর বাতাস—ধুলো—আর সব সময়েই ঘণ্টা বাজছে—কি যে শব্দ! ঘণ্টার বাজনা তখনি ভাল যখন জীবন সুন্দর...'

এলিজাবেথা সাবধান ক'রে দেয় : 'অবসন্ন হ'য়ে পড়ছো কিন্তু।'

ক্লিম ইঙ্গিতটা বোঝে।

'বিদায়', বলেই তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে আসে। ভয় হয়, পাছে মুমূর্ষু লোকটা হাত বাড়িয়ে দেয়। এই প্রথম ও দেখতে পেল মৃত্যু কি ক'রে মানুষকে গ্রাস করে। ভয় বিরক্তি, দুটো মনোভাবই যেন ওকে পিষে ফেলেছে। ড্রইংরুমে ফিরে এসে বলল :

'সূর্য কি নির্দয়ভাবেই...'

কিন্তু এলিজাবেথা হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে ছিল। তার দৃষ্টিটা ওর ঘাড়ের পাশ দিয়ে বহুদূরে নিবদ্ধ। বলল :

এ সব সময়ে রীতি হচ্ছে দার্শনিকের মতো কিছু বলা। কিন্তু তার দরকার নেই। এখানে কিছু বলারও প্রয়োজন নেই।'

তার শ্রান্ত আশাহীন দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সামঘিনের ইচ্ছে হলো পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখে ঘাড়ের ও পাশটাতে কি দেখছে।



ফিরে যাবার পথে বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে দেখলো ভারভারা ওরই ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফুলের পাঁপড়িগুলোকে আদর করছে। প্রাচীর পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলল :

'আমরা এখানে অসময়ে এসেছি।'

পেছন দিকে তাকিয়ে ভারভারা ফিস ফিসিয়ে বলল : 'ও কী—শীগ্‌গিরই ?'

সামঘিন মাথা নাড়ায়, বলে : 'এদিকে এস।' মুক্তা-রঙা রেশমী পরিচ্ছদে সেজে সুষম দেহখানা নবপল্লবিত ঝোপের ওপাশের পথটা ধ'রে এগিয়ে এল। সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো ওর কাছে কৈফিয়ৎ দেবার নিশ্চিত প্রয়োজন ঘটেছে। পরম সৌজন্যে বাগানের এক কোণে ওকে নিয়ে গেল। চেরী গাছের ঘন ছায়ার তলে বেঞ্চিতে ওরা বসল। আদর মাখান হাত বুলোতে বুলোতে বলে : 'বিচ্ছিরি ব্যাপার।'

উৎসাহী কণ্ঠে জবাব দেয় ভাবভারা :

'হ্যাঁ, যা বলেছ—।' তারপর নীচু গলায় খুব তাড়াতাড়ি বলে যায়, যেন মাস্টারমশায়ের কাছে পাঠ কবছে :

'আর্বাৎ স্কয়্যার দিয়ে একজন বেশ ভাল পোশাক পরা লোক যাচ্ছিল। এক ঝাঁক পায়রা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। সেখানে এসেই লোকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। পায়রাগুলো উড়ে গেল। লোকেরা সব ছুটে এসে তাকে ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে দেয়। একজন পুলিশ তাকে নিয়ে গেল। ভীড় সরে গেল। পায়রাগুলোও আবার ফিরে এল। ঘটনাটি আমি দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম লোকটা নিশ্চয়ই পায়ে চোট পেয়েছে। পরের দিন কাগজে পড়লাম লোকটা পড়ে মরেই গেছে।'

গল্পটা বলতে বলতে বাগানের এককোণে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। সবুজের মধ্যে দিয়ে যেখানে দরদালানের ছাদের অংশ, তারই সঙ্গে ধোঁয়া-ভরা একটা চিমনি দেখা যায়। চিমনি দিয়ে নীল ধোঁয়া বেরে চ্ছে, এত পাতলা আর স্বচ্ছ যেন ধোঁয়া নয়, গরম বাতাস। ভারভারার চোখ অনুসরণ ক'রে সামঘিনও সেই উদ্গত ধোঁয়া দেখে। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে হয়, খুব সাধারণ দৈনন্দিনের কথা, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। ভারভারা তখনো বলছে :

'যখন আমাব বয়স তের, আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা ছাদ মেরামত হচ্ছিল। সেদিন শাস্তি পেয়েছিলাম, জানলার ধারেই বসেছিলাম। একটা ছোট ছাদ-পিটুনি ছেলে আমাকে ভেঙচাচ্ছিল। আর একজন মিস্ত্রী গান গাইতে শুরু করল। বেশ লাগছিল। কিন্তু হঠাৎ শুনি গানের বদলে তীব্র চিৎকার, কর্কশ আর তীক্ষ্ন চিৎকার, ধপ্ ক'রে শব্দ হয়েছিল, নরম একটা কিছু পড়ে যাবার শব্দ। বড়মিস্ত্রি পড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা টিনের ওপরে মুখ গুঁজে টান হ'য়ে শুয়েছিল, যেন একটা প্যাটার্ন..'

থামল একটু। তাবপরে শেষ করল :

'হঠাৎ কেউ মরে গেলে কিন্তু ভয় লাগে না।'

'থাক্। ওসব কথা আর না। শহরটা কেমন লাগল ?'

'দেখলাম আর কই,' মনে করিয়ে দিল। ওর এইসব কথা অদ্ভুত শোনায়। এত সরলতা ভরা, যেন ইস্কুলের ছাত্রী। কখনো ভুলভ্রান্তিও থাকে। কেমন যেন

অস্বাভাবিক, কেমন বিষাদ করুণ। সামঘিন বুড়ো কজলভের কাছে শোনা শহরের কাহিনী বলতে আরম্ভ করে। রুমাল দিয়ে একটা মৌমাছি তাড়িয়ে ভারভারা বাধা দেয় :

ওরা 'উনুন জ্বালাচ্ছে কেন?'

'হয়তো জল গরম করবে।' অনিচ্ছুক গলায় সামঘিন জবাব দেয়। ভারভারার আরো কাছে ও এগিয়ে যায়। ধোঁয়ার দিকে তাকায়।

'কিংবা ঝি এসেছে হয়তো। জান তো একটা কুসংস্কার আছে'। কোন মেয়ে মানুষের ছেলে হতে খুব কষ্ট হলে গির্জায় জারের গেট্‌টা খুলে দেওয়া হয়। এর এর অবশ্য একটা অর্থ হয়—প্রতীক হিসাবে। আর যখন কোন লোক খুব যন্ত্রণা পেয়ে পেয়ে মরে তখন উনুনের ওপরে কাঠের গন্‌গনে আগুন করা হয়, কিংবা একখণ্ড চেলা কাঠ জ্বলিয়ে রাখা হয়, যাতে আত্মা স্বর্গের পথ দেখতে পায়—
—"আত্মার নির্গমনের জন্যে আলোক।" এই আর কি?

ভারভারা অবিশ্বাসী ভঙ্গীতে চোখ পিট্‌পিট্ করছিল দেখে ও ঠাট্টার সুরে বলে :

'এই আর একটা ধাঁধা শোন। উত্তরটা দাও দেখি, আত্মাকে কেন দেউলেদের মতো চিমনির ভেতর দিয়ে উড়ে যেতে হবে।'*

ভারভারা কিন্তু হাসে না। মাথা নীচু ক'রে, রুমালটা দুমড়ে মুচড়ে বলে :

'জান, সেই তখন—, এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল জীবনের একটা টুকরো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

সামঘিন ওর হাতে চুম্বন ক'রে বলে : 'মাকে পছন্দ হয়নি?'

'জানি না,' সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

'প্রায় প্রথম থেকেই তিনি তো ওই কথাটাই বলছেন...'

অট্টালিকার ছাদটার দিকে ভারভারা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। অস্তরবির আভায় চিমনির নীচটা লাল টকটকে হ'য়ে উঠেছে। রুপোলী ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, প্রায় চোখেই পড়ছে না। সামঘিন নিজের ওপরে খুব বিরক্ত। হতভাগা চিমনিটা থেকে ভারভারার মন সরিয়ে আনতে পারছে না! ভুলও করেছে, মায়ের কথা জিজ্ঞেস ক'রে। মোট কথা উল্লসিত হ'য়ে ওঠবার মত কিছুই করতে পারেনি। নিজেকে চিন্‌তে বা বিশ্বাস করতেও পারছে না। কয়েকমাস আগে কখনো কি ও ভাবতে পেরেছিল যে ভারভারার ওপর যে মনোভাব এখন জেগেছে তা সত্যি হ'তে পারে, শোভন হ'তে পারে?

'আঃ, তোমাদের তিমোফেই স্তেপানোভিচ সত্যিই অপূর্ব!' মুখ থেকে অদৃশ্য একটা কিছু হাত দিয়ে তাড়িয়ে শহর-বেড়ানোর প্রস্তাব করে ও। পথে পড়েই চঞ্চল হয়ে ওঠে। সামঘিন বোঝে চাঞ্চল্যটা নেহাৎ ইচ্ছাকৃত। তবু ও খুশী হয় এই ভেবে, যে অন্ততঃ আনন্দ পাবার চেষ্টা তো করছে। ভারভারা বলে উঠল : 'শহরটা বুড়ো-বুড়ী আর অথর্বদের চমৎকার আস্তানা!'

'নেহাৎ খারাপ হবে না, যদি এদের জন্যে বিশেষ বিশেষ শহরে ব্যবস্থা করা হয়। এরা মানে যাদের দিন আগে ছিল।'

সামঘিন হেসে বলে : 'কিন্তু বড় নিষ্ঠুর প্রস্তাব।'

ভারভারা চুপ ক'রে গেল। অবশেষে বলে : 'কথাটা শুনতে বড্ড খারাপ—'মরে যাচ্ছে'—কথাটা শুনলেই আমার সেই সব জিনিসের কথা মনে হয় যাতে আমার

---

* রুশ ভাষায় দ্ব্যর্থক বাক্য এটি : 'চিমনির ভেতর দিয়ে উড়ে যাওয়া'-র অর্থ হলো দেউলিয়া হওয়া।'

কিছুই এসে যায় না।'

আবার ওই বিষয়ে ফিরে যাচ্ছে দেখে সামঘিন বিরক্ত হয়। শুষ্ক কণ্ঠে বলে : 'কিন্তু কি ক'রে চলেইবা যাই বল? কাল-ই যদি যেতে চাই, তা তো আর হয় না। মা দুঃখ পাবে।

'তা বটে।' ভারভারা সায় দেয়।



আঁধার নামবার পর ওরা ফিরল। খাবার-ঘরে ভারভকা জটিল 'পেসেন্স' খেলার তাস সাজাচ্ছিল। তাস গোছাতে গোছাতে বিড়্‌বিড় করছে। বিপরীত দিকে ব'সে ডাক্তার মোটা একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে।

'আজ রাতে বৃষ্টি হবে,' ডাক্তার বলে। এক চোখ ছোট ক'রে আর এক চোখ দিয়ে ভারভারাকে পলকে দেখে নেয়। ভবিষ্যত-বাণী করে—'বৃষ্টিতে শিল্পী শেষ হ'য়ে যাবে।'

'ডাক্তার, তোমার ওই মৃতলোকটাকে নিয়ে বড্ড বেশি ঘ্যানর-ঘ্যানর করছ।' ভারভারার সুরে নালিশ ফুটে ওঠে।

ডাক্তার ওকে শুধরে দেয় : 'মৃত নয়, অসুস্থ।'

'যাক্‌গে. কোন কেউকেটা তো মরছে না,' ভারাভকা মন্তব্য ছুঁড়ে হাতের তাসে তার নাক চুলকোয়।

বড় শ্রান্ত বলেই ভারভারা তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে। সামঘিনও নিজের ঘরে যায়। অনেক ক্ষণ ধরে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনটা কেমন উদাস। দেখে কালো মেঘের টুকরো একটু ইতস্ততঃ ক'রে অবশেষে তারাগুলোকে নিভিয়ে দিচ্ছে। রাতে কিন্তু বৃষ্টি হলো না। ভয়ানক গুমোট। ঘুমোন দুষ্কর। খোলা জানালা দিয়ে যেন বর্ণহীন উষ্ণস্রোত এসে ঘামে শরীর ভিজিয়ে দিয়ে গেল। অদ্ভুত অসাধারণ ঘন নৈঃশব্দ—বিভীষিকার মতো উদ্যত হয়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসে জমেছে। কেঁদে ওঠবার তীব্র ইচ্ছে হয়। কিন্তু শহরটা নীরবেই ধুঁকছে। যেন সেই রাতে ওর বেঁচে থাকাটাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কুকুরগুলোও চেঁচান বন্ধ করেছে। এক-মাত্র শুধু পুলিশের আশীর্বাদক আর্চেন জেল মিখাইলের গির্জার ঘণ্টা নিস্তব্ধ রাত ঘোষণা করছে।

ক্লিম চোখ বন্ধ ক'রে পড়ে থাকে। ভাবে নেখায়েভা বালিদিবার চেয়েও জীবনে অনেক বেশী পেয়েছে ভারভারার কাছ থেকে। তবুও হায়, নেখায়েভার কথাই বুঝি সত্যি। বিশ্লেষণের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায় জীবনের হাতে এমন একবিন্দু মধুও ওঠে না যাতে তিক্ততার স্বাদ নেই। সরলভাবে জীবন যাপন করাই বোধহয় বিধি। হ্যাঁ, মানুষের পক্ষে তাই-ই উচিত...।

সকাল সাতটা আন্দাজ বৃষ্টি নামল। গত তিন সপ্তাহ হলো হবে-হবে ক'রেই শাসাচ্ছিল, আর এই এখন এল। সঙ্গে নিয়ে এল তার অনেক সঙ্গী বন্ধু,—এল বিদ্যুৎ তার চোখ-ধাঁধানো তন্বী রূপ নিয়ে, অশনি-নির্ঘোষের সঙ্গে এল প্রমত্ত প্রভঞ্জন। বিলম্বে আগমন হেতু যেন নিজের গুণাবলী প্রদর্শনে এখন ব্যস্ত। বৃষ্টি এসে দরদালানের লোহার ছাদ ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে গেল। চারিধারে ধুলো-ধূসরিত গাছগুলো চীনাংশুক প্রচ্ছন্নতা নিয়ে যেন অবগাহন স্নান সেরে উঠল। তৃষ্ণাতুর উন্মুখ ধরিত্রী অজস্র বর্ষণে স্নাত। এখন বর্ষণ-ক্লান্ত পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্ন হ'য়ে যেন সূর্য-প্রতীক্ষায় রয়েছে।

সর্বপ্রথমে ক্লিম এল খাবার-ঘরে চায়ের জন্যে। বাড়িতে তখনো সাড়া জাগেনি, সবাই ঘুমিয়ে। ওপরতলায় ভারভারার ঘরে যেখানে ডাক্তার উঠেছে, কে যেন সেখানে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছ। কয়েক মিনিট পরে ভারভারা চুপটি ক'রে এসে ঢুকল। সেজে-গুজেই সে এসেছে।

'আমিও ঘুমোতে পারে নি,' ভারভারা বলল : 'এই রকম গোরস্থানের নীরবতা আমি আর কোথাও দেখিনি। রাত্তিরবেলায় সাদা পোশাকে এক নারীমূর্তি বাগানে বেড়াচ্ছিল। হাত দুটো তার মাথার পেছনে রাখা। তারপর এলেন ভেরা পেত্রোভনা। তাঁরও পরনে সাদা পোষাক। বহুক্ষণ তাঁরা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—যেন পার্‌সি।'*

'পারসি? সে তো তিন দেবীর সাক্ষাৎ!' ক্লিম ওকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

'তা জানি। কেন, ওই লোকটা!...সে কি বেঁচে আছে এখনো?'

সারারাত ঘুমোতে না পেরে ক্লিম এখন অবসাদগ্রস্ত। কি বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মুখ মুছতে-মুছতে ডাক্তার এসে ঢোকেন। হেসে বলেন :

'সুপ্রভাত! খবরের মধ্যে রুগী এখনো বেঁচে। যতটা বাঁচা যায়, তার একটুকুও কম নয়। এ এক অস্বাভাবিক ব্যাপার!'

ক্লিম বিরক্তিটা ওঁর ওপর চালাতে যায় :

'বুদ্ধির ওপর আপনার আস্থা ভুল কি না......'

জানালা খুলতে খুলতে ডাক্তার বিড়-বিড় ক'রে : 'এ এক অসাধারণ কেস।' টেবিলের কাছে এসে এক কাপ কফি ঢেলে নিয়ে গেলাস হাতে এক মুহূর্ত ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পায়চারি ক'রে টেবিলে এসে বসেন। অভিযোগের সুরে বলেন :

'আমার কাজটা খুব বৈচিত্র্যহীন। দুঃখ হয় গাইনোকলজিস্ট হইনি কেন।'

ভেরা পেত্রোভনা এলেন। বললেন ভারভারা তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ক'রে ইস্কুলে চলুক। সামঘিন ঠিক করল সংবাদপত্রের অফিসে একবার যাবে বইয়ের সমালোচনার পারিশ্রমিকটা নিয়ে আসতে।

বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে শহরটা যেন উৎসব-সাজে ঝকঝক করছে। বাগানে-বাগানে তপন দেবতা কিরণ ঢেলে ঢেলে যেন উষ্ণতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। নিথর বাতাসে নব-কিশলয়ের গন্ধ। চারিধার নির্জন। প্রফুল্ল চিত্তে ওরা হাঁটছে। ক্লিম ভাবে : যাই বল থাকতে হয় তো এই মফঃস্বলেই।

সম্পাদকের দপ্তরে লোহার সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দ্রোনভের সঙ্গে দেখা। দ্রুত পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নামছিল সে :

'আরে! কখন এলি? স্পিভাক মরেছে? আমি তো ভাবলাম ওর শেষকৃত্যের ঘোষণা নিয়ে এসেছিস। ভাবছিলাম ওর বৌটার কাছে যাই, শোক সংবাদের জন্যে কিছু খবর নিয়ে আসি।'

সামঘিনকে এগিয়ে যেতে দেয়। সমর্থনের সুরে বলে : 'ছাত্রের পোশাকের চেয়ে ভদ্রবেশে কিন্তু তোকে মানায় ভাল।'

দ্রোনভের পোশাক ফিটফাট। পাতলা চুলে তেল চিকচিক করছে। দুটো পাশ পরিপাট ক'রে ভাগ করা। নতুন জুতোটা শান্ত সৌজন্যে কিচকিচ শব্দ তুলছে। মোট কথা, তাব গোটা চেহারাটা যেন বিনয় করে রসবেত্তার বার্তা বহন করছে।

টেবিলে সামঘিনের উল্টো দিকে সে বসে বুক চিতিয়ে দিয়ে। চোখে-মুখে

.* "পারসি—তিন রোমান ভাগ্যদেবীর সম্মেলন। ওদের প্রত্যেককে বলা হয় পারকা।

প্রয়োজনীয় কথা ও কাজের বেশ ব্যগ্রতা আছে। সোনা বাঁধানো একটা পেন্সিল নাড়তে নাড়তে চেয়ারের ওপরে হঠাৎ তড়বড় ক'রে ওঠে, যেন চেয়ারটা খুব গরম, আরামে বসা যাচ্ছে না। বলে :

'কি করছি ? ঠিক যা করতাম। ওই আগের মতোই। সম্পাদক কাঁদে কেন-না, মানুষ, না, ঘটনা কেউ তাকে বিশেষ লক্ষ্যের মধ্যেই আনছে না। রবিনসন আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহই বলে ওর পেশা। বলে, কাগজটা নির্বোধ আর অভদ্র। আমাদের উচিত প্রতিদিন কাগজের ঠিক নামটার নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা, "স্বৈরতন্ত্র মুর্দাবাদ!"

দ্রোনভের অনুসন্ধানী ক্ষুদে চোখ দু'টো সামঘিনের মুখের ওপর আঠার মতো লেগে রইল। ক্লিম চশমা খুলে নিল, হঠাৎ যেন মনে হলো ওগুলো আবছা হয়ে গেছে।

'তোর লেখার ওপরেও সম্পাদক ভুরু কোঁচকায়! ভাবে, তুই—কি বলে গিয়ে ওদের, ওই, ওই অবক্ষয়ীদের ওপর একটু বেশি মাত্রাতেই উদার...'

পেন্সিলটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গড়াতে গড়াতে সামঘিনের পায়ের কাছে এল। দ্রোনভ কয়েক সেকেণ্ড সেদিকে তাকিয়ে থাকে। বোধহয় আশা করে, ওটা লাফিয়ে হাতে এসে উঠবে। দ্রোনভ কিসের অপেক্ষায় রয়েছে বুঝতে পেরে ক্লিম চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসে চশমার কাঁচজোড়া মুছতে শুরু করে। একটি বেয়ারা তখন পেন্সিল কুড়িয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর দিয়ে সেটা সামঘিনের দিকে গড়িয়ে দেয়।

'একজন অভিনেত্রী এটা আমায় উপহার দিয়েছে। জানিস, নাটক-বিভাগেব ভারও আমার ওপর। প্রাভ্‌দিন নিজেকে মার্ক্সিস্ট বলে ঘোষণা করায় সম্পাদক মশাই ওকে তাড়িয়ে দিলেন। পাথরটা খাঁটি নীলকান্ত! তারপর, তোর কি খবর?'

কক্ষে সম্পাদক প্রবেশ করলেন। সামঘিনকে আর উত্তর দিতে হলো না।

'এই যে কেমন আছেন?' টুপী খুলে সম্পাদক অভ্যর্থনা জানান : 'বড় গরম, তাই না?'

অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য। ভদ্রলোকের মস্তকটি শিশির-ভেজা কুমড়োর মতো চক্‌চক্‌ করছে। নিজের ঘরে ঢুকে টাকমাথা মুছে ফেলেন। একটা ক্লান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাঝের ড্রয়ারটা খুলে সামঘিনের দিকে ওরই একরাশ পাণ্ডুলিপি এগিয়ে দেন। এ-সবই, মানে তাঁর এই ধরনের অঙ্গভঙ্গী ক্লিম ইতিপূর্বে বহুবার দেখেছে।

'মাপ করবেন, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে। সেন্সরের ওখানে যেতে হবে।' হতাশ চোখে সামঘিনকে দেখতে দেখতে বিমর্ষ সুরে বলেন।

'নবীন কবিদের ওপর আপনার যে মনোভাব তা কিন্তু আমি ঠিক সমর্থন করতে পারছি না। ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে? শুধু স্নানরতা সুন্দরীদের ওপর উঁকি দেবার জন্যেই যেন! আর যখন আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা, কবিরা...'

অনেকক্ষণ ধরে বলে গেলেন সম্পাদক। সেন্সরের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনটুকুও নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সামঘিনের পাণ্ডুলিপি এত জোরে চেপে ধরেন যে আঙুলের ডগাগুলো লাল হয়ে ওঠে।

'নাঃ! এদের সঙ্গে নির্দয়ভাবে যুঝতে হবে।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে উঠে দাঁড়ান সম্পাদক। 'এ আমি ছাপতে পারি না। লোকে এখানে স্থূল-কামনা প্রচার করছে, জীবন-বোধ থেকে পালিয়ে যাওয়া, বাস্তবকে এড়িয়ে যাওয়া আর আপনি...তাকেই কিন্তু উৎসাহ জোগাচ্ছেন!'

চাপা ঘৃণায় আর ক্রোধে সামঘিন ঔদাসিন্যের ভাব নিয়ে এল। সম্পাদকের সঙ্গে তর্ক করার কোন ইচ্ছে ওর নেই। দু'জনে একসঙ্গে অফিস ছেড়ে রাজপথে এসে দাঁড়ায়। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সামঘিনকে সম্পাদক বলেন: 'খুবই দুঃখিত, কিন্তু—'

হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ছায়া-ছায়া দিকটায় এসে সামঘিন মনে মনে গজরায়: 'বুড়ো মূর্খ।'

মনে আঘাত পায় এই ভেবে যে ওর সমালোচনা ছাপবার জন্যে সম্পাদকের যে আপত্তি তাতে ও কি-না ক্ষুব্ধ হয়েছে!

'এর মূল্য কতখানি বাস্তব যা তোমাকে ইভান দ্রোনভ পরিবেশন করে? বিরক্তিভরাচিত্তে ভাবতে ভাবতে ছোট্ট ছোট্ট আয়েসী বাড়িগুলো ও পেরিয়ে যায়। কজলভের মর্মস্পর্শী বক্তৃতার কথা মনে পড়ে।

জোরে জোরে হেঁটে সত্তর-পঁচাত্তর হাত যেতে না যেতেই ও দেখল দু'জন লোক চলেছে। একজনের মস্তকে আভিজাত-টুপী, আরেকজনের মাথায় পানামা হ্যাট। চওড়া কাঁধের দেহ দুটি প্রায় সমস্ত অপ্রশস্ত পথটুকু জুড়ে চলেছে। কাটাতে গেলে ভিজে রাস্তার কাদায় পা দিতে হয়। ক্লিম ওদের পিছনে পেছনে চলল। লাল লাল মোটা ঘাড় প্রায়ই ওর নজরে পড়ছে। বাঁ-দিকের পানামা-হ্যাটের লোকটা ভারি গলায় বলছিল:

'স্বপ্নের মধ্যে আপনি যত ভাল খাবারই খান না কেন, ক্ষিদে তো আর মিটবে না। আর স্বপ্নে তো শুধু চিবোতে পাবেন মোজার গাটার!... হ্যাঁ জমি-জঙ্গলের কথা। জমির কি ধরনের মালিক আমরা? আমার ছেলে, বুঝলেন মশাই, সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়ে, কিন্তু এগ্রিকালচার বোঝে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। আজকের দিনে, মশায়, পলিটিক্যাল ইকনমী নামে ইহুদীদের যে তত্ত্বটা আছে না, সেটার ওপরেই বলে লোকে বেঁচে রয়েছে। এমনকি মেয়েরাও আজকাল ওটা পড়ে।...যা কিছু আছে বেচে দিয়ে চলুন আমরা অন্যত্র চলে যাই। তা'হলেই টাকা-পয়সা কিছু করতে পারব, বুঝলেন। নইলে এখানে তো দেখছেন শুধু ওই ইহুদী ব্যাটারাই আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। ওই যে ভারাভকা না কি, যত্তো সব—! বেচেই ফেলুন।'

রাস্তায় নেমে গিয়ে সামঘিন ওদের পাশ কাটাল। পেছনে শুনতে পেল এক চড়া-গলা বলছে:

'বেশ, যদি বেচতেই হয় তো আমরা নিশ্চয়ই বেচবো। যদি পূবেই যেতে হয়, আমরা নিশ্চয়ই যাব।'

সামঘিনের একবার মনে হয়েছিল পেছন ফিরে দেখে চড়া-গলার মালিকের মুখটা কেমন। কিন্তু ভয়ানক আলসেমি ওকে ঘিরে ধরেছে। বিনিদ্র রাতের ক্লান্তি এখনো ওর দেহে-মনে। বাতাসের সৌগন্ধ মাতাল ক'রে তুলছে। চিন্তা করবারও যেন শক্তি নেই। তবুও মনে হলো রাস্তায় হঠাৎ-শোনা আলাপের যত টুকরো স্মৃতিতে ধরা রয়েছে, তারা সবাই যেন আয়নার বুকে পতঙ্গ-চিহ্ন। শুধু কাহিনী উদ্ভাবনের কাজেই লাগে। মনে হলো প্রতীকী কবিরা যে কি খুঁজছে সেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই হয়নি। কিন্তু খুশি হয়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা তো গাইছে না, চিৎকার ক'রে বলছে না: 'এগিয়ে চল, নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে!' "পবিত্র জাগরণের" উদয়ের কোনো আওয়াজও তুলছে না।



শুয়ে ঘুমোনোর প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখে ওরই ঘরের জানলার দাঁড়িয়ে ভারভারা চৌকাঠের পেছন দিক থেকে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'চুপ!' সাবধান ক'রে দেয়, ফিসফিস ক'রে বলে : 'দেখ!'

বাগানের আপেল গাছের নীচে সবুজ বেঞ্চিতে বসে আছে এলিজাবেথা, হাত দুটো বেঞ্চিকে চেপে ধরেছে। এতটুকুও নড়াচড়া নেই, যেন এক প্রতিমূর্তি। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে এগিয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে তারা রাগে জ্বলছে। মুখের ওপর আলোছায়ার জাফরী-কাটা, যেন পুড়ে পুড়ে গলে পড়ছে।

ভারভারা নিম্নকণ্ঠে বলে : 'সুন্দর ভঙ্গী!...ইস্কুলে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে বল তো? দুনায়েভের সঙ্গে, সেই শ্রমিক। লোকটা কি হাসিখুশী। চিনতে পারছ না? ওই তো ওখানে চৌকীদার না কিসের কাজ করে। আমাকে চিনতে পারল না, তবে সেটা বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই।'

ওর নিম্নকণ্ঠের মধ্যেও এত চাঞ্চল্য যে সামঘিন কারণটা বুঝে ফেলল। জিজ্ঞেস করল :

'মরে গেছে?'

'বোধহয়। দেখে এস না।'

সামঘিন খাবার ঘরে গেল। দেখল ডাক্তাব কি একটা লেখায় ব্যস্ত। কাগজের ওপব সিগারেটের ধোঁয়া।

'রুগী কেমন?'

'এখন আর কোন রুগী নেই।' মাথা না তুলেই ডাক্তার বলেন, কাগজের ওপর দিয়ে তার কলম ছুটছে। 'এখন আমি পুলিশের জন্যে একটা বিবৃতি লিখে রাখছি এই বলে যে লোকটা বাস্তবতঃ এবং আইনতঃই মৃত।'

ডাক্তারের কথা যেন বিশ্বাস হয় নি এমনি ভঙ্গীতে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে যায় সামঘিন। ও-পাশের দালানের জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে জানলার ধারে খাটে শোয়া। থুতনিটা বুকের ওপর চাপা। আধবোঁজা চোখ দুটো গভীর গর্তে ঢুকে গেছে। মনে হয়, যেন হতবুদ্ধি সঙ্গীতজ্ঞ নিজের হাতের উল্টোন তালুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। খাটটি ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নেই। খালি ঘরের শূন্যতা সঙ্গীতশিল্পীর একাকীত্বকে ভয়ানক ক'রে তুলছিল। মুখের ওপরে মাছি ভন্ ভন্ ক'রে উড়ছে।

এ দৃশ্যে সামঘিন একটু বিচলিতই হয়ে পড়ে। এ-মৃত্যু ওর বাবার মৃত্যুর চাইতেও বেশী, অনেক বেশী ভয়ের। ওর গলার মধ্যে এক অশরীরি আতঙ্ক যেন পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে থাকে। কোনো মতে এলিজাবেথাকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি ও চলে এল।

ক্লিমের দিকে তাকিয়ে ভারভারা জিজ্ঞেস করে : 'দেখে এলে?'

ক্লিম মাথা নাড়ে।

'ঠিক ধরেছিলাম।' ছোট্ট একটু দীর্ঘশ্বাস। টেবিলের ওপর একধারে বসে ফিকে-গোলাপী রঙের মোজা-পড়া পা দোলাচ্ছে ভারভারা। সামঘিন কাছে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাত রাখে, কি যেন বলতে চায়। কিন্তু যে-সব কথা মনে আসে, তারা

বড্ড একঘেয়ে, বিশ্রী। ভাবে ভারভারা যদি শুরু করতো যে কোনো তুচ্ছ প্রসঙ্গ নিয়ে...

'আমাকে ঠেলছ যে—' পা দিয়ে সামঘিনের পা জড়িয়ে ধরে বলে ভারভারা।

ক্লিম ওর কাঁধে মাথা রাখে।

'একটু দাঁড়াও,' ভারভারা ফিসফিস ক'রে বলে। টেবিল থেকে নেমে ও আস্তে জানালা বন্ধ করে দরজার ছিটকিনী তুলে দেয়। বিছানায় বসে ডাকে: 'এস।' কোমল কণ্ঠে শুধায় ও: 'তোমার খুব খারাপ লাগছে না?' মধুর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। ক'মিনিট পরে কৃতজ্ঞ সামঘিন চাপা গলায় বলে:

'তুমি এত বোঝ! প্রখর বুদ্ধি তোমার!'

কয়েকটা দিন ছোটখাট নানা প্রয়োজনীয় কাজে খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল। সংগীতজ্ঞকে শেষ সাজে সাজিয়ে সযত্নে এক সুন্দর কফিনে রাখা হলো। কফিনের চারপাশে মালার মতো কারুকার্য। ফুলে-ফুলে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আইনতঃ মৃত ব্যক্তিটির সবুজ-সবুজ মুখে আর সেই বিহ্বল ভূতুড়ে ভাব নেই। মৃত্যুর অব্যবহিত পরের চেহারায় সামঘিন ভয়ই পেয়েছিল। উঠোনের মাঝখানে, দরদালানের জানলার ঠিক নীচে "কর‍্যাল-সংগীত-প্রেমিক সংঘ" শেষ বিদায়ের গান গাইল। কুরভিন কয়ার পরিচালনা করল। কপালের লাল ভি-আকৃতির কাটা দাগটা বাঁ ভুরুকে একটু ওপরে ঠেলে তুলেছে। তাইতেই যেন ওঁর ভাবহীন মুখে বীরের কান্তি ফুটে উঠেছিল। কুরভিন যখন চায় ওর কয়ার দলের সুসজ্জিতা তরুণীরা গানের মধ্যে আরো একটু শোকের সুর নিয়ে আসুক, তখন হাত দুটোকে সে সজোরে নীচের দিকে নামায়। যেন নীচের দিকে কিছু চেপে ধরছে। মোটা নাকের ডগাটি তখন গোঁফজোড়ার খাঁজে ঝুলে পড়ে। ইনোকভের কথা মনে পড়ল ক্লিমের, মা'কে জিজ্ঞেস করল তার কথা। ভেরা পেত্রোভনা বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি করে রেখেছেন। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

'যে ইঞ্জিনীয়ার—যে ইস্কুলে ছেলেদের আর ছাত্রদের নিয়ে লিখত—ইনোকভকে চাকরী দিয়ে নিয়ে গেছে।'

জানলায় ধূপের ধোঁয়া, ফুলের গন্ধ। উঠোনে দাঁড়িয়ে এক দল ধর্মভীরু দর্শক। বাগানের গেটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ইভান দ্রোনভ বিষণ্ন মুখে স্ট্র-হ্যাটের কোণ দিয়ে গাল চুলকোয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন ঝড় উঠল। সবাইকে যেন ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল সমাধি-ভূমির দিকে। মেয়েদের অঙ্গে ঝড়ো বাতাসে স্কার্ট চেপে বসেছে, তারা অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেছে। পুরুষদের চুল এলোমেলো। শোক-মিছিলকে পেছনে ফেলে ঝড়ের টানে শোক গানের চারণেরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এলিজাবেথা স্পিভাক আর ভেরার পেছনে সামঘিন চলছিল ভারভারার হাত ধরে। ওদের কানে আসছে শুধু রুদ্ধ গোঙানীর দমক: 'আ—আঃ—আঃ!'

মেয়ে-পুরুষ সবাই পিঠ বেঁকিয়ে, মাথা চেপে ধরে ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে নিজেদের সামলায়। পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চেয়ে নেয়। ঝড়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে ওদের চলার গতি দ্রুত হয়। যেন ক্রমশঃ বিলীন ওই গোঙানী—'আঃ—আঃ—আঃ'-কে ওরা ধরবেই।

হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি। সামঘিন ভাবে, জীবন কি ক্ষণস্থায়ী। চিন্তাটা আরো বিমর্ষ হয়ে ওঠে। কোথায় যেন ও পড়েছে:

'— অকস্মাৎ এক উপহারে,
জীবন, কেন অর্পিত মোর 'পরে?'

শব্দ ক'টিকে মন থেকে সরিয়ে দিতেই আবার মনে পড়ে :

'...এবং, যখনি
নিস্পৃহ চোখ—তুমি, জীবনকে দেখবে বারম্বার,
মনে হবে, এক শূন্য, বিমূঢ় উপহাস।'

যখনি নিজের কথায় জীবনকে সংক্ষিপ্ত ক'রে ব্যক্ত করবার ভয়ানক প্রয়োজন অনুভব করেছে, তখনি ব্যথিত হয়ে দেখেছে জীবনের সব প্রকাশিতব্য বেদনাই বহু দিন বলা হয়ে গেছে। এবং অতি সুন্দরভাবেই তা বলা হয়েছে।

অবিরত হাওয়ার সঞ্চার আব লোকের অবিন্যস্ত সচলতা ওকে বিরক্ত ক'রে তোলে, ভারভারারও গতিকে ব্যহত করছে। স্কার্ট ঠিক করবার জন্যে ও নীচের দিকে ঝুঁকেছিল. যেই সোজা হয়ে আবার দাঁড়াচ্ছে অমনি ভারসাম্য বিচ্যুত হয়ে গেল। একপায়ে লাফিয়ে ঠিকমত দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই আবার স্কার্ট পায়ে জড়িয়ে গেল। এলিজাবেথা ঋজু দেহে পথ চলেছে। মাথা উঁচু। ক্লিমের মনে হয় স্বামীর মৃত্যুতে যেন এ-মেয়ে গর্বিতা! চলবার ভঙ্গী এমন যেন দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে. একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ ঘটার ভয়। আইনোও তো মাথা সোজা রেখে বাবার কফিনের অনুগমন করেছিল। কিন্তু তার ভঙ্গী ছিল অনেক সহজ।

এলিজাবেথার কালো মূর্তির দিকে তাকিয়ে সামঘিন ভাবে : 'এই এক অদ্ভুত নারী। বিপ্লবের পথিক। দুনায়েভকেও নিশ্চয়ই পাঠ দিচ্ছে। কিন্তু আমি জানি এ-সব কাজ ও করে শুধু ভয়ের বশেই। পাছে ওর জীবনটাও সহৃদয়া তানিয়া কুলিকোভার মতো না হয়ে পড়ে।'

সমাধিভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো এক ঘণ্টারও বেশী নরম মাটি কবরের পাশে। কবরটার একটা দিক ধ্বসে গিয়ে দন্তহীন ভিখারিণীর চোয়ালের মতো দেখাচ্ছে। উকিল প্রাভদিন বক্তৃতা দেয় জীবন-মৃত্যুর স্বাভাবিক সঙ্গতি বিশ্লেষণ করে। পুরোহিত মশাই রাজা ডেভিডের কথা বলেন, তাঁর বীণার কথা, ভগবানের সমৃদ্ধির কথা। গোরস্থানের ক্রশ আর গাছের মাঝে ঝড়ো বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ। মাথার ওপর দিয়ে বিদ্যুতগতি মার্টিন পাখীর পাখা ঝাপটানো। গীর্জা পেরিয়ে অনেক দূরে পাহাড়ের সানুদেশে জলকলের বাষ্পনির্গম যন্ত্রটা একটানা আক্রোশে ভোঁস-ভোঁস শব্দ করে চলেছে।

॥ ১৪ ॥

একদিন পরে ক্লিম এসে দাঁড়াল রাজহংসীর মতো সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা লঞ্চের পাটাতনে। বেশ খুশী-খুশী মন। শহরটা রক্তাভ মেঘের জমকালো পোশাক পরেছে। তাকিয়ে তাকিয়ে ও দেখছে সেই দৃশ্য। নগর-উদ্যানে সামরিকব্যান্ড নানা মিশ্র-সঙ্গীত বাজাচ্ছে। কর্নেটের মুখে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে অফেনবাখ্ প্লাঁকেত ও হার্ভের লীলায়িত রাগ-রাগিনী। তিরতির ক'রে নদী কেটে কেটে লঞ্চ চলেছে এগিয়ে। যতদূরে চলেছে শহরটাকে ততই মনে হচ্ছে খেলনার মতো সুন্দর, অস্ত সূর্যের নরম রঙে রাঙানো। ক্যাথেড্রালের সোনাচূড়া আরো ঝকঝক ক'রে উঠল। দূরে স'রে স'রে-যাওয়া ছোট-ছোট বাড়িগুলোকে দেখে মনে হয় যেন তারা ক্রেমলিনের চূড়া আর প্রাকারের গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে। এবার লঞ্চটা বাঁক নেয় ফারগাছে মোড়া এক ছোট্ট পাহাড়ের পাশ দিয়ে। মুহূর্তে শহরটা মিলিয়ে গেল। যেন কোন লোমশ কালো থাবা ওকে পৃথিবী থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল। উষ্ণ দিনের নীরব শান্তিতে ক্ষীণ নদীটির বুকে চাকাগুলো শুধু ঘুরে ঘুরে লাল লাল জল ছেটাল। তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ল ফেনা ওঠা ঢেউ। তখন মনে হলো লঞ্চটা যেন বিরাট ডানা-মেলা একটা পাখী।

একপাশের ডেকে দাঁড়িয়ে সামঘিন আর ভারভারা অনাবিল শান্তির মাধুর্য উপভোগ করছে। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কালো মেঘের টুকরো তার ছায়া দিয়ে জলস্থল আঁধার ক'রে তুলল, লঞ্চের ওপরেও এগিয়ে এল। চোখে পড়ল আর একটা জাহাজ। আলোয় আলো, এগিয়ে আসছে ওদেরই দিকে। বাদামী রং-করা আলোর প্রতিচ্ছবিগুলোকে লোহার মতো দেখাচ্ছে। নদীর বুকে তারা যেন সব ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যেন একরাশ লৌহ-লাঙ্গলের দাঁত। জ্বল জ্বলে দাঁত দিয়ে নদীকে অবিশ্বাস্য রূপে কেটে কুটে এক্সা ক'রে দিচ্ছে। অতৃপ্ত কামনায় তবুও জ্বলতেই থাকে। বাঁ-ধারে, পাহাড়ের পেছন থেকে হঠাৎ কমলা রঙের এক বিশাল চাঁদ ওঠে। ডান দিকে ভাল্লুকের চামড়ার মতো লোমশ মেঘটা সরে সরে যায়। বিদ্যুতের আলোয় সেটা থেকে থেকে কাঁপে। আকাশে কিন্তু গর্জন নেই একটুও। বিদ্যুতের চমকে ভয় লাগছে না। ছেলেমানুষী উৎসাহে ভারভারা চেয়ে চেয়ে দেখে। সামঘিনের বাহু আঁকড়ে ধরে ওর দেহলগ্ন হয়ে বলে :

'দেখ, দেখ! ওই যে, দেখতে পাচ্ছ?'

'হুঁ, বেশ সুন্দর।' যেন কৃতার্থ ক'রে দিল : 'প্রকৃতি বড় দাম্ভিক।' কিন্তু তবুও, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, সেই নিদাঘ রাতের মোহিনী-মায়া ও উষ্ণ-আঁধার থেকে অনুচ্চারের রাজ্যের পানে ধীর যাত্রা ওর মনকে ধীরে ধীরে অভিভূত ক'রে ফেলে। এক উদাস স্নিগ্ধ বিমর্ষতা চুপি চুপি এসে মনে বাসা বাঁধছে। নীলে বাঁধানো শিহরণ-মুখর আঁধারের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে দু'টো তীরের কালো-আকার ধীর গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। বিগত দিনের জীবন থেকেও তো ও অবশ্যম্ভাবীরূপেই দূরে সরে যাচ্ছে। সে-কথা মনে পড়তেই সকৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে ও।

নিজনী-নভগোরদে নিখিল-রুশীয় মেলা দেখবার জন্যে ওরা থামল। মেলার সবে শুরু। এখনো পুরোপুরি জমে ওঠেনি। ভারভারার অবাক দৃষ্টিতে

সামঘিনের মজা লাগে। অবাক হ'য়ে দেখছে লোকগুলো কি ব্যস্ত! আগুন্তি ট্রাক থেকে মাল নামাচ্ছে, গাঁটের পর গাঁট খুলে ফেলছে, বাক্স-পেঁটরা খুলছে, দোকান-ঘরের সুগভীর গহ্বরে থরে থরে মাল সাজাচ্ছে, আর জানালায় জানালায় বিজ্ঞাপনের প্রলোভনী সাজ চড়াচ্ছে।

'ইস্! কি প্রাচুর্য না, সব জিনিসের!' বারে বারে বলে। উৎসুক চোখের তারাগুলো বড় হ'য়ে ওঠে, পল্লবগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে। সামঘিন মনে মনে হাসে। ফেদোরভের প্রবন্ধ থেকে মাকারভ একদা যে উদ্ধৃতিটুকু দিয়েছিল, সে-কথা ওর মনে প'ড়ে যায়।

'সবই তোমাদের জন্যে!' বলল ওকে : 'জীবনে এসব জিনিস কেন এসেছে জান? "নারী জাতের অত্যাচারহীন কিন্তু বিধ্বংসী প্রভুত্বের ফলে।"—তোমার তো গর্ব হওয়া উচিত!'

ভারভারা কিন্তু ওর কথায় কান দেয় না। লোকের অবিরাম চলা-ফেরায়, বিচিত্র মানুষের ভীড়ে, চিৎকার চেঁচামেচিতে, খোওয়া-ফেলা রাস্তায় চাকার ঘর্ঘরানিতে, লোহার ধাতব শব্দে, কাঠের মচমচ আওয়াজে, অনভ্যস্ত সব মন্তব্য ক'রে বসে। মনে হয়, শহরটা যেন কোন বইয়ের এক মনোরম প্রচ্ছদ, যে বইয়ের নাম 'মেলা'। আরো দেখে, হাজার হাজার মানুষ যেখানে কাজে রত সেইখানে জীবন হ'য়ে উঠেছে কত বড়!

সাইবেরীয় জেটির ধারে এই কথাগুলো ও বলেই ফেলল। চওড়া-কাঁধের খালাসীদের দেখাচ্ছিল যেন অজস্র পিঁপড়ের সারি। স্টিমার আর বজরা থেকে তারা মাল নামাতে ব্যস্ত। তীরে পাহাড়-প্রমাণ হ'য়ে উঠল নানা জিনিসের স্তূপ। তুলো, চামড়া, শুঁটকী মাছ, লোহা, চালের বস্তা, শুকনো আঙুর, মনাক্কা, কিসমিস। গোল গোল গড়ানো পিপে-ভর্তি সিমেন্ট, হেরিং, মদ, কেরোসিন আর মেসিনের তেল। এখানে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা গোলমাল, বিচিত্র সব শব্দ, প্রচণ্ডতায় কানে প্রায় তালা লাগে। সব ছাপিয়ে কখনো কখনো হুকুমজারীর তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে।

'দেখেছ, ওদের কি সমর্থ-দেহ!' কর্মরত খালাসীদের দিকে তাকিয়ে ভারভারা চেঁচিয়ে ওঠে : 'শুনতে পাচ্ছ? গান করছে। চল, কাছে যাই।'

সামঘিন রাজী হ'য়ে যায়। এই প্রথম ও বিষণ্ণ 'দুবিনুশকা' গান শোনে বেশ স্ফূর্তির সুরে, জোর কদমে। কোনো এক বজরার পেট থেকে "লুবিনভ এবং সলভে" কোম্পানীর সোডা নামাচ্ছে একদল খালাসী। তারাই গাইছে। পাটাতনে দুই সারিতে দশজন দাঁড়িয়ে আছে। নীচে বজরার পেটে দড়ি নামানো। সেটাতে যেই ওরা হ্যাঁচ্‌কা টান দিচ্ছে, অমনি গর্ত থেকে বেরিয়ে আসছে এক-একটি পিপে। মনে হচ্ছে ওগুলো বোধ হয় ফাঁপা, কোন ওজনই নেই। কিন্তু ও-গুলো যে কত ভারী তা' বোঝা গেল, যখন দেখল দু'দুটো লোক একটা পিপেকে উঁচু ক'রে তুলে ঝুঁকিয়ে পাটাতনে গড়িয়ে ফেলতেই হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে। পাটাতন থেকে গড়াতে গড়াতে কাঠের ঢালু তক্তা বেয়ে পিপেগুলো তীরে নামছে।

"দুবিনুশকা" গানে দু'জন লোক নেতৃত্ব করছে। তাদের একজন খুব শক্ত সমর্থ। গায়ে লাল ছেঁড়া সার্ট, ঘামে ভিজে জবজব করছে, বেল্ট নেই, পায়ে ক্ষয়-হ'য়ে-আসা খোলের জুতো। হাতের কনুইয়ের ওপরটা খোলা, সেখানে লোহার মতো মরচে ধরছে যেন। গান গাইছে তীক্ষ্ম সপ্তম সুরে। তারই মাঝে মাঝে সুপটু গলায় শিস দিয়ে উঠছে। পায়ে তাল দিচ্ছে। সমস্ত শরীর দিয়েই যেন গানটা গাইছে তারা। টান্‌টান্ শক্ত দড়িতে লোহার হাত দিয়ে দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে; যেন বীণা বাজাচ্ছে। তার গানের কথায় কোনই ইতস্ততা নেই। গেয়ে উঠছে :

'হেই জোয়ান, গড়ায় গড়ায় দাও,
হাঁই-হো, হাঁই-হো!
হেই জোয়ান, জলদি জলদি নাও
হাঁই-হো, হাঁই-হো।
হেই জোয়ান, না যদি পার,
হেই জোয়ান, স'রে বরং পড়...'

ভারভারা সামঘিনের পেছনে এসে দাঁড়ায়, ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে দেখে।

'হেই দুবিনুশকা, হেই হো!' সুরের রেশ তুলে নিয়ে অন্য লোকগুলো উল্লসিত গান ধরে। প্রতিটি ধ্বনি খুব দ্রুত তালে উচ্চারণ করে। ওদের সমবেত কণ্ঠ থেমে যাবার ঠিক আগে, আরেকজন একক কণ্ঠে শুরু করে। লোকটা লম্বা, টাক-মাথা, মুখ ভরতি কালো দাড়ি, গায়ে ওয়েস্ট-কোট, সার্ট নেই। তার গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠ সবাইর গলা ছাপিয়ে উঠল :

'হেই জোয়ান! মারো জোরে টান!
দড়া য্যান্ না লাফে, সাবধান!'

যেন এক খেলা, কঠোর পরিশ্রমই নয়। নানা রকম শব্দের তরঙ্গ ধুলোটে বাতাসে আছড়ে পড়ছে। পরস্পরের শক্তির যেন যাচাই হচ্ছে। খালাসীদের উত্তাল গানের সুর হৈ চৈ আওয়াজের মাঝে ভেঙ্গে পড়েও কিন্তু নিজস্ব চঞ্চল মূর্চ্ছনার অভিক্ষেপটা রেখে যায়। কিছুদিন আগে ক্লিম "দুবিনুশকা"র গান শুনেছিল রেললাইন পাতবার এক ক্ষেত্রে। সেখানে গানটি ছিল মন্থর গতির আর হতাশার। বিশ্রামের এক অজুহাত মাত্র। কিন্তু এখানে এর সতেজ ছন্দ রাজকীয় মর্যাদায় ধ্বনি বিস্তার করছে, এক মহান আদেশের যোগ্যতা নিয়ে। পরিচিত শব্দগুলোকে নতুন শোনায়, সামান্য ভীতিকরও হয়তো।

নতুন এই উপলব্ধির কথা চিন্তা করতে করতে সামঘিনের হঠাৎ মনে পড়ে ডীকনের কথা, ল্যাকট্যানটিয়াস থেকে তার সেই উদ্ধৃতির কথা। নিশ্চিত বুঝতে পারল :

'একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণমাত্র। অন্য কিছুই নয়। কোন কিছুকে বদলে দেবার শক্তি নেই শব্দের।'

বজরার পেছনে নীল ভল্গা দুঃসহ রোদের তাপে দেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। আরো দূরে বালিয়ারী ঝিক্‌মিক্ করছে সোনার মতো। তার পাশ দিয়ে নদীটি শান্ত গতিতে ঢেউয়ের চিকিমিকি তুলে ব'য়ে চলেছে। তীরে সবুজ ঝোঁপ কোমল জলে ঝুঁকে পড়েছে। ডেকের খালাসীদের মনে হলো যেন বিশ হাতে শব্দ প্রাচুর্যে ভরা দুটো টান টান দড়ি চমৎকার বাজিয়ে চলেছে।

পাড় থেকে কে একজন চিৎকার ক'রে ওঠে : 'হেই-ও...দড়ি ছাড়!'

সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলো দড়ি ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই ক'জন ডেকের ওপর পড়ে যায়, নরম শব্দে, জন্তুদের মতন; কেউ কেউ পাড়ে চলে আসে, একটা লম্বা লোক,—তার উঁচু উঁচু চোয়ালের হাড় আর লম্বা চুল জড়িয়ে বাকলের দড়ি,—এগিয়ে এল ক্লিমের দিকে। বেশ উদ্ধতভাবে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে জিজ্ঞেস করে :

'একটা ছিরগেট্ হবে বাবু?'

কালিমাখা আঙুল দিয়ে ক্লিমের কেস্ থেকে দু'টো সিগারেট বের ক'রে নেয়। একটা মুখে পোরে আর একটা কানে গোঁজে। কিন্তু চড়া সুরে গানের নেতৃত্ব করছিল যে লোকটা সে কোথা থেকে তৎক্ষণাৎ এসে হাজির। কানের সিগারেটটা ছোঁ মেরে নিয়ে নেয়। গাজর রঙের গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুখের এক কোণায় সেটা ঝুলিয়ে দেয়। পুরোনো চটের প্যান্টটা টেনেটুনে আঁটো ক'রে নেয়। কোমরের

ওপর হাত দ্'টো রেখে সামঘিনকে প্ঙথান্প্ঙথ দেখে। তার বিদ্রূপমাখা সাদাটে চোখদ্'টো অস্বাভাবিকভাবে ঠিকরে পড়েছে। ম্খটা সৈন্যের মতো। ছেঁড়া সার্ট কলারের নীচে খালি ব্কটা দেখা যাচ্ছে। সেটাও তার ম্খের মতোই ধ্লো আর ঘামে দাগ-দাগ হ'য়ে উঠেছে।

সামঘিন ব্ঝতে পারে সামনের মান্ষটা ঠাট্টা-তামাশার ভক্ত। কিন্তু তার ঠাট্টা-তামাশার চেহারা নিশ্চয়ই কর্কশ, স্থ্ল আর আক্রোশে ভরা। মনে হয়, লোকটা এখ্নি বিচ্ছিরি কিছ্ করবে বা বলবে। গানের নেতাটিকে দেখে বহ্ খালাসী তাড়াতাড়ি ওখানে এসে জোটে। সামঘিন ভাবে, ওর ধারণাটাই ঠিক। লোকটা নিশ্চয়ই কোন কান্ড করবে এখন। তার দাড়িওয়ালা ম্খের দিকে খালাসীরা হাসি ম্খে চেয়ে আছে। কিছ্ একটা আশা করছে। মান্ষটা কি ভাবতে ভাবতে সিগারেটটা চিব্লো। রোঁয়াভরা খোলের জ্তোটা মাটিতে ঘসল। সামঘিনের ব্টে ধ্লো ছিটিয়ে দিল। ঠিক তক্ষ্ণি কালো দাড়ি-ওয়ালা টেকো গাইয়ে ভারী পায়ে এসে হাজির হয়ে গম্গমে গলায় হেঁকে ওঠে :

'মিখাইলো. ফের বদমাশী? আরেকটা কেচ্ছা চাই, না?'

লাল সার্টের গাইয়ে নিপ্ণ হাতে সিগারেটটাকে ওপরের দিকে ছ্ড়ে, হাতের তাল্তে সেটাকে আবার ল্ফে নেয়। তারপর কিছ্ না বলে কালোদাড়ির পেছনে পেছনে দ্রুত চলে যায়। সবাই ওদের পিছ্ পিছ্ চলে। যেতে যেতে একজন সখেদে মন্তব্য করে : 'তাহলে ওকে মাপ ক'রে দিলে—অ্যাঃ!'

প্রো ঘটনা ঘটতে একমিনিটেরও বেশী সময় লাগে নি। কিন্তু সামঘিন জানে ওর স্মৃতিতে বহ্দিন জেগে থাকবে এ ঘটনা। লাল সার্ট পরা লোকটাকে ভয় পেয়েছিল ভেবে লজ্জা পায়। কেমন বোকাটে হাসি দিয়ে তার ম্খের দিকে ও চেয়েছিল। নাঃ, আচরণে মান-মর্যাদা সব খ্ইয়েছে। ভারভারার চোখ কিছ্ই এড়ায়নি। কর্মীদের ভীড় ঠেলে. পরিশ্রান্ত ঘোড়াদের নাকের নীচ দিয়ে ভারভারার বাহ্ ধরে আসতে আসতে কতবার শ্নলো : 'হেই, সাম্লে!' সামঘিন বিড়্বিড় ক'রে বলে :

'জান, ওদের আর আমার মধ্যে কোন্ জিনিসটা মেলে—'

'এই. সাম্লে!'

'মানে আমাদের আর ওদের মধ্যে?' নিজেকে সংশোধন ক'রে নেয়। 'আমাদের পেছনে রয়েছে কৃষ্টি সংস্কৃতিময় জীবনের জটিলতায় প্ষ্ট কত প্র্বপ্র্ষ—'

কিন্তু সঙ্গে সংগেই বোঝে কথাগ্লো বিদ্বেষ-দোষে ভরা। অনেক তিক্ত মন্তব্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

'আমার মধ্যে যে স্স্পষ্ট বোধটি আছে সেটাই বার বার চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখাচ্ছে। অর্ধঅসভ্যদের থেকে আমার কি বিরাট ব্যবধান—'

নাঃ। ভারভারাকে যে কথা বলা উচিত তাতো ক্লিম বলতে পারল না।

'ভিন্ন ভিন্ন খন্ডে এতখানি র্চির পার্থক্য নিয়ে যেসমাজ গড়ে ওঠে, তা কখনই স্দৃঢ় হ'তে পারে না। উত্তর আমেরিকার এক কোটি নিগ্রো কখনো-না-কখনো তাদের অস্তিত্বের ওপর বিশ্বের মনযোগ আকর্ষণ করবেই।'

ভারভারা এবারে ওকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল : 'আমার প্রচন্ড তেষ্টা পেয়েছে। চল তাড়াতাড়ি হাঁটি।'

কয়েক পা এগিয়ে প্রবল উৎসাহে বলে : 'কি স্ন্দর ওরা গাইছিল! কি সপ্রতিভ আর সমর্থ, না?...'

সামঘিন সস্নেহে, প্রায় কৃতজ্ঞ হ'য়েই বলে :

'ব্ঝলে. খালাসীদের কাজ লোকে যতটা ভাবে ঠিক ততটা কঠিন নয়।'



সকালে ওরা হোটেলের মতো আয়েসী এক স্টীমারে উঠল। ভেসে যেতে যেতে দেখল উজান ঠেলে চলেছে কত বজরার মিছিল। কত জং-ধরা ভাসমান যানকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে তারা। সন্ত্রস্ত মাছধরা নৌকাগুলি এদিক ওদিক ছুটোছুটি কবছে। তীরের সমৃদ্ধ জনপদ থেকে অ্যাকর্ডিয়ানের বাজনা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। উজ্জ্বল পোশাক পরা চাষীমেয়েরা মুগ্ধ চোখে স্টীমারের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার ক'রে কাঁদছে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বালির ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। স্টীমারের মাথায় তৃতীয় শ্রেণী, সেখানে বাজনা বাজে, গান হয়। ভারভারা ভাবে ভল্‌গা নদী সত্যিই সুন্দর! একে নিয়ে শ'য়ে শ'য়ে যে গানের স্তুতি রচনা হয়েছে, তা' যথার্থই। সামঘিন ওকে বলে ওর বাবা কেমন ক'রে আবৃত্তি করতে শেখাতেন :

'ভল্‌গায় এস। কার আর্তকণ্ঠ উঠেছে ওই
রাশিয়ার মাতৃসমা মহা-নদীর বুকে?'

'কিন্তু দেখ, আর্তকণ্ঠ কই? এখানে তো ওরা অ্যাকর্ডিয়ন বাজায়, সূর্যমুখী ফুলের বীজ খায়, আর সুন্দর সুন্দর বেশভূষা করে।'

'আজ রবিবার,' ভারভারা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি যোগ করে : 'অবশ্য তোমার কথা আমিও মানি। লোকের দুঃখদৈন্যের কথা নেক্রাসভ অনেক বাড়িয়ে বলেছেন।'

এত তাড়াতাড়ি পরের কথাগুলো যোগ করল যে মনে হয় ও হয় মতান্তরের ভয়টাকে চেপে রাখতে চাইছে, নয়তো সমর্থন করার অক্ষমতকে। বড় বড় চোখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে এবারে ব'লে ওঠে :

'কখনো মনে হয়নি মস্কো বাদে কোথাও রাশিয়া আছে। ভূগোল পড়েছি বটে—কিন্তু ভূগোল কি? কতগুলো এমন অনাবশ্যক জিনিসের ফিরিস্তি যা দিয়ে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন দেখছি বিরাট এক রাশিয়া। আর—আর বোধ হয় তুমিই ঠিক। এখানে যা-কিছু খারাপ তা' ভয়ানক বাড়িয়ে তোলা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণেই।'

সামঘিনের মনে পড়ে না কবে এ-কথা বলেছে। তবু মৃদু হেসে বলে :

'লেভিতান, নেস্‌তেরেভের মতো শিল্পীও রাশিয়া যা, তা'র চেয়ে অনেক অনুজ্জ্বল, অনেক বর্ণহীন ছবি এঁকেছেন।'

'অবশ্য এ আমার নিজের কথা।' সামঘিন মন্তব্য ছোঁড়ে—মনে হয়, আত্ম-মানস সম্পদে স্ফীত হ'য়ে উঠেছে। দিন ও রাত এতরকম উপহার নিয়ে এসেছে ব'লে আর কখনো মনে হয় নি। এখন যা দেখে তা'তে আশ্চর্যই হয় সবচেয়ে বেশী। মনে হয়, অনুভূতিগুলোকে বিন্যস্ত ক'রে তোলাই সর্বপ্রথম কাজ। এক সুবিন্যস্ত সাজ ও এক 'বিচ্ছিন্ন বাক্যের সুসম্বন্ধ রীতি'-র অত্যন্ত প্রয়োজন ঘটেছে। তা'হলে মন আর বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না। কাজটায় সফল সহায়তা পেল ও ভারভারার কাছ থেকে।

আশ্চর্য যে ভারভারা এত বাধ্য, সব জিনিসেই মাত্রা রেখে চলে, এত আন্তরিক-ভাবে ভালোবাসে, নিজের অনুভূতি যে কখনো জোর ক'রে চাপিয়ে দেয় না, সেই ভারভারাই দিন দিন প্রিয় হ'তে প্রিয়তর হ'য়ে উঠছে। প্রিয়তর শুধু এই কারণেই:

নয় যে ওর সঙ্গে ও স্বচ্ছন্দ হ'তে পারে। কিন্তু এমন এক গভীর প্রিয়ভাব যে ওকে আনন্দে ভরে তুলবার আগ্রহও জন্মাচ্ছে, স্নেহময় হবারও। মনে করতে পারল না লিদিয়া কখনো এমন অনুভূতি জাগাতে পেরেছিল কি না।

ইচ্ছে করে ভারভারাকে অসাধারণ কিছু শোনায়। এমন কিছু নিশ্চিত কথা যাতে ওকে আরো কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু সে-রকম কোনো কথা খুঁজে খুঁজে আর পেল না। হয়তো খুব কাছেই লুকিয়ে ছিল তেমন কোনো কথা, কিন্তু দীপ্তি-ময় হয়ে উঠল না। অসংখ্য শব্দের ভীড়ে সে-ও আরেকটি শব্দ হ'য়েই থেকে গেল।

লাল সার্টের খালাসীও আরেক বাধা। সামঘিনের মনে সেও এক অবাঞ্ছিত চিহ্ন। ওর সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও যেন চলেছে। স্টীমারে উঠে সেই হয়তো কোনো নাবিকের চেহারা নেয়, সামারার জেটিতে এসে বেনের দোকানের কেরানীটির বা কোনো থার্ড ক্লাশের যাত্রীর। সোজা সিধে হ'য়ে বসে বাদাম খাচ্ছে অদ্ভুতভাবে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে—পেছনের দাঁতে বাদাম রেখে তালু দিয়ে মারছে ঘা নীচের চোয়ালে, বাদাম ফেটে দু'খণ্ড হয়ে যায়। এদের সবাইয়ের চোখে সেই খালাসীর বিদ্রূপ দৃষ্টি। এরাও যেন ওরকম উদ্ধতভাবে অশোভন কিছু একটা করবার জন্যে প্রস্তুত। যে-লোকটা অদ্ভুত কায়দায় বাদাম ছাড়াচ্ছিল, সে একবার ওপরের ডেকের দিকে তাকিয়েছিল। ভারভারা আর সামঘিন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। বেশ জোরে জোরে ব'লে উঠেছিল :

'মাইরি বলছি, মেয়েমানুষটা মোজা নিশ্চয়ই পরে আছে, চামড়ার রঙের।'

আস্‌ত্রাখানে এসে ত্রিফনভের সঙ্গে দেখা। লোকটার মাছের ব্যবসা। ভারাভকার বন্ধু। গোল গোল ছোট্ট মানুষটি, মোটা ঘাড়, দাড়িহীন মুখে ছোট খুশী-খুশী চোখদুটো ঝিনুকের বোতামের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে। চপলচঞ্চল চরিত্র। ওডিকোলনের কড়া গন্ধ ছিটিয়েছে সারা গায়ে। খোপ খোপ চেকের স্যুট পরনে। সব মিলিয়ে যেন এক ভাঁড় গোছের। শোনা গেল ও নাকি 'শহরপিতাদের' একজন। কাজেই শহরের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য ও সুযোগ সুবিধার কথায় একেবারে পঞ্চমুখ। শহরটা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে নোংরা বালির ওপর। গুমোট কুয়াশায় ভরা। নোনা মাছ, কাঁচা চামড়া আর পেট্রোলের গন্ধে বাতাস ভারী। জাহাজ ঘাটেই কি আর ধুলোভরা রাস্তাতেই কি, সব জায়গায় মাছের আঁশ। অভ্রের মতো চিক চিক করছে। এখানে-ওখানে অজস্র প্রাচ্যের মানুষ। খুলি ঢাকা টুপী বা পাগড়ী বা মাথায় কাপড় জড়ানো। মুখগুলো থেকে ভস্‌ভসে ধোঁয়া। ধীর গতিতে চলে ফেরে। সংখ্যায় এত বেশী যে শহরটাকে রুশ-শহর ব'লে মনেই হচ্ছে না। গির্জাগুলো নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হয়। ক্রেমলিনের ধূসর রঙের নীচু-নীচু প্রাচীরের ছায়ায় কালমায়ক, তাতার আর পারসীরা বর্শা-শাবল হাতে বসে শুয়ে রয়েছে। যেন এইমাত্র আক্রমণ-শেষে শহর অধিকার করল। এখন ক্রেমলিনকে ধূলিসাৎ করবার হুকুমের প্রতীক্ষায় জিরিয়ে নিচ্ছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা শহরের গরম রাস্তায় রাস্তায় ত্রিফনভ গাড়ী ক'রে সামঘিনদের ঘোরাল। গাড়ী খুব সুন্দর, ঘোড়া দুটো ভয়ানক আলসে। ত্রিফনভ প্রচুর ঘামে। সুগন্ধ ছিটানো রুমাল দিয়ে মাঝে মাঝে মুখটা মোছে। আসত্রাখানের আকর্ষণ আর সুন্দর সুন্দর দৃশ্যের কথা বলে। নানা রকম অর্থহীন শব্দের বিবরণ। সেগুলোও ওর স্যুটেরই মতো চৌখুপী। একঘেয়ে চড়া ব্যঞ্জনা।

'প্রত্যেক বছর বসন্তকালে ভলগা আমাদের জাহাজঘাটকে চেটে একেবারে সাফ ক'রে দেয়। প্রতি বছর আমরা আবার সারাইও। যত টাকা খরচা করেছি তা' দিয়ে একটা গোটা বজরা ভরে যায়! আমাদের কোন্‌ জিনিসের প্রয়োজন জানেন,—পাথর। শুধু শুধু পাথর।' অনুনয়ের সুর। ছোট ছোট হাত সামঘিনের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'কিন্তু আমাদের পাথর নেই। সার্টের নীচে যেগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তা দিয়ে তো আর ভলগাকে বাঁধা যায় না,' কিঞ্চিৎ ঠান্ডা হলো। 'বুঝলেন, এখানকার বাসিন্দেদের মতো আস্ত উজবুক আর কোথাও নেই। চাবুক হাতে কোনো গভর্নরকে যদি আমরা পেতাম, নিদেনপক্ষে তিমোফেই স্তেপানোভিচ ভারাভকার মতো কোনো লোক মেয়র হতেন,—ওঁর হাতে বালিও পাথর হ'য়ে উঠত।'

ত্রিফনভের পরিবার আছে দেশে। কথা ব'লে ব'লে সামঘিনদের প্রায় হতচেতন ক'রে ফেলেছে যখন, তখন ব্যবস্থা হলো এক 'উত্তম সান্ধ্যভোজের। শাম্পেনের ব্যবস্থাও ছিল। লঞ্চের ওপর ভোজ বেশ জমে উঠল। ওদেরকে সমুদ্রগামী জাহাজের "নয় ফুট" নোঙ্গরের জায়গায় নিয়ে যেতে চাইল, নিজের টাগ "বাজপাখী"-তে ক'রে।

গর্ব ক'রে বলে: 'বয়েস কম না, কিন্তু খুব চট্‌পটে।...যেতে যেতে আমার মাছ মারার জায়গাটা আপনাদের দেখিয়ে দেব।'

কোনো অজুহাতই নেই প্রত্যাখ্যান করবার। বন্ধ হোটেল কামরায় দুজনেই সেকথা ভেবে ভেবে অস্থির।

'কি অদ্ভুত লোক। চোখেই দেখে না।' ভারভারা বলে।

সামঘিনের প্রাণ গরমে আইঢাই করছে। মাছের ব্যবসায়ীর সারাদিন কচকচি একেবারে পরিশ্রান্ত ক'রে ফেলেছে। বিরক্ত কণ্ঠে বলে:

'বোধ হয় যারাই কারবার করে তারা সকলেই অন্ধ।'

একমিনিট পর রাতের জন্যে চুল বেঁধে নিয়ে ভারভারা টিপ্পনী কাটে:

'শহর আর ভলগার গুণপণা এমনভবে ব্যাখ্যা করছিল ভদ্রলোক যেন কোনো দোকানদার। তাড়াতাড়ি যাতে মাল কাটে তারই চেষ্টা। নইলে ভয় কখন বা ওগুলো স্টাইলের বাইরে চলে যায়।'

'বাঃ! বেশ চালাক হ'য়ে উঠছে তো ভারভাবা!' সামঘিন ভাবে।



সকাল ছয়টায় এক নোংরা ছোট টাগের ওপর ওরা বসল...। ভলগার ওপর দিয়ে ভোঁসভোঁস ক'রে চলেছে সাগরের পানে। নদীতে জায়গায় জায়গায় তেল-জলের রামধনু। বিপরীত দিকে শুষ্ক বিবর্ণ আকাশের পটে শ্লথগতিতে সূর্য উঠেছে। তার মুখটা দেখাচ্ছে কিরঘিজের মতো। নোঙ্গর-করা জাহাজগুলোর মালিকদের নাম একে একে বলে যায় ত্রিফনভ। হিংসায় অভিযোগ করে: 'নোবেল আমাদের খেয়ে ফেলল! ওই ব্যাটা আর হতচ্ছাড়া আর্মানীগুলো।'

জলযানগুলোর ভেতর দিয়ে টাগ্‌ বেঁকে বেঁকে চলল। সমস্ত শরীর যেন কম্প-জ্বরের পালায় কেঁপে উঠছে। চলার ধরনটা বাজারে বুড়ীর মতো, শী-শী ক'রে শিস্‌ দিচ্ছে আর ক্যাঁট্‌ক্যাঁট করছে। হাল ধরে দাঁড়িয়ে সুন্দর চেহারার এক তাতার! দাড়ি ধবধবে সাদা। সূর্যের দিকে চোখ দুটো তার আধবোঁজা।

'এখানে, বুঝলেন এরা সবাই প্রকৃতির সন্তান,—আল্‌সের ডিম সব।'

ত্রিফনভ ভারভারার মনটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে চায়। সমুদ্রের কাদাটে ধারটায় গড়িয়ে গড়িয়ে টাগ তীরের পাশ দিয়ে কিছুটা পথ এগোয়। এক সময় মক্‌-মক্‌ শব্দ তুলে কাঁপতে থাকে! আর তাবপরেই ইঞ্জিনের স্পন্দন থেমে যায়।

ত্রিফনভ খোশমেজাজে বোঝায়: 'আমার এই জল-সুন্দরীর মেজাজ-টেজাজ বেশ

আছে! যেন কিরঘিজ ঘোড়া! আরেকটা যেটা আছে 'কশাক তরুণী'। তার কাছে ঠাট্টা-মস্করা কক্ষণো পাবেন না। একেবারে একটা তীর!'

হালের চাকায় হ্যাঁচ্‌কা টান দেয় তাতার।

'কি হলো ইউনুস্?'

'ইঞ্জিন রুখছে,' মোলায়েমভাবে তাতারটা ঘোষণা করে। ত্রিফনভ ইঞ্জিন পর্যন্ত এগিয়ে নীচের তলার দিকে লক্ষ্য ক'রে হেঁকে ওঠে :

'এই শয়তানেরা! এ্যাই কুত্তির ছায়েরা! আগে জিজ্ঞেস করিনি তোদের হারামজাদা কুত্তা সব! ইউনুস্, পারের দিকে চল।'

হিস্ হিস ক'রে কাত্‌রাতে কাত্‌রাতে টাগ্ আস্তে আস্তে বালির পারের দিকে চলে। ত্রিফনভ ইতিমধ্যে ওদের বোঝায় :

'এই ব্যাটারা মানুষ না। সব এক-একটা উল্লুক। খাওয়া ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না।'

তীরে নৌকোর ভাঙ্গা-চোরা কবন্ধের কাছে একটা মানুষ বসে আছে। মাথায় উর্দীর টুপী, ফিতেটা ক্ষয়ে গেছে। গায়ে মেয়েদের ব্লাউজের মতো অদ্ভুত জ্যাকেট। প্যান্টের দুটো পাশে লম্বা লম্বা টান। গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তোলা। বুকের কাছে পাঁউরুটি ধরে ছুরি দিয়ে দিয়ে কাটছে। পাশে বালির ওপর মস্ত বড় একটা ঘন সবুজ তরমুজ।

ভারভারা বলে : 'দেখ, ও যেন খাবার-টেবিলে বসেছে।' সত্যিই মানুষটা আদিগন্ত-সমুদ্রকে যেন টেবিল বানিয়েছে। বহু দূরে দিগবলয়ের কোলে অসংখ্য মাস্তুলের ছোট ছোট বিন্দু দেখা যাচ্ছে। সেই দিকটা দেখিয়ে ত্রিফনভ বলে :

'ওই হলো "নয় ফুট" নোঙরের জায়গা।'

কথা বলার চোঙ তুলে নিয়ে তীরের দিকে চেঁচিয়ে ওঠে :

'এই কশাক, দৌড়ে স্টেশনে যা। ওদের বল গে 'চেসার'কে যেন পাঠিয়ে দেয়। ত্রিফনভ্ চেয়ে পাঠিয়েছে।'

'চোঙ ছাড়াই শুনতে পাচ্ছি'—লোকটা বলে। হাতে রুটির মস্ত টুকরো। টাগটাকে লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে সেটা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ত্রিফনভ খুব জোরে হাত নাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে : 'যা, ব্যাটা, দৌড়!'

রুটিতে কামড় বসিয়ে কশাক জিজ্ঞেস করে : 'কত দেবেন কত্তা?'

'এক রুবল।'

পঁচিশ,' লোকটা বলে স্বর না উঁচিয়েই। রুটি চিবোতে চিবোতে এক হাতে ছুরি ধরে আর এক হাতে তরমুজটাকে গড়িয়ে নিজের দিকে টানে। ত্রিফনভ ভারভারার দিকে তাকিয়ে মুখটা বিকৃত ক'রে হাসে। বলে : 'শুনেছেন? পঁচিশ রুবল চাইছে! অথচ স্টেশনটা তো ওই পাহাড়টার ওপরেই। বড় জোর ভাস্ট-দেড়েক হবে। বেশ ইয়ার্কি পেয়েছে, না!'

আবার মুখে চোঙ লাগায়। এত জোরে চেঁচায় যেন গুলি করছে :

'তিন!'

'না কত্তা যাব না,' তরমুজে ছুরি বসিয়ে লোকটা বলে।

গলা নীচু ক'রে ত্রিফনভ বলে : 'জানি, ও যাবে না। কশাক তো—হারামজাদারা সব চোর—কম খরচায় থাকে, জাল থেকে মাছ চুরি করে।' তারপর চেঁচিয়ে বলে : 'পাঁচ!'

'না, যাব না।' কশাক তরমুজটাকে কেটে দু-টুকরো ক'রে অনাবৃত পদযুগল নদীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে দিতে বলে : যেন টেবিলের নীচে সে পা রাখছে।

'এখানকার লোকগুলো একেবারে হতচ্ছাড়া,' ত্রিফনভ বোঝায়। 'নেড়া মাথা এশিয়াটিকগুলো কি ক'রে কাজ করতে হয় তাই-ই জানে না। আর আমাদের রুশেরা তো কাজ করতেই নারাজ। এ্যাই কশাক! আমি ত্রিফনফ, চিনতে পারছিস?'

'সবাই আপনাকে জানে, ভাসিলি ভসিলিচ্—চিনি বৈ কি—' কশাক জবাব দেয়। তরমুজে অনেকটা ছুরি দিয়ে খুবলে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ঠেলে মুখে ঢোকায়।

টাগের ধারে বসে ভারভারা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে কশাককে লক্ষ্য করে। একটু মধুর হাসি হেসে সারেঙ্গ হালের চাকায় মোচড় দেয়। ইতিমধ্যেই টাগটার অগ্রভাগ ডুবো-চরায় নিযে এসে ফেলেছে। তীক্ষ্ম নজর রাখছে স্রোতে যেন বয়ে না যায়। ইঞ্জিন-ঘরে দু'জন লোকের চড়াগলা শোনা যাচ্ছে। ঝগড়া করছে। হাতুরির ঠকাঠক শব্দ। বাষ্পের হিস্‌হিস্ আর ভোঁস-ভোঁস্ আওয়াজ। রোদ্দুরে আর নীরবতায় অদূরের রাস্তাগুলো ঝক্‌মক্ করছে। তাদের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, বজরাগুলো অনেক দূরে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছোট জাহাজগুলো গুবরে পোকার মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। নৌকোগুলো যেন জানলার কাঁচে হামাগুড়ি-দেওয়া মাছি।

গরমে ক্লান্ত হয়ে ক্লিম সামঘিন এখন বিশ্রাম করছে। অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঝক্‌মকে শূন্যতার দিকে। সব কিছুই কেমন ছোট, কেমন তুচ্ছ। অবসন্ন মনে ভাবে ত্রিফনভের মতো নাদুস-নদুস নিশ্চিন্ত প্রকৃতির লোক আর মৃগী রুগীর মতো লিউতভ, এদের দু'জনের মধ্যে কিছু-না-কিছু মিল আছে। বাইরে কিন্তু ওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গোঁয়ার কশাকটার ওপরে ত্রিফনভের যে চমৎকৃত ভাবটুকু ফুটে উঠেছিল তাইতে মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগে লিউতভ ছিপ-হাতে এক সুদক্ষ মৎসশিকারীকে দেখে কি মুগ্ধই না হয়ে উঠেছিল। ভদ্রলোক বসে বসে অলীক ক্যাট্‌ফিস্ ধরবার ভান করছিলেন।

'তারপর, যাচ্ছিস না কেন রে, ব্যাটা গাড়ল?' ত্রিফনভ প্রায় অভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করে।

'আপনাকে খুশী করতে মোটেই রাজী নই কত্তা।' উদাসীন গলায় কশাক জবাব দেয়। অর্ধেক তরমুজেব শূন্য খোলাটা দোলাতে দোলাতে জলে ছুঁড়ে দেয়। পিছলে জলের ধারে তা আবার আসে। ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে খানিকটা জল তোলে। লোমশ মুখে এমনভাবে সেই জল-হাত ঘুরায় যেন টেবিল-ক্লথে মুখ মুছ্‌ছে।

'ভারভারা কথাটা বেশ ভাল বলেছে। এমনভাব দেখাচ্ছে যেন সত্যিই সমুদ্র ওর খাবার টেবিল,' সামঘিন ভাবে: 'অবশ্য এরাই হচ্ছে বিপ্লবীদের নির্ভর। যেমন এই লোকটা বা সেই চাষীটা অদ্ভুত ধরনে যে বাদাম ছাড়াচ্ছিল, বা নিজনী-নভগোরদের সেই খালাসীটা। মানে যারাই নতুন সুরে বিষন্ন "দুবিনুশকা" গাইছে, আক্রমণের ভঙ্গীতে।'

জলযানটির এক পাশে একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে ত্রিফনভ কশাকের সঙ্গে তখনো কথাকাটি করছে:

'বুঝলি, ঠিক বের ক'রে নেব তুই কে।'

তরমুজের আর একটা খণ্ড শেষ করতে করতে উদাস সুরে কশাক বলল:

"ইভান কালমায়কভকে খুঁজবেন। ওটাই আমার নাম।'

ত্রিফনভ ভারভারাকে বোঝায়: 'দেখলেন, এখানে এ ব্যাটারা একটুও ভয় করে না, কাউকেই না।'

দেখা গেল মসৃণ শৈল-অন্তরীপটির পেছনে সুন্দরভাবে বৃত্তপথ অতিক্রম করতে করতে এগিয়ে আসছে একটা সবুজ স্টীমার।

'ওই তো, ওই আমার "কশাক তরুণী," ত্রিফনভ চেঁচিয়ে ওঠে। আহ্লাদে

এবং নারীর দুজনের কথাই অনুভব করতে পারতো। নারীকে যা দিয়েছে তা যদি তার নিজের মধ্যে প্রতিফলিত হতো।'

'হয় না কি?'

দেখল কথাটা ভারভারা মোটেই বোঝে নি। নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরে মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রেমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে যে দেখত সে লিদিয়া। অনবরত কথার ফোয়ারা ছোটাতো নির্লজ্জের মতো। সে-তুলনায় ভারভারা অনেক সংযত, অনেক সাবধানী, বোধহয় নিস্প্রভও।

'তবু আশা করতাম ও অবাধ হয়ে উঠবে, মনে প্রাচুর্যের ইচ্ছা জাগবে, উচ্ছৃংখলও হবে। নিশ্চয়ই মধুর-ভুলে ভুলেছিলাম, কিন্তু—'

একদিন পরে আবার জিজ্ঞেস করে:

'আচ্ছা, বল তো, আমি যা অনুভব করি, তা তুমিও অনুভব করতে চাও?'

'নিশ্চয়ই,' জবাব দেয় ভারভারা। কণ্ঠস্বরে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সামঘিনের মনে সংশয়। কি বলতে চেয়েছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা দিতে যায়, ভারভারা অবাক হয়। ঋজু হয়ে পড়ে—নিজেকে টেনে তোলে। নীচু গলায় বলে: 'কিন্তু আমি তোমাকে সত্যিই উপলব্ধি করি।'

মনে কিন্তু অস্বস্তি। ভাবে:

'কি ক'রে করে আর কতখানিই বা করে?'

'দেখ, কিভাবে বলি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হয় তোমাকে আমি—কেমন অনুভব করি জান?—যেন সব সময় তোমাকে গর্ভে ধারণ করছি। কি ক'রে জানি না, কিন্তু জান তো কোনো কোনো মুহূর্তে এমন আসে—ঠিক জৈবিক প্রেরণার নয় তারা।'

এবারে স্পষ্টই লজ্জাতুর হয়ে পড়ে ভারভারা। আরক্ত মুখে মিনতি করে: 'এ-সব কথা আর নয় গো। এখনো বেশী কথায় আমার ভারী ভয়।'

ক্লিম ওকে আদর করে। কিন্তু বিশ্রী লাগছে—ওর মনের কথাটা ভারভারা শেষ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না।

আর কি বোকার মতোই না বলল:

'যেন তোমাকে গর্ভে ধারণ করছি।'

*

কিছুদিন পরে ক্লিম ওর সঙ্গে প্রায় ঝগড়াই করল। পেতরোভস্ক থেকে স্থল-পথে এসেছিল ভ্লাদিকাভ্কাজ। সেখান থেকে দরিয়েল গিরিসঙ্কট ধরে ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে চলল তিফ্লিস্। পাহাড়টি পেরোতে গেলে সবচেয়ে উঁচু জায়গা গুদাউর। ওরা সেখানে উঠেছিল। যতই উঠছে পাহাড়ও ততই উঁচু হচ্ছে। মনে হলো যেন বিরাট এক ধাপ্পা। ঘোড়াগুলো ওপরে তো উঠছেই না বরঞ্চ যেন নীচেই নামছে। নামছে পাহাড়ের নীচে কোনো অতলান্ত খাদের দিকে। সেখানে নীল-নীল অন্ধকার যেন ধুঁয়োর মতো জমে আছে। খাদ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠেছে, ক্রমশঃ অন্ধকার। আর তারই ভেতর থেকে উঠে এসে কালো রাত পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আটকে নিস্পিষ্ট হয়ে আছে। আকাশ যেন নীলচে বাতাসে জড়ানো রেখা। অন্ধকার যতই বাড়ে, হাওয়াও তত ভারী হয়ে ওঠে। তার ঘন কায়া ঘিরে অপরিচিত সব নক্ষত্র। পেছনে ডান দিকটায় কাজবেকের সাদা পাগড়ী উঠে

দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে হাওয়া বয়ে এসে ক্লিমের ঘাড়ে লাগে। সোঁদা-সোঁদা সতেজ হাওয়া। গোপনে-জিয়োন নীরবতা। ঘোড়ার খুরের শব্দ বা তাতার কোচয়ানের মোটাগলার বকর-বকর সেই দুর্ভেদ্য শান্তিকে একটুও ব্যাঘাত করতে পারে না। অনেক নীচে, 'তেরেক' পাখী বিশ্রী চিৎকার ক'রে উঠছে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ স্বরে। যেন গিরিসঙ্কটের দু'ধারের দম বন্ধ-করা বিশাল পাহাড় গায়ে গা ঘষে কর্কশ শব্দ তুলছে।

পাহাড়গুলোর কদাকার সমন্বয়ের রাজকীয় ভাবটুকু সামঘিনের মনে জ্বালা ধরায়। এর কি-ই বা প্রয়োজন ছিল। অদ্ভুত অহঙ্কার বলেই মনে হয়, যেন ক্ষমতার বন্ধ্যাত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'যদি আমি এদেরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মুঠো মুঠো ধুলো ক'রে ছড়িয়ে দিতে পারতাম,' মনে মনে ভাবে। পাহাড়ের হাঁ-করা চোয়ালের দিকে ওর দৃষ্টি নিবন্ধ। সোজা উঁচু পাহাড়ের গায়ের ফাটলগুলোর দিকে চেয়ে থাকে।

কোবি স্টেশনের পর থেকেই ভারভারা নীরব। বিমর্ষ। দুই কাঁধের ভেতরে মাথা গোঁজা। মুখটা উঁচু হয়ে আছে, তীক্ষ্ণ। দেখে মনে হয় বয়স অনেক বেড়ে গেছে। ভয়ঙ্কর কি এক চিন্তায় যেন মগ্ন হয়ে আছে। বহুদিনের বিস্মৃত কোনো ঘটনা মনে করবার চেষ্টা চলছে। বার-বার ক্লিম ওর চোখের দৃষ্টিটা বুঝতে চেষ্টা করল। মনে হলো যেন সেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে গভীর ক্রুদ্ধ দ্যুতি। অথচ সেখানে ভয় বা বিস্ময়ের চিহ্নই তো আশা করেছিল।

'গনচাবোভ মনে আছে--'রণতরী প্যালাস'?' জিজ্ঞেস করল ক্লিম।

'হ্যাঁ।'

'ওতে একটা অংশ আছে, সেখানে বলা হয়েছে—গনচারোভ ডেকের ওপর বেরিয়ে এসেছে. বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দেখছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কি অর্থহীন, কি বীভৎস। মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' ভারভারা বলে: 'না। সত্যি, আমার মনে নেই। পড়িই নি বইটা। গনচারোভের কথা এখানে কেন?'

'বেশ ভাল লেখক তিনি।'

'আমার ভাল লাগে না,' ভারভারা তীব্রভাবে মন্তব্য করে: 'তাছাড়া, ভয়ঙ্কর কখনো কুৎসিত হয় না। এ সত্যি নয়।'

গলাব স্বরে ক্লিম বিস্মিত হয়। খুশীও হয়ে ওঠে, অন্ততঃ কিছু বলেছে তো। কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থাকে। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ওকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে অজানা ভাবনার রাজ্য থেকে। বলে:

'এ যেন নবকের পথ। দান্তে বোধহয় এমন কিছুই দেখেছিলেন। দেখ, ওপরে উঠছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন নেমে যাচ্ছি।'

ভারভাবা অদ্ভুত তৎপরতায় জবাব দেয়: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তবু চুপ ক'রে থাকতে ইচ্ছে করে। কি-ই বা বলবার আছে, বল এখানে?' চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কেঁপে উঠে বলে: 'কবিরা অবশ্য বলেছেন—কিন্তু কিছুই বলতে পারেন নি।'

'ঠিক তাই,' ক্লিম সায় দেয়: 'লেরমনতভও এ-স্থলে হাস্যকর—

"একদা, এক গোষ্ঠীবদ্ধ পর্বতচূড়ায় ঘন সন্নিবেশে..."

যেন তারাস, তাই না?'

ভারভারা মাথা নীচু ক'রে পাশ থেকে সরে যায়। সামঘিন কিন্তু মুখে কুঞ্চন তুলে বলতেই থাকে.

'তোমার ওপর প্রকৃতির অদ্ভুত প্রভাব। বোধহয় আদিম মানুষেরাও এমনি

ক'রেই এর কাছে আত্মসমর্পণ করতো। কি ভাবছ?'

'সত্যিই জানি না,' উত্তর দেয় প্রায় অপরাধীর সুরেই চাপা গলায়। 'শব্দে প্রকাশ করা যায় না।'

'শব্দহীন...নিরাকার... কেউ ভাবতে পারে?'

ভারভারা বলে: 'আমি শুধু নিঃশ্বাস নিচ্ছি। নিঃশ্বাস টানছি। মনে হয়, এমন গভীর নিঃশ্বাস আর কক্ষনো নিইনি। তুমি কথাটা বললে কি অদ্ভুতভাবে—ওপরে উঠতে উঠতে আমরা নেমে যাচ্ছি। যেন বিশ্বেষ ফুটে উঠেছে তোমার কথায়।

অন্ধকার এখন প্রায় কালো হয়ে উঠেছে। তার শরীর থেকে বেরুচ্ছে এক মৃত গন্ধহীন শৈত্য। সামঘিন বলে, কণ্ঠে ফোটে ক্রোধের সঞ্চার:

'রাশিয়ায় তুষারেরও গন্ধ আছে।'

'নোনতা গন্ধ,' ভারভারা যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে।

ওরা গুদাউর গিরিপথে পেঁাছোল। শাশলিক* খেল, নীলাভ ঘন সুরা পান করল। রাত্রিবাসের ঘরটিতে বিছানার ওপর ভারভারা ক্লান্ত হয়ে বসে থাকে, পরনে অর্ধবাস। অন্ধকার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলে:

'এ-সব আমি দেখেছি—কবে দেখেছি এখন আর বলতে পারব না। খুব ছোট্ট ছিলাম যখন। বোধহয় স্বপ্নের মধ্যে। আমি ওপরে উঠছিলাম আর সংগে সংগে সবই ওপরে উঠছিল। কিন্তু আমার চেয়ে অনেক জোরে। মনে হলো নেমে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি। এমন তীব্র আতঙ্ক, ক্লিম। সত্যি বলছি, সে যে কি ভয়ঙ্কর। আর এই এই আজ..'

আচমকা জোরে ফুঁপিয়ে উঠে বলে: 'তার ওপর তুমি রাগ ক'রে আছ!'

সামঘিন ওকে সান্ত্বনা দেয়। মুখের ওপর থেকে ভারভারা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে। বিড়ালের মতো ভংগী। ফিসফিস ক'রে বলে:

'জানি তুমি খুব বুদ্ধিমান। খুব বিরক্ত হও যখন আমি নিজের কথা ব্যক্ত করতে পারি না। কিন্তু আমি যে পারি-ই না। এ রকম কথাই যে নেই। এখন মনে হচ্ছে ও ধরনের স্বপ্ন একবার নয়, বহুবার দেখেছি। আমার জন্মেরও আগে।' একটু হেসে জোর দিয়ে বলে ওঠে: 'মহাপ্লাবনেরও আগে।'

হাত দুটো দিয়ে ওকে ঘিরে ভারভারা জিজ্ঞেস করে

'তুমি কি কখনো নিজেকে মহাপ্লাবন-বিরোধী ভাবতে পেরেছ?'

'এখনো না,' সামঘিন উত্তর দেয়। আদরের উচ্ছ্বাসে অকৃপণ হয়ে ওঠে। বলে: 'থাক্, তুমি এখন ক্লান্ত।, তা'ছাড়া জান, তুমি খুব বেশী অবক্ষয়ী কবিতা পড়েছ।'

আবার ভাব হয়ে যায়। ভোরে উঠে পাহাড়-পথ বেয়ে আবার নামার সুরু। এবারে আরাগভা উপত্যকার দিকে। সামঘিনের মনে হয় রাতের ঘটনা ভারভারাকে আরো কাছে টেনে এনেছে। তাই বলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে:

'কাল রাতে বড্ড খিচ্খিচ্ করেছিলাম, না?'

কিন্তু তক্ষুণি বুঝতে পারে কথা বলা ভুল হয়েছে। ভারভারা পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে ওরই কাঁধে ভর দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে নীচের দিকে। যেখানে সোনালী নদী, মোটা মোটা শ্যাম মেষচর্মের আচ্ছাদন পরা কোমল পাহাড় আর তারই গায়ে চরে বেড়ানো ধূসর বলের মতো ভেড়ার পাল।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে: 'অদ্ভুত! কী অপরূপ সৌন্দর্য! কালকের পর এমনটি

*শিকে গেঁথে ঝলসানো মেষ-শাবকের মাংস। শিক-কাবাব বিশেষ।

কে আশা করতে পেরেছিল? দেখ, গাধার পিঠে চলেছে মা ও ছেলে। আর একটা লোক গাধাটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই তো ঈশ্বরমাতা আর জোসেফ! ক্লিম, ওগো—এ যে অপূর্ব!'

ক্লিম মৃদু মৃদু হাসে। সরল উৎসাহভরা কথাগুলো শোনে। চশমার ভেতর দিয়ে খুব সাবধানে নীচের দিকে উঁকি দেয়। উৎরাইয়ের পথে পথে ভয়ঙ্কর বাঁক। গাড়ীতে বার বার ব্রেক কষতে হয়, চাকাগুলো পাথরের ওপর গর্জন করে। কখনো কখনো রাস্তার ধূসর রেখা প্রায় সমকোণে বেঁকেছে। কালো দাড়িওয়ালা সহিস লাগামে জোর টান দিয়েছে। নিম্নগামী পথ বেয়ে গাড়ী ঘর্ঘর ক'রে চলেছে। চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পাহাড়ের অজস্র তীক্ষ্ম দাঁত। ওদের স্নায়ু কেঁপে কেঁপে ওঠে। সামঘিনের মনে অনুশোচনা, কেন ভারভারা আজ এত বেশী কথা বলছে।

ভারভারা আবার বলে: 'এইখানেই কোথাও পুশকিন আরাগভাকে প্রশংসা করেছিলেন। মনে আছে--"জর্জিয়ার পাহাড় 'পরে"...'

'"তোমারি, শুধু তোমারি পাশে—"' ক্লিম আবৃত্তি করে।

ভারভারা ওর হাতে চাপ দেয়।

'কি অদ্ভুত, উপলব্ধিও করা যায় না, না? ক'টি শব্দের মধ্যে ক-ত কী ভরে তুলতে পারে!'

'হ্যাঁ। সামঘিন স্বীকার করে।

গাড়ী নিরাপদে ম্লেতি স্টেশনে পৌঁছুল।

রুক্ষ ধূসর পাথুরে তিফলিস। দুই পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে আছে। পাহাড়ে অসংখ্য উঁচু উঁচু ছাদ। সেখানকার সব হাওয়া যেন ছেলে-মানুষি হাতে কে বাড়িগুলোর মাথায় সেঁটে দিয়েছে। অনেকটা পাখীর খাঁচার মতো দেখাচ্ছে। ঘোলাটে জলের কুরা-নদী উচ্ছৃংখল। গির্জায় গির্জায় অনমনীয় স্থাপত্য। সব মিলিয়ে সামঘিন খুশী হতে পারে না। কালো চুলের লোকগুলো তেলতেলে চোখে ভারভারাকে নির্লজ্জ কৌতুহলে দেখে—মনে হয় ওরা বোধহয় পালা-পার্বনের মেজাজ নিয়ে মেতে আছে। আমানী উপাখ্যানের ভাষায় তারা রুশ বলছে। লোকগুলো যেন জ্বলন্ত রাস্তা থেকে আরাশোলার মত পালাচ্ছে। ভারভারা তাই দেখে খুশী হয়ে ওঠে। মনে হয়, এরা বেশ সুন্দর, যেন হৃদয়বান। কিন্তু সামঘিনের ভাষায় রুশ রাজ্যের সীমান্তে জর্জীয়ান, আর্মেনীয়ান বা অন্য যে-কোন নৃশংস আকারের লোকের কোনো স্থান নেই। শুধু রুশ কৃষকদের দেখতে পেলেই ও যেন খুশী হতো। ভারভারার অপরিসীম প্রশংসাকে দমিয়ে দেওয়াই যেন ওর উদ্দেশ্য। বিরক্ত হয়ে উঠছিল। বিদ্রূপের স্বরে ও বলল:

'তা'হলে ত্রিফনভের অন্ধত্ব তোমাকেও পেয়ে বসেছে দেখছি!'

অজান্তে ওর মনে এক অদ্ভুত ধারণা জন্মায়। মনে হলো রাশিয়ায় প্রচুর অনাবশ্যক লোকেব গোষ্ঠী রয়েছে। তারা জানেই না তাদের কি কাজ। অথবা কোনো কাজ করতেও বোধহয় চায় না। বন্দরে, রেল-স্টেশনে বসে-শুয়ে তারা কাটায়। সমুদ্রের ধারে এমনভাবে বসে থাকে যেন ওটাই একটা টেবিল। সবাই যেন কোনো জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু নিখিল-রুশীয় শিল্প প্রদর্শনীতে যে-সব লোকের বহুবিধ পরিশ্রমের এত প্রশংসা করেছিল, কই তাদেরকে তো আর দেখা গেল না।

মনের কথা সামঘিন ভারভারাকে বোঝাতে চাইল। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপও নেই। ও যেন শিহরণমুখর পক্ষী-শাবক, ক্রমশঃ পালক গজাচ্ছে, আসন্ন আকাশযাত্রার দিন গুণছে।

॥ ১৫ ॥

যাযাবরী বৃত্তি শেষ ক'রে ক্লিম যখন মস্কো পৌঁছুল, শুধু তখনি মন ভরে উঠল প্রসন্ন আনন্দে। ভারভারা এবং ওর মানসচিত্তে যে অমিলটুকু রয়েছে, পথে-প্রবাসে তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মস্কোতে সেটা থাকে অস্পষ্ট। দু'জনে জীবন সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল—আনন্দটা পারস্পরিক। প্রাঙ্গণের আস্তানাটা ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ওপরের গৃহে ওরা উঠে এল। সেখানে দোতলার ওপর সুন্দর একখানা ঘর ওদেরি জন্যে যেন সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ভারভারা বেশ চমৎকারভাবে সেটা নতুন ক'রে গোছায়। ক্রিসানফকাকা সংসারের যত টুকিটাকি একত্র ক'রে গেছেন, সে-সবই ক্লিম ওর পড়ার ঘরে নিয়ে যায়। ঘরটা রাশভারী গোছের হয়ে ওঠে। ভারাভকার প্রভাবে বীমা কোম্পানীর পরামর্শদাতা এক ধনী উকীলের সহকারীর কাজ ও গ্রহণ করবে। তছাড়া ভারাভকা তার অসংখ্য উদ্যোগ-প্রচেষ্টার মস্কোস্থিত আইনবিষয়ক প্রতিনিধি হিসেবে ওকে নিযুক্ত করল।

অল্প ক'দিন পরে লুবাশা এসে হাজির হলো। ওর ওপর থেকে মস্কো প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছে। ও এসে উঠল দালানের ওই অংশের একটা ঘরে। একটু শুকিয়েছে, তাই লম্বা দেখাচ্ছে। জগতের ওপর আরো করুণা-ঘন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওর দুই নীল চোখে। তাতিয়ানা গোঘিনা ভারভারাকে বলে :

'লুবাশাকে দেখে মনে হয় যেন বেশ পেটপুরে খেয়ে উঠেছে এইমাত্র।'

লুবাশা আগের মতোই সান্ধ্য-আসর আর লটারীর আয়োজন করে রাজনৈতিক নির্বাসিতদের সাহায্যকল্পে। তাদের জন্য মোজা বোনে, স্কার্ফ বোনে, অন্তর্বাস সেলাই করে। অন্নসংস্থানের জন্য উপন্যাসের অনুবাদ করে। অবক্ষয়ী কবিতা বুঝবার অক্লান্ত চেষ্টা করে করে অবশেষে হতাশ হয়ে বলে :

'নাঃ। ভয়ানক কঠিন! হাতিচোক, অবক্ষয় আর ঝিনুক—আমার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতায় কুলোয় না।'

সন্ধ্যেবেলায় ওকে আর গোঘিনদের ভারভারা গল্প বলে।—"অযুত-অলিন্দ" তিফলিসের কথা, গ্রিবয়োদভের সমাধির কথা, ভয়াল বুনো ষাঁড়ের গল্প, কাঠকয়লার ফেরিওয়ালাদের পুতুলের মতো সব গাধার বর্ণনা, অপূর্ব সুন্দর দেশী লোকের চিত্র, আরো কত নানা বিচিত্র দৃশ্যের কথা। শুনতে শুনতে সামঘিনের মনে হয় :

'বেশ বানাচ্ছে কিন্তু। একেবারে অন্য রকম।'

ক্লিমের মনে হয় মানুষ কতই না উদ্ভাবন করে, জীবনকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলে। পরস্পরকে ঠকায়। নিজেরাও ঠকে। লুবাশাও কাহিনী শুরু করে। এখান থেকে যাবার আগে ও ঠিক করে গিয়েছিল কয়েকটা মফঃস্বল শহরে যাবে। এখন তাদেরি নানা কথা বলে। ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব কতটা বেড়েছে, মার্ক্সীয় প্রচারের পরিমাণ সাফল্য লাভ হয়েছে, শ্রমিকচক্র সংগঠনের কি কি প্রচেষ্টা হয়েছে—সেই সব। সামঘিন ঠিক বুঝতে পারে কম্‌সে কম তিন গুণ বাড়িয়ে বলছে সমভা। ক্লিম নিশ্চিত যে মানুষের যাবতীয় 'উদ্ভাবনা' ওর মনে সূর্যকিরণে ধুলোর মতো সুস্পষ্ট হয়ে ভাসছে।

অনুভব করে মনের বোঝা শীগ্‌গির নামিয়ে ফেলা উচিত। যত ধারণার ভীড় সেখানে জমেছে, সব লিখে ফেলা প্রয়োজন। কয়েক পাতা লেখবার পর কিন্তু

অবাক। দেখে, মন ও লেখার হাত কি ভয়ানক রক্ষণশীল। এ আবিষ্কারে ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। লেখাগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেয়।

আনর্ফিমিয়েভনা গোটা আবাসটির পরিচালনা-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। বাড়িটার একপাশের উইঙ্গ ভাগ ক'রে ক'টি থাকার ঘর করেছে। আসবাবপত্রে সুসজ্জিত ঘর। ভাড়াটেদের মধ্যে লুবাশা ছাড়া আছে দুজন ছাত্র, একজন মধ্য-বয়স্কা মহিলা, একজন প্রুফরীডার মেয়ে ও মিঃ মিত্রোফানভ নামে অনির্দিষ্ট পেশার এক ভদ্রলোক। তার সম্বন্ধে আনর্ফিমিয়েভনা বলে :

'উনি কাজের খোঁজে আছেন আর বৌয়ের অপেক্ষা করছেন।'

মিশাকাকা চিলেকুঠরীতে চলে গেছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়, ছাদের ভারে নিস্পিষ্ট হ'য়ে একটা তেলের প্রদীপ সাদা ঢাকনীর নীচে জ্বলে—সূর্যাস্তের সময় থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। শুভ্র আলোর ছটায় সামঘিনের কোনো অসুবিধা হয় না।

রান্নাঘরে আনর্ফিমিয়েভনার জায়গায় এসেছে এক বুড়ো। তার নাকটা লাল, চেহারাটা যেন শুষে-নেওয়া। দেখে মনে হয় লোকটার কোনো ওজন নেই, বোধহয় ভেতরটা একদম ফাঁপা। গলার স্বর অস্বাভাবিক গম্‌গমে। সরু গোঁফে সজ্জিত মুখটা যেন বিড়ালের। মদে চুড় হ'য়ে ভারভারা আর ক্লিমের সামনে এসে বলল :

'আমার মদ খাওয়া দেখে মোটেই ঘাবড়ে যাবেন না যেন। আমার মাতাল হওয়ার শুরু সেই ছোট্টবেলা থেকে। অন্য কোনোভাবে যে বাঁচা যায় তা' আর মনেও করতে পারি না। মস্কোর যত খান্‌দানী রান্নাঘর আছে তার প্রায় সব কয়টির সঙ্গে আমার পরিচয় আমার এই অবস্থাতেই।'

আনর্ফিমিয়েভনাও কথাটা সমর্থন করে :

'পাচক হিসেবে নাম আছে সন্দেহ নেই। মানুষটাও ভাল। প্রায় তিরিশ বছর ধ'রে আমার সঙ্গে পরিচয।'

ভারভারা হেসে প্রশ্ন করে : 'তোমার ভালোবাসার মানুষ নাকি?'

'ভালোবাসা আর কেতাবের ধার ধারি না গো। নিজের বোকা-সোকা মনটা নিয়েই বেঁচে আছি।' আনর্ফিমিয়েভনা একটু রূঢ়কণ্ঠেই বিড় বিড় ক'রে ওঠে। তারপর ওদেরকে সাবধানও করে, 'হ্যাঁ, দেখ, ওর সামনে কিন্তু কয়েকটা জিনিস বলো-টলো না। জারের পরিবারের ওপর ওর কিন্তু অসীম ভক্তি; সেণ্ট পীতের্স-বুর্গ থেকে ওর নামে একটা কাগজও আসে। অদ্ভুত মানুষ বাপু!'

পরে জানা গেল খবরের কাগজটা 'রাষ্ট্রীয় দূত' আর ওই অদ্ভুত মানুষটি খুব শান্ত প্রকৃতির, আত্মমর্যাদার নানা উচ্চ ধারণায় ভরপুর। উঁচু স্তরের রাজনীতি-তেও খুব উৎসাহ। সামঘিনের আবার মনে হয় যদি অদ্ভুত অদ্ভুত লোক ছাড়াই দুনিয়ায় বাঁচা যেত, কি চমৎকারই না হতো! মোটা সুতোয় গাঁথা নানা বর্ণের লোকগুলো মিটিং-এর শুধু কতকগুলো চিত্তির-বিচিত্তির স্থান, অবান্তর হাসি আর উপাখ্যান-সুলভ মন্তব্যের প্রসাদ ফেলে যায়! এদের সঙ্গে আনর্ফিমিয়েভনার কত তফাৎ! তার ঘোড়ার মতো শক্তি, কিন্তু প্রতিবেশীর সঙ্গে গা না ঘষেও তো তার জীবন চলে। পঞ্চাশ ও ষাটের মাঝামাঝি পেঁৗছে তার বয়স যেন আট্‌কে গেছে। বাড়েও না, শক্তিরও ক্ষয় হয় না। সামঘিন তার সম্বন্ধে একদিন ভার-ভারাকে বলে :

'অন্যের জীবনে যারা বিনা-কৌতূহলে প্রবেশ করতে পারে, তাদের ওপর আমার খুব শ্রদ্ধা। তারাই তো খাঁটি বীর।'

অল্প ক'দিনের মধ্যেই সামঘিন এমন একজন ব্যক্তি হ'য়ে উঠল যাদের নাম লোকে জানে, শ্রদ্ধাও করে, এবং যারা জনমতের বিভিন্ন ধারার ঠিক মাঝখানটিতে

এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এরা কোনো মতধারার অনুসরণ করে না। সবরকম দল-উপদলের সঙ্গেই পরিচয়, সবার ওপরই সমবেদনা, এমন কি নেহাৎ বিপজ্জনক না ঠেকলে খোলাখুলি বা গোপনে-গোপনে সকলের জন্যেই কিছু-না-কিছু কাজ করতেও রাজী। নিজেদের কাজ সম্বন্ধে ভীষণ উচ্চ ধারণা। সামঘিনের সুগঠিত দেহ, শুকনো মুখ, কালো ছোট দাড়ি, খুব শক্তিমান না হলেও প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ এমন কণ্ঠস্বর, অত্যধিক উচ্ছ্বাসকে থামিয়ে দিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথা বলবার ভঙ্গী,—এ'সব দেখে মনে হয় ও এমন একজন লোক যে নিশ্চয়ই কিছু জানে, বোধহয় সবই জানে। কথা বলে কম, তা-ও সংযতভাবে। যারা শোনে তারা ভাবে, কথাগুলোর তেমন গুরুত্ব না হ'লে কি হবে, ওগুলো বোধহয় জ্ঞানের কথা,—সকলের জন্যে নয়, শুধু মুষ্টিমেয় বিশিষ্টদের জন্য। চশমার নীচে নীল-পাণ্ডুর চোখ-দুটো জ্বলজ্বল করে। যে-ই আলোচনা করতে আসে, তার মুখের দিকে সেই দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ। রহস্যময় ভাব ফুটিয়ে তুলতেও সক্ষম। তা'ছাড়া বেশীর ভাগ লোকই তো অনর্গল কথা বলে, কাজেই যে নির্বাক হ'য়ে থাকে সেই তো সব-চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওর আশ্চর্য স্মরণশক্তিতেও লোকে ভাবে নানা বিষয়ে ওর অনেক জ্ঞান। সামঘিন বুঝে নেয় খ্যাতি অর্জন করতে বিশেষ চেষ্টার দরকার হয় না। তাই লোকের সঙ্গে ওর ব্যবহার ক্রমশঃ এমন হ'য়ে উঠল যেটা মোটেই তোষামোদের নয়। মনে মনে মানুষের নানান্ ছলনা-ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষকরূপে নিজেকে দেখবার ভয়ানক লোভ। কয়েকবারের সফল চেষ্টার পর মনে হয়,—হ্যাঁ, আমি তো কোনো সামান্য শয়তান নই।

কখনো কখনো ওর মনে হয়েছে মহানগরীর জীবনস্রোতে ও বোধহয় কোনো কিছু চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পরিচালনা করছে। 'যুগকে রঙীন ক'রে তুলছি আমি—' এ-ভাবনা ভাববার অধিকার তো সকলেরই। . প্রেইসের গৃহে ক্রমে ক্রমে লোক জমে অনেক, উত্তেজনাও বাড়ে প্রচুর। সামঘিন সেখানে রাশভারী গলায় ঘোষণা করে:

'ছাত্র-আন্দোলন সম্পূর্ণ আবেগপ্রবণ। "উত্তপ্ত শোণিত ও শক্তির আধিক্য"—ছাড়া এ'আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে এতে এক ভয়ানক বিপদের সংকেত আছে লুকিয়ে। নারোদনিকদের মনোবিলাসই হচ্ছে ছাত্রদের একমাত্র প্রেরণা। কাজেই, নারোদনিকেরা যে সন্ত্রাসবাদের স্বপ্ন দেখছে সে-কথা চিন্তা করলে—' অতি-সাবধানে ইঙ্গিতটুকু করে।

*

প্রেইসের ওখানে সব মতামতই অতি-সাবধানতায় ব্যক্ত হয়। প্রায় প্রত্যেকেই স্বীয় মতের স্বপক্ষে এডুয়ার্ড বার্নস্টাইনের নাম নেয়। সামঘিন বুঝতে পারে যারা এসে জুটছে তারা সবাই ওরই গোত্রের। এই আত্মীয়তাটুকুর জন্যই ওদেরকে জঘন্য মনে হয়। স্ত্রাতনভ ও তাঘিলস্কি প্রেইসের ওখানে বড় একটা আসে না। বেরেনদিয়েভ আসে ক্কচিত-কখনো। এমনভাব দেখায় যেন মদে চুড়। অপরিচিত-জনদের বাসায় কি ক'রে এসে হাজির হয়েছে, সে-কথাটাই যেন অবাক হ'য়ে ভাবে। ওরা কি নিয়ে আলোচনা করছে, সেটাও বুঝতে চেষ্টা করে। সলজ্জ হাসি হাসে। লাফ দিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চেয়ার থেকে চেয়ারে ছুটোছুটি করে। কোনো অজানা শক্তির পাল্লায় পড়েছে যেন,—সব চেয়ারেই বসে দেখতে হবে। কদাচ উত্তেজনায় মাথার চুল ধ'রে মন্তব্য করে:

'না। ওরকম নয়! কথাটা মোটেই তা' নয়।'

সার্মাঘনের ভাল ক'রে জানা আছে বেরেনদিয়েভ একটা ধর্মীয়দল গঠন করেছে। দিওমিদভ সে-স্থানের এক মাতব্বর।

প্রেইসের বৈঠকে নবাগতদের মধ্যে জিন্নয়েভ বেশ চমকপ্রদ। লম্বা পাতলা চেহারা। গায়ে অদ্ভুত কাটের বে'টে ফ্রক-কোট। গে'য়ো পুরুতের বৌয়ের মতো মুখ, নরম তুলতুলে। দরদী গলার স্বর মনে হয় কোনো নার্স বোধহয় রূপকথা বলছে। রুশজীবনের 'প্রসন্নতর তথ্যাবলী' আবৃত্তি করে তার ভারী উৎসাহ। সব সময় পিপারমেন্টের গুলী চোষে আর তারই ফাঁকে ফাঁকে সবাইকে অভয় দেয়: 'রাশিয়া জাগছে!' একটু দূরে থেকেও সার্মাঘন মেন্থলের ঠান্ডা গন্ধ পায়। জিন্নয়েভের মতে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করতে পারলে সমাজবাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। মিলেরাণ্ডের সঙ্গে ওর ব্যক্তিগত আলাপের কথাটা প্রায়ই শোনায়, পঞ্চমুখে সেই ভদ্রলোকের প্রশংসা করে। তিনিই তো সর্ব প্রথম দেখিয়েছেন—সমাজবাদের ভূমিকা বিপ্লবের নয়, এ'শুধু এক সংস্কারমূলক মতবাদ।

'আপনি আশাবাদী', বিশাল চেহারার তারাস্‌সভ চে'চিয়ে ওঠে। মোটা-মোটা ঠোঁট নড়ে। জিন্নয়েভর দিকে আঙুল উ'চিয়ে আছে। কালো চোখের স্থির দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে: 'রাশিয়া জাগছে—এ'কথার মানে কি? বেশ, না হয় মেনে নেওয়া গেল যে এখন আমাদের আছে দুমুখো ঈগল—যার দু'টো মুখ, ধরা যাক, দুই সমাজবাদী পার্টি। কিন্তু সেটাতো আর মাটির ওপরে নেই, বরঞ্চ নীচেই।'

যত উত্তেজিত হয়, ততই 'ক' উচ্চারণ তীব্র হ'য়ে ওঠে। ইয়ারোস্লাভ্‌লদের টান তার উচ্চারণে বেরোয়:

'বেশ, ওরা না হয় দুটো ভাগ হলো। ধরা যাক, একদিকে কৃষক পার্টি, অন্য দিকে শ্রমিকপার্টি। কিন্তু এদের মধ্যে কে জাতটার স্বার্থ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে,—সংস্কৃতির স্বার্থ, গোটা রাষ্ট্রের স্বার্থ? আমাদের বুদ্ধিজীবিরা তো গোটা সাম্রাজ্যের, নিখিল-রুশের সমস্যা বুঝতেই পারে না, বুঝতে চায়ও না। নাঃ। আমাদের কিসের প্রয়োজন জানেন? তৃতীয় এক দলের। যারা দেশটাতে ধরুণ একত্ববোধ এনে দেবে। এখন আমাদের ঈগল আছে অজস্র, কিন্তু কোন ঘরের পাখী নেই।'

'সাবাস!' বেরেনদিয়েভ চে'চিয়ে উঠে লাফ দিয়ে দাঁড়ায়। 'আমাদের প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সংস্কারের পার্টি। বাক্‌-স্বাধীনতা, প্রত্যয়-উৎপাদনের স্বাধীনতা—'

প্রেইস সমর্থনের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ে। জিন্নয়েভ বুকে হাত ঠুকে বলে: 'বিরোধী-আন্দোলনে সোস্যালিস্টদের অংশগ্রহণে তো আমি কক্ষনো আপত্তি করিনি!'

এদের ভয় দেখাতে, উত্যক্ত করতে, সার্মাঘনের মজা লাগে। পরিষ্কার চাঁছা-ছোলা ভাষায় শ্রমিক-আন্দোলনের যা কিছু ওর জানা আছে সব এদেরকে বলে। অরাজক অবস্থাটার ওপর জোর দেয়। খালাসীদের কথা বলে, কশাকদের কথা বলে, বানিয়ে বানিয়ে অন্য বহু ধরনের লোকের কথাও বর্ণনা করে। সবাইয়ের মধ্যে শ্রেণীবিদ্বেষের জাগরণ দেখতে পায়। অজান্তেই এই বিদ্বেষে ও প্রাণীতত্ত্বের রঙ্‌ চড়ায়। সেটা বানাতেও হয় না, নিজের মধ্যেই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব করে। জিন্নয়েভ বা তারাস্‌সভের মতো অক্লান্ত বক্তা অনেক দেখেছে। তাদের সম্বন্ধে এতটুকুও কৌতূহল নেই ওর, পরিষ্কার জানা আছে তাদেরকে। প্রেইসের অন্য অতিথিরা সংযত হ'য়ে রইল। দামী জিনিসের দোকানে হা-ঘরে খদ্দেরদের মতো তাদের

অবস্থা। কি হচ্ছে না-হচ্ছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে, শোনে, প্রশ্ন করে। কিন্তু নিজেদের মতামত কখনো ব্যক্ত করে না। ক্বচিৎ-কখনো যদি বা করে, তা-ও খুব সাবধানে, অস্পষ্টভাবে। এদের মধ্যে মৌনতার জন্যে রেদোজুবভ্ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লম্বা লিক্‌লিকে চেহারা। দীঘল মুখখানা ধোঁয়া-রঙের দাড়িতে ভরা। কানের পেছন থেকে দাড়ির গোছা নেমেছে, চোখের নীচে সেটা বেড়েছে, আর গলার নীচে পেঁাছে প্রাচুর্যে ভরে উঠেছে। মনে হয় ওটা নকল। তেমনি মনে হয় ওর চুলও নকল। সোজা সিধে চুলগুলোর ওপর শুয়ে আছে, যেন পরচুলা।

সামঘিনের জানা আছে "জনগণের জন্যে" নামে এক অতিমানবিক কাহিনীর ও রচয়িতা। সব সমালোচকই বইখানাকে প্রশংসা করেছেন। রেদোজুবভ সর্বশক্তিমান ভগবানের ভঙ্গীতে যেন দেবাসনে বসে থেকে তার পাকানো মোটা ভুঁরুর নীচে দিয়ে অন্যদের দেখে। মাঝে মাঝে গলা খঁকারী দেয়, যেন সকলকে সাবধান করছে— আমি এখন কিছু বলব। কিন্তু খঁকরে উঠবার পর আবার যে-কে-সেই। নির্বাক, মৌন। ওকে দেখে সামঘিনের কেমন চেনা চেনা ঠেকে। কোথায়, কবে দেখেছে, মনে করতে চেষ্টা করে। হঠাৎ, অতি আকস্মিক ভাবেই, রেদোজুবভের কোন ভঙ্গী মনে করিয়ে দেয়, লেখক কাতিনের বাড়ির কথা। সেখানে এক ভদ্রলোক আসতেন। তিনি তলস্তয়বাদের প্রচারক, কৃষকের মতো পোশাক পরতেন। মুখটা ছিল তাঁর ভাবাবেগ বর্জিত আর চোখ দুটো সবসময় অভিযোগ-মুখর। কিন্তু দশবছরে তো তাঁর এত বুড়িয়ে যাবার কথা নয়। সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যে সামঘিন জিজ্ঞেস করে :

'মাপ্ করবেন,—আপনি কি কাতিনকে চেনেন?'

রেদোজুবভ ঘাড়টা ধীরে ধীরে ঘোরায়, ভুঁরু কাঁপিয়ে তোলে : 'হ্যাঁ, চিন্‌তাম, কেন?'

'মনে হচ্ছে আপনাকে তার বাসায় আমি দেখেছি।'

'সম্ভব নয়।'

'দশ-বারো বছর আগে।'

'ওঃ—হ'তে পারে।'

রোদোজুবভ উদ্ধত ভঙ্গীতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কিন্তু, সামান্য বিরতির পর বলে :

'তখন জানতাম না কাতিন এত শূন্যগর্ভ। মানুষকে ভালোবাসে না, শুধু তাদের নিয়ে লিখতেই ভালোবাসে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে, এ'কথাই বলতে হবে যে আমাদের লেখকেরা...'

প্রবলভাবে হাত নাড়িয়ে থেমে যায়। চেটো দিয়ে হাঁটুদুটো খুব জোরে জোরে ঘষে বিড়বিড় ক'রে বলে :

'নীটশেপন্থী। অবক্ষয়ী। শব্দের ভ্রষ্টাচারী।'

ছাত্রদের জন্য মার্ক্সবাদের গোপন ক্লাশ চালায় পয়ারকভ। ভ্রূভঙ্গীতে তার নিরন্তর যুদ্ধ ঘোষণা। এমনভাবে চোয়াল নাড়ায় যেন শক্ত কিছু চিবোচ্ছে। সামঘিন তাকে মাঝেমাঝে বলে যে তার ছাত্রেরা বুর্জোয়া মানসিকতায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, সেখানে অন্য কিছুর প্রবেশ—সে-এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

'তা'জানি', পয়ারকভ গম্ভীরমুখে বলে : 'কিন্তু আমাদের এমন লোকও যে চাই যারা শ্রমিকদের শিক্ষা দিতে পারবে।'

কোনো বেসরকারী সংগ্রহালয়ে পয়ারকভ দলিলপত্র সংরক্ষণের কিছু রিসার্চ করে। পোশাকের দৈন্যদশা আর চেহারার শ্রীহীনতায় বোঝা যায় কাজটায় পয়সা-কড়ি ভাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্যে লুবাশার কাছে আসত।

আদেশের ভাষায় তার সঙ্গে কথা কইত। প্রায়ই তাকে কোনো-না-কোনো কাজে পাঠাত। লুবাশা তার সব আদেশনির্দেশ তামিল করে আর পেছনে ওকে 'মহা-উদ্যমী' ব'লে অভিহিত করে।

সামঘিনের ওপর পয়ারকভের মনোভাব বেশ রূঢ় আর তাচ্ছিল্যে ভরা। কাজেই লুবাশার কাছে যখন শোনে কলোম্নাতে পয়ারকভ গ্রেপ্তার হ'য়েছিল, ও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের ও বলত :

'মনে হয় না তোমরা কিছু করতে পারবে। কিন্তু—এটা স্পষ্ট যে বহু মূল্যবান শক্তির প্রচুর পরিমাণ অপচয় ঘটছে, দেশের কানাকড়িও কাজে আসছেনা। অথচ, আজ রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক-ধারায় শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ভীষণ প্রয়োজন।'

তবুও লুবাশার মাধ্যমে ছাত্র-আপীল ও নানা ধরনের হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে বা প্রচার করতে ও অনেক সাহায্য করে।

সন্ধ্যেবেলায় লুবাশার কাছ থেকে সংবাদ আহরণ করে। কখনো তার ঘরে যায়, প্রায়ই দেখে নির্বাক নিকনোভা সেখানে ব'সে। তার চেয়েও বেশী দেখে মিশা-কাকাকে। মিশাকাকার প্রকৃত নাম সুস্লভ। ছোট্ট মানুষটি ওকে কৌতূহলীও যেমন ক'রে তুলত, তেমনি বিরক্ত-ও। খুব ধীর-স্থির কল্পনা তার, কিন্তু বড় এক-গুঁয়ে। জীবনেব সিজিল-মিছিল শুচিবায়ুগ্রস্থের মতো। বোধহয় তার নীচে অনেক দুঃখের স্মৃতি জমা হ'য়ে রয়েছে। ভর্ৎসনামুখর দীপ্তিতে বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবিদের নানা কাহিনী বলতে খুব ভালোবাসেত। কারাগারের বন্দী-জীবন, নির্বাসিতের কাহিনী। ছোটখাট বিবরণে ভরে উঠত সে সব কথা। কিন্তু বলতে বলতে মিশাকাকা কখনো উত্তেজিত হতো না। বোঝা যায় এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁর বেশ ভাল ক'রে জানা। সংগ্রাম করবার, আত্মদান করবার প্রয়োজনের কথাও বলে। কথা বলতে বলতে তাঁর মাথাটা ডানদিকে ঘেঁষে একটু বেঁকে যেত। যেন কোন অদৃশ্য কাঁধের পেছনে দাঁড়িয়ে কানে কানে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে। তাঁর কথায় সামঘিনের মনে হয় মিশাকাকা জনগণকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে চাইছেন, মুক্তি-যুদ্ধে যেসব বুদ্ধিজীবী ক্ষয় হ'য়ে গেছে তাদের সাহায্যে তাঁরা যেন এগিয়ে আসে। ক্লিমের মনে প্রবল আগ্রহ, এই লোকটা কি করেছিল। লুবাশাকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু নিরাসক্তগলায় সে বলে :

'যা উচিত তা-ই করেছিলেন। এ-রকম প্রশ্ন কেউ করে না।'



প্রধান উকীল মশায়ের কাজে সামঘিনকে প্রায়ই মস্কো প্রদেশের নানা জায়গায় যেতে হয়। এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে ও লক্ষ্য করত : মস্কো-নগরীর বিরাট ধূমেল কটাহের অল্প একটু দূরেই জীবনের প্রবাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ছোট ছোট জেলা-শহরের জীবন সহজ, অনায়াস তার গতি। ব্যবসায়ী, ছোট শহরের নাগরিক বা পুরোহিত, এইসব ধরনের লোকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হবার পরও দেখে যে এ'দেরকে যত অমানুষিক লোভী বা নির্বোধ হিসেবে নানা লেখায় ও আলোচনা-সভায় বর্ণিত করা হয়, এরা মোটেই তা' নয়। নতুনত্বের প্রতি এদের বিদ্বেষের কথা নিয়ে বারবার যে অভিযোগ করা হয়, সে আর কিছুই নয়, শুধু সাবধানী লোকের স্বাভাবিক সন্দেহের তীব্র মনোভাবটুকু মাত্র। এ'দের জীবন-যাত্রার ধারা

অতি সনাতন। সংস্কার-কুসংস্কার, ধরন, অতি পুরাতন সন্দেহ নেই, সেগুলোর যৌক্তিকতাও আছে এদের জীবন যাপনের মধ্যে—আছে অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীদের নিকটতম পরিচয়ের সূত্রের মধ্যে। এরা পছন্দ করে ভাল খাবার আর ভাল পানীয়। রাজধানীর তুলনায় বিধ্বস্ত-স্নায়ুর লোক এদের মধ্যে নেই বললেই হয়। যুক্তিতর্কে মেয়েদের বশীভূত করবার জটিল ও কৃত্রিম তত্ত্বটি এদের কাছে যেমন বিদেশী, তেমনি হাস্যকরও বটে। এরা বই পড়ে না। কাজেই নীট্‌শে ও তলস্তয়ের মধ্যে কে ঠিক, বা মার্ক্স ও বার্নস্টাইনের মধ্যে কে অভ্রান্ত, এ নিয়ে কোন তর্কের কোন রেশই এদের বিচারশক্তিকে এখনো নিবীর্য করতে পারেনি। যেসব পদাধিকারীরা এদের ওপর শাসন চালায়, তারা একটু চেঁচায় বটে। ওই এক বদ-দোষ তাদের। কিন্তু আসলে তারাও ঠিক শাসিতদের মতোই ভাল মানুষ। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, সুদূরতম সম্ভাবনার জন্যে বর্তমানকে যারা কঠোর হাতে ভেঙেচুড়ে দেবার স্বপ্ন দেখছে, তাদের কারও নেতৃত্ব এই লক্ষ লক্ষ লোক মেনে নেবে।

ডাকবদলের জায়গায় পৌঁছে ডাক-গাড়িতে নতুন ঘোড়া জুড়বার জন্য অপেক্ষা করতে হলো সামঘিনকে। ডাক-পিয়ন ছেলেটি আরেকজন চাষীর সঙ্গেও আলাপ করে। চাষীটির অবশ্য নানান অভিযোগ—জমি কম, ট্যাক্স বেশী, কারখানা এসে 'মানুষকে নষ্ট করলেক গো কর্তা—' ইত্যাদি, নালিশের ভাষাও ঠিক যেমন চাষীপ্রেমিক লেখকদের বইয়ে পড়া যায়। লেখকদের ওপর সন্দেহ করা সামঘিনের অভ্যাস। কাজেই চাষীদেরও ও সন্দেহ করে। ভাবে, এসব বলতে হয়, ওরা এতে অভ্যস্ত নয়। বোধহয় ওর কাছে কিছু বাগাবার চেষ্টায় আছে চাষীরপো। কিন্তু কোন কিছু দেয় না ক্লিম। যখন চাষীরপো চাইল, ও তখন হেসে উঠল। ভাসকা কালুঝানিকের কথা মনে পড়ে। সে বলে খ্রীষ্টের কাছ থেকে একটি অচল রুবল পেয়েছিল। মোটের ওপর, গ্রাম ওর ভাল লাগে না। কৃষাণেরা বড় ত্যাঁদড়। হাড়গিলা চেহারা, রোদে পোড়া, শীতের ঠাণ্ডায় ফাটা, কিন্তু তবুও অপরিষ্কার। দেখতে পারে না ও এই বোকগুলোকে। এক-এক সময় মনে হয় ওকে বোধ হয় ওরা দুর্বোধ্য ও অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করছে।

কৃষাণী ও কৃষককন্যাদেরও একঘেয়ে উৎসাহ ওর কাছে বড় বিশ্রী লাগে, তাদের চোখগুলো দেখে মনে হয়, যেন জান্তব, ভেড়ার মতো। অথবা কোন জড়স্পব মানুষ যেন কিছু মনে করার তীব্র চেষ্টা করছে। বুড়োগুলোর মোটা মোটা কান আর জলের মত টলটলে দৃষ্টি। বুড়ীদের রাগ খুব, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও গেছে। বয়ঃপ্রাপ্তেরা বেশ সাহসী, কিন্তু উদ্ধত।—এই তো দেশের চেহারা।—একটুও ভাল লাগে না। মনে হয় গোটা দেশটাই বোধহয় আল্‌সেমি আর অযত্নের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

খামখেয়ালীভাবে তৈরি করা আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যেতে ক্লিমের বেশ লাগে। অলস নদীর পার ধ'রে ঝোপের ভেতর দিয়ে দিয়ে এই চলা সত্যিই আনন্দের। দিকবলয়ে ফিকে-নীল আভা, অরণ্যের ঘন-নীল আঁধার, হরিৎশ্রী শস্যক্ষেত্রে বাতাসের দোলা, ভরতপাখীর গান, নেশা ধরানো কত গন্ধ। সব যেন ওর প্রাণের মধ্যে এসে জড়ো হয়। এক মধু মাখানো শান্তিতে মন ওর ভরে ওঠে। মাঠের মাঝখান থেকে দেখা যায় বহুদূরে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে জমিদারদের বাড়ি, গাঁয়ের গির্জার চকচকে ক্রুশচিহ্ন। সামঘিন ভাবে :

'এই তো সত্যিকারের রাশিয়া। সহজ সরল সাধারণ লোকের সুন্দর সাবলীল দেশ।'

চিমনি আর ফ্যাক্টরীর লাল-লাল স্তূপ কিন্তু দৃশ্যপটের সৌন্দর্য দানবের মতো বাধা। রোজ সন্ধ্যেবেলায় বা ছুটির দিনে পথে পথে শ্রমিকেরা দল বেঁধে

ঘুরে বেড়ায়, কাজের দিনে তাদের বেশভূষা নোংরা, চেহারা এলোমেলো, মেজাজ চড়া। ছুটির দিনে পোশাক সুন্দর। প্রায়ই প্রচুর মদ খায়। দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে পথ চলে, যেন এক ঝাঁক রঙরুট্। ফ্যাক্টরীগুলো তখন ব্যারাক হ'য়ে ওঠে। এই রকম হল্লাবাজ লোকের এক মিছিল রাস্তার ওপর সার বেঁধে চলেছিল। ডাক পিয়ন ছোকরাকে চেঁচিয়ে তারা বলে :

'হেই, রাস্তা ছেড়ে হঠ্!'

ছোকরা নির্বিবাদে একপাশে সরে দাঁড়ায়। দলের মধ্যে একটা লোক, মাথায় টুপী নেই, কপালের চারপাশে ফিতে বাঁধা, দাড়িওয়ালা, হাতে তাম্বুরিন, মুঠি দিয়ে বাজনাটায় বাড়ি মেরে সামঘিনকে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে :

'হেই বাবুসাহেব! তোমাদের জন্যেই তো আমাদের এই হাল।'

তবু বিশ্বাস করা শক্ত এরা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

কখনো কখনো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দুল্‌কি চালে চলেও ঘোড়াগুলো মস্কোর বন্ধুর প্রত্যন্ত প্রদেশ পেরিয়ে যেতে পারে না। ধরিত্রী এখানে মাতৃসমা, অপূর্ব সহৃদয়া। মাঠে মাঠে অবারিত শান্তি। সামঘিনের মনে হয় বইয়ে যা কিছু পড়েছে বা লোকের মুখে যা শুনেছে তা' সব এখানে অচল। মন থেকে সমাজে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা মুছে গেল। এ'সব জায়গা থেকে ফিরে যাবার পর সামঘিনের মন ঝরঝরে হ'য়ে ওঠে। যাবার আগে লুবাশার কাছ থেকে বই নিয়ে যেত, ছোট ছোট প্রচার-পুস্তিকা নিয়ে যেত। অজ-পাড়াগাঁয়ে মূর্খ মানুষদের মাঝে একাকী পড়ে থাকা মাস্টারদের জন্য কোনো কাজের ভার নিয়ে আসত, অথবা ছোট শহরের অবিচলিত লোকগুলোর মাঝে যে জেমস্ত্‌ভো পরিসংখ্যান্‌বিদ নিঃসঙ্গে পড়ে আছে, তারও জন্যে নিযে যেত কোনো কাজের খবর। এ'সব কাজ করতে ওর কোনো দ্বিধা নেই, কেননা মনে মনে নিশ্চিত যে এই ভিজে জীবনে কোনো কাগজই জ্বালাবার শক্তি ধরে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সামঘিনেরা যখন চা খাচ্ছিল, ভাড়াটে ভদ্রলোক মিত্রোফানভ এসে অনুরোধ করল যে ভাড়া দেবার সময়টা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

'বুঝলেন, নাদেঝদা আনফিমিয়েভনা আমার কোনো কথা শুনতে রাজী নয়। কাজেই তাকে ডিঙিয়ে সাহস ক'রে আপনাদের কাছে এলাম।'

ভারভারা তার প্রস্তাবে রাজী হয়। ভদ্রলোককে এক কাপ চা-ও এগিয়ে দেয়। চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে বেশ সপ্রতিভভাবে টেবিলে এসে বসে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে আবার উঠে দাঁড়ায়। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের চারপাশে ঘুরে ঘুরে মূর্তিগুলো দেখে।

সেক্সপীয়রের প্রতিকৃতিকে থুতনী দিয়ে দেখিয়ে প্রশ্ন করে : 'ইনি কে?' তারপর, সেক্সপীয়র যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু এমনি সুরে মন্তব্য করে : 'বাঃ, খাসা মিল তো!'

শেড্রিনকে খুঁটিয়ে দেখে। হাতের মুঠির মধ্যে দিয়ে দূরবীনের মতো লক্ষ্য করে।

'সুন্দর মুখটা!'

ফিরে এসে বসতে বসতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে :

'বুঝলেন, "আমরাও এক সময় রেসের ঘোড়া ছিলাম।"'

কথাটায় সামঘিনেরা বেশ মজা পায়। ভারভারা জিজ্ঞেস করে, কি রকম লেখা তার পছন্দ। মিত্রোফানভ ধীর শান্ত গলায় বলে :

'দুর্বৃত্ত উপন্যাস সবচেয়ে ভাল লাগে—যেমন ধরুন, "রশ্যাম্‌বো," "১৩ নং ফিয়াক্‌র্" বা, "কাউণ্ট মণ্টি ক্রিস্টো।" রুশ লেখকদের মধ্যে কাউণ্ট সালিয়াসকে

আমার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হয়। বিশেষ ক'রে ওর "কাউণ্ট তিয়াতিন বালাতিস্কি" উপন্যাসখানা। জানেন নিশ্চয়ই, ওটা এক ঐতিহাসিক রচনা। অবশ্য ইতিহাসে আমার তেমন উৎসাহ নেই...'

'কেন?' ভারভারা উল্লসিত গলায় বলে।

'দেখুন, ব্যাপারটা কি জানেন, আমি আজ বেঁচে আছি,, সেটা তো আজকেরই বাঁচা, গতকালের নয়। আবার আগামীকালও বাঁচতে হবে। বইয়ের সাহায্য ব্যতীতই জীবনের বিজ্ঞান থেকে আমার মস্তক মুক্ত...'

চল্লিশের ওপর বয়স। মাথার মাঝখানে বেশ খানিকটা গোল টাক চক্‌চক্‌ করছে। দুটো পাশেও সামান্য টাক। মুখটা চওড়া, চোখ দুটো ম্লান—গোটা চেহারার এই-ই হচ্ছে মোদ্দা কথা। সামঘিনের মনে পড়ে ডীকনের কথা,—দাড়ি ছেঁটে পরিপাটি করবার আগের চেহারা তার। মিত্রোফানভের মুখ অতি সাধারণ, অগণিত সাধারণ মুখের পরিচিত আকার। ওর শান্ত বেঢপ গলার স্বর শুনে মনে হয় যেন বহু কণ্ঠের আওয়াজ দূর থেকে ভেসে আসছে।

'বিখ্যাত লেখকেরা—যেমন ধরুন তলস্তয়—আমার কাছে ভয়ানক গদ্য-গদ্য ঠেকে। কল্পনার ভীষণ অভাব, কোনো ইভান ইলিচের অসুখ হলো, মরে গেল, তা' জেনে আমার লাভ? বা ধরুন, মাদাম পর্জ্জনিশেভা স্বামীর ওপর অবিশ্বাসিনী হলেন, তাতেই বা কি? সাধারণ ঘটনা থেকে তো কোনো শিক্ষালাভ হয় না।'

ভারভারা ঝিল্‌মিলে চোখে ক্লিমের দিকে তাকায়। ও তখন মগ্ন হয়ে অতিথির কথা শুনছে।

'বাধ্য হয়ে যে কাজ করা যায়, তা'তে মোটেই আনন্দ নেই। জুতোওয়ালা যতক্ষণ জুতো বানায়, তার কোনো দাম নেই। কিন্তু সে যখন কাউকে খুন ক'রে ফেরার হয়...'

মিত্রোফানভ উঠে পড়ে। বলে: 'এই দেখুন, কথা বলতে বলতে জমেই গেছি। মাপ করবেন...অনেক ধন্যবাদ সময় বাড়ানোর জন্যে।'

'মাঝে মাঝে আসবেন। গল্প করা যাবে।' সামঘিন আমন্ত্রণ করে।

আরেকবার ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে মিত্রোফানভ বেরিয়ে যায়।

হাসতে হাসতে ভারভারা বলে: 'কি গবেট!' সামঘিন কোনো কথা বলে না।

কয়েকদিন পরে এক সন্ধ্যেবেলায় মিত্রোফানভ আবার এল। গলার স্বরে বন্ধুত্বের টান:

'ঘরে আলো দেখে ঝি-কে জিজ্ঞেস করলাম বাইরের কেউ আছে নাকি। না বলাতে ঢুকে পড়লাম।'

সেই সন্ধ্যেয় সামঘিনেরা ওর পরিচয় পায়। জানতে পারে ভদ্রলোকের পুরো নাম ইভান পেত্রোভিচ মিত্রোফানভ। বাপ ছিল ব্যবসায়ী। জন্মেছে শুইয়া শহরে। সাত বছর পাঠশালায় কাটিয়েও পঞ্চম শ্রেণীর ওপরে উঠতে পারেনি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে, বুঝতে পারল যে বিদ্যাভ্যাস ওর জন্যে নয়।

'সেই সময় বাবা মারা গেলেন। মা চিররুগ্না। আমি বিপথগামী হতে পারি আশঙ্কা করে তিনি আমাকে বিয়ে দিলেন। চার বছর পর বৌ মারা গেল। দ্বিতীয় বার বিয়ে করলাম। সাত বছরে দ্বিতীয় বার বিপত্নীক হলাম।'

ঘাড়টা বেঁকানোর চেষ্টাতে মনে হয় যেন মাথা নাড়ছে। কিন্তু ঘাড় ওর বেঁকবার মতো নয়। চোখ দুটো নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে:

'দ্বিতীয় বৌ-কে নিয়ে, মশায়, আমি অরিওলে বাস করতাম। ওই শহরেই ওদের বাড়ি কিনা। শহরটায় এন্তার যক্ষ্মারুগী আর চোরকাঁটা। উঃ, সে যে কি চোরকাঁটা! সব জায়গা ছেয়ে ফেলে।...আমার তৃতীয়া এখন এসেছেন, অবশ্য

অনুষ্ঠানগুলো সব সেরে ফেলা হয়নি। ও তোমস্ক গেছে, সেখানে ওর—'

প্রখর দৃষ্টিতে ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন মনে করতে চেষ্টা করছে, তোমস্কে ওর বৌয়ের কে থাকে। মনে পড়ে অবশেষে :

'হ্যাঁ, এক ভাই।'

লোকটার দৈর্ঘ্য মাঝারিগোছের। খুব যে শক্তসমর্থ, তা নয়, তবে হাড়গুলো বেশ চওড়া। তার সব কিছুই যেন মোটা-মোটা। হাত দু'টো ভারী আর জবর-জঙ্গ। সব সময়েই তাদের আগলে রাখে, হয় পকেটে ঢুকিয়ে, নয়তো টেবিলের নীচে। হয়তো লজ্জা পায়, যদি লোমশ মোটা হাত কেউ দেখে ফেলে। জানা গেল গোটা রাশিয়া সে ঘুরেছে। আস্ত্রাখান থেকে আর্কাঞ্জেল, ইর্খুত্স্ক্ থেকে ওদেসা। ককেশাসেও গেছে, ফিনল্যাণ্ডেও।

'ঘুরে বেড়াতে আপনার ভাল লাগে?' সামঘিন জানতে চায়।

'না। আমি—মানে, আমি চাকরির খোঁজ করছিলাম।'

'কিন্তু আপনি তো—বেশ সচ্ছল অবস্থা, নয়?'

মিত্রোফানভ অবাক হয়ে তাকায়।

'সময় মত ভাড়াই দিতে পারছি না, তার আবার সচ্ছল? তবে হ্যাঁ, এককালে টাকা ছিল বৈকি। কিন্তু দ্বিতীয় বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সব উধাও। তার সঙ্গে বেশ ফুর্তিতে দিন কাটিয়েছিলাম। ফুর্তি-আহ্লাদের সময় কি আর কড়ির হিসেব থাকে!'

সামঘিন জানতে চায় কি ধরনের কাজ খুঁজছে।

'আমার ক্ষমতা অনুযায়ী,' মিত্রোফানভ বলে। বিশদ অর্থও করে। কিন্তু গলায় আস্থার সুর যেন তেমন ফোটে না : 'ধরুন, কিছু পাহারা দেওয়া।'

মিনিটখানেক কি ভাবে। তারপর হেসে বলে :

'যখন ছোট ছিলাম, গোল-গম্বুজের ফায়ারম্যানকে খুব হিংসা করতাম। কত ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখে!'

সামঘিনের মনে হয় লোকটা অদ্ভুত হলেও মনে তো কোনো বিরক্তি জাগিয়ে তুলছে না। কিন্তু তা' কি ক'রে হলো?

মিত্রোফানভকে আর প্রথম বারের মতো অত আর ভাল ঠেকছে না, ভারভারা ভাবে। ক্লিম ওকে পরে বলল :

'সব অর্ধশিক্ষিত মানুষই যেমন হয়ে থাকে, ও-ও তাই। সব কিছুতেই দার্শনিক রঙে রাঙানোর অপচেষ্টা। কিন্তু এর বেলায় কি জান, চেষ্টাটা অনেক সংযত. সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মোড়া।'

কিছু দিনের মধ্যেই মিত্রোফানভ সামঘিন-পরিবারের একজন হয়ে উঠল।

*

ক্রেমলিন যাবার পথে এক সকালে সামঘিন দেখল নিকিতস্কায়া স্ট্রীট্ লোকে লোকারণ্য।

এক হাতে ছড়ি আর এক হাতে বুলডগ্-বাঁধা চেন ধরে একজন নিরীহ ভদ্রলোক জানায় : 'পুলিশ ছাত্রদেরকে রাইডিং ইস্কুলে ঢোকাচ্ছে।' ক্লিমের সঙ্গে একসঙ্গে পথ হাঁটতে হাঁটতে বলে : 'সেই চিরাচরিত ব্যাপার।'

সামঘিনের মনে পড়ে একটা চিঠির কথা। নির্বাসিত কুতুজভ সম্প্রতি

লুবাশাকে লিখেছে :

'ওগো কপোতী, বৃথাই তুমি তোমার হৃদয় তোলপাড় করছ; তুমি ভুল পথে চলেছ।'

কুতুজভ আরো লিখেছে, তলস্তয় ঠিক। ছাত্র-আন্দোলন একটা সরু ফাটল। উদারপন্থীদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে দিয়ে কোন বিরাট কাজ ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। 'কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে যুবশক্তির অস্থিরতা, ছাত্রের পিতাদের মৃদু আপত্তি, জুবাতভদের বিভেদ দূরীকরণের প্রচেষ্টা এবং এমনি ধারা আরো অজস্র নানা কাজ, নদীর ছোট ধারার মতো। ভুললে চলবে না জলা থেকে বেরোয় ছোট ছোট ধারা কিন্তু তারাই তো সৃষ্টি করে ভল্‌গা, নীপারের মতো বিশাল নদী। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যা হচ্ছে তা কারখানার কাজের পক্ষে একেবারে বৃথা নয়।'

চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে সামঘিন এগোয়। সামনে পুলিশের দেওয়াল। লোকগুলো চওড়া চওড়া কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তৈরি করেছে সুদৃঢ় দুর্গপ্রাকার। তাদের লাল ঘাড়ের উপব শক্ত করে আঁটা মস্তকগুলো যেন প্রকারের গায়ে কামান দাগবার নানা ছিদ্র। পার্কে একদল ছাত্র তারস্বরে নাগায়োচ্‌কা (চাবুক) গাইছে। ভয়ানক বেতালা। গানের মূর্চ্ছনাটাই শোনা যাচ্ছে কিন্তু কথাগুলো ডুবে গেছে হৈ-চৈ হট্টগোলে। পুলিশ মখোভায়া স্ট্রীটের দিক থেকে সবুজ সবুজ ওভার কোটপরা অনেক যুবককে গাইয়ে দলের দিকে জোর করে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ফলে ক্রমেই স্ফীত হয়ে উঠছে। কত উত্তেজিত, কত হাঁ-করা মুখ সামঘিনের চোখে পড়ে। মনে হয় উত্তেজনাটায় স্ফূর্তি জাগছে, নেশা ধরছে। রাগ-বিদ্বেষেরই নয় যেন। ততক্ষণে মাছের আঁশের মতো তুষার পড়তে শুরু হয়েছে।

ছাত্রজীবনে সামঘিন রাস্তার মিছিলকে এড়িয়ে চলত। ওর সাবধানী মন মিছিলে যোগ দেবার বিরুদ্ধে মত দিত। সফলভাবে এড়াতেও পারত। দূর থেকে অবশ্য বহুবার দেখেছে, পুলিশ কি ক'রে জনতা ছত্রভঙ্গ করে, কি ক'রে আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে—সব দেখেছে। মনে হয়েছে ওদের পদ্ধতি কি বিশ্রী আর কদর্য। আজ কিন্তু মনে হলো পুলিশের ব্যবহার বিশ্রীও নয় কঠোরও নয়। শুধুই যান্ত্রিক। যেন কোন্ সুদূরে পরাহত ক্লান্তিকর কর্তব্যে রত। কালো কোর্ট-পরা মিলিটারীরা, ঘোড়ার পিঠে চেপে বা পায়ে ছুটে এক-এক ক'রে সবুজে পোশাকের মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিশাল ঘন-বিন্যস্ত এক পদার্থের দিকে যেখান থেকে উঠছে নানা রকম চিৎকার তীব্র, তীক্ষ্ম আর খণ্ড খণ্ড। সমস্ত মিলিয়ে দৃশ্যটায় নির্বুদ্ধিতার খানিকটা আভাস ফুটে উঠেছে বই কি! মহাকায় কৃষ্ণ-হরিৎ পিণ্ডটি ধাক্কা খেয়ে খেয়ে কর্ষণ-আকর্ষণে ছিট্‌কে ছিট্‌কে রাইডিং-স্কুলের হাঁ-করা চোয়ালের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। সামঘিন যেখানটায় দাঁড়িয়ে ছিল সেখানকার দর্শকের ভীড় এতক্ষণে বিচলিত হয়ে উঠল। নির্বাক-মুখে বিড়বিড় কথা ফুটলো।

'"ওরা অরণ্য কাটে, লক্‌লকে সবুজ অরণ্য-তরুণ" সামঘিনের পেছনে কে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি ক'রে উঠল। গালিনার এই কবিতাটি ওর বিশ্রী লাগে। মিথ্যে আর সস্তা। লক্ষ্য করে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে উঠছে। দর্শকেরা এতক্ষণ বিদ্রূপের দৃষ্টিতে পুলিশদের দেখছিল কিন্তু এখন তারা ক্রমে ক্রমে রেগে ওঠে।

কিছুটা দূরে সামঘিন একজন দীর্ঘাঙ্গী লোককে দেখতে পায়। পরিষ্কার ক'রে কামানো গাল, দুটো হাত পকেটে। পোশাক-পরিচ্ছদ আর ঝুলকালি-মাখা

মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোনো ধাতু কারখানার শ্রমিক। দু'টো পুলিশের মাথার মাঝখান দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। মুখে নিভে-যাওয়া সিগারেট। মনে হলো ছাত্রদের ওপর পুলিশ যতই কঠোর আর হিংস্র হয়ে উঠছে, ততই লোকটার নাক-মুখ-চোখ উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে। কয়েক বার তার দিকে তাকিয়ে, 'ইস্ক্রা' ("স্ফুলিঙ্গ")-তে লেখা লেনিনের একটা প্রবন্ধের খানিকটা অংশ সামঘিনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে: "ছাত্রেরা শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিল; শ্রমিকদেরও নিশ্চয়ই ছাত্রদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ছাত্রদের দমন করবার জন্যে যখন সরকার সৈন্য বা পুলিশ মোতায়েন করে, তখন যে শ্রমিক সেই দৃশ্য নিস্পৃহভাবে দেখতে পারে, সে সোশ্যালিস্ট নামের অযোগ্য।"

'তাতে কি?' সামঘিন নিজেকে প্রশ্ন করে: 'এই লোকটা তো নিস্পৃহভাবে দেখছে না, বরং যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই দেখছে।।'

জনতার চাপে সামনে-পেছনে, এদিকে-ওদিকে ধাক্কা খেতে খেতে চলে। কাঁধের ওপর কে একজন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে:

'মশাই, আপনাদের আপত্তি করা উচিত। দেখছেন না পুলিশ ওদেরকে পিটছে। ওরা তো সব আমাদেরই ছেলে, দেশের ভবিষ্যত...'

দেখতে পায় ভীড়ের চাপে পুলিশের দেওয়াল দুলতে আরম্ভ করেছে। কেউই পালিয়ে যেতে চায় না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনের হ্যাঁচকা টানে পার্কের মাঝখানে এসে পড়ে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পুলিশ অফিসার। বেশ মোটা-সোটা। অনেকগুলো ফিতে দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। ভদ্রলোকের মুখের সঙ্গে "আমাদের এলাকা" পত্রিকাটির সম্পাদকের মুখের আশ্চর্য মিল।

'এদিকে'—সামঘিনকে আদেশ করে। দস্তানা-পরা হাত দিয়ে রাইডিং-স্কুলের দিকে দেখায়।

'জরুরী কাজে আমি কোর্টে যাচ্ছি।' ক্লিম বলে। কিন্তু পুলিশ অফিসার প্রবলভাবে হাত নাড়িয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

'এ-দিকে যান। আমি বলছি!'

পর মুহূর্তেই ক্লিম দেখতে পায় ছাত্রদের ভীড়ের মধ্যে ও দাঁড়িয়ে আছে আর পুলিশ তাদের সবাইকেই "রাইডিং-স্কুলের" দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। খ্যাঁদা-নাক একটা ছেলে, গাল দু'টো টকটকে লাল, মাথায় টুপী নেই, চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, ক্লিমের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ভাইসব, আমাদের মধ্যে একজন পুলিশের টিকটিকি!'

ঠিক তক্ষুণি সামঘিনের কাঁধে বিশাল এক থাপ্পর দিয়ে চওড়া-কাঁধের একটি ছাত্র, বিরাট মুখে উগ্র গোঁফ নিয়ে বলে ওঠে:

'আরে, ক্লিম ইভানোভিচ্ না? আপনি এখানে কি ক'রে? এতো আপনার জায়গা নয়।...ওহে, এ্যাই, সরো, আমাকে এগিয়ে যেতে দাও, এ্যাই,...'

কনুই আর কাঁধ দিয়ে কমরেডদের ধাক্কা দিতে দিতে ছাত্রটি এগোয়। চার-পাশের ভীড় এমনভাবে দুলে দুলে ওঠে, যেন প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপ্টায় ঘাসগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। জনতার ব্যূহ থেকে কোনমতে সামঘিনকে ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে নিয়ে এসে ছাত্রটি বলে:

'আচ্ছা বিদায়—চিনতে পেরেছেন তো?'

জবাব দেবার আগেই একজন পাতলামতো ছোটখাট লোক, পরনে ধূসর রঙের ওভার-কোট, চোখের ওপর টুপীটা বেশ ভাল ক'রে নামানো, কোথা থেকে ছুটে এসে ওর ব্রীফকেস ধরে টানাটানি করতে করতে উচ্চৈস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ধর, ধর, একে ধর!'

'কেন?' ছাত্রটি জিজ্ঞেস করে।

'তা' দিয়ে তোমার কোন্ দরকার?'

'কেন?' ছাত্রটিও তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। কোটের কলার ধরে লোকটাকে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসে। এত জোরে ঝাঁকায় যে টুপীটা মাথার ওপর বার কয়েক লাফ দিয়ে ওঠে। বিবর্ণ ছোট্ট মুখটি পরিষ্কার দেখা যায়। পেছন থেকে সামঘিনকে জাপ্টে ধরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই 'উঃ' ক'রে ছেড়ে দেয়। কোটের ঘের ধরে সামঘিনকে পেছন দিকে টানে। কোনো রকমে টাল সামলে ও পায়ের ওপর খাড়া হয়ে থাকে। পুলিশের তীব্র হুইসিল বেজে ওঠে। ছাত্রটি ততক্ষণে লোকটাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে। হিংস্রভাবে চেঁচিয়ে ওঠে:

'কী? খুব যে তড়পাচ্ছিলি?'

চট ক'রে ঘুরে গিয়ে কার মুখে প্রচণ্ড ঘুঁষি চালায়। যত জোর আছে গলায় তত জোরে সামঘিন চিৎকার ক'রে ওঠে:

'কি করছ? বুঝতে পারছ কি করছ?'

ঠকঠক ক'রে পা দুটো কাঁপছে। কণ্ঠস্বর কোন্ অতল থেকে উঠছে। ব্রীফ-কেসটা দোলাতে দোলাতে কথাগুলো বলেছিল। কিন্তু নিজের কথা নিজের কানেই পৌঁছয়নি। আশেপাশে হাজার-হাজার গলার অবিরাম চিৎকার:

'বাঃ! সাবাস্। পুলিশ-জুলুম চলবে না! পুলিশীরাজ মুর্দাবাদ...'

সামঘিনের চোখে পড়ে চারপাশে সব কিছুই যেন লাফাচ্ছে, কাঁপছে, দুলছে, ঘুরছে। চোখের সামনে কত মুখ আর কত হাত ঝলক দিয়ে দিয়ে উঠছে। কোথা থেকে একটা হাত এসে ওর মাথার টুপীটাকে এক ঝটকায় ফেলে দেয়। আরেকটা হাত ব্রীফকেসটা চেপে ধরে।.. হঠাৎ সামনের পুলিশটাকে ঠেলে মিত্রোফানভ বেরিয়ে এল। শান্ত গম্ভীর গলায় পুলিশটাকে ধমকায়:

'কাকে ধাক্কা দিচ্ছ হে? চেন না?'

ক্লিমকে সামনে রেখে ছাত্রদের ভীড় ঠেলে এগোয়। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ওর হাত ধরে জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলে। হঠাৎ সামঘিন মাথায় এক চোট পায়। তারপরই সব অন্ধকার।.. যা যা ঘটল কেমন ভাসা-ভাসা হয়ে মনে পড়ে। শুধু স্পষ্ট মনে আছে মিত্রোফানভ একজন পুলিশের সাহায্যে ওকে স্লেজে তুলে দিয়েছিল।

'যাও!' মিত্রোফানভ আদেশ করেছিল। স্লেজ-ড্রাইভারের পিঠে ব্রীফকেসটা দিয়ে মৃদু আঘাত করে সেটা সামঘিনের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। তারপর শুকনো গলায় বলেছিল:

'এ-সবের মধ্যে এসে আপনার লাভ কি?'

তিযাত্রাল্নায়া স্কোয়ারে মিত্রোফানভ স্লেজ-ড্রাইভারকে ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে চলন্ত স্লেজ থেকে সেই যে লাফিয়ে পড়েছিল, তারপর আর একবারের জন্যেও পেছনে সে ফিরে তাকায়নি। সামঘিন গাড়ীতে ব'সে চলেছে। শরীর ভয়ানক অসুস্থ। মনটা আচ্ছন্ন। চিন্তাভাবনাগুলোও যেন আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছে। মাথার মধ্যে অদ্ভুত একঘেয়ে যন্ত্রণা।

বাসায় শুয়ে শুয়ে সামঘিন অসহায়ভাবে এপাশ-ওপাশ করে। ভারভারা বাইরে গেছে। ঘরের মধ্যে নীরন্ধ্র নীরবতা, কিন্তু মাথার মধ্যে বহুকণ্ঠের জটলা। মনে করতে চেষ্টা করে কে কি বলেছিল। কিন্তু স্মৃতি খুঁজে খুঁজেই হয়রাণ হলো, একটি কথাও মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ে অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে অনেকে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছিল।

'মৃগীরোগ?' ধমকে ওঠে নিজেকে: 'কিন্তু কি ক'রে হলো?' অবাক হয়ে

ভাবে। চোখ দু'টো বোঁজে। অজান্তে মনে পড়ে যায় দেওয়াল ধ্বসবার পর কি বিশ্রী সব কাণ্ড করেছে।

'ঠিক কচি খোকাদের মতো, সবে কলেজে-ঢোকা ছেলে-ছোকরাদের মতো।'

ঘোলাটে চিন্তার অবিন্যস্ত ধারা কোন্ দিকে বইছে, তাল রাখা মুস্কিল। সব মিলিয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার বেদনার্ত অনুভূতি জাগছে।

'যূথ-প্রবৃত্তি। জনতার সম্মোহন।' নিজেকে প্রবোধ দেয় কিন্তু সান্ত্বনা পায় না। 'কি বলেছিল'—সেই প্রশ্নটা ক্রমশঃ ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে যে।

ভারভারা ফিরে এসে ওকে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করে কি হয়েছে। সামঘিন ওকে হাত ধরে ওর পাশে বসায়। বেশ লঘু মেজাজে ঘটনাটি বলে। ভাবটা এমন যেন ও নিজেই অন্য কেউ। কল্পিত বক্তৃতার কিছু কিছু শোনায়—এমন সব কথা যা ছাত্র-সভাতে আক্ছার শোনা যায়। বলতে বলতে এক সময়ে বিভ্রান্ত হয়ে নীরব হয়ে যায়।

'আঘাতটা কি গুরুতর?' পরম স্নেহে ভারভারা শুধায়। ও বিস্মিত হয়েছে।

'না'।

আবার বলতে শুরু করে ক্লিম। এবারে খুব সাবধানে। যতটুকু মনে পড়ছে শুধু ততটুকুই বলবে, আর একটুও বানানো নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ভীষণ কোনো বক্তৃতা নিশ্চয়ই দিয়েছিল।

'হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। পুলিশ আর ছাত্র দু'দলকেই যা-তা ক'রে বকলাম।'

'সে কি? তোমার মতো গম্ভীর মানুষও?'

ক্লিম উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঘরের এপাশ-ওপাশ পায়চারি করে। আয়নার সামনে এসে চুল ঠিক করে নেয়। ক্ষণকাল পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে: 'ক'জন আর সত্যি-সত্যিই নিজেকে জানে, বল!'

ভারভারা চেরা-গলায় প্রশ্ন করে: 'কিন্তু—তোমাকে গ্রেপ্তার করল না কেন?'

'গ্রেপ্তার করতেই যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ মারামারি বাধল। ছেলেরা আমায় ধাক্কা দিয়ে ভীড়ের মধ্যে ঠেলে দিল।'

এখন পর্যন্ত মিত্রোফানভের কথা মনে পড়েনি। এবারে মনে হতেই সে-কথা জানায়। রুমাল ঘুরিয়ে মুখে হাওয়া খেতে খেতে ভারভারা তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে যায়। আরেকবারের জন্য সামঘিনের মনে হয়:

'ইস! কী ক'রে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম?'

অস্বস্তি লাগে। না জানি ভাড়াটে ভদ্রলোক ভারভারাকে কোন্ কাহিনী বলবে। যা বলেছে তার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। তাছাড়া, গোয়েন্দারা ওকে ঠিকই লক্ষ্য করেছিল। তবে তো ব্যাপারটা সহজে মেটার নয়...

ভারভারা ফিরে এল। বলল:

'ক্লিম, তোমার ওভার-কোটে কত চূণের দাগ, পকেট ছেঁড়া—'

ভারভারা থর থর ক'রে কাঁপে। সামঘিনের বুকের মধ্যে মাথাটাকে শক্ত ক'রে চেপে ধরে। কিন্তু সামঘিন ভাবে:

'কোট দেখতে গেল কেন ভারভারা? আমাকে কি বিশ্বাস করেনি?' তবু প্রাণে জ্বালা ধরে না। নিজেকেও তো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে বা চিনতে পারছে না। ভারভারার কোমলতা আর আতঙ্কের বিস্ময় মনে কিছুটা প্রশান্তি এনে দিল। ডিনারের সময়ে মিত্রোফানভ এলো। সন্তর্পণে সে ঘরে ঢোকে, বোকার মতো হাসে। যেন অস্পষ্ট দোষের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে। হাত দু'টো পেছনে লুকোনো।

তার বিব্রতভাব দেখে সামঘিন উৎকণ্ঠিত হয়। ভাবে, 'না জানি কি বলবে?'

কৃতজ্ঞচিত্তে ভারভারা তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে টেবিলে বসায়, ভদ্‌কা ঢেলে দেয়, স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান করে। আর তারপরেই শুরু হয় তার জেরা। ইভান্‌ পেত্রোভিচ্‌ খুক খুক ক'রে কাশে, গলা-খ'কারি দেয়, মন দিয়ে ভদ্‌কা পান করে, চিবোয়ও। বিব্রতভাব ক্রমশঃ বাড়ছে দেখে সামঘিন অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করে :

'পুলিশের হাত থেকে কি ক'রে আমাকে টেনে এনেছিলেন মশাই?' পিট পিট ক'রে তাকায় মিত্রোফানভ। আস্তে আস্তে কথা বলে, যেন অবান্তর কিছু বলে ফেলার ভারী ভয়।

'মানে ব্যাপারটা কি জানেন, ওরা আহত লোকদের পছন্দ করে না। অর্থাৎ, ওরা তাদেরকে ভয় পায়—ওদের স্বার্থের তারা পরিপন্থী তো। তাই আমি বললাম : 'থামো! লোকটা আহত হয়ে পড়েছে। কনস্টেবলটা আবার আমার পরিচিত লোক বেরিয়ে গেল। বহুদিন আমরা একসঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলেছি...'

'আমি কে জিজ্ঞেস করেছিল? '

'না। আর করলেও, কক্ষণো জবাব পেত না।' মিত্রোফানভ দাঁত বের ক'রে বলে।

'আঃ, ইভান পেত্রোভিচ্‌! ও কি, হাত তুলে বসে আছেন কেন? ওটুকু খেয়ে ফেলুন।' ভারভাবার মিষ্টি মিষ্টি কথা : 'আপনি সত্যিই খুব ভাল!'

মিত্রোফানভ প্রথমে ওর দিকে তাকায়, তারপর সামঘিনের দিকে। মনে হয়, হঠাৎ কোন আনন্দের খনির সন্ধান বুঝি পেয়ে গেছে। ডগমগ হয়ে ওঠে। পুরোনো আত্মবিশ্বাস যেন ফিরে পায়। খুশী-খুশী কণ্ঠে বলে :

'আমি তখন কাত্‌জেভের বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল, ক্লিম ইভানোভিচ্‌কে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝলেন, দেখেই রক্ত গরম হয়ে উঠল, সেই ছেলেবেলাকার মতন। আমাদের লোকের গায়ে হাত, এতবড় কথা!'

সামঘিনেরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সেইদিন থেকে ইভান্‌ পেত্রোভিচ ওদের সংসারের একান্ত আপনার জন হয়ে উঠল। যেন বাড়িতে হঠাৎ এসে-পড়া বেড়াল, আমন্ত্রণ পেয়ে রয়ে গেল। কারো কথার মধ্যে না থাকবার এক মহান গুণ ওর। ঠিক কোন মুহূর্তে অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ছে, বুঝতে পারত। সামঘিনদের বাসায় কোন অতিথি এলেই মিত্রোফানভ উঠে যায়। এমনকি লুবাশা এলেও।

হয়তো বলে ওঠে : 'মাপ করবেন। বিদুষী তরুণীদের আমি ভয়ানক ভয় পাই।'

মানুষটাকে ভারভাবার বেশ লাগে। বেশ মজলিসী। কত মজার মজার কথা বলে। গ্রাম্য-জীবনের কথা,—তাদের রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দ, বিশ্বাস-সংস্কারের কথা, আগুনের কথা, হত্যার কথা, প্রেমের কাহিনী। চোখ দু'টো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেছে। যতটুকুই হাস্যরস থাকুক না কেন, এতটুকুও তার নজর এড়িয়ে যেতে পারেনি। বেশ সুন্দর ক'রে বলে, আমুদে ঢঙে। কখনো বা সামান্য বিষণ্ণ সুরে। শ্বেতসাগরে কড্‌মাছ ধরবার গল্প বলে, সাইবিরিয়ায় সীডার-বাদাম কুড়ানোর, উরালের হীরা-জহরত খনিতে কি ক'রে মূল্যবান পাথর তোলা হয়, সেই সব কাহিনীও। ভারভারার মনে হয় কাহিনী বলায় ওর অপূর্ব দক্ষতা।

আগের চাইতে অনেক বেশী গম্ভীর হয়ে, মনোযোগ দিয়ে সামঘিন এখন ওর কথা শুনছে। মিত্রোফানভকে বেশ দৃঢ়চেতা মনে হয়, বেশ সদালাপী। সফরের শেষে বাড়ি ফিরে নিজের উপলব্ধির কথাগুলো তাকে বলে। আনন্দিত চিত্তে মিত্রোফানভের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ও শোনে।

চিন্তায় আত্মবিশ্বাসের সুর নিয়ে মিত্রোফানভ হয়তো বলে : 'আমাদের

কৃষকদের যেভাবে রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত অন্যায়। তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাই মালিক হতে চাইছে। কেউ-ই আর ভাড়াটে হতে চায় না। এই ধরুন, আমি যদি আমার ঘরের দেওয়ালে নতুন ক'রে কাগজ লাগাই আর কাল আপনারা, মানে মালিকেরা এসে বলেন, ঘরটি ছেড়ে দিতে হবে হে—তবে কি রকম দাঁড়ায়? ঠিক এই রকম হতাশাপূর্ণ অবস্থা আমাদের মুঝিকদের। আর সেই জন্যেই তো এরা এত আলসে। দিন দেখি ওকে ওর নিজের জমিতে বসিয়ে,—দেখবেন, কুকুরছানার মতো নাদুস-নদুস হয়ে উঠছে দিন দিন।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে :

'আসলে কি জানেন, অন্যের জমিতে বাঁধাকপি বোনাটাই যে আহাম্মুকি। অরিওলে পুলিশের নজর-বন্দী এক ভদ্রলোক ছিলেন। বয়সে বেশ মান্যবর। যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা আর দয়ামায়া, কিন্তু দয়ামায়া দিয়ে তো আর মুষড়ে-পড়া লোকগুলোকে জাগানো যায় না! শহরটাই যে বিচ্ছিরি! ধুলোয় ভরা আর যত রকম বদ-প্রবৃত্তিতে ঠাসা। কাজেই দয়ালু ভদ্রলোকটি আসে-পাশের লোকদের পরিমার্জনায় উঠে-পড়ে লাগলেন। আমার বৌ-ও, দ্বিতীয় জনা,—তাঁর হাত থেকে রেহাই পায়নি—ইস্কুল থেকে তাকেও বার ক'রে দেওয়া হয়েছিল—'

ভারভারা হোঃ হোঃ ক'রে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। সামঘিন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকায়, ছিঃ, অতিথি যদি কিছু মনে করে! কিন্তু মিত্রোফানভের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। যুবতী নারীটিকে আনন্দ দিতে তার যে বেশ আগ্রহ, সেটা বোঝা যায়। পকেট থেকে একটা হাত বের ক'রে নিয়ে এক আঙুল দিয়ে তার পাতলা পাতলা গোঁফে তা দিতে দিতে বর্ণহীন চোখে হাসি ফুটিয়ে বলে :

'হ্যাঁ, তারপর, বুঝলেন—সদাশয় ভদ্রলোকটি চারদিকে প্রচার করলেন, "যুক্তির বীজ বপন কর, দয়ারও"—আর ওই ধরনের আরো নানা কথা। হঠাৎ কিন্তু দেখা গেল, তিনি নিজেই এক উকিলের বিধবাকে বিয়ে ক'রে বসলেন। বিধবার বাড়ী-ঘর-জমি আছে। দু'বছরের মধ্যে, জানেন, লোকটা এইরকম একঘেয়ে হয়ে গেল যেন অরিওলেই তাঁর জন্ম। আর সারা জীবন সেখানেই কাটিয়েছেন।'

ক্রমশঃ সামঘিনের মনে হয়, ইভান পেত্রোভিচ আছে বলেই নিজের ধারণাগুলোর সংশোধন ঘটছে। একদিন রাত্রে থিয়েটার থেকে ফিরে যখন শুতে যাবে ভারভারা হঠাৎ বলে ওঠে :

'আচ্ছা, মিত্রোফানভ কিন্তু খুব ভাল কৌতুক অভিনেতা হতে পারে। ওর প্রতিভা আছে।'

'বড্ড বাড়িয়ে বলছ,' সামঘিন বলে। ভাড়াটে ভদ্রলোকটার মধ্যে প্রতিভা!—মরে গেলেও স্বীকার করবো না। 'লোকটা আসলে, জান, শুধুই একজন খাঁটি রুশ, নিখাদ সাধারণ বুদ্ধিধর। এ-রকম লোক লক্ষ লক্ষ আছে।'

মিত্রোফানভ নামের লোকটার বর্ণ ও আকৃতি কিন্তু ঈস্টারের রাতে ক্লিমের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।



খোদিন্কার সেই কাণ্ড আর "রাইডিং স্কুলের" এই ঘটনাটির পর সামঘিন খুব সাবধান হয়ে ওঠে। লোকের ভীড় দেখলেই সন্তর্পণে এড়িয়ে যায়। এমনকি

থিয়েটারের লাউঞ্জে যে ভীড় জমে, সেটাতেও ওর বিরক্তি। দরজার কাছে কাছেই থাকে। রাস্তায় যদি দেখে কোন দুর্ঘটনা কি মারামারি হয়েছে, চারপাশে লোক জমেছে তবে দূরে দূরে ঘুরে পথ হাঁটে।

ঈস্টার-রাতে ক্রেমলিনে যাবার জন্যে ভারভারা ধরল। যেতেই হবে, ভয়ানক অনুনয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামঘিনকে রাজী হতে হয়। ক্রেমলিনের প্রাচীরের কাছে পৌঁছুতেই জমাট কালো ভীড়টা তীব্র আকর্ষণে যেন টেনে নিল। স্বাধীনতা হারিয়ে চারপাশ থেকে অনবরত ধাক্কা খায়। বিভীষিকার মতো মনে হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে। পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে খেয়ে দু'জন জারের কিম্ভূত মনুমেণ্টের কাছে এসে পৌঁছয়। সেখানে ভীড় অনেকটা কম। তাই নিশ্বাসও সহজ হয়ে আসে।

হিমেল আঁধারে মানুষগুলো প্রবল চাপে যেন একটা বিরাট পিণ্ডের আকার নিয়েছে। পিণ্ডটা দুলে দুলে উঠছে, উত্তাল ঢেউয়ের মতো তরঙ্গায়িত হচ্ছে। গুরুভারে পায়ের নীচের মাটি দেবে যাচ্ছে! ক্যাথেড্রালের বাতায়ন থেকে মোটা মোটা হলুদ আলোর রশ্মি এসে লোকগুলের ওপর ঠিকরে পড়ছে। অন্ধকারকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে তুলছে। তার ঘাড়গুলো যেন নীল বরফের মতো। চিকমিক করছে। অনাবৃত মাথায় মাথায় আলো পড়ে মনে হচ্ছে যেন সেগুলো আলু, বাদাম বা মটরদানা। দিনের বেলার আয়তনের চাইতে অনেক ছোট। যত দূরে তত আরো ছোট। শেষে সীমায়িত আকার ছেড়ে সবাই গিয়ে মিশেছে মস্তকহীন, অবয়বহীন, এক কালো স্তূপে। ভীড়ের ওপর জেগে আছে কৃষ্ণ-সেন্‌ট্যরের মতো ঘোড়-সওয়ার পুলিশ। তাদেরই একজনের কাছে দাঁড়িয়ে মোটা মতন একটা লম্বা লোক, গায়ে ফারের কলার দেওয়া গরম কোট। ঠিক তার ওপরেই যেন ঘোড়ার মাথাটা লাগানো,—জোরে জোরে দুলছে, বার-হয়ে-আসা দুপাটি দাঁতে লাগামের টুকরো চকচক করছে। মহান ইভানের ঘণ্টা-ঘর যেন সেই অন্ধকারের কায়ায় নিজেকে সজোরে চেপে ধরেছে। বিশাল কদাকার একটা আঙুলে পিতলের ডাণ্ডা তুলে সমস্ত জগতকে শাসাচ্ছে। তলাটা ডুবে গেছে বিক্ষুব্ধ কালো স্তূপের গভীরতায়। উচ্ছ্বল সমুদ্রের মতো সেখানে তরঙ্গ ভঙ্গ হচ্ছে, যেন জোয়ারের টানে টানে ফুলে-ফুলে উঠছে।

ক্লিম সামঘিনের মনে হয়: ঘণ্টা-ঘর যদি ভেঙে পড়ে কত হাজার হাজার লোক মরবে। নানা জায়গার লোক—ওখোত্‌নি রো-এর, চীনা টাউনের, অরদিঙ্কার, আরবাতের। অস্ত্রোভ্‌স্কি বর্ণিত মস্কো নদীর ওপারের কত শত চরিত্র। আরো হাজার হাজার লোক হয়তো মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পারস্পরকে নিষ্পিষ্ট করবে, বিকলাঙ্গ ক'রে দেবে। অথবা অন্য কোন বিভীষিকা এসে হয়তো এই নীরেট পিণ্ডকে বিদীর্ণ করবে। ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে মহাকায় পিণ্ডটি চারপাশ বিধ্বস্ত ক'রে যাবে। যত অট্টালিকা, যত গির্জা—সব ধ্বসে পড়বে, এমন কি ক্রেমলিনেব প্রাচীরও।

ভীড়টা হাঁপায়, বিড়বিড় ক'রে কথা বলে। সামঘিনের মনে পড়ে যখন ঘণ্টা তুলে বসানো হচ্ছিল তখন গ্রামে সে কি অস্থির গুঞ্জন। এখানেও যেন এরা অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা কোন গুরুভারকে ওপরে তুলে ওঠাতে চাইছে। একজন আরেক জনের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে, কাঁধে কাঁধ ঘষছে। সর্বশক্তি উজাড় ক'রে ওরা যেন উষ্ণ হলুদ আলোকরশ্মির দিকে ছুটছে, কোনো রকমে ক্যাথেড্রালের দরজায় পৌঁছনোর জন্যে গুঁতোগুঁতি করছে। অস্পষ্ট কোলাহলের রেশ ভেসে আসছে সেখান থেকে। আশ্চর্য শান্ত ঠাণ্ডার দমক উঠছে। হিমেল রাত আর তুষারজমা পৃথিবীর অলঙ্ঘ্য নীরবতায় যেন সব ডুবে যাচ্ছে। সামঘিনের পাশে

যারা দাঁড়িয়ে তাদের মুখগুলো কেমন গম্ভীর। তীব্র প্রতীক্ষা, কখন রাত ভোর হবে, উত্তাপ আসবে। কাছে দাঁড়িয়ে ভারভারা কেঁপে কেঁপে ওঠে। ইতস্ততঃ ক'রে ডান হাত নাড়ায়, বুকের কাছে চেপে ধরে। সামঘিন দেখে ওর হিমশীতল মুখটা ধর্মপ্রাণাদের মতো হ'য়ে উঠেছে। কোনো কথা বলে না, চুপ ক'রে থাকে। মনে হয় এক্ষুণি বোধহয় ভারভারা ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে, লোকের ধাক্কা-ধাক্কির কথাটাও বলবে।

ভীড় ঠেলে মিত্রোফানভ বেরিয়ে আসে। বগলের নীচে টুপীটা চাপা, হাতে রুপোর ঘড়ি। পাশে এসে দাঁড়িয়ে নীচুগলায় একটু তোৎলিয়ে ব'লে ওঠে :

'এখ্-খুণি বাজবে।'

চুল পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে আধখোলা মুখে আকাশের দিকে চায়। চোখ-দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠেছে। দেখ্লে মনে হবে যেন কোনো ছোট্ট ছেলে আকাশে উড্ডীন খাবার খুঁজে-খুঁজে ফে'রা পায়রার ঝাঁক দেখছে।

হঠাৎ কালো আকাশে কে যেন ভরা পাত্র শূন্য ক'রে দিল। খাঁটি তামার ঝন্ঝনানির শব্দ-রণন চারদিক ছড়িয়ে পড়ল। কামানের মতো প্রচণ্ড শব্দে কি যেন অর্থহীনভাবে ফেটে গেল। নীরবতা বিদীর্ণ হলো। অন্ধকার ভাসিয়ে আলোর বন্যা এল নেমে। বহু হাসিভরা মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখ উঠল ফুটে।... গোটা ক্রেমলিন অকস্মাৎ সুদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। মস্কোর আকাশে-বাতাসে গম্ভীর ঘণ্টা-নিনাদের আলোড়িত তরঙ্গ গড়িয়ে চলে। অসংখ্য হাত ভীড়ের ওপর পাখীর মতো পাখা-ঝাপটে ক্রুশচিহ্ন আঁকে। সোনালী অঙ্গবাস পরা যাজকেরা ক্যাথেড্রেল প্রাঙ্গণে রঙের বাহার জাগিয়ে তোলে। মাথায় নানা রঙের দ্যুতি নিয়ে এক ব্যক্তি সবাইকে অগ্নিময় ক্রুশে আশীর্বাদ করে। হাজার কণ্ঠের গর্জন ওঠে। প্রত্যয় ও বিশ্বাসে ভরা ঘোষণা তিনবার গর্জে গর্জে উঠল :

'যথার্থই, তিনি জাগ্রত হ'য়েছেন।'

খৃীষ্ট জাগ্রত হ'য়েছেন!' চিৎকার ক'রে ওঠে মিত্রোফানভ। ক্লিমকে আলিঙ্গনে বেঁধে চুম্বন করে, উচ্ছ্বাসে অধীর হ'য়ে কেঁদে ফেলে। আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

'চিন্তা করুন! ওঃ ঈশ্বর!...'

ভারভারাকেও জড়িয়ে ধরে, চুম্বন করে, ঝাঁকায়। বিড়বিড় ক'রে বলে :

'বিশ্বাস নাও যদি করেন, এখন করবেন। যথার্থই তিনি জাগ্রত হয়েছেন! একি সত্য নয়?'

দু'গাল বেয়ে এত অজস্র অশ্রুর বিন্দু নামে যেন চোখের জল নয় ঘামের ফোঁটা। ভারভারা বিব্রত হ'য়ে তাকে ঠেলে দেয়। ক্লিমের দিকে অনুনয়ের চোখে তাকায়। অনুযোগ ভরা গলায় ডাকে : ক্লিম?'

স্বরে অভিযোগ আর অনুযোগ, দুই-ই। পারিপার্শ্বিক এমন কল্পরাজ্য হ'য়ে উঠেছে যে সামঘিনও ভাড়াটে ভদ্রলোকটির উত্তেজনায় অভিভূত। সান্ত্বনার মৃদু হাসি হাসে। আর তারপরেই হাস্যকর দেখাবার ভয় সত্ত্বেও ক্লিম স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল।

'খৃীষ্ট জাগ্রত হ'য়েছেন, ভারিয়া!'

ভারভারা ক্লিমের দেহলীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্ত্রীর কাঁধের ওপর দিয়ে ক্লিম মিত্রোফানভের ভিজে-ভিজে মুখ আর সুখী চোখদুটো দেখতে পায়। তার আবেগ-দীপ্ত কণ্ঠ শুনতে পায় :

'কী অপূর্ব মুহূর্ত! আমরা যেমনটি করি, পৃথিবীর আর কোথাও কেউ তেমন ক'রে পারে না। পারে? সবায়ের জন্যে! আশ্চর্য কথা নয়, ক্লিম ইভানোভিচ,

এমন একটা জিনিস থাকতে পারে—যা সকলের জন্যে! আবার সবাইকে ছাপিয়েও। ভিখিরীই কি আর জারই বা কি, সবায়ের জন্যে এক রকম! ওগো প্রিয়বন্ধুরা, আমরা হলাম এমনি মানুষ...'

ভীড় ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ল। সুস্পষ্ট মানুষের সব চেহারা এবারে ভেসে ওঠে। সবাই সাধারণ মানুষ। উৎসব-আনন্দে উৎফুল্ল। সবাই সবায়ের সামনে মাথার আচ্ছাদন খুলে দাঁড়াচ্ছে, আলিঙ্গন করছে, চুম্বন করছে, অবিরত উচ্ছ্বাসের ধ্বনি তুলছে :

'খৃীষ্ট ..'

'যথার্থই...'

যেন খবরটা এই প্রথম জানতে পারল। সামঘিন না ভেবে থাকতে পারে না যে এতদিন খৃীষ্টজাগরণের আনন্দকে ওর মনে হয়েছে হাস্যকর এক ভণ্ডামি, কিন্তু এখন যেন অনুভব করছে, না, তা'নয়, এর মধ্যে হাসিরও যেমন কিছু নেই, ভণ্ডামিরও না। বিচলিত হ'য়ে পড়ল, হলো আনন্দিতও। পেছন ফিরে দেখল, ভয়ঙ্করের সব চিহ্ন কোথায় অদৃশ্য, চারদিক এখন আলোয় আলো, ঝলমল করছে। নগরের সমস্ত গির্জা-ঘণ্টার সানন্দ কলরবকে ছাপিয়ে উঠেছে এখানকার বিজয়ী তূর্যনাদ। মস্কোর মসীকৃষ্ণ আকাশে দিকে দিকে উঠেছে আতসবাজির নানা ফুলঝুরি। অসংখ্য নির্লজ্জ কণ্ঠস্বর যেন আকাশ বাতাশকে উজ্জ্বল ক'রে তুলছে। গির্জাগুলো যেন রূপকথার সোনার তরী, গৃহের অরণ্য ভেদ ক'রে বেরিয়েছে। একটা পাশ ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে মিত্রোফানভ জনতার ভীড় ঠেলে এগোয়। কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পথ করে, তবুও অভদ্রতা নেই। ভারভারার জন্যেও পথ ক'রে দেয়। মুখে সারাক্ষণ বড় বড় কথা।

'আমরা', কতবার বলল : 'আমরা '

লোকের আনন্দোচ্ছ্বাসে কথা বোঝা দায়। ক্লিমের 'বস'-য়ের সঙ্গে সঙ্গে ওদের দুজনেরই 'উপবাস-ভঙ্গ' করবার কথা। কিন্তু হঠাৎ ক্লিম ব'লে ওঠে :

'ভারিয়া বাড়ি চল। ইভান পেত্রোভিচও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন— কি বল?'

'আঃ কি আনন্দ!' ঈষৎ চেঁচিয়েই বলে ভারভারা।

'আমি এত—আশ্চর্য কি ভীষণ উত্তেজিত হ'যে পড়েছি!' সামঘিন মিন মিন ক'রে স্বীকার করে। অপ্রস্তুত গলায় বলে · 'কাল 'বসে'র কাছে মাজনা চেয়ে নেব।

'হাজার হাজার ধন্যবাদ' মিত্রোফানভ বলল : 'আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলে তো খুব খুশী হবো।'

কতবার যে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল তার ইয়ত্তা নেই। উল্লাসে বন বন ক'রে রুমালটা ঘোরায়। আশেপাশের লোকজনের গায়ে লাগে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভারভারা সবিনয়ে কথাটা জানাতেই মিত্রোফানভ চেঁচিয়ে ওঠে

'ঠিক আছে। আজ রাতে আর কেউ দোষ ধরবে না!'

আনফিমিয়েভনার সঙ্গে ঈস্টার-চুম্বনের পালা শেষ হলো। সাদা পোশাকে তাকে দেখাচ্ছে যেন ছোট চ্যাপেল। পাচকের সঙ্গেও ও-পর্ব শেষ হয়। ইতিমধ্যেই সে-ভদ্রলোক বেশ খানিকটা পান করে বসে আছেন, বেশভূষায় রঙীন কৌতুক-অভিনেতাটি। পরিচারিকাও বাদ যায় না। গোলাপী পোশাকে আর অগুন্তি রিবনে তাকে এমন দেখায় যে সামঘিনের মনে পড়ে যায় গাঁয়ে বিবাহ-লগ্নের সুসজ্জিত ঘোড়াগুলোর কথা। নানা খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষ্য করতে করতে সামঘিন স্নিগ্ধ হাসি হেসে ওঠে। চশমা খুলে আবার পরে। ও খুব সচেতন যে ওর আজকের ব্যবহারটা সাধারণ সীমা পার হয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত অভিলাষে মনটা ভ'রে

ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে আরো লজ্জা পায়। মিত্রোফানভের পিঠ চাপড়ে বলে উঠতে ইচ্ছে করছে : 'খ্রীষ্ট জেগেছেন!' ভারভারাকে নরম মিষ্টি কথা শোনাতে আগ্রহ হচ্ছে। সাদা পোশাকে ভারভারা যেন নতুন বৌ। অনাবিল প্রশান্তি; কিন্তু সামান্য একটু বিষণ্ণতার ছোঁয়াচও যেন। এটাও সামঘিনকে বিচলিত ক'রে তোলে। ফুলে ফুলে ঢাকা টেবিলে এসে দাঁড়ায়। শূকের ছানার দাঁত-বের-হওয়া মাথাটার দিকে চেয়ে থাকে। ছোট্ট দাড়িটি মোচড়ায়, আর শোনে পেছনে দাঁড়িয়ে মিত্রোফানভ বলছে :

'মিঃ দোলগানভ—বুঝলেন ওই নামে এক ভদ্রলোককে আমি জানি—একবার এসে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বোঝাতে চায় খ্রীষ্ট ব'লে কেউ কোনোদিন ছিল না। খ্রীষ্ট নাকি শুধুই নিছক কল্পনা। আচ্ছা, যদি তাই-ই হয়, ক্ষতি কি? হ'তে পারে খ্রীষ্ট এক কল্পনামাত্র, তবু তো তাঁর অস্তিত্ব আছে, তিনি আছেন! তিনি আছেন, ভারভারা কিরিল্লোভ্না। আমাদের সকলের মধ্যেই তাঁর কোনো-না কোনো অংশ আছে। সেটাই তো বড় কথা। আমরা খারাপ হ'তে পারি, বুঝলেন না, কিন্তু সেটা তো কিছু অদ্ভুত নয়। আসলে ..

'আসুন, বসা যাক।' ক্লিম বলে। ভাড়াটে ভদ্রলোকের উৎসাহ দেখে প্রশংসা জাগছে। ভাল ক'রে লক্ষ্য করতে করতে মনে হয়, লোকটা যেন সার্কিট-কোর্টের রেজিস্ট্রার, মুইর এ্যান্ড মুরিলীসের ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের খাজাঞ্চী, "প্রাগা"-রেস্তোরাঁর হেড-খানসামা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিটার বা এই জাতীয় যে-কোনো নিতান্ত সাধারণ মানুষ। পরনের কালো সোয়ালো-টেল কোট বারকয়েক ইস্ত্রী ক'রে নিয়েছে। ওয়েস্ট কোটটা সাদা পিকের। সার্টে কড়কড়ে মাড়, কলারটা ফেটে-ফেটে গেছে। বেশ বোঝা যায় সেখানটা কাঁচি দিযে দিয়ে ছেঁটেছে। পাত্রের পর পাত্র জুব্রাভকা-ভদকা পান করত করতে বলে :

'আমরা সবাই খ্রীষ্টের কাছ থেকে এসেছি। সকলের জন্যে ওই একই পথ। সবাই তো আমরা চাই জীবন এমন সমৃদ্ধ আর শান্তিময় হোক যা খ্রীষ্টও চেয়েছিলেন. '

'একজন কবি,' ক্লিম বলে ওঠে. 'মানে, ঠিক কবি নয়, ডীকন...'

'একজন ডীকন ? ও!' মিত্রোফানভ যেন বুঝে নেয়। 'তারপর ?'

'খ্রীষ্টকে বলেছিল :

"যখন তোমাতে মোদের দ্বেষ, তখনো ভাল না বেসে পারি না;
ঘৃণা-দ্বেষের মাঝেও মোরা তোমার সেবক ছাড়া কিছু না।"

হাতের ভদ্কার পাত্র ঠোঁট-সমান উঁচু ক'রে মিত্রোফানভ জিজ্ঞেস করে : 'কি বললেন?' কথাগুলো ক্লিম আরেকবার বলতেই, মদের পাত্রও বিনা চুমুকেই টেবিলে নামিয়ে ভুরু দুটো কোঁচকায়, যেন গভীর চিন্তায় ডুব দিচ্ছে।

'হতে পারে সত্যি কথা, কিন্তু যেন কেমন—নতুন-নতুন,' বিমর্ষ গলায় ভারভারা বলে।

'একজন ডীকন বললেন না?' মিত্রোফানভ্ প্রশ্ন করে : 'লোকটা কি পাঁড়-মাতাল? মদ খেলেই তো এমন কথা বলা যায়।' বিশদভাবে ওদের বোঝায়। এক চুমুকে ভদকা নিঃশেষ ক'রে বলে : 'বাস্, বাস্, ভারভারা কিরিল্লোভনা। আর নয়। আর খেলে স্রেফ মাতাল হয়ে পড়ব!'

আবার বলে :

'ঘৃণা বা বিদ্বেষ আমি মানি না। ঘৃণা করবার মতো কেউ-ই নেই, কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, দু'-এক ঘন্টার জন্যে বিরক্ত হওয়া যেতে পারে—সেটা খুবই সম্ভব। কিন্তু ঘৃণা করবেন, কিসের জন্যে? কাকে? সবাই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলে। কাজেই সব পথই উচ্চাভিমুখী। আমার বাবা মাকে লাঠিপেটা করতো।

কিন্তু আমি কক্ষণো কোন মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলিনি। সময়ে সময়ে অবশ্য, আমার মনে হয়েছে, মারাই বোধহয় উচিত ছিল।'

'এটা বোধহয় উচ্চাভিমুখী হচ্ছে না। বরং নীচের দিকেই নামছে যেন!' ভারভারা জিজ্ঞাসার সুরে বলে। তাই শুনে সামঘিনও ঠাট্টা করে ওঠে:

'তুমি কি চাও, আমি তোমাকে মারি?'

হাসতে হাসতে মিত্রোফানভ বলে: 'সে-রকম কল্পনাও অসম্ভব।'

ডানে-বাঁয়ে দুবার মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ে: 'বুঝলেন, আমি একটু মাতাল হয়েছি! নেশা হলেই আমি আবার ভদ্রস্থ থাকি না।'

এবারে হেসে ওঠে। অট্টহাসি। ততখানি জোর দিয়েই বলে: 'আমি নেশা করেছি। কি আশ্চর্য কাঁদছিও। হায় ভগবান! কাঁদছি আর কাঁদছি। কিন্তু কেন? শুধু শয়তানই বলতে পারে, কেন! আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আতিথেয়তা আর দয়ার জন্য...'

লোকটা চলে যাবার পর ভারভারা বলে ওঠে: 'চমৎকার লোক।'

ভোর হয়েছে। ধূসর আকাশে ফিকে নীলের ছোপ ছোপ। তার একটা দিয়ে এখনো একটি তারা জ্বল জ্বল ক'রে উঁকি দিচ্ছে।

ভারভারার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে ক্লিম বলে:

'জনতার একজন। সেটাই ওর প্রকৃত বিশেষণ। জনতা থেকে এসেছে। ঠিক তাই। কিন্তু আমিও বোধহয় একটু বেসামাল হয়েছি।'

ভারভারাকে চেয়ার থেকে তুলে জড়িয়ে ধরে। চুমু খায়। ওর গায়ে লেপ্টে থেকে ভারভারা মৃদুস্বরে বলে:

'না-গো! আমাকে এখন ছুঁয়ো না।'

ধীরে ধীরে বাহুবন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে হাত দুটো মাথার দু'টো পাশে রাখে, অভিনয়ের ঢঙে।

'মাথা ধরেছে?'

'ন'—। কিন্তু,—ক্লিম গো, কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না,' চোখ নামিয়ে ভারভারা ফিসফিস ক'রে বলে, 'সৌন্দর্যকে বোঝাই দুষ্কর—কি অপরূপ দৃশ্য, তাই না? আর, তারপরে আমরা কি করলাম? না, বসে বসে একটা শুওরছানা খেলাম আর খ্রীষ্টের সম্বন্ধে আলোচনা করলাম—'

'কি হয়েছে গো তোমার?' সামঘিন কোমল হয়ে ওঠে কিন্তু একটু বিরক্তও।

'বোকার মতো কথা, আমি জানি। কিন্তু জান তো, এতে লোকে সামান্য আহতও বোধ করে, তাই না?' জিজ্ঞাসা-মুখে ওর পানে চেয়ে থাকে। ক্লিমের মনে হয় ভারভারা বোধহয় এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে।

'খুব বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সেই জন্যেই এ-রকম লাগছে।'

'হবে। শুয়ে পড়িগে,' বলেই দ্রুতপায়ে নিজের ঘরে যায়। দরজার ল্যাচ্ দু'বার শব্দ ক'রে উঠল।

ক্লিম ভাবে: 'ক্লান্ত হযে পড়েছে ও। অবসন্নও।' মনে মনে খুশীও হয়ে ওঠে, ঠিক সময়টিতে চলে গেছে, মেজাজ বিগড়ে দেবার আগে। 'দিন দিন ছোট্ট হচ্ছে, বোকাটেও।'

টেবিলের ধারে গিয়ে এক গেলাস পোর্ট খায়। হাত দু'টো পেছনে মুষ্টিবদ্ধ। জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের পানে তাকায়। সাদা তারাটা নীল আকাশে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। বাড়ির গেটে বাতিটাও। স্মৃতির মধ্যে কথাগুলো তোলপাড় করতে থাকে: "মৃতের মধ্যে থেকে খ্রীষ্ট জাগ্রত হয়েছেন..."

ক্লিম সামঘিন চারপাশটা দেখে নিয়ে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে:

' 'মৃত্যুকে মৃত্যু দ্বারা পরাজিত করেছেন......''

পাশে দাঁড়ানো কাউকে যেন জিজ্ঞাসা করছে, এমনি ভঙ্গীতে ফিসফিস সুরে গভীর গলায় প্রশ্ন করে : 'নাকি "পরাজিত করছেন?"'

তারপর আবার নরম গলায় সুরেলা আবৃত্তি করে :

'..."মৃত্যুকে মৃত্যু দ্বারা পরাজিত করেছেন"'

আবার চারপাশ দেখে। চুপচাপ শোনে রাস্তায় আর বাড়িতে শুধুই নৈঃশব্দ্য।

'কি অদ্ভুত ব্যাপার, আমি গান করছি। কিন্তু আমি তো এখন সুস্থ নই। বেসামাল। ঠিক কথা,' জোরে জোরে নিজেকে বোঝায় : 'একটু বেসামাল হয়েছি কি-না, তাই গান গাইছি।'

আরো জোরে গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে—গম্ভীর কণ্ঠে গির্জায় যেমনটি হয়। ভারভারাও বেরিয়ে আসুক সাদা পোশাক পরে। ওদের যেন বিয়ে হবে।

'কান্ডটা যদিও বোকার মতো তবুও বোধগম্য! মাতাল হলে মিত্রোফানভ কাঁদে, আর আমি গান গাই,' নিজেকে ক্ষমা করে। লজ্জিতও হ'য়ে ওঠে। যাতে চোখের জল না গড়ায় তাই চোখদুটো শক্ত ক'রে বুজে রাখে। চোখ বন্ধ করেই হাতড়ে হাতড়ে বসে পড়ে শব্দ যেন না হয়। এখন আর ইচ্ছে হচ্ছেনা ভারভারা আসুক। বরঞ্চ ভয় হয় যদি এসে পড়ে। এত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখের পাতার নীচ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল গড়ায়। রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলো মুছে ফে'লে ভাবে : কোথাও কোন গলদ হ'য়েছে—। আমার জীবনে যেমন হওয়া উচিত তা'তো নয়।'

আকাশের তারাটি ইতিমধ্যে অদৃশ্য হ'য়েছে। কিন্তু বাতিটা নিষ্প্রভ হলেও এখনো জ্বলছে। সামান্য আভায় ওপাশের বাড়ির জানালা, মসলিনের পর্দা আর পেছনের ফুলের ছায়াগুলো প্রকট হ'য়ে উঠছে।



রাতের কথা মনে ক'রে সামঘিন মুখ টিপে হাসে। বোধহয় উচ্ছ্বাসে অধীর হ'য়ে পড়েছিল, জীবনকে শাপ-শাপান্ত করেছিল। কিন্তু কই জীবন তো তেমন খারাপ হ'য়ে ওঠেনি। ভারভারা প্রতীকীদের কবিতা আর গদ্য প্রাণপণে পড়ছে। চারধারে শিল্পকলার ইতিহাসের বই জড়ো ক'রে স্তূপ করেছে। 'সালোঁ'-র গৃহকর্ত্রী হবার জন্যে নিজেকে তৈরি করছে। সে-কথা বুঝে সামঘিন কিঞ্চিৎ উপদেশ দেয় :

'দেখ, সম্ভব হ'লে সবকিছু জেনে নেবে। খুবই প্রয়োজনীয় সেটা। কিন্তু কক্ষণো যেন কোনো জিনিসে ডুবে যেও না।—"সব আসে সব যায়, কিন্তু পৃথিবী থা'কে চিরতরে"– অবশ্য এখন পৃথিবী সম্বন্ধেও কথাটা খাটে না।'

শনিবার-শনিবার সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ছোটখাটো আসর বসাবার কথা তুলেছিল ভারভারা, কিন্তু ক্লিম বলে :

'প্রত্যেক শনিবার রাতে নিয়ম ক'রে অপরিচিত লোকের ভীড় ভাল লাগবে? না আমার তো মনে হয় এক্ষুণি এ-সব করা সমীচীন হবে না।'

কথাটা নিয়ে তর্ক হলো বটে, কিন্তু ভারভারার যুক্তিতে প্রত্যয় ছিল না। ওকে খেপিয়ে তুলতে সামঘিনের মজা লাগে। তবু সামঘিন না চাইলেও পরিচিতের সংখ্যা দিন দিন আশ্চর্য রকম বেড়ে চলল। অনায়াসেই, অজস্র ধারায়। বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে খবর সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি যেন মানুষের ভয়ানক বেড়ে গেছে।

কৌতূহলের যন্ত্রণা সইতে না পেরে সংবাদ চাতকেরা উৎকণ্ঠায় অধীর হ'য়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে জিজ্ঞেস করে :

'হ্যাঁ, মশাই, জানেন নাকি?...এ্যাঁ শুনেছেন?...কি মনে হয়?'

সামঘিনকেও এরকম বহু প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়।

সবাই সবাইকে বলে রাশিয়া খুব দ্রুত ধনী হ'য়ে উঠছে। বণিকসম্প্রদায়ের যে ছবি অস্ত্রোভস্কি এ'কেছিল তা' আর এখন নেই। মস্কোতে তো তাদের আর দেখা যায় না। বরঞ্চ এখন যে নতুন শিল্পপতি-সম্প্রদায় গড়ে উঠছে তাদের সংস্কৃতি শিল্পকলা বা রাজনীতিতে একটুও অনীহা নেই। সামঘিন ভাবে এতো পরম পরিতৃপ্তির কথা, আনন্দে ঘোষণা করবার মত কথা। অন্যের সাফল্যে যেটুকু ঈর্ষাবোধ হয় মানুষের, না হয় সেটুকু রইল; কিন্তু তা'তো নয়। এমনভাবে বলা হচ্ছে যেন এক মহা-অপরাধ। সানন্দে যা ঘোষণা করা হয় তা'হচ্ছে হয় ছাত্র-আন্দোলন, শ্রমিক-ধর্মঘট, নয়তো গ্রামগুলোর নিঃস্বতা বা সরকারী কর্মচারীদের অন্তঃসার-শূন্যতার কথা। সামঘিন কিন্তু নির্বিকার। মনে মনে তাতিয়ানা গোঘিনার সঙ্গে ও একমত। একবার এক উত্তেজিত আলোচনাসভায় তাতিয়ানা চে'চিয়ে উঠে বলেছিল :

'আমার মতে আমরা সবাই আলসে, বখাটে আর—জনবিক্ষোভের শিকার। এই আমাদের আদত চেহারা!'

'ঠিক কথা', ও ত'কে উত্তরে বলেছিল : 'আসলে কি জান, এই সব লোক যেন জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন। নিজেদের নিয়ে কি যে করবে তাই জানে না। আর এরাই তোমার ওই তথাকথিত জনবিক্ষোভ সৃষ্টি করে। কোথায়? না, বুদ্ধিজীবীদের আস্তানার চার দেওয়ালের মধ্যে, মস্কোর সীমা-সরহদ্দের ভেতরে। কিন্তু সীমানার বাইরে সারাক্ষণ বয়ে চলে সরল লোকের পরিশ্রমী জীবনের অনাবিল ধারা...'

ওঃ, তা'লে আপনি তো, মনে হচ্ছে,—' তাতিয়ানা বাধা দিয়ে ব'লে উঠেছিল। সামান্য একটুক্ষণ পর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে অব্যক্ত কথাটাকে প্রাঞ্জল করেছিল : 'ঠিক যে কি তা' কেউ জানে না!'

মেয়েটি যদিও ঔদ্ধত্যে পাকা নয়, তবুও সবাইকে দুর্বিনীত কথা শোনাতে ওস্তাদ।

মিত্রোফানভও আসে। ব'সে ব'সে পাঁচ-ছয় গেলাস চা খায়। চরম ঔদাসীন্যে রুটি খায়, বিস্কুট খায়, যা কিছু ভক্ষণযোগ্য তাই-ই খায়। এ-বাসায় শান্তি নিয়ে আসে।

'কি হলো? চাকরি পেলেন?' ভারভারা হয়তো জিজ্ঞেস করে।

'নাঃ', মিত্রোফানভের জবাবে লেশমাত্র দুঃখ বা বিরক্তি নেই। 'এখানে কারো পক্ষে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। জোরজার ক'রে তো আর কোথাও ঢুকে পড়া যায় না। এখানকার লোকগুলো যেন মৌমাছি। ভন্‌ভন্‌ করছে ঘুষের জন্যে। হয়তো মোটে দশ কোপেক, তাই-ই সই, দিতেই হবে। লোভের জিভ লক্‌লক্‌ করে।'

দলা-করা রুমাল দিয়ে ভিজে ঠোঁট মোছে। দার্শনিক ঢঙে আওড়ায় :

'আর কেনই বা লোভী হবে, বলুন তো? একশ' বছর তো আর কারু পরমায়ু নয়। সবায়ের জন্যে তো যথেষ্ট রয়েছে। নাঃ, মস্কো বড্ড লোভী। সাইবেরিয়ান, উক্রেইনিয়ান বা অন্য জাতেরা মস্কোকে যে দেখতে পারে না, তার কারণ আছে বই কি। হ্যাঁ, তাতারদের যদি দেখেন—একটা জাত বটে! তাদের সঙ্গে বাস করাও সুখ। তাতাররা খুব শান্ত। তার কোরাণে নিষেধ আছে, ঘুষ নিতে পারবে না, কাউকে ঠেলতে-ঠুসতে পারবে না। একজন ভদ্দরলোক, বুঝলেন, তাকে প্রায় অধ্যাপকই বলতে পারেন, আমার কাছে এসে অভিযোগ করল দনস্কয় দিমিত্রি আর

অনেরা মিলে যে তাতারদের জোয়াল সরিয়ে দিয়েছে তার কোনোই দরকার ছিল না। কেন না, তার মতে, তাতাররা যেমন শান্ত তেমনি সৎ, একটুও লোভী নয়। তাদের কাছ থেকে তো আমরা অনেক কিছুই পাচ্ছিলাম। কিন্তু মহারাজ পিটার তখন কি করলেন, না. কোত্থেকে একগাদা জার্মান আর ইহুদী আমদানী করলেন—লোকে তো এ-ও বলে যে তাঁর নাকি একজন ইহুদী মন্ত্রী ছিল। আর এই এই সব লোকই তো মস্কোওয়ালাদের লোভের জিভ বাড়াচ্ছে।'

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ক্লিম সামঘিনের জীবন প্রশান্তছন্দে ব'য়ে চলেছে।... কিন্তু অতি অকস্মাৎ তার দু'কূল পড়ল ভেঙে।

॥ ১৬ ॥

ভাঙনের শ্রুর্ হলো চার্লস অমোঁতের বিখ্যাত রঙ্গালয়ে। লোকটির আদর্শ "প্রতিটি রাজধানীকে পারী হ'তে হবে।" এর সঙ্গে আবার জ্বড়ে দিয়েছে, "প্রাণে আনন্দ না থাকলে সে তো মান্ষই না। জীবনের ভিয়েনে তার রসের পাক হয়নি।"

র্শদের "জীবনের কড়া-পাক" শেখানোর জন্যে অমোঁত মস্কোতে এক অতি উত্তপ্ত উন্ন বসালো। সোঁদা সোঁদা র্শদের লজ্জার লেশহীনা স্ন্দরীরমনী দেখিয়ে সেই উন্নে পরিপাটি ক'রে ভেজে নেয়।

অমোঁতের আলয়ে ঢ্কলে প্রথমেই দর্শকদের মনে হয় যেন সত্যি-সত্যিই কোন উন্নের ভেতরে ঢ্কে পড়েছে। চারপাশে উজ্জ্বল আলোর ছটা। সমস্ত জায়গাটা ঘিরে উত্তাপের প্রাচুর্য। অসংখ্য আয়নায় আলোগ্লো হাজার বার প্রতিফলিত হয়। আকাঙ্ক্ষিত ম্র্তিরা যেখানে অধিষ্ঠিত হবেন সেই বেদীর চারপাশটা আগ্নের মতো জ্বলে। দেয়ালে দেয়ালে সোনালী গিল্টীর গ'লে-যাওয়া মোম চক্‌চক্ করে। ওপরের ব্যালকনি থেকে দেখলে জ্বলন্ত উন্নের কথাটা আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে। সেখানে থেকে দর্শকের বিস্ফারিত দ্ষ্টি দেখতে পায় কবরাকৃতি এক দীর্ঘ গহ্বর;—চারপাশ আর গভীরতাতেও নানা বর্ণোজ্জ্বল আলোর সমারোহ। প্র্ষ-দের টাক মাথায় আলো পিছলে রক্তরাঙার আভা স্ষ্টি করে। মহিলাদের নিরাবরণ-কাঁধ ও পিঠ যেন মাখনের মতো গলে গলে পড়ে। নগ্ন হতেও নগ্নিকা—আলোক-দীপ্তা বহ্বর্ণা অভিনেত্রীদের দেখে প্রশংসায় করতালির ঝড় ওঠে। মঞ্চের ওপর বাজনার চিৎকার হয়, গর্জন ওঠে, ভেসে আসে বহ্জাতীয় নারীর তীক্ষ্ম কণ্ঠের গান, আর ফ্টে ওঠে তাদেব আলোড়িত লাস্য ন্ত্যের নানা ছন্দ।

সামঘিনেরা অমোঁতের রঙ্গালয়ে গেল আলেনার 'প্রথম-রজনী' দেখতে। সবে সে বিদেশ ঘ্রে এসেছে। পারী ও ভিয়েনায় আত্মপ্রকাশের পর নাম হয়েছে—বহ্ব্যয়-সাধ্যা ও দ্রুতসঞ্চারিণী মহিলা হিসেবে খ্যাতিও ছড়িয়েছে। নামডাকের ম্লে প্র্ব-কাহিনীর নানা গল্প। নীতির ধ্বজাবাহকেরা তো তাইতে রেগে আগ্ন। বিদেশে যাবার আগেও আলেনার জীবন ছিল কলরবে ম্খর। 'হৃদয় গিলে খাওয়া'-য় যথেষ্ট নাম হ'য়েছিল। মফঃস্বলে তার অপেরেট্টা কম্পানী যেখানে যেখানে গেছে, সেই সব শহর দ্টো আত্মহত্যার প্রচেষ্টা আর উচ্ছৃংখল বড়লোকদের বহ্ বেলেল্লাপনার স্মৃতিতে বিজড়িত। সামঘিনের মনে পড়ে, মা একবার লিখেছিল সম্পাদকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে রবিনসন নাকি 'আমাদের এলাকা' পত্রিকা ছেড়ে গিয়েছিল শ্ধ্ এই কারণে যে তার 'কুষ্ঠরোগী সম্পর্কে' নামক একটা প্রবন্ধ ছাপাতে সম্পাদক রাজী হননি।—'অতি জঘন্য প্রবন্ধ। এর একজায়গায় এক হতভাগ্য র্গী আলেনাকে বলেছে "সাইলোম অক্ষর", "নিরাময়ের অব্যর্থ প্রলেপ," এবং ঈশ্বর জানেন আরো কত কি।'

অমোঁতের রঙ্গমঞ্চে আলেনা এল একেবারে শেষে। সীনটা কিছ্ আহা-মরি গোছের নয়। পর্দা উঠতেই 'গোটা মস্কো'-র চোখের সামনে ভেসে উঠল একজন অভিনেত্রীর স্সজ্জিত ড্রেসিংর্ম। স্টেজের মাঝখানে ঝক্‌ঝক্ ত্রিশিরা আয়নার সম্ম্খে আলেনা দাঁড়িয়ে। দর্শকদের দিকে পেছন ফেরা। ক্লোকের মতো চওড়া

ড্রেসিং গাউন পরে আছে। গুন্‌গুন্‌ ক'রে গান গাইতে গাইতে চুল বাঁধছে। যেন মেক-আপ করছে। হঠাৎ কাঁধ থেকে একটানে ক্লোক ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ফেনার মতো লেসের সমুদ্রে ভেসে ওঠে তার অনাবৃত দেহ। সারামুখে ঢিলেঢালা হাসির ভাব ফুটিয়ে স্টেজের সামনে দিয়ে দু'তিনবার অলসচরণে চলাফেরা করে। লর্নিয়েত্‌ আর অপেরা-কাঁচের মধ্যে দিয়ে দর্শকরা তাকে নিঃশব্দে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। প্রেক্ষাগৃহের নিস্তব্ধতায় ওঠে বেহালা আর সেলোর গোঙানি, ক্লারিয়নেতের গোঁ-গোঁ, আব বাঁশীর শিস। ঢিমে তালের লান্নার ওয়ালজের সকাম মূর্চ্ছনা রগ্‌রগে আলোয় ভরা হলঘর ডুবিয়ে দেয়। শুধু ডোবে না আলেনার মৃদুগলায় কোমল ফরাসী গান।

মেয়েটি অভিনয়ে পটু। নিজের ঘরে একান্তে ব'সে সাজ করছে এমনি ভাব ফুটিয়ে তোলে। দর্শকদেব যেন দেখতেই পায়নি, অনুভবও করেনি। প্রেক্ষাগৃহের দিকে এমন চোখে তাকায় যেন কোন্‌ শূন্যের দিকে চেয়ে আছে, অথবা বহুদূরে দিগন্তের পানেই যেন ওর দৃষ্টি। স্বপ্নচারিণীর বিহ্বল ভঙ্গী। বড় বড় নরম চোখের চাউনিতে অশোভন বেশবাস সত্ত্বেও ও যেন প্রায় পবিত্রই হ'য়ে উঠেছে।... দু'হাতে তালি বাজাল, দু'জন দাসী এল ছুটে। একজনের চুলের রঙ গোধূলির মতো কিন্তু পোশাক লাল, আরেকজনের চুল লাল কিন্তু পোশাক নীল। সুচারু হাতে তারা ওকে গাউন পরালে, একটা খুলে আবেকটা। তিনবার গাউন বদল হলো।...অর্কেস্ট্রা থেকে ওঠে বিদ্বেষের বাষ্প আর প্রশংসার গুঞ্জন। যবনিকা পরতেই দর্শকেরা রেখেঢেকে হাততালি দেয়। এই দৃশ্য যে নেহাৎই ভূমিকা, তা যেন সকলেরই জানা।

এবার পর্দা উঠতেই ওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যের শুরু। রানীর মতো দৃপ্ত ভঙ্গীতে আলেনা পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ায়। পরনে অতি-সূক্ষ্ম সাদা পোশাক। প্রতিটি দেহ রেখা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বাদামী চুলে লালগোলাপ গোঁজা, কোমরেও লালগোলাপ। গান গাইতে আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে নিতম্ব দোলে, মঞ্চের বিভিন্ন স্থান থেকে ঘুরে ঘুরে ও নাচে। রসালো ফরাসী শাঁসোঁ-গানেব বিশেষ বিশেষ ছত্রে রমনীয় অঙ্গভঙ্গীর ঝোঁক। বাহুদুটো যখন ওপরে তোলে চওড়া স্লীভ পাখার মতো পত্‌পত্‌ ক'রে নড়ে। মনে হয় যেন শুভ্র ডানামেলা এক মূর্তি। ওর সুন্দর মুখের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মূর্তিটা বেমান্নান। কোমল চোখের নরম দীপ্তির সঙ্গে সরল উচ্চারণের বেহায়া কথাগুলো যেন মানায় না।

কোনো এক কাস্টম্‌স্‌-অফিসার ওকে খানাতল্লাসী করছে, এই হলো গানটার বিষয়বস্তু।

'থামুন! খুব হয়েছে!' হাসতে হাসতে আদেশের সুরে ব'লে ওঠে নায়িকা। অদৃশ্য অফিসাবের বেয়াদপ স্পর্শ থেকে যেন নিজেকে বাঁচাচ্ছে। বিস্ময়ে-অপমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে, ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাসও ফেলছে। এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টায় দেহ তোলপাড় ক'রে নাচছে, উল্লসিত সঙ্গীতের স্মরাতুর ধ্বনির তালে তালে সামঘিনের মনে হয় দেহের ছন্দ এর চেয়ে একটু সংযত হলেই বরং আরো নির্লজ্জ হ'যে উঠত।

কেঁপে দুলে ক্ষ'য়ে দেহটা যদিও অদৃশ্য হাতের স্থূল আদরের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, তবুও সুকুমাব মুখের উদ্ধত হাসিটুকু মেলায় না। চোখের ঝিল-মিলে তারায় দুঃশাসন আর বিদ্রূপ। যে অদৃশ্য হাত আলেনাকে এতক্ষণ ধ'বে ছুটোছুটি করায়, সেই হাতই যেন গান বন্ধ হবার সাথে সাথে ওর অপূর্ব-অভিনয়ের সপ্রশংস শত-শত হাত হ'য়ে ওঠে। এক অলীক হাত কত জীবন্ত বাস্তব হাত হয়।

পাগলের মতো হাততালি দেয়। লোভে লক্‌লক্‌ ক'রে ওর দিকে এগিয়ে আসে, ওকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলতে যেন ভারী আগ্রহ, বসন-আবরণ খুলে ছিঁড়ে দূরে ক'রে দিতে উদ্যত! ওর চোখের তারা সংকীর্ণ হয়। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটে। জ্বলজ্বলে মানুষগুলোর দিকে বিজয়িনীর দৃষ্টি হানে, আর তাদের দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়।

'হ্যাঁ, এই হচ্ছে পারী!' সার্মাঘিনের পেছনে সহর্ষ মন্তব্য। স্বরে রসিক জনের মেজাজ। আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস জবাব দিল :

'ইস! কী ডগমগে মেয়ে!'

সার্মাঘিন প্রশংসার করতালি দেয়নি, ওর বিশ্রী ঠেকেছে। বিরতির সময়ে দরজা ঠেলে পুরুষদের লাউঞ্জে ঢুকতেই তুরোবোয়েভের সংগে দেখা। আয়নায় তার সম্পূর্ণ চেহারাটা প্রতিফলিত হ'য়ে আছে। চলে যেতেই চাইছিল কিন্তু তার আগে তুরোবোয়েভ্‌ না-ঘুরেই আয়নার মধ্যে হেসে উঠেছে।

'তুমি এখানে, আশ্চর্য!'

চুলে ব্রাশ করতে করতে শুধু হাতটা সার্মাঘিনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মুখে ধরা ইম্পীরিয়ালে। বারকয়েক মোচড় দিয়ে খবর-বার্তা শুধায়। ওয়াশ-স্ট্যাণ্ডের দিকে তাক্‌ ক'রে ব্রাশটা ছোঁড়ে। কিন্তু সেটা পেতলের একটা অ্যাশ-ট্রেকে উল্টিয়ে পড়ে গিয়ে শক্ত-সমর্থ হলুদ-মুখ-একজন লোকের পায়ে। লোকটা তুরোবোয়েভের দিকে তাকায়। কিন্তু তুরোবোয়েভ নিরুত্তর। লোকটা গজগজ ক'রে বলে :

'এ'সব সময়ে লোকে অন্ততঃ ক্ষমা চায়।'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন, কেউ কেউ না চেয়েও থাকে।' তুরোবোয়েভ কাটা কাটা কথায় শুনিয়ে দেয়। কেঠো হাসি হেসে ক্লিমকে আপাদমস্তক দেখে নেয়।

'তারপর? তাড়ির আড্ডা কেমন লাগছে?

কোন কথা না বলে ক্লিম শুধু কাঁধ ঝাঁকায়। তুরোবোয়েভের কথা কিন্তু শেষ হয়নি :

'এমন অসভ্য-প্রতিষ্ঠান আমি আর দু'টো দেখিনি। লোকগুলো তো তার ওপরেও এককাঠি—গা গুলিয়ে ওঠে। মনে হচ্ছে এদের বেছে বেছে নেওয়া হয়েছে, তাই না? আচ্ছা চলি, বিদায়।'

সার্মাঘিনের দিকে আর একবার হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে দাঁতের মধ্যে দিয়েই বলে : 'বুঝলে, এখন বোধহয় রাভাচল্‌কে বোঝা শুরু হচ্ছে। তাই না?'

রাগে রি-রি ক'রে ওঠে সার্মাঘিন। তুরোবোয়েভটা মহা হতচ্ছাড়া, মনে হলো মনের মধ্যে কি যেন একটা আছড়ে উঠল। তারই ধাক্কায় মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা শুকনো কাটা কাটা কথা :

'কোন তৃতীয় জন উপস্থিত থাকলে বোধহয় বলতে না এ-কথা।'

'কেন নয়?' তুরোবোয়েভ ভুরু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। বাঁকা হাসিটা মিলিয়ে গেছে। মুখের ওপর ফুটে উঠেছে কালো ছায়া। 'নিশ্চয়ই, একশ' বার বলতাম। আমি সব সময়ে যা-ভাবি তাই-ই বলি।'

'সব সময়েই? সত্যি?' বিড়বিড় ক'রে ওঠে সার্মাঘিন। আয়নার মধ্যে ওর ভ্রূ-কুঞ্চন স্পষ্ট দেখা যায়।

'তোমার মেজাজটা বেশ তেড়িয়া, না?' তুরোবোয়েভের প্রশ্ন। কোনমতে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বেরিয়ে যায়। সার্মাঘিন চশমা খোলে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে কাঁচ দুটো মোছে। সামনে এখানো সেই লোকটার সুদৃশ্য চেহারা ভেসে থাকে। নরমসরম গড়নের ফ্যাশন্‌-বাবু। যেন অবোধ্ধাদের কাছে আদর্শ কেতা-বাজ। তার চোখের দৃষ্টিতে ছিল কি ঘৃণা আর করুণা!

'ব্যাটা পাজীর পা-ঝাড়া,' সামঘিন আক্রোশে গর্জায় : 'রাস্কেল! মেয়েটাকে বেশ্যা বানিয়ে এখন এসেছে বাহবা দিতে। হারিয়ে দাঁড়িয়ে কাশ্যপ-গোত্র, টাকা-পয়সা উড়িয়ে হিংসার চোটে এখন প্রগতিবাদী হয়েছেন।'

লোকটার ওপর ঝাল ঝাড়তে গিয়ে একসময় ভাসা-ভাসা মনে হয় আক্রোশের পরিমাণটা হয়তো খুব বেশী হ'য়ে যাচ্ছে। তবুও আক্রোশ আরো বেড়ে ওঠে। মনটায় একরাশ তীব্র ধোঁয়া পাক খায়। ভারভারার কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে মনে পড়ে যায় সেই অভিজাত যুবকটির কথা। একজন নৈরাজ্যবাদীকে সমর্থন করা যেতে পারে ভেবে ভদ্রলোক তার সন্ধ্যেটা বিষাক্ত ক'রে তুলেছিল। কথাটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে আর চোখ দুটো লোকের ভীড়ে-বোঝাই প্রেক্ষাগৃহে বারবার তুরো-বোয়েভকে খুঁজে ফেরে।

স্টেজের ওপর সাদা ডানার মূর্তিটা আবার গান গায়। মুখরোচক ভঙ্গী করে। উত্তেজনা জোগায়। দর্শকদের মধ্যে মাঝে মাঝে রসালো হাসি ফুটে ওঠে, গুঞ্জন ওঠে। ভারভারা গলা লম্বা ক'রে সামনে ঝুঁকে বসে আছে। চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখে সামঘিন বলে :

'মেয়েদের তো উচিত এর প্রতিবাদ করা।'

'কেন?' ভারভারা ঘুম ঘুম স্বরে জিজ্ঞেস করে।

'কেননা, এতে লাম্পট্যের প্রশস্তি গাওয়া হচ্ছে।'

'তবে তো পুরুষদেরও প্রতিবাদ করা উচিত—' ভারভারা বলে। গলার স্বর তেমনি শান্ত, তেমনি ঘুম-বিজড়িত। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে : 'কি সুন্দর সুঠাম তনু! কী অপূর্ব ক্ষমতা—মেয়েটা আশ্চর্য!'

'প্রতিভাহীন।'

'সৌন্দর্য কি প্রতিভা নয়?'

সামঘিনের জিভের আগায় একটা কড়া উত্তর এসেছিল। কিন্তু চুপ ক'রে গেল।

প্রেক্ষাগৃহে তুরোবোয়েভকে পাওয়া গেল না। কিন্তু সামঘিনের মনে হলো একটা চেয়ারে যেন লিউতভের মতো মুখ দেখতে পেল, তেমনি অদ্ভুত, আর তেমনি ভেঙচি-কাটা। দর্শকদের দেখতে দেখতে ওর গায়ে জ্বালা বাড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরোবোয়েভের কথা মানতে বাধ্য হয়। এই রসের মন্দিরে যারাই পুজো দিতে আসে তারা সবাই বিশেষ এক বেছে-নেওয়া অংশের সবচেয়ে পাজীর দল। পুরুষদের বেশীর ভাগ নাদুস্-নুদুস্ আর টাক-মাথা। মেয়েদের বয়স বেশী। দেখানোর প্রচেষ্টায় অনাবরণ দেহ একটু বেশী মাত্রাতেই। খোলা-খোলা পিঠ, কাঁধ আর হাতের ছড়াছড়ি। লাল্‌চে আর হল্‌দে চামড়া। বুকগুলো সীটের রেলিঙে ভর দিয়ে পাশে-রাখা চকোলেটের বাক্স আর ফুলের তোড়ার সঙ্গে একসঙ্গে আছে। তাদের নগ্নতায় যেন ভিখারীর অহঙ্কার,—বিকলাঙ্গ দেখিয়ে ভিখারীরা যেমন দয়া চায় ঠিক তেমনি। আয়নায় আয়নায় প্রতিফলিত হ'য়ে থোলো থোলো মাংসপিণ্ডের স্তূপের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে। ঝল্‌মলে আলোয় তারা যেন গলে গলে পড়ছে। আলোও তো কাঁচের সাদা চমকানিতে হাজার গুণ হ'য়ে আছে।

ডানা-পরা মেয়ে তখন হতাশ সুরে গান ধরেছে। দেহ নাচাচ্ছে লোভনীয় ভঙ্গীমায়। পুরুষের কাম-লালসা জাগিয়ে তুলছে। স্পষ্টই বোঝা যায়; মেয়েরাও উত্তেজিত হ'য়ে উঠছে। কাঁধ নাড়াচ্ছে। পিঠের নীচ দিয়ে যেন যৌন-অনুভূতির ঢেউ নামছে। বোঝা মুস্কিল এই সব বাপ মায়ের দল ছাত্রদের সমস্যা সম্বন্ধে, রাশিয়ার সমস্যা সম্বন্ধে কি ভাবছে,—অবশ্য যদি এ-সব সম্বন্ধে তাদের কোন ভাবনার বালাই থেকে থাকে। ছাত্রদের আপাত-সমস্যা সরকার বাধ্য ক'রে তাদেরকে

সৈন্যদলে নাম লেখাচ্ছে, আর রাশিয়ার সমস্যা বিপ্লবী মেজাজের লোক দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এই দেশের ইতিহাসেই তো এক রাজকুমারের কোন অধস্তন পুরুষ সন্ত্রাসবাদীর বোমাকে সমর্থন করেছিলেন।

কথাটা ভাবতে ভাবতে এক সময় সামঘিনের মনে হয় উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে কড়া কড়া কথা বলে। মনের মধ্যে কল্পনার ছবিও ভাসে, ওর দিকে বহুলোক ভয় আর হতবুদ্ধির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বোঝে, যত শক্তিশালীই হোক ওর কণ্ঠস্বর, এখানে এদের আদিম কলরবই সব ছাপিয়ে উঠবে, হাততালিতে কানে তালা লাগবে।

'এই বিকৃত-মানুষের ভীড়টায় হোস্-পাইপ্ ছেড়ে দিলে বেশ হয়,' জোরেই বলে ওঠে। পাশে দাঁড়িয়ে ভারভারা কিন্তু মৃদুস্বরে বলল :

'দেখ, কেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—ঠিক যেমন এরমেলোভার বেলায় হয়। দেখ, দেখ! ওকে ঠিক হাঁসের মতো দেখাচ্ছে...'

'চলে এস!'



বাইরের রাস্তায় জোর তুষার পড়ছে। মানুষ, ঘোড়া—সব তুষারে ঢেকে গেছে। ভারভারার টুপী সাদা হ'য়ে ওঠে, কাঁধেও। সামঘিনের চশমার ওপরে প'ড়ে ওকে অন্ধ ক'রে তোলে। পথ চলতে চলতে কে একজন পথচারি অভদ্রভাবে ধাক্কা দেয়।

'মাপ করবেন,—ওঃ তুমি!'

লিউতভের গায়ে বোতাম-খোলা-কোট, টুপীটা মাথার পেছনে ঠেলে দেওয়া। সামঘিনকে দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধ'রে কানে কানে বলে :

'একজন মন্ত্রীকে গুলী ক'রে মেরেছে—বোগোলপভ্‌কে—হ্যাঁ, সত্যি।'

গলা উঁচু ক'রে আবার বলে : 'চল, একসঙ্গে সাপারে বসা যাক। প্রাইভেট কামরা নিয়ে নেব। গালগল্প করা যাবে হে।...য়্যাই ইয়েগর!'

হাত নাড়াতেই যেন ভেল্কিবাজির মতো তুষার ঠেলে বেরুল ঘোড়াবাঁধা স্লেজ। সামঘিনকে সেদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে চুপি চুপি বলে :

'কারপভিচ—লোকটার নাম— ইয়েগর, তেসতভের ওখানে চলো! ভারভারা কিরিল্লোভনা, আমার এদিকে বসো।'

ভারভারাকে যেন চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে এমন ভাব। সামঘিন হাত দিয়ে লিউতভের কোমর আঁট ক'রে পেঁচিয়ে নিয়েছে যাতে স্লেজ থেকে না গড়িয়ে পড়ে। কোনো সাড়াশব্দ নেই ওর। খোলা রাস্তায় পোঁছে, কোচোয়ান গলা বেঁকিয়ে নীচু সুরে জিজ্ঞেস করে :

'ভ্লাদিমির ভাসিলিয়েভিচ্, পুলিশ বলছিল ছাত্রেরা নাকি একজন মন্ত্রীকে খুন করেছে?'

ক্লিমের কোমরে কনুয়ের গুঁতো মেরে লিউতভ চট্‌পট্ জবাব দেয় : 'এঁ্যা, তাই নাকি? কোন্ মন্ত্রী?'

'ওদেরকে যে শাসন করতো সে-ই বোধ হয়।'

'কেন?'

'ভগবান জানেন।'

'হুঁ!—তা' তোমার কি মনে হয়?'

'ওরা সবাই তো লড়ুয়ে। ছাত্রই বলো আর মজুরই বলো, সব সময়ে ওদের ঝগড়া লড়াই...'

'লোকটা কি বুড়ো হ'য়েছিল?' ভারভারা শুধোয়।

বেশ খোশ মেজাজে লিউতভ চড়া গলায় ব'লে ওঠে; 'না, বিশেষ বুড়ো নয়।'

রেস্তোঁরার প্রাইভেট কামরায় ঢুকে হাত ঘষে নেয়। আনন্দে বলে : 'স্তেরলিয়াদ স্যুপ আর পাই।' বুড়ো ওয়েটারকে ডেকে বলে : 'কেমন, মাকারি পেত্রোভ, এই হলো গো অর্ডার। বাদ বাকী এর সংগে মিলিয়ে নিয়ে আসবে। বুঝলে? যাও, এখন চট্‌পট্ করো তো।'

ওয়েটার চলে যেতে-না-যেতেই লিউতভ ক্লিমের কাঁধে এক চাপড় মারে। ফিস্-ফিস্ ক'রে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে। মাঝে মাঝেই মুখ ভেঙ্‌চিয়ে ওঠে। চোখ দুটো এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে নেয় :

'বুঝলে, নারোদনিকেরা এবার তোমাদের মার্ক্সিস্টদের নিয়েছে এক হাত। হাঃ হাঃ! নিশ্চিন্তে থাকতে পার, ছোকরারা এখন ওদের কথায় মাতবে। এ আমি লিখে দিচ্ছি তোমাকে। একজন মিনিস্টারকে আজ গুলী ক'রে মারলে, সেটাই তো আর সব শেষ নয়। কাল আর একটা মন্ত্রী বানিয়ে নেবে। যেমন ক'রে মর্দভিনরা নতুন মূর্তি বানায়। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, চিন্তার কথা, যে ছেলেছোকরারা এখন গিয়ে তাদেরি অনুসরণ করবে যারা কথা একেবারেই বলে না কিন্তু কাজ করে। হ্যাঁ, এই ব'লে দিলাম।'

'যদি বিপ্লব-আন্দোলন আবার সন্ত্রাসবাদের পথ ধরে...' সামঘিন গম্ভীর গলায় বলে, কিন্তু লিউতভ থামিয়ে দেয় :

'যদি কি? এর মধ্যেই ধরে ফেলেছে। সরলরেখাই তো সব চেয়ে সোজা রাস্তা...'

'কু-ডাক গাইবার কাক ওড়ে সে-রাস্তায়, ভুলো না...'

'কে, যেটা সোজা পথে ওড়ে আর বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে? ওহে বন্ধু, লড়াই করা সহজ, অপেক্ষা করা কঠিন।'

'কথাগুলো কিন্তু বেশ জোরে-জোরে হ'য়ে যাচ্ছে,' ভারভারা সাবধান ক'রে দেয়। চিন্তান্বিত হ'য়ে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে।

মন্ত্রীহত্যার ব্যাপারটা সামঘিনকে হক্‌চকিয়ে দিয়েছে। ঠিক জানে ব্যাপারটার এখানেই শেষ নয়, জীবন আরো ঘোরালো হ'য়ে উঠবে। লিউতভের সংগে কিভাবে এ-নিয়ে আলোচনা করবে, বুঝতে পারছে না। লিউতভের অস্বাভাবিক উত্তেজনা ওকে রাগিয়ে তোলে। বড্ড বেশী কৃত্রিম, প্রায় হতাশাতেই ভরা। গলায় অদ্ভুত তিরস্কারের সুরটাও ভাল ঠেকল না।

'তবে কি ওর টাকাতেই ষড়যন্ত্র হয়েছে?' সামঘিন ভাবে।

নিজেকে সংযত করবার আগেই গলা দিয়ে বিড়বিড় সুরে বেরিয়ে পড়ল :

'এমনভাবে বলছো যেন তোমার ব্যক্তিগত কিছু লাভ হয়েছে!'

যেমনি বলা, লিউতভ ভারভারাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে, কোনো ক্ষমা না চেয়েই, ছুটে সামঘিনের দিকে ঝুঁকে কি বলার জন্যে মুখ খোলে। কিন্তু সংগে সংগে ঠোঁটের ভংগীতে বোঝা যায় যা বলতে চেয়েছিল তা' আর বলা হলো না। অন্য কথায় চলে যায়।

'আমি হলাম আমার দেশের নাগরিক। কাজেই এখানে যা ঘটে ত'তেই...' ট্রেতে ক'রে খাবারের প্লেট নিয়ে ওয়েটার ঢোকে। সামঘিনের দিকে চোখ টিপে লিউতভ কথা চেপে গিয়ে ব'লে ওঠে :

'কোচোয়ানটা--কেমন আশ্চর্য, না, যেন কোনো খরগোশের কথা বলছিল!...

আয়ে, বসো, বসো ভারভারা কিরিল্লোভনা, বসো।'

ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ওরা খাবার গিললো, ভদকা পান করল। লিউতভ অনর্গল কথা ব'লে যায়। যখন থেকে ব্যক্তিগত লাভের কথাটা উচ্চারণ ক'রে ফেলেছে তখন থেকেই সামঘিনের মনটা খচখচ করছে। ভারভারা খায়, অ-জ্ঞিদের খাওয়া। যখনই লিউতভ কথা বলে, ভারভারা চট্ ক'রে কাঁধ সরিয়ে নেয়। ওর ভয়, কখন বা ধাক্কা খায়। ক্লিমের মনে হলো ভারভারা যেন এখনো চার্লস অমোঁতের ঝক্‌ঝকে রঙ্গালয়ে বসে আছে।

'হ্যাঁ! তোমরা একদম হেরে গেলে,' লিউতভ বারবার একথা বলে। গলায় প্রায় ব্যঙ্গ।

'আমার মনে হয়, এখন যখন শ্রমিক-আন্দোলন গণবিক্ষোভ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,' সামঘিন শুরু করে। লিউতভ তার প্লেট এক পাশে ঠেলে দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে আমুদে ঢঙে বলে: 'ব্বাঃ! বেশ, বেশ—কি ক'রে বললে হে?

হঠাৎ ও হেসে ওঠে। দমকে-দমকে ফুলে-ফুলে-ওঠা হাসি। মুখটা বুড়ো-মানুষের মতো অজস্র কুঞ্চনে ভরে ওঠে। থর্ থর্ ক'রে সারা শরীর কাঁপে, হাতে হাত ঘষে। কতকগুলো বলিরেখার মধ্যে ওর চাপা পড়া চোখ দুটো সামঘিনকে মাছির মতো উত্যক্ত করে। হাসির চোট দেখে ভারভারা কাঁটা-চামচ নামিয়ে ফেলে। মাথা নীচু ক'রে তাড়াতাড়ি ঠোঁট মুছতে আরম্ভ করে, যেন ক্ষারে ঠোঁট পুড়িয়ে বসেছে। সামঘিনের মনে পড়ে গ্রামের বাড়িতে অলীক ক্যাটফিস ধরবার সময় ও ঠিক এমনি হাসিই হেসেছিল।

'কি হলো? হঠাৎ এত উল্লাস কেন?' চটেমটে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু একটু যে বিব্রতভাব না ছিল তা' নয়।

হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিতে নিতে লিউতভ বলে: 'ওঃ! ওঃ!...ওগো বন্ধু!' ভারভারার দিকে ঘুরে বলে: 'কি বলছিল? শ্রমিক আন্দোলন, না? তা' তোমার কি মত ভারভারা কিরিল্লোভনা? শ্রমিক-আন্দোলন থেকে ও কি চায়?

'রাজনীতি আমার ভালো লাগে না।' ভারভারা শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দেয়। ওষ্ঠের কোলে তুলে নেয় এক গেলাস মদ।

লিউতভ আবার হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে ওঠে। যদি কিছু অপ্রিয় ঘটে যায় সেই ভয়ে সামঘিন ইতস্ততঃ করে। বলতে গেলে হাসিটাই তো ওর পক্ষে এক বিরাট উপহাস।

'তোমাদের সমৃদ্ধি!' গেলাস উঁচিয়ে লিউতভ বলে। ঠাট্টার স্বরে যোগ করে: 'ওঃ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, শ্রমিক আন্দোলন তো বুদ্ধিজীবিদের সেই-অংশে প্রবল আশা নিয়ে এসেছে, যারা চায়--এই দেখ, কি চায় তাই যে ছাই জানি না। এই মিঃ জুবাতভের কথাটাই ধরা যাক না কেন। তিনিও তো বুদ্ধিজীবী। শ্রমিকরা প্রভুর সঙ্গে লড়াই করুক, সেটা খুব চান। কিন্তু জারকে ছোঁওয়া—উঁহু-হু, ওটি চলবে না। এর নাম রাজনীতি! এর নাম মার্ক্সিজম! বুদ্ধিজীবিদের ভবিষ্যত নেতা...'

অবাক বিস্ময়ে ভারভারা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। লিউতভ হঠাৎ মাতাল হ'য়ে পড়ে। তেরছা চোখদুখো সজীবতা হারায়। পেশীতে পেশীতে টান ধরে। কাঁটা তুলে ধরবার জন্যে আঙুলগুলো বৃথা চেষ্টা করে। ওর আকস্মিক নেশা হওয়াটাকে সামঘিন ভাল চোখে দেখে না। এই তো প্রথম নয়, কতবার এই লোকটার মাতাল বা গম্ভীর হওয়ার কসরৎ ও দেখেছে। তাছাড়া ওর মনে হয়, বেনেতী ফ্রককোট পরা এই লোকটার সঙ্গে ছাত্র লিউতভের কোনো মিল নেই, শুধু তেরছা চোখদুটো ছাড়া। এমনকি কথা বলার ধরন-ও পাল্টেছে। আগের মতো চার্চ-স্লাভনিক বাচনভঙ্গী আর নেই। কথায় কথায় উদ্ধৃতি দেবার অভ্যাসও না। এখন

যা বলে তা শুধু নিছক মস্কোয়ী বুলি। সব মিলে ক্লিমের মনে হয় লোকটা চালিয়াত হয়ে পড়ছে।

'হ্যাঁ' লিউতভ বলল : 'এখন পিস্তল এসেছে খেল দেখাতে। জামবুর্গে একসঙ্গে তিনজনের আত্মহত্যার কথাটা শুনেছ তো? একজন ছাত্র, একজন কলেজী মেয়ে, আর একজন অফিসার। বুঝলে, একজন অফিসার,' শেষ কথাটায় বেশ জোর দেয় : 'খবর পেয়েছি রোম্যান্স-টোমান্স নয়, রোম্যান্টিকবাদ। ক'দিন বাদে সিম্ফেরোপোলে, আরেকজন ছাত্র মাথায় বুলেট ঢুকিয়ে মরল। রাশিয়ার দুই প্রান্তের এই দুই ঘটনা...'

একটু নীচু গলায় বলে :

'আরেকজন ছাত্র, পোজ্নের, না পোর্জেন—বিদেশী, বুঝতেই তো পারছ,—হৃদয়ের সরলতায় ট্রেনের জানলা থেকে চেঁচিয়ে উঠেছিল : 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' জোর ক'রে তাকে আর্মিতে ঢোকানো হলো, ঢুকলও গিয়ে,—কথাটা শুনে রাখ! তা'হলে আমাদের গভর্নমেন্টের পণ্ডিতেরা তাঁদের বোধগম্য ভাষায় কথাটার কি মানে করলেন? 'আমরা একটি আহাম্মক সরকার', এই কথাটা যদি ওরা বারবার নিজেদের শোনায়, তবেই..'

ভারভারা উঠে দাঁড়ায়। তার দিকে চেয়ে, সামঘিন কৃতজ্ঞ হ'য়ে ওঠে :

'হ্যাঁ, উঠবার সময় হলো তো...'

'আমরা এক পাগ্লা দেশে বাস করছি,' লিউতফ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—যেন ওর বিদায়ী-মন্তব্য : 'মাথা খারাপের চরম...'

রাস্তায় এসে ওরা দু'জনে যেই একলা হ'লো, ভারভারা ফস্ ক'রে বলে :

'হায় ভগবান! কি মানুষ! মাথা ধরিয়ে দিলে। অভদ্রের একশেষ! কি যে হাসি! কি ক'রে সহ্য কর গো? কেন বলে দাওনা ও'কে, সহজ ভাষায়?'

সামঘিন নীরব হ'য়ে থাকে। পাছে মুখ খুললে ব্যাখ্যানটা দশগুণ হ'য়ে পড়ে। বাড়ি ফিরে ভারভারা আবার লিউতভকে নিয়ে পড়ে :

'বুঝতে পারলাম না, মন্ত্রী নিহত হওয়ায় ও খুশী হয়েছে, না, ভয় পেয়েছে।'

বুঝতে পারাটা নিশ্চয়ই এমন কিছু জরুরী ছিল না, কেন না সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা আবার বলে ওঠে : 'লোকে বলে, ও নাকি আলেনার পেছনে প্রচুর টাকা ঢালছে।'

'খুবই সম্ভব।' সামঘিন বিড়বিড় ক'রে ওঠে। মনটা আত্ম-চিন্তায় বিক্ষুব্ধ। কাজেই বউকে বিছানায় ঢুকে পড়তে দেখে বেশ খুশী হ'য়ে ওঠে। ভারভারা দু'একবার নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে বলে : 'আঃ! আলেনা কি অসম্ভব সুন্দরী!'—তারপরেই সব চুপচাপ।



, পার্কের ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে সামঘিনের তুলনা করা চলে। রাস্তা থেকে দ্রুত-পায়ে লোক হঠাৎ হঠাৎ এসে ওর আলোর-বৃত্তের মধ্যে প'ড়ে একটু বিস্ময়-ধ্বনি ক'রে ওঠে—আর তারপরই কোথায় যায় মিলিয়ে। ল্যাম্প-পোস্টের মনে যেটুকু ছাপ রেখে যায় সেটা শুধুই ওদের তুচ্ছতার। কোন নতুন-কথা বা চমৎকার বার্তা নিয়ে সামঘিনের কাছে কেউ আসে না। জীবনে প্রত্যক্ষ ক'রে দেখা বা বইয়ের মধ্যে পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করা নানান পুরানো কথা নিয়ে লোকে আসে। মন্ত্রী-

নিধনের কথাটাই শুধু অপ্রত্যাশিত ও দুর্বোধ্য। কাজটা অবশ্য সমর্থন করে না কিন্তু এ-সম্বন্ধে কি বলা যায়; সেটাও বুঝে উঠতে পারছে না।

রেস্তোরাঁতে যাবার পথে মনে হয়েছিল লুবাশা তিন হপ্তা হলো সেণ্টপীতর্স-বুর্গে গেছে। এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে, কোথাও দয়া দেখাতে গিয়ে এই হত্যা কাণ্ডটার সঙ্গে সেতো আবার জড়িয়ে পড়েনি? যারা তার মতো সদয় তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। এরা এক রহস্যময় সংজ্ঞা, সাধারণের পর্যায়ে পড়ে খুব কমই। এদের ইচ্ছা শক্তি নিঃসন্দেহে দুর্বল। কখনোই মিত্রোফানভের মতো, যারা সদয়ও নয়, ,আবার ঈর্ষা-পরায়ণও নয়—তেমনি সাধারণ মানুষ হতে পারে না। আহা মিত্রোফানভও যদি এ-সময় থাকতো। কিন্তু তা'তো হবার নয়, কিছুদিন হ'লো চাকরি পেয়ে সে মফঃস্বলে চলে গেছে। মিশাকাকা হাসপাতালে। জেলে থাকবার সময়ে বাতে ধরেছিল, এখন তাই সারাচ্ছে। লুবাশা আর মিশাকাকা, ভাড়াটে হিসেবে দু'জনেই অনভিপ্রেত। আশ্চর্য. ভারভারা কিছুতেই কথাটা বোঝে না। অথচ, সাধারণভাবে ও মানুষ চিনতে পারে ভাল।

সমভা'র ওপরে ভারভারার ব্যবহার একটানা নয়। কখনো ভালোবাসে, দেখা-শোনা করে, বন্দীদের জন্যে সেলাই-ফোঁড়াই করতে সাহায্য করে, রাজনৈতিক 'রেড্ ক্রশে'র জন্য অদম্য-উৎসাহে উপহার জোগার করে, আবার কখনো একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস ক'রে বসে :

'লুবাশা, তুমি কি সারা জীবন সেবা ধর্ম নিয়েই কাটাবে?' এরকম মন্তব্য করবার পর থেকে কিন্তু মেয়েটাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ওদের মাথামাখিইবা কেন, গরমিলই বা কেন, সে-সম্বন্ধে সামঘিনের বিন্দু মাত্র উৎসাহ নেই। তবু একদিন ও ভারভারাকে জিজ্ঞাসা করল : 'সমভাকে কেমন লাগে?'

ভারভারা তক্ষুণি জবাব দেয়, যেন উত্তরটা মনে মনে বহুদিন তৈরি ক'রে রেখেছে :

খাঁটি রুশ মেয়ে। দয়ামায়া আছে। জীবনে সুখ না থাকলেও যার চলে যায়'।

আর একবার কিন্তু ও বলেছিল :

'কখনো, কখনো মনে হয় কি জানো, ও যদি লেখাপড়া না জানত, জনসেবায় সক্রিয় না হ'য়ে উঠত, তবে বোধহয় হৃদয়ের দয়ামায়ার চাপে ও কামুক মেয়েই হয়ে উঠত। এমন কি গণিকা হ'লেও হতে পারত। আর তখন ও বসে বসে ভাবোচ্ছ্বাসে ঠাসা কবিতা লিখত, যেমন ধরো ·

"ওগো মা-মণি, মোর মা-মণি—
কত ভালোবাসা আদরের খনি;
কন্যে তোমার, রূপ-ডালি নিয়ে তার
চোখ জুড়িয়ে দাঁড়াল বারম্বার :
তারপর, মা, সেই ভীষণ ক্ষণে
শারদ-কৃষ্ণ রাত গহনে,
কন্যে তোমার, আমি হতভাগিনী
এলেম চলে প্রিয়-গরবিনী,
প্রিয়ের সাথে ..."

গম্ভীর স্বরে করুণ ক'রে কবিতটার আবৃত্তি শেষ ক'রে ভারভারা জিজ্ঞেস করে :

'আচ্ছা. এই ধরনের গানগুলো বা ধরো ওই 'মারুসিয়ার বিষপান' এগুলো তো কসবীদেরই রচনা না?'

'এ সম্বন্ধে আমি বিলকুল অজ্ঞ', সামঘিন জবাব দেয়। আবার সেণ্টপীতর্স-বুর্গের হত্যা-কাণ্ডের কথা ভাবে। আচ্ছা, এটা কি? কোন ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার ফল,

না নারোদনিকদের অবশেষে 'কথা থেকে কাজে' যাত্রার শুরু? সন্ত্রাসবাদনীতির দিক থেকে আপাতত্তের তো বটেই, বাস্তব উপযোগীতাও তার খুব কম। বিশ বছর আগেই তো তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করা গেছে। তাছাড়া একজন মন্ত্রীকে হত্যা করলে তো দেশ শুদ্ধ সব বিচক্ষণলোক এদেরই বিরুদ্ধে যাবে। মনে মনে চিন্তা করতে করতে সামঘিন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে যখন 'বস'-এর স্টাডিতে গিয়ে হাজির হলো, তখন ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে ওকে জিজ্ঞেস করে :

'আরে, পড়েছ নাকি? বোগোলোপভ্‌কে এক নির্বোধ ছোকরা একেবারে সাবাড় ক'রে দিয়েছে তো? নাও না, ঢেলে নাও।'

কফিতে মনোনিবেশ ক'রে তবেই সামঘিন নীরবতা রক্ষা করতে পারে। 'বস্'-তো এ্যাদ্দিন রাজনীতির কোন আলোচনাই ওর সঙ্গে করেনি। সামঘিন জানত, রাজনীতিতে ভদ্রলোকের রুচি নেই, উদারপন্থী উকিলদের তিনি এড়িয়ে এড়িয়েই চলেন। কিন্তু এখন ভদ্রলোক ওকে বলে :

'একথা মানতেই হবে হেরডের মতো তরুণদের এই রকম পাইকারী হত্যাকান্ড করলে তার এই তো স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ছাত্রদের বাধ্য ক'রে সৈন্যে ঢোকানো যে রকম প্রথম নিকোলাস করেছিলেন...'

ভদ্রলোকের বয়স বছর পঞ্চাশেক। চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। মাথাটা ভারী, ঘন ধূসর চুলে ভরা। ভুরুও ধূসর আর ঘন। মেয়েদের মতো উজ্জ্বল ঠোঁট। ভুরু ও ঠোঁটের ওঠা-নামায় মুখটা কখনো সৌম্যসুন্দর হয়ে ওঠে, আবার কখনো বা সন্দেহে ভরা। পরিষ্কার কামানো মুখের সৌন্দর্য ওরা অনেক বাড়িয়ে তুলেছে। অভিনেতার মতো দেখায়, যেন নায়কের ভূমিকা করছে। চোয়ালের ওপর অজস্র সরু-সরু লাল শিরার জাল। চোখের নীচে পাতা দু'টো সামান্য ঝুঁকে পড়ায় চোখ দু'টো যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়েছে। বড় বড় মাছের মতো চোখে অস্পষ্টতার চিহ্ন। মাথাটা সামান্য এগিয়ে ষাঁড়ের মতো পথ চলে। গম্ভীর চালে ঈষৎ স্থূল উদর বয়ে বেড়ায়। বাঁ-হাতটা সবসময় ঘড়ির চেনের ছোট ছোট রিং নাড়াচাড়া করে। ডান হাত অভ্যস্ত ভঙ্গীতে শূন্যে ওঠানামা করে; চওড়া তালু বাতাসে এমন ক'রে ভাসে, দেখে মনে পড়ে জলের মধ্যে ছোট-ছোট পোনামাছের কথা। বাহু দু'টো শরীর আন্দাজে লম্বা, হাত অহেতুক চওড়া। কাজের মানুষ বলে খ্যাতি আছে। কখনো-কখনো স্প্রেল্‌না বা ইয়ারে গিয়ে হৈ-হল্লা ক'রে আসে। বছরে একবার ক'রে পারী যাওয়া চাই। বহুদিন হলো বৌকে ত্যাগ করেছে। এখানে মস্ত এক উত্তাপহীন বাসায় বাস করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দিনেও বাসাটা সব সময় ধুলো-ধুলো অন্ধকার। চুরুটের কড়া গন্ধ আর শুকনো খসখসে গন্ধ বাতাসকে ভারী ক'রে তোলে। গন্ধটা তার ভীষণদর্শন স্টাডিতে আরো বেশী উগ্র। সেখানকার দু'টো বইয়ের আলমারী যেন মোটা-মোটা বইয়ের জগতের দিকে খুলে রাখা জানলা। আসল জানালাগুলো কিন্তু খোলে এক বন্ধ প্রাঙ্গণের দিকে; গাছপালার মধ্যে দিয়ে দূরে একটা ছোট গির্জাও দেখা যায়। ভদ্রলোক কবিতা আবৃত্তি ভালবাসে। প্রায়ই নাদ্‌সনের একটা লাইন আওড়ায়; 'আমাদের এই কালে, অপরিচিতদের বয়স বাড়ে।' গলেনিস্‌চেভ-কুতুজভের নৈরাশ্যবাদী গীতিকবিতার ওপর ভীষণ আকর্ষণ। কিছুদিন আগে সামঘিনকে বলেছিল :

'আমি এক নিঃসঙ্গ মানুষ, বন্ধু; জীবনের অভিনয় আমার হয়ে গেছে।'

আজ চুরুটটাকে সঙ্গীত-পরিচালকের দণ্ডের মতো ক'রে দোলাতে দোলাতে বলে :

'আমাদের মতো অভিজ্ঞ জনকর্মীরা...'

গলার স্বর চুরুটের বাঁকা-বাঁকা ধ'োয়ার সংগে যেন তাল রেখে চলে।

'আমাদের কারখানাটার গলন-কটাহ এখনো বড্ড ছোট। বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যদি রুশ কৃষকেরা এ'তে গলে প্রলিটারিয়টে রূপান্তরিত হয়, রাজ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়—তোমাদের কালটা যে বাঁচার ইচ্ছার ভরপুর হ'য়ে প্রতিক্রিয়ার নিয়মের সংগে সরাসরি যুঝতে চাইছে, সে-ই তো স্বাভাবিক...'

অনেকক্ষণ ধ'রে কথা বলে, যতক্ষণ না চুরুট শেষ হয়। সামঘিনের মনে হয় ভদ্রলোক বোধহয় কোনো একটা জিনিস ওকে স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে চাইছে, কিন্তু সে-টা যে কি তা' আর বুঝে উঠতে পারে না।

প্রবীন ব্যক্তিটির সংগে গাড়ী ক'রে ও কোর্টে গেল। উকীল আর সরকারী কর্মচারীরা হত্যার ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করছে যেন অতিসাধারণ কোনো অপরাধ। শুধু আশার একটা কথাই স্পষ্ট হ'য়ে উঠল—প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ব্যাপারটা কোনো ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার ফল। একজন উকীল, নামটা তার বিচিত্র—ম্যাগনেট—চুম্বক—. সবসময়ই সোরগোল করছে। চুলগুলো খাড়া-খাড়া, দাঁতও বড়-বড়। তাকে দেখে সামঘিনের মনে হয় ইংরেজের অশোভন ব্যঙ্গ যেন। নির্লজ্জ ভঙ্গীতে সে চেঁচিয়ে উঠে বলে : 'ব্যক্তিবিশেষের প্রতিবাদ হিসাবে এর কোনো মানেই হয় না।'

ক'দিন পর সামঘিনের মনে হলো গোটা মস্কো শহরে একজন বিচক্ষণ লোকও যদি থাকে। কেননা এমন একজনকেও দেখা গেল না যে হত্যার ব্যাপারটায় ক্ষুব্ধ হ'য়েছে। ছাত্রেরা তো দলবে'ধে রাস্তায় চলেছে. যেন বিজয়ীর মিছিল। একমাত্র প্রেইসের বৈঠকেই ও কিছুটা উদ্বেগ দেখল। উত্তেজনায় হাত ঝাঁকিয়ে জিয়েভ চেঁচাচ্ছিল :

'এই কাঁটার খোঁচা শুধু প্রতিক্রিয়াশীল শুয়োরটাকে আরো রাগিয়ে তুলবে।'

রেদোজুবভের দিকে তাকিযে চিৎকার করে। চিরাচরিত ভঙ্গীতে সে তখন এক কোণায় চুপ্টি ক'রে ব'সে হাঁটুদুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে আছে। ঠোঁট আর ভুরু মাঝে-মাঝে কে'পে কে'পে উঠছে। কখনো কখনো গলা খ'কারি দিয়ে উঠছে। বেরেনদিয়ভও তাক আক্রমণ করে। এমনভাবে আঙুল উ'চায় যেন রেদোজুবভের কপালই ফ'ুড়ে দেবে। বলে :

'কথায় আছে, "যে ব্যক্তি তরবারি উঠায়..."'

'সেখানে একথাও আছে, "শান্তি নয় কিন্তু তরবারি ."' রেদোজুবভ ভয়-দেখানো গলায় সংগে সংগে জবাব দেয়।

'হতাশায় যার জন্ম, সেখানে কক্ষণো সুফল আসতে পারে না.' ভারাস্সভ জ্ঞানদান করে।

এমনকি প্রেইসের মতো কায়দাদুরুস্ত লোকও রেদোজুবভের সংগে এমন সুরে কথা বলে যেন কোনো বর্বরের সংগে আলোচনা করছে সে :

'বোঝেন না কেন, সন্ত্রাসবাদ হ'লো পুরোনো ব্যারামের টোট্কা চিকিৎসা? আমাদের দরকার নেতার, উচ্চ আত্মিক মূল্যের মানুষের, গাঁয়ের হাতুড়ে বদ্যি নয় ..'

গলা পরিষ্কার ক'রে রেদোজুবভ গম্ভীর কণ্ঠে বলে : 'ভবিষ্যত নেতাদের জোর ক'রে ব্যারাকে পোরা হচ্ছে। তার মানে কি, তা' নিশ্চয়ই বোঝেন, বোঝেন না? অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে তারা সৈন্যদেরও বিপ্লবী ক'রে তুলছে। অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, সরকার বাহাদুর গোটা দেশটাকে নৈরাস্যবাদের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এই কি আপনারা চান?'

সামঘিনের মনে হয় সেই গতানুগতিক তর্ক-বিতর্ক। যা একটু তফাৎ দেখা

যায়, তা'হচ্ছে অন্যায়ের হিংসাত্মক অ-প্রতিরোধের একজন পুরোনো ধ্বজাবাহক এবারে সন্ত্রাসবাদের রক্ষায় কোমর বেঁধেছে। হ'তে পারে এখানে যারা বাদ-বিবাদ করছে তারা সবাই বিচক্ষণ। তবু সামঘিনের মনে হয়, এদেরকে পেছনে ফেলে ও অনেক এগিয়ে গেছে। এরা তো এখনো কথার কচকচিতেই ডুবে আছে, কোথাও এগুচ্ছে না। জীবনের প্রশস্ত রাস্তার ফুটপাথেই দাঁড়িয়ে আছে, যদিও সে-জায়গাটাও আজকাল দিন দিন বিপজ্জনক হ'য়ে উঠছে।



দারুণ ঠাণ্ডা লাগিয়ে লুবাশা মস্কো ফিরল। চোখদুটো লাল টক্‌টক্‌ করছে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। হাঁচতে-হাঁচতে সামঘিনদের সেণ্টপীতর্সবুর্গের কাজান ক্যাথেড্রালে বিক্ষোভ-আন্দোলনের কাহিনী বলে,—কশাক আর পুলিশেরা কেমন ক'রে বিক্ষোভকারী আর পথচারিদের আক্রমণ করেছিল। উৎসাহে ফেটে প'ড়ে বলে :

'ভেবে দেখ! মাতাল বাক্সসগুলো যখন সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে এল, একজনও পালায়নি—একটি প্রাণীও না। তারাও পাল্টে লড়াই চালাল। কেমন ক'রে! ওঃ হো!' হাতদুটো জোরে-জোরে দোলাতে-দোলাতে বলে : 'কতরকম লোক দেখলাম : স্ত্রুভ, তুগান-বারানভস্কি, মিখাইলভ্স্কি, ইয়াকুবোভিচ...'

তেমনি উত্তেজনার সঙ্গে বলে সেণ্টপীতর্সবুর্গে বিশ্ববিদ্যালযের ছাত্রদের মধ্যে একটা বিশেষ দল হয়েছে যাদের আদর্শ : "বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের জন্যে, অতএব রাজনীতি দূর হোক।"

দাঁতে দাঁত চেপে সামঘিন প্রশ্ন করে : 'সেটা কি তোমার ভাল লাগল?'

'অদ্ভুত মনে করলেও করতে পার, কিন্তু কি জান, আমার একটুও খারাপ লাগল না.' যেন আশ্চর্য হ'য়েছে এমনভাবে লুবাশা জবাব দেয় : 'আজকাল সবই কেমন যেন বোধগম্য হ'য়ে উঠছে—কে কোথায় যায় বা কেন যায়, সবকিছুই।'

বোগোলোপভ সম্পর্কে ক্লিমের প্রশ্নের উত্তরে বলল :

'ও হ্যাঁ—, ওরা বলে কারপভিচের নাকি ফাঁসী হবে না, কঠোর সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত হবে। যেদিন ও গুলী করল, আমি সেদিন পুস্কোভে। যখন সেণ্টপীতর্স-বুর্গে ফিরে এলাম, তখন আর ও-প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ আলোচনাই করছে না।...আঃ, ক্লিম, সেণ্টপীতর্সবুর্গে ওরা যে কি ভাবে থাকে!'

যখন বন্ধুদের কথা উঠল, তখন ওর উত্তেজনা শেষ।

'লিদিয়া ধর্মের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করছে। বুঝিনা ব.পু. ও দিয়ে কি হবে। একা-একা থাকে নানের মতো, অপেরা আর কনসার্টে যায়।

লুবাশা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে, তারপর দুঃখের সুরে বলে :

'চিরদিনই তো ও কেমন দুর্জ্ঞেয়-গোছের, কিন্তু এখন একেবারেই যেন অবোধ্য। সবসময় এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো ঠিক ভাল লাগে না। এক মহিলা-কবিকে নিয়ে এখন ভাবাবিস্ট হ'য়ে আছে, সে নাকি দেবদূতের মতো সেজে দু'পাশে দু'টো ডানা লাগিয়ে সভায় এসে আবৃত্তি ক'রেছিল : "আমি চাই এমন সব বস্তু, যার অস্তিত্ব-ই নেই।" মাকারভেরও ভাব লেগেছে, তবে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। লিদিয়ার সঙ্গে তার সব সময়েই তর্ক-বিতর্ক, তবে কি নিয়ে যে তা'ঠিক জানি না। শুনলাম এখানে নাকি মাকারভ ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে চলে গেছে। প্রফেসরকে যখন

সাহায্য করছিল, তখন ভদ্রলোক নাকি এক রঙ্গিনীকে নিয়ে কি সব ঠাট্টামস্করা করছিলেন। আর যেমনি অপারেসন শেষ, অমনি মাকারভ তাঁকে গরম-গরম কথা শুনিয়ে, কাজ করবে না ব'লে চলে গেল।'

'আহা কি আমার বীরপুরুষ রে!' ভারভারা বিদ্রূপ ক'রে ওঠে।

'কাঠখোট্টা লোক!' ক্লিম সায় দিয়ে ওঠে। তারপর জিজ্ঞেস করে: 'ওদের তো প্রেম চলছে, না? মাকারভ আর লিদিয়া?'

'নাঃ!' লুবাশা আস্বস্ত করে। 'ওদের দুজনের কেউই প্রেমের যোগ্য না। ওরা তো ভয়ানক জ্ঞানী। কিন্তু হ্যাঁ, একটা বিয়ে হলো বটে ওখানে। লিদিয়া তো প্রেমিরভার ওখানে থাকে, তার একটা ভাই-ঝি আছে, না, মেরিনা? তার বিয়ে হলো গির্জা-উপচার বেচার এক দোকানীর সঙ্গে। বরকনের জোড় দেখে শিউরে উঠতে হয়—শোপেনহাওয়ারে যেমনটি আছে না, তেমনি-ই। কনের বেশ গড়নপেটন, সুন্দর দেখতে, নিখুঁত ভালকিরি, আর বর হলো ছোট্টখাট্টো, টাকমাথা, হলদেটে রঙের মানুষ, ভারাভকার মতো দাড়ি আছে। চোখদুটো সাধুসন্তর মতো আবার ওদিকে ওক গাছের মতো গা'য়ে শক্তি। বছর চল্লিশের হবে।'

'জান কুতুজভের সঙ্গে মেরিনার প্রেম চলেছিল?' হাসতে হাসতে সামঘিন বলে।

'যাঃ!' লুবাশা অবাক। কিন্তু যখন ক্লিম মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বলে, লুবাশা থেমে থেমে বলে: 'কী বোকা!'

ওর ক্ষুব্ধ হ'য়ে-ওঠা দেখে সামঘিনরা হেসে ফেলে।

'হাসছ কেন, বুঝি না।' একটু চটেই গেল যেন। 'গির্জার জন্য ধূপ-ধুনা-বেচা একটা মানুষকে বিয়ে করা যে কি—আঃ দূর হও, হাসছে কি দেখ না!' সামঘিনরা আরো জোরে হেসে উঠতে লুবাশা চেঁচিয়ে ওঠে।

কথা বলে বলে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল, লুবাশা নিজের ঘরে গেল ফিরে। ভারভারা একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইল। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে: 'ওর কাছে সবকিছুই সহজ।'

সামঘিন উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে তুরোবোয়েভের কথা মনে পড়ে: রুশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লোকে পড়াশুনা করে না। শুধু অনিয়ন্ত্রিত কর্মের কবিত্বতেই মোহিত হয়ে ওঠে।'

ভারভারা ফিক ক'রে হেসে ফেলে বলে, 'আমাদের রাঁধুনীর মতে ছাত্ররা বিদ্রোহ করে দুই কারণে—এক, খেতে না পেয়ে, আর দুই, প্রথম দলের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে। ও বলে, "আমি যদি মন্ত্রী হতাম তো সব্বাইকে সরকারী রেশনের ওপর রাখতাম—কি গরীব, কি বড়লোক। লোকের পাকস্থলী পূর্ণ থাকলে বিদ্রোহের কোনো কারণই থাকে না।" এই যুক্তির পেছনে ওর এত অদ্ভুত প্রমাণ আছে, বলে: "ভিখারীদের খাওয়ার কোনো অভাব নেই বলে ওরা কখনো বিদ্রোহ করে না।"

'ওটা তো পাঁড় মাতাল,' সামঘিন ওকে মনে করিয়ে দেয়। ঘরের এদিক থেকে ওদিক তখনো পায়চারি করছে। ভারভারা মৃদুকণ্ঠে বলে:

'কেমন যেন মনে হয়, না,—ভয় পাবার মতোই—একজন লোক সত্তর বছর ধরে বেঁচে আছে, কত কি দেখেছে, আর সারা জীবন ধরে মনের মধ্যে রাশ রাশ অদ্ভুত চিন্তা জড়ো করে গেছে, বা অর্থহীন কত উক্তি...'

'উক্তি কখনো অর্থহীন হয় না,' সামঘিন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যেন ঘোষণা ক'রে ওঠে। 'সংক্ষিপ্ত উক্তি দিয়ে ভাববার ধারাটা জনতার বৈশিষ্ট্য,' আরো হয়তো বলত কিন্তু আহত হয়ে চুপ ক'রে যায়, ওর বৌর ওর কথা মোটেও শুনছে না।

'ছাত্রদের ও ভয়ানক অপছন্দ করে—মানে আমাদের রাঁধুনী। যুক্তিতর্ক দিয়ে আমাকে বোঝাচ্ছিল যে তাদেরকে সাইবিরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান উচিত, আর্মিতে

জোর ক'রে ঢোকানো অনুচিত। বলছিল, সৈন্যদের মাথায় ওরা নানা গোলমাল পাকিয়ে তুলবে, যেমন, ঈশ্বরে বিশ্বাস ক'রো না বা জারের পরিবারের ওপর কোনো শ্রদ্ধা রেখ না, ইত্যাদি। ওদের মাথার মধ্যে যে কলরবের বোঝাটা আছে না, সেটাকে সবাই কিন্তু বুদ্ধি বলে ভুল করে।'

সিগারেটটা শেষ না ক'রেই নিভিয়ে দেয়। চেয়ার থেকে উঠে স্বামীর বাহু ধরে পায়ে পায়ে চলে।

'নাঃ। উক্তি দিয়ে দিয়ে ভাবা আমার পছন্দ না। একদম না। কিন্তু যদি একবারটিও আমাদের রাঁধুনী আর মিত্রোফানভের কথাবার্তা শুনতে।'

'হুঁ,' কিছু না-বলার মতো ক'রে ক্লিম বলে।

'ক্লিম, ওগো,' স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে বলতেই থাকে: 'জীবনকে তোমার অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?'

'শুধু মনে হচ্ছে এখন শোবার সময় হয়ে গেছে,' সামঘিন বলল : 'কাল আমার অনেক কাজ...'

এই প্রথম নয় যে সামঘিন স্ত্রীর আলাপ-আলোচনার ইচ্ছাটাকে জোর ক'রে দাবিয়ে দিল। ভারভারা কি বলতে চায় জানা নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে ঐ ধরনের কথাবার্তায় ফলাফল খুব সুখকর হবে না।

'জীবন আর ওই সব নিয়ে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে, কেমন?' ভারভারার মুখে বিষণ্ণতার ছাপ দেখে সামঘিন প্রতিশ্রুতি দেয়। তার কাঁধে মৃদু-মৃদু চাপড় দিয়ে বলে : 'জীবন সম্বন্ধে সাদা মনে আলোচনা করা উচিত, বুঝলে গো। লুবাশার কাছ থেকে খবর শুনে নিয়ে নয়। দেখলে তো স্ত্রুভ আর অন্যদের নিয়ে ও এমন-ভাবে আলোচনা করছিল যেন দেবদূতদের ওপর ওর খুব বিশ্বাস?'

'হ্যাঁ,' ভারভারা একটু হেসে বলে। কিন্তু দৃষ্টি গিয়ে পড়ে জানলার ওপরে। সেখানটায় জ্যোৎস্না পড়ে আলো হয়ে আছে।



তিন সপ্তাহ পরে, সামঘিন ডাক-ব্রিংস্কাতে গিয়ে বসল। দু'টো গাজর-রঙের ঝলমলে ঘোড়া যন্ত্রের মতো খুর ফেলে-ফেলে ছুটছে, যেন কষে-বাঁধা একজোড়া পুতুল। বসন্তকালের বন্যায় রাস্তা-খানা-খন্দ ভরে গেছে। চষা জমি দু'পাশে রেখে চলছে, মাঠে শীতের শস্য প্রায় নেই-ই। চত্বরের অনুর্বর প্রান্তরে শুধু বৃষ্টিধৌত সাদা সাদা নুড়িপাথর।

'এখানকার চাষের দফা শেষ করেছে ওই হারামী অ্যাগারিক-ছাতায়,' জমির দিকে চাবুক উঁচিয়ে সহিস ওকে বোঝায় : 'চেনেন না, অ্যাগারিক-ছাতা? ওই যে হল্‌দে হল্‌দে মাথা। অতি পাজী গাছ, বুঝলেন,' মুখ ঘুরিয়ে কাঁধের পেছন দিয়ে সওয়ারীকে একঝলক দেখে নেয়।

'এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমি বিদেশী।' সামঘিন মনে-মনে বলে।

দিনটা রবিবার। মাঠে লোকজন নেই। এখানে ওখানে হলদে ঠোঁটওয়ালা কাক গম্ভীরমুখে গট্‌মট্‌ ক'রে চলেছে। বহুদূরে মাঠের মধ্যে দু'একটা মানুষ অদৃশ্য পথ ধ'রে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলেছে, তাদেরকে এতদূর থেকে পাখীর মতোই দেখায়। আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ, যেন ভেড়ার লোমের কম্বল, তার মধ্যে দিয়ে মাঝেমাঝে অর্কদেব বহু ইতস্ততঃ ক'রে উঁকি দিচ্ছেন। ঝোপঝাড়ের নিষ্পত্র ডাল-

পালায় ছোট্ট-ছোট্ট মসলিনের চাদরের মতো ছায়া। অল্ডারগাছের ধূসরডালেও তারা এসেছে, সোঁদা মাটিতেও হামা দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে। দৃশ্যপটের বিশ্রী একঘেয়েমি। সামঘিন নড়্‌বড়্‌ করতে করতে চলে। ব্রিৎস্‌কার চালে ঢুলুনি আসে। দেহ এলিয়ে ব'সে ব'সে ঢোলে। ঝাঁকি দিয়ে সব চিন্তা বের ক'রে নেওয়া হয়েছে মন থেকে। বারবার মনে পড়ে যায় একজন লোকের কাছ থেকে শোনা এক গল্প,—একটা মানুষ নাকি জীবনের অর্থ খুঁজবার জন্যে কয়েকবার নিস্ফল চেষ্টা ক'রে অবশেষে বাসায় ফিরে দেখল সেখানে সবকিছুই আরো বেশী নিরর্থক। ক্লান্তিকর।... সামঘিনের ছোট ব্যাগটিও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, পায়ের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। কিন্তু সরিয়ে রাখতেও বড্ড আলসেমি।

লম্বা-লম্বা সীসে রঙের অল্ডারগাছের জঙ্গলে এসে ওরা ঢোকে। পচা ডোবা আর ভিজে পাতার টক-টক গন্ধ। ব্রিৎস্‌কার নীচে মট্‌মট্‌ ক'রে কি ভাঙল। গাড়ীটা পেছনে গড়িয়ে পড়ল, একধারে হেলে গেল। সামঘিন ধাক্কার চোটে ছিট্‌কে পড়ল গাড়ী থেকে। ঘোড়াদুটো সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। সামঘিন মাটিতে পড়েছিল চিৎ হ'য়ে, কাঁধ আর কনুইয়ের ওপর ধপাস্‌ ক'রে। তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে উঠে, রাগের চোটে চেঁচায় :

'ধেৎ তেরি...'

সহিস মাঝবয়সী একজন চাষী। রোগাটে শরীরে পাতলা-পাতলা ধূসররঙের ছোট দাড়ি। তাড়াতাড়ি তার বাক্স থেকে নেমে প'রে ব্রিৎস্‌কার তল পরীক্ষা ক'রে দেখে। হেসে হেসে বোঝায় :

'হুস্‌, শালা, চাকার নেমীটাই ভেঙ্গে দু'টুকরো। আমার দোষ নাই বাবু। লোহার পাতটা আর কত সহ্য করবে বলুন।'

যেমন পারিপার্শ্বিক তেমনই কোচোয়ান। দুই-ই সমান গম্ভীর, কথা বলায় অনিচ্ছুক। যাই হোক. বিষণ্ণতা একটু ঝেড়ে ফেলে কোচোয়ান মাথার ওপরে জেবড়া-জেবড়া টুপীটা ঠিক ক'রে নেয়। বেল্টটা টেনেটুনে সান্ত্বনার সুরে বলে

'হেঃ. এমন কাণ্ড কতই হয়। তারাস্‌সোভকা তো দেড় ভার্স্ট রাস্তা। ওখানে এক কামার আছে, একমিনিটও লাগবে না সারিয়ে দেবে। আপনি ধীরে ধীরে হাঁটেন।.. গীঃ, এই আমার হাঁসের বাচ্চারা,' ঘোড়াদুটোকে আদর ক'রে ডাকে, তাদের পিঠ চাপড়ে দেয়।

সীটের নীচ থেকে একটা কুড়াল নিয়ে এল। তিন কোপে একটা অল্ডারগাছ কেটে নামায়। ডালপালাগুলো ছেঁটে ফেলে আবার বলে ·

'ওখানে এক কামার আছে, ভাসিলি মিকিতিচ, একেবারে বিশ্বকর্মার বেটা। অমনটি আর কোথাও পাবেন না, মস্কোতেও না। তার মাথার মধ্যে বুদ্ধি গিজ্‌গিজ্‌ ক'রে...'

'আমি হেঁটে হেঁটে যাব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। দেখেশুনে চলে যান। ঠিক ধরে নিব আপনাকে।'

ঘোড়াগুলো চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে আছে, যেন ব্রোঞ্জে গড়া। তবুও তাদেরকেই ও বলে : 'এঃ-হে-হে, চুপ্‌ যাও না বেহঙ্গ মম!'

মাটি থেকে একটা ডাল কুড়িয়ে নেয় সামঘিন। হাঁটতে আরম্ভ করে। গাছের তল দিয়ে দিয়ে রাস্তাটা অনেক পাক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কখনো ছায়ার মধ্যে থেকে রোদ্দুরে পড়ছে, আবার কখনো রোদ থেকে ছায়ায়। চলতে চলতে মনে হয় ইস্কুল, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে চোদ্দ বছর ধ'রে পড়াশুনা করার পরও যদি এমনি ক্ষয়-হ'য়ে আসা রাস্তার ওপর দিয়ে বিশ্রী ব্রিৎস্‌কাতে বিশ্রীতর ঘোড়ার টানে আধা-জঙ্গলী কোচোয়ানের সঙ্গে চলতে হয় তো সে-পড়াশুনায় লাভ কী। কোটপকেটে তামার

পয়সা যেমন ঝন্‌ঝন্‌ করে, তেমনি ওর মাথার মধ্যে এল এক ছড়ার সুর-ঝঙ্কার। চলতে চলতে পায়ের তালে তাল রেখে মনে পড়ে :

'গ্রামগুলি বড্ড কৃপণ,
জমিন-আস্‌মান সব সেই মন...'

জোত্‌দার গ্রিগরভিচ, জুয়াড়ী নেক্লাসভ, জ্যাতভ্রাত্‌স্কি বা অন্যদের মনে সত্যিই কি এমন কোনো অনুভূতি জন্মেছিল যার নাম তাঁরা জনগণের প্রতি ভালোবাসা দিয়েছিলেন ?

আগাছার ঝোপ কমে কমে আসছে। রাস্তা থেকে স'রে তারা মাঠে গিয়ে পড়েছে, তারপর সেখানকার একটা খালের মধ্যে গিয়ে জমেছে। বহুদূরে, পাহাড়ের মাথায় একটা মিল্‌ দেখা যায়। দু'পাশের ছড়ান পাখা দিয়ে যেন সেটা পথ আট্‌কে আছে। সামঘিন ঘোড়াগুলোর জন্যে দাঁড়াল। ভিজে বাতাসে ডালপালার সর্‌সর্‌ শব্দ কান পেতে শোনে। একটা ভরত পাখীর গানও এসে জুটেছে সেই সর্‌সর্‌ ধ্বনির মধ্যে।.. ঘোড়াগুলো যখন এল, ক্লিম দেখে যে ব্রিৎস্‌কাতে ওর ব্যাগের ওপর রাখা আছে গাড়ীর কাদালাগা চাকাখানা।

'এ্যাঁ, বাক্সটার-গাযে লাগছে বুঝি ?' ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে কোচোয়ান জিজ্ঞেস করে। সামঘিনের তীব্র-আদেশে চাকাটাকে সীটের নীচে রেখে দিয়ে বলে : 'আর এসে পড়েছি, বুঝলেন।'

কিন্তু বড় ঝোপটা থেকে বেরিয়ে ওপরকার পুলে এসেছে কি না এসেছে, অমনি কোচোযান ঘোড়াদুটোর গা'ধ'রে তাদেরকে চোখের নিমেষে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ, যা ভেবেছি। দাঙ্গা বাধিয়েছে। শালা, হারামীর দল .'

চুপ্‌-চুপ্‌ ক'রে সামঘিনকে পরামর্শ দেয় :

'আপনি বরঞ্চ ঘন ঝোপটোপের আড়ালে দাঁড়ান। কে জানে ওরা আবার আপনাকে কি চোখে দেখবে ? কাণ্ডটা বেআইনী তো, সাক্ষী-ফাক্ষীর জায়গা নেই।'

ক্লিম ঘাবড়ে গিয়ে ওকে মেলাই প্রশ্ন করে। কোচোয়ানটা ধীরেসুস্থে জানায়, তারাস্‌সোভের চাষীদের বহুদিন থেকে কোনো দানাপানি নেই, এতদিন শিশু আর বুড়োদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে ভিক্ষে করাত।

'দানা নাই,--পেটে দিবার জনেও না, মাঠে বুনবার জন্যেও না। বীজ চেয়েছিল, পায়নি। মানা ক'রে দিয়েছে। কাজে কাজেই শস্য লুটবে ঠিক করল—মানে, ওই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক'রে। গেল বুধবারেই করত, কিন্তু সদর ইনস্পেকটার এসে ভয় ধরিয়ে দিলে যে। তাছাড়া ওটা কাজের দিন কি না, সবাইকে পাওয়াও যাবে না। কিন্তু আজ রোববার।'

ওর কথা শুনতে শুনতে সামঘিন লক্ষ্য ক'রে দেখল, মেয়ে-মরদ, ছেলে-বুড়োর মস্ত একটা দল গাঁ থেকে বেরিয়ে একটু দূরে যে শস্যের গুদামটা আছে, সেইদিকেই চলেছে। মোটেই সোরগোল করতে করতে যাচ্ছে না, তবুও ভীড়টা থেকে থমথমে গুঞ্জন উঠছে। দলটার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বেঁটেমতন বেশ চওড়া একজন কৃষক, তার কাঁধে দড়ির একটা মোটা গোছ।

'ওই তো কুবাশভ, স্টোভ-মিস্ত্রী। সব জিনিসেই ও সবাইয়ের ফাস্‌ট্‌। কামারগিরি, স্টোভ-মেরামতি, ছুতারগিরি--যে কোনো কাজই দেন না। ঠিক কারখানার লোকের মতো।... এরা সবাই আইনকে তুড়ি মেরে দেয়,' কোচোয়ান এমনসুরে বলে যেন আইনের জন্য তার দুঃখ হচ্ছে। 'কাণ্ডটায় আপনার কিন্তু দেরী হ'য়ে যাবে বাবু,' এক-পা থেকে আরেক-পায়ে ভর দিয়ে ব'লে ওঠে। ওর রোগাটে মুখে চাপা উদ্বেগ দেখা যায়। সেখান থেকে লিক্‌লিকে ঘাড়ের ওপর দর্‌দর্‌ ক'রে

গ্রাম ঝরে।

গাঁ থেকে ওরা প্রায় তিনশ' গজ দূরে দাঁড়িয়ে। একটা সরু নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বিন্দু বিন্দু কুটীর। নদীর দুটো পার জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। সামঘিন স্পষ্ট দেখতে পায় কি ঘটছে। অনুভব করতেও পারে, কিন্তু না বুঝেই। ওর মনে হলো ভীড়টা গম্ভীর পদক্ষেপেই যেন চলেছে, কোনো ধর্মীয় শোভাযাত্রার মতো। আইকন বা পতাকাবাহী মিছিলের চেয়েও এটা যেন অনেক বেশী জমাট। গোলমালের শব্দ ব'য়ে নিয়ে এসে হাওয়া সামঘিনের ওপর আছড়ে পড়ল, আলাদা আলাদা কণ্ঠস্বরও ও বুঝতে পারল। বহুকণ্ঠের মিলিত স্বর ছাপিয়ে তীক্ষ্ণ এক সুর সবায়ের ওপর উঠে চিৎকার করে :

'এরমাকভ! ভাইসব, দেখ, দেখ এরমাকভ পালাল!'

হঠাৎ একটা লোক ঝোপ ডিঙিয়ে রাস্তার ওপর এসে পড়ল। লোকটার পরনে লাল সার্ট, বেল্ট নেই, খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত প্যাণ্ট গোটানো। ভীড় থেকে এগিয়ে প্রাণপণে ছোটে, হাতদুটো আকাশের দিকে নাড়তে নাড়তে এমন ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে যেন প্রবল যন্ত্রনা হচ্ছে :

'যদি এরমাকভ পালায়, আমিও পালালাম!'

স্টোভ-মিস্ত্রী দড়িগাছ দিয়ে ওকে সপাং ক'রে মারে। লোকটা লাফ দিয়ে একটা উঠোনে গিয়ে পড়ে। নিরাপদ জায়গাটা থেকে পাগলের মতো চেঁচায় :

'নাঃ, করব না, আমি কিছুতেই করব না! কাজটা ভাল না!'

'এ্যাই, এরমাকভকে এখানে ধরে নিয়ে আয় তো!' স্টোভ-মিস্ত্রী হুকুম দেয়। কথাগুলো এত পরিষ্কার শুনতে পেল যে সামঘিনের মনে হয় লোকটা বোধহয় ওর পাশেই দাঁড়িয়ে।

'ওরা কি করতে চায়?' ক্লিম প্রশ্ন করে। চবুকের ডাণ্ডাটা দিয়ে কোচোয়ান কানের পাশ থেকে টুপীটা সরিয়ে দেয়, জোট পাকান দু'চার গোছা চুলে ঘস্‌ঘস্ ক'রে লাঠি দিয়ে চুলকোয়, বড় ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে বলে :

'কী আর করবে? গুদাম খুলতে চায় কিন্তু চাবি নাই। চাবির দরকারটাই বা কি—' কপালের ওপর হাত দিয়ে সূর্য আড়াল ক'রে গাঁটাকে ভাল ক'রে দেখে। তারপর বলে : 'চাবি খুলতে একটা হাতই মাত্র লাগত। এখানে তো সবাইকে হাত লাগাতে হবে, ছেলেগুলাও বাদ যাবে না। আপনারা তো তা'হলে শাস্তি দেবেন না—বাচ্চাগুলোকে?' সামঘিনের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে। কোনো কথা না ব'লে সামঘিন ওদিকটাতে চেয়ে থাকে। দেখতে পায় দু'জন চাষী একটা লোককে দু'হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে আসছে। লোকটার গায়ের সুতীসার্টটার এত ঝুল যে হাঁটুর নীচে নেমেছে, দাড়িও আছে তার। দাড়িওয়ালা লোকটা প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছে। ওর দাড়ির নড়াচড়া দেখে মনে হয় কিছু বলবার চেষ্টাও করছে, কিন্তু লাল-জামা পরা লোকটার হাঁকডাকে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। লোকটা দাড়িওয়ালার কাছে এগিয়ে এসে খপ্ ক'রে ওর টুটি চেপে ধরল :

'পালিয়ে যাবি, হারামজাদা কাঁহাকা!'

'দেখেছেন, লোকটার রাগ!' কোচোয়ান চেঁচিয়ে উঠল, গলায় বাহবার সুর। ব্রিৎসকার পাদানিতে ব'সে একপাটি বুট খুলতে আরম্ভ করে। 'হ্যাঁ, একেবারে নিয্যস্ কথা। এমন কাজ সক্কলে মিলেই তো করতে হবে, একেবারে এক হ'য়ে।'

উঁচু বুট খুলে ফেলে সরিয়ে রাখতেই পায়ের ঘামের ভোস্‌কা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সামঘিন সরে যায়। কিন্তু সহিস ওকে সাধান ক'রে দেয় :

'উঁ-হুঁ-হুঁ, বেশী যেন দেখতে না পায় আপনাকে। ওই যে যেটাকে ধ'রে আনল না, এরমাকভ, ও-ও বিদেশী। মৌমাছির চাষ করে আর মাছ ধরে। ও

হলো আপনার গিয়ে খুব গোঁড়া। মেন্নোনাইট সম্প্রদায় আছে না, তারাই, ফৌজে যাতে না যেতে হয়।'

গোঁড়া লোকটাকে স্টোভ-মিস্ত্রীর কাছে নিয়ে আসা হলো। ভীড় নীরব হয়ে গেল। স্টোভ-মিস্ত্রীর গলা পরিষ্কার শোনা গেল :

'কি এরমাকভ? খুব তো বল খৃস্ট-খৃস্ট! আর এখন বেইমানি, এত লোকের দুশমনি করা...সাবধানে থাকবি, বেটা বজ্জাত। মাথা উপুড় ক'রে পুকুরে চোবাব, হরামীর পুত্।'

সেরগোল করতে করতে লাল রঙের চাষীটা সরু-সরু অঢাকা ঠ্যাঙে এদিক ওদিক তড়্‌বড়্‌ ক'রে বেড়ায়। মাছির মতো একবার এখানে বসে একবার ওখানে। বাচ্চাদের ধাক্কা দিয়ে, চড়চাপড় মেরে চেঁচিয়ে ওঠে :

'সার বেঁধে দাঁড়াও, খৃশ্চানরা।'

জনতার পিণ্ডটা আস্তে আস্তে সূচীমুখ ফলার আকার নেয়। ডগাটা শস্য গুদামে চেপে আছে। তীক্ষ্ণতম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ছোটখাট লাল চাষীটি। পাক্ দিয়ে দিয়ে ঘুরে উঠছে, যেন দরজার ভেতর দিয়ে ইস্ক্রুপের মতো মুচড়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। স্টোভ-মিস্ত্রী পেছনে ছড়ান' ভীড়টার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথার ওপর দিয়ে একগাছা বিরাট লম্বা দড়ি ছুঁড়ে দিয়ে দু'হাতের মুঠি ঝাঁকিয়ে চিৎকার ক'রে বলে :

'সবাই দড়ি ধরে থাক, এ্যাই।'

লাল চাষীটাও সবাইকে শাসায়, পাগলের মতো তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে ক'রে ওঠে :

'একজনও বাদ যায় না যেন! তা'হলে হাত গুঁড়িয়ে দেব!'

ক্রুশ চিহ্ন এঁকে মেয়ে-মরদ সবাই দড়ি ধ'রে ঝুঁকে পড়ার জন্যে তৈরি হ'য়ে থাকে। লাইনটা আরো লম্বা হয়েছে, রাস্তাতে এসে ঠেকেছে। সামঘিনের মনে পড়ে বহুদিন আগের দেখা সেই ঘণ্টাকে ওপরে ঠেলে তোলবার কথা। তখনকার মতোই লোকগুলো যেন শান্ত হ'য়ে পড়েছে, ধর্মভাবের চাপে। গুদামের তালায় দড়ির প্রান্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। টান্‌টান হ'য়ে উঠেছে দড়িটা। স্টোভ-মিস্ত্রী নিজের গায়ে ক্রুশচিহ্ন ক'রে চেঁচিয়ে উঠল :

'তিন বলবার সঙ্গে সঙ্গেই—টানবে।'

'সব্বাই ধরেছে তো?'

'আচ্ছা। এ-ক!'

'দেখো যেন এরমাকভ...'

'এ্যাই কোথায় যাস, কুত্তা?

'তি-ন!'

মানুষের লম্বা লাইনটা হেঁচকা টানে দুলে উঠল। দেওয়ালের ওপর থেকে এক ঝট্‌কায় দড়িটা লাফিয়ে উঠে লোহার ঝন্‌ঝন্ শব্দে নীচে পড়ে গেল।

'যাক, বাবাঃ, শেষ হ'য়ে গেল!' কোচোয়ান ব'লে ওঠে। বুট পরতে পরতে সামঘিনের দিকে চোখ টিপে বলে : 'আমরা কিছুই দেখিনি কি বলেন বাবু? গুদাম খোলা আছে। কি ক'রে খুলল তা' আমরা কি জানি। খোলা থাকার মানেই শস্য ধার দেওয়া হচ্ছে—কি বলেন?'

ঘোড়ার পিঠের লাগাম ঠিক করতে করতে খোস্‌গলায় ব'লে যায় :

'অবশ্য তালাটা ভাঙ্গা। কিন্তু দোষী কে? দু'একটা রাখাল আর কয়েকজন শ্মশানযাত্রী থুত্থুরে বুড়ো-বুড়ী বাদে গোটা গাঁ-ই দোষী, বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত। গোটা গাঁয়ের লোক, বাচ্চাকাচ্চাসমেত, তো আপনি আর জেলে ঢোকাতে পারেন না?

এইটাই হলো গে চাল, বুঝলেন না। হ্যাঁ, দাঙ্গা হয়েছিল বটে, কিন্তু অপরাধী কে? না, চুড়্চু... ! চলেন, যাই এবারে...'

এতক্ষণ বিশ্রাম পেয়ে ঘোড়াগুলো বেশ জোর কদমে চলে। চাকার জায়গায় যে লাঠিটা লাগান সেটা মাটিতে দাগ কেটে কেটে যাচ্ছে। কোচোয়ান ঘোড়াগুলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে। মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠে :

'গাঃ, হেঃ-হেঃ, চল্ আমার ছোট্ট হাঁসের জোড়া! আমার কবুতরের ছানা, চল!'



সামঘিন এক-একা পথ চলল। চোখমুখ কুঁচকে দেখে গাঁয়ের লোক ঝোলা-ঝুলি বোঁচকাবস্তা নিয়ে ছুটাছুটি করছে, হই-চই-হল্লা লাগিয়েছে। রাস্তার মাঝখানে দাড়িওয়ালা গোঁড়া এরমাকভ চুপ ক'রে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গাঁয়ে ঢুকতেই কোচোয়ান মাথার থেকে তাড়াতাড়ি টুপী খুলে নিয়ে হাঁক পাড়ে : 'ওহে, ভাসিলি মিত্রিচ!'

সঙ্গে সঙ্গে হট্টগোল থেমে গেল। লোকগুলো যেন ভয়ে মিনিটখানেক নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়াল। সামঘিন আর ঘোড়াদুটোকে ফিরে ফিরে দেখে। সাবধানে গুটি-গুটি ক'রে এগিয়ে আসে।

'ধারে দানা পেলে বুঝি আজ?' কোচোয়ান উল্লসিত গলায় প্রশ্ন করল। লাল-রঙের কৃষাণটা কিন্তু তার সামনে কয়েকবার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে দ্রুত প্রশ্ন করে : 'কে? কোথায় নিয়ে যাও?'

দু'জন লোক এগিয়ে এল। তাদের একজন স্টোভ-মিস্ত্রীটি,—বেশ শক্তসমর্থ জোয়ান, মুখটা যেন গ্র্যানাইট পাথরের। দ্বিতীয়জন কালো, হা-ঘরের মতো চেহারা। সামঘিনের দিকে স্টোভ-মিস্ত্রী এমন তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল যে ও নিজের অজান্তেই সুড়্সুড়্ ক'রে দু'পা পিছিয়ে ব্রিৎস্কাতে এসে বসল। কোচোয়ান আর কালো লোকটা মিলে ঘোড়াদুটোকে লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে যায়। ছোট্ট খাটো লালরঙের চাষাটা সামঘিনের দিকে ছুটে এল। সার্টের ছেঁড়া হাত গুটিয়ে বন্বনে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খায়।

'কোথায় যান? আপনি কে?' যেন ভয় পেয়েছে এমন কণ্ঠস্বর। স্টোভ-মিস্ত্রী ওর কাঁধটা খপ্ ক'রে ধ'রে ছোট্টছেলের মতো একধাক্কাতেই অনেকটা হটিয়ে দেয়। ধপ ক'রে মাটিতে পড়তেই তাকে ধম্কে ওঠে : 'যাঃ, বাড়ি যা ইভান!'

কথা কয়টা বলতে যেন ওর অত্যন্ত কষ্ট হলো। লালচে মুখে দাগ-দাগ চিহ্ন। রোঁয়া-ওঠা ভুরুর নীচে ফিকে-নীল রঙের দুটো কঠোর চোখ। পা-ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো হাতের বুড়ো আঙুলই কোমরের বেল্টে ঢোকান, মস্ত বড় পেটটা ফুলে আছে। চুপচাপ চোয়াল নাড়ায়; রুক্ষ পাতলা দাড়ি নড়ে-চড়ে। সামঘিন বুঝতে পারে ওকে নিয়ে লোকটা কি করবে তা'ভেবে উঠতে পারছে না। পরমুহূর্তেই লোকটা কি করতে পারে তা' সামঘিনেরও অজানা। দশ-বারোজন চাষী, খুব গম্ভীরমুখে, কঠোর ভঙ্গীতেই এগিয়ে এল।

'তুমিই কি স্তারস্তা—মোড়ল?' সামঘিন জিজ্ঞেস করে। মনে মনে ঠিক ক'রে নিয়েছে পরের বার নিশ্চয়ই রিভলভার সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে।

'স্তারস্তা গেরেফ্তার হয়েছে।' একজন চাষী ব'লে ওঠে। স্টোভ-মিস্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে পায়ের কাছে থু-থু ক'রে থুথু ছিটোয়। হুকুম জারীর ভাষায় বলে :

'মিছে কথা বলিস না! স্তারস্তার অসুখ হ'য়েছে। শহরে গেছে!'

পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন গর্ভিনী মেয়েছেলে বস্তা দোলাতে-দোলাতে বিড়বিড় ক'রে ওঠে: 'আবাগীর পুতেরা একটা মোকা পেয়েছে তো, খুব খুশী—চট্‌পট্‌ হাত চালিয়ে নাও।'

'স্তারস্তাকে দিয়ে আপনার দরকার?' স্টোভ-মিস্ত্রী জিজ্ঞেস করে। 'পাশপোর্ট আমিও দেখতে পারি। আমি পড়তে জানি। যারাই এখান দিয়ে যাবে তাদের সকলের পাশপোর্ট দেখবার হুকুম হ'য়েছে', মুখে বলে বটে কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় তার মনটা অন্যত্র। 'জেমস্ত্‌ভোর লোক আপনি?'

'আমি এ্যাটর্নী।'

'এ্যাটর্নী', স্টোভ-মিস্ত্রী এদিক-ওদিক লোকগুলোর দিকে চায়।

কে একজন ঘোঁত্‌-ঘোঁত্‌ ক'রে ওঠে: 'তার মানে তো দু'দিকেরই, গাছেরও খাই তলারও কুড়াই।'

'বেশ বেশ। অমলেট খাবেন নাকি?' লোকগুলোর দিকে চোখটিপে স্টোভ-মিস্ত্রী বলে। প্রায় খুশী-খুশী সুরে বোঝায়: 'ভদ্দরলোকেরা সবসময় অমলেট চায়।'

পকেট থেকে চামড়ার পোচ আর পাইপ বের করে। পাইপের মুখ দিয়েই খুঁটরে খুঁটরে তামাক ভরে নেয়, আঙুল দিয়ে ঠাসে। হঠাৎ ভীত হ'য়ে সামঘিন প্রশ্ন করে:

'আমার কাছ থেকে কি চাও তোমরা?'

'আমরা?' স্টোভ-মিস্ত্রী যেন অবাক। 'আমরা আবার কি চাইব? আমরা তো বাড়িতেই ব'সে। একজন পরদেশী এল দায়ে পড়ে, আমরা দেখছি।'

মুখটা দুমড়ে-মুচড়ে পাইপ টানে যতক্ষণ না ধোঁয়া উঠল। তারপর সামঘিনের কাছে এগিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে ওঠে:

'যান।'

'কোথায়?'

'ওইখানে।' পাইপটা দিয়ে বাঁ-দিকটা দেখিযে দেয়। কয়েকটা সাদা উইলো গাছের নীচ থেকে হাঁপরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হাতুড়িরও ঘা পড়ছে, ভারী গলায় কে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে: 'ফু-উ-উঃ! ফু-উ-উঃ!'

ঘোড়ার পায়ে নাল পরানর আড়াআড়ি খুঁটিটার ওপরে কোচোয়ানকে ব'সে থাকতে দেখা যায়। পা দুলিয়ে দুলিয়ে কামারের সঙ্গে গল্প করছে। স্টোভ-মিস্ত্রী তার কাছে গিয়ে আদেশ করল:

'কশারিয়ভ, এদিকে আয়।'

ওরা তিনজনই ক'পা ওদিকে গেল। কিছুক্ষণ ফিস্‌-ফিস্‌ কথাবার্তার পরে কামার বলে উঠল:

'মিছে বলছিস না তো? কর্‌, ক্রশ কর্‌' ভয়-দেখান স্বরে আবার যোগ করল: 'মনে রাখিস।'

কামার মত্তবিক্রমে কাজ শুরু করে। গন্‌গনে উনুন আর নেহাইয়ের মধ্যে যে কতবার পাগলের মতো ছুটাছুটি করল। প্রলাপ বকার মতোই যেন তার ব্যস্ত-সমস্ত চলাফেরা।

'জোরে-জোরে, ফুঁ মার্‌, ঘাঁই মার্‌, কয়লা দে!' ভাঙ্গা গলায় চেঁচায়। অনিশ্চিত বয়সের আলুথালু এক মেয়েছেলে হাঁপরের কাছে প্রার্থনার ভঙ্গীতে ব'সে ব'সে দুলছে, তার মুখটা ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় বোঝা যায় না।

'হাত চালা ভাসিয়া। ভদ্দরনোককে বসিয়ে রাখিস না,' স্টোভ-মিস্ত্রী ধমক দিয়ে কামারের দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

'ভয়ঙ্কর কাজের লোক, কি বলেন?' সামঘিনের কাছে আসতে আসতে কশারিয়ভ মন্তব্য করে। 'তা-ও তো এখন যক্ষ্মায় কুরে করে ফেলেছে। আগে এমন কাজ করত, পাশ দিয়ে হাঁটতেই ভয় লাগত। ওই যে মেয়েছেলেটা, ওর বোন বুঝলেন। জন্ম থেকেই হাবাগবা।'

অনর্গল বক্‌বক্‌ ক'রে। একসময় বুকের কাছ থেকে রাই-রুটির একটা টুকরো বের ক'রে আনে। ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার ক'রে হাত দিয়ে ঝাড়ে, তারপর আবার পরম-যত্নে জামার ভেতরে লুকিয়ে রাখে।

আজকাল হাবাগবা মানুষ কিন্তু অনেক বেড়েছে, না বাবু? এই জেলাতেই প্রত্যেক গাঁয়ে দু'তিনটে ক'রে পাবেন। কেউ বলে গরীবির ফল, আবার কেউ বলে এটা সুলক্ষণ, ভাল দিন আসছে তারই লক্ষণ।'

'এ্যাই কশারিয়ভ! ইদিকে আয়! ধরতে হবে!' কামারটা চেঁচিয়ে ওঠে।

হাওয়ায় হাওয়ায় আকাশে নানা আকারের বাসন্তী মেঘ এসে জুটেছে। সূর্যের চারদিকে তারা অদ্ভুতভাবে কুঁকড়ে-কুঁকড়ে আছে, যেন আঠার'শতকের অভিজাত-পুরুষের পরচুলা। রাস্তার ওপর কাঁধে বস্তা নিয়ে মেয়েমদ্দা সবাই চুপিচুপি চলেছে। বাচ্চারা এদিক-ওদিক এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেন বাক্স থেকে গড়িয়ে দেওয়া দাবার ঘুঁটি। সামঘিনের পাশ দিয়ে একজন টাকমাথা বুড়ো, চার-কোণা মুখে ছাগুলে দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে যাচ্ছিল। শুনতে পেল বুড়োটা বলছে :

শয়তানের পয়দা সব...'

কামারশালা থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে সামঘিন হাঁটে। ভাবে, চাষীদের কি ও ভয় পেয়েছিল : বোধহয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার তো কিছুই ছিল না, স্টোভ-মিস্ত্রীর খোলাখুলি শত্রুতায় কতখানি অপদস্থ হ'তে হলো।

'ওদের কাজের সাক্ষী হ'য়ে পড়াতেই ওরকম করছিল। দেখেছি তো কেমন ক'রে তালা ভেঙে গুদাম লুঠ করল।'

অলস মনে ক্রিমিন্যাল কোডের ধারা খোঁজে যাতে এই ধরনের 'পাইকারী' অপরাধের দণ্ডের কথা আছে। তেমন কোনো ধারা মনে পড়ে না, মনে করার আর কোনো চেষ্টাও করল না। ততক্ষণে অন্য নানা চিন্তা এসে জুটেছে।

'স্টোভ-মিস্ত্রীর স্বভাবটা দেখেই বলা যায় যে ও ও-ই খালাসী আর কশাকের সমগোত্রীয়, একই ধরনের নৈরাজ্যবাদী...'

'হ'য়ে গেছে, আসুন,' আহ্লাদে ডগমগ হ'য়ে কশারিয়ভ চেঁচায়। কামারকে বেশ আমড়াগাছি করতে শুরু করে : 'আঃ! নেমীটা এখন আগের চেয়েও শক্ত হয়েছে। কী কাজেরই লোক তুমি, দাদা!'

হাতের তালুতে পয়সাগুলোকে বাঁকাতে বাঁকাতে কামার একটু বিরক্ত হ'য়েই সামঘিনকে ব'লে ওঠে : 'আর কিছু দিন না, এক বোতল ভদকার জন্যে।... বাঃ, বেশ। আচ্ছা, কশারিয়ভ্‌।'

ঘোড়াদুটো টগ্‌বগে কদমে ছুটল। রাস্তা শান্ত হ'য়ে পড়েছে। মেয়েপুরুষ যারাই ব্রিৎসকার চলন-পথে পড়ল, চুপচাপ মাথা নেড়ে নেহাৎ অনিচ্ছাতেই কশারিয়ভের দিকে চেয়ে পরিচয়ের মাথা নাড়ে। কশারিয়ভ খুশীমনে চাবুক দোলাতে দোলাতে চেনা-জানা মানুষগুলোর নাম ধ'রে চেঁচায়। ঘোড়াদুটোর দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ে :

'হেঃ-হেঃ, আমার পাখীরা!'

গ্রামটাকে ছাড়াতেই সওয়ারীর দিকে ফিরে ব'লে ওঠে :

'বাজে লোক সব!'

এত অপ্রত্যাশিত মন্তব্য যে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে সামঘিন জিজ্ঞেস

করে : 'কেন?'

'নিশ্চয়ই!' গজ্‌গজ্‌ করতে করতে কশারিয়ভ বলে : 'এইটা কি ঠিক— শস্য চুরি করা? না, মশায়! এতখানি স্বাধীনতাকে আমি ন্যায়ধর্ম বলি না। লোককে খেতে হবে, বীজ বুনতে হবে তা-ও ঠিক। কিন্তু সরকার কি তা' জানেন না? তাঁরা যা করছেন তা' নিশ্চয়ই বিচার-বিবেচনা ক'রেই তা করছেন, তাই না?'

মাঠের দিকে সাঁই ক'রে চাবুক ঘোরায়। সেদিকটায় গোধূলির নীল আভা। আবার তার কথা শুরু হয়, যেন বিস্ময়-উক্তিই :

'যদি চুরির কথাটা নালিশ করেন, পালের গোদা হলো স্টোভ-মিস্ত্রী, তারপর ওই লাল সার্ট-পরা লোকটা, মিশকা ভাভিলভ,—কামারটাও। ময়সেয়েভ ভাই দুটো —নামগুলো লিখে নিন, নইলে ভুলে যাবেন না?'

'চুপ কর!' কঠোরস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে সামঘিন : 'এ-সবে আমার কোনো দরকার নেই।'

খুব রেগে গেছে। কিন্তু কোচোয়ানকে লজ্জা দিতে পারে এমন কোনো ওজনদার কথাই মনে পড়ছে না।

'লজ্জা করে না তোমার, নিজের লোকদের সম্বন্ধে নালিশ করতে?'

"আরে মশাই আমি তো এখানকার নই...'

'তাতে কি। কাজটা কি খুব ভাল?'

'হ্যাঁ, তা' ঠিক। ভাল নয় অবশ্য,' কশারিয়ভ সায় দেয় : 'কি জীবন...'

'আমি অবাক হ'য়ে গেছি,' সামঘিন কথার জের টানে, কিন্তু কোচোয়ান ওকে বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে :

'কেই বা অবাক না হবে? যখন দেখলাম ওরা কি করছে, ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম।'

'বাস্‌-বাস্‌!' সামঘিন চেঁচিয়ে ওঠে।

'আপনার মর্জি', কশারিয়ভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে। নিজের বাক্সের ওপর গুছিয়ে ব'সে, ঘোড়ার জিনের পিছটায় চাবুক ঘোরাতে-ঘোরাতে শুকন গলায় বলে :

'আপনি নিজেই তো দেখলেন, আমি এখানে বিদেশী।—গীঃ-গী, পক্ষীরাজ!' চেঁচিয়ে ওঠে। মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে সামঘিনকে জানায় : 'রাতে বৃষ্টি হবে,' আর তারপরেই কচ্ছপের মতো মাথাটাকে কাঁধের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে।

'গণদেবতা' সামঘিন আক্রোশে জ্বলে উঠে মনে-মনে বলে : 'দাঙ্গাবাজ!' বিমর্ষ-ভাবে ভাবে। কিন্তু নেহাৎ অনিচ্ছাবশতঃই মনের কাজ চলে, শব্দের সঙ্গে শব্দের যোগবিয়োগই শুধু ঘটে। হীতশ্রদ্ধা-ভাবটুকু দিগন্তের বিদ্যুৎঝিলিকের সাথে সাথে ওই বিদ্যুতের গতিতেই অন্তর্হিত হ'য়েছে। পূর্বদিকে, অনেকদূরে, নীল-নীল মেঘ উঠে আসছে, রাস্তার ধূসর বাঁকটাকে আঁধার ক'রে তোলে। ঘোড়াগুলো যখন নির্জন কোনো গাছের তলা দিয়ে ছুটে যায়, মনে হয়, পত্রহীন শাখা থেকে কালো-কালো ধুলো এসে নীচে জমছে। শীত-শীত সন্ধ্যেয় সামঘিনের মনে বিষণ্ণ গীতিময়তা দেখা দিল। নিজের ওপর করুণা জাগছে,—না চাইতেও মানুষটাকে কতরকম বিশ্রী কথা ও কাণ্ড না আজ দেখতে হলো। এই সব মাঠঘাট চাষী-কিষাণে ওর কি দরকার? এদের দেখলে তো মনে অশেষ ব্যর্থ চিন্তার রাশ জাগে, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জীবন যাপনের ইচ্ছাটা সেই চিন্তার পাকেপাকে কোথায় হারিয়ে যায়। স্বকীয়তার অনুভূতিও অন্যের চিন্তার পাকে জড়িয়ে পরে। সব জানবার চেষ্টার ওর কি দরকার, জ্ঞানী হবার কি প্রয়োজন? বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে আলোচনা করার শক্তি দিয়ে কি হবে, নিজেকে ঈয়োলিও-বীণা তৈরি ক'রে লাভ? কার জন্যেই বা এত সব?

বুঝতে পারল অন্যের চিন্তা দিয়েই এই বিরুদ্ধ-বাত্যায় ও এসে পড়েছে।

তক্ষ্ণি মনস্থির ক'রে ফেলে বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা বা নিজেকে প্রয়োজনীয়তার রঙে রাঙিয়ে দশজনের চোখের সামনে দেখানোর ইচ্ছা নিতান্তই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; এ'দেরকে বাদ দিলেই জীবন বিস্বাদ।

'আমি যেন অন্যের ইচ্ছার যন্ত্র স্বরূপ হয়েছিলাম।' মনে-মনে ভাবে।

ঘোড়াগুলো ছোট্ট রেল-স্টেশন পর্যন্ত একটানা ছুটে এল। কশারিয়ভ হাত পেতে বকশিস নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ী ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল, নিশব্দপ্রায় বর্ষণের মধ্যে। দশ মিনিট পর সামঘিন সেকেন্ড ক্লাশ কামরায় পোশাক বদলায়। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে, ভিজে-ভিজে অন্ধকারের মধ্যে অশুভ আলোর শিখাগুলো সোঁ-সোঁ ক'রে চলে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে সার-সার কালো-কালো গাছপালাকে আলোয় ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চাষীদের কুটীরের ছাদগুলোকে বিরাট-বিরাট কফিনের ঢাকনি বলে মনে হচ্ছে। একটা কারখানার দেওয়াল চলে গেল পাশ দিয়ে, তার লাল-লাল জানলাগুলোকে উদগ্র দাঁতের মতো দেখায়। গাড়ির কোলাহলের মধ্যেও যে ঘর্ষণের আওয়াজটা শোনা যায় তা বোধহয় ওখান থেকেই উঠছে।

সামঘিন শুয়ে পড়ে। এত ক্লান্ত যে ঘুম আসছে না। ট্রেন যখন দুই বারের বার থামল, নানারকম আওয়াজ করতে করতে মস্ত বড় একটা লোক এসে কামরায় ঢোকে। গার্ডকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবার আদেশ করে যেই সামঘিনের দিকে চোখ পড়ল অমনি চেঁচিয়ে ওঠে :

'আরেঃ! তুমি. না? কোথায় যাচ্ছ? চিনতে পারলে না? আমি ইপ্পলিৎ স্ত্রাতনভ।'

বোতাম খুলতে খুলতে এমন দুপ্‌দাপ্ ক'রে নড়াচড়া করে যে কামরাটাই দুলে দুলে ওঠে। ক্লিমের সঙ্গে কথা বলার ধরন দেখে মনে হয় ঝগড়া বাধাতে চাইছে :

'শুনেছ? এক ব্যাটা গর্দভ পবেদনস্তজেভকে গুলী করতে চেষ্টা করেছিল রাস্তা থেকে, জানালার ভেতর দিয়ে—শয়তানের বাচ্চা! তোমার কি মনে হয়, এ্যাঁ?'

মোটেই প্রকৃতিস্থ নয়। জুতো খোলার জন্যে বেঁকতেই মাথা দিয়ে সামঘিনের পাশে প্রায় মারল এক ঢুঁ। ক্লিম উঠে দরজার কাছটায় কোণার দিকে গিয়ে বসে।

'যত সব অর্ধশিক্ষিত গাঁইয়া!' স্ত্রাতনভ বিড়বিড় করে।

ছাত্রদের উর্দির কোটটা বোধহয় ওর আয়তনকে চেপে ধরেছিল। বেশ অফিসার-অফিসার দেখাচ্ছিল কিন্তু। সাদা পোশাকে এখন স্ত্রাতনভ সবদিকে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। লম্বাতেও বড় হলো, কাঁধও চওড়া হলো, নিতম্বও স্থূল হলো। মুখটা ফুলে গোল। চোখমুখও যেন বড় হয়ে পড়ল। আয়তন দিয়ে, কণ্ঠস্বর দিয়ে, সার্কাসের মল্লবীরের মতন নড়াচড়ার কায়দা দেখিয়ে সামঘিনকে হতভম্ব করে দেয়। সামঘিনের এখনও বিশ্বাস হয় না যে এই লোকটা কোনোদিন ছাত্র ছিল।

'গাড়োলগুলো আরেকবারও এই রকম করে খেল্ ভেস্তে দিয়েছিল,' স্ত্রাতনভ বলছিল। চামড়া মোড়া একটা ঝুড়ির তালা খুলতে খুলতে বলে : 'ওই শালা পয়লা মার্চ যদি না হতো তো এ্যাদ্দিন ইউরোপকে শিং ধরে টেনে আনতুম না—'

কথার মধ্যে বিষাদ নেই কিন্তু। শুধু যেন মহা-বিরক্ত। কি ক'রে অন্যের গ্রুটি সংশোধন করতে হবে সেটা যেন খুব জানা, তা করতেই যেন যাচ্ছে এক্ষুণি। দাগ-কাটা জকি-ভেস্ট আর বিচিত্র রঙের ঝল্‌ঝলে প্যাণ্ট পরে লোকটা ঝুড়ি থেকে প্যাকেট বের করছিল। আলুঝালু মাথাটা বেঁকে রয়েছে। ক্লিমকে বলে :

'এস, শোয়ার আগে পেটে কিছু দেওয়া যাক। এই আমার এক অভ্যেস বুঝলে একবার আমার চারটে দিন কেটেছিল এক বেনে-কেলাশের বিধবার সঙ্গে। তিরিশের কাছাকাছি বয়স। কাজেই কি যে হতে পারে সে তো বুঝতেই পার! তখনো, রাত্তিরেও, প্রেমের মহাশ্রমের মধ্যেও বুঝলে, খেয়ে নেবার জন্যে থামতুম। বলতুম, "প্রিয়ে, একটু মাপ করতে হবে—"...'

সামঘিনের খিদে পেয়েছিল। ভাবে, এই আধা-মাতাল লোকটার সঙ্গে কথা না বলে খেয়ে নেওয়া অনেক ভাল। স্‌ত্রাতনভ কালো বোতল থেকে কড়া সুগন্ধির তরল পদার্থ একটা রুপোর কাপে ঢালে।

'গিলে ফেল। খুব আনন্দ পাবে হে...'

ক্লিম ওটা গিলতেই যেন দম-আটকে আসে। তাড়াতাড়ি মুখ খুলে ফেলে। রাগে হিস্‌হিস্‌ করে।

'কি—বিষ নাকি? আমার মহিলাটি একজন বুড়ো বারম্যানকে চেনে। আঃ, কি লোক—নামটা মেনদেলিয়েভ! নাও না, কিছুটা হাঁসের মাংস নাও...'

বৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেল। জানলাগুলো ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। সোনার থালার মতো মস্ত এক চাঁদ আকাশে গড়িয়ে এল। স্টেশন আর ফ্যাক্টরীর আলো-গুলো ঢিমে হ'য়ে পড়েছে, ক্রমে ক্রমে মিলিয়েও যায়। জানলার সার্সিতে অজস্র পারার ফোঁটা। মাটির ওপর গ্রাম্য কুটীরগুলো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে, যেন নদীর ওপর বজরা।

'মার্ক টোয়েইনকে তোমার ভাল লাগে? জেরোমকে? এদের দু'জনের মতো প্রাণখোলা হাসি হাসাতে আর কেউ পারে না—' স্‌ত্রাতনভ হাপুসহুপুস ক'রে খেতে খেতে বলে। ন্যাপকিন দিয়ে হাত মুছে সখেদে ব'লে ওঠে :

'অনুভূতিশীল লোকদের আছে টোয়েইন আর আমাদের আছে চেকভ। কিছু দিন আগে আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে তাঁর ওই "ক্ষুদে অফিসার প্রিশিবেয়েভ" বইখানা পড়ে দেখতে বলেছিল, খুবই নাকি মজার। পড়লাম, কিন্তু মজা তো একটুও লাগল না, বরং দুঃখেরই মনে হলো যেন। বোঝাও যায় না লেখকের মনোভাবই বা কি। যে-লোকটা শৃঙ্খলা ভালবাসে ব'লে সকলের হাসির খোরাক হ'য়েই রইল, তা'কে তিনি কি বলতে চান।...এস, আরেক পাত্তর ক'রে হোক!'

'স্‌ত্রাতনভ তাঁর "বিষাক্ত" সুরা এমন অকুণ্ঠ পান করছে যেন লেমনেড। পান শেষ হ'লে অতিরিক্ত খাবারটুকু আবার ঝুড়িতে রাখতে রাখতে বলে :

'মোটকথায় রাশিয়াতে মজাদাব কিছু নেই, একমাত্র সোস্যালিস্টরা ছাড়া। আমাদের ব্যঙ্গরসের কারবার একেবারে বোকার মতো : কোনো পোল্‌ বা কোনো ইহুদী রাস্তা থেকে হোলি-সাইনডের প্রকুরেটর-ভদ্রলোকের জানালায় গুলী চালাল—বাস, এই পর্যন্ত। নিশ্চয়ই রিভলভারটাও সস্তাগোছের।'

কয়েক মিনিট পর বেঞ্চিতে টান্‌টান্‌ হ'য়ে শোয়। কথাবার্তা বন্ধ। বুকের চাদরটা ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। জানালার বাইরের মাটিও তাই, কখনো গাছের মাথা কেটে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আবার কখনো বা শেকড়-বাদ দেওয়া গোড়া। ডালপালা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তারা ছুটে পালিয়ে যায়। স্‌ত্রাতনভের মস্ত উত্তুঙ্গ-নাক আর বিকশিত দন্তপাটির দিকে চেয়ে চেয়ে সামঘিনের মনে হয় তারাস্‌সোভকা গ্রামে চাষীদের ভীড়ের সামনে পড়লে স্‌ত্রাতনভের কি অবস্থা হতো।

স্টোভ-মিস্ত্রী নিশ্চয়ই ওর হাতে সুবিধে করতে পারত না।

আগে ক্লিমের মনে হতো স্রাতনভ পাকা লোক, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধিতে একেবারেই সাধারণ। এখন কিন্তু তার ওপর নানা গুণপনার আরোপ করতে ইচ্ছে করে। তাই, তার মধ্যে দেখতে পায় ভারভারার কর্মশক্তি, কজলভের দেশাত্মবোধ, মিত্রো-ফানভের আশাবাদ—সব মিলে মস্ত এক মানুষ।

'বোধহয় এমন লোকই রাশিয়ার দরকার।'

ছাত্র বিক্ষোভের সময় মিত্রোফানভের সেই আশার কথাগুলো আবার মনে পড়ল :

'ঠিক আছে। আমাদের চামড়াতেই শুধু চুলকোনি, নীচের শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। যেমন ধরুন বাকহোয়েটের মণ্ড। রান্না করার সময় যখন ফুটে ওঠে, পাতলা কণাগুলো ওপরে ভাসে। পরে তাদেরি থেকে সুন্দর মচ্‌মচে মুড়ি হয়, তাই না? কিন্তু আমরা তো মুড়ি খেয়ে বেঁচে থাকি না—থাকি মণ্ড খেয়ে...'

ঘুমিয়ে পড়বার আগে সামঘিনের মনে হয় :

'হ্যাঁ, রাশিয়ার পক্ষে সুস্থ লোকের দরকার, আশাবাদীদের দরকার। হেরজেন যাদের "পিত্তির ধাতের মানুষ" বলেছেন তাদের কোনো দরকার নেই। শেড্রিন আর উস্‌পেন্‌স্কি বুদ্ধিজীবিদের স্বভাব এমন ক'রে নষ্ট করেছেন যা আর কেউ কোন-দিন করেনি।

কিন্তু সকালে উঠে স্রাতনভ ক্লিমকে হতাশ করল।...ওই আগে উঠেছিল, এদিক ওদিক ভারী পায়ের চলাফেরায় ক্লিমের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কফি খাওয়ার আহ্বান জানাল।

'থার্মোস্‌-ফ্লাস্ক আছে আমার। গার্ড এক্ষুনি গেলাস এনে দেবে,' পরম আদরে নতুন হাল্কা প্যাণ্ট পরতে পরতে বলে। ক্লিম জিজ্ঞেস করল :

'প্রেইসের ওখানে আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছ?'

'না। কখনো কখনো যাই,' স্রাতনভ আমতা আমতা ক'রে বলে। 'কিন্তু জানতো জায়গাটা নীরস। দেখ, নিজেদের মধ্যে বলতে কি, একটা কথা আছে না, "যে ব্যক্তি অভাজনদের সভায় যায় না, সে ঈশ্বরের আশীষপুষ্ট," এও ঠিক তাই। ওদের সঙ্গে আর আমার মতের মিল হয় না। হয় তোমাকে রাস্তা আটকে পাপী-দের যাওয়াটাই বন্ধ ক'রে দিতে হবে, নয়তো লেগে পড় গিয়ে তাদের সঙ্গে। বুঝলে তো? প্রেইস্‌ বড্ড চালাক,' নাকটা কুঁচকে বাক্যস্রোত টেনেই যায় : 'বেশ চালাক চতুর। জানাশোনাও আছে অনেক। কিন্তু যে ভেড়ার পালের ও রাখাল হ'য়ে বসে আছে. তারা সবাই বাক্যবাগীশ, শূন্যকুম্ভ।'

ন্যাপকিন দিয়ে গেলাসটাকে ভালো ক'রে মুছে স্রাতনভ আবেগের সঙ্গে বলে : 'বুঝলে দোস্ত, ইতিহাস আমাদের সামনে একটা সমস্যা এনে দিয়েছে। প্রশান্ত মহা-সাগরের কূলে যেতে হবে—প্রথমে মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে দিয়ে, তারপর নিঃসন্দেহে পারস্য-উপসাগরের ভেতর দিয়ে। হ্যাঁ, সত্যি কথা। উ'হুঃ, তোমার হাসিটা নেহাৎ-ই অপ্রয়োজনীয়।...ওই দুটোরই দরকার। প্রথমে একটা তারপর আরেকটা। কৃষ্ণ-সাগর খুলে দেবার মতোই প্রয়োজনীয়। আমাদের আবার সময় নষ্ট করলেও চলবে না। কারণ—'

গাড়ী খুব জোরে ঝাঁকুনী দিয়ে ওঠে। ফ্লাস্ক থেকে ক' ফোঁটা কফি ছল্‌কে পড়ে স্রাতনভের নরম গ্রে-প্যাণ্টের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ ক'রে সে চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে। প্রতিটি গালাগালের কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণ।

'ধেৎ!' বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। রুমাল দিয়ে প্যাণ্টের ওপর থেকে কফির দাগ মুছবার চেষ্টা করে। গেলাশের কফি নিয়ে গিয়ে পিক্‌দানীতে ফেলে আসে। থার্মস্‌টা আবার ঝুড়িতে তুলে রাখে। সামঘিনকে কফি দিতে চেয়েছিল সে-কথা

ভুলেই গেছে।

'বিপ্লবের কি খবর?' ক্লিম শুধায়।

প্যান্ট খুলতে খুলতে স্মাতনভ অস্ফুটকণ্ঠে বলে :

'ওঃ—ওটাকে বিপ্লব বলো নাকি? ছেলেরা রিভলবার দিয়ে গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি করছে...'

'ছেলেই বল আর যাই বল, ওদের দুটো সুসম্বন্ধ পার্টি আছে, কিন্তু তোমার মতো বিচারধারার মানুষের...'

স্মাতনভ প্যাণ্টটাকে ভেতরদিক থেকে উল্টে খুব যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে। ওপরের তাক থেকে একটা মোটা ব্যাগ পেড়ে আনে। গাল ফুলিয়ে সামঘিনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে একটা হাত প্রসারিত ক'রে তালুর ওপর ফু দিয়ে বলে ওঠে :

'তোমার পার্টিদের জন্যে এই-ই। ধুলো, তোমার পার্টিরা স্রেফ ধুলো।'

ব্যাগ থেকে আরেকটা প্যান্ট বের ক'রে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখে বিড়বিড় ক'রে বলে :

'রাশিয়া আন্তর্জাতিক নীতির পথে পা দিয়েছে আর তোমরা রিভলভারের কথা বলছ। অদ্ভুত...'

সামঘিন চুপ ক'রে যায়। স্মাতনভ ওর চোখে অনেক নেমে গেছে। প্যান্টের ওপর অত মাথাব্যথা; কথা বলার বিশ্রী ভঙ্গী, বড্ড বেখাপ্পা ঠেকে। ট্রেন থেকে নেমে হুঁ-হাঁ ক'রে বিদায় নিল। ঘোড়ার গাড়ীতে বসে স্মাতনভের কথা ভাবে ঘৃণার সঙ্গে :

'ষাঁড় একটা। ইডিয়ট। তোমার কতখানি সামর্থ্য আছে হে? যারা আদর্শের জন্য স্বাধীনতা দিয়ে দিতে পারে, জীবন দিয়ে দিতে পারে, তাদের সঙ্গে যুঝতে পারা তোমার কর্ম নয়!'

চিন্তার এতখানি সুস্পষ্টতায় সামঘিন কিন্তু অপদস্থ হয়ে ওঠে। মনে মনে প্রতিবাদ করতেই যাচ্ছিল, কিন্তু অনুরূপ চিন্তার স্রোত এসে তাকে কোথায় ভাসিয়ে দেয়।

'এমন ষণ্ডদের বিজয়ী দেখতে নিশ্চয়ই আমি চাই না,' মনে-মনে ঠিক করল। অপ্রিয় সাক্ষাতের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে মনস্থ করে। এমন তো কত স্মৃতিই মুছে ফেলেছে। মনের ভাঁড়ারে তাদের রাখবার মতো কোনো কুলুঙ্গীই নেই।

॥ ১৭ ॥

সামঘিন বোঝে তথাকথিত "গণ-আন্দোলন" বেড়ে উঠছে। লোকে যেন বিরাট শোভাযাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছে। রেড-স্কোয়্যার থেকে গম্‌গমে গলার কোনো আদেশের 'প্রতীক্ষা করছে, মিনিন বা পোঝার্‌স্কির মতো বীরদের ব্রোঞ্জমূর্তি রয়েছে। উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরটা তাদের সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে লবনোয়ে-প্লেস থেকে জিজ্ঞেস করব, তোমরা কীসে বিশ্বাস কর।...আলোচনাগুলো এখন অনেক বেশী উষ্ণ; সপ্রশ্ন :'আপনার মত কি?'

গুশারভ দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে। থম্‌থমে কালো গোঁফের মঞ্জরী কিন্তু রেখেই দিয়েছে। তাতে ক'রে ওর মুখটা দেখাচ্ছে ঠিক আর্মানীদর মতো। ন্যাকড়া-ন্যাকড়া ব্লাউজটা ছেড়ে এখন মাড়-কর্‌করে সার্ট পরে, ক্যাপের বদলে হ্যাট। হাঁটু পর্যন্ত বুট উঠেছে। সাজ-সজ্জায় চেহারাটা অনেক দূর থেকেও চোখে পড়ে। পার্টি দু'টোকে এক ক'রে মেলাবার কথা এখন আর বলে না। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ও নাম দিয়েছিল 'সেদিয়ে' (ধূসর-মাথার লোক) আর সোশ্যাল রেভল্যুসানিস্টদের 'সেরিয়ে' (ধূসর রঙের লোক)। নাম দুটো আবিষ্কার ক'রে কিন্তু মহাখুশী। প্রায়ই বলত :

'সেদিয়ের উচিত কাজ দিয়ে প্রপাগাণ্ডা করা। কি দরকার জানেন, কারখানায় কারখানায় সন্ত্রাসবাদ, মালিক, ডিরেক্টার, ফোরম্যান সবাইকে মেরে তুলো-ধুনো করা। সেদিয়ে যদি এই করতে পারে তো সেরিয়ে একদম খতম।'

লুবাশা ওর সম্বন্ধে বলে : 'বারফট্টাইগিরি। বলে কি না, শ্রমিকদের সঙ্গে খুব জানাশোনা, কিন্তু কাউকেই তাদের নাম বলবে না। আরেঃ, সবাই তো শ্রমিকদের সঙ্গে পরিচয় নিয়ে খুব বাগাড়ম্বর করে। ব্যাপারটা যেন খেলুড়েদের গালগল্প আর কি! কিন্তু অন্যদিকে মিঃ জুবাতভের কথা ধরা যাক, তার পক্ষে তো অহঙ্কার করবার মতো যথেষ্টই রয়েছে...'

চিন্তাভাবনা অনেক বেড়ে গেছে লুবাশার। আগের চেয়ে কর্কশ হয়ে পড়েছে। রোগা হয়ে গেছে। বিরক্ত হলে প্রায়ই তোৎলায়, কথার মাঝখানেই থেমে যায়। এক দিন ভারভারার সামনেই সামঘিনের ওপর চটেমটে বলে ওঠে :

'হা ভগবান, ক্লিম তুমি দিনদিন এত বোকা হয়ে পড়েছ! এমন জটিল ক'রে কথাবার্তা বল, কিছুই বুঝতে পারি না।'

'তোমারও বড় বদ-অভ্যেস, বুঝলে, সব কিছুই খুব সরল ক'রে বুঝতে চাও,' ক্লিম প্রত্যুত্তরে যা মনে এসেছিল তাই বলেছিল।

কুতুজভের কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি পায় লুবাশা, দীর্ঘপত্র। সামঘিন এদের নাম দিয়েছিল, "খ্রীষ্টশিষ্যের প্রচারবাণী।" চিঠি এলে সমভার যেন জন্মদিনের উৎসব। সকলেই বোঝে, পাতলা নোটপেপারে খুদে খুদে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা এই চিঠিগুলো মেয়েটির জীবনের মহামূল্য সম্পত্তি, আনন্দের খনি। সামঘিনের আশ্চর্য লাগে, কুতুজভ তার মোটা-মোটা হাত দিয়ে কি ক'রে ঐ রকম ছোট্ট-ছোট্ট পরিষ্কার অক্ষরের লাইন বুনে যায়।

'দুনিয়া আজ ভয়ানক অসুস্থ; কোনো সন্দেহ নেই উদার মানবিকতার স্যাকারিন মিষ্টাচারে এ রোগ সারবার নয়,' কুতুজভ লেখে : 'অস্ত্র-চিকিৎসার দরকার।

ফোড়াগুলো কাটতে হবে, বিষাক্ত টিউমার সারিয়ে দিতে হবে।'

'খুব সত্যি কথা,' গোঘিন সায় দেয়। কড়ে আঙ্গুলের নখ দিয়ে ভুরু চুলকোতে চুলকোতে বলে: 'আগেও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছিল। ওটা যেন কি, ওই থলে আর ছুঁচের কথাটা?'

'নারোদনিকরা ভাল ভাল কথার থলে যতই সেলাই ক'রে নিক না কেন, শ্রেণী-স্বার্থের ছুঁচটা কোথায় লুকোবে?'*

'স্তেপানের মাথা বড় চমৎকার,' গোঘিন সপ্রশংস ঘোষণা ক'রে ওঠে। কিন্তু ওর বোন মাথা নাড়িয়ে বলে:

'যাই বল না কেন, এ রকম লোক কিন্তু আমার ভাল লাগে না। যে সব লোককে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলা যায়, যাদেরকে ভাগ করলে কোনো অবিশিষ্টই থাকে না. তারা একটুও ইণ্টারেস্টিং নয়। মানুষ তার নিজের মধ্যে সম্ভব হলে, সব কিছুই রেখে দেবে, তার ওপরেও আরো কিছুটা।'

তাতিয়ানার কথার মারপ্যাঁচে কিন্তু কেউ মন দেন না। মাঝে মাঝে লুবাশা তাকে খোঁচা মারে:

'এই. তানিচ্‌কা, এটা তুমি অবক্ষয়ীদের কাছ থেকে চুরি করলে!'

তাতিয়ানা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়: 'অবক্ষয়ীরাও বিপ্লবী।'

সব রকম মন্তব্য শুনে নিয়ে সার্মাঘিন সুযোগ মত বলে: 'কুতুজভের মতো লোক খুব দরকার, যারা কোনো একটা বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ। আদর্শের চোটে তারা হয়তো এমন সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে যে পঙ্গু-পঙ্গু দেখায়. দৃষ্টিও অন্ধ হয়ে পড়ে, তবুও এদেরি দরকার।'

'কেন? ওদের দিয়ে কি হবে?' ওর দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের গলায় তাতিয়ানা বলে।

'সব রকম ফালতু-লোক থেকে আমাদের রেহাই দেবে বলে। যেমন ধর, যারা বাক্যবিলাসিতা ভালোবাসে, তথ্য-কথনে আর ফ্যাসন নিয়ে যারা উন্মুখ, বা বুদ্ধি-বৃত্তিতে যারা শিথিল...'

আজকাল ওর কথা বলার ধরনটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাদামাটা, কোনো সুর বা আবেগ নেই. যেন গভীর কোনো বইয়ের অংশবিশেষ পড়ে শোনাচ্ছে। ওর ধারণা এমন করে বললে কথায় ওজন বাড়ে, দ্বিধাটাকেও লুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু অনুধ্যান করা থেকে বিরত থাকে. কারণ ও যা চায় তা শুধুই "তথ্য"। ভাইয়ের চিঠিও ও-ভাবেই জোরে জোরে পড়ে শোনায়. সব সময়েই সেগুলো কিন্তু বিষণ্ণতার সুরে ভরা:

'লোকে এখানে যেন সেই গোগলের সময়ে বাস করছে। মনে হবে, শতকরা প'চানব্বই জনই "মৃত আত্মা",—এমন প্রেতের মতো মৃত যে জীবনে ফিরে আসবার লক্ষণই নেই।

'ইস্কুলে সামরিক কুচকাওয়াজ ঢোকান' হয়েছে। স্থানীয় গ্যারিসনের অফিসাররা শেখাচ্ছেন। বিশ্বাস কর. অনেক ছেলেই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে, খেলাটা তাদের বেশ ভালই লাগছে। সম্প্রতি একজন অফিসার ছেলেদেরকে বেশ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।'

ইভান দ্রোনভও সার্মাঘিনকে চিঠি দিয়েছে। মস্কোর কোনো খবরের কাগজে কি ওর জন্যে কোনো কাজ জুটিয়ে দিতে পারে সার্মাঘিন? সার্মাঘিন চিঠি লেখালেখি শুরু করল. দ্রোনভ মাল-মসলা জোগাল:

---

*প্রবাদবাক্য। তীক্ষ্ম জিনিস লুকোন যায় না।

'সাইবেরিয়া থেকে ছাড়া পাওয়া একজন ছাত্র জিমন্যাসিয়ামের মেয়েদের নিয়ে আধিদৈবিকের চর্চায় মেতেছে।...বাতি নিভিয়ে দেবে, এমনভাবে জলের টব রাখবে যে ওয়াশস্ট্যান্ড থেকে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল পড়বে কোনো একটা পিতলের গামলার মধ্যে। ঘোর অন্ধকারে অবিরত জলপড়ার শব্দের তালে তালে ও মেয়েদেরকে নানা রকম রতিবিলাস আর অতীন্দ্রিয় কবিতা পড়ে পড়ে শোনাবে। এভাবে মেয়ে-গুলোকে প্রায় মূর্চ্ছা-পাওয়ার দশায় টেনে নিয়ে যায়। কয়েক দিন হলো জানা গেছে যে ওদেরি একজনের, তার বয়স চোদ্দ বছর, গর্ভ হয়ে গেছে।'

এমন এমন কাহিনী ইভান দ্রোনভের অজস্র জানা, এত যে শজারুর গায়ের কাঁটার সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। কোন্‌ কোন্‌ ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে আবার ভর্তির দরখাস্ত করেছে তাদের নাম লিখে পাঠাল স্যামঘিনকে, কে কে এখনো দোনো-মনো করছে এবং কেন—তা-ও। মানুষের যত মন্দ এবং অশ্লীল কর্মকাণ্ডের কথা তার জানা। সামঘিনকে তার "জীবনের জ্ঞান" সম্বন্ধে নানা তথ্য জানায়। ক্লিমও তার ইতস্ততঃ ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার কথা অতিথিদের জন্যে আলাদা ক'রে রাখে। বেশ খুশী মনে চেয়ে চেয়ে দেখে গল্পগুলো শ্রোতাদেরকে কেমন বিষণ্ণ নীরব ক'রে তোলে। ও প্রতিহিংসা মেটাত এইভাবেই, এদের যেমনটি দেখতে চেয়েছিল তা তারা নয় কেন! ওর ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যে কতখানি তা দেখাতে চেয়ে বহুদিন আগে ও ঘোষণা করেছিল যে একথা ঠিক—ওর তথ্যাবলী কিঞ্চিৎ অবিমিশ্র-গম্ভীর, কিন্তু বর্তমান উদ্দেশ্য হলো শুধু জীবনের টুকরো টুকরো ছবি আঁকা, "দুই শতাব্দীর সীমানায়"—এই শীর্ষকে।

'দেখাতে চাই নানা রকম বিদ্রোহের যে যুগটা আসছে তারই কিনারায় কি ক'রে সব 'অবলম্বন' আর 'ঐতিহ্য' ধ্বসে-ধ্বসে পড়ছে—' সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রের মতো উচ্ছ্বাসহীন সুরে ও বলেছিল।

মোটকথা, লোকের মাঝে ওর যে স্থান সেটাতে ও সন্তুষ্টই ছিল। নিজেকে অভ্যস্ত ক'রে নিয়েছিল বিশেষ-বিশেষ গণ্ডীর সঙ্গে মেশবার জন্যে। তাদেরকে নিজের অবস্থিতিবই একটা অংশ ক'রে তুলেছে যেন। বুঝতে পারত তাদের 'বিচ্ছিন্ন বাক্যের সুসম্বন্ধ রীতি'গুলোকে। নিশ্চিত হয়ে আছে, লিদিয়ার ভাই ছোটবেলায় যেমন ওকে অপদস্থের ভূমিকা নিতে বাধ্য করেছিল তেমন কোনো অবাঞ্ছিত অবস্থায় ফেলে দেবার জন্যে জীবনে আরেকটা বরিস ভারাভকার দেখা মিলবে না।

*

ভারভারার পরিচয়ের গণ্ডী ক্রমশঃ বেড়ে যায়। এত ধীরে ধীরে বাড়ে সামঘিন টেরও পায় না। 'নতুন' লোকের জন্যে ভারভারার মনে অফুরন্ত-কৌতূহল। ওর চারপাশে তরুণ-ছেলেমেয়েরা কিলবিল করে। তারা হয়তো 'রাজনীতি,' 'ঐতিহ্য' বা 'নীতি'র পরোয়াও করে না। বিগত যুগ সম্বন্ধে রয়েছে বিদ্রূপ আর অবিশ্বাস। এদের দেখে সামঘিনের মনে পড়ে বহুদিন হলো ভুলে-যাওয়া সেরাফেমা নেখায়েভার নানা কথা,—জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে, ভেরলেইন সম্বন্ধে বা ইব্‌সেনের নাটক সম্বন্ধে তার আলোচনা।...এরা এড্‌গার পো এবং দস্তয়েভস্কিকে আবিষ্কার করছে; হামস্যুনের "প্যান" নিয়ে উৎসাহে অধীর হচ্ছে, বাসনা চরিতার্থ করবার, ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় খেয়াল মেটাবার স্বাধীনতা বড় গলায় ঘোষণা করছে।

ব্যক্তিবাদী ও সমাজবাদীদের লড়াই বাধিয়ে সামঘিন বেশ মজা পায়, ওদের নীতির মধ্যে যে অভ্রান্ত বিরোধ আছে সেটাকে সযত্নে সামনে তুলে ধরে।

দেখতে পায় ভারভারা ওদের মধ্যে নিফন্ত কুমভ নামে জনৈক তরুণের ওপর মনোযোগ একটু বেশীই দিয়েছে। ছেলেটির লম্বা চেহারা, ঘাড়ের দিকটা কদাকার-ভাবে লম্বা হয়ে উঠেছে। সরু মুখে মস্ত নাক আর কালো কালো গোঁফ-দাড়ি। দূর থেকে কুমভের দীর্ঘ শুকনো চেহারা দেখলে 'উদ্ধত প্রকৃতির কথাটা বেশী ক'রে মনে হয়, মুখটাকে এমনই হাস্যকরভাবে ও ঘুরিয়ে রাখতে পারে যে, কাছ থেকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় চওড়া ঘাড়টা ওর ওপর চেপে বসায় "নাকটা উল্টে গেছে।" কুমভ বেশ বিনয়ী আর লাজুক। নম্র মৃদু গলায় অস্ফুট স্বরে কথা বলে। সব সময়ই উঠে দাঁড়ায়, ছোট ছোট বাক্যাংশ বলতে হলেও ইস্কুলের ছেলেদের মতোই ও চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কালো মুখে দুটো কটা চোখ জ্বলজ্বল করে, গোল গোল, নরম, পাখীদের মতো চোখ।

'উফার এক পশু-ব্যবসায়ীর ছেলে। ইস্কুলে পড়েছে। সপ্তম গ্রেডে পাশ ক'রে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়, জেলে কাটে কিছুদিন। কিছুদিন পুলিশের তত্ত্বাবধানে উফাতেই ছিল। পালিকা-মা বাড়ি থেকে দূর ক'রে দেওয়ায় গোটা রাশিয়া ঘুরে বেড়িয়েছে। উরাল আর ককেশাসেও গেছে, দুখবোরদের সঙ্গে বাস করেছে, তাদের সঙ্গে ক্যানাডা যাবারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ক্রীট-দ্বীপে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওরা তাকে ওদেশায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। দক্ষিণ দেশ থেকে পায়ে হেঁটে মস্কো এসেছে। "কিছু শেখবার" আশায় এখন এখানেই খুঁটি গেড়েছে।

এই শান্তশিষ্ট মানুষটার মধ্যে সামঘিন মনে ধরবার মতো কিছু দেখতে পায়। কেরাণীর চাকরি দিয়ে রাখে। প্রতিদিন পায়খানার পাশের ছোট ঘরটায় কুমভ খস্ খস্ ক'রে কলম চালায় আর সন্ধ্যেবেলায় শান্ত গলায় রহস্যময় সুরে বলে :

'আমাদের উচিত প্রাণাত্মা' আর 'জীবাত্মা'র প্রভেদটা ভাল করে বোঝা'—সরু-সরু দুর্বল হাত কপালের সমান উঁচু ক'রে ধরে বলে। হাতটাকে আবার হাঁটুর পাশে আস্তে ক'রে ঝুলিয়ে দেয়।' 'খ্রীষ্টের কথা মনে করুন : 'তব করে আমি প্রাণাত্মা প্রদান করিতেছি,'—জীবাত্মা নয়। আবার দেখুন : 'প্রাণাত্মাকে নির্বাপিত করিও না।' ব্যবহারিক যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রাণাত্মাকে প্রলুব্ধ করা যায় না, কিন্তু জীবাত্মাকে যায়। আমি যা দেখেছি সব সেক্টারিয়ানদেরই জীবাত্মা নিয়ে কারবার, প্রাণাত্মা নিয়ে নয়। দুখবোরেরাও জীবাত্মার মধ্যে প্রাণাত্মাকে বন্দী করেছে। সাধারণ লোকেরা প্রাণাত্মাকে নিয়ে বসবাস করে না—করে বলে যে ধারণাটা আছে, সেটা ভুল। সাধারণ লোক জীবাত্ম-শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র—যুক্তির, ব্যবহারিক অনুভূতির। এ এক দুর্দান্ত শক্তি, শুধুমাত্র পার্থিব স্বার্থ থেকেই এর জন্ম। বুদ্ধিজীবিরাই শুধু প্রাণাত্মার কারবারী, কাজেই সেটা অবাস্তব বলে পরিগণিত হয়। কুবানে সুবর্ণনিকেরা গান ক'রে : "আমার জিওনের নগরী খুঁজিয়া বাহির করিব। তথায় আমাদের আত্মাকে নিরাময় করিয়া তুলিব।" তবুও ওরা যেমন ধনী তেমনি লোভী। দুখবোরদের বেলায়ও ওই একই ব্যাপার। মনে হচ্ছে ওরা প্রাণ-শক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে, মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে, কিন্তু আসলে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে সব কিছুই অপেক্ষাকৃত ভাল। আর বুদ্ধিজীবিরা যান মন্দতরোর দিকে, কঠিনতরোর পানে।'

সামঘিন মুখের ওপর হাসি টেনে শোনে। কুমভের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আগে আগে চেষ্টা ক'রে দেখেছে কিন্তু কোন ফলই হয়নি। ওর যুক্তিতর্ক শুনে কুমভ আবার নিজের মতবাদগুলোই বলে যায়, এমন এক গলায় যেন সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে তার যা সত্য তাই একমাত্র সত্য। রাগ করে না বা ক্ষুব্ধও হয় না।

কিন্তু কখনো কখনো কথায় এত উত্তেজিত হয় যে ওর বক্তৃতা উচ্ছ্বাসে দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। চেয়ার থেকে একটু উঁচুতে উঠে জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে এমন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে যে মনে হয় ভয় পেয়েছে :

'শরীর। মাংস। জীবাত্মা আছে কিন্তু প্রাণাত্মা নয়। বগোমিল সেক্টের মতবাদ জানেন? ঈশ্বর অঙ্গ দিল, শয়তান দিল প্রাণ। একেবারে সত্যি কথা। সেইজন্যেই তো জনতার প্রাণাত্মা নেই। প্রাণাত্মা সৃষ্টি করতে পারে শুধু ঈশ্বর-মনোনীতেরা।'

'কেমন, ওর দর্শন তোমার কেমন লাগে?' সামঘিন ভারভারাকে জিজ্ঞেস করে। ভারভারার মনোযোগ দেখে ও বিস্মিতও হয়েছে, আমোদও পেয়েছে।

'বেশ সুন্দর লোক।' ভারভারা ছাড়া-ছাড়া স্বরে বলে : 'খুব সরল।'

মাঝে-মধ্যে দিয়োমিদফ আসে। তার ক্বচিৎ উপস্থিতি যেন সাময়িকতার কোনো অদ্ভুত নিয়মে চালিত। মনে হয় ধীরে ধীরে বিরাট বৃত্তপথ বেয়ে দিয়োমিদফ চলেছে, যার কোনো বিন্দুতে হোঁচট খেলেই সামঘিনের বাসা। ভাবখানা যেন এসে গৃহকর্তাদেরকে পরম আপ্যায়িত করেছে। অকিঞ্চনদের ওপর কৃপা ক'রেই যেন বলে : 'কেমন আছ? এখনো কি সব লোককে ঠেলে একটা কোণে নিয়ে ঠাসতে চাইছ?'

বিদ্রূপাত্মক করুণায় হাসে। 'আমি যে খুব প্রয়োজনীয়'—এ রকম একটা ভাবের পোশাক পড়েছে। আত্মসন্তুষ্টিও যথেষ্ট। ধীরে-ধীরে বুক চিতিয়ে হাঁটে। সৈনিক-সৈনিক ভঙ্গী। কাঁধ পর্যন্ত মাথার চুলকে নামতে দিয়েছে। গোছাগুলোর শেষপ্রান্ত বেশ জড়ানো-জড়ানো। গাল আর চোয়াল থেকে এমনভাবে নেমেছে যেন চাষার কাঁথার সুতো। তার দুই মরু-অক্ষিতে অহঙ্কার এসে বাসা বেঁধেছে, চোখ দু'টোকে ঘষা-ঘষা ক'রে তুলেছে।

সর্বজ্ঞ লুবাশা বলে দিয়োমিদফের নাকি এখন প্রচুর চেলাচামুণ্ডা। তাদের বেশীর ভাগই ছোটখাট দোকানদার, গুদামবাবু, কারখানা-শ্রমিক, বা সীবন্তী আর পাচিকাদের মধ্যে থেকে দলে-টানা কিছু মেয়েছেলে। দিয়োমিদফের শিক্ষাকে পুলিশ নাকি সুনজরেই দেখে।...দিয়োমিদফের ওপর তার মনের ভাবটা বেশ তিক্ত, যার প্রত্যুত্তরে তার কাছ থেকেও পায় বিদ্বেষ-সিঞ্চিত ঠাট্টার সুর।

'তোমার বই কি পড়েছি?' জিজ্ঞাসার সুর। তারপরেই : 'আমার ভাল লাগবার মতো লেখা কি আর ওগুলো—অনেক, অনেক নীচু।'

লুবাশার সঙ্গে তর্ক করে কমই। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর মেঝেতে পা ঘষছে, যেন দাগটাগ মুছে ফেলতে চাইছে।

একবার আলেক্সেই গোঘিন তার সামনেই কুমভকে বলে, বুদ্ধিজীবিদের সামনে দুটো রাস্তা—হয় ধনের প্রতি আনুগত্য নয়তো শ্রমিকশ্রেণীতে সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি। দিয়োমিদফ চড়া সুরে কড়া গলায় ঘোষণা করে :

'ভুল কথা। মানুষের সামনে শুধু একটিই পথ—ঈশ্বরাভিমুখী। বাদবাকী জোটপাকান মাকড়সার জাল।'

দিয়োমিদফের জ্ঞানে ভারভারার বন্ধুরা সরবে প্রশংসা জানায়। ক্লিমের মনে হয় এই ভূতপূর্ব ভূম্যধিকারীর সঙ্গে কুমভের খানিকটা মিল রয়েছে। তাই তাদের দু'জনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু নাঃ, কুমভ যে তর্কই করতে চায় না! প্রাণাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে যে দুর্মেল বিভেদটা রয়েছে সেই তত্ত্ব প্রাঞ্জল ক'রে বলবার পর শান্ত, ধৈর্যের সঙ্গেই দিয়োমিদফের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার-বাণী শোনে :

'সমস্তই ভুল, শুধুই কল্পনা। জীবাত্মা ছাড়া আর কোনো আত্মাই নেই। "আত্মা মোর, আত্মা মোর, কেন নিদ্রাতুর রে? সমাপ্তি যে ওই নিকটে রে।"—একথাটিই বুঝতে হবে। মানুষের সমাপ্তি নিকট হয়ে আসে কেন,—না, জীবন অতি-ভরণে ক্লিষ্ট। তোমরা, যুবকেরা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা চালিত মানুষদের পুজো ক'রে ভুল করছ। এখন তারা মানুষকে প্রলুব্ধ করছে দল গঠনের জন্য, নব-সেনানী গড়ে তুলছে।'

তিতিবিরক্ত হয়ে কারো সঙ্গে করমর্দন না করেই দিয়োমিদফ চলে গেল। লুবাশাও বিরক্ত হয়েছে। কুমভকে জিজ্ঞেস করল কেন সে দিয়োমিদফের কথার জবাব দিল না।

'আমি তর্ক করতে পারি না—ওঁর মতো মানুষের সঙ্গে,' চেয়ার ছেড়ে উঠে, অপরাধী-অপরাধী চিত্তে কুমভ স্বীকার করে। তারপর বসে পড়ে খানিকক্ষণ ভাবে। একটু হেসে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলে: 'আমি পারি না এ'দের সঙ্গে। জানেন তো, এমন সব লোক রয়েছেন, যাঁরা—যাঁরা বশ চিত্তাকর্ষক। তাঁদের প্রতি-হিংসার লিপ্সা খুব—প্রতিশোধ নিতে চায়...'

'তুমি কি ঘুমের মধ্যে কথা বলছ, ভাই,' ওর দিকে হাতটা ছুঁড়ে দিয়ে সমভা বলে ওঠে।

'না। সত্যিকথা, বিশ্বাস করুন,' কুমভ বেশ দৃঢ়স্বরে বলতে চায়। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, মুখের ওপর এখনো সেই অপরাধীর হাসি লেগে রয়েছে। 'এমন বহু লোক আমি দেখেছি। একজন দুখবোরকে জানতাম—বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু তার বুটজোড়া ছিল ভয়ানক আঁটো। কাজেই, বিশ্বাস করুন, যখনি বুট পরতো সব মানুষের ওপর সে খেপে উঠত। হাসবেন না! এমনকি—কি অদ্ভুত, না, শুধু শক্ত বুটের জন্যেই একটা মানুষ জগতকে ঘেন্না করতে পারে!'

সামঘিনও হেসে ওঠে। কিন্তু অধৈর্য হয়ে ভারভারা ওকে শাসন করে:

'আঃ, ক্লিম থাম না...'

'সত্যিকথা.' কুমভ চেয়ারের পেছনটায় ভর দিয়ে বলে: 'আমার এক বন্ধু, এলিজাবেথগ্রাদের ক্যাভলরি ইস্কুল থেকে ভেগে-পড়া ক্যাডেট, সে-ও, বুঝলেন, ঘাড়ে তাকে কি যেন কামড়ে ছিল। ঘাড়টা ফুলে উঠল, আর অমনি তার ব্যবহারটাও সাংঘাতিক হয়ে উঠল। এমনকি, আমি যে তার বন্ধু, আমার সঙ্গেও। এই হলো গিয়ে আত্ম-প্রতিহিংসা। ক্ষতিপূরণ। ধরুন গালে একটা আঁচিল আছে, কি লোকটা একেবারেই নির্বোধ, মানে. যাই অভাব-ত্রুটি থাকুক না কেন, তারি জন্যে এ ধরনের ঘটনা খুবই সাধারণ।'

'দিয়োমিদফ কোন ক্ষতির পূরণ চাইছে?' ক্লিম গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করে।

'ঠিক বলতে পারি না। চিনি না তো। তবে একথা ঠিক, ইনি এমনিই মানুষ: কুমভ কথা কয়টি বলে বসে পড়ে।

সামঘিন ওর কেরানীর সঙ্গে সসম্মান দূরত্ব বজায় রেখে চলে। ক্বচিত-কদাচিত তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় যোগ দেয়। কুমভ মানুষটা খুবই অন্য মনস্ক, কর্মী হিসেবে অপটু। সামঘিনের মনে ভয় পাছে কেরানীটি ওর গণতন্ত্রী ব্যবহার দেখে কাজে আরো ঢিল দেয়। কুমভকে সীমিত বুদ্ধির মানুষ বলেই ওর মনে হয়, অনেক রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে বটে কিন্তু দুর্বল বোধশক্তি সেগুলো পরিপাক করতে পারেনি। প্রতিহিংসার কথাগুলো কিন্তু সামঘিনকে বিস্মিত ক'রে তোলে। তবে লোকটাকে যত সরল মনে করা গিয়েছিল তা ও নয়। ওকে আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করে, বিদ্বেষ যে একেবারেই নেই তা নয়।

*

একদিন সন্ধ্যেবেলায় স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সামঘিন মাকারভের দেখা পেল। তাকে চা-এ নেমন্তন্ন করল। মাকারভের চুলে পাক ধরেছে, রগের কাছটা প্রায় সাদা, কালো কালো গুচ্ছ অনেক পাতলা হয়ে এসেছে। দু-রঙা চুলে বেশ মানিয়েছে। তাতে হ্যাজেল-চোখ আরো ভারাতুর হয়ে উঠেছে। হয়েছে নম্রও। যদিও বুড়িয়ে যায়নি তবু চেহারায় বিষন্নতার ছোপ। পা দিয়ে দিয়ে তাল ঠোকে, সন্তান-ধারণে অনিচ্ছুক ফরাসী মেয়েদের গল্প করে, জার্মানীর জেবইকিণ্ডার-সিস্টেমের কথা বলে, জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে নিও-ম্যালথুসিয়ানিজমের আলোচনা করে। এইসব লক্ষণে ওর বিশ্বাস, শিল্প-বিজ্ঞানে অত্যুন্নোত দেশের সংস্কৃতির মধ্যে থেকে মা-হবার প্রবৃত্তিটাই দিন দিন লোপ পাচ্ছে।

'অফিস বা মেশিনের জন্যে মেয়েরা সন্তান ধারণ করতে চায় না।' গলার স্বরে কোন উচ্ছ্বাস নেই। যেন সামঘিনের কাছে নিজের দেখা বিবরণ সাদাগলায় ব্যক্ত করছে। ক্লিম ঠাট্টা ক'রে বলল :

'প্র্যাকটিস্ কমে যাওয়ায় গাইনকলজিস্ট কি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন?'

'না। ব্যাপারটা ভেবে দেখ,' মাকারভ বলে। কথা শেষ করবার আগে কিন্তু একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালায়, যতক্ষণ না সেটা পুড়ে পুড়ে শেষ হয়, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর ফুঁ দিয়ে সেটা নিভিয়ে লালচে অঙ্গার থেকে সযত্নে সিগারেট ধরায়।

সামঘিন ভাবে : 'চাষার মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন।'

'ব্যাপারটা হলো,' মাকারভ সুরু করে : 'অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যে শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী, তারাই সন্তান চয় না। এরাই তো হলো শাসকশ্রেণী। তাহলে ক্ষমতায় এদের কি লাভ? শ্রমিকরা ছেলেপুলে চায় না, কারণ উপোষ আর কে করতে চায় বল? কিন্তু ওরা কেন? অবশ্য এগুলো আমার কথা নয়, তুরোবোয়েভের..'

সামঘিন মুখটিপে হাসে।

'বাঃ, বেশ। করছে কি ও আজকাল?'

'ও? খুঁৎখুঁতে হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয়, অত্যধিক খুঁৎখুঁতিতেই ওকে খেয়ে ফেলেছে।'

ভারভারার দিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে মাকারভ্ ক' সেকেণ্ড চুপ ক'রে থাকে। তারপর খুব সংযত স্বরে বলে ·

'লিদিয়া তিমফিয়েভনা একবার ওর ওপরে খুব রেগে গিয়েছিল, বলেছিল, "নিজেকে গুলী ক'রে মারতে পারে না?" জবাব দিয়েছিল "বেনেদের খেরো-খাতায় নাম লেখাতে চাইনা।"'

সামঘিন ওকে লিদিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ভারভারা এতক্ষণ চুপচাপ বসে-ছিল, এইবারে উঠে পড়ে বেশ একটু দর্শনীয়ভাবেই যেন ঘর ছেড়ে চলে গেল। মাকারভ লিদিয়া সম্বন্ধে অনাগ্রহের সুরেই কথা বলে। নতুন কিছু সামঘিন জানতে পারল না। মাকারভ বিদায় নিল।

যেতে যেতে বলে গেল : 'কাল আমি সেণ্ট পীতর্সবুর্গে ফিরে যাচ্ছি। বসন্তে বোধহয় জায়গা বদল করব—খুব সম্ভবত কাজান-এ যাব, তোমস্কেও যেতে পারি।' কেমন নীরস ছাড়া-ছাড়া ভাব রেখে চলে গেল।

'তুমি পালিয়ে গেলে কেন?' সামঘিন জিজ্ঞেস করল ভারভারাকে।

'মাকারভকে আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না,' ভারভারা খিট্‌খিটে মেজাজে বলে উঠল: 'যেন হারেমের খোজা।—!'

'যাঃ!' সামঘিন খুশী হয়ে বলে ওঠে। ভারভারা তার নিজের কাপে চা ঢেলে নিতে নিতে বলে:

'আমি যদিও বিশ্বাস করি না ওর মতো চেহারার বা স্বাস্থ্যের মানুষ—মেয়েদের কাছ থেকে শুধু যে দার্শনিক কারণেই সরে থাকে তা নয়—আসলে বাপ হওয়ার ভয়েই ও সরে থাকে। তারপর দেখো, ওর ওই যে নালিশগুলো, মেয়েরা নাকি সন্তান ধারণ করে না...'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ—' সামঘিন হাসি দিয়ে সুরু করে কিন্তু ঠিক সময় মতই থেমে যায়। দেখতে পায় ভারভারা এটুকু শুনেই শক্ত হয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে, চোখ দু'টো গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, কি বলছিলে?' ঠোঁট কামড়ে ভারভারা জিজ্ঞেস করে: 'তুমি আমাকে সন্তান বিনষ্টের কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাইছ, না?'

সামঘিন গম্ভীর গলায় বলে: 'না, বিন্দুমাত্র না। তোমার এ-রকম ভাবার কারণ?'

'তাহলে কি বলতে চাইছিলে?'

'শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম স্বচ্ছল শ্রেণীর মধ্যে জন্মের হার সত্যি সত্যিই কমে যাচ্ছে। আর এ-রকম লক্ষণ নিশ্চয়ই কোন খারাপ...'

অধ্যাপকের মতোই বক্তৃতা দিয়ে চলে যতক্ষণ না ভারভারা বাধা দেয়:

'ওঃ! ঘাট মানছি। ভুল ধারণা করেছিলাম।'

সামঘিনের মনে হয় ওর মাপ চাওয়াটা যেন বড় বেশী ভব্য গোছের হলো। এর চাইতে না-চাওয়াও যে ভাল ছিল। কিছু দিন থেকেই মনে হচ্ছে ভারভারার মেজাজ সব সময়ই কেমন যেন খিঁচড়ে থাকে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করে না। যখনই এমন মেজাজ দেখে, সযত্নে চেষ্টা করে যাতে ও আরো বিরক্ত না হয়ে ওঠে, একা একা থাকতে দেয়। ভাবে এ-রকমটি করলেই কোন বিরক্তিকর দৃশ্য বা ঝগড়াঝাঁটি এড়িয়ে থাকা যাবে। ভারভারা আজকাল সব সময়েই সিগারেট টানতে শুরু করেছে। সামঘিন ক'দিনের মধ্যে এটাও বরদাস্ত ক'রে নিল, মনকে বোঝাল দাঁতের মধ্যে সিগারেট নিয়ে ভারভারাকে বেশ মানায়। তারপর ও নিজেও ধূমপান শুরু করল। তবু সব মিলিয়ে এ-কথা বলা যায় না যে ওর জীবন কিছু খারাপ হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নব-বর্ষের পরে ওর অভ্যস্ত জীবনে কিন্তু আকস্মিক মোড় নিল।



সারঘেই জুবাতভকে নিয়ে বহু দিন থেকে বহু রকম আলোচনা হচ্ছে। প্রথমে তার নাম নেওয়া হতো ঘৃণার সঙ্গে, বিদ্রূপভরে, তারপর ক্রমে ক্রমে এল গুরুতর আলোচনার পালা। শেষে সামঘিন লক্ষ্য ক'রে দেখল কারখানা-শ্রমিকদের মাঝে সৈন্যরক্ষীদের কাজকর্ম সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের যদিও অস্থির ক'রে তুলছে কিন্তু নারোদনিকদের কাছে তা কথঞ্চিৎ আশ্বাসই যেন বয়ে আনছে। সুসলভের ঘরের প্রদীপ আবার চিলেকুঠরীর জানলায় জ্বলে উঠল। হাসতে হাসতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সামঘিনকে বলল:

'জুবার্তাভিজম্‌ তো মার্ক্সিস্ট-প্রচারের স্বাভাবিক পরিণতি।'

শ্রমিকরা কি অদ্ভুত তৎপরতায় "পারস্পরিক সাহায্য সমিতি"-তে নাম লিখিয়েছে, সে-কথা বলতে বলতে লুবাশা রাগে ফোঁসে, প্রাণপণে নিজের বিনুনী ধরে টানে, আর হতভম্ব হয়ে বলে :

'যদি তাঁতের মজুরেরা হত, তাও না হয় বোঝা যেত—কিন্তু এ যে দেখছি ধাতু-শিল্পের শ্রমিকেরা, ওরাও এই টোপ গিলল! ইস্‌, ভেবে দেখ!'

কিছুতেই শান্ত হয় না। কুতুজভের চিঠির কথাতেও না, যে ওকে লিখেছে :

'রাসায়নিকের পরীক্ষাটায় সাহস আছে বটে, কিন্তু অকৃতকার্য হতে যে বাধ্য। কেন-না শত চেষ্টা করলেও "কেমিক্যাল অ্যাফিনিটি"র সূত্র তো আর পুলিশেও বদলাতে পারে না। আর অলৌকিক কিছু যদি ঘটেই, সৈন্যরক্ষী. পদাতিক বা অশ্বারোহী, সবাই যদি শোষিতদের সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে শোষকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তো আর কি চাই। কিন্তু আলৌকিক কখনো ঘটে না.—এখানেও না, ওখানেও না,—অথচ ভুলভ্রান্তি সব দিকেই সব সময়েই সম্ভব।'

দুঃখের সঙ্গে অবুঝ গলায় লুবাশা বলে : 'বুঝি না এ নিয়ে ও কি ক'রে ঠাট্টা করতে পারে?'

গোঘিনও ঠাট্টা করতে চায় কিন্তু ভালমত পারে না। আমুদে প্রাণটাই যেন তাকে তাগিদ দিয়ে ওঠে, বলে :

আমার সতের জন ছাত্রের মধ্যে শুধু দু'জনই বোঝে জুবাতভ পাজী।'

"কৃষক-মুক্তি" দিবসে শ্রমিকরা নাকি ক্রেমলিনে যাবে—মুক্তিদাতার স্মৃতি-স্তম্ভে,—কথাটা প্রচার হয়ে পড়তেই লোকে অবাক আর দুঃখিত হলো।

গেলও। তবে ১৯শে ফেব্রুয়ারী নয়, তিনদিন পরে, রবিবারে। দিনটা ছিল মার্চ মাসের মতোই কোমল, যদিও অতটা স্পষ্ট নয়। রেড-স্কোয়্যারের ওপর দিয়ে স্যাঁতসেঁতে হাওয়া উঠেছিল, তুষার-ঝড়ের পূর্বাভাস। মস্কো নদীর ওপার থেকে মেঘের দল দ্রুতসঞ্চরণে এগিয়ে এল, ক্রেমলিনের কাছে এসে নীচু হয়ে জোট বাঁধল। দু'পাশ থেকে এল উত্তাল কালো ভীড়ের ঢেউ, স্কোয়্যারটাকে ভাসিয়ে। তার একটি শাখা গড়িয়ে-গড়িয়ে ক্রেমলিন-প্রাচীর পর্যন্ত পোঁছুল, দ্বিতীয়টি শাস্কি আর নিকোলস্কি গেট পর্যন্ত। শ্রমিকরা ধীর পদক্ষেপে এগোয়, গোলমাল নেই কিন্তু গাম্ভীর্যও অনুপস্থিত। কথা বলে কম, যেটুকু বলে তাও নীচু গলায়, অসন্তোষের বিড়বিড় ধ্বনি। বিশাল জনতার সম্মিলিত চলনে-বলনে যে রকম হই-চই হওয়ার কথা, তা নেই। ঠাণ্ডায় বহু লোক কাশছে। হাজার-হাজার পা মচমচ্‌ শব্দে তুষার দলছে, যেন কোনো ঠাণ্ডা-অবরুদ্ধ অতিকায় গলা ঘর্ঘর আওয়াজ ক'রে উঠছে গার্গানটুয়্যান ফুস্‌ফুসের নিরুদ্ধ দমকে।

ক্লিম সামঘিন ঐতিহাসিক যাদুঘরের সিঁড়িতে একদল দর্শকের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। যাদুঘরের দুটো পাশ দিয়েই শ্রমিকরা আসছে, ক্রেমলিন গেটে একটু ইতস্ততঃ ক'রে থমকে দাঁড়াচ্ছে। তারপরেই তারা একমুঠো হয়ে গেটটার পাথুরে চোয়ালে এমন ক'রে চাপ দিচ্ছে যেন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। পাশ দিয়ে ক্রমাগত মানুষের আনাগোনা। তাদের মুখের পানে সামঘিন চেয়ে চেয়ে দেখে। শ্রমিকদের দুই-তৃতীয়াংশই বোধহয় চল্লিশ পোরোন মানুষ, অনেকেরই দাড়ি পেকে উঠেছে, তরুণের সংখ্যা নেহাৎই অল্প। বেশী বয়সের লোকেরা থম্‌থমে নিঃশব্দে পথ চলে, আর অল্প-বয়সীরা কথা বলে, হাসে, শাপ-শাপান্ত করে, যাদুঘরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকমকে পোশাক পরা লোকগুলোর দিকে মুখ বেঁকিয়ে তাকায়, উদ্ধতও হয়ে ওঠে। পা-ঘষা আর পা-ফেলার আওয়াজে কথা ডুবে যায়। ক্যাপ-পরা মাথার

সমুদ্রে শাল-ঢাকা বা রুমালে আবৃত মাথা শুধু এদিকে-ওদিকে দু'চারটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখা যায়। মেয়েরা অনেক শান্ত। তাদেরি একজন, পুরুষের বেঁটেকোট পরে লাঠিহাতে পথ চলেছে। পেছন দিকে নিতম্বের কাছটায় পা-দু'টো এমন অস্বাভাবিকভাবে বেঁকিয়ে তুলছে যেন মনে হয় মেয়েছেলেটার রাস্তা হাঁটার ধরন কোণাকুণি। মুখটা মস্ত, ইঁট রঙের, তাতে ভুতুড়ে তরলতা,—মাথা নেড়ে-নেড়ে জনতার আর সবাইয়ের মতোই অবাক চোখে স্কোয়্যার দেখে। এই যেন প্রথম সে এই পুরোনো প্রাচীর, ভারিক্কী দোকান ঘর, নানা রঙের ক্যাথেড্রাল, মিনিন এবং পোমারস্কির ব্রোঞ্জমূর্তি দেখবার সুযোগ পেয়েছে।

বারবার ক্লিমের চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে অজস্র ডীকন আর মিত্রোফানভের মুখ। ক্লান্তিকর পৌনঃপুনিকতায় তারা আসছে। তেমনি শুকন-লম্বাটে বা গোলগোল লেপাপোছা মুখ। তবু আগেরটার চাইতে পরেরটাই যেন অনেক বেশী ক'রে নজর পড়ছে। এদের মধ্যে শুধু একটি মুখই ক্লিমকে দুনায়েভের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সামঘিনের মনে হয় এদের মধ্যে কিছু লোক, হয়তো অনেকেই বা প্রায় বেশীর ভাগই—ওকে আর ওর আশেপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা দর্শকদেরকে ঠিক সে-ই চোখেই দেখছে যে-চোখে ও নিজে বা পাশের মানুষগুলোও তাদেরকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। একই রকম কৃপামিশ্রিত, উদাসীন, বিদ্রূপাত্মক, উদ্ধত গম্ভীর দৃষ্টি, যার সহজ নাম সম্পূর্ণ অপরিচয়ের চাউনি।

'আমরা', ঈস্টার-রাতে উচ্চারিত মিত্রোফানভের উচ্ছ্বসিত এবং গুরুগম্ভীর কথাগুলো মনে পড়ে। আবার মনে ঝলক্ দিয়ে ওঠে এই শব্দটাও,—"শ্রেণী"। কিন্তু সংগে সংগে এ-কথাও ভাবে যে সেই গ্রামটায় যখন কৃষাণেরা শস্য-গুদামের দরজা ভাঙছিল, বা, নির্জন নভগোরদে যখন জার এসেছিল, কই, তখন তো রাষ্ট্রের শ্রেণী-ভিত্তিকতার অনৈক্য-তত্ত্বটায় ওর একটুও বিশ্বাস হয়নি।

জোর গুঁতো দিয়ে একজন লোক ক্লিমের পাশে এসে দাঁড়াল। মুখের ওপর গোল ছোট দাড়ি, গায়ে খেঁকশিয়ালের লোম-বসানো চাষাড়ে ওভারকোট আর আস্ত্রাখান টুপী। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেছনের ঘেরটা জোরে-জোরে দোলায়, ভাবখানা যেন এক্ষুণি শূন্যে ঝাঁপ দেবে। লোকটা এক-পা থেকে আর পা'য়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। বেশ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে :

'বাতাও তো ভাই, হচ্ছে কি এগুলো? বুঝতে পারে কার বাপের সাধ্যি? কাল মেরে আজ হাউ-হাউ কান্না—এই দাঁড়াল তো?'

সরু ক্যানকেনে গলার কথাগুলোয আর হাসিতেও বিদ্বেষ মাখান :

'হিঃ! হিঃ!'

সামঘিনের পেছনে এক ধাপ উঁচুতে দাঁড়িয়ে একজন বিশ্বাসের গলায় বলে ওঠে : 'এটা কিন্তু ছাত্রদের বিরুদ্ধে হচ্ছে। অন্যেরা করছে বিদ্রোহ আর মজুরেরা..'

তৃতীয় এক রোগা-খস্খসে গলা কাত্রে ওঠে : 'আমার মনে হয় এই জলুসটা করতে দেওয়াই ভুল হ'য়েছে।'

সংগে সংগে দু'জন লোক ব'লে উঠল : 'ঠিক কথা।'

'কেন, ভুল কেন?'

'কি জানেন', রোগা-গলা আম্তা-আম্তা করে : 'যদি বিশ বছর পরে, নিহত জারের কথা আবার নতুন ক'রে মনেই পড়ল তো নিজের-নিজের পাড়ার গির্জায় গিয়ে মেমোরিয়াল-সার্ভিস করলেই হয়..'

'ঠিকই তো। পয়লা মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা খুবই উচিত ছিল...'

'ওদিকে মুক্ত-কৃষকেরা যে উপোস ক'রে মরছে...'

'হ্যাঁ, এক্কেবারে হক্ কথা.' আস্ত্রাখান-টুপী পরা লোকটা তৎক্ষণাৎ সায় দেয় : 'এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভীড় করে বেরিয়ে পড়া, ক্রেমলিনের দিকে ঝাঁক বেধে যাওয়া,...গলত্ বাত্। ক্রেমলিনে, হ্যাঁ, যেখানে কিনা রাজমুকুট আছে, রাজার হাজারো জিনিস আছে, শাহী খাজাঞ্চিখানা আছে, আরো কত কি আছে—'

'এটা কার মাথা থেকে এস্ছে হে?' কে একজন জলদকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কিন্তু কোনো জবাবই পেল না কারো কাছ থেকে। মিনিটখানেক পরে সব গলা ছাপিয়ে, লোকটার বিরক্তি আর ঘেন্না প্রকাশ পায় নাটুকে-ঢঙের চিৎকারে : 'ক্রেমলিনকে গোশালা বানাল হে ..'

'আমি প্রতিবাদ করছি। এ-সব সম্পূর্ণ ওপর-পড়া কথা!' সামঘিনের পেছনে আরেকটি আহত কণ্ঠ ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। 'এখানে এমন এক দৃশ্য আমরা দেখছি যেটা জার আর তাঁর প্রজাদের মধ্যে মিলনের প্রতীক...'

'জার নয় দাদা, জারের ঠাকুদ্দার বিতিকিচ্ছি মনুমেণ্টটা...'

সঙ্গে-সঙ্গে ফাজিল-গলায় কে অনেকদিন আগের-ভুলে-যাওয়া ব্যঙ্গকবিতা সুর ক'রে আবৃত্তি করে :

'পলকা ভাস্করের
পাগলা কাজে
মানুষ-ত্রাতা জার
(আজ) মাঠে সাজে—।'

দেখবার লোক ক্রমশঃ বেড়ে উঠল। বিড়বিড়ে মুখওয়ালা হাইকোর্টের একজন অফিসার সামঘিনের সামনে সরে এল। পেছনে পেছনে এল সেই উকীলবাবু—মিঃ ম্যাগনেট—শ্রীচুম্বকাকর্ষণবাবু—অদ্ভুত নাম। চট্ ক'রে হাত বাড়িয়ে কোর্টের অফিসারের সঙ্গে করমর্দন ক'রে নেয়। সামঘিনকে কনুয়ের গুঁতো মেরে জিজ্ঞেস করে :

'তারপর? কেমন মনে হচ্ছে?'

সামঘিন নীরবে কাঁধ বাঁকায়। অফিসার হলদে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল : 'অদ্ভুত ব্যাপার—শ্রমিকদের মাথায় এইকথা ঢোকান যে মালিকদের সঙ্গে লড়াইয়ে গভর্নমেণ্ট তাদের সাথ দিচ্ছে।'

'পরের বার প্রসিকিউসন্-বক্তৃতায় একথাগুলো বলবেন, উকীলবাবু খোঁচা মারলেন। এমন জোরে হেসে ওঠে যে যেতে-যেতে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই তার দিকে তাকিয়ে দেখে।..দর্শকদের ভীড়টায় আরো কজন এল, একজনের পাকাচুল, দু'জন কমবয়সী। অনেক মজুরও এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। মোর্চা থেকে চলে এসেছে। মিউজিয়মের কাছে দর্শকদের জমাট ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা। প্রথমটায় সামঘিনের মনে হয় ওরা বোধহয় লুকিয়ে পড়ছে কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারে তা' নয়, ভুল ধারণা। ততক্ষণে ওর সামনেও অনেক শ্রমিক এসে দাঁড়িয়েছে, মেশিন-অয়েলের বদ্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পার্কের এদিকে-ওদিকে পুলিশ ঘুরছে. তাদের কোটের ঘের বাতাসে দুলছে। মনে হয় আর্কেডেও বহু পুলিশ লুকিয়ে আছে, চীনা-টাউনের সরু গলিতেও লেরনোয়েপ্লেস্ লোকে ঠাসা, দেখে মনে হয় যেন একটা বোঝাই পিপে। মস্কোরক্ষাকর্তার মনুমেণ্টের চারধারে বহু দর্শকের ভীড়। কোজমামিনিনের মূর্তি তার ব্রোঞ্জের হাত দিয়ে লোকগুলোকে ক্রেমলিন দেখাচ্ছে, তবুও লোক একটুও নড়ছে না।

ইতিমধ্যে শ্রমিকরা জায়গায় জায়গায় জটলা পাকিয়ে তোলে, চলাফেরায় একটুও দ্রুততা নেই, একজায়গায় চাক বেঁধেও নেই, ছিন্নভিন্ন অনেক জটলা। বহুলোক হাতদু'টো পকেটে ঢুকিয়ে, বা পেছন দিকে মুড়ে সামনে ঝুঁকে রয়েছে। সামঘিনের

একটা ছবির কথা মনে পড়ল, "নীভা"-তে বেরিয়েছিল—মলচের দানবীয় চেহারার প্রতিকৃতি, সামনে নুয়ে-পড়া অসংখ্য লোক শেকলে বাঁধা, কার্থেনীয়ানদের ভীড় ঠেলে চলেছে, কোন ভয়াল দেবতার কাছে যেন তাদের বলি দেওয়া হবে।

কিন্তু স্মৃতিচিত্রটা মনের মধ্যে আপনা-আপনি উদয় হলেও ওটা স্পষ্টতঃই বেমানান। সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে মিলিয়ে গেল। তবু সামঘিনের মনে অনবরত একটা প্রশ্ন পাক খায়—এই একঘেয়ে ধরনের হাজার-হাজার দাড়িওয়ালা, বাতাসে ফরফরে চুলের মানুষগুলোর সঙ্গে অন্য যে-কোন ভীড়ে দেখা লোকের কোনই পার্থক্য নেই। ঠিক অন্য যে কোনো ভীড়ের মতোই এটাও। নারোদনিকেরাই ঠিক—নেতা না থাকলে, বীর না থাকলে, জনতা একটা জড়পদার্থ মাত্র। আজ এই জনতার নেতা তো সৈন্যরক্ষী-প্রশাসনের একজন বিশিষ্ট পদাধিকারী, সারঘেই জুবাতফ।

'শ্রেণীচেতনা।..."কিন্তু সত্যিই কি কোনো বালকের অস্তিত্ব ছিল?"—'

একে-একে সুসানিন, কমিশারভ, খালতুরিন, সকলের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সব চিন্তার কণাগুলোই একের পর এক এলেও, মনের মধ্যে গভীর বিভ্রান্তিকর চেতনার ওপর দিয়েই ভেসে গেল, ছুঁয়ে যেতেও পারল না। তা'ছাড়া, দর্শকদের অনবরত কথার কচ্‌কচিতে কি কোনো অভিনিবেশ সম্ভব!

'এরা কিছু অন্য ধরনের নয়। বোধহয় আমার গায়েই মার্ক্সবাদের ছোপ লেগেছে,' সামঘিন নিজেকে বোঝায়।...নিজের চোখেই তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মজুরদের ভারী পায়ের ছাড়া-ছাড়া মিছিল গেটের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে আবার জমাট পিণ্ড পাকিয়ে তুলল, ক্রেমলিনে ভেঙে পড়ল।

'অন্ধদের মতো। পায়ের নীচে যদি পড়ে, না দেখেই দলে-পিষে শেষ ক'রে দেবে।' হঠাৎ আপন মনে বলে ওঠে। অন্য চিন্তার চাইতেও এই ভাবনাটাই ওর মনে প্রবল হয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারে জ্বরের ঘোরের মতন একটা জোর-উচ্ছ্বাসের দমক ভেতর থেকে উঠে আসছে, পরিমাণে কম কিন্তু এর আভাস-ইঙ্গিতও আগে কোনো দিন পায়নি। বিষ-ফোড়ার মতো বাড়ছে, কন্‌কনে ব্যথা, যতই ধ্যান-ধারণা করুন না কেন, একটুও কমছে না। পরিষ্কার বুঝতে পারে এই উচ্ছ্বাসকে রূপ দেওয়া চলবে না, কথায় ব্যক্ত করলে হবে না, বরঞ্চ একে দাবিয়ে দিতে হবে, মন থেকে তাড়াতে হবে।

ফটকে চিৎকার উঠল : 'টুপী খুলে! হেই, ভাইসব! টুপী নামাও না!'

আদেশটায় সামঘিনের মনে পড়ে যায় সেই সদম্ভ দু-লাইন কবিতার কথা :

'কোন্ সে হতচ্ছাড়া চাঁদি খুলবে না
ধর্মের স্থান ক্রেমলিন-গেটেতে?'

খাটো মতন একটা বুড়ো মানুষ, পরনে বুকখোলা কালো ছাগলের চামড়ার কোট, টুপী নাড়তে নাড়তে আহ্লাদে চেঁচিয়ে ওঠে :

'এক শালাকে এক্ষুণি পাকড়েছে।...বজ্জাতটা বলে কিনা আমরা কোথায় যাচ্ছি। চেঁচাচ্ছিস, কোথায় যাচ্ছিস, এই বেকুবগুলো হ্যামের গুষ্টি! পাগলের মতো, শালা হারামজাদা!'

'কেলেঙ্কারী না ক'রে আমরা কোনো কাজ করতে পারি না,' দাড়িওয়ালা একটা লোক তার ধোঁয়াটে মুখ দিয়ে গম্ভীর মন্তব্য করল।

'"যত্তো সব নোংরা কাণ্ড," ও বলছিল...'

'ছাত্র?'

'না, নাগরিক।'

'মাতাল?'

'কে জানে? এক নজরে তো আর বলা যায় না।'

'জোয়ান?'

'হ্যাঁ। জোয়ান বইকি।' থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপছিল, যেন প্রচণ্ড রেগে গেছে—"কোথায় যাচ্ছ?" প্রশ্ন করেছিল।'

'ক' হাজার হবে? সামঘিনের সামনে সাদাসিধে পোশাক পরা একটা মোটামত লোক নির্জীবভাবে জিজ্ঞেস করে।

'দশ হাজার।'

'বে-শী।'

ক্লিমের মাথার ওপরের গাড়ী-বারান্দা থেকে কে রসিকতা ক'রে উঠল :

'মস্কো কি ডরিবে কভু জনতারে?'

তক্ষুণি জলদ কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল :

'জনতা তো তার কাছে যেন জাঁতা-কলে গম।'

ছাগল-চামড়ার কোটপরা বুড়ো লোকটা এরই মধ্যে দু'জন মজুরকে জেরা করতে শুরু করেছে।—ওরা ঠিক তক্ষুণি দর্শকদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল।—

'সাথীদের ফেলে চলে এলে কেন?

'তা'তে তোমার কি কাম।' ভারাক্‌সিনের মতো চেহারার একটা লোক হেঁকে উঠল। আরেকজনের মুখটা যেন বুড়ো সৈনিকের, সে বেশ আপসের সুরে বলে :

'ভয়ানক ঠেলাঠেলি। গেটের কাছে যাওয়া যায় না। হাড়-পাঁজরা ভেঙে চুড়চুড়্‌ হ'য়ে যাবে।'

'তা'লে শুরু করতে কে বলেছিল হে? হইচই পাকিয়ে দিয়ে তারপর পিট্‌টান?'

টুকরো কথাবার্তার তোড়ে, দর্শকদের মাঝখান থেকে ছোট্ট ঝর্ণার মতো কোনো ব্যস্তকণ্ঠের ধ্বনি ভেসে উঠল :

'কিছুই বুঝছি না বাপু। জলুসটা কিসের জন্যে? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, যদি হতো সৈন্যদের মার্চ, সঙ্গে ঢম্পর ঢম্পর বাজনা, বা আইকন আর ধ্বজা নিয়ে যাজকের দল, বা যদি দেশের তামাম জনতাও হতো, তাহলে বলতাম, এস হে স্বাগত! কিন্তু এই যে, যা এখানে হচ্ছে, তা'থেকে আমরা পাবটা কি? আমার তো মনে হয় শুধু আরো কিছু দলাদলি। আজ মজুরেরা, কাল দোকান-কর্মচারীরা, পরশু চিমনি মোছার ধাঙড়েরা, এই রকম হরেক কিসিম্‌। কিন্তু কেন? বলুন না মশায়, আপনাদেরই জিজ্ঞেস করছি! জবাব তো আমাদেরই দিতে হবে। এতো আর খোদিনস্কি মাঠে বেড়াতে যাওয়া নয়; কি বলেন?'

দর্শকদের নানা কথার টুকরো আর ভয়-পাওয়া হুঙ্কার। এর মাঝে প'ড়ে সামঘিন মনের অতিপরিচিত এমন কি পছন্দসই, চিন্তা-সূত্রগুলোকে সরিয়ে রাখল। ইতিমধ্যেই সেগুলো কিন্তু এত বিকৃত হ'য়ে উঠেছিল, এত আয়াস সাধ্য, এত সহজেই পদধ্বনিতে বিলীয়মান যে ক্লিমের মন ধিক্কারে ভরে উঠল :

'কি অজ্ঞতা! মনের কি দারিদ্র্য!'

ক্রেমলিন থেকে একটানা চিৎকার ভেসে এল। কেমন রোঁয়া-রোঁয়া পশমের মতো, জবরজঙ্গ, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বাতাসকে যেন গরম ক'রে দিল। খেঁকশিয়ালের লোমওয়ালা চাষাড়ে-কোট পরা মানুষটা সবাইকে আশ্বস্ত করে :

'ওরা গাইছে—গান গাইছে "ঈশ্বর মোদের রক্ষা করুন"!'

ক্যাপটা খুলে মহিমান্বিত ভাসিলির ক্যাথেড্রালের দিকে মাথা নুইয়ে ক্রশ ক'রে সে দ্রুত চলে যায়।

দর্শকরা যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। অবিলম্বেই তাদের ঘন-দেওয়াল খুলে গেল, ছড়িয়ে পড়ল। সামঘিনও ধীর-পায়ে চলতে শুরু করে। বিপণি-বীথিতে এসে মিত্রোফানভের সঙ্গে দেখা। ল্যাম্পপোস্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইভান পেত্রোভিচ,—গালদুটো ফোলা-ফোলা, ঠোঁট ঝুলে আছে, টুপীটা চোখের ওপর নামান। দেখে মনে হয় যেন, এক্ষুণি ঘাড়ে আঘাত পেয়েছে। একমিনিটের জন্যে সামঘিনের মনে হয়েছিল লোকটা বোধহয় মদে চুড়। ইভান পেত্রোভিচ সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো কথা বলে না। ক্লিম ওকে দেখে খুব খুশী হয়—বহুদিনের কষ্টকর নির্জনবাসের পর যেন বন্ধুর দেখা পেয়েছে। হাতটা সটান বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু ক্লিম লক্ষ্য না ক'রে পারল না, ওর ভাড়াটে তার প্রসারিত হাতটা ধ'রে ঝাঁকানোর আগে উৎকণ্ঠিত মুখে ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল।

'হুঁ, বলুন, কেমন লাগল?'

'চমৎকার—চমৎকার,' মিত্রোফানভ তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়: 'বেশ চমৎকার,' কয়েকবার বলে। মাথাটা পেছনে ঝাঁকিয়ে টুপী সোজা ক'রে নিলে। কোটের বোতাম নাড়তে নাড়তে বলে: 'খুব সুশৃংখল। বেশ—মনোহর!'

ব্যবহারটা যেন কেমন অদ্ভুত। সামঘিনের কৌতূহল হলো। মিত্রোফানভকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করল। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মিত্রোফানভ হ্যাঁ বলল না। কেমন অপ্রস্তুত-ভাবে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। নেমন্তন্ন গ্রহণের পর কিন্তু দ্রুতপায়ে সামঘিনের আগে-আগে চলল।



নীচের তলায় রেস্তোরাঁয় অগুন্তি লোক। এককোণে এসে ওরা বসল, আলমারীর কাছে। প্রচুর হট্টগোল আর হই-চই। সবাই যেন সবাইকে চেনে, যেন পংক্তি ভোজনে বসেছে, প্রাণ খুলে গালগল্প করছে। কথার ফুলঝুরির মধ্যে কিন্তু সামঘিন শ্রমিকদের জলুস সম্বন্ধে একটি কথাও শুনতে পেল না। ওর নিজের মনটাকে যাচাই ক'রে নেবার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল, সাধারণ মানুষ কি ভাবছে না-ভাবছে সেটা যে জানা খুবই দরকার। মিত্রোফানভকে অনেক চেষ্টা ক'রেও তাতান গেল না,—লোকটা মুখই খুলছে না। ইভান প্রেত্রোভিচ শুধু ক্লিমের কথায় হুঁ-হাঁ ক'রেই গেল:

'আইডিয়াটা কিন্তু মাথা থেকে এসেছে বেশ।...খুব সত্যি কথা যে মালিকেরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। শ্রমিকশ্রেণীর কষ্ট তো লাঘব করতেই হবে।'

কিন্তু তিন গেলাশ ভদকার পর মিত্রোফানভ জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বোঁজে। মুখ কুঁচকে মাথা নাড়িয়ে ধীরে-ধীরে বলে:

'ক্লিম ইভানোভিচ, এসব হলো গিয়ে টক-কুল!'

'কি?' সামঘিনও তেমনি ধীরগলায় জিজ্ঞেস করে। মনে-মনে কিন্তু উৎসাহী হ'য়ে উঠেছে, মিত্রোফানভের স্বকীয়তা এবারে ফুটছে। আশ্বাসের নানা কথা বলবে এখন।

'টক-কুল,' মিত্রোফানভ আবার বলে। টেবিলের ওপর দিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে। 'বিশ্বাস হচ্ছে না, ক্লিম ইভানোভিচ? নেকড়েকে টক-কুল খাওয়াবেন? খাবে না তো!' চোখের পাতা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ফিস্‌ফিস ক'রে ওঠে। টেবিলের

ওপর আরো ঝ্ঁকে পড়েছে। 'বিশ্বাস করবেন না। এ সবই ধাপ্পাবাজী। আমি জানি।'

আঙ্ল সাংঘাতিক কাঁপছে। তাড়াতাড়ি আরো এক গেলাস ভদকা ঢেলে নিয়ে একচুম্কে শেষ করে দিল। রুটির টুকরো তুলে তা'র খানিকটা কামড়ে সেটাকে আবার প্লেটে রেখে দিল।

'নিজের বুদ্ধি দিয়েই তো লোকে বেশী ঠকে, তাই না? অনেকেই চান যে তাঁদের ইচ্ছামত জিনিসই দুনিয়ায় হোক, কিন্তু যা তাঁদের ইচ্ছা তা'র অস্তিত্ব কোথায়! স্রেফ কল্পনা। যেমন আমরা ভূত দেখি। জিনিসটার সবই তো কল্পনা, অথচ মনে হয় যেন আছে।'

চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে, ফিসফিস ক'রে বলে :

'দু'ঘণ্টা ধ'রে আপনার ওই তথাকথিত সৈন্যদের সঙ্গে মার্চ করলাম, একেবারে মাঝখান থেকে। কি বলে না-বলে সব শুনলাম। ওরা কি সত্যি সত্যিই জারের কাছে গিয়েছিল মনে করেন, তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে?'

মিত্রোফানভ খুক-খুক ক'রে হাসে। টেবিলের ওপরে হাতদুটো বেশ একটু উঁচুতে রেখে দোলায়, যেন আড়মোড়া ভাঙছে। একটা বোতলে ঠকাস ক'রে লাগে, সেটাকে তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে জাপ্টে ধ'রে চেয়ারে ব'সে লাফিয়ে ওঠে।

'দেখুন, যা বলব মাপ করবেন! কারখানার মজুরদের আমার চিনতে বাকী নেই,' গলার স্বর এখনো খুব নীচু : 'ওদের জাতটাই অন্য। সবকিছুতেই ক্যাঁচ্-ক্যাঁচ্ করে। ওদেরি একজন আজ এ'সব ভান করতে অস্বীকার করায় অ্যারেস্ট হলো।'

হ্যাঁ, শুনলাম বটে। বেপোরোয়া ছোকরা, না?'

'এ্যাঁ? না-না। নিখুঁত দাড়িকামান মুখ, বেঁটে মতন, বয়সে আপনার চেয়েও দু'এক বছরের বড়ই হবে।'

'মজুর?'

মিত্রোফানভ মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। পেছনদিকটা একবার চোখ ঘুরিয়ে, গলা খ'কারি দিয়ে ব'লে ওঠে :

'বারুদের মতো তেজ, বুঝলেন। ওদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ ফেটে পড়ল। বলল : যত্তো সব—। কি তোমরা?... জারকে মেরেছিল কেন? লোককে ঠকিয়েছিল ব'লেই তো, তা-ও কি বোঝ না? আর সেই তোমরাই এখন চলেছ তার সামনে হাঁটুগেড়ে বসতে।" সবাই তেড়ে এল, বুঝলেন, মার্-মার ক'রে ওকে ধাক্কা দিল, চড়-চাপ্টাও লাগাল, চেঁচিয়ে উঠল : "চুপ কর্, ব্যাটা আহাম্মক!" কিন্তু মাতালদের যেমন হয় না, ওর-ও তেমনি। কিছুই অনুভব করল না বোধহয়, ভীড়ের মধ্যে বিঁধে এল যেন লোহার শলা, গলা-ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল : "জঞ্জাল, আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল তোরা!" এটা কিছু বড় কথা নয় ক্লিম ইভানোভিচ, যে, একটা মানুষ বিদ্রোহ করল,--বড় কথা এই যে দশজনের মধ্যে সাতজন তাকে সমর্থন করল, আরো কি জানেন, ওকে মারল বটে কিন্তু সেটা অন্তর থেকে নয়, নিরাপদে থাকার জন্যে। খুবই সাধারণ কৌশল!... ক্লিম ইভানোভিচ, সমস্ত ব্যাপারটাই ভুল। হেরে-যাওয়া চাল। আমি স্পষ্ট শুনলাম, এদেরি মধ্যে থেকে এক চিঁড়িয়া ব'লে উঠল : "এবার থেকে জার লোকের নেতৃত্ব করবে!"—কিন্তু আমরা সবাই তো জানি আমাদের জার নিতান্তই দুর্ভাগা, অপদার্থ! হাজার-হাজার লোক তাঁর করোনেসনে মারা গেল, কিন্তু তিনি তো তার জন্য একটি বারও অনুতপ্ত হন নি। গুটি-কয়েক পুলিশকে ধ'রে তো ফাঁসীতেও চড়ালেন না। এঁ'র পিতামহ লোককে যখন-তখন ফাঁসী চড়াতেন। কিন্তু এ-ভদ্রলোক তাঁর কাকাকে ভয় করেন। আপনি কি মনে

করেন লোকে খোদিঙ্কার কথা ভুলে গেছে? অবিচারের কথা লোকের মনে জ্বল-জ্বল করছে। অবিচার ছাড়া তাদের মনে রাখবার মতো কোন্ কথাটাই বা ঘটেছে।'

মিত্রোফানভ যেন চমকে উঠে মাথা ঝাঁকাল।

'অবশ্য এসব আমার কথা নয়। লোকে বলছে। সাধারণ লোকে...'

'বটেই তো', টেবিলে আঙ্গুল দিয়ে দিয়ে টোকা মারতে মারতে সামঘিন সায় দেয়। মিত্রোফানভের কাছ থেকে এ জিনিস আশা করে নি। আশ্বস্ত হতে পারছে না, মনের মধ্যে সংঘাতের দ্বন্দ্ব। দু'রকম চেহারা ভেসে উঠছে। ভীতিজনক মনোভাবকে মিত্রোফানভ যদিও আরো বাড়িয়ে তুলেছে তবু মনে আশার আনন্দ মিত্রোফানভই বাড়াল, অন্য কেউ নয়।

'হ্যাঁ, গভর্নমেণ্ট আমাদের প্রতিভাহীন। জার অক্ষম।' ক্লিম বিড়বিড় ক'রে ওঠে। নিরাসক্ত চোখজোড়া ঘুরে ঘুরে আহার পুষ্ট মুখগুলোকে দেখে। ধোঁয়ায়-ভরা ঘরটায় রক্তোচ্ছল মুখগুলোকে ওর যেন মনে হলো দু'খণ্ডে কাটা তরমুজ। চেঁচামেচি, নানা রকম গন্ধ আর ভদকা, সব মিলে ওর মাথা গুলিয়ে ওঠে।

'দেখুন, আপনি তো সাদাসিধে সৎ রাশিয়ান একজন...'

মিত্রোফানভের মাথা টেবিলের ওপর আরো নীচু হয়ে এল।

'আচ্ছা, বলুন তো, আপনার কি মনে হয়? বিপ্লব কি আসন্ন?'

'হবে নিশ্চয়ই, বিরাট আন্দোলন হবে।'

মিত্রোফানভ মাথা উঁচু করে চাপাগলায় বলে:

'হবে, য়্যা?' সামঘিনের মনে জিজ্ঞাসা। মিত্রোফানভের জবাবের নিঃসন্দেহ স্পষ্টতা ভাল লাগে না। মনের মধ্যে যত বড় বড় চিন্তার কথাগুলো আকার নিচ্ছিল, তাদের প্রকাশে বাধা পড়ল।

'আপনি নিজেই জানেন,' ফিসফিস ক'রে মিত্রোফানভ বলে। মুখের ওপর এত কুঞ্চন জেগেছে যে মনে হয় মুখটা ঢেউ-খেলান। 'দৈনন্দিনের জিনিসপত্তরের অভাব আর পুলিশের অত্যাচার লোককে তিক্ত ক'রে তুলেছে'—মুঠি পাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলে: 'হতাশা বাড়ছে আর—' চেয়ারটা টেবিলের কাছে আরো সরিয়ে এনে এত ঝুঁকে পড়ে যে থুতনিটা প্রায় একটা প্লেটে এসে ঠেকে। বলে: 'দেখুন মনের কথা বলি, এ্যাদ্দিন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি সব ঠিক হয়ে যাবে, আমরা বুদ্ধিমান জাত তো। কিন্তু এখন দেখছি যুক্তিরহিত বা হতাশ লোকের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে উঠছে। যখনি কোনো মদের দোকানে কী সরাইখানায় যাই, কি শুনতে পাই? না, একে অন্যকে গলা উঁচিয়ে বলতে চাইছে জীবনে কত দুঃখ-দুর্দশা। কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যেন পরস্পরকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছে, কার জীবনটা কত বেশী কষ্টকর। এ নিয়ে অহঙ্কার করা হচ্ছে, বড় গলায় শোনান হচ্ছে।... আমার জীবন এর চেয়েও খারাপ। না, মিছে কথা, আমারটা খারাপ!...এ সব কি? ভবিষ্যতের কোনো কাজের অছিলা দেখানই তো?'

সামঘিনের মনে হলো, মিত্রোফানভের গোল গোল চোখে এখন যেন দুঃখের না-বোঝা আবেশ:

'ভেবে দেখুন, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথাটা যদি মনে করা যায় তো এইসব পাগলামি না? মানুষের জীবনে যে সময়টুকু বরাদ্দ তা থেকে কিছুই বাঁচে না। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা দিন দিন খুব বেড়ে যাচ্ছে যাদের কাছে জীবনের প্রতিটি দিনই উপোসের-শুক্রুবার। আর কি রকম জমাট হয়ে থাকতে হয় তাদেরকে, আঁটো হয়ে। তারা যেখানে থাকে সেখানে একজন ফালতু লোকেরও প্রবেশ করবার জায়গা নেই, চোরেরও না সাধুরও না। মানুষ তার আশে-পাশে অজস্র খোলামেলা জায়গা পাবে, পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাবে, তবেই না? কিন্তু সে-মাটি কোথায়?'

ক্লিম বাধা দিয়ে উঠল। এমনভাবে হাত তুলল যেন মিত্রোফানভের গালে থাপ্পড় কষাতে চায়। বলে :

'তবে শিগ্‌গিরি আরম্ভ হলেই ভাল নয় কি?'

'ক্লিম ইভানোভিচ!' মিত্রোফানভ চাপাস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে। মুখটা অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে, লাল টকটকে হয়ে গেছে, কান দুটোও যেন নড়ছে মনে হলো।

'বুঝেছি. আপনার কথা বুঝেছি। আপনার কথা বেশ বুঝেছি!'

'কারণ চিরন্তন ভয়ের মধ্যে বাস করা কি সম্ভব? সব সময় ভয় হয়তো কাল সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, অজানা ভাব-অনুভূতির সংঘাতে দুলতে হবে?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই তাই হবে,' মিত্রোফানভের মনেও শঙ্কার দোলা।

সামঘিনও টেবিলের এক পাশটায় শরীরের ভর দেয়। বুকটাকে টেবিলের ধারে খুব জোরে চেপে ধরে যতক্ষণ না আঘাত পায়। জীবনে এই প্রথম লোকের সঙ্গে ও পরম আন্তরিকতায় কথা বলছে। নিজের প্রতি এত আন্তরিকতাও এই প্রথম। মস্তিষ্কের মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগে যে নিজেরি খানিকটা অংশ বোধহয় ত্যাগ ক'রে ফেলল। আরাম পায়, কেন-না ভীতিকর কালো অনুভূতিটা এতে চাপা পড়ে গেল। অন্য লোকেরা কেতাবী-ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাতে ওর অহঙ্কারে একটুও ঘা লাগল না :

'স্বৈরতন্ত্র মানুষ শাসনে অক্ষম। বলশালীর হাতেই ক্ষমতা যাওয়া উচিত, যারা বলিষ্ঠ হাতে রাশিয়া থেকে শ্বাস ও জীবনরোধকারী জ্বালাময় মনুষ্য আবর্জনাকে দূর ক'রে দিতে পারবে।'

শুনতে পায় মিত্রোফানভ ফিসফিস সুরে সম্মতি জ্ঞাপন করে বলছে :

'সত্যিই তাই। মঙ্গলময় শাসনের জন্যেই বিপ্লব বরদাস্ত করলেও করা উচিত।'

সামঘিনের সামনে টেবিলের ওধারে একটা মাথা উঁচু হয়ে আছে। মনে হয় যেন কাটা মুণ্ডু হাতের চেটোতে রাখা। মাথাটার মুখে পরিচিত কিন্তু সামান্য বদলে যাওয়া ব্যঞ্জনা, কোঁচকান ভুরু, শক্ত ক'রে দাঁতে-দাঁত চাপা, কালো চোখ দুটো যেন ঝাপ্‌সা অথবা খুদে-খুদে ছাপা-অক্ষর পড়ার চেষ্টায় উদগ্র।

'গভর্নমেণ্ট শ্রমিক অথবা ছাত্র আন্দোলন বন্ধ করতে পারবে না।' সামঘিন গলা নীচু ক'রে বলে।

'ভগবান,' মিত্রোফানভ নিঃশ্বাস ফেলল। টান-টান মুখটা ঢিলে হয়ে পড়ায় চোখ দু'টোকে অশোভনভাবে বড় আর করুণ দেখাচ্ছে। নীল গাল দুটো বাদামী পাণ্ডুর হয়ে পড়েছে। 'বুঝেছি, ক্লিম ইভানোভিচ। আপনি আমাকে যাকে বলে জিতে নিচ্ছেন তো?' সামান্য নড়াচড়া ক'রে বুকের ওপর তিনবার ক্রুশচিহ্ন আঁকে, বলে : 'আমি রাজী, হৃদয় থেকে রাজী।'

স্বীকারোক্তির পালায় ঠাণ্ডা মেরে যায় ক্লিম সামঘিন। চুপ ক'রে থাকে। মুহূর্তের জন্য মনে হয় বেশ খানিকটা হাসির রসও আছে এর মধ্যে। মিত্রোফানভ কিন্তু আহত কণ্ঠে আস্তে আস্তে বলে ·

'জানি আমাকে আপনারা নেবেন না, তাড়িয়েই দেবেন, কারণ আমি সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি, দুর্বলচিত্ত। কল্পনাশ্রয়ী। আর চিত্ত যেখানে দুর্বল সেখানে, আপনি তো জানেনই, কল্পনা বিষবৎ।...না, না, দাঁড়ান।' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে যদিও সামঘিন কিছু বলার বা বাধা দেবার কোনো ভঙ্গীই করেনি। 'অনেক দিন আপনাকে বলতে চেয়েছি, কিন্তু যথেষ্ট সাহস ক'রে উঠতে পারিনি। সেদিন, বুঝলেন, থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। ওই যে নাটকটা খুব চলছে না আজকাল, যেটাতে

একদল দীনহীন লোক বিড়বিড় ক'রে কে জানে কি সব বলে,—দীনহীন অবস্থাটা কিন্তু ওগুলোর উচিত প্রাপ্যই—তাদের মধ্যে একজন বুড়ো লোক নানা সান্ত্বনার কথা-টথা বলে : একেবারে নির্ভেজাল মিথ্যেগুলো বলে যায়...'

দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে, কাঁপা-কাঁপা হাসিতে মুখটা কুঁচকে তোলে। হাত দু'টো ছড়িয়ে আবার বলে : 'হঠাৎ, বুঝলেন, আমার মাথায় কথাটা এল, উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বুড়ো লোকটার ব্যবহার যে আমারি মতো। সত্যিই।'

ভুরু কুঁচকে সামঘিন বলে : 'ঠিক বুঝলাম না।'

'হ্যাঁ, সত্যি, আমারি মতন—কত মিথ্যে বানায়, অতি পাজী! ক্লিম ইভানোভিচ, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং...' গলার মধ্যে কথা আটকে যায়। মাথা ঝাঁকিয়ে বলে : 'দেখুন—আমি নিজের সবন্ধে নানা রকম কথা বলেছি। সেজন্যে আপনার ক্ষমা চাইছি, ও-সব আমাকে বানাতে হয়েছে ভদ্রতার খাতিরে। বোদের কথা, আমার জীবনের কাহিনী, সব বানান,—'

'কি বলছেন? কেন?' সামঘিনের প্রশ্নে বিদ্বেষের আভাস। হতবুদ্ধিও হয়ে গেছে।

'নিজেকে ভদ্রস্থ দেখানোর জন্যে...'

কাঁপা-কাঁপা হাতে ইভান ভদকা ঢেলে নেয়, কিন্তু খায় না। গেলাশটা সরিয়ে দিয়ে, দরাজ-গলায় হিক্কা ওঠবার মতো ক'রে হাসে। কপালের দুপাশে চোখের নীচে ঘাম জমে ওঠে। তাড়াতাড়ি দৃঢ় হাতে দলা-পাকানো রুমাল দিয়ে সেগুলো মুছে ফেলে।

'কাজেই আমি মিত্রোফানভও নই ইভানও নই। আমি পেতর ইয়াকোভ্লেভিচ কতেল্‌নিকফ, নিজনি-নভগোরদের এক ব্যবসায়ীর সন্তান, সেখানে নামটা অতি পরিচিত .'

আবার মুখ থেকে ঘাম মুছে রুমালটাকে ঝাড়ে, চেয়ারে বসে বসে এমন অস্থির হয়ে ওঠে যেন এক্ষুণি লাফ মেরে উঠে দৌড়ে পালাবে।

'যখন আমার তেইশ বছর বয়স, তখন থেকেই আমি গুরুতর অপরাধের পুলিশী গোয়েন্দা। ভাল কাজ দেখিয়ে এখানে বদলী হয়ে এসেছি—'

'গুরুতর অপরাধের?' সামঘিন উদ্বেগভরা চাপাকণ্ঠে প্রশ্ন করে। বুঝতে পারে না কি বলা উচিত, শুধু মনে হয় মিত্রোফানভ যেন ওর মনে দাগা দিয়েছে।

'ভয় পাবেন না,' ইভান পেত্রোভিচ আশ্বাস দেয় : 'অন্য কোনো কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই। আর যদি থাকেও, আমি আপনার সেবাতেই নিযুক্ত আছি! আমার জন্যেই আপনি এবং আপনার স্ত্রীই হচ্ছেন প্রথম লোক যাঁরা...'

কথা শেষ না ক'রেই খুব জোরে নিশ্বাস ফেলে। আবার কথা শুরু করে বিব্রতভাবে, চোখ নামিয়ে : 'খুবই আশ্চর্য কিন্তু ছাত্রদের মারামারির দিনেও আপনারা এতটুকুও সন্দেহ করলেন না আমি কে! কারণ, যদি সাধারণ লোক হতাম তবে কি আপনাকে নিয়ে পুলিশের কাছে যেতে পারতাম? এই গেল এক নম্বর। তারপর ধরুন, একটা লোক দু-দু'টো বচ্ছর ধরে আপনাদের নাকের কাছে বাস করল, কোথাও কাজ করে না। শুধু বলে চাকরী খুঁজছে। তা'হলে কি ক'রে সে বেঁচে থাকে, টাকা কোথায় পায়? লোকটা বাসাতেও ঘুমোয় না।...আপনারা বড্ড সরল, আপনি এবং আপনার স্ত্রী, এত সরল যে আপনাদের আমি প্রায় ভয় করি! কিন্তু আনফিমিয়েভনার কথা ধরুন, সে নিশ্চয়ই ভাবে আমি একটা চোর—'

ওর মুখভরে সহজ অপরাধী-অপরাধী হাসি ফুটে ওঠে :

'আপনার স্ত্রীকে বলবেন না যেন।' মিত্রোফানভ কঠোর কণ্ঠে সাবধান ক'রে দেয় : 'যখন সময় আসবে আমি নিজেই তাকে বলব।'

নিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে যায়। যেন সামঘিনকে ভেবে দেখবার সময় দিচ্ছে। সামঘিনের মনে কিন্তু অন্য চিন্তা। ভাবছে, এই যে একটা লোক যাকে ও গুরুত্ব দিয়েছিল, পাঁচজনের বিশিষ্ট ভেবেছিল, নিখাদ সাধারণ বুদ্ধির মানুষ মনে করেছিল—

'কিন্তু বদলালই বা কোন্ জিনিসটা?' নিজেকে প্রশ্ন করে। কোনো উত্তর পায় না।

'এখন বোধহয় এ বাসা ছাড়তে হবে—' মিত্রোফানভের বিষাদভরা অস্ফুট কথা শুনতে পায় ক্লিম।

'না। তা'র দরকার হবে না। ভেবে দেখব—কি ক'রে—'

'গোয়েন্দা হয়েছিলাম লোভে পড়ে নয়, প্রয়োজনের খাতিরেই।' মিত্রোফানভ বিড়বিড় ক'রে ওঠে। একটু ভদকাও খেয়ে নিল। 'কিছুটা কল্পনাও অবশ্য। সমানে অপরাধীদের বই গিলতাম তো। কি অদ্ভুত! লেকোকের বুদ্ধি খুব।... হা ভগবান!' জোরে চেঁচিয়ে ওঠে: 'আমার এই ব্যবহার ক্ষমা করবেন আশা করি। ঈশ্বরের দিব্বি, ভালোবাসা আর বিশ্বস্ততা এই দুইয়ের মাঝে পড়েই আপনাকে যা কিছু ধোঁকা দিয়েছি।...ক্লিম ইভানোভিচ, ভালোবাসতে পারা যায় এমন কাউকে পাওয়া অত সহজ কথা নয়।'

'না, তা নয়,' মিত্রোফানভের অবিচলিত কালো চোখের তারা দু'টো ঝাপসা হয়ে আসছে দেখে, সামঘিন নিজের অজ্ঞাতেই বলে ওঠে। এতক্ষণ ভাবছিল লোকটার হাতে কি রকম অপদস্থ হতে হলো, এখন মিত্রোফানভের স্বীকৃতির বিস্ময়বোধ এসে তাতে যোগ হলো।...তবুও স্বীকারোক্তিটির অনস্বীকার্য আন্তরিকতায় সামঘিন বিচলিত, ওকে ভালোবাসার স্বীকৃতিটাও শুনতে ভাল লাগে। লোকটা আর আকর্ষণীয় রইল না সত্যি, কিন্তু চমকপ্রদ হয়ে উঠল।

'আমি ভাল লোক কখনো দেখিনি,' হাতে-ধরা কাঁটাটাকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মিত্রোফানভ বলে। 'এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। কাঁহাতক আর শুধুই কুকুরের গা থেকে পোকামাকড় বাছা যায় —মানে, আমার কাজের কথাটাই বলছি আর কি। তা'ছাড়া আপনিই বলুন, ক্লিম ইভানোভিচ, চোর জিনিসটা কি, যদি একেবারে শেষ পর্যন্ত বিচার করেন? একটা ছোট্ট ছুঁচলো টুকরো তো— মানে, বলতে গেলে একটা পোকা। ধরুন, একটা মশা-ই। দায়ে না পড়লে একটা যে মশা, সে-ও কামড়ায় না। অবশ্য, কিছু কিছু পাকা অপরাধী যে নেই, তা নয়। কিন্তু আমরা বেঁচেই আছি প্রয়োজনের ওপর কোনো দৈব্যের ওপর নয়। আজকের ব্যাপারটাই দেখুন না, প্রয়োজনের খাতিরেই তো শ্রমিকদের টেনে নিয়ে এসে বিখ্যাত জারের প্রতি সম্মান দেখানো হলো...'

কাঁধ দু'টো উঁচু ক'রে, মাথাটা কচ্ছপের মতো ভেতরে ঢুকিয়ে মিত্রোফানভ বলে পেছনের দিকে আঙুল দেখিয়ে:

'এখানে দেখুন, ব্যবসায়ীরা বসে আছে, পরমানন্দে ভাল ভাল খানা খাচ্ছে, ভদকা গিলছে, দামী-দামী মদ পান করছে, এমনভাবে ব্যবসার কথা আলোচনা করছে যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু যদ্দুর আমার জানা, মজুরদের ক্রেমলিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যেই। ঠিক সেই শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যেই রাত্রে পাহারাদারেরা ঠাণ্ডায় জমে, চোরদের আঁতিপাঁতি ক'রে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, আর মোদ্দা কথায়—সব কিছুই হয় ওই দুটো জিনিসের খাতিরে! তবুও এদের মধ্যে আমি জীবনের সুখের কোনো ইঙ্গিত আছে বলে মনে করি না—নাঃ, ক্লিম ইভানোভিচ, হলপ ক'রে বলতে পারি তেমন কিছুই দেখতে পাই না! আর জানেন, আপনার মনে ছুঁচের তীক্ষ্ম খোঁচাটা লাগবে তক্ষুণি যখন মনে হবে সত্যিসত্যিই

যারা জনগণকে ভালোবাসে,, তাদের জন্য নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তোয়াক্কা করে না, তারা রাজনৈতিক অপরাধী—মানে, অপরাধী তো নয়ই, বরং—আচ্ছা, "গ্যাডফ্লাই" আর "স্পার্টাকাস" উপন্যাস দুটো পড়েছেন? মিস্ সমভা ও-দুটো আমাকে পড়তে বলেছিলেন। আনন্দের সঙ্গে পড়েওছি!'

সামঘিন নিজের মনেই হাসে। জোরে হেসে ওঠবারও ইচ্ছে হচ্ছে,—ওর কোনো আনন্দের জন্যে নয়। মিত্রোফানভ সাবধানে চেয়ার ছেড়ে ওঠে, হাত বাড়িয়ে না দিয়েই বলে :

'আপনাকে ধন্যবাদ—অনেক ধন্যবাদ। হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ!'

সামঘিনের মনে হয় এই এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর ভাড়াটে ভদ্রলোক অনেক লম্বা হয়ে উঠেছে, মুখটাও পাতলা হয়েছে, সুশ্রীও। সামঘিনের মনটা খুব উদার হয়ে ওঠে, তার হাতটা টেনে নিয়ে ঝাঁকিয়ে দেয়।

'আপনার স্ত্রীকে আমি নিজেই বলব।'

আরো দশ মিনিট ক্লিম ওখানে থাকে। ভাবনা-চিন্তার মধ্যে একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করে, কিন্তু নানান রকম জট আর স্ববিরোধ, সহজ ক'রে নেওয়া দুষ্কর। শুধু একটা জিনিস সুস্পষ্ট—মিত্রোফানভের আন্তরিকতা।

'সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় ও-ই নিজেকে আমার হাতে সঁপে দিল। অপরাধী—পুলিশের চর—অপরাধীদের—' সামঘিন বার বার নিজেকে বলে। 'এ ধরনের কাজে ভালো লোকের যথেষ্ট আপত্তি, কিন্তু সেটা কি ভাল? আধুনিক সমাজে গুপ্তচরেরা তো অপরাধীদের মতোই সমান অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে মিত্রোফানভ সহৃদয় ব্যক্তি। বোকা ও নয়। টাইপটা তানিয়া কুলিকোভা, আনফিমিয়েভনার মতো। যে সব মানুষ অপরের প্রয়োজনের...'

॥ ১৮ ॥

সামঘিন যখন রেড স্কোয়্যারে এল, জায়গাটা ছুটির দিনের মতো। নির্জন ক্রেমলিনের ওপর আকাশ নীচু হয়ে এসেছে, ভারী তুষারকণার পতনে নিজেকে যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে। মহান ইভানের সোনালী পাগড়ীতে তুষার নেই। যাদুঘরের মাথায় এক ঝাঁক সীসে-রঙের পায়রা। বুঝতেও পারা যায় না যে মাত্র এক ঘণ্টা আগে এই স্কোয়্যার দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকের জনতা ক্রেমলিনে গিয়ে আছড়ে পড়েছিল, এমন সব মানুষ যারা হয়তো ক্রেমলিনের ইতিহাস বিন্দুমাত্রও জানে না, মস্কোরও জানে না, রাশিয়ারও না।

'হ্যাঁ। মিত্রোফানভও মনে করে বিপ্লব অপরিহার্য। ও বলছিল, "আমরা"! এই "আমরা"-টা কে? মানুষটা কি অদ্ভুত—উদ্ভট ধরনের বাঁকা...'

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে ক্লিম পোশাক বদলায় আর বিরক্ত হয়ে ভাবে যে এইবার জলুসের সব বিবরণ ভারভারাকে বলতে হবে। খাবার ঘরে চামচের ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ শুনতে পায় আর শুনতে পায় কুমভের চাপাগলার কচকচি আর মিশাকাকার শ্লেষ-বিদ্রূপ :

'ওহে যুবক, তুমি কি শেলিং পড়েছ খুব বেশী?'

'শেলিং একেবারেই পড়িনি আর তাছাড়া যুক্তিগত দর্শনে আমার কোনো কৌতূহল নেই। লেভ তলস্তয়ের মতো আমিও যুক্তিতে বিশ্বাস করি না।'

'তলস্তয়ের মতো? বাঃ!'

তুমি গোল্লায় যাও!' মনে-মনে ক্লিম গজরায়। লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হবার একটুও ইচ্ছে নেই, তাই পড়ার ঘরে গিয়ে ডিভানে শুয়ে পড়ে। কিন্তু খাবার-ঘরে যাবার দরজাটা আঁটো ক'রে বন্ধ না থাকায় স্পষ্ট কানে আসে প্রাচীন নারোদনিক আর কেরানীটির আলাপ-আলোচনা।

'মানুষ তো যুক্তি দিয়ে বেঁচে থাকে না, কল্পনায় বেঁচে থাকে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, যুক্তি দিয়েও বটে কিন্তু সেটা নীচের স্তরের বাঁচা। আমাদের উচ্চতর সিদ্ধিগুলো যুক্তি থেকে আসে না '

'ধরো, বিজ্ঞান?'

'বিজ্ঞানও কল্পনাজাত।'

'আরো একটু দেব?' ভারভারার কণ্ঠ। প্রশ্নের নরমসুরে ক্লিম আন্দাজ ক'রে নেয় জিজ্ঞাসাটা কুমভকেই করা হলো।...মনে হয় চায়ের তেষ্টা পেয়েছে, খাবার ঘরের দিকে ও এগোয়। কুমভ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়, ক্লিমকে দেখে ভারভারা বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করে :

'ফিরে এসেছ? কোথায় গিয়েছিলে?'

'আহাঃ!' মিশাকাকার সশব্দ উচ্ছ্বাস। ছোট মুখটায় ভালমানুষি হিংসার ছোপ ধরল।

'হ্যাঁ, কি করল্ ওরা?' "ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন" গাইল তো? বলোই না। সব বল।

'কিন্তু গুশারভ তো সব বলে গেল।' ভারভারা মনে করিয়ে দিল।

'আমরা দুটো রিপোর্ট তুলনা ক'রে দেখব।' ঠাট্টার সুরে সুসলভ বলে। যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে বোঝা যায়। লুবাশা যে কমলা রঙের উলের জ্যাকেটটা বুনে দিয়েছিল সেটা বুকের ওপর টেনে নামিয়ে নেয়। সামঘিন ওর কাহিনী বলা আরম্ভ করার আগেই সে বলে ওঠে: গুশারভ মহা-উত্তেজিত হ'য়ে এসেছিল। ওর মনে ধারণা কি একটা দেখে এসেছে আর তাই এখানে এসে প্লেখানভকে বিকৃত করছিল। নিয়ম-টিয়মও বেঁধে দিল, শ্রমিকদের মুক্তি শ্রমিকদেরই কর্তব্য, অতএব আমরা, বুদ্ধিজীবিরা, যেন সরে দাঁড়াই...'

কুমভ এ-সব কথায় কান না দিয়ে লম্বা শরীরটাকে ভারভারার দিকে বাঁকিয়ে নীচুগলায় বলছিল :

'খৃস্তিরা তাদের প্রার্থনার সময় বলে পবিত্র-ভূত দেখে, কিন্তু পবিত্র-ভূত কোথায়...'

আশ্চর্য হ'য়ে সামঘিন চশমার ভেতর দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে। কুমভ অপ্রস্তুত হাসি হেসে চুপ ক'রে যায়।

'মনে হলো ওর মতে বুদ্ধিজীবিরা শ্রমিকশ্রেণীর ভৃত্য মাত্র, আর কিছুই না,' ভুরু কুঁচকে সুসলভ বলে। চায়ের গেলাসে এক চামচ চা ঢেলে নিয়ে আবার বলে : 'আমি তাকে বললাম, "না। ভৃত্য দিয়ে বিপ্লব হয় না, বিপ্লবের জন্য চাই নেতা।" নেতৃবৃন্দ। ভৃত্য নয়। তোমরা মার্ক্সিস্টরা জার্মানদের কু-দৃষ্টান্তে প'ড়ে সত্যি-সত্যিই শ্রমিকদের চাকর হ'য়ে পড়ছ। কিন্তু জার্মানদের তো বেবেল আছে, আড্‌লার আছে, আরো কত কে রয়েছে। তোমাদের তো অমন কেউ নেই, আর ভগবান করুণ না-ই যেন থাকে—নইলে ওই ক্রেমলিনে গিয়ে জারের চরণধূলিই তো নেওয়াবে...'

সুসলভের বিদ্বেষটা স্পষ্ট হলেও সামঘিন দেখে যে সে দুঃখিত হ'য়ে পড়েছে। তার ছোট ছোট চোখদুটো বিষণ্ণভাবে কাঁপছে, গলা ভেঙ্গে এসেছে, হাতের চামচটা অযথা নড়ছে।

'না। এই গুশারভ লোকটা হচ্ছে কেমন জান—ওপরে ওপরে "মহিমান্বিত ব্যক্তি" কিন্তু তলে-তলে "অসম-মনের মানুষ"...'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তাতিয়ানা গোঘিনা ব'লে ওঠে: 'আপনি আগে থাকতেই জানেন?' সামঘিন মুখ ঘুরিয়ে তাতিয়ানাকে দেখে চিনতেই পারে না। সাদাসিধে পোশাক, মোটা জুতো, আর পাটি পেড়ে চুল আঁচড়ানোয় ওকে অল্পবিত্ত পরিবারের দাসী-মেয়ে মনে হচ্ছে। পেছনে-পেছনে লুবাশা এসে ঢোকে, কথা না ব'লে ধপ ক'রে চেয়ারে বসে।

'কি জানি আমরা?' লুবাশা আর তাতিয়ানাকে আপাদমস্তক দেখতে দেখতে সুসলভ জিজ্ঞেস করে। লুবাশা রাগে ফুঁসে ওঠে: 'ওই গুশারভটা তো একটা জুবাতভিস্ট...'

সুসলভ ক্ষুব্ধ-উচ্চ কণ্ঠে বলে: 'এএরকম কথা, বুঝলে মেয়েরা, আমাকে মাপ ক'র,—শুধু তখনি বলবে যখন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে।'

'ও একটা বোকা কিন্তু মস্ত ভূমিকা চায়। আমার মতে এই-ই হলো ওর আসল চেহারা।' গলার স্বর যথেষ্ট নরম ক'রেই তাতিয়ানা বলে। 'ভারিয়া লুবাশাকে এককাপ কড়া চা দাও না। আমি ওকে বাসায় রেখে আসছি। ওর শরীর ভাল না।'

আঙুলের ওপর অধৈর্যভাবে চামচের বাড়ি মারতে মারতে সুসলভ জিজ্ঞেস করে: 'হুঁ, তারপর?'

'ওখানে ক্রেমলিনে, গুশারভ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দিল। কি বলল, না,—রাজনীতি দূর হোক্, ছাত্রদের বিশ্বাস করো না, মজদুরদের পেছনে-পেছনে

বুদ্ধিজীবিরা ক্ষমতার রাস্তা দেখছে, এমনি সব নানান যাচ্ছেতাই, তাতিয়ানা বিশদ ক'রে বলে, এমনভাব যেন একেবারেই নিস্পৃহ।' 'আপনি কি ক'রে জানলেন?' প্রশ্নও করে।

'না-না, আগে বল তুমি এ'সব কি ক'রে জানলে?' সুসলভ অধীর হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

'ও যখন বক্তৃতা দিচ্ছিল, আমি ওর পেছনে দাঁড়িয়ে—আমি আর আরেকজন শ্রমিক, আমার এক ছাত্র।'

'হুঁ-উ,' সুসলভ ক্লিমের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ করে।

কয়েক মুহূর্ত অপ্রীতিকর নীরবতায় কাটে। তারপর সামঘিন গলা-খ'কারি দিয়ে সবাইকে মনে করিয়ে দিলে: 'আর এই তো সে'দিনও কারখানায় সন্ত্রাসবাদ চালু করবার কথা ও বলছিল।'

ভারভারা লুবাশার জ্বর দেখছিল। কুমভ উঠে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাত দিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে বাইরে চলে গেল। চেয়ারের হাতলের ওপর ব'সে হাতে কাপ নিয়ে লুবাশার কাঁধে ঠেস দিয়ে তাতিয়ানা চা খায়। ধীরে-ধীরে তার কাহিনী ব'লে যায়, মাঝে মাঝে ঠাট্টামস্করা ক'রে ওঠার অভ্যস্ত ভঙ্গীটি আর নেই:

'তিরিশ কি বড়জোর চল্লিশজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছিল। ও দাঁড়িয়েছিল "জার-বেল্"-যে। উচ্ছ্বাস-উত্তাপ ছিল না গলায়, খুব একটা সাহসও না। একজন মজুর তাই দেখে আরেকজনকে বললে: 'লোকটা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছে।" ওদের কিন্তু আশ্চর্য তীক্ষ্ম দৃষ্টি।'

'ওদের মেজাজটা কেমন দেখলে?' সুসলভ জিজ্ঞেস করে।

'মনে হলো অনাসক্ত-ভাব। অবশ্য ওটা শুধু আমার ব্যক্তিগত ধারণা। লুবাশার পরিচিত একজন ধাতু-কারখানার শ্রমিক বোধহয় মেজাজটা ঠিক মতন আঁচ করেছিল। মিছিলটা তখন স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছে। লোকটা বললে: "আমরা অজানা জঙ্গলে চলেছি ব্যাঙের ছাতার সন্ধানে। ব্যাঙের ছাতা হয়তো সেখানে আছে, তবে না-থাকাটাই সম্ভব। কিন্তু তাতে কি, বেড়ান তো হবে।"..'

ভারভারা বাতি জ্বালাচ্ছিল।

সামঘিন বললে: 'থাক্।' ঘরে আঁধার নেমেছে।

হাত ঘষতে ঘষতে, সুসলভ মৃদু-মৃদু হেসে ওঠে।

'শ্রমিকদের মধ্যে আমি কোনো মহান অনুভূতি কিছু দেখলাম না। অবশ্য মনুমেণ্টের কাছটায় যেখানে বক্তৃতা হচ্ছিল সেখান থেকে অনেক দূরে ছিলাম আমি,' তাতিয়ানা বলে, বর্ণনার সংযমে সামঘিন অবাক হয়: 'একজন লোক ওখানে পাগলের মতো উচ্ছ্বসিত হ'যে ক্যাপ নাড়াচ্ছিল। লোকগুলোকে যেন দেখলাম ক্রুশচিহ্ন করছে। একটু যে এগিয়ে যাব, তা' একেবারেই অসম্ভব।'

'৩৮·৬°।' ভারভারা জোরে ব'লে ওঠে। সুসলভ হাত তুলে ওকে চুপ করতে বলে: 'স্-স্!'

ক্লিম ভাবে: 'এমন ভাব করছে যেন ওরই বাড়ি।'

কাহিনী থামিয়ে লুবাশাকে গোঘিনা বলে বাসায় গিয়ে শুয়ে পড়তে। মেয়েটি কিন্তু যাবে না ব'লে জেদ ধ'রে রইল। চটেও গেল:

'চুপ কর না বাপু। তোমার কথা শেষ কর, তারপর যাব।'

'আঃ, বাধা দিও না সমভা,' সুসলভ কড়া গলায় হুকুম করে। ইস্কুল মাস্টারের ভঙ্গীতে আদেশ দিল: 'বল, গোঘিনা।' হাসতে হাসতে ভারভারা তার পাশে এসে বসে।

'মন্যাস্টরি আর কোর্টের মাঝে যে মোড়টা আছে না, সেখানে এক ভদ্রলোক আশ্চর্য ছাঁটের কোট পরে উইট-কে নিয়ে পড়েছিল। শ্রমিকদের বোঝাচ্ছিল কাগজের রুবল "অর্থের রূপের দিক থেকে সম্পূর্ণ খ্রীষ্টীয় নীতিসম্মত।" ঠিক এই কথা-গুলোই কিন্তু বলেছিল...'

সুসলভ ভয়ানক খুশী হ'য়ে ওঠে। দুই হাতে হাঁটু চাপড়ে হাঃ-হাঃ ক'রে হাসে, বলে : 'ও-ব্যাটা বোধহয় রাশিয়ান ফিন্যান্সের ওপর সারঘেই শারাপভের মেমোর্যান্ডাম পড়েছে। শুনলে সামঘিন? ভেবে দেখ! শ্রমিকদের কাছে খ্রীষ্টীয় নীতিসম্মত রুবলের কথা! ওঃ-হো, এই অর্থনৈতিকেরা!'...

'শ্রমিকরা নৈতিক রুবলের কথাটা কিন্তু চুপচাপ শুনে গেল, সিগারেট-বিড়ি খাচ্ছিল বটে কিন্তু হাসে নি,' তাতিয়ানা বলে, সমভার দিকে চেয়ে চোখ মটকায়। 'ওখানে সবজায়গাতেই গুটিকতক লোক চারপাশে ছোট ছোট শ্রমিকদের জটলা পাকিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিল। নির্বাক শ্রোতাও ছিল বহু। আর তাদেরি একজন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তাঘিল্স্কি.' সামঘিনের দিকে তাকিয়ে বলে : 'ভয় হচ্ছিল যদি চিনে ফেলে। শ্রমিকরা আমাকে "তরুণী মহিলা" ব'লে ঠিক চিনে ফেলেছিল আর সঙ্গে সঙ্গেই সন্দেহ আমার ওপর। ছোটরা "জার-ক্যাননে"র ভেতর চড়বার চেষ্টা করছিল।'

চোখ বুঁজে কিছু মনে করতে চেষ্টা করে, আর সামঘিন ভাবে : ওর কি দরকার মজদুরদের ভেতরে গিয়ে ঠেলাঠেলি করা,— ও তো সাজপোশাক পছন্দ করে, পিয়ের লুইয়ের লেখা বইয়র ভক্ত, আদিরসের সাহিত্যের পূজারী, ব্রুশভের কবিতার হিম-শীতল ইন্দ্রিয়চ্ছলতা ভালোবাসে!

'অবাক চোখ তুলে ওরা সব জিনিস দেখছিল।' তাতিয়ানা আবার শুরু করে, কিন্তু এখন ওর স্বরে সামান্য বিভ্রান্তি : 'ক্রেমলিন যেন জীবনে এই প্রথম দেখল। অথচ ওদের অনেকেই, বোধহয় সকলেই, ঈস্টার-রাতে ওখানে এসেছিল। যেন কোনো অপরিচিত শহরে এসেছে—বা, কোনো বাসা ভাড়া নিয়েছে। একজন শ্রমিক বললে : "এখানে বাড়িগুলোর কোনো দাম নেই।' একটা বেশ মজার বুড়ীকে দেখলাম, প্রকাণ্ড দেহ, খোঁড়া, পুরুষের কোট পরেছে, মনে হলো কানেও বোধহয় খাটো—কেন-না যে যাই বলুক, কান পেতে শুনছিল। মুখটা ফোলা, সেখানে পেশীর একটুও সঞ্চালন নেই, চোখ দুটো দেখাই যায় না। অশরীরী মুখ একটা। বারবার জিজ্ঞেস করছিল : 'কি কি দেবে ব'লে কথা দিচ্ছে রে?' আর সবাইকে বলছে : "ওহে কিষাণেরা, বিশ্বাস ক'রো না। আমিও সার্ফ ছিলাম। আমি জানি। জার লোককে ঠকিয়েছিল। ওদের নজরে নজরে রেখ। আবার তোমাদের ঠকাবে।"'

সুসলভ আস্তে-আস্তে খুক্ ক'রে হেসে ওঠে :

'ওকে চিনি আমি। ওর নাম কাতারিনা বচ্কারিওভা। খোঁড়া বললে না? ভগ্ন-নিতম্ব, না? ঠিক্, ও-ই।'

'শ্রমিকরা ওকে বলছিল : "বক্বক্ বন্ধ কর!"'

'নিশ্চয় ও-ই একেবারে ওরই কথা। এখনো বেঁচে! সত্তর বছরের তো হবেই। বহুদিন থেকে জানি। আমিই তো অ্যালেক্সান্ডার প্রুগাভিনকে ওর সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিই। একসময়ে ও সুতায়েভ সেক্টের অনুরাগিনী ছিল। তারপর গণক হলো। এই সব লোককে আমরা ঠিকমত বুঝতে পারি না, এরাই তো সাচ্চা-জারের তত্ত্বটাকে ধ্বংস করে দেয়, তবুও...'

হঠাৎ লুবাশা লাফিয়ে পায়ের ওপর খাড়া হলো, দু'এক পা চলতে গিয়েই টলে পড়ে, হাত দুটো এমন ভাবে জড়িয়ে ওঠে যেন ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, পড়ে আর কি। সামঘিন যদি সময়মত না ধ'রে ফেলত তো মুখ থুবড়েই মেঝের ওপর পড়ত।

ভারভারা আর তাতিয়ানা ওকে দুই বগলের তল দিয়ে শক্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল।

'ভয়ানক জেদী, না!' সুসলভ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে : 'শুয়ে ঘুমোন উচিত কিন্তু ঠিক জেগে বসে থাকবে।'

সামঘিনের কাছে সরে এসে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে :

'এই গুশারভটি কি সংগঠনের ভেতরে আছে, পার্টির মধ্যে?'

'ঠিক জানি না। বোধহয় না।' সামঘিন জবাব দেয়। বেশ বুঝতে পারছে তাতিয়ানার কাহিনী ওকে জাগিয়ে তুলেছে, একটু তিক্তও করেছে হয়তো।

'কি পাজী,' সুসলভ দাঁতের মধ্যে দিয়ে বিড়বিড় করে : 'আর তুমি সামঘিন, তোমার কি মত জলুসটা সম্বন্ধে?'

'জানেন তো আমি ক্রেমলিনে ছিলাম না,' সিগারেটে দম দিয়ে সামঘিন ছাড়া-ছাড়া সুরে বলে . 'আমার যন্দুর মনে হয়, গোঘিনা জিনিসটা ঠিক মতই দেখিয়েছে। শ্রমিকরা গোটা ব্যাপারটাই, খুব বেশী হ'লে, কৌতূহলের সঙ্গেই নিয়েছে—'

'হুম।' মিশাকাকা কথাটা বিশ্বাস না ক'রে আওয়াজ ক'রে ওঠে।

'আমি দর্শকদের ভীড়ে দাঁড়িয়েছিলাম, আর ওরা সব পাশ দিয়ে মার্চ ক'রে গেল।' সামঘিন আবার বলে।. সিগারেটের জ্বলন্ত বিন্দুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। বলল, কয়েকজন শ্রমিক দর্শকদের ভীড়ে এসে দাঁড়িয়েওছিল।... তারপর আকস্মিক উচ্ছ্বাসে ভরে উঠে তাদের সম্বন্ধে বলে : 'মনে হয় দর্শকদের অনেকেই ভাবছিল যে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে। মানে, স্পষ্টভাষায় তারা প্রতিবাদও করল, শ্রমিকদের সঙ্গে প্রেমের খেলা যেন না খেলা হয়। অবশ্য এটা প্রবৃত্তিগত.. '

'শ্রেণী-চৈতন্য?' সুসলভ হেসে ওঠে। 'না, না, মোটেই তা'না, বিশ্বাসও করো না। ওসব না, শুধু কারখানার মজুরদের ওপর যে বিতৃষ্ণাভাবটা রয়েছে তা'ই প্রকাশ পাচ্ছিল—এ বিতৃষ্ণা আমাদের মতো কৃষকপ্রধান দেশে অত্যন্ত সহজেই প্রচারিত হ'য়ে পড়ে। বহুদিন থেকে এই কথা ভাবাটাই তো নিয়ম যে কারখানার শ্রমিকেরা ভূমি হ'তে বিচ্ছিন্ন একদল লোক, শয়তানির ফিকিরে-ফিকিরে ঘুরছে...'

কাহিনীর মাঝে মাঝে প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢোকানোয় সামঘিন বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। এই বিরক্তির জন্যই ও ব'লে উঠল :

'এই এক ক্ষতিকর ধারণা। গত ক'বছরের স্ট্রাইকগুলোয় স্পষ্ট হ'য়েই উঠেছে যে শ্রমিকেরা শক্তি হিসাবে নিজেদের গুরুত্ব ঠিক বোঝে। আর তা'ছাড়া তাদের জন্য এক রেডিমেড দর্শন আছেই, বুর্জোয়া বা কৃষকদের তো আর তা' নেই।,

'হুঁ-হুঁ, ও?' সুসলভ ওকে প্ররোচিত করতে চায়।

কিন্তু সামঘিনের যেন এখন আর কোনো মন্তব্যে কানই নেই, উচিত-জবাব দেবার মনটিও নেই। বলবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাস বেড়ে উঠছে। ক্রমে উত্তেজনায় এত অধীর হ'য়ে পড়ল যে দেখতেও পেল না কখন স্ত্রী এসে আবার ঘরে ঢুকেছে। বাতি জ্বালাতেই কিন্তু চমক ভাঙ্গে। দেখে, টেবিলে ভর দিয়ে ভারভারা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। সুসলভ উঠে দাঁড়িয়েছে, জ্যাকেটটা ঠিক ক'রে নিয়ে, খুব খুশী-খুশী গলায় বলল :

'সামঘিন, মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তুমি ততটা গোঁড়া মার্ক্সিস্ট নও, এমন কি...'

কথাটা শেষ করল হাসি দিয়ে। ভারভারার সঙ্গে করমর্দন ক'রে আবার সামঘিনের দিকে ঘুরে বলল :

'আমি কিন্তু এ আশা করেছিলাম না। খুব খুশী হলাম।'



সুসলভ চলে গেলে সামঘিন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে :

'অমন ক'রে তাকিয়েছিলে কেন আমার দিকে?

'তোমার কথা শুনছিলাম। শ্রমিকদের সম্বন্ধে ও-ভাবে কথা বলছিলে কেন—অত রাগত' স্বরে?'

'রাগত স্বরে?' আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করে ক্লিম: 'মোটেই না। কে বললে তোমায়?'

'বলবে আর কে? তোমার গলার স্বর আর তোমার কথা।'

'আমি তো শ্রমিকদের কথা বলিই নি, বলছিলাম মধ্যবিত্তদের কথা...'

'তা'হলেও কি,—তুমি ওদের দোষ ধরলে না, শ্রমিক-আন্দোলনের ওপর যে-সর্বনাশা বিপদ এগিয়ে আসছে সেটা বুঝতে পারে না ব'লে...'

'বোঝে না যে তা'নয়, কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'ওরা অক্ষম. আব সেটাই তো একটা দোষ।'

'বুঝলাম না। দোষ কেন?'

'কেন না শক্তিহীনতা মানুষের পক্ষে দোষ বই কি।'

ভাবভারার সবুজ চোখ হেসে ওঠে। নিঃশ্বাস ফেলে যখন কথা বলল তখন ওর গলার সুরে নতুন এক মায়া। বলে :

'ক্লিম, আমার একটুও ভাল লাগে না কিন্তু, তুমি যখন রাজনীতি নিয়ে কথা বল। চল, তোমার ঘরে চল। ওরাও তো এই-ই চায়।'

ক্লিমের হাত জড়িয়ে ধ'রে শরীরের ভার তাবই ওপর এলিয়ে, ভারভারা অতি সন্তর্পনে স্টাডিতে এল। স্বামীকে ডিভানে বসাল, পিঠের পেছনে একটা কুশনও ঠেলে দিল।

'তোমার চোখমুখ কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে গো,' যেন সদয় হ'য়ে ওঠবার কারণ দর্শাচ্ছে।

'হুঁ, তা'হলে তোমার ভাল লাগে নি, কি বল?' সামঘিন শুরু করে।

'না,' ভারভারা তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে। ডিভানে ব'সে পা দুটোকে কাছে টানে, স্কার্ট গুছিয়ে নেয়। 'তুমি কথা বল অবশ্য খুব সুন্দর ক'রে, বুদ্ধিমানের মতোই,—কিন্তু কেমন যেন, অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করছ ব'লে মনে হয়।'

'হুঁ,' সামঘিন শুধু অস্ফুট শব্দ ক'রে ওঠে। ভাবতে চেষ্টা করে, মিশাকাকাকে কি বলেছিল যাতে লোকটা অত খুশী হ'য়ে উঠল, ওর বৌ-ই বা কেন হঠাৎ এত আদুরে হ'যে উঠছে।

সামঘিনের আঙুলগুলোকে নিয়ে খেলা করতে করতে ভারভারা বলে : 'ওগো! তোমাকে ক'টি কথা বলতে চাই,— খোলাখুলি আলোচনা! আমার তো মনে হয় তুমি যে ভূমিকা নিয়েছ তা'তে তুমি নিস্পিষ্ট হ'য়ে যাচ্ছ '

'না, না! ও-সব কি কথা, ভূমিকা-টুমিকা আবার কি—' কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ভারভারা কাঁধ ঝাঁকিয়ে পেছনে হেলান দিল।

'ভুলে যেয়ো না আমি একজন অসফল অভিনেত্রী। স্পষ্ট কথাই বলি,—জীবন আমার কাছে থিয়েটার, আমি একজন দর্শক। স্টেজের ওপর অভিনয় চলেছে,

কত রকম পোশাক পরা কত চরিত্র আসছে যাচ্ছে। তারা সবাই,—সবাইকেই, আমাকে, তোমাকে, এমন কি নিজেদেরকেও, তাঁদের নিজের নিজের ক্ষমতা দেখাতে চায়, ভেতরের জগৎ দেখাত চায়। এ কথাতো তুমিও কতদিন বলেছ। জগতটা যে কতখানি ভেতরকার, তা'ঠিক জানি না। কুমভই বোধহয় ঠিক। তুমি তো তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো—তুমি নেহাৎ উন্নাসিক, ও এক অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু ও বেশ ভাল গো। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠ মানুষ...'

সামঘিন তীক্ষ্ন্দৃষ্টিতে বৌকে দেখে। ভারভারা ঘাড় নাড়ে, কোমল কণ্ঠে বলে :

'হ্যাঁ সত্যিই তাই—স্বধর্মের মানুষ .'

'হুঁ, তা' ও কি বলে-টলে, কুমভ-মহাশয়টি?' ক্লিম বিদ্রূপ ক'রে ওঠে। একটু ভীতও যেন।

ভারভারা আরো কাছে এগিয়ে আসে। উ'চু তীক্ষ্ন গলা এরই মধ্যে নরম হ'য়ে পড়েছে। সেটাকে আরো কোমল ক'রে বলে : 'ও বলে, ভেতরকার জগৎ দুর্বোধ্য হ'য়ে থাকে কারণ যুক্তি সব সময়েই বহির্জগতকে হয় আদর্শবাদ নয়তো জড়বাদের চোখে বিচার ক'রে দেখতে অভ্যস্ত। এই সব অভ্যাসের ফলেই প্রকৃত মানবিক দিকটা বিভ্রান্ত হ'যে পড়ে, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যায়। নানা আইডিয়া আর মতবাদের চাপে কল্পনার স্বাধীনতার হয় মৃত্যু '

'এ'তো মূর্খ-ভাষণ,' সামঘিন বলে। ওর মুহুরীর দার্শনিক ব্যাখ্যায় কোনো-রকম আগ্রহই বোধ করে না। 'অজ্ঞতাও বলতে পার, ও বলে : 'কিন্তু তুমি আমাকে কি বলতে চাইছিলে?'

'দেখ তাই আমি বলি কি—' ভারভারা জবাবে বলতে যায়, কিন্তু শক্ত মাটি যেন পাচ্ছে না, 'মানে,...তুমি তো জান আমার কাছে তুমি কি ভীষণ প্রিয়...'

'তা'তে হলো কি?' সামঘিন যেন ধমক দিচ্ছে।

ওর বৌ তখন কাঁধে সোহাগের চাপড় মেরে ব'লে ওঠে :

'আহা, কি বীরপুরুষের মতোই না বললে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুরুও কুঁচকায়। বলে: দেখ, তোমাকে করুণা দেখাবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। তবুও, যতই অদ্ভুত মনে কর না কেন, আমার মনে হয় করুণা-সমবেদনা পাওয়া তোমার খুবই দরকার। তুমি ব্যক্তিত্ব হারাচ্ছ, ভেঙ্গে-চুড়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছ. .'

অনেক কথাই বলে যায় কিন্তু সামঘিন শোনেও না। শুধু ভাবে :

'দিনটা কি বিশ্রী! .ওর কথাগুলো কিন্তু কতকটা ঠিকই।'

নিজের ওপর বিরক্ত হয়, বৌয়ের ওপর রাগ করতে পারছে না কেন। কেস্ থেকে একটা সিগারেট নিতে নিতে প্রশ্ন করে :

'আমার কাছ থেকে তুমি কি কিছু পাচ্ছ না?'

'তোমাকেই যে পাচ্ছি না।' ভারভারা এমনভাবে জবাব দেয় যেন গোড়া থেকেই এই প্রশ্নটার আশায়-আশায় অপেক্ষা করছিল। স্বামীর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে জ্বালায়, এমন ভঙ্গীতে টান্ হ'য়ে শুয়ে পড়ে যেন ছবিতে আঁকা কোনো হারেম-রমণী। সামঘিনের হাঁটুতে কনুই ভর দিয়ে ছাদের দিকে পুঞ্জ-পুঞ্জ ধোঁয়া ছুঁড়ে দেয়। এই ভঙ্গীতে শুয়ে ও এমন একটা কথা বলল যা সামঘিনের অনেক উপন্যাসেই বহুপঠিত ব'লে মনে হয়, রঙ্গমঞ্চেও যেন বহুশ্রুত :

'তুমি আর আমাকে ভালোবাস না। আমাদের মধ্যে আর তেমন মিল নেই।'

'ওঃ, এই কথা—' বহু পরিচিত শব্দ কয়টি শুনে সামঘিন ভাবে।

'যে-মেয়ে হিংসা উৎপাদন করতে পারে না, সে-তো ভাবে তাকে কেউ ভালবাসে

না...'

'দেখ, কথাটা হচ্ছে,' সামঘিন বেশ গম্ভীরভাবে শুরু করে : 'আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন...'

'কিন্তু সব মানুষই তো ভালোবাসতে চায়, তা' সে আদর্শবাদীই হোক, আর জড়বাদীই হোক,' ভারভারা অধৈর্য হ'য়ে ব'লে ওঠে। এবারে ভাষাটা ওর নিজস্ব। কথা কয়টা ব'লেই উঠে পড়ে, আধপোড়া সিগারেটটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে দেয়। 'সব যুগের এই-ই হলো চরম কথা। তা'তো তুমিও জান। আর এর জন্যেই—রাগ ক'রো না কথাটা বলায়—আমি সন্তান বিসর্জন দিয়েছি।'

'আর যে কাজটাতে আমার সম্পূর্ণ আপত্তিই ছিল,' সামঘিন ওকে মনে করিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ ডিভান থেকে উঠে ভারভারা ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পায়চারি করতে থাকে, কোমরের চওড়া বন্ধনীটার ওপর অন্যমনস্কে হাত বুলোয়। বলে :

'মানুষ যা-ই করুক না কেন, শেষে সবাই আরামের স্থিতি চায়। পুরুষ নারীর সঙ্গে, নারী পুরুষের সঙ্গে। এই হচ্ছে একমাত্র অবিসম্বাদিত সত্য। ধর, আমিও তো কত আদর্শবাদী আর জড়বাদী দেখলাম। তত্ত্বাবধনার কাজ আমার খানিকটা আসেও নয় কি? আমি তোমাকে বলছি, যারা আদর্শবাদী তারাই বেশী ক'রে মানুষের নিন্দুক. জীবনের আরাম-আয়েস খোঁজার চেষ্টায় তারাই বেশী তৎপর। তারা যে আরো ইন্দ্রিয়-অনুরাগী জড়বাদীদের চেয়েও বেশী বাস্তব-বুদ্ধি রাখে. সে-কথা তো বলাই বাহুল্য। হ্যাঁ, সত্যি কথা। আদর্শবাদীরা ততটা দূরে দৌড়য়ও না। তাদের বাস্তব-বুদ্ধি জনতার চেয়ে অনেক প্রখর জনতা বিপ্লব না করলে যে ভালভাবে থাকা যাচ্ছে না। আমার বন্ধুদের বিপ্লবের প্রয়োজনই নেই। তাদের চাই টাকা, বই-প্রকাশের ব্যবসা খুলবে যে! তোমাকে চুপি-চুপি একটা কথা বলি, আমার বন্ধুরা আমাকে দিয়ে যে-রকম প্রস্তাবে রাজী করিয়েছে, যা আমার স্বার্থের এত প্রতিকূল, তা' কোনো জড়বাদীই সংখ্যাতত্ত্বের ওপর হাজার ভালোবাসা সত্ত্বেও, কক্ষণো করতে পারত না। তুমি কুমভকে বললে অতি-সরল, কিন্তু সে-ই হচ্ছে একমাত্র লোক যে আমার কাছ থেকে কিছু চায় না, মনে হয় জীবনের কাছ থেকেও না।'

'ওর ওপর তোমার খুব দয়া দেখছি।'

'সেটুকু ওর প্রাপ্য। বোধহয় তুমি জাহির করতে চাইছ যে তোমার মধ্যেও ঈর্ষা আছে?' প্রশ্নটা খুবই উদাসীনভাবে ছুঁড়ে দেয়। 'কুমভ নির্ভেজাল দর্শক—দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখে। এমন কি স্পিনোজার আলোচনাতেও ওর আগ্রহ, যে নাকি মাকড়সার জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করতো। তা'ছাড়া তোমার অতীত চেহারার সঙ্গে ওর খানিকটা মিলও আছে...'

'শুনে আনন্দ পেলাম।' ক্লিম হাসে। ভারভারার কথায় দম আটকে আসছে, যেন তুষারের তলে পড়েছে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে : 'অদ্ভুত কথা বলছ ভারভারা।'

'অদ্ভুত?' ক্লিমের ডেস্কে রাখা ঘড়িটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—ঘড়িটা ওরই দেওয়া। 'যদি কথাগুলো ভেবে দেখ তো তোমারই ভাল। মনে হচ্ছে আমাদের বাস করার ধারাটা—ঠিক যে রকম উচিত ছিল তা' নয়।... ওই বই-প্রকাশের ব্যবসাটা নিয়ে আমাকে কিছু আলোচনা করতে যেতে হবে, ফিরতে ফিরতে দু'তিন ঘণ্টা হবে।'

সামঘিনের কপালে চুম্বন এ'কে ও বিদায় নিল। যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রত্যাশিত, তবুও ও যে এখন চলে গেল তা'তে সামঘিন খুশীই হলো। সিগারেট ধরিয়ে বাতি নিভিয়ে দেয়। রাস্তার আলোর অনচ্ছ প্রতিফলন জানলার ফ্রেমটাকে

ক্রুশের ছায়ায় মেঝের ওপর ফেলেছে। সব কিছুই যেন কাছে-কাছে এগিয়ে এসেছে, ঘরটা জমাট হ'য়ে পড়েছে, উষ্ণও। জানলার বাইরে ভিজে বাতাসের সোঁ-সোঁ শব্দ। ঘন হ'য়ে তুষার পড়ছে। শহরের কোলাহল মৃতপ্রায়, যেন গভীর রাতের স্তব্ধতা।



ডিভানে শুয়ে শুয়ে সার্মঘিন চোখ বুজে ভাবছিল।

এর আগে ভারভারা তো কখনো এমন সুরে কথা বলে নি, মনে হতো কিশোরী বয়সে ওর সম্পর্কে যে মনোভাব ছিল এখনো বোধহয় তাই-ই আছে। তবে কিসের জন্য বদলাল, কেন বদলাল, কখন বদলাল? মনে পড়ল ক'দিন আগে অতিথিদের বিদায় ক'রে দিয়ে এসে ক্লান্তিব হাঁই তুলে ভারভারা ওকে বলেছিল :

'দেখেছ, লোকগুলো দিন-দিন কেমন একঘেয়ে হ'য়ে পড়ছে?'

আবার, খুব বেশীদিনেব কথা নয়, স্ত্রী সযত্নে ওকে বলেছিল, কণ্ঠস্বরে সামান্য তিরস্কার টেনেই :

'তোমার চশমা যে তোমার নাকের দু'টো পাশ লাল টকটকে ক'রে দিযেছে।'

আর একটা ঘটনার কথা সার্মঘিনের মনে পড়ে। মাস দুই আগে একদিন কুমভের সাথে কাজ করতে কবতে রাত গভীর হ'য়ে পড়ল। অন্য অন্য বার যেমনটি হয়, সেদিনও কেরানীকে ওখানেই রাতটা কাটিয়ে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিল পরদিন সকালে উঠে মুখ ধুতে গিয়ে দেখে বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মনে মনে নিশ্চিত, স্ত্রীতো সেই কোন্ ভোবে তৈরি হ'য়ে গেছে, এখন বোধহয় ডাইনিং-রুমেই আছে। তবুও দরজায় ধাক্কা দেয়। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবে হুকটা বোধহয় নিজে নিজেই খাঁজের মধ্যে গিয়ে আটকে গেছে, কোনো সময় দরজায় সজোবে ধাক্কা লেগে কান্ডটা ঘটেছে। ডাইনিং-রুমে গিয়ে তাই একটা রুটি-কাটা ছুবী সংগ্রহ ক'রে এনেছিল। ভেবেছিল, দরজার ফাঁক দিয়ে ছুরীটাকে ঢুকিয়ে হুক তুলে দে:ে। ভারভারা ডাইনিংরুমে ছিল না। ছুরীটা হাতে নিয়ে যখন আবছা-আলোয-ভরা হলঘর পেরিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল. দেখতে পেল বাথরুমের দরজায দাঁড়িয়ে আলুথালু, ভারভারা, নগ্ন শরীরটার ওপর কোনো মতে একটা ড্রেসিং-গাউন ফেলা। রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিল :

'কি, কি করতে যাচ্ছ?'

বুকের ওপর ড্রেসিং-গাউনটা চেপে ধ'রে, দরজার পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল. এমন ক'রে ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করছিল যেন মেঝের ওপর ব'সে পড়তে চায়।

'কি করতে যাচ্ছ?' আবার ব'লে উঠেছিল, গলার স্বর নীচু ক'রে একটু আর্তধ্বনি ক'রে। পা দুটো যেন আরো ভাঁজ হ'য়ে পড়ছে, শরীরটাও হেলে যাচ্ছে। গাউনের গলার কাছটা একহাত দিয়ে আঁটো ক'রে ধরেছিল, অন্যহাত বুকের ওপরটা সজোরে চেপে ধরেছিল।

ক্লিম যখন ছুরীহাতে ওর কাছে গিয়ে পেঁীছেছিল, তখন সেই আলো-আঁধারিতে দেখেছিল ওর চোখদুটো ভয়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে, বিড়ালের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে। ভয়ে-বিস্ময়ে ক্লিম ছুরীটা নীচে ফেলে দিল, হাত দিয়ে ওর শরীরটা পেঁচিয়ে নিয়ে ওকে ডাইনিংরুমে নিয়ে গেল।...সেখানে পেঁীছে ঘটনাটা খুব সহজেই

বুঝিয়ে দেয় ভারভারা : সারারাত ঘুম হয়নি, তাই উঠতে দেরী হ'য়ে গেছে। স্নান করবার পর, বাথরুমের সোফায় শুয়েশুয়ে ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখল :

'ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলতেই হঠাৎ দেখি তুমি। আমার দিকে হাতে ছুরী নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছ! কী ভয়ঙ্কর পাগলামি!' সামঘিনের শরীরে লেপ্টে এসে তীক্ষ্ম হাসি হাসতে হাসতে বলেছিল।

'ভেবে ছিলে আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি?' সামঘিনও ঠাট্টার ছলে ব'লেছিল।

'কিছু ভাবিনি, শুধু দুঃস্বপ্নটা যেন তখনো কাটেনি,' ভারভারা বলেছিল।

সামঘিন বাথরুমে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু যেতে যেতে বাথরুমের পাশে যে ঘরটায় কুমভ কাজ করে সেখানে হঠাৎ কোন্ এক অন্তঃস্থ প্রেরণার বশেই ঢুকে পড়ল। নিঃশব্দে দরজা খুলতেই চোখে পড়ল কুমভ দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, শরীরের দু'পাশে হাতদুটো যেন অবশ হ'য়ে ঝুলছে, মাথাটা এমন ক'রে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে যেন লোকটা ফাঁসীতে ঝুলছে। দরজা ক্যাঁচ ক'রে ওঠায় কুমভ ফিরে তাকায়। মুখের ওপর সেই অক্ষম বিনয়-বিগলিত হাসিটি, দোমড়ানো মুখটা যেন তা'তে চওড়া হ'য়ে উঠল।

'কপি করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার ডেস্কে রেখে দাও,' সামঘিন আদেশ করে। ভাবছিল : 'নাঃ, এ সম্ভব নয়! এ'রকম জড়দগবদের নিয়ে-হ'তেই পারে না!'..

কিন্তু এখন মনে হয় সেদিন বাথরুমে ভারভারার সঙ্গে নিশ্চয়ই কুমভ ছিল। তাই তো ভারভারা অমন ভয় পেয়েছিল।

'নিশ্চয়ই তাই,' মনে মনে ভাবে, কিন্তু ঈর্ষাও হয় না বা ওদেরকে অপরাধীও মনে হয় না। এরকম চিন্তা মন থেকে দূর ক'রে দেবার জন্যেই যেন এই ব্যাপারটা এখন আবার ভেবে দেখছে। চিন্তা ক'রে দেখবার মতো তো শুধু ভারভারার ওই কথাগুলো,-সে নাকি জোর করছে নিজের ওপর, ভেঙ্গে চুড়ে গুঁড়ো হ'য়ে পড়ছে।

'ও যে কথাগুলো বলল তার কারণ রুশ বা বিদেশী সোস্যালিজম দ্বারা সীমায়িত লোক দিন দিন বিশিষ্ট হ'য়ে পড়ছে।' চোখ না খুলেই সামঘিন ভাবে। 'সীমায়িত লোক অনেক বেশী সু-বোধ্য। ও দেখছে তো লোকে আর আগের মতো ক'রে মন দিয়ে আমার কথা শোনে না। আর সেইটাই তো সব নষ্টের গোড়া।'

মার্ক্সিজম সম্বন্ধে সুসলভের মন্তব্য মনে পড়ে। লোকটা বোধহয় নানা রোগে ভুগে ভুগে রোগ জমাবার সূত্র হ'য়ে উঠেছে। বয়সও যেন কমে গেছে, শক্তিও বেড়েছে, তার ডিক্টেটরী-গলার হুকুম দিন-দিন উ'চুতে চড়ছে। লুবাশা বোধহয় তার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি ক'রেই সম্প্রতি ওকে শুনিয়েছিল :

'তোমার যুক্তিটুক্তিগুলো বুড়ো লিব্যারেলের মতো হচ্ছে, ক্লিম।'

"শ্রমিক-আন্দোলন সহায়ক সমিতি" নামে এক দল প্রতিষ্ঠা করেছে, তাই লুবাশার এমন হাবভাব হয়েছে যেন ও বিপ্লবীদের কর্নেল।

তাতিয়ানা গোঘিনা এক আধা-কানুনী ইস্কুলে শ্রমিকদের পড়ায়, ইস্কুলটা কোনো উদারমনা ব্যবসায়ীর কারখানায় অবস্থিত। তার ঠাট্টাতামাশা দিন-দিন অত্যন্ত তীক্ষ্ম হ'য়ে উঠছে! বোঝা যায় যে, যে-সব বিষয়ে খোঁচা আছে তাদের সুগভীর মতদ্বৈধতা নিয়ে তীব্র মন্তব্য করা যেন ওর একটা দুর্বলতায় দাঁড়িয়েছে। এই সেদিনই তো ও ব'লেছিল বোদলেয়রের ফ্লুর্স্ দ্য মল হচ্ছে "ক্রিশ্চিয়ান সংস্কৃতির ওপর শয়তানের স্মরণ-উৎসব," আর বোদলেয়র নিজে হচ্ছেন "সেক্সপীয়রীয় কবর-খনক"। আজ ওর মেজাজটা কিন্তু অন্য রকম, বোধহয় সেই জন্যেই পরিশ্রান্ত, আর

লুবাশার অসুখের জন্যেও তো ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে। ওর কথা ভাবতে ভাবতে সামঘিনের মনে হয় ভাইয়ের ওপর তাতিয়ানার মনোভাব সাধারণ রোম্যান্সের। যন্দুর জানে আলেক্সেই গোঘিন-পরিবারের পালিত সন্তান। আলেক্সেই আপাত-দৃষ্টিতে "কমিটির সদস্য"। হাসিখুশী লোকটা, আগের মতোই এখনো রঙ্গরসে ভরা, কিন্তু ইদানীং যেন নানান্ সন্দেহে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে। সামঘিন বুঝতে পারে আলেক্সেই এখন ওকে অবিশ্বাস মেশানো কৌতূহলের চোখেই দেখে।

'হ্যাঁ, সবাই বদলে যাচ্ছে...'

সোস্যালিস্টরা অভদ্রভাবে, এমন কি যথেষ্ট রূঢ়তার সঙ্গেই, লিবার্যালদের হেনস্থা করে, লিবার্যালরাও সোস্যালিস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে হ'তে পারছে না ব'লে যেন নিজেদেরকে দোষী ঠাওরাচ্ছে। কিন্তু তরুণ বিপ্লবীদের ওরা যথেষ্ট সাহায্যই করছিল,—অর্থ দিয়ে, মিটিঙের জন্যে নিজেদের বাসা ছেড়ে দিয়ে বা বিপ্লবী পুস্তিকা সংরক্ষণ ক'রে।

ক্রমশঃ বিরক্ত হ'যে ওঠে। ডিভান থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায়। কুঁজো লোকটার কথাগুলো মনে পড়ে :

'বাস্-বাস্, যথেষ্ট নষ্টামি হ'য়েছে।'

জুবাতভটা মূর্খ,' মনে-মনে গজরায়। অন্ধকারের মধ্যে চেয়ারে হোঁচট খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে। পাকাচুল লিবার্যালেরা ছেলেদের সঙ্গে অনবরত তর্কও জুড়ছে আবার সবসময়েই তাদেরকে বলছেও যে শুধু ভুল শুধরে দেবার জন্যেই নাকি এতসব কথা। মনে হয় আসলে ছেলেদের আরো জোরে কাজে লেগে পড়বার প্ররোচনাই যেন তারা দিতে চায়। তাতিয়ানার বাপ গোঘিন আজকালকার ছেলে-ছোকরদের দোষে, তারা নাকি নারোদোভোলৎজিদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে দেয় নি, পবেদনোস্‌তজেভের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকেই দেশের মধ্যে প্রসারিত হ'তে সাহায্য করেছে।...একদিন বহু দুঃখে এক পার্টিতে ব'সে ভদ্রলোক বলেছিল :

'শেড্রিন আমাদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল কিন্তু আমরা ঘুমিয়েই রইলাম। ইতিহাস আমাদেব কক্ষণো ক্ষমা করবে না।'

মাঝারি উচ্চতার লোক, বেশ ভারী, সাবধানে চলাফেবা করে, প্রতিটি চলনেব সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজ ক'রে ওঠে। বোধহয় হার্ট দুর্বল, দুটি কটারঙের সদয় চোখের নীচে ফোলা-ফোলা মাংসেব থলি। টাকমাথার ওপরে, কানের ঠিক একটু উঁচুতেই পাকা চুলের কযেকটা গুচ্ছ শিঙের মতো খাড়া হ'যে আছে, ওরা যেন কেশের পুরোনো গৌরবের স্মারক। দাড়ি কামান মুখে মোটা কশাক গোঁফজোড়া নরম নাকের দুটো পাশ দিযে বিমর্ষভঙ্গীতে ঝুলে আছে। ঠোঁটের নীচে ইম্পিরীয়লের সরু গোড়াটা ধরা। আলেক্সেই আর তাতিয়ানা দু'জনেব ওপরেই অকপট মমতা, কিন্তু তার মধ্যেও বিষাদেব ছোঁওয়া।

"তরুণদের ক্যালভ্যারির দিকে মার্চ ক'বে যাওয়াটা সহজতর ক'রে তোলা তো আমাদেরই কর্তব্য,' একবার বন্ধু ও গৃহসঙ্গী রিণডিনকে বলেছিল।

কথাগুলো মনে ক'বে ক্লিম ভাবে : 'নৈবেদ্যের পাইকারী উৎপাদক সব।'

রিণডিন কোনো কালে জমিদার ছিল, এখন সব গেছে। আগে নারোদা-ভোলৎজিব বন্দু ছিল, পরে তলস্তয়ের অনুগামী হয়, এখন নৈরাজ্যবাদী আর রম্যবিলাসী। ঈষৎ ঝুঁকে-পড়া দীর্ঘ দেহ, ষাট বছব প্রায় বয়েস, কিন্তু অদ্ভুত শক্তসমর্থ। কর্কশ মুখে সব সময় ভ্রূকুঞ্চন, তীক্ষ্ম গলা, লম্বা-লম্বা বাহু। অসীম দয়া নাকি তার, 'এই জগতেরই নয়' নাকি। বড় ছেলে নির্বাসনে আছে, দ্বিতীয় জন জেলে, আর সবচেয়ে ছোটজন জিমন্যাসিয়মে থাকতে অস্বীকার ক'রে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত উঠে ছুতার মিস্ত্রীর দোকানে গিয়ে জুটেছে। বুড়ো রিণডিন সম্বন্ধে

তাতিয়ানা একবার বলেছিল :

'মানুষের ওপর মমতায় তিনি তাদেরকে মেরে ফেলতেও পারেন।'



রবিবার ক'রে গোঘিনদের বাসায় আড্ডা জমে। কম বয়সী উকীল, মফঃস্বলের উদারমনা জমিদার, জেমস্তভো প্রশাসনের পরিসংখ্যানবিদ, ছাত্র-ছাত্রী সবাই গরম গরম আলোচনায় মাতে। ক্লান্ত চেহারা কিন্তু দেখতে বেশ রহস্যময়, এমন অনেক যুবককে ইতস্ততঃ চলাফেরা করতে দেখা।...মাঝে মাঝে রেদোজুবভও আসে, সংগে নিয়ে অনম্য তিক্তভঙ্গী আর গির্জাই অসহিষ্ণুতা।

সামঘিন দুই-তিনবার এই আড্ডাতে এসেছিল। মনে-মনে এর নাম দিয়েছে 'তীর্থযাত্রীদের ধর্মশালা'। তাতিয়ানার ভাষায় কিন্তু এরা : 'কথার বিভীষিকা-ভরা গুহা'।

যেখানেই যায় সামঘিন নিকোনোভাকে দেখে। বেশ বিনয়ী আর সংযত। বন্ধুর মতো হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানায়। রাজনীতি নিয়ে কখনো আলোচনা করে না। একবার কিন্তু তার আকস্মিক বিস্ময়কর প্রশ্নে সামঘিন অবাক হয় :

'আচ্ছা, সত্যিই কি সাভা মরোজভ ইস্ক্রার প্রকাশের জন্যে টাকা দিচ্ছে?'

ক্লিম হাসে।

'সাভা মরোজভ? প্রচণ্ড এক ঠাট্টা, নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, তাই-ই ভাবছিলাম।' ব'লেই চলে যায়।

ধীরে-ধীরে ওব জন্যে সামঘিনের মনে মায়া জন্মে। মিত্রোফানভের সংগে ওর অনেক মিল, ঠিক তেমনি আশ্বাস জাগাতে পারে। নিকোনোভা যেন সাধাসিধে যন্ত্র বিশেষ, সৎ এবং সরল।

'নৈবেদ্যের আহুতি। জীবনের বশম্বদ ক্রীতদাস,'--ওর সম্বন্ধে সামঘিন এ'ভাবে চিন্তা করতেই অভ্যস্ত হ'যে পড়ে।

কোটিপতি সাভা মরোজভ আর পার্মের ক'জন জাহাজ-মালিক নাকি বিপ্লবীদের বেশ মুক্তহাতে সাহায্য করছে, এই কথাটা ক্রমে-ক্রমে খুব ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারে ডিভানে শুয়ে সিগারেট খেতে-খেতে সামঘিন হতাশ হ'য়ে ভাবে,—মনটা ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়েছে :

'সবই সম্ভব। এই অপ্রকৃতিস্থ দেশে সবই সম্ভব—এখানে মানুষ প্রাণপণে নিজেদেরকে বানিযে-বানিয়ে তুলছে, জীবনের যত রকম প্রকাশ সবই এখানে বিশ্রী হাতে তৈরি।'

নানা কথা ভাবে। বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে রাদেয়েভের উৎসাহ, নিকোনোভার সংগে কথাবার্তায় লিউতভের কর্তালি-সুর, রক্ষণশীল মতবাদের এক বৈজ্ঞানিকের ওপর সাভা মরোজভের কড়া-কড়া কথা—অথচ ভদ্রলোক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়নবিদ, -এমনিই কত কথা।

'হ্যাঁ, এদের পক্ষে বিপ্লবীদের অর্থসাহায্য করাটা মোটেই অসম্ভব নয়। আর তাই যদি হয়, তাব মানে তো কাজ করবার জন্যে ওদেরকে প্ররোচিত করাই হচ্ছে। তা'হলে এই উৎক্ষিপ্ত দুনিয়ায় আমার কোন্‌টা জায়গা? মফঃস্বলের কোনো গর্তে গিয়ে আমাকে সেঁদাতে হবে, একা-একা থাকতে হবে, আর লেখার চেষ্টা করতে হবে...'

তবু মনে হয় এসব কাজও যেন ওর নয়। শ্রমিকদের মাঝে প্রচারক হওয়া যেমন ওর সাজে না, বা, বোয়ের তেমন কোনো বন্ধুর সাজ নেওয়া যে সব সময়ই চিৎকার করছে,—ও অন্তর থেকে ঘৃণা করে—তুচ্ছ ছোট-ছোট কথা নিয়ে তারা অবিরত চিৎকার করছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে, মদন দেবতা নিয়ে, ঈশ্বর নিয়ে বা মৃত্যু নিয়ে। এদের হয়তো বিশ্বাস যে তারা শুধু ইউরোপীয়ই নয়, পারীবাসীও বটে। পড়ার ঘরে তাদের কথাবার্তার টুকরো ভেসে এসে সামঘিনকে নেখায়েভার সকরুণ মূর্তিটা স্মরণ করিয়ে দেয়,—সেই মৃত্যুভীতি আর প্রেমের অসুস্থ তৃষ্ণা। সমাজের নানা প্রশ্নকে ব্যঙ্গের সুরে তরল ক'রে তুলবার সাহস দেখে ও জ্বলে ওঠে। মনে হয় এরা নিজেদেরকে জোর ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে চিন্তা ভাবনার জাল থেকে পালিয়ে এসেছে। অথচ এই সব চিন্তাভাবনা থেকে তো ওর নিজের মুক্তি নেই,—ভাবতেই হয়, নিজের জীবনে বাধা হয়ে এসে দাঁড়ায়, জ্বালাতন ক'রে মারে। স্বীকার না করলেও বুঝতে পারে এসব লোক বেশ উচ্চশিক্ষিত, তুলনায় ও-ই বরং অজ্ঞ-মূর্খ। তবু এরা এমন সব বিষয় নিয়েই নিরন্তর আলাপ-আলোচনা করছে যা নিয়ে চিন্তা করতে কিছু-মাত্র আগ্রহও হয় না। কখনো-কখনো মনে হয় এটা ওর ত্রুটিই তবে শুধু সেই অর্থেই যে অর্থে ওর শব্দজ্ঞান সীমিত হ'যে আছে। ওর শব্দজ্ঞানটা কিন্তু উক্তি-প্রবচনে যথেষ্ট ধনীই।

মাঝে মাঝে বলত : "অধিকারের দর্শন শুধু অধিকার না-দেবার পক্ষে যুক্তির প্রয়াস মাত্র।" তার সঙ্গে যোগ ক'রে ব্যাখ্যা করত যে যে-লোক জীবনসংগ্রামকে প্রাকৃতিক নিয়ম ব'লে স্বীকার করে, তার পক্ষে ধর্ম, দর্শন বা নীতির ক্ষেত্রে স্থান ক'রে নেবার চেষ্টা শুধু নিষ্ফলই নয়, ভণ্ডামিও বটে। এমন অনেক উক্তি ওর জানা, কোথায় কিভাবে সেগুলোকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে জ্ঞানও যথেষ্ট। তবু তাদের মূল্যহীনতা সম্বন্ধে কিন্তু ও বেশ সজাগ উক্তিগুলোর তাই নাম দিয়েছে : "জ্ঞানের কড়ি।" সাধারণতঃ দার্শনিক মীমাংসা ও করতে চায় না, তাদের থেকে দূরে-দূরেই থাকে। ওর পছন্দ "তথ্য"। যখন দেখে যে সেই তথ্যগুলোর সমীক্ষায় ওর কথাবার্তা হয় পরস্পরবিরোধী হ'য়ে যাচ্ছে নয়তো বড্ড বেশী এক রকম, তখন ভাবে যে কার্যকারণের দাবীতেই এই রকমটি হলো।

গত কয়েক বছরে ওর মনে যে ধারণাগুলো জন্মেছে, আজ রাত্রে সেগুলোর যথাসম্ভব সূক্ষ্ম ও বাস্তব পর্যালোচনা করল। নিজেকে ভয়ানক একা মনে হলো সামঘিনের, অন্যান্য মানুষ থেকে কত স্বতন্ত্র। এত ভীষণ সেই অনুভূতি যে, মনে হলো, সত্যি সত্যিই একটা বিশ্রী বেদনা উঠে মনের কোনো স্পর্শকাতর জায়গায় খোঁচা দিচ্ছে। নড়েচড়ে উঠে বসল। অনেকক্ষণ বরফে-সাদা-হ'য়ে-যাওয়া জানলার সার্সির দিকে তাকিয়ে রইল অথচ নজর সেখানে নেই। রাস্তার আলোর সোনালী আভা এসে জানলাটার ওপর অস্পষ্টভাবে পড়েছে। মনের মধ্যে "আমাদের এলাকা"—সম্পাদকের একটা কথা দপ ক'রে জ্বলে উঠল

'আমাদের বুদ্ধিজীবি-গোষ্ঠী অসুস্থ; বাস্তবের প্রতি সমালোচনা-বৃত্তির অতি স্ফীতি ঘটেছে তাদের।'

সামঘিন ভাবে · 'হ'তে পারে আমাকেও ওই রোগে ধরেছে। আর এই ছোঁয়াচটা থেকেই আর-দশটা জিনিস এসেছে।'

একমুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তা ক'রেই কিন্তু মনের মধ্যে "কিন্তু-কিন্তু" এল।

'তাই যদি হয়, আমি অন্ততঃ রোগটা তো ধরেছি। অন্যেরা তো তা-ও জানে না।'

পরমুহূর্তেই মনে-মনে নিশ্চিত, একা-একা ঠেকাটাই তো অসাধারণত্বের পরিচায়ক। মনে পড়ল এমন একাকীত্বের অনুভূতি, লোকজনের কাছ থেকে দূরে

চলে যাওয়ার বোধ, আরেকবার ওর হয়েছিল,—সেই ওর নিজেদের শহরে, বিজয়ী-সেণ্ট জর্জের গির্জার গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তখন মনে হয়েছিল একাকীত্বের মধ্যে বেশ বীর-বীর ভাব আছে।

'আমার আত্মার কণ্ঠস্বরের জন্যে আমার নিজের কোনো শব্দই নেই, অন্যের কথায় তো আর সেটা প্রকাশ পেতে পারে না,' সামঘিন চিন্তা করে করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল।

দেওয়ালের ওপর দিয়ে একটা কালো ছায়া ঘুরে-ঘুরে কাঁচের ফ্রেমে-আঁটা ছবির ওপর এসে স্থির হয়। সামঘিন থমকে দাঁড়ায়, বুঝতে পারে জানলা দিয়ে আগত আলোক-রশ্মিতে ওর মাথা ঠেসে কাঁচে গিয়ে ছায়া হয়েছে। ডেস্কের কাছে গিয়ে সিগারেট ধরায়, আর তারপর ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে আরম্ভ করে।



ভারভারা ফিরল মাঝরাত্তিরে। ওকে ঘণ্টা বাজাতে শুনে সামঘিন তাড়াতাড়ি আলো জ্বালায়, টেবিলে এসে বসে, কাগজগুলো এমন ক'রে ছড়িয়ে দেয় যাতে মনে হয় যে অনেকক্ষণ ধরে ও কাজ ব্যস্ত, নইলে বৌয়ের সঙ্গে তুচ্ছ কথায় মাততে হবে। দশ মিনিট পরে ভারভারা লম্বা-সেমিজ পরে ঘরে ঢুকল, পায়ে স্লীপার। ভেজা-ভেজা ঠাণ্ডা হাতে সামঘিনের গালে আর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল।

'কাজ করছ?'

'দেখতেই পাচ্ছ।'

'আশ্চর্য! আসতে আসতে আলো দেখলাম না তো তোমার ঘরে!'

'দেখ নি?'

ডেস্কের এক কোণায় বসে, ভারভারা বলল লুবাশার খুব অসুখ, ডক্তার ভাবছে নিউমোনিয়াই হয়তো। গোঘিনা ওর কাছে আছে।'

'তা'হলে ভালই। তুমি শুয়ে পড়। আমি বেশী দেরী করব না।'

ভারভারা বাধ্য মেয়ের মতো চলে গেল। ওর গোলাপী রঙের গোড়ালির দিকে চেয়ে চেয়ে সামঘিনের মনে হয় এই নারীর সব কিছুই জানা হয় গেছে এখন আর একটুও কৌতূহল নেই। ওর দেহের প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, প্রতিটি ধ্বনিই চেনা। মুখের অভিব্যক্তিও সম্পূর্ণ পরিচিত,—বৈচিত্র্যে বিশেষ ধনী অবশ্য সেটা। ওর কথার ভঙ্গীও কত পরিচিত, শব্দ নিয়ে অনিশ্চতের কি প্রয়াস,—ফ্যাশনদুরুস্ত পত্রিকার ভাষার অসহিষ্ণু ব্যবহার। মাঝে মাঝে সেই সব শব্দজালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে, হাস্যকর বিরোধে হয় তার সমাপ্তি। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে ভারভারাতে বেশ সুবিধা,—গিন্নীপনায় ও সুপটু। ওর কতগুলো জিনিস সামঘিনের বেশ লাগে, যেমন মানুষের ওপর ওর সন্দেহ-দৃষ্টি, যা কিছু মিথ্যা তার ওপর স্পর্শকাতরতা, ছদ্মবেশ ধরে ফেলতে দক্ষতা। ওর সাথে বাস করাটা এমন কিছু মন্দ না। কিন্তু ধরা যাক্ নিকোনোভোর সঙ্গে যদি থাকতে হতো তো জীবন নিশ্চয়ই অনেক কোমল হতো, হতো 'অনেক আরামের, যদিও বয়েসে ও ভারভারার চেয়েও বড়।

ঘণ্টাখানেক পরে সামঘিন শোবার ঘরে এল। ভেবেছিল বৌ এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু দেখল ভারভারা বিছানায় শুয়ে-শুয়ে একটা হাতকে বালিশ করে,

সিগারেট খাচ্ছে।

সামঘিন পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বলে: 'শোবার ঘরে সিগারেট খাওয়াটা খুব বদভ্যাস।'

'তোমাকে তো বলে বলে আমি হয়রান—' ভারভারা তেমনি জবাব দেয়। মনে হলো কথাটায় এখানেই ছেদ টেনে দিল। সামঘিন ওর দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে কি একটা বলতে যায়, কিন্তু সামলে নেয়। ভারভারা বেশ মোটা হয়েছে তো, আর সেইজন্যেই বোধহয় ওর ঘাড়টা অমন ছোট দেখাচ্ছে।

'অবিশ্বাসিনী হলে ওর আদর-সোহাগে নিশ্চয়ই টের পাওয়া যাবে, দেহের ভঙ্গিমায় তা ফুটে উঠবে,' সামঘিন মনে-মনে ভাবে। কথাটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে মনস্থ করে।

খাটের কাছে এসে বলে: 'একটু ওদিকে সর না।'

উঃ, বড্ড ক্লান্ত লাগছে,' না সরে চোখ বুজে থেকেই ভারভারা বলে: 'এখন একসঙ্গে শুতে পারব না।'

এর আগে কখনো অস্বীকার করে নি, অন্ততঃ এমন কোনো ছুতো দেখিয়ে। অনুনয় করাটা সম্মানে বাধে। এর আগে কখনো তা করেও নি। মনে মনে আঘাত পেল।...নিজের বিছানায় গিয়ে সামঘিন শুয়ে পড়ে।

'ওখানে এক ইহুদী ছিল,' সিগারেট নিভিয়ে ভারভারা আরম্ভ করে। যেন অনেকক্ষণ থেকে সুরু করা কোনো কাহিনীর রেশ টানছে।

'আর কুমভও ছিল,' ক্লিম বেশ জোরেই বলে ওঠে। জিজ্ঞাসা নয়, কুমভ যে ছিল সেই প্রত্যয়ের ঘোষণাই যেন।

'ছিলই তো,' ভারভারা বলে: 'কিন্তু ওই লোকগুলোর ভীড় সহ্য হচ্ছিল না। জানই তো, ওর নিজের এই মতটাকে ও আঁকড়ে ধরে থাকে: জগৎ হচ্ছে দুর্ভেদ্য অন্ধকার; কল্পনার অগ্নি দিয়ে মানুষ সেটা আলোকিত করে; মতবাদ হচ্ছে এমন আঁকিবুকি যা শিশুরা স্লেটে আঁকে...'

'কি নির্বোধ অবিবিদ্যা—ননসেন্স,' সামঘিন চটে উঠে বলে। ওর মুহুরীর দার্শনিক মতবাদ আর নিজের চিন্তাধারার মিলটা কিছুতেই সহ্য করা যাবে না। 'ঘুমোও এখন। আমিও ভয়ানক ক্লান্ত।'

ভারভারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মাথার নীচে বালিশটা সোজা ক'রে নেয়। কয়েক মিনিট চুপ ক'রে থেকে আবার বলে:

'জান, আমি ইহুদীদের দেখতে পারি না। বড় লজ্জার কথা, না?'

'নিশ্চয়ই।'

'না, আমি তাদের পছন্দ করি না। সব জিনিসেই তারা অন্যদের ওপর যেন টেক্কা মারে। কতগুলো ইহুদী আছে যারা শুধু এ্যান্টি-সেমিটিজম্‌কেই জিইয়ে রাখছে।'

'কতগুলো রুশ আছে যারা শুধুই রুশো-ফোবিয়া জিইয়ে রাখতে পারে।" সামঘিন বিড় বিড় ক'রে ওঠে। কিন্তু ভারভারা কথায় আপাত-শ্লেষের সুর নিয়ে আবার বলে ওঠে:

'এটা কোন জবাবই হলো না। তুমিও ইহুদীদের পছন্দ করো না, শুধু কথাটা স্বীকার করতেই যা লজ্জা।'

'কি যাতা বলছ! আলোটা নিভিয়ে দাও।'

দিল বটে, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও ওর কথা চলতেই থাকে। কণ্ঠস্বর আর কথা ক্রমে ক্রমে বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

'তুমি বল নি যে কোন ইহুদী যদি নিহিলিস্ট হয় তো সে রুশ-নিহিলিস্টের

চাইতেও হাজারো গুণে খারাপ?'

সামঘিন অতিকষ্টে নীরবতা বজায় রাখে। বুঝতে পারে মিত্রোফানভের কথাটা এখন বলা ঠিক হবে না, ও শুধু হেসেই উঠবে। যেন ঘুমে চোখ ভেঙে পরছে এমনি সুরে জড়ানো-জড়ানো উচ্চারণ ক'রে ক'রে ক্লিম অবশেষে স্ত্রীকে নির্বাক ক'রে তুলতে সফল হলো।

*

আজকাল মিত্রোফানভ আগের চেয়ে অনেক কম আসে। সব সময়েই গভীর-দুঃখের ভাব নিয়ে আসে। মুখে জিজ্ঞাসার হাসি যেন নীরবে প্রশ্ন করছে :

'তারপর? আমার ব্যাপারটা ঠিক ক'রে নিয়েছেন?'

প্রচুর পরিমাণে চা গেলে। রাস্তায় বা সরাইখানায় দেখা দৃশ্যের অবতারণা করে; ভারভারা খুব খুশী হয়ে ওঠে, ওর আমোদ লাগে। মিত্রোফানভের কথায়-বার্তায় সামঘিন আবার নতুন ক'রে বুঝতে পারে যে বুদ্ধিজীবিরা যতই জট পাকিয়ে তুলুক না কেন, অতল তলের জীবন এখনো সেই পুরানো নিয়ম-কানুনের আর অভ্যাস-সংস্কারের দৃঢ় আবহাওয়াতেই চলছে।

'একটা কাজ পাওয়াব কথা আছে, পাগল্যাগারদের সেকেণ্ড-এ্যাসিস্ট্যাণ্ট,' মিত্রোফানভ ভারভারাকে জানায়। ডাইনিং-রুম ছেড়ে যেই ভারভারা উঠে গেল, অমনি দ্রুতকণ্ঠে সামঘিনকে ফিসফিস ক'রে বলে : 'পাগলাগারদের কথাটা মিথ্যে, বুঝতেই তো পারছেন। ক্ষমা করবেন, কেমন?'

'কেন, কিসের জন্যে?' ক্লিম অবাক।

'মানে,...ধরুন. ভারভারা দেবীর যদি কখনো আমার ওপর সন্দেহ হয়তো আমার অস্বাভাবিক আচরণ বুঝিয়ে দেবার জন্যে আপনার হাতে কিছু থাকবে।'

ওর জন্যে গোয়েন্দাটির এই অদ্ভুত বিবেচনায় সামঘিন পুলকিত হয়ে ওঠে। মিত্রোফানভকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কিন্তু আত্মজিজ্ঞাসা জাগে :

'ভারভারার ওপর আমার মনোভাব কি লোকে টের পাচ্ছে?'

সঙ্গে সঙ্গে চটেও যায় :

'ও-ব্যাটা আহাম্মুক হয়তো ভাবে যে আমার চিন্তাগুলোও বোধহয় ওরই মত।'

ক'দিন পর সামঘিন একা-একা খাবার ঘরে বসে সান্ধ্য-চা খাচ্ছিল। মনে-মনে হিসাব করছিল, জীবনে কি কি অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল জমেছে বা কোন্ জিনিসটা তামাদি হয়ে গেছে। একটা ঘরের কথা মনে পড়ল, ভাঙাচোরা জিনিস দিয়ে বোঝাই। ছোটবেলায় হঠাৎ একদিন সেই ঘরটা খুলে ফেলেছিল।...বিষণ্ণ বিগত চিন্তার মাঝে নিঃশব্দ পদক্ষেপে সুসলভ এসে হাজির, যেন অশরীরী প্রেত একটা।

'শুনেছ নাকি?' হাসি-হাসি মুখ ক'রে জিজ্ঞেস করে। কালো ছোট-ছোট চোখ দুটো জ্বল-জ্বল ক'রে ওঠে। গৃহকর্তার মতো ভাব নিয়ে টেবিলে এসে বসে, এক গেলাশ চা ঢেলে নেয়। মাপা-মাপা ভঙ্গীতে গেলাশে খানিকটা কাঁচা চা নেয়, তরল পদার্থটাকে নাড়তে গিয়ে চামচের ঠুন-ঠুন শব্দ করে। আর তারই সঙ্গে শুরু হয় সামঘিনকে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষক-দাঙ্গার কথা শোনানো। ছোট্ট শুকনো হাত কাঁপে, মুখ কুঁচকে হাসে, নাকের ফুটো দুটো ফুলে-ফুলে ওঠে, শক্ত কলারের চৌহদ্দিতে আটকান ঘাঘটাকে একবার এদিকে আরেকবার ওদিক মুচড়ে

মুচড়ে লম্বা করে।

'তবে, দেখলে তো?' ধীরে-ধীরে আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করে: 'তোমার ওই শ্রমিকদের নিখাদ অর্থনৈতিক আন্দোলনের কি মূল্য? যে-আন্দোলনে তোমাদের কোনো হাতই নেই, আছে ওই সৈন্যরক্ষীদের হাত। সামাজিক ন্যায় আদায় করবার জন্যে কৃষকদের যে প্রাথমিক অনুভূতি সে-তুলনায় এর কি দাম?'

ভদ্রতার হাসি হেসে সামঘিন চুপ ক'রে থাকে। এই ছোটোখাটো বুড়ো লোকটাকে ওর মোটেই বিশ্বাস হয় না। হয়তো কৃষক-বিক্ষোভটা খুবই সামান্য ঘটনা। গুদাম লুট করার সেই স্মরণীয় ব্যাপারটার মতোই তুচ্ছ। গমগমে গলায় সুসলভের কথা কিন্তু চলছেই। জ্যাকেটের হাতা তালু পর্যন্ত টেনে নামাতে চেষ্টা করছে। বড় হয়ে-ওঠা কিশোরের মতো দেখাচ্ছে, স্যুটগুলো যেন হঠাৎ ছোট হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, ভাল কথা, তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে চলে যাচ্ছি, সেই কথাটা বলতেই এসেছিলাম। এই যে, আমার ঘরের চাবি, এইটা রেখে দিও। লুবাশাকে দিয়ে দিও, কেমন? গিয়েছিলাম ওর ঘরে, কিন্তু ও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মেয়েটার বড্ড অসুখ।' নিঃশ্বাস ফেলে। কপাল কুঁচকে পাকা ভুরু দু'টোকে যেন একেবারে কাছাকাছি নিয়ে আসতে চায়। 'আর একেবারেই ঠিক সময়মত। কোথায় ওকে এখন পাঠান হবে কোন্ এক বিশেষ জায়গায়, তা নয় এখানেই শুয়ে শুয়ে...'

কথার ঠিক এইখানটায় এসে সামঘিনের নজরে পড়ে বুড়ো আজ উৎসব-সাজ পরে এসেছে, অথবা জন্মদিনের পেশাক যেন। নতুন গাঢ় নীল স্যুটে তার রোগা-পাতলা শরীরটাকে সৈনিকদের মতো খাড়া-সোজা দেখাচ্ছে। ভাব-ভঙ্গীতে জেকব-কাকার কথা খানিকটা মনে করিয়ে দেয়, সেই পুড়ে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অর্ধ-মৃত লোকটা যে মৃতদেরকে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে এসেছিল। সামঘিনকে বন্ধুভাবে বিদায় জানিয়ে নতুন জুতোর মচ্-মচ্ শব্দ তুলে সুসলভ চলে গেল। সামঘিনের মনে অস্পষ্ট এক অভিলাষ জাগে, মনে হয় লোকটার মধ্যে হাস্য-কর কি আছে খুঁজে বের করা যাক। ত র মধ্যে হাসির কিন্তু কিছুই নেই, তবুও অনেক চেষ্টার পর ক্লিমের মনে হয়:

'ওর জ্যাকেটের ওপর যদি কেউ ক'টা সোনালী বোতাম লাগিয়ে দেয় তো ওকে নির্ঘাৎ বিপ্লবের রাষ্ট্রমন্ত্রীর মতন দেখাবে...'

সুসলভের যাওয়ার মিনিট দশেক পরে গোঘিন এল। ততটা হাসিখুশী নয়। দেখা গেল তার খবরটা বেশ ভাল ক'রে জানা আছে, কিন্তু কোনো একটা বিষয় নিয়ে অসন্তোষও বেশ প্রকট। ঘরের মধ্যে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে করতে, বিরক্তিতে বার কয়েক আঙুল মটকে, পরিষ্কার গলায় নীচু সুরে বলে:

'বিক্ষে ভ শুরু হয়েছিল লিসিচিয়া গ্রামে কিন্তু খারকফ আর পল্‌তাভা গভর্ন-মেন্টের পাঁচটা জেলায় তা ছড়িয়ে পড়ল। ও হ্যাঁ, ওখানে আপনার এক ভাই আছে না? ঠিকানাটা দিন তো। তাতিয়ানা সেখানে যাচ্ছে। প্রবাসী লোকজনদের সম্বন্ধে কিছু খবর সংগ্রহ করতে। দুটি ঠিকানা অবশ্য আমাদের আছে, কিন্তু আমাদের বন্ধুদের এ্যাদ্দিনে অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়াটাই সম্ভব।'

একটা ভারী চেয়ার হাত দিয়ে তুলে, পেছনটা শক্ত ক'রে ধরে, বাড়ান অন্য হাতের দিকে দুলিয়ে, গোঘিন চিন্তাশীল কণ্ঠে বলে:

'কোনো জিনিসের একটা দিক আর তারপর অন্য কোনো দিক দেখতে আমি অভ্যস্ত নই। কিন্তু মনে হচ্ছে জুবাতভ মিছিলের এটা বোধহয় অপর দিক—ক্ষতিপূরণ। একটুও ভাল লাগছে না..'

'কেন?' ক্লিম প্রশ্ন করে, ওর বর্ণনায় একটু মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

'কি ক'রে বোঝাই? বোধহয় আমার মধ্যে ওটা একটা অনুভূতির উচ্ছ্বাস।
হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে, তাই-ই। কিছু দিন আগে এক কারখানায় ধর্মঘট হয়েছিল, মেশিনগুলো ভেঙে চুর-চুর ক'রে দিয়েছিল। কোনো দক্ষ শ্রমিক কখনো মেশিন ভাঙে না। একাজ সেই মজুরদের, যারা লাঙল ছেড়ে কেবল এসেছে...'

চেয়ারটাকে নীচে নামিয়ে রেখে তার পা ফাঁক ক'রে বসে। পাতলা গোঁফে মোচড় দেয়।

'রাষ্ট্রের অর্থনীতিও একটা মেশিন। বলতে পারেন, পুরানো, বা জীর্ণ। তা ঠিক, কিন্তু আমাদের তো গরীব দেশ! আর এখানে উচ্ছ্বাস এসে এসে এমন জায়গায় ধাক্কা দেয় যেখানে—যেখানে, বোধহয় রয়েছে পরিকল্পনার হিসাব। আমাদের দেশের যত লোক প্রবাসে আছে, তারাই সুদক্ষ বৈপ্লবিক তৈরি ক'রে নেবার কথা বলছে। কথাটা বেশ ভাল শুনতে...'

ওর কথায় সামঘিনের কান নেই। ভাবছে গোগোলের দেশে দাঙ্গার কথা। উক্রেইনের গীতিনাট্যের মধ্যে যাদের ছোটলোক চাষা বলে জেনেছে তাদেরি লক্ষ লক্ষ লোকের এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা। বড় হয়ে বাবার জেদে "জার্মানীর কৃষক-যুদ্ধের ইতিহাস" পড়ে যা দেখেছে এবং "রুশবাসীদের রাজনৈতিক আন্দোলন" পড়ে যা শিখেছে, সব মিলিয়ে ওর মনে একটা কালো ছবিই ফুটে ওঠে। জ্যোৎস্না রাতে মাঠের মধ্যে দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে কালো-গভীর জনস্রোত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে, জমিদারদের অট্টালিকা ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের চারদিকে রেণু-রেণু হয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বলে-জ্বলে উঠছে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মানুষের দল চিৎকার করতে করতে, শিষ দিয়ে, তীব্র আওয়াজ তুলে অন্য কোনো জমিদারীর দিকে কালো পিণ্ডের আকার নিয়ে চলেছে। দল অনবরত ভারী হয়ে উঠছে যেন মাটির তল থেকে তারা গজিয়ে-গজিয়ে উঠছে। সামনে সারি সারি ঘোড়ার দল তাড়া খেয়ে খেয়ে ছুটে চলেছে, পেছনে আগুনে-পাহাড়ের দল ক্রমে-ক্রমে সংখ্যায় বাড়ছে, আর নীচে অজস্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আকাশ আর দেখা যাচ্ছে না, পৃথিবী শূন্য হয়ে পড়ছে, আর তার ওপরের স্তরটা কার্পেটের মতন গুটিয়ে-গুটিয়ে যাচ্ছে, ফলে নতুন-নতুন অনেক জীবন্ত কৃষ্ণ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে।

'তা'হলে, বেস্পাতিবার?' আলেক্সেই উঠে পড়ে চারদিক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে।

সামঘিন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। যদিও ঠিকমত শোনেনি গোঘিন কি বলেছিল বা জিজ্ঞাসা করেছিল।

আরেকবার একলা হতেই সামঘিন যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। পরিচিত যন্ত্রণার বিরক্তিকর একঘেঁয়েমি। স্মৃতির মধ্যে কালো মানুষের পিণ্ডগুলো সঞ্জিবীত হয়ে উঠল। খোদিন্কি মাঠে লক্ষ লক্ষ লোকের ঠেলাঠেলি, পায়ের চাপে মাটি বেঁকে যায়। দৃশ্যটা মনে পড়তেই ভাবে মস্কোতে যদি এই ভীড়টা দোড়ে চলে আসে তো সারা শহর ধুলো আর ইঁটের পাঁজায় পরিণত হবে। হাজার-হাজার শ্রমিক ব্রোঞ্জের জারের দিকে মিছিল ক'রে চলেছে। ইনি হচ্ছেন আজকের নীল-চোখ যুবকের পিতামহ, যিনি গাড়ীর আসনে বসে দুলতে দুলতে হাজার লোকের ভীড়ের মধ্যে দিয়ে মুখে অপরাধী-অপরাধী হাসি টেনে চলেছিলেন। সব মানুষ মিলে একটা ঘণ্টাকে ওপরে টেনে তুলছে, দড়িতে এত জোরে টান দিচ্ছে যে মনে হয় গির্জার ঘণ্টা-ঘরকে তারা ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করছে। কৃষকদের একটা গোটা দল শস্য-গুদামের তালা ভাঙছে। কাঠের এক পা-ওয়ালা একজন চাষী অলীক ক্যাটফিস্ ধরবার চেষ্টা করছে। আরেক জন চাষী সন্দেহভরে জিজ্ঞাসা করছে :

'সত্যিই কি কোনো বালক ছিল? বোধহয় কোনো বালক ছিলই না।'

এই দুই চাষীর মধ্যে ও আশ্বাসের কথা খুঁজে পায়। মনে হয় এরা যেন রূপক। বোধহয় সকলেই অস্তিত্বহীন ক্যাটফিস ধরার চেষ্টায় ব্যাপৃত, তারা কিন্তু জানে যে ক্যাটফিসের অস্তিত্বই নাই তবুও কথাটা একে অন্যের কাছ থেকে লুকিয়েই রাখবে।

'না। বোকার মতন চিন্তা করছি,' চোখ বুঁজে চশমা পরতে পরতে ভাবে। 'আমার মধ্যে অসহায় কিছু একটা আছে,'—নিজের সম্বন্ধে রায় দিয়ে বসে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল শোধরায়: 'না—ছেলেমানুষিই। এই কি হতে পারে যে আমাকে সবসময়ই এমনভাবে জীবন কাটাতে হবে? বন্দী হয়ে? ক্রীতদাস হয়ে?'



বাড়ি থেকে ওকে গাড়িতে করে নিয়ে গেল এনুঈ। শহরের ওপর, ঠাণ্ডা উঁচু আকাশে, অসংখ্য তারা মিটমিট করছে। ঘোড়ার নালের মতো রুপোলী চাঁদ সবিনয়ে জ্বলছে। শহরের আলোয় আকাশে হলদে রঙের ছোপ। ভের্সস্কাইয়া স্ট্রীটে, ফিলিপ্পভ কাফের ঝকঝকে জানলা পেরিয়ে, গণবধূদের মিছিল। সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে ছাত্র ও যুবকের দল নির্ভাবনায় হাতে ছড়ি নিয়ে মন্থরগতিতে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোমশ কোট পরা একটা লোক মাথায় বোলার হ্যাট, ডবল-থুতনির মুখ—একটা মেয়ের হাতে হাত জড়িয়ে পথ চলছিল। সামঘিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোকটা মেয়েটিকে বলল:

'বেশ, ঠিক আছে। তিন রুবলই পাবে—কিন্তু...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মেয়েটা বলে। বেশ সদিচ্ছাভরা কণ্ঠস্বর, 'আমাকে সবাই তারিফ করে।'

আরেকটি লোক, তার মুখটা লম্বা, কোটের বোতাম খোলা, কুজনেতস্কি মোস্তের এককোণে ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে সঙের ভাঁজ-পরা টুপী মাথায় ছোট্ট কুঁজো একজন লোককে বলে:

'গোল্লায় যাক্ ব্যাটারা! হোক না কেন গির্জা-প্যারিশের স্কুল, তবুও তো লোকে লিখতে-পড়তে শিখবে!'

একজোড়া কালো কুচকুচে পশু পা-গুলোকে খ্যাপা ইঞ্জিনের লিভারের মতো তড়িৎবেগে চালিয়ে আলেনা তেলেপনভাকে নিয়ে গাড়ী টেনে চলে গেল। তার পাশে বসে লিউতভ। কোচোয়ানের দিক পিছন ফিরে ওদের মুখোমুখি বসে এক জন বেশ গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান হাত নাড়ায়, দেখতে ফায়্যারম্যানের মতো। লিদিয়ার কথা সামঘিনের মনে পড়ে। ককেশাসের কোথাও হয়তো সে আছে এখন। লুবাশা যা বলল তাতে মনে হয় কোনো বিষয় নিয়ে হয়তো বই লেখায় ব্যস্ত। ভারভারা কখনো তার নাম উচ্চারণ করে না। মাকারভও মস্কোতে, কিন্তু সেখানে তেমন কিছু নামজাদা হয়নি। কিছুদিন হলো ভাই দিমিত্রি মস্ত একটা চিঠি লিখেছে—বিরক্তিকর বিবরণী। চাষীদের হাতের কাজ নিয়ে পড়াশুনা করছে—বিশেষ ক'রে, তাদের মৃৎশিল্প।

'বোধহয় গ্রেপ্তার হয়ে গেছে,' সামঘিন ভাবে।

দীর্ঘদেহ সৈন্যের একটা দল গার্ড-ডিউটির শেষে ছুটি পেয়ে পেভমেণ্টের ওপর দিয়ে বেশ কায়দা ক'রে হেঁটে যায়। তাদের রুপোলী বেয়োনেট বাঁকা হয়ে আছে, যেন আকাশ-বাতাসকে তীক্ষ্ন ধারে আঁচড় দিয়ে চলেছে।

'আসবে নাকি গো?' সামঘিনকে একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করে। তার চওড়া হ্যাট বেপরোয়া ভঙ্গীতে মাথায় হেলানো। চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক বড়, পিনের আগার মতো চকচকে।

'নিশ্চয়ই অ্যাম্প্লীপন,' সামঘিন তার রঙ-করা মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সাব্যস্ত করে। কয়েক মুহূর্ত ও বেশ্যাদের কথাই চিন্তা করে। কি জানি কেন, তাদেরকে মনে হয় শুধু এমনি সব ক্লান্তিকর নিরাশ মুহূর্তেই।

'বেশ মজাদার।'

আর বিরক্তিকর একঘেয়েমি নেই। রাস্তার যথারীতি হৈ-চৈ মাতামাতি কিন্তু ওর মনে কোনো রকম চিন্তাভাবনাই নিয়ে আসে না। বাড়িগুলো গায়ে গা লাগিয়ে মহা-আড়ম্বরে দাঁড়িয়ে। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল সামঘিন।

বাড়ি ফিরল যখন বৌ ঘুমে অচেতন। পোশাক ছাড়তে ছাড়তে তার মুখে বার-বার চেয়ে চেয়ে দেখল। শান্ত আত্মসমাহিত মুখকান্তি, আনন্দের উচ্ছ্বাস যেখানে আধ-চাপা, কোনো অপূর্ব শ্রুতিবিমোহন শ্রবনের পালা যেখানে চলেছে।

'আমার চেয়ে ও সুখী। কারণ ও অনেক বেশী নির্বোধ।'

সামঘিন বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। এক মুহূর্তের জন্যে বৌয়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনে। মনের মধ্যে তিক্ততার সঞ্চার হলো অনতিবিলম্বেই।

'বোকা কামুক মেয়েছেলে একটা। লালসার তাণ্ডব ঢেকে রাখার জন্যে ওপরে-ওপরে লজ্জাবতী হবার চেষ্টা করে—যেমন উচ্ছৃঙ্খল মেয়েরা ঠিক তেমনিই। যাতে আমোদে ব্যাঘাত না হয়, সেইজন্যেই তো ছেলে নষ্ট করেছে।'

কালো অন্ধকারে কড়া-কড়া কথা সহজ হয়ে ওঠে। সামঘিন সেগুলো একটা একটা ক'রে গাঁথে, নিজের ক্ষুব্ধ-মানসে সন্তুষ্ট হয়, ক্রোধের তণ্ডুল আকণ্ঠ ভোজন করে আরামের উদ্গার ছাড়ে। শক্তিশালী মনে হয় নিজেকে। স্ত্রীর কথাগুলো মনে ক'রে তাকে শুনিয়ে দেয় :

'ঠিকই তো, আমি বিপ্লবী নই। আমার প্রকৃতিই সে-রকম না। সহজ শোভন মানুষের মতো সৎভাবে বেঁচে থাকবার কাজ করতে চাই। কর্তব্যের তাড়নাতেই আমি বিপ্লবী। কিন্তু তুমি? তুমি কি?'

বৌকে উঠিয়ে মুখের ওপর কড়া কথা ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করে। সপাং-সপাং ক'রে কথার চাবুক পড়বে, আর যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠবে।

'এমনি কোনো মুহূর্তেই বোধহয় পুরুষ স্ত্রী-হত্যা করে,' মনের মধ্যে কথাটা চকিতে উদয় হয়। উঠোনের মধ্যে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পায়, ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। পরমুহূর্তেই তীব্র উৎকণ্ঠায় কে দরজার কড়া নাড়ে। আনফিমিয়েভনার চাপা গলা ভেসে আসে :

'চত্বরে পুলিশ এসেছে। বাতি জ্বালিয়ো না। ঘুমিয়ে থাকার ভান কর। ভগবান দয়া করবেন।'

'ইস! কি গেরো!' বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সামঘিন বিড়-বিড় ক'রে ওঠে। ভারভারার কাঁধ ধরে ঝাঁকায় : 'ওঠো, ওঠো! বাড়ী সার্চ করছে।...এই নিয়ে তিনবার হলো,' অস্ফুটধ্বনি ক'রে ওঠে। চটির জন্যে পা নামায়, এক-পাটি তো খাটের তল থেকে কিছুতেই বেরোতে চাইছিল না, আর অন্য পাটিটা চ্যাপ্টা হয়ে পায়ের আঙুলে ঢুকছিল না।

নাইট-ড্রেসে পেত্নীর মতো ঢ্যাঙা দেখায় ভারভারাকে। বাতাসে ভর দিয়েই যেন জানলায় গিয়ে পোঁছয়। কাতর আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

'হায় ঈশ্বর...'

'পর্দা তুল না।'

'কিছু আছে নাকি তোমার কাছে? লুকোও, লুকোও। আমাকে দাও, আমি লুকিয়ে ফেলছি। আনফিমিয়েভনা রেখে দেবে।'

ছুটে বেড়িয়ে গেল। শোবার ঘরের দরজাটা বিকট শব্দে দড়াম ক'রে বন্ধ হয়। সামঘিন লম্বা-লম্বা পা ফেলে স্টাডিতে গিয়ে ঢোকে, বইয়ের আলমারী থেকে একটা ফাইল টেনে আনে, তার মধ্যে সেন্সর-নিষিদ্ধ পোস্টকার্ড, কবিতা আর প্রবন্ধের প্রুফ। কাগজের টুকরোগুলোকে ও অতি বাজে ও সাধারণ বলেই ভাবত, কিন্তু অন্য লোকের দৃষ্টি কেনার এরাই তো কড়ি। তা'ছাড়াও এদের মূল্য আছে বইকি ওর কাছে—এদের সুলভতায় অন্যের ওপর ওর ঘৃণা বেশ বেড়ে ওঠে।

'নাঃ. ভয় পেয়ে গেছি,' স্বীকার করে নিজের কাছে। ফাইলটা দিয়ে হাঁটুতে বাড়ি মেরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নিজের কাপুরুষতায় বড্ড যন্ত্রণা। ভারভারা লক্ষ্য করলে তো আরো বিষম ব্যাপার।

'আমাকে অ্যারেস্ট করবে—নাঃ, তা হতেই পারে না! মস্কো থেকে শুধু বাইরে পাঠিয়ে দেবে—' সান্ত্বনা দেয নিজেকে: 'দিক গে! নিরিবিলি কোনো শহর বেছে নিয়ে এই সব আপদ থেকে শান্তিতে থাকব।'

ভারভারা প্রবল বেগে ঘরে ঢুকল।

'দাও, আমায় দাও!'

ফাইলটা ছিনিয়ে নিয়ে, বাইরে যেতে যেতে উৎসাহ দিয়ে গেল: 'তোমার খোঁজে আসেনি বোধ হচ্ছে।'

সাবধানে পর্দা ফাঁক ক'রে সামঘিন জানলার বাইরে তাকায়। উঠোনে মানুষের আকারের কয়েকটা আঁধারের ছোপ চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

'তোমার খোঁজে আসে নি, বৌয়ের কথা, পুনরাবৃত্তি ক'রে বলে: 'অন্য মেয়েছেলে হলে বলতো—"আম্যাদর খোঁজে আসে নি।"'

ভারভারা ফিরে আসে। সামঘিন জানলা থেকে সরে এসে ডিভানে বসে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বৌ ড্রেসিং গাউন নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে, আস্তিন হাতড়াচ্ছে।

'একটু সাহায্যও করতে পার না?'

আস্তিন দুটো সোজা ক'রে দেবার পর ভারভারা ওর গায়ে লেপ্টে এসে মৃদু গলায় বলে: 'জেলখানায় তুমি—এ-কথা ভাবতেই পারি না।'

'শ'য়ে শ'য়ে লোক জেলে পচছে।'

'আঃ ও-সব শ'য়ে শ'য়ে লোক দিয়ে আমার কি দরকার?'

ওরা দু'জনে ডিভানের ওপর ঘন হয়ে বসে। পর্দার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে রাস্তার আলোর টুকরো দেখা যায়। উল্টো দিকের বাড়ির ওপরে আলোটা হামা দিয়ে দিয়ে এগুচ্ছে যেন দেওয়ালকে কেটে টুকরো ক'রে ফেলবে। ভারভারা সিগারেট ধরায়। বলে:

'আচ্ছা, ওর তো খুব অসুখ। এ-অবস্থাতেও কি অ্যারেস্ট করবে?'

সামঘিন নিরুত্তর। ভারভারার চোখের সামনে বসে বসে রক্ষীদের অপেক্ষা করাটা ভয়ানক হীন কাজ, কেমন যেন অদ্ভুত বোকামি, বিভ্রান্তিকরও বটে। কিন্তু—ওর কীই বা করবার আছে?

'আর সুসলভ—পালিয়ে গেছে,' ভারভারা ফিসফিস ক'রে বলে: 'বাড়ি সার্চ করবে জানত নিশ্চয়ই। ভয়ানক চালাক—শিয়ালের মতো...'

'কি যে বাজে বকো,' সামঘিন কঠিন গলায় বলে।

আবার চুপচাপ। দু'জনে শুধু কান পেতে উঠোনে কাশির শব্দ শোনে। কাশিটা গম্ভীর-নিনাদে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে উঁচু পর্দায় চড়ে তীক্ষ্ম পাতলা আর্ত-

ধ্বনিতে পরিণত হয়, যেন কোনো বাচ্চা হুপিং-কাশিতে ভুগছে।

'নাঃ, এ বড্ড অপমানকর—এইভাবে অপেক্ষা করাটা।' ভারভারা বলে : 'আমি শুতে গেলাম।'

চলে গেল। পায়ের স্লীপার জোরে ঘষে-ঘষে, রাগের ভঙ্গিমায়। সামঘিন আবার উঠে দাঁড়িয়ে, জানলার বাইরে অন্ধকারে সাবধানে উঁকি মারে। কিছুই বদলায় নি, আগের মতো দেওয়াল বয়ে রাস্তার বাতির আলো পড়ছে।

'বাতির বার্নারটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে,' সামঘিনের মনে হয়। 'এখন আর ওরা নিশ্চয়ই আসবে না।'

শোবার ঘরে যাবার স্পৃহা নেই। ডিভানেই শুয়ে রইল সামঘিন, আত্মধিক্কার আর গ্লানিতে ভরে উঠেছে মন।

॥ ১৯ ॥

লুবাশার বাসায় খানাতল্লাসীর সময় মিত্রোফানভ সাক্ষী ছিল। সকালে চায়ের সময়ে সে এসে হাজির হলো। বলল: 'খুব কড়া সার্চ, মশায়।' হেসে-হেসে সমর্থনের ভঙ্গীতে জানায়: 'কিছুই পেল না অবশ্য—একটা আলপিনও না, একটা খুদকুড়োও না। তবুও ধরে নিয়ে গেল—'

'কিন্তু ওর যে অসুখ!' ভারভারা অবাক-বিস্ময়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ইভান কাঁধ ঝাঁকায়। একটু দম নিয়ে বলে:

'ওদের আবার নিজস্ব যুক্তি-টুক্তিও থাকে কিনা। সন্দেহের পাত্রদের শরীর-স্বাস্থ্য কেমন সে-সব নিয়ে কোনো মাথা ব্যথাই নেই। বইগুলোও তো একদম আইনসম্মত ছিল।' একটু হেসে নিয়ে আবার বলে: 'বাইবেল একখানা, বিজ্ঞান, তুর্গেনেভ-গ্রন্থাবলী চতুর্থ খণ্ড...'

'ওর কাছে বেআইনী বই থাকবে এমন কথা আপনার মনে হলো কেন?' ভারভারার প্রশ্নে সন্দেহের সুর।

ইভান পেত্রোভিচ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে বিশেষভাবে তাকায়। গাল দুটো হাত দিয়ে ঘষতে-ঘষতে নীচু স্বরে বলে:

'দেখুন, ভারভারা কিরিল্লোভনা, সাফ কথাই বলা যাক, কেমন! আমিও তো কিছু-কিছু বুঝি। ক্ষমতা বদলের সময় হয়েছে, বোকারা যে-সব জায়গায় এ্যাদ্দিন জেঁকে বসেছিল এখন সেদিকে নজর পড়েছে চালাকগুলোর। আলবৎ, সময় হয়েছে। হওয়াই তো উচিত। আর, বিচারই যদি কাম্য হয়, তো দয়া দেখানো স্রেফ নিরর্থক। শুধু মানুষ-মারা, চুরি-চামারি আর দাঙ্গাবাজি, এগুলো আমি চাই না।'

ভারভারার দিকে ঝুঁকে পড়ে গলা আরো নামাল:

'তবু হত্যা-টত্যা হলে তারও মানে হয়। একটা প্রবাদ আছে জানেন তো—"তদন্তকে পকেটে পোরা যায় না," যখন কোনো মন্ত্রী নিহত হন, সেটার মানে আমার কাছে একটা তদন্তের সূচনা বা ধরুন এই রকম একটা ঘোষণা: 'হয় দাও, নয়তো—! আর তারি জন্য শক্তির প্রমাণস্বরূপ ঢুম্!'

ভারভারা অনিচ্ছার হাসি হাসে।

'বড় মজার-মজার কথা বলতে পারেন, ইভান পেত্রোভিচ,' হাসির মধ্যে দিয়ে ওর গলা ফুটে বেরোয়।

'মজার তো বটেই,' মিত্রোফানভ স্বীকার করে: 'কিন্তু বিশ্বাস করুন, মজার-মজার কথার নীচে আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো কিন্তু খুব সীরিয়স। জীবনের বহু পথ হেঁটে-হেঁটে আজ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে যারা জীবনকে বশ করতে পারে না তাদের জন্যে কারো কোনো দুঃখই হয় না। আর সবাই এ-কথাও বোঝে যে ভদ্রলোক মন্ত্রী হলে কি হবে, নিরর্থক হয়েই ছিলেন। কাজেই যা বাকী রইল, তা শুধুই কৌতূহল, একজন অপরিচিত লোক খুন হলে যেটুকু কৌতূহল জন্মায়, তাই। ওরা তার দিকে তাকিয়ে থাকে, বিলুপ্তির কারণটা নিয়ে সামান্য গবেষণা করে, তারপর নিজের নিজের গন্তব্য স্থানে যাত্রা করে—অফিসে, হোটেল-রেস্তোরাঁয়, হয়তো বা কারো বাড়িতে কিছু চুরি করতে।'

ভুরু উঁচিয়ে সামঘিন শুনছিল। ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ভারভারা ধরে ফেলে

মিত্রোফানভের পেশা কি। তা'হলে তো ওকেই উল্টে শুনতে হবে : 'ওঃ, তোমার সাধারণ মানুষটার তবে এই কাজকর্ম?' মিত্রোফানভের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল যাতে চোখের ইশারায় সাবধান ক'রে দিতে পারে কিন্তু লোকটা যে ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছে—দর দর ক'রে ঘাম পড়ছে, তীব্র উত্তেজনায় মিত্রোফানভের সব সময়ই এমন হয়।

'হ্যাঁ, যদি এটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়, এই গুলী ক'রে মারাটা—তা'হলে নিশ্চয়ই খুব খারাপ,' চোখ বড় বড় ক'রে বিশদ ব্যাখ্যা দেয়। 'এইখানেই, আমার মনে হয়, বিপদ লুকিয়ে রয়েছে—যদিও বলতে গেলে গোটা জীবনই তা বিপদের ওপর দাঁড়িয়ে। তবু, গরম মেজাজের ছোকরারা যদি চিরুনীর দাঁতই দিল ভেঙে, তবে আমরা চুল আঁচড়াব কি দিয়ে? ওটা তো আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার। ভারভারা কিরিল্লোভনা, চুল আঁচড়ানোর প্রয়োজনীয়তা আমাদের খুব বেশী, কেন-না আমরা যে এক অগোছাল উস্কো-খুস্কো জাত। হায় ভগবান! মানুষ যে কতখানি শ্রীহীন হতে পারে তা কি আমি জানি না...'

সামঘিন ইশারার গলা-খাঁকরি দেয়, কিন্তু কে কার কথা শোনে!

'এমনো অবশ্য হতে পারে যে আমাদের অপরাজেয় বিচার-স্পৃহাই আমাদেরকে এমন ক'রে রেখেছে। ইস্, কি রকম ব্যাপার বলুন তো, চোর যে চোর—সে-ও বিচার চাইছে! সব্বাই অন্য কোনো জীবনের কামনাতে মত্ত—আমাদের সুরাসক্তি আর লম্পট চরিত্রের আসল কারণই তো এই। তবুও, ভারভারা কিরিল্লোভনা, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এর মধ্যে অনেক কপট ছদ্মবেশী রয়ে গেছে—যত সব কুত্তীর ছা! আমি জানি আমি কি বলছি। ধরুন না এই অপরাধীদের কথা...'

মনে মনে সামঘিন বলে ওঠে : 'ব্যাটা গাড়োল।' বাইরে কিন্তু সামান্য একটু মুখ কুঁচকে চামচ দিয়ে গেলাশ ঠুকে ঠুকে টুন্‌টুন্ আওয়াজ ক'রে ওঠে। তক্ষুণি থেমেও যায়, মিত্রোফানভের বক্তৃতায় বাধা দিতে চায় না।

লোকটার চোখ দুটো ভয়ানকভাবে ঠিকরে এসেছে। হাঁটুতে প্রবল জোরে এক চাপড় মেরে হাতটা ভারভারার দিকে সটান এগিয়ে দেয়, আঙুলগুলো এমনভাবে নিসপিস করছে যেন এক্ষুণি তার গলাটা পাকড়ে ধরবে। ভারভারাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যদিও বলে, তবু যেন ওকে নয় :

'ব্যাটা কুকুরের বাচ্চা তুই নিজেকে অপরাধী ঠাউরেছিস, য়্যাঁ?' তীব্র সুরে ফিসফিসিয়ে ওঠে : 'অথচ, তুই কি স্রেফ বোকাস্য বোকা, রামগাড়োল—তুই তো স্বপ্ন দেখেই জীবন কাটালি রে। তুই তো মূর্তিমান দয়া, হ্যাঁ তাই তো রে তুই! শুধু অনেক কিছু কল্পনা ক'রেই মরলি আহাম্মুকটা! তুই একটা সং, একটা বাজে অভিনেতা, অন্যের ভেক নিয়ে শুধু বসে আছিস—অপরাধী নোস! রক্যামবল থেকে তোর কত তফাৎ জানিস রে হারামজাদা, দাঁড়কাক আর ঈগলে যতটা তফাৎ। অন্যের খেতাব চুরি করার দোষে তুই দোষী, সম্পত্তি হরণের নয় রে বোকা!'

ঝেড়ে-ঝুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শান্ত ভঙ্গীতে এবারে বলল, হাত দু'টো এমনভাবে উঁচু ক'রে যেন শপথ পড়ছে :

'ভারভারা কিরিল্লোভনা, আমাদের মতো জাত আর দু'টো নেই!'

ভারভারা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। এত বিস্মিত হয়েছে যে মুখ দিয়ে কথাও ফুটছে না। এবারে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসল, হাত দু'টো পিঠের পেছনে রাখল। তাতে বুক দু'টো যেন শ্লীলতা ছাপিয়েই প্রকট হয়ে উঠল। সামঘিন আর পুলিশী গোয়েন্দাটির বক্তৃতা-স্রোত বন্ধ করতে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। বক্তৃতাটায় রূপকের ছোঁয়া দেখেছে বলে যেন ওর মনে হয়।

'সামাজিক জীবন যাপনের পক্ষে এই এক অদ্ভুত অসম্ভব জাত,—নির্দোষ

আর উন্মাদে ভর্তি। প্রত্যেক জাতেরই নিজস্ব চোর্যবৃত্তি আছে, তাদের সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই—তারা তাদের পেশায় সম্পূর্ণ নিখাদ, অত্যন্ত সহজে চলাফেরা করে—যেমন আমরা রবার-সোল পায়ে পথ হাঁটি। তাদের কোনো কুসংস্কারও নেই—সব কিছুই অতি পরিষ্কার। কিন্তু আমাদের কাছে, অতি-সামান্য জীব, পকেট-মারেরও যেন কত কৌশল রয়েছে, কত কায়দা। একটা 'উদাহরণ দিতে অনুমতি করুন। একবার আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো...'

মিত্রোফানভ কথা গুলিয়ে ফেলে। ক্লিমের দিকে দ্রুত-দৃষ্টি হেনে বলে :

'মানে, ঠিক নির্দেশ নয় অবশ্য, আমি একবার আকস্মিকভাবে এক মেঝে-পালিশ করার লোককে চুরি করার অবস্থায় ধরে ফেলেছিলাম। ছোট ছোট জিনিস চুরি করতে সে ছিল ওস্তাদ—আংটি, ব্রোচ, এমনি সব জিনিস। আমি তাকে অনেকক্ষণ ধ'রে লক্ষ্য করছিলাম। লোকটা খুব সুন্দর একটা বাড়ির নকশা-কাটা মেঝে পালিশ করছিল—গৃহকর্ত্রীর শোবার ঘর ছিল সেটা। ছোকরা সাকরেদটিকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে লোকটা ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুব চটপট খুলে ফেলল একটা লোহার দাঁড়া দিয়ে. যা মন চায় তাই লুটেপুটে নিয়ে চোরাই মাল মোমের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল। সুন্দর সাফ কাজ। আর তারপর...'

মিত্রোফানভ চেয়ারের ওপর সজোরে দোল খেয়ে নেয়। গোলমত মার্জার-মুখে বোকাটে ধরনের আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে ওঠে।

'আর তারপর. বুঝলেন, লোকটা একছুটে পাশের ঘরে চলে গেল। সেখানে দু'হাতে ভর দিয়ে দুষ্টুছেলের মতো পা উ'চু ক'রে পাঁকক্ হয়। সেভাবেই চলতে থাকে. দাঁড়ানো আয়নার নীচের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে। কিন্তু, এ'রকমটি করল কেন? লোকটার বয়স কম ক'রেও চৌত্রিশ, বেশ খানিকটা লম্বা দাড়িও আছে, রগের দু'পাশে ভালমত পাক ধরেছে। হ্যাঁ সত্যি! তাই ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল—মানে. আমিই জিজ্ঞেস করলাম : 'বাঃ, সাবাস্, ইয়াকভলেভ, কিন্তু অমন ক'রে পা মাথায় তুলে হাঁটছিলি কেন রে?' বলে কি, ''তা' বলতে পারি না, মশায়। ওটা আমার হলো গে একটা অভ্যেস—কুসংস্কারও বটে—যখনি আমি কাজ গুছিয়ে তুলব অন্ততঃ মিনিটখানেক আমাকে উল্টো হ'য়ে হাঁটতেই হবে।''

আবার ও চেয়ারের ওপর সরে এল। ভারভারার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে দৃঢ়প্রত্যয়ের শান্তস্বরে. ভয়-মেশানো দুঃখভরা গলায় বলতে আরম্ভ করল :

'এটা কিন্তু রক্যাম্বল নয়, নেহাৎ-ই প্রতারণা, সাংঘাতিক বোকামি। আত্মছলনা আর ভ্রম. বলতে গেলে নিজেকে নিয়ে খেলা করা বই আর কিছু নয়। এর সদুত্তর শুধু একটিই আছে—ঠাস্ ক'রে এক প্রচন্ড চড় কষাও গালের ওপর। যাক্, সুখের বিষয় কি জ'নেন, আদালত এইসব ভেল্‌কিবাজি-টাজি মানে না, নইলে তারা বিচার কি ক'রে করবে? হা ঈশ্বর—নিজেকে নিয়ে খেলা! এমনি বিশ্রী কাজ যে ভাবতে গেলে কান্না পেয়ে যায়. .'

সত্যি-সত্যিই ও কে'দে ফেললে। ঠিক্‌রে-পড়া চোখ দুটোয় জলের বিন্দু। সামঘিনের মনে হ'লো ওর চোখের জলের রঙ হলদে আর ফেনায় ভর্তি। ঠোঁটের কাঁপন বন্ধ করবার জন্যে সেদুটো কামড়ে ধ'রে, মিত্রোফানভ মুখ-চেপে হাসে। বলে :

'মানুষ যে কি-সব করে, বোঝে কার সাধ্য। ইয়েরমাকভ ঘোড়ার চাষ করত, নিজের ব্যবসায় তার খুব নামডাক। অঢেল টাকা, তাই শুরু করল বুড়ীদের জন্য এক দোতলা দাতব্য-আলয় বানাতে, সঙ্গে এক গির্জা আর ওইসব নানা ব্যাপার। হঠাৎ একদিন উ'চু ভারা-টা ভেঙে পড়ে গেল, কিছুলোক পঙ্গু হ'য়ে গেল। নেহাৎ-ই এক অপঘাত, যে-কোনো লোকই তা' স্বীকার করবে। কিন্তু ইয়েরমাকভ গির্জার কাজ বন্ধ ক'রে দিল। বাড়িটা তৈরি হ'য়ে গেলে লোকের মুখ হাসিয়ে ওটা ভাড়া

দিয়ে দিল এক অনুচিত কাজের প্রতিষ্ঠানকে, যাকে ফরাসীরা শিষ্টতা বজায় রাখার জন্যে মেইস' পাব্লিক ব'লে থাকে। এ'রকম বহু ঘটনা আমি আপনাদের বলতে পারি। কিন্তু, লোকে কোন্ আদর্শটা অনুসরণ করছে? সেইটাই বড্ড গোলমেলে ব্যাপার। কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আপনার হয়তো এই কথাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হবে যে ভড়ং-ছাড়া মানুষ আর কোথাও দেখা যায় না, এখুনি হয়তো সবাই হাতে-ভর দিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠবে।'

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মিত্রোফানভ উঠে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে:

'আপনার কি মনে হয় এটা খুব একটা সরল সহজ কথা? লোকের কাজকর্মের কতরকম ধারা, হোটেল-সরাইয়ে যায়, সার্কাসে যায়, থিয়েটার দেখতে যায়—সেটাই কী সব? নাঃ, ভারভারা কিরিল্লোভনা, ওটা তো স্রেফ বাইরের আবরণমাত্র, ভেতরে-ভেতরে নিতান্তই গতানুগতিকের একঘেয়েমিতা। জীবনের সাধারণ ধারা তো বড়ই কৃত্রিম, কিছুদিন চলতে পারে কিন্তু যখন মুখোশ খুলে যাবার মুহূর্তটা এসে উপস্থিত হয়—বাস্, মানুষটার মাথা একেবারে তলিয়ে যায়।'

বেঢপ ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়।

'এতটা বিচলিত হ'য়ে পড়ার জন্যে মাপ চাইছি। জানেন নিশ্চয়ই, আপনি জীবন যাপন করছেন—কিন্তু সেটাকে ঠিক আরামপ্রদ ব'লে তো মনে হচ্ছে না। সেটাতে আপনি বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়ছেন। ক্ষমা করবেন।'

জ্যাকেটের ওপর থেকে পাউরুটির গুঁড়োগুলো ঝেড়ে ফেলে মিত্রোফানভ বেরিয়ে গেল।

'বাঃ চমৎকার', ভারভারা বিনিয়ে-বিনিয়ে বলে, আশ্চর্যের ভঙ্গীতে, চোখদুটো মুদে, মাথা নাড়তে নাড়তে। 'কি বল, চমৎকার না? মুখোশ খোলার মুহূর্ত!'

'হ্যাঁ। বেশ ইণ্টারেস্টিং,' সামঘিন মন্তব্য করে। পুলিশ-গোয়েন্দাটির "বাক্যের রীতি" বুঝবার গোলমেলে চেষ্টায় সময় কাটায়।

'না। যেমনটি ভেবেছিলে তা' নয়। সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার মানুষের সঙ্গে ওর কোনো মিলই নেই।' ভারভারা বলে।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' সামঘিন বিড়বিড় ক'রে বলতে বলতে নিজের কক্ষে চলে যায়।

'কিন্তু হতাশ হচ্ছো কেন তা' তো বুঝি না।' ভারভারা ওর পেছনে-পেছনে যেতে যেতে বলে: 'লুবাশাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাওয়ার কথাটা কি গোঘিনদের গিয়ে বলে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

ডেস্কে, এসে বসে মোটা একটা ফাইল টেনে খুলল সামঘিন। তার ওপর শিরোনামা লেখা 'বিষয়—।' কিন্তু যেই ভারভারা ঘর ছেড়ে চলে গেল, অমনি ও যেন এক লতাগুল্মে ছাওয়া চিন্তার গহ্বরে পড়ে গেল:

'প্রতারণা। জীবন নিয়ে খেলা...'

কথাগুলোর পেছনে লুকোন চিন্তার ইঙ্গিত, পরিচিত কিন্তু বিভ্রান্তিকর। মিত্রোফানভ কোনো একটা ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছে—খুবই সুস্পষ্ট সেটা। এমন ভাব যেন মহা-অপরাধী, আত্মসমর্থন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'একজন সৎ লোক এবং সেই হেতুই অপরাধী,' সামঘিন সিদ্ধান্ত ক'রে বসে। কিন্তু বিরক্তির সঙ্গে উপলব্ধিও করে যে সিদ্ধান্তটা এসেছে ওর বাইরে থেকে, কেমন বিস্বাদ-বিস্বাদ ঠেকে, বিদেশী-গন্ধ যেন।

পাশের ঘর থেকে ভারভারার কণ্ঠ ওর চিন্তাকে বাধা দেয়। আদেশের সুর:

'কফি নাও কিছুটা।'

'ধন্যবাদ', কুমভের প্রত্যুত্তর।

স্ত্রীর চেহারাটা সামঘিনের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, 'ড্রেসিংগাউন পরা, চুল খোলা, পা খালি।' ততক্ষণে তার কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল :

'কি বলল ?'

শান্ত গলায়, আর নিশ্চয়ই অন্যপক্ষের প্রসঙ্গে তার সেই চিরাচরিত কৃতার্থতার হাসিটুকু ফুটিয়েই কুমভ ঘোষণা করল :

'আত্মিক নিরক্ষতার জন্য তিনি বাস্তব-লেখকদের তিরস্কার করেন। সেটা অবশ্য ঠিকই, কিন্তু এখন আর তো তা' নতুন নয়। তাছাড়া, ওরা নিজেরাই তো জানে বাস্তবতা বহুদিন হ'লো জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে।'

'তোমারও তাই মনে হয় নাকি?'

'হ্যাঁ—, সেটাই তো নিয়ম। যখন জীবন হয় খুব বেশী বিয়োগান্ত সাহিত্য পা বাড়ায় আদর্শবাদের দিকে, রোম্যাণ্টিকের হয় উদয়, যেমনটি হ'য়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে—'

'হুঁ—, তাই হয় নাকি?' ভারভারার প্রশ্ন।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করতে করতে সামঘিন মন্তব্য ক'রে ওঠে : 'মনে মনে হিসাব কষছে এখন কোন মাল বাজারে ছাড়লে দাও মারা যেতে পারে, মুহরীটির খিট্‌খিটে গলা আর স্ত্রীর ব্যবসায়ী প্রশ্ন যাতে এঘরে আর ভেসে না আসে তারি যেন বন্দোবস্ত ক'রে ফেলল।

সন্ধ্যেবেলায় গেল গোঘিনের বাড়িতে। ভাল লাগে না যেতে, মনে হয় যেন রেলওয়ে স্টেশনে এসে পড়েছে, তেমনি নানা ধরণের লোকের ভীড়। একমাথা উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে আলেক্সেই দরজা খুলে দিলো। তার কানে পেন্সিল গোঁজা, পকেটে গাদা কাগজ। বললে :

'ও, আপনি! আমরা এখন .'

গলা নামিয়ে সামঘিন জিজ্ঞেস করে : বাড়ি সার্চ হচ্ছে না তো?'

'এই সময়ে সার্চ-টার্চতো হয় না...'

'কাল রাতে লুবাশা গ্রেপ্তার হয়েছে।' কোট না খুলেই সামঘিন জানায়। তক্ষুণি ফিরে যাবার বাসনা। গোঘিন অন্ধের মতো চোখ পিটপিট করে। সামান্য একটু কাতর শব্দ ক'রে বলল : 'বিশ্রী ব্যাপার! আমার বোনও। পলতাভা-তে। হুঁ!—আসুন, ভেতরে আসুন।'

ড্রইংরুমের দরজার দিকে গলাটা সারসের মতো লম্বা ক'রে দেয়। সেখান থেকে খস্‌খসে কণ্ঠস্বরের ভোঁতা-ভোঁতা আওয়াজ আর কাশির শব্দ ভেসে এল। সামঘিনের মনে হলো ওখানে বোধহয় চমক্ দেওয়ার মতো কিছু ঘটছে, না হলেও এখন আর হুট্ ক'রে চলে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না।...ঘরের মধ্যে ডীকন চিৎকার করছিল, কাশছিলও। একটা টেবিলের সামনে বসে বুকের ওপর দুটো হাত আড়াআড়ি ক'রে রেখেছে। বিরাট বিরাট দুটো থাবা কাপের মতো আকার নিয়ে আছে. যেন লোকটা আর জ্যান্ত নেই। তার জোর-গমকের গলায় আর অনুরণন উঠছে না. ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে, দম্‌কা কাশির আওয়াজে থেকে-থেকে বক্তব্যটা ব্যাহত হচ্ছে। ডীকন কথা খুঁজে-খুঁজে হয়রান. তাই কথা অসংলগ্ন। মাঝে-মাঝে বাক্য

শেষ না ক'রেই থেমে যাচ্ছে যেন বাকীটুকু গলার মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা ক'রে প্রতিটি কথা চিৎকার ক'রে উচ্চারণ করছে।

'মিশরের বন্দীত্ব থেকে ছাড়া পেয়ে পালানোর মতো,' চৌকাঠ পেরুতে পেরুতে সামঘিন শুনল ডীকন চেঁচাচ্ছে : 'কিন্তু কোনো মোসেস্ নেই! এমন কেউই নেই যে প্রতিশ্রুত দেশের পথ দেখাবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই সামঘিন যেন বুঝতে পারে লোকটার মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যাচ্ছে, কিছুটা ভৌতিকই যেন। অথচ কোনোদিনই তো একে দেখতে পারত না। ডীকন নিষ্পেষিত হ'য়ে পড়েছে, আগের চেয়ে চ্যাপ্টা দেখাচ্ছে, কদাকার। সোজা হ'য়ে বসে আছে, কাঠ-কাঠ ভাব। দাড়িসব পেকে গেছে, গুচ্ছ-গুচ্ছ হ'য়ে ঝুলছে,—দেখলে মনে হয় যেন কোনো ভিখারী জেনেশুনে দয়া জানানোর জন্যে কদাকার সেজে আছে। তার টাকমাথাটা এখন আরো মসৃণ হয়ে বিশ্রী দেখাচ্ছে। ধূসর চামড়ায় একটা অংশ কপাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত। তারি ওপর এখানে-ওখানে কয়েকটি, সামান্য চুলের গোছা, কানের ওপর দু'টো একটু-বেশী লম্বা চুলের ঝালর শিংয়ের মতো ঝুলে আছে। মুখটায় অপর্যাপ্ত কুঞ্চন, দেখাচ্ছেও অনেক বেশী লম্বাটে যেন সস্তা আইকনে "ভ্যাসিলি দি ব্লেসেড"-এর মুখাকৃতি।

'আর ওদের কাছে কিছুই ছিল না—না রাইফেল, না কোনোরকম পিস্তল—শুধু লাঠি আর সোঁটা আর নাকী কান্না...'

সামঘিন ভাবে : 'যাত্রার ঢং খানিকটা রপ্ত করেছে বটে।' হতাশার ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে কিন্তু যেই দেখল ডীকন ঘাড় ঘুরিয়ে আলেক্সেইয়ের সঙ্গে ওর ভেতরে আসাটা লক্ষ্য করছে, অমনিই সেটা আরো বেশী ক'রে বেড়ে ওঠে। চোখের নীচের থলথলে চামড়া ডীকনের চোখদুটোকে বিশ্রীভাবে খুলে দিয়েছে,—পাতাগুলোর নীচের দিকে টান পড়ায় লাল-লাল মাংস বের হ'য়ে পড়েছে, মণিদুটো ছড়িয়ে গেছে। তার ঘোলাটে আভায় অপ্রকৃতিস্থতার নিশ্চিত আভাস।

'বেশ, যেমন পার তাই লেখ না। কি এসে যায়,' আলেক্সেইর দিকে সজোরে হাত নাড়িয়ে ডীকন বলে।

ঘরের মধ্যে প্রায় পনের জন লোক ছড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি ওই লোকটার ওপর স্থির নিবদ্ধ। সামঘিনের মনে হ'লো ও-ও যেমন দূরে-দূরে থেকে তার দিকে চেয়ে আছে, ভয়ের চোখে, অস্বাভাবিক কিছুর প্রত্যাশাতে, সবাই বোধহয় তাই। দরজায় বসে আছে বাসার চাকর-বাকরেরা—পাচিকা, চাকরাণী আর কমবয়সী পরিচারক আকিম। পাচিকাটি নীরবে কাঁদছে, মাথার কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছছে। সামঘিন বসে পড়ল, পাশের লোকটা চেয়ারে গুঁড়িসুড়ি মেরে বসে আছে,—দুটো হাঁটুর ওপর কনুয়ের ভর দিয়ে, দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে।

'প্রচন্ড হতাশার স্রোত এসেছিল,' ডীকন কাশতে কাশতে ভারী গলায় চেঁচিয়ে ওঠে : 'জোয়ারের তোড়ের মতোই লোকজন অনাবাদী অকর্ষিত মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। অন্ধের মতো শীতের শস্য নষ্ট ক'রে মাঠ ভেঙ্গে চলল, অথচ ও-সব শস্য তো ওদের নিজেদেরই সম্পত্তি। তারপর খারকভের সেই শক্ত একগুঁয়ে সেনাচেরিব ওদেরকে তাড়া ক'রে এল...'

'ও বোধহয় সজ্ঞানে নেই, না?' সামঘিন চুপিচুপি পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করে। সে কিন্তু তেম্নিই অচলভাবে বসে থেকে, একটুও না নড়েচড়ে গজ্‌গজ ক'রে বেশ জোরেই বলে :

'তুমি নিজেই নেশায় বুঁদ হ'য়ে আছ।'

'কশাকের চাবুকে একজন গ্রাম্য নেতার পেটটা ফাঁক হ'য়ে গেল—নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে এল। মেয়েদেরকে এমনভাবে চাবুক মারা হ'লো যেন তারা মানুষই না,

ঘোড়া।'

একেকোণা থেকে কে একজন একান্ত নিরাশার সুরে প্রশ্ন করে :

'প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই হ'লো না?'

'কি দিয়ে প্রতিরোধ হবে? আঙুল দিয়ে? যখন ছিঁড়ে কুড়ে দেওয়া হ'লো তখন চামড়াগুলো বাধা দিয়েছিল বই কি।'

ডীকন চুপ হ'য়ে গেল, তার রক্তচোখ দিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল। ঘরের প্রতিটি কোণা থেকে নানা প্রশ্ন এল, তেমনি ভীরু আর তেমনি অপ্রস্তুত সব জিজ্ঞাসা। শুধু সামঘিনের পাশের লোকটা তারস্বরে কঠিনকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল :

'ওরা ক'হাজার লোক ছিল?'

'গুনিনি। অসংখ্য।'

গলার স্বরে সামঘিন পাশের লোকটাকে চিনে ফেলল। নিশ্চয়ই পয়ারকভ। ও সরে এল।

'এখানে, আপনারা সবাই জানতে চাইছেন কিভাবে ওদের মারা হ'লো, কি দিয়ে মারা হলো, ক'জনকে মারা হ'লো,' ডীকন আবার শুরু করে। একটু কেশে নিয়ে নোংরা একটা রুমালে থুঃ-থুঃ ক'রে বলে : 'এগুলো কি সংবাদপত্রের প্রবন্ধের জন্যে নাকি, এ্যাঁ? তোমাদের সবই তো কথা আর শব্দ। কাজ কি হবে কোনদিন?'

চেয়ার থেকে উঠতে যায় কিন্তু পারে না। প্রকাণ্ড বুটজোড়া যেন মেঝেতে আট্‌কে গেছে। চেষ্টা করে। কিন্তু এবারও পারে না। পাঁশুটে রঙের কোটটায় নানা ভাঁজের দাগ ধরা; কলারে ঘাড়টা যেন বিরাট একটা গাছের কাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে. সেটাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে জমায়েতের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে আবার শুরু করে :

'এক সময় আমিও কথা বা শব্দে আরাম খুঁজে পেতাম। পদ্যও লিখতাম। কিন্তু কথায় কোনো আশ্বাসই নেই। বিশেষ একটা সময় পর্যন্ত ওরা খুব ভাল, কিন্তু তারপরই একটা সময় এসে উপস্থিত হয় যখন নিজেরই লজ্জা করবে...'

'মুখোস খুলে যাওয়ার মুহূর্ত,' সামঘিনের মনে যন্ত্রের মতই কথাগুলো ফুটে ওঠে।

'কথা আর কথা। তাদের স্বরূপ কি? প্রাণের বিষ্ঠা।'

পাশ ফিরে বসতেই ডীকনের দাড়ি টেবিলের ওপর এসে পড়ল। এলোপাথারি ভাবে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে ডীকন পাগলের মতো বিড়বিড় ক'রে ওঠে :

"উগ্রদৃষ্টিতে শয়তান রইল চেয়ে মোদের জীবনের প্রতি,
কেঁপে-কেঁপে উঠল, আর্তধ্বনিতে ঘোষিত হ'ল ভীতি :
"প্রভু—আমি পাগলের মত একি করেছি?
"তোমাকেও জয় করেছি—হে প্রভু,—অবিদিত নহে তাহা তোমার চরণে?
"সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছি তোমার বিধান, তোমার নিদান।
"হে মোর বন্ধু, মোর অসফল ভ্রাতা,
"মোর অ্যাবেল, তুমি...'

প্রচণ্ড জোরে কেশে উঠল, কাশির দমকে কোনোমতে চেয়ারের সীমায় নিজেকে ধ'রে সামলে নিল। তারি মধ্যে মধ্যে বলল :

'এই সব আমি লিখতাম—সবটা এখন মনে নেই—শেষটায় আছে :
'আলিঙ্গনবদ্ধ হ'লো। উভয়েই বিষাদ-তিক্ত রোদনে ভেসে গেল...'

হাত দিয়ে ডীকন টেবিলে চাপড় মেরে ওঠে।

'পরস্পরের অক্ষমতার জন্যে ঈশ্বর আর শয়তানের চোখের জলের কি মূল্য? লোকে তো চোখের জল চাইছে না, চাইছে একজন গিডীয়ন, ম্যাকাবীস...'

আবার টেবিলে চাপড় মারে। এবার তাতে লাভই হলো, ও উঠে পড়তে পারল। লম্বা শীর্ণ শরীর, কণ্ঠস্বরে চিৎকার ওঠে :

'আমাদের দরকার একজন জোশুয়া! এ-কথা শুধু আমার নয়, এ'হচ্ছে প্রতিটি মানুষের দীর্ঘশ্বাস। আমি নিজে শুনেছি লোককে বলতে : আমাদের একজনও লোকের মতো লোক নেই। যদি থাকত! হ্যাঁ!'

তার লম্বা শরীরে কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটা তীব্র বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'এখানে একজন প্রচারক ছিল, মাটির নীচে একটা ছোট্ট কুঠুরীতে বাস করত, সুখারেভ্‌কা বাজারে আবর্জনা বেচ্‌ত। তার শিক্ষা ছিল : পাথর বোকা, গাছ বোকা আর ভগবান বোকা। তখন আমি চুপ ক'রে থাকতাম। মনে-মনে বলতাম, মিথ্যে কথা, খ্রীষ্ট চালাক। কিন্তু এখন বুঝি—নিজেকে আরাম দেবার জন্যে, আশ্বাস দেবার জন্যেই ঐ সব। এ-সব শুধু কথাই। খ্রীষ্টও একটা মৃত শব্দ। আছে তাদেরি সঙ্গে যারা অস্বীকার করছে, যারা স্বীকার করছে তাদের সঙ্গে নেই। আতঙ্কের বিরুদ্ধে কাকে স্বীকার করবে? মিথ্যাকে। মিথ্যাই স্বীকৃত হয় সেখানে। মানুষের বিরাট দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই। বাদবাকী সব—বাড়িঘর, আস্থা বিশ্বাস, বিলাসব্যসন বিনয়-নম্রতা—সব মিথ্যা।'

ডীকন যদিও কাশির দমকে বাধা পাচ্ছিল তবুও তার বক্তব্যে ছিল অসম্ভব জোর। কতকগুলো কথায় তো তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর যেন নরম হ'য়ে এসেছিল—সেই পুরোনো ভেলভেট-মসৃণ কণ্ঠ যেন আবার ফিরে পেয়েছিল। সামঘিনের চোখের সামনে হঠাৎ এক বিষণ্ণ দৃশ্য ভেসে এল : রাতের অন্ধকার। সীমাহীন উদাত্ত মাঠ। যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকেই দূরদিগন্তে বিশাল লেলিহান অগ্নিময় কুণ্ড। বহ্ন্যুৎসবের ভেতর থেকে হাজার হাজার কৃষাণের মাথার ওপর দিয়ে সদম্ভে এগিয়ে আসছে এই ভয়ংকর ব্যক্তিটি, তার অনাবরণ চোখে মত্ত দৃষ্টি।—সামঘিন দেখল শ্রোতারা যেন থিয়েটারের দর্শক, নায়ক পছন্দ না হ'লে যেমন পরস্পরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে তেমনি ভাবেই যেন একে অন্যের দিকে ওরা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

'আর ওই যে ক্রীতদাসদের কথা, ওগুলোও সত্যি না। মিথ্যা!' ডীকন বলে। কাঁপা-কাঁপা হাতে কোট চেপে ধরে। 'খ্রীষ্টের আগে ক্রীতদাসের অস্তিত্বও ছিল না—ছিল শুধুই বন্দীরা। ক্রয় হয়েছিল তাদের দেহ, দৈহিক ক্রীতদাসত্বই শুধু। কিন্তু খ্রীষ্টের সময় থেকেই আত্মিক ক্রীতদাসত্ব শুরু হলো!'

পয়ারকভ মাথা তুলল, সোজা হয়ে বসে বলল :

'ঠিক বলেছেন, পাদ্রী।'

'না, মশায়! আমাকে বলতে দিন—' ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পায়ের একটা লোক উদ্ধত চিৎকার ক'রে উঠল, তার হাতে লাঠি। পয়ারকভ তাকে চাপাসুরে গর্জন ক'রে ধমক দেয়। ডীকন আঙুলগুলো ফাঁক-ফাঁক ক'রে একটা হাত ছাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে :

'এক সময় আমার এক ছেলে ছিল। এক সময় জনপ্রেমিক ছাত্র মারাকুয়েভ এই দুনিয়ায় বাস করত। নির্বাসনে সে মরে গেল। শ'য়ে শ'য়ে ধ্বংস হয় এই রকম সবিনয়ী ভদ্র যুবকের দল! লোকও ধ্বংস হয় কত। বিশৃংখল চেহারার কোনো কশাক তরুণ তার চাবুক দিয়ে এমন সব বুড়ো লোকদের চাবকায় যারা অর্ধ-শতাব্দী ধরে তাদের আহার যুগিয়ে এসেছে, বিশপদের, তোমাদের সবায়েরই—গোটা রাশিয়ার! ও তাদেরকেই চাবকায়। মারার কথাটা সদম্ভে ঘোষণা করে, উল্লসিত হয়, অহঙ্কার ক'রে বলে যে তাদেরকে মেরে ফেললেও ওর কিছু হবে না। আঃ—'

কানে তালা লাগার মতো প্রচণ্ড জোরে ডীকন 'আঃ' ক'রে ওঠে। শুনে

সামঘিনের মনে হয় এখুনি কোনো অশ্লীল শাপ-শাপান্ত হয়তো করবে। কিন্তু যে-চেয়ারটায় এতক্ষণ বসেছিল সেটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডীকন শুধু বৃষ্টিভেজা পাখীর মতোই নিজের শরীরে ঝাঁকুনি দেয়। পকেট থেকে উজ্জ্বল রঙের স্কার্ফ বের ক'রে গলায় জড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'আর বলতে পারছি না,' বিড় বিড় ক'রে ওঠে : 'ক্ষমা করো। শরীরটা ভাল ঠেকছে না।'

তার পেছন-পেছন গেল আলেক্সেই ও সাদা-মাথা বুড়ী একজন। বুড়ীর পরনে শোকের পোশাক, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল : 'কিন্তু আপনি কোথায় শোন?'

ডীকন উত্তর না দিয়ে শুধু কাশে। অন্ধের মতো দু'হাতে বাতাস ঠেলে ঠোকর খেতে খেতে এগিয়ে যায়।

পয়ারকভ আবার গুটিসুটি মেরে বসে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাছে ওর সংগে চোখাচোখি হয় তাই সামঘিনও নিঃশব্দে হলঘরের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে গেল দরদালানে। ডীকন রাস্তার ও-পারে একটা ল্যাম্প-পোস্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে একটা কাগজের চিরকুট আলোর দিকে উঁচু ক'রে ধরে পড়ছে, অন্য হাতে চোখ আড়াল ক'রে রেখেছে। অদ্ভুত ধাঁচের টুপী তার মাথায়। সামঘিনের মনে পড়ে শিল্পীরা গোগোলের কর্মচারীদের মাথাতেও এমনি ধরনের টুপী এঁকে বসিয়ে দেয়।

নেশাগ্রস্ত মানুষের মত, গজর-গজর ক'রে আর কাশতে কাশতে ডীকন অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে : 'যত সব জোচ্চের।' চিরকুটটা টুকরো-টুকরো ক'রে ছেঁড়ে। আর তারপর, ল্যাম্প-পোস্ট থেকে হঠাৎ সামনে চলে আসতেই বুটের ওপর খুব জোরে ঠোক্কর খায়। রাস্তাটা সরু, তাই ও-পাশ দিয়ে চলতে চলতেও সামঘিন তার অসন্তোষের বিড় বিড় ধ্বনি শুনতে পায় :

'ঈশ্বরের কাছে আহুতি—প্রাণ ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো—হৃদয় ভেঙেও গুঁড়ো-গুঁড়ো আবার হৃতমান। হিঃ হিঃ!'

পথচারিরা এই দীর্ঘ মানুষটার দিকে পেছন ফিরে ফিরে তাকায়। ডীকন হাত দু'টোও দুই পাশে চেপে পকেটের গভীরে ঢুকিয়ে রাখায় তাদের মনে হয় লোকটার বোধহয় হাতই নেই।

সামঘিনের মনে চিন্তা : 'বুড়ো বয়সে বিশবাস হারিয়ে ফেলাটা না জানি কত কষ্টকর।' মনে পড়ে এই অর্ধ-উন্মাদ মৃতপ্রায় লোকটার মুখ দিয়েই নিকিতা খ্রীস্টকে বলেছিল :

'যখন তোমাতে মোদের দ্বেষ, তখনো ভাল না বেসে পারি না;
ঘৃণা-দ্বেষের মাঝেও মোরা তোমার সেবক ছাড়া কিছু না।'

কিন্তু এই অনুভূতি সামঘিনের মনের ওপর বেশীদিন চেপে বসতে পারল না। ধীরে-ধীরে সময়ের আবর্তনে তা গেল কোথায় হারিয়ে।

*

কয়েক দিন পরে প্রায় মাঝরাত্তিরে ভারভারা যখন শুয়ে পড়েছে আর সামঘিন স্টাডিতে বসে কাজকর্ম করছে, তখন ওদের দাসী, গ্রুশা এমন মুখ ক'রে এসে বলল যেন কুকুর-বিড়ালের সম্বন্ধে বলছে :

'ভাড়াটিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

পা টিপে টিপে দু'হাতে ভারসাম্য বজায় রেখে মিত্রোফানভ এসে ঘরে ঢোকে। চিবুক পর্যন্ত মুখটা নেমেছে হাস্যকরভাবে, গোঁফ খোঁচা-খোঁচা হয়ে উঠেছে। দরজাটা শক্ত ক'রে বন্ধ ক'রে টেবিলে এসে শান্ত গলায় জানায় :

'আবার একজন ছাত্র এক মিনিস্টারকে গুলী ক'রে মেরেছে।'

সামঘিনের পক্ষে হাসি চাপা মুস্কিল হয়ে ওঠে, মিত্রোফানভের মুখটা কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে, তার নুয়ে-পড়া কাঁধ আর সমস্ত মুখমণ্ডলের তোবড়ান ভঙ্গীটি হাস্যকর ঠেকছে।

'একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই, কাঠ-ঠোকড়া পাখীর মতোই পড়ে গেল। ভয়ানক ওস্তাদ। অফিসারের মত সাজপোশাক পরে এসে—দুম্!'

'সত্যি—?' কিছু একটা বলবার জন্যেই যেন সামঘিন প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, খাঁটি খবর। যা কিছু যক্ষ্মুণি ঘটে আমরা খবর পাই।' মিত্রোফানভ বলে। গভীর নিশ্বাস ফেলে বসে পড়ে, টেবিলের এক কোণায় বুকটা চেপে ধরে।

'ক্লিম ইভানোভিচ,' ফিস্‌ফিস ক'রে বলে উঠল : 'আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন না—ছাত্র আর মিনিস্টারদের মধ্যে এই লড়াইটা কিসের জন্যে? বোঝা শক্ত দেখছি। ওরা বোগোলোপভকে গুলী করল, পবেদোনোস্‌ত্‌জেভকে গুলী করতে চেষ্টা করল আর এই আমাদেব ত্রেপভ—এখন যেটা হ'লো—বুঝতে পারি না এ-সব কেন ঘটছে—' আঙুলের চারপাশে রুমাল জড়াতে জড়াতে চাপা সুরে কথা বলে : 'মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকাতে আছি, বুঝলেন—নিগ্রো, গণ্ডার, একেবারে হিংস্র দেশ একটা!'

'সন্ত্রাসবাদের ওপর আমার একটুও সহানুভূতি নেই,' সামঘিন সাত-তাড়াতাড়িই বলে উঠল, কিন্তু কথায় ততটা প্রত্যয় যেন ফুটল না।

'জানি আপনি যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা রাখেন, তাই তো আমি...'

মিত্রোফানভের জবুথুবু দেহটা চেয়ারের একধারে সরে এসেছে। সামঘিনের দিকে ঝুঁকে চোখভরা প্রশ্ন ফুটিয়ে বলে :

'আমার মতে এর নাম বিপ্লব নয়, এ তো শুধু সাধারণ খুন-খারাপি। যেমন ধরুন আপনার স্ত্রীর প্রেমিককে হত্যা করার মতো ঘটনা। অফিসারের পোশাক পরে, ছদ্মবেশীর মতো এদিক-সেদিক ঘুরে—তারপরেই দুম্! এই একটা রাষ্ট্রের চেহারা নাকি! এ তো দেখছি অজ পাড়াগাঁ। যদি সবাই গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু ক'রে তবে নিরাপদ রাষ্ট্র কোথায় পাবেন?'

'কোনো সন্দেহই নেই এই একক সংগ্রামগুলো শুধু পাগলামী,' দৃঢ়কণ্ঠে সামঘিন ঘোষণা করল। দেখল মিত্রোফানভ কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্রমশঃ কেমন ভীত হয়ে পড়ছে। অনর্গল ঘামছে, দুটো পাশে কনুই চেপে প্রায় গর্ত খুঁড়ে ফেলছে. হাতগুলো অদ্ভুতভাবে নাড়াচ্ছে—মাছের পাখনার মতোই সে-দুটো হাতের চেহারা।

'ছদ্মবেশে এসেছিল। তার দৃষ্টান্ত দেখে তো যে কেউ এখন প্রীস্ট সেজে গিয়ে আর্কবিশপকেও গুলী করতে পারে।'

সামঘিনের আরো কাছে সরে এসে ও বলে : 'ক্লিম ইভানোভিচ, আপনি অবশ্যই জানেন যে এই বাড়িটার ওপর--মানে, নজরে রাখা হয়েছে...'

'মানে, আমার বাড়িতে? আমার ওপর?'

'হ্যাঁ। আপনার বাড়িতে। গোয়েন্দাদের অবশ্য আমি চিনি, আমাদের কাজ তো প্রায় একই ধরনের। আপনার বাড়িতে যারাই আসে তাদের ওপর লক্ষ্য রাখে, ক্লিম ইভানোভিচ।'

'আমার ওপরেও নিশ্চয়ই?'

'স্বভাবতঃই! এখানে সমভার সঙ্গে দেখা করতে আসত একজন বেশ শান্তশিষ্ট ভদ্রমহিলা—নিকনোভাই বোধ হয় তার নাম—তারপর, মিঃ সুসলভ, মোটের ওপর—আপনি তো বোঝেন ক্লিম ইভানোভিচ, কোনোমতে আপনি যদি...'

'ধন্যবাদ,' সামঘিন গভীর কণ্ঠে বলে।

মিত্রোফানভ নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা আলোচনায় যতি টানবার জন্যেই সামঘিনের ইঙ্গিত। তাই সে উঠে পড়ে। বুকের বাঁ-পাশে হাত চেপে বলে :

'শপথ নিয়ে বলছি এ শুধু আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার জন্যেই...'

'তা বুঝেছি, ধন্যবাদ।'

সামঘিন হাত বাড়িয়ে দিল। গোয়েন্দাটি ব্যগ্রভাবে সেটা দুই হাতে চেপে ধরে। গলা নীচু ক'রে জিজ্ঞেস করে :

'ছাত্রটা কি তাদের জন্যে, না, উক্রেইনিয়ানদের জন্যেই এই হত্যাটা করল? জানেন নাকি?'

'জানি না।' সামঘিন বলল। অজান্তেই অতিথিকে দরজার দিকে ঠেলে দিল যেন। একের পর এক বহু চিন্তার ভীড় ওর মনে। এই হত্যাকাণ্ডটায় আবার নতুন ক'রে বহু ধরপাকড় হবে, দমন-নীতি চলবে, নতুন নতুন সন্ত্রাসমূলক কাজ ঘটবে. গত বিশ বছরে এ-দেশের ওপর দিয়ে যা-যা হয়ে গেছে আবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।.. শোবার ঘরে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে স্ত্রীর খাটের পাশে থমকে দাঁড়ায়—গভীর ঘুমে সে অচেতন, বিরক্তির ভ্রূকুটিতে মুখের ওপর ভাঁজ পড়েছে। নিজের খাটে বসে সামঘিনের মনে পড়ে ভারভারাকে যখন মারাকুয়েভের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিল, সে শান্ত গলায় বলেছিল :

'জানি।'

'আমাকে বল নি কেন?'

ভারভারা জবাব দিয়েছিল :

'রেকুয়েম্ সার্ভিস যদি করতে চাও তো এখনো এমন কিছু দেরী হয়নি।'

'তোমার ঠাট্টাটা বড়ই বোকার মতো,' সামঘিন বলেছিল।

'ঠাট্টা করি নি। আমি রেকুয়েম-সার্ভিস করেছি,' পেছন ফিরে বলে উঠেছিল।

'ক্রমশঃ ও অপরিচিত হয়ে উঠছে' সামঘিন পোশাক ছাড়তে ছাড়তে ভাবে। 'ওকে জাগিয়ে আর কাজ নেই, কালকেই বলব সিপিয়াঘিনের কথাটা,' এমনভাবে সঙ্কল্প করে যেন এতে ভারভারাকে বেশ খানিকটা শাস্তিই দেওয়া হবে।

*

ভারভারা নিজেই কিন্তু এ-খবর ওকে দিল। সকালবেলায় খবরের কাগজ নাড়তে নাড়তে ওর ঘুম ভাঙিয়ে তারস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে : 'সিপিয়াঘিনকে গুলী ক'রে মেরেছে! পড়ে দেখ!'

ওর খাটের ওপর নিঃশব্দে এসে বসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে : 'ছাত্র বালমাশভ। আরেঃ তাকে তো আমি দেখেছি, জ্লামেন্স্কিদের ওখানে। ওর বোনও ছিল, বা হয়তো ওর প্রেমিকা। হ্যাঁ, প্রেমিকাই হবে—ছোটখাট মেয়েমানুষ, বয়স কম, পালকের বোয়া পরেছিল। আর কি যে নাম—আর্মেনিয়ান বোধহয়, না...'

খবরের কাগজটাকে দুমড়ে-মুচড়ে. ঘুম-ঘুম মুখটায় হাসির বাঁকা-বাঁকা রেখা

ফ্ুটিয়ে অভিযোগ জানাল :

'কিছ্ দিনের মধ্যেই এমন হবে, ব্ঝলে, যে যেখানেই যাও কোন-না-কোন বীর নায়কের দর্শন পাবেই...'

কথা শেষ করবার আগেই ক্লিম ও কি বলতে চায় তা ব্ঝে নিয়ে বলে উঠল :

'মনে আছে বীর নায়কের জন্যে তোমার সে আকুলতা?'

ম্খ টিপে হেসে ভারভারা আয়নার সামনে যায়। বিচলিতভাবে চুলে চির্নী ব্লায়।

'এ-হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্যে কাজ এগিয়ে দেওয়া.' মেঝের ওপর কাগজটা ছ্ঁড়ে ফেলে ক্লিম বলে : 'পরে এমন হবে কোনো লেভ তিখমিরভ আবার অন্-শোচনা ক'রে বলবে যে, সন্ত্রাসবাদ নিরর্থক বোকামি, রাশিয়ার পক্ষে জারই এক-মাত্র কাম্যবস্তু।'

'এ-সব ব্ঝি না বাপ্। তিখমিরভকে আশা করবার কি দরকার।—কিছ্ই ব্ঝি না। দেশে একটা র্চিশীল আন্দোলনের স্চনা হয়েছে। কাব্যে-সাহিত্যে-চিত্রশিল্পে উজ্জ্বল আলোর সমারোহ এসেছে'' ভারভারা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে যন্ত্রণায় ম্খ ভেঙচিয়ে বিরক্তকণ্ঠে বলে। তার বিরক্তিতে যেন নির্ব্দ্ধিতার ছাপ। সামঘিন একট্ বাঁকা হাসি হেসে ম্খ-হাত ধ্তে যায়। বাথর্মে ঢ্কে কিন্তু কৌচে বসে কান খাড়া করে। বাড়ির সর্বত্র যেন অস্বাভাবিক ঠেকছে—চারদিকে আওয়াজ, যেমন লম্বা ছ্টির আগে ঘর-দোর সাফ করার ধ্মধারাক্কা পরে যায় তেমনিই। দরজাগ্লো দড়াম-দড়াম ক'রে বন্ধ হচ্ছে, রান্নাঘরে ঘটিবাটির ঝন্ঝন্ শব্দ. প্লেট নিয়ে দৌড়ে যেতে যেতে পরিচারিকা অন্য দিনের চাইতে অনেক বেশী আওয়াজ করছে। আনফিমিয়েভনা ঘোড়ার মতো ক'রে চলেছে।

সামঘিনের মনে হয় বেশীর ভাগ ব্দ্ধিজীবীদের বাড়িতেই বোধহয় এমনি অর্থ-হীনভাবে কোলাহলম্খর। সবখানেই অর্ধ-বাস পরা উস্কোখ্স্কো লোক খবরের কাগজ পড়ছে, মিনিস্টার নিহত হয়েছে দেখে উল্লসিত হচ্ছে, ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

'অসম্ভব জীবন...'

বাথর্ম থেকে আসতেই হলঘরে পাচকের সঙ্গে দেখা হয়। দেওয়াল ঘেঁষে ছায়ার মতো ওরই দিকে এগিয়ে আসছে. ট্পীটা হাতে ধরা, ম্তের মতো বিবর্ণ।

'একটা কথা জানতে চাই—'

ম্খ কেঁপে কেঁপে উঠছে, দন্তহীন মাড়ির ব্যঙ্গহাসিকে ঘিরে তার গাল থেকে টেকো চাঁদি পর্যন্ত অজস্র কুঞ্চন যেন আস্তে-আস্তে গ্ড়ি মেরে মেরে এগ্চ্ছে।

'দেখ্ন জনগণের একমাত্র রক্ষক জারের প্রভুভক্ত সেবকদের যারা হত্যা করছে, সেই ছাত্রদের উদ্দেশ্য কি তা' জানতে আমার কৌত্হল হচ্ছে,' দ্র্-দ্র্ গলায় থেমে থেমে বলে। বিদ্রূপ ক'রে বলার ইচ্ছে সত্ত্বেও তার স্রটা যেন বিলাপের মতো শোনায়। হাতের মধ্যে ধরা মাড়-করকরে ক্যাপটাকে দ্মড়ে তুলেছে সে। চোখদ্টো এতবছর ধ'রে ঝাপসা হ'য়ে থেকে এখন হলদে অশ্র্তে ভাসছে, যেন রসে ভাসা গজবেরী।

'আমি সত্তর বছর ধ'রে বেঁচে আছি—অনেক প্র্বতন ছাত্র বড় বড় পদ অধিকার ক'রেছে—আমি নিজে তা' দেখেছি! চার বছর আমি নিহত হিজ এক্সেলেন্সির আত্মীয়দের সেবা করেছি, সিপিয়াঘিনদের—তাঁকে য্বক বয়সে দেখেছি.' অজস্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলল। কর্ণপাতও করল না সামঘিনের কথায় :

'ইয়েগর ভাসিলিয়েভিচ, শান্ত হও!'

'জার ছাড়া আমাদের আর কোনো রক্ষকই নেই.' পাচকটি ফ্ঁপিয়ে ওঠে : 'আমি একজন সার্ফ ছিলাম, গ্হভৃত্য,' লাল-লাল ম্ঠি দিয়ে ব্ক ঠ্কে বলে : 'সারাটা জীবন

আমি অভিজাতদের সেবা ক'রে এসেছি—শেঠদের ঘরেও করেছি, কিন্তু সে-কাজ আমার অসম্মানজনক মনে হয়েছে! তবে আম বলব—নাঃ, এ কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না...'

রান্নাঘর থেকে রাজকীয় ভঙ্গিমায় বেরিয়ে এল আনফিমিয়েভনা, তার ব্লাউজের হাত ওপরে গোটান। উরুর মতো স্থূল হাত দিয়ে পাচকটির কাঁধ ধ'রে তাকে দেওয়াল থেকে টেনে নিয়ে এল, এত অনায়াসে যেন দেওয়াল থেকে সাঁটা কোনো কাগজের টুকরা সে টেনে ফেলে দিচ্ছে।

'ইয়েগর, কাজে এস! স্মেলিং সল্ট শুঁকো'খন। এস!'

ছোট ছেলের মতো তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে, সামঘিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল :

'একে আর কথাবার্তা দিয়ে নষ্ট করা কেন। এর কাছে তো আবার সবই সমান। মাছিদের সঙ্গেও পারলে কথা কয়।'

রান্নাঘরে পাচকটিকে রেখে এসে, আনফিমিয়েভনা নালিশ জানায় :

'মনিবরাই ওকে খারাপ করেছে। সবসময় বড়-বড় বাড়িতে কাজ করেছে আর—'

'বৃদ্ধকে দেখে করুণা জাগে।' ক্লিম অস্ফুট উক্তি ক'রে।

করুণা জাগে? বল জেগেছে! আরে, রাম-রাম, এততো বছর বাঁচলে কেই বা করুণা না জাগিয়ে থাকতে পারে?' আনফিমিয়েভনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।



একঘণ্টা পরে ক্লিম ওর 'বসে'-র স্টাডিতে এসে উপস্থিত হয়। বিরাট চেহারার রাশভারী মানুষটা ড্রেসিংগাউন পরে ডেস্কে বসেছিল। ক্লিমকে দেখে তার হাত-খানা পরম সমাদরে বাড়িয়ে দেয়, ভুরুজোড়া নাড়িয়ে প্রশ্নের ভঙ্গীতে ক্লিমের মুখের দিকে তাকিয়ে নীচুগলায় জিজ্ঞেস করে : 'কেমন বুঝছ?'

'প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজ এগুচ্ছে।' ক্লিম বলে।

বাঁ-ধারের দেওয়ালে ছোট্ট দরজাটার দিকে চোখের ইঙ্গিত ক'রে 'বস' বলে :

'অত জোরে না। নতুন মুহুরীটা ওখানে আছে।'

ছাদের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হ'য়ে থেমে যায়।

'প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্যে বললে না? হুঁ, ভয়ানক জটিল প্রশ্ন। যুবকেরা একটু খেপে গেছে ঠিকই, কিন্তু তা' বলে...'

আবার থেমে গেল, চিন্তা করছে যেন। ভুরুজোড়া উঁচিয়ে তোলে। আজ সকালে তাকে যেন একটু বেশীই চকচকে দেখাচ্ছে, শরীর থেকে ওডিকোলনের যে গন্ধটা বেরুচ্ছে সেটা আরও বেশী তীব্র। উজ্জ্বল চেহারায় গাম্ভীর্য্য বিকীর্ণ হচ্ছে, নখের চারাগুলো জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে উঠছে। চোখ দুটোয় প্রশ্নের দ্যুতি, মনে হয় সামান্য ভীতির ছায়াও বা আছে।

'হ্যাঁ, তরুণেরা উত্তেজিত হ'য়ে আছে বটে, কিন্তু তার কারণ মোটেই অবোধগম্য নয়,' সাবধানে উচ্চারণ ক'রে ক'রে বলে 'বস', ঠোঁটের ভেতরে যেন কথার তাল ছেনে-ছেনে তুলছে। 'এই বিতৃষ্ণা তো স্বাস্থ্যকর। লোকে দেখছে সরকারের শাসন চালানোর মতো ক্ষমতাই নেই—মানে তারা একেবারেই অসহায়। অক্ষমও নিঃসন্দেহে, দক্ষিণের গণ্ডগোলটাই তো তার প্রমাণ।'

অন্যদিকে ঘুরে চীফ নীরবতায় কান পেতে থাকে।

'প্ররোচকদের নিয়ে বিপ্লব অথচ নেতা নেই, বুঝতে পারছ। একেই তো বলে নৈরাজ্যবাদ। দেশের সুস্থ চিন্তাধারা যেটা চায় তা'তো এ-দ্বারা আসতেই পারে না। যেমন শুধু নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহতেও আসতে পারে না—মনে ক'রে দেখ ডিসেম্বরিস্টদের কথা, নারদোভোলৎজিদের...'

ডীকনের কথা স্মরণ ক'রে সার্মাঘিন ভাবে :

'ইনি ও গিডীয়নদের স্বপ্ন দেখছেন। বেশ ভাল গিডীয়ন হবেন বটে উনি, ওই ভুঁড়ি নিয়ে. ঘড়ির চেনের অসংখ্য তাবিজ ঝুলিয়ে।'

'যুবকেরা তাদের কর্তব্য বুঝতে পারবে, এইটাই তো সবাই আশা করে।' বুধ বলতে বলতে সামাঘিনের দিকে একবাণ্ডিল কাগজ ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ড্রেসিং-গাউনটা ফাঁক হ'য়ে গেল, তলার রেশমী অন্তর্বাস ক্লিমের চোখে পড়ে, শরীরটা যেন সার্কাসের মল্লবীরের মতো।

'আসলে কি জান. লোককে একযোগে দু'টো মোর্চায় লড়াই করতে হবে,' বক্তৃতার সুরে বলে ওঠে, গুরু-গম্ভীর চালে। এদিক-ওদিক.পায়চারি ক'রে রুমালের প্রান্ত আঙুলে জড়াতে-জড়াতে আবার বলে : 'হ্যাঁ, দু'টো মোর্চা : একদিকে ডানধারের ওই শয়তানগুলোর বিরুদ্ধে যারা জনতাকে আবার পুগাচেভিজ্‌মের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে, যেমনটি হ'য়েছিল দক্ষিণাঞ্চলে; আর অন্যদিকে হতাশায় যারা ভেঙ্গে পড়েছে তাদের নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে।'

এই সদ্‌-ভুক্ত লোকটি যে বিচলিত হ'য়ে উঠেছে তা'তেই সামাঘিনের আনন্দ। ওর মাথায় এক অদ্ভুত কল্পনা এল। মিত্রোফানভকে যদি বলা হয় এ ভদ্রলোকের বাড়িতে চোর পাঠান হোক তো কেমন হয়। মিত্রোফানভ নিশ্চয়ই কথা রাখবে. কত চোরের সঙ্গে তো তার বন্ধুত্ব।—কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া উঠল :

'ধেৎ! কি যে সব আবোল-তাবোল ভাবছি!'

ওর 'বস' আবার ওর কাছে এগিয়ে এসে বলে :

'হ্যা, একটা কথা। পরশু রাতে আমি একটা—আমাকে বলা হয়েছে ছোট একটা সভার আয়োজন করতে। এস। একটা লোক—ধর. মফঃস্বল থেকে আসছে—বেশ চমকপ্রদ রিপোর্ট দেবে—মানে সে রকমই আমায় বলা হয়েছে।'

'খুব খুশী দেখছি।' সামাঘিন ভাবে। বাইরে কিন্তু মাথাটা বেশ সম্মানজনক-ভাবেই ঝুঁকিয়ে আসবার স্বীকৃতি জানায় : 'খুশী যে হ'য়েছে তা'তো বোঝাই যাচ্ছে।... নাঃ, এমনটি আমি কক্ষণো হবো না।' বিনা দ্বিধায় নিজের সম্বন্ধে চূড়ান্ত মত দিয়ে বসে।

'কোর্টের পর এখানেই এস। আজ আমি যাচ্ছি না—শরীরটা ভাল না। এ সপ্তাহে একদিন কিন্তু তোমাকে কালুগা যেতে হবে।'

দিন তিনেকের মধ্যে সামাঘিন দেখে সিপিয়াঘিনের মৃত্যু লোককে অস্থির ক'রে তুলেছে। বোগোলোপভের মৃত্যু হতেও এই মৃত্যু অনেক বেশী উল্লাস সঞ্চার করেছে। ওর মনে হ'লো সাধারণভাবে দেখতে গেলে লোকের মনোভাব যেন নাটকের চাঞ্চল্যকর প্রথম অঙ্ক দেখবার পর দর্শকদের যেমন অবস্থা হয়, তেমনি।

গাজুরে উকীল হাত ঘষতে ঘষতে বলে : 'যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়েই কাজে নেমেছে ব'লে মনে হচ্ছে।'

'দেখা যাক্ কি হয়। দেখতেই পাব।' আরেকজন বলে, সুফলের প্রত্যাশা ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করে। আবার অনেকে সন্দেহবাদীর সুরে বলে :

'কিছুই হবে না। বহুবার এসব পরীক্ষা হ'য়ে গেছে।'

বড়-গোঘিন অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল :

'হ্যাঁ, যদি শ্রমিকরা এখন ভাল ক'রে আঘাত ক'রে স্ক্রুটা এ'টে দিতে পারে, তবে

মজবুত শরীরের জন্য রাশিয়াকে আমরা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাতে পারব। কি বল, আলিয়োশা?'

আলেক্সেই অনেক শুকিয়ে গেছে। গোমড়া মুখে ইতস্ততঃ ক'রে জবাব দেয় : 'অন্যের জন্যে কাজ করতে করতে শ্রমিকদের বোধহয় হাঁফ ধ'রে গেছে।'

রাস্তায় সামঘিনের সঙ্গে রেদোজুবভের দেখা।

প্রাক্তন তলস্তয়ীটি বলে উঠল : 'পাগলামী সব!' যেখানে জলার নালা-কাটা দরকার সেখানে ওরা ডাঁশমাছি মারছে।'

কথাটা ক্লিমের কাছে বড্ড ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকল, বড়ই কৃত্রিম। এর চেয়ে রেদোজুবভের ব্যগ্র প্রশ্নটি ঢের স্বাভাবিক শোনাল :

'আইনজীবী হিসাবে আপনার কি মত? কার্পভিচের মতোই বালমাশভকেও কি ফাঁসীতে ঝোলাতে ওদের ভয় হবে?'



সামঘিনের 'বস-এর বাড়িতে যেদিন মিটিং সেদিন আবহাওয়াটা ছিল বড়ই বিশ্রী। খোদিনস্কি ময়দান থেকে শহরের মধ্যে হিম হাওয়ার ঝাপ্টা ভেসে আসছিল। সঙ্গে নিয়ে এল আঁঠালো তুষার-কণা, অকালের পণ্য। সন্ধ্যের দিকে সত্যি সত্যিই ঝড় এল। ক্লিম ভয়ানক পরিশ্রান্ত, একটুও জুত পাচ্ছিল না। দেরী হয়ে গেছে বুঝতে পারছিল, তাই যত হম্বিতম্বি সব গিয়ে পড়ল কোচোয়ানের ওপর। সে-বেচারী চোখে তুষার পড়ায় দেখ্তে পাচ্ছিল না। বাক্সের ওপরে এদিকে-ওদিকে দুলে-দুলে উঠছিল। সওয়ারীর ঢক্কা-নিনাদের দিকে দার্শনিক নীরবতা বজায় রেখে ঘোড়াকে আবদারের সুরে বলে : 'ছোট্না ব্যাটা! বাড়ি যাচ্ছি যে—'

'তবুও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে যাতে এ-সব লোকের কোনদিন কিছু হয়', সামঘিন ভাবে। কথাটা মনে হতেই কেমন একটা ক্লান্তি ওর দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

সাধারণতঃ 'বস'-এর বাড়ির দরজা খুলে দেয় এক কাংস্যকণ্ঠ বুড়ী দাসী, কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় দরজা খুলল তার ভ্যালেট্ জতভ। জতভ্ লোকটা কোন একসময়ে নাবিক ছিল। এখন বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পরিষ্কার ক'রে কামান মাথাটা তার নীলচে দেখাচ্ছে, এমন তুলতুলে চাঁদি যেন কোন দুধে-ঘিয়ে থাকা সন্ন্যাসী। ভুরুর নীচ থেকে চোখ দুটো অবিশ্বাসের দৃষ্টি হানছে।

'আসুন, বৈঠকখানায় এসে বসুন,' ভিজে কোটটা ঝাড়তে ঝাড়তে লোকটা বিনয় প্রকাশ ক'রে বলে। সামঘিন ওক-কাঠের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, চশমাটা ভাল করে মুছে নেয়। তারপরে দরজাটা দিয়ে কোন-মতে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে প্রবেশ করে। বুঝতে পারে কি বোকার মতোই কাণ্ডটা করল। ঘরে ঢুকতেই চোখের সামনে যা ভেসে ওঠে তাতে পিসেম্স্কির লেখা নীরস উপন্যাসে পড়া রাজমিস্ত্রীদের সভার কথা ওর মনে পড়ে। বড় ঘরটার মাঝখানে ডিম্বাকৃতি চারধারে ব'সে আটজন লোক। তাদের মাথার ওপর শ্বেতশুভ্র গোল ল্যাম্প। ওর পাশে সাদা ধব্‌ধবে স্টার্চ মোড়া বুক নিয়ে প্রেইস। ও-পাশে রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়রের ইউনিফর্ম-জ্যাকেট পরে কুতুজভ। কুতুজভের উপস্থিতিতে ক্লিম মোটেই অবাক হ'লো না। যেন ওর জানাই ছিল "মফঃস্বল হ'তে আগত লোকটা" কুতুজভ ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। কুতুজভের থেকে একটা চেয়ার ছেড়ে আর একজন অপরিচিত লোক, তার

পরনে চওড়া-মতো ছাই রঙের স্যুট, ঘাড়ের পেছনে হাতদুটো জোড়া। প্রথমটায় ক্লিমের মনে হয়েছিল ওটা বোধহয় ঢাকনী দিয়ে ঢাকা একখানা খালি চেয়ার। গ্রেইনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নেড়ামাথা জনৈক ব্যক্তি টেবিলের ওপর বেশ ঝুঁকে ব'সে আছে। তার নীলাভ মাথার খুলিটাকে প্রায় টেবিলের মাঝখানটাতে যেন সেঁটে দেওয়া হয়েছে, খোঁচা-খোঁচা হাড্ডিসার কাঁধদুটোকে নাড়িয়ে সে যেন টেবিলের ওপরটায় গুঁড়ি মেরে উঠতে চাইছে।

টেবিলটাতে যথেষ্ট আলো ফেললেও, ল্যাম্পটা ঘরের বাকী অংশকে অন্ধকার ক'রে রেখেছে তা-ও আবার তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। দেওয়ালের কাছ ঘেঁষে ছড়ানো লম্বা-লম্বা পা দুটোকে অস্বাভাবিকভাবে মুচড়ে ব'সে আছে পয়ারকভ, সে-ই চিরাচরিত গুঁড়িসুড়ি মেরে বসার ভঙ্গী, মেঝের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। তার পাশেই আলেক্সেই গোথিন আর চাষারে কোট ও আলকাতরা-মাখা বুট পরা আরেক জন লোক। চেহারা দেখে মনে হয় কোচোয়ান হওয়াও বিচিত্র নয়। কোণটার হঠাৎ দেশলাই জ্বলে উঠতেই দুনায়েভের দাড়ি দেখা গেল। মাথা গুনতি ক'রে ক্লিম দেখল সতেরজন লোক রয়েছে।

বেশীর ভাগ লোকই কুতুজভের দিকে গলা এগিয়ে দিয়েছে। তাই ক্লিম মাথা গুনে-গুনে দেখল। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বেশ চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে, সবাই যেন কখন কুতুজভ কথা শেষ করবে তারি জন্য অধীর আগ্রহে ব'সে রয়েছে।

'আপনারা অবশ্য এ-সব পড়েছেন,' সে বলে। তার হাতের সিগারেট থেকে ধুঁয়োর কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ল্যাম্পের দিকে উঠছে।

'পড়েছি আমরা', নেড়ামাথা লোকটা বলে ওঠে : 'পড়ে অবাক হ'য়েছি,' বলতে বলতে টেবিলের আরো ওপরে যেন গুঁড়ি মেরে উঠে আসে : 'ষড়যন্ত্রকারীদের একটি দল পাকান হচ্ছে। বালখিল্য তুবড়ীবাজি। গুস্তাভ এমার! স্কুলের ছেলের রোম্যাণ্টিসিজ্‌ম!'

'দেখুন, মাপ করবেন,' গৃহকর্তা তিরস্কার ক'রে উঠে টেবিলের ওপর জোরে-জোরে পেন্সিল ঠোকে। নেড়ামাথা লোকটা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অসন্তুষ্ট-ভঙ্গীতে বলে :

'এই ব্যাপারটার নায়ককে আমি গুরুগম্ভীর যুবক বলেই জানতাম, কিন্তু দেখছি বিদেশে ক'বছর কাটানোর পর...'

গৃহকর্তা সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে : 'বক্তাকে বাধা দেবেন না সে-কথা আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি।' অর চোখমুখ থমথম করছে, গালদুটো ফুলে উঠেছে।

কুতুজভ সিগারেটটা ছুঁড়ে দেয় কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে সেটা ছাইদানীতে না প'ড়ে নীচে পড়ে। ক্লিমের অতিপরিচিত ভঙ্গীতে কথা শুরু করে। বিপ্লবীদের কথা বলে, জগদ্দল অনড়তা থেকেই তাদের সৃষ্টি হয়েছে, খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা বশতঃই, রোম্যাণ্টিসিজম থেকে, এ্যাডভেঞ্চারের মোহে। কথাগুলোয় শ্লেষের খোঁচা কিন্তু কণ্ঠস্বর শান্ত অপমানজনক নয়। কীলকের মতো আকারের ছোট্ট দাড়ি আর ছাঁটা গোঁফ সত্ত্বেও তার কৃষক-চেহারার একটুও বদল হয় নি।

শুনতে শুনতে সামঘিন ভাবে : 'কেউ চিনতে না পারে এমন বেশ ও কখনোই ধারণ করতে পারবে না।'

'আমার মনে হয় এক নতুন ধরনের রুশ-বিদ্রোহীর জন্ম হয়েছে, বিপ্লবের ভয় থেকেই এই বিদ্রোহীদের সৃষ্টি। এমনি ধরনের জাদুকরদের সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। "ইসক্রা"-কে তারা মুখপত্র হিসাবে বুঝতে পারে না—মানে, সাদা কথায় লেনিনকে বুঝতে পারে না—কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-সচেতনতার বৃদ্ধি দেখে, বিপ্লবের অপরিহার্যতা বুঝে, তারা বার্নস্টেইনে বিশ্বাস করতেই নিজেদেরকে বাধ্য

করছে।'

'এ-কথা সত্যি নয়,' কোণা থেকে কে একজন রুক্ষগলায় প্রতিবাদ জানায়।

'উদাহরণ দিতে পারি।'

'অনুঘাতকের কাজ দেখে,' অন্য একজন তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে ওঠে।

কুতুজভ থেমে যায়, বোধহয় প্রতিবাদের অপেক্ষায়। ছাইদানীতে সিগারেট চেপে আবার আরম্ভ করে :

'কিছুদিন আগে এই ধরনের এক চটপটে ছোকরার সঙ্গে কথা বলতেই আমার মনে পড়ে গেল প্রিভি-কাউন্সিলর ফিলিপ উইগেলের এক বিচক্ষণ উক্তি, তার "স্মৃতিপঞ্জী"তে কথাটা রয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন : "বিশৃঙ্খলার রক্তাক্ত যুদ্ধটা বোধহয় আমাদের আরো তাড়াতাড়ি পেরিয়ে আসা উচিত ছিল, যাতে বহুদিন আগেই বিশৃঙ্খলার ভেতর থেকে আইন ও শৃঙ্খলার স্থাপনা আমরা ক'রে নিতে পারতাম—" এই কথা দিয়ে ফিলিপ উইগেল তার আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করেছেন, প্রথম আলেকজান্ডার কেন তাঁর সময়েই ডিসেম্বরিস্টদের বিনাশ করেন নি।'

প্রেইসের দুর্ভেদ্য অনড় মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে নিয়ে জোর দিয়েই ব'লে ওঠে :

'জেমস্ত্ভোর ওপর উইটের মেমোর‍্যান্ডামের ভূমিকায় স্রুভ পুলিশ বিভাগকে ভয় দেখাতে চেয়েছেন যে সাংঘাতিক লোকক্ষয় হবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর পেছনে রয়েছে সাবধানের হুমকি : ওরে নির্বোধ, দেখে-শুনে পথ চল্! অবশ্য এ-কথাও সত্যি যে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেছেন : "ইতিহাসের অগ্রসরের কাছে আত্মসমর্পণ কর, স্বৈরচারীকে দমন কর।" কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে এর মানে হলো গিয়ে, "আমাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি ক'রে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি এস, তোমাদের সংগ্রামেও আমরা সহায়তা করব..."

'অনুমতি করুণ!' প্রেইস তীক্ষ্ণধ্বনি ক'রে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে বলে : 'আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সব চেয়ে প্রতিভাবান লোকদের বিরুদ্ধে এই বিষোদ্গার...'

গৃহকর্তা জামার হাতা টেনে ধরে ভুরু কুঁচকে কানে-কানে কথা বলা সত্ত্বেও কুতুজভ তার বক্তব্য ব'লেই যায়, এ-সব মন্তব্য যেন তার কানেই ঢোকেনি :

'আমি এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে তাড়াতাড়ি ক'রে নাটক শেষ ক'রে যত শীগ্গির হয় ফলভোগ করব এমন প্রত্যাশায় দিন গোনার মত বিপ্লবীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়...'

'এতো তোমাদেরই বিরুদ্ধে গেল হে, লেনিনের বিরুদ্ধে,' খুশীতে ডগমগ হয়ে নেড়ামাথা লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে। 'সেই তো...'

'লেনিনের কোনো তড়া নেই,' কুতুজভ বলে : 'তিনি শুধু শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে বিপ্লবের শিক্ষক ও শিল্পী ক'রে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার কথাই বলেন।'

'নারোদনিকদের প্রভাব! নায়ক, জনতার ভীড়...'

'ষড়যন্ত্র কষছে! হাঃ! হাঃ!'

অর্ধেকের বেশী লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। এত লোক কুতুজভকে অপমান করছে, রাগিয়ে দিচ্ছে, দেখে ওর আনন্দ হলো কিনা সে-কথা সামঘিন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

গণ্ডগোল ছাপিয়ে কোণা থেকে ভারী গলার এক চিৎকার ভেসে আসে :

'খুব ঠিক কথা। বহু লোকেই বিপ্লবী হয় জীবনের ভয়ে। রাত্রিবেলায় জেলার পাজোর মতো আগুন দেখে মারে ঝাঁপ তারি ভেতরে।'

টেবিলে চাপড় মেরে গৃহকর্তা বৃথাই অনুনয়-বিনয় করে :

'শ‍ুনেনে, শ‍ুনেনে! ও মশায়! অর্ডার, অর্ডার!'

তার কথা কেউ শ‍ুনল না। কুতুজভ একটা ভাঙা সিগারেট ধ‍ুঁয়ে দিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করে। পয়ারকভ পেছন দিকে ম‍ুখ ঘ‍ুরিয়ে প্রেইসকে বলে চিৎকার ক'রে: 'হ্যাঁ। আমাদের এমন এক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা যে-কোনো সময় সমস্ত বিপ্লবী শক্তি বা বিপ্লবের সমস্ত অভ্যুত্থানের সমন্বয়-সাধন করা যেতে পারবে—শেষ সংগ্রামের জন্য সৈনিক সংগ্রহ করা, তাদের শিক্ষা দেওয়া। এ আমাদের চাই-ই। দ‍ুনায়েভ, কমরেড দ‍ুনায়েভ—'

দ‍ু'জন কম-বয়সী লোক দ‍ুনায়েভকে দেওয়ালে কোণঠাসা করেছিল—তাদের একজন সেই চাষাড়ে কোটপরা লোকটা যাকে সামঘিন চেনে না। দ‍ুনায়েভের সঙ্গে তারা কথা বলছিল, দ‍ু'জনেই দ‍ু'জনকে বাধা দিচ্ছিল। নির্লিপ্ত হাসি হেসে উত্যক্ত করবার জন্যে টেনে-টেনে বলল: 'তাই নাকি?'

চাষাড়ে কোটপরা লোকটা কর্কশ স‍ুরে দ‍ুনায়েভের ম‍ুখের ওপর বলে ওঠে:

'কৃষকেরা তোমাদের ইঁদ‍ুরের মতো জলে ডুবিয়ে মারবে।'

'তাই নাকি? সত্যি? ভেড়া পড়বে? পড়ুক। কোনো ক্ষতি নেই। ধোঁয়াটা যা একট‍ু ঘন হবে। আর গন্ধটাও খ‍ুব স্বাস্থ্যকর হবে না, যাক্‌গে! তব‍ুও ক্ষতি কিছ‍ু নেই।'



নেড়ামাথা লোকটাই সবচেয়ে বেশী রেগে উঠেছিল। টেবিলের ওপর নিজেকে ছড়িয়ে, কন‍ুইয়ে ভর দিয়ে, কুতুজভের ম‍ুখের দিকে ডান হাতটা সটান এগিয়ে দিল। মাথার নীলচে বর্তুল অংশটা এখন ঠিক ল্যাম্পের সাদা গোলটার নীচে। ফলে আরেকটা ওই রকম আকার অদ্ভুতভাবে ভূতুড়ে ভঙ্গীতে এসে স্থান ক'রে নিল। তার কথাগ‍ুলো সামঘিনের কান পর্যন্ত না পৌঁছোলেও, কণ্ঠস্বরের তিক্ত ব্যক্তিগত আঘাত বোধটা ও ঠিক ব‍ুঝে নেয়। প্রেইসের শ‍ুকনো কথাগ‍ুলো কিন্তু পরিষ্কার শোনা যায়:

'কক্ষণো আশা করি নি যে আপনি—এত লোক থাকতে আপনিই!—এতখানি নীচে নেমে এসে ঝড়ো-সাগরবিহঙ্গের কৃত্রিম উৎপাদন করবার ওকালতী করবেন, আর মোদ্দা কথায়, এই বলবেন যে...'

উত্তেজনার চোটে অনেকগ‍ুলো কথার প্রথম অক্ষর দ‍ু-দ‍ুবার ক'রে উচ্চারণ করে। হাসি-হাসি ম‍ুখে কুতুজভ তার কথা শোনে, সবিনয়ে ম‍ুখের একটা কোণা দিয়ে যে দিকে বসে আছে সে-দিকটায় ধোঁয়া ছাড়ে। সে-ভদ্রলোক হাত দিয়ে দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে দেয়। গৃহকর্তার ম‍ুখটায় নিরাশার ছাপ। পেন্সিল দিয়ে চিব‍ুকে টোকা মারতে মারতে সামনের ওই দ‍ুলে-দ‍ুলে ওঠা নীল চাঁদির দিকে তাকিয়ে থাকে। পয়ারকভ খেপাটে স‍ুরে চেঁচিয়ে ওঠে:

'বিবর্তন? এই বিবর্তনে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে, আমি বলে দিচ্ছি। বাস্তবের পা চাটতেই তোমরা চাও, কিন্তু উচিত হচ্ছে মট মট ক'রে তার হাড় ভাঙা।'

দাঁতে-দাঁত চেপে "বাস্তব" শব্দটা হিসহিসিয়ে গর্জন ক'রে ওঠে, প্রতিটি অক্ষরের ওপর সজোরে চাপ দেয়। বাস্তবের "তব"-টা এমন ক'রে বলে যেন ওটা কোনো শাপঅবাণী। ম‍ুখটা চিত্রবিচিত্র হয়ে ওঠে, চোখ দ‍ু'টোকে র‍ুই মাছের আঁশের মতো দেখায়।

'হিংস্র কুকুরের মতো দুনায়েভ ওর বেল্ট ধরে আছে,' ক্লিম ভাবে :

'আমরা, প্রবীন জনসেবকরা,' গৃহকর্তার গলা গম গম ক'রে উঠল, ধিক্কারের সুরও তার মধ্যে বিধৃত।

কেউ-ই শুনল না। ঘরের চারপাশে ছড়ান মানুষগুলো ধীরে ধীরে আলো-আঁধারি থেকে বেরিয়ে এল, এল নানান কোণ থেকে। নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন ওরা ক্রমশঃ টেবিলের কাছে এগিয়ে আসছে। নেড়ামাথা লোকটা উঠে পড়ে। লম্বা. চ্যাপ্টা দেহ, অনেকটা ডীকনের মতো। এতক্ষণে তার মুখ দেখতে পেল সামঘিন—কোনো শক্ত ধিকি-ধিকি রোগে ভুগে ওঠা মানুষের মতো মুখ। ছোট্ট ছোট্ট হাড়ে-ছাওয়া মুখমণ্ডল আর তারি ওপরে টান্-টান্ ক'রে লাগিয়ে রাখা হলুদ চামড়া। খুদে-খুদে চোখ দুটো কালো গর্তের মধ্যে থেকে জ্বলছে।

'ফ্যানাটিসিজ্ম! আভ্ভাকুমভিজ্ম! বাভেরিয়ার কৃষকেরা প্রমাণ করেছে—ইতালীর গ্রামীন সমাজবাদ...'

ছাড়া-ছাড়া উচ্ছ্বসিত কথা। চিঁ-চিঁ সুর। যেন কোনো সংক্ষিপ্তসারের শীর্ষকগুলো বলে যাচ্ছে। বাহু দুটো বে-আন্দাজ ছোট। কনুই দিয়ে বাতাস কাটছে, হাত দুটো কিন্তু এমনভাবে ল্যাক্প্যাক্ করছে যেন ওগুলো আলগা বস্তু। কুতুজভ সিগারেটে দম দিতে দিতে, গলা না উঁচিয়েই নেহাৎ অপছন্দের ভংগীতেই ছোট-ছোট বাক্যে ওর কথার জবাব দেয়। শুনতে না পেয়ে ক্লিম বিরক্ত হয়ে ওঠে। কুতুজভ কি জবাব দেয় সেটা জানতে যে খুব ইচ্ছা। বহু কণ্ঠের সোর-গোলে ওর মনোযোগ একটু ভোঁতা হয়ে পড়েছিল। কথাবার্তা তেমন শুনছিল না, যতটা দেখছিল বিভিন্ন মুখে কি অদ্ভুত সব ব্যঞ্জনা।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' নেড়া মাথা চেঁচিয়ে উঠল : 'গুরুভার এক ক্রুশ এসে আমাদের চেপে দিয়েছে।' আমাদের সব্বাই এক-একজন ক্রীতদাস মাত্র। ইতিহাসের জগদ্দল রথের সংগে আমাদেরকে অতীতের চেন-রশি দিয়ে কষে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা কয়েদী, পৃথিবীর পেটে দণ্ড খাটছি...'

'না, না। দুঃখিত, এ-কথা আমি মানি না।' ছাই রঙের স্যুটপরা একটা লোক বলে ওঠে। তার তাতার মুখটার ওপর চশমা পরা। 'প্রয়োজনের তল থেকে মুক্তির উত্তলে ঝাঁপ দিয়ে উঠতেই হবে। নইলে বাল-দেব এসে আমাদের গিলে খাবে। সার্ফ থেকে মুক্তকর্মী হয়ে উঠতে হবে আমাদের নিজেদেরকে..'

'ওটা আপনাদের কাজ। হয়ে উঠুন না,' কুতুজভ জোরে চিৎকার করে। প্রশ্ন ক'রে ওঠে : 'কিন্তু যারা বিপ্লবের সত্যিকারের শক্তি, সেই শ্রমিকদের আপনাদের সংগে কি করবার আছে?'

নীচু গলায় বলতে আরম্ভ করে, অন্যেরা শুনতে বাধ্য হয়। অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সামঘিন বুঝতে পারে যে কুতুজভ যা বলছে তাতে ওর সামঘিনেরই প্রকৃত চেহারা যেন লোকের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। দেখল, এই ঘরের মধ্যে চাঁদকে ব্যঙ্গ ক'রে যে শুভ্র-গোলক টাঙান হয়েছে তারি অস্পষ্ট আলোর নীচে যারা রয়েছে তাদের যুক্তি আর ভাবাবেগ পরস্পর বিরোধী। তবুও এরা ওর চেয়ে অন্যভাবেই স্ববিভক্ত। কেন-না, ওর নিজের যে যুক্তি বা ভাবাবেগ সেটা এক অজানা তৃতীয় শক্তি দিয়ে বিপর্যস্ত, তাই-ই তো ওর বাঁচার ধরনটা হয়ে ওঠে নিজের ইচ্ছার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কুতুজভের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় লোকটার শান্ত এবং আপাত-অনিচ্ছাপ্রসূত বাক্যস্রোত চারদিকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে, ওকে টেনে নিয়ে চলছে কোন্ এক অতল দ'য়ের পানে। এই অবশ্য প্রথম নয় যে কুতুজভের সম্মোহনী শক্তি ও অনুভব করল, তবুও এমন জোর সে আর কখনো উপলব্ধি করেনি।

মনে মনে সামঘিন ভাবে, বোধহয় সত্যি কথাই বলছে। গীভিয়ন সম্বন্ধে ডীকনের আহ্বান মনে পড়ে, 'বস'-এর কথাও মনে পড়ে: "প্ররোচকদের নিয়ে বিপ্লব অথচ নেতা নাই।"

বেশীর ভাগ লোকই শান্ত হয়ে পড়ছে দেখল। এখানে-ওখানে শুধু একটু-আধটু চাপা প্রতিবাদ। নেড়ামাথা লোকটা মাঝে-মাঝে উপহাসের হাসি হেসে উঠছে। কুতুজভ যেন প্রফেসর, ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে:

'আমার মনে হয় সবাই জীবনের চাবিকাঠি খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর এই চেষ্টাকেই নানা গুরু-গম্ভীর নাম দেওয়া হচ্ছে। চাবি কিন্তু খুঁজে পায় না, তাই হাজার রকমের আদর্শবাদের হাতুড়ি, ছেনী-বাটাল সংগ্রহ ক'রে আনে—সিঁধ কাঠির সরঞ্জাম।'

'অত্যন্ত অভদ্র কথা!' নেড়ামাথা লোকটা পা ঠুকে চেঁচিয়ে ওঠে। এমনভাবে সামনে ঝুঁকে আসে যেন পড়ে যাচ্ছে: 'বিজ্ঞান...'

'বিশেষভাবে বিজ্ঞানের কথা মোটেই বলছি না। বিজ্ঞানই তো শিল্প-প্রগতির উৎস, শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম লাঘব করে। আর অভদ্রতার কথা—জানেনই তো, নিজেকে মার্জিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করবার কোনো দাবীই আমার নেই। বরঞ্চ আমাকে স্থূলই বলা যেতে পারে। আমি যা সেভাবেই আমাকে গ্রহণ করুন।'

বলতে বলতে বাঁ-হাতের একটা আঙুল দিয়ে কুতুজভ টেবিলে টোকা মারে। ডানহাতের আঙুলগুলো ততক্ষণে একটা সিগারেটের তামাক টেনে-টেনে বের করছে। সিগারেটটা বোধহয় অত্যধিক তামাকে ঠাসা। তামাকের গুঁড়ো সিগারেটটা থেকে ঝরে-ঝরে পড়ে। নীচের ঠোঁটটা অনেকখানি বের ক'রে দিয়ে গৃহকর্তা লক্ষ্য ক'রে ক'রে দেখে। কাণ্ডটা পছন্দ যে হচ্ছে না বোঝাই যায়, মনটা খুঁত খুঁত করছে। কুতুজভের কাজটা শেষ হতেই সে-ভদ্রলোক রুমাল বের ক'রে হাঁটু থেকে তামাক ঝেড়ে ফেলে। তার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখে কুতুজভ। ভদ্রলোকের কান, সামঘিনের যেন মনে হলো, লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

'বিপ্লবীদের যুক্তি মেনে চলতে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আইনবিরোধী কোনো কাজ করতে হলে একটুও ভয় পাব না, যেমন ভয় অন্যেরা পায়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই এ-কথাও মনে রাখবেন যে আমরা বাজিটাজি ফোটানোর বিরুদ্ধে। মিনিষ্টারদের সঙ্গেও ডুয়েল লড়তে চাই না। এক ঘণ্টার জন্যে নায়ক সাজা সে নভেলেই মানায়, কিন্তু জীবনে দরকার সাহসী কর্মীর যারা জানে যে শ্রমিকদের এই মহান কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবেও তাদেরি, ইতিহাসগত ভাবেও তাদেরি...'

'তোমরা যারা এখনো অনাগত অকাট্য সত্যের প্রচার করো—' মাথা-কামান লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে। খুব দ্রুত কথা বলে, শব্দগুলোয় যেন ওর শ্বাসরোধ হয়ে আসছে, কাজেই সামঘিনের পক্ষে ওর কথা বোঝা মুস্কিল হয়ে ওঠে। চওড়া হাতের তালুটাকে হঠাৎ আন্দোলিত ক'রে কুতুজভ জবাব দেয়:

'এ-কথা সত্যি নয়। সংস্কৃতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি যা বলে উল্লসিত হলেন তা নয়, জীবনের যন্ত্রীকরণের জন্যে এ মোটেই হচ্ছে না—শিল্প-প্রগতির জন্যেও না, যার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আপনি বোঝেনই নি। নাঃ। সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে পড়ছে বুর্জোয়াদের কাণ্ডজ্ঞানহীন মনস্তত্ত্বের জন্যে, ব্যবসায়ী আর বিষয়ী লোকদের লোভ-লালসার জন্যে, তারাই তো কাজের প্রতি ভালোবাসাকে বিনষ্ট ক'রে দেয়। তা'ছাড়া, আমি আবার পুনরাবৃত্তি ক'রে বলছি যে আপনাদের সেই চকচকে বিদ্রোহীটি শুধুই ঝড়ের আশাতেই মুখ তুলে বসে আছে, কেন-না ঝড়ের পরেই তো বাবাজী আশা করেন যে শান্তিকে পাকড়ে ধরবেন হাতের মুঠোয়! অবশ্য এটা অন্যায়ও নয়, কিন্তু কি জানেন, ধারে-কাছে কোথাও

এখন শান্তি নেই। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি এর সম্ভাবনায় যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ ক'রে থাকি, এমনকি মানুষের পক্ষে এর প্রয়োজনটাও সন্দেহজনক।'

কুতুজভ উঠে পড়ল। পকেট থেকে মোটা একটা রুপোর ঘড়ি বের করে, তার চেহারাটা বাল্বের মত। খানিকক্ষণ সেটার দিকে চেয়ে, হাতের তালুর ওপর ঘড়িটাকে রাখে।

'যাগ গে, আজকের এই "প্রাণের আণুবীক্ষণিক আমোদ-প্রমোদ" বন্ধ করবার কি সময় হয়নি এখনো? কথাটা কিন্তু একটা প্রাচীন পুঁথির শিরোনামা,—হাইড্রা সম্বন্ধে লেখা, ওটা আবার যেমন আদিম তেমনিই অন্ধ সরীসৃপ।'

অজান্তেই সার্মাঘিন পায়ে-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। কুতুজভের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ওর ঘোরতর আপত্তি, পয়ারকভ বা দুনায়েভের সঙ্গেও। ঘরের মধ্যে আবার কান-ফাটানো চিৎকার ওঠে। কে একজন বিদ্বেষ-ভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে :

"আণুবীক্ষণিক আমোদ-প্রমোদ বলছে" এ কে?'

॥ ২০ ॥

জনহীন পথ বিসদৃশভাবে শান্ত। বিশাল মহানগরীর বুকে মধ্যরাত্রি প্রশান্তি এনে দিয়েছে। রাস্তার বাতিগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া হলুদ মেঘের ওপর ঝাপসা আলো ফেলেছে। তুষার গলে-গলে আর্দ্র বসন্তের গন্ধ ছড়িয়েছে আকাশে-বাতাসে। কার্নিশ থেকে জল ঝরার শব্দে মনে হচ্ছে যেন সার্সিতে গিয়ে উচ্চিংড়েরা ঠোকর মারছে।

সামঘিন ধীর-পায়ে পথ হেঁটে চলেছে। বোধহয় ভয় পাছে মনের ভেতরের স্তূপীকৃত ধারণা যদি উপচে পড়ে যায়। কুতুজভের বক্তব্যের অধিকাংশও বহু সূত্রে বহু বার পড়েছে বা শুনেছে। তবুও কুতুজভের মুখে এ-সব যেন মূলসূত্র হতে নির্গত চিন্তার গুরুত্ব পেয়েছিল। সামঘিনের মনে পড়ল একদল অতি-ক্রোধান্বিত শত্রুভাবের লোকের মাঝখানে কুতুজভ দাঁড়িয়ে আছে ধীর অনাক্রমণের ভঙ্গীতে, নিজের শক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে—সব সময়েই ও ঐ রকম। মনে হতেই ওর হিংসা হয়, সমবেদনাও জাগে।

'ওই রকম লোকদের বিরুদ্ধে যাওয়া...'

কুতুজভকে শ্রমিকদের মধ্যে কল্পনা করে, কোনো আগ্রহ না নিয়েই ক্রেমলিনের দিকে চলেছে।

'এমনটি হলে ও কি করত?'

প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু মনে হলো, এই লোকটি থাকলে বোধ-হয় অনেক শ্রমিকই জারের মনুমেণ্টে যেত না। মনটাকে আবার পূর্বদৃশ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কুতুজভের পাশে দাঁড় করাল নীল-চোখ অ র দোষীসুলভ হাসির সেই যুবকটিকে। ওর 'বস'কেও, যে সব সময়েই আপাতদৃষ্টিতে টেবিলের ওপর থেকে রুমাল দিয়ে তামাকের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলছে। অসম্ভবভাবে ফুলে-ওঠা ভারাভকাকেও, আরো বহু জনকে। এদের মধ্যেও কুতুজভ হারিয়ে গেল না, গ্রামের চিত্রটিতেও ও পূর্ণব্যক্তিত্বে দাঁড়িয়ে রইল, গুদাম থেকে শস্য লুণ্ঠনরত ভয়ঙ্কর কৃষাণদের ভীড়েও।

'নাঃ। ওকে কিছুতেই "ইতিহাসের জগদ্দল রথের সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা" ক্রীতদাস বলা যায় না।'

ক্লিম সামঘিনের মনে এই প্রথমবার আন্তরিক দুঃখ জাগল। কেউ নেই যার কাছে হৃদয় খুলে দেখান যায়।

বাড়ির কাছ পর্যন্ত আসতেই পেছন থেকে একটা লোক এসে ওকে ধরে ফেলল। লোকটার পরনে ধাতুর বোতাম বসান কালো কোট; সরকারী কর্মচারীর মতো টুপী চোখের ওপর নীচু ক'রে নামান। লোকটা ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। থমকে দাঁড়িয়ে কুতুজভের গলায় ওকে প্রশ্ন করে: 'সামঘিন না? কেমন আছে? ওখানে তোমাকে দেখেছিলাম, ওই ষাঁড়টার বাসায়। কথা বলতেও চেয়েছিলাম কিন্তু কোথায় যে হঠাৎ উধাও হলে।' একটু থেমে চারদিকটায় নজর বুলিয়ে বাধ-বাধ কণ্ঠে বলে: 'তোমার ওখানেই যাচ্ছি জান তো—মানে, সমভার বাসায়...'

'ও-তো অ্যারেস্ট হয়ে গেছে।' খুব নীচু গলায় সামঘিন বলে। মনে ভয় কুতুজভ যদি ওর গলার স্বরে উচ্ছ্বাস ধরে ফেলে। কিছুতেই মনের এই ভাবটুকু ওকে জানতে দেওয়া হবে না। সামঘিন নিজেই যে জানে না এই উচ্ছ্বাসটুকুর

অর্থ কি।

কুতুজভ হঠাৎ থেমে গেল। ওর কনুই আর কাঁধ সামঘিনের গায়ে ঠোক্কর খায়।

'ওঃ, যন্ত্রণা—কখন? ওখানেই আমায় বলে দিলে না কেন?'

টুপীটা খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে। বলে:

'অসুখ! যন্ত্রণার একশেষ! হ্যাঁ,, তা-ই—কিন্তু ঘুমোই কোথায় তা'হলে? লিখেছিল যে আমার ঘুমোনর জন্যে একটা কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। তার মানে কি তোমাদের বাড়ি?'

'হবে,' ক্লিম বলল।

'কিন্তু ওটা কি সুবিধা হবে? স্পষ্ট কথা বলো?'

'এই তো, এসে গেছি,' পরের দরজায় হেলান দিয়ে সামঘিন জবাব দেয়। ঘণ্টি টিপে দিয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে কুতুজভ বিড়বিড় ক'রে ওঠে: 'সব পরিষ্কার মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ দেখ,' ঢুকতে-ঢুকতে কুতুজভ জানায়: 'তোমরা বাড়িতে আমার নাম এগর নিকোলায়েভিচ পনোমারেভ। ভুল না কিন্তু। আমার পাশপোর্টটা একেবারে নির্ভুল।'

'আমার স্ত্রী বোধহয় তোমাকে চিনতে পারবে...'

'এ্যাঁ—তাই নাকি?' হলঘরে কোট খুলতে খুলতে কুতুজভ অস্ফুট-উক্তি ক'রে ওঠে: 'দরজা খুলে দিল যে স্তম্ভটা তার ব্যাপার কি? এত রাত্তিরে অতিথি দেখলে ঘাবড়াবে না তো?'

'এ-সবে ওর অভ্যেস আছে।' সামঘিন মন্তব্য করে। একবার মনে হয় ওকে বুঝিয়ে দেয় যে এইসব আন্ডারগ্রাউন্ড গোপনীয়তা ওর কাছে কিছু নতুন জিনিস নয়।

'তারপর? লুবাশাকে ছিনিয়ে নিল!' কুতুজভ বৈঠকখানায় ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। 'এই নিয়ে তিনবার ওর সঙ্গে দেখা হলো না! প্রথমবার আমি গ্রেপ্তার হলাম, তারপরের বার ও! আর এই তৃতীয়বার! কী জ্বালাতন!'

সামঘিনের মনে হলো কুতুজভের কথার মধ্যে যেন একটু বিষাদের রেশ। মুখটা না দেখতে পাওয়ায় দুঃখিত হলো। কুতুজভ মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে বাক্স থেকে সিগারেট বাছে। সামঘিন ওকে কিছু খেয়ে নাওয়ার কথা বলল।

'সানন্দে—' কিন্তু কোনো চাকর-বাকর নয়, বুঝলে? ওখানে চা, স্যান্ডুইচ্, ঠান্ডা হামবুর্গার এ-সব পাওয়া যাচ্ছিল—কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি চলে এলাম। জমায়েতটা সুবিধার মনে হলো না।'

'নেড়ামাথা লোকটা কে?' ক্লিম জিজ্ঞেস করে।

'পেছনের সারির। একদা বিখ্যাত ছিলেন।' নামটা বলল কিন্তু ক্লিমের কাছে তা অর্থহীন। স্ত্রীর ঘরে গিয়ে দেখল ও তাড়াতাড়ি ড্রেস ক'রে নিচ্ছে।

'কি হয়েছে? ও কে?' ভয়ের সুরে ফিস্‌ফিস্ ক'রে ওঠে। 'ও হ্যাঁ—মনে পড়েছে। সেই গাইয়েটা তো যাকে নিয়ে লুবাশা পাগল। খেতে চাইছে? আচ্ছা তুমি যাও, আমি এক্ষুণি আসছি।'

সামঘিন কিন্তু তক্ষুণি বৈঠকখানায় ফিরে গেল না। ওরা এক সঙ্গেই গেল।



'আহা, জলপরী যে, কেমন আছ? চোখ দেখেই তোমায় চিনেছি,' কুতুজভ উৎসাহে ফেটে পড়ে ভারভারাকে অভিবাদন জানায়। 'মনে আছে আমরা একসঙ্গে নেচেছিলাম, সেই যে-গো সেই ব্যবসায়ী লোকটার বাড়ির পার্টিতে—ওই যে যার দাঁতগুলো বাঁকাচোরা। কি নাম যেন— ?'

অতিথির উচ্ছ্বলতাকে সামঘিনের মনে হলো জাল। কিন্তু বিরক্ত হয়ে ভাবে লিউতভকে তো হাজারবার দেখেছে, কিন্তু কই তার দাঁত যে বাঁকা-বাঁকা তা তো লক্ষ্য করেনি—অথচ দাঁতগুলো সত্যিই বাঁকা! মিনিট পাঁচেক পরে অবাক হয়ে কিন্তু একটুও আনন্দ না পেয়ে ভারভারার নিতান্ত ব্যবসায়িক কথাবার্তা শোনে: 'আমাদের ওপর অবশ্য নজর রেখেছে, তবুও কাল দুটো সম্পূর্ণ নিরাপদ ঠিকানা জোগাড় ক'রে দিতে পারব...'

'বাঃ! সত্যি বলছ? হপ্তা দু'য়েকের মতো কেমন?'

'আচ্ছা।'

গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে কুতুজভ সার্ডিন আর চীজ খায়, লাল সুরা পান করে। ভাবখানা এমন সহজ যেন এই ঘরে আসা ওর এই প্রথম নয়, ভারভারাও যেন পুরোনো বন্ধু, তার সঙ্গ বেশ মধুর লাগছে।

'শহরের নামকরা লোকের সঙ্গে দেখা হলে গাঁইয়েরা যেমন করে, ভারভারাকেও ঠিক তেমনিই করছে,' সামঘিন মনে মনে ভাবে। নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে যেন বাতাসে ভেসে আছে। কিন্তু ভারভারা বেশ সুন্দরভাবে আলোচনা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রগল্‌ভাও হয়ে পড়ছে, কুতুজভকে বেশ বুদ্ধি ক'রে প্রশ্ন করছে। অতিথি ওর প্রশ্নের উত্তর বেশ চটপট দিচ্ছে:

'নির্বাসন? সে হচ্ছে এমন এক অবস্থা যখন লোকে চিন্তা করতে বা পড়াশোনা করতে সময় পায়। হ্যাঁ, তাই। কিন্তু বড্ড একঘেয়ে। চার হাজার সাতশ' দেশবাসী অসহায়ভাবে রয়েছে, কারো কোন কাজে আসছে না, এমনকি নিজেদেরও না। বড় বড় শহরের তিরিশ বছর বা পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে পড়ে যাচ্ছে। সবাই, কোন ব্যতিক্রম নেই, অজ্ঞানতার সন্দেহে ভোগে। শুধুমাত্র বৈচিত্র্যহীনতাই তাদের পাগল ক'রে দেয়।...ওগো পান ক'রে নাও...শীতের রাতে শহরে নেকড়ে-বাঘ ঢোকে...'

ক্লিম বিরক্ত-চোখে দেখে আনফিমেয়েভনা সামোভার নিয়ে ঢুকছে। চা করতে করতে ভারভারা জিজ্ঞেস করে:

'বিপ্লবের সময়ে এইসব অকেজো লোক কি করবে?'

'বিপ্লব তো আর কালই হচ্ছে না,' কুতুজভ বলে। সামোভার দেখে চোখ দু'টো প্রকাশ্যেই চকচকে হয়ে উঠেছে। ন্যাপকিন দিয়ে দাড়ি মুছে বলে: 'সেটা আসবার আগে কিছু লোক নিশ্চয়ই কাজের মানুষ হয়ে উঠবে। অবশ্য মনে করা যেতে পারে ওদের বেশীর ভাগ বিপ্লবের বিরুদ্ধেই যাবে, হয় সক্রিয়ভাবে নয়তো পরোক্ষ কৌশলে। আর তা করতে গিয়েই মরবে।'

ভারভারা কথাটা মেনে নেওয়ার ভঙ্গীতে মন্তব্য ক'রে বসে: 'এত সহজ ক'রে তুলতে পারেন আপনি।'

সামঘিন কপাল কুঁচকে অস্ফুট-ধ্বনি ক'রে ওঠে: 'নাঃ, এত তো সহজ নয়।'

'কেন?' কুতুজভ গলা পরিষ্কার করতে করতে প্রশ্ন করে: 'বিপ্লবের সময়—সামাজিকটারই কথা বলছি আমি—বিকল্পের রীতিটা ভয়ঙ্কর অনিবার্যতায় কাজ করবে—হয় হ্যাঁ, নয় না।'

সামঘিন বলতে চায়: এ যে ভীষণ নিষ্ঠুর কথা।...আরো কত কি যে বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভারভারা কুতুজভকে নিয়ে পড়েছে, লোভীর মতো জেরা করছে, উৎসাহ যেন ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। বেশ তাকিয়ে-তাকিয়ে চা খেতে খেতে কুতুজভ ভয়ানক অমায়িক হয়েই ওর প্রশ্নের জবাব দেয়:

'ধর্মের আর কি ভূমিকা থাকতে পারে, বল, যখন জীবনের ধারাকেই বহুদিন হলো তার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর নীতির শেষ-চিহ্নটুকুও ঘষে মুছে ফেলা হয়েছে?'

'আদর্শবাদ তো মানুষের আত্মার মৌলিক গুণ,' উত্তেজিত হয়ে ভারভারা তাকে আক্রমণ করে। মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, ঝকঝকে চোখ দুটোতে পলক পড়ছে না।

'দার্শনিক-আদর্শবাদ শ্রমিকশ্রেণীর পরিপন্থী। নিজেকে ছাড়িয়ে, স্বীয় শক্তির পরিধির বাইরে শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নেওয়া শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অসম্ভব, নিষিদ্ধও বটে। তার পক্ষে সামাজিক আদর্শবাদের গ্রহণটাই যথেষ্ট, এবং সেটাও কিছুটা রেখে-ঢেকেই করতে হয়।'

সামঘিন ভাবে: 'ওর কাছে সব চিন্তাই ওর পরমবিশ্বাসের সঙ্গে গাঁথা। শক্তিমান পুরুষ, কিন্তু...'

কিন্তু—কুতুজভের সঙ্গে তর্ক করতে চায়। তর্ক করবার ইচ্ছাটুকুই যে আবার সব নয়, প্রয়োজন আছে নিজের এক বিশিষ্ট 'বাক্‌-রীতির'। তা'ছাড়া আরো কি একটা এসে বাধা দিচ্ছে। কি সেটা?

ভাবতে ভাবতে সামঘিন আলোচনার খেই হারিয়ে ফেলল। যখন সম্বিৎ ফিরে পায়, শোনে ভারভারা জিজ্ঞেস করছে: 'শিকারও করেন নাকি?'

'চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু খুব বেশী উৎসাহ পেলাম না। একবার এক নেকড়ের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। জন্তুটা এত কষ্ট পাচ্ছিল যে, দয়া না ক'রে পারলাম না। কাজেই শেষ ক'রে দিতে হলো ওটাকে, আর সেইটাই বড় বিশ্রী। আরেকবার গিয়েছিলাম মিলন-ঋতুতে উডকক-পাখী শিকার করতে, কিন্তু পাখী দুটোর মিথুন-শৃঙ্গারে এত আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে যখন বন্দুক তুললাম তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তা'ছাড়া বলতে লজ্জা নেই মারতে বিশেষ আগ্রহবোধ করছিলাম না। অপরূপ জিনিস, পাখীদের এই মিলন-কূজন!'

নিজের নীরবতায় ক্লিমের অস্বস্তি লাগতে শুরু করে, হীন মনে হয় নিজেকে। ভারভারার সঙ্গে কুতুজভের আলাপ যেন প্রতিযোগিতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে—শুধু কথারই নয়। কুতুজভের চোখের স্বপ্নিল হাসির ঝিকিমিকি সামঘিনের মনে হয় নেহাৎই চালাকি, প্রলোভনের জাল। হাসিটা ভারভারার চোখেও প্রতিফলিত হয়েছে, সে-দুটো বড় বড় ক'রে মেলে অত্যন্ত গভীর মনোযোগ দিয়ে কুতুজভের কথা শুনছে। বোধহয়, মেয়েমানুষ যখন মনে-মনে তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিসকে যাচাই ক'রে দেখে, তখন তার চেহারা হয় এমনিই। মনের বিরক্তিকে উপেক্ষা না করতে পেরে সামঘিন বলে:

'নেকড়ের জন্যে আপনার দুঃখ হচ্ছে কিন্তু মানুষের বেলায় তো দেখি কঠোর আর দয়ামায়াহীন।'

কুতুজভ মুখ টিপে হাসে। লাল মদে গেলাশ ভরে নিয়ে বলে:

'ও-হো, ব্যক্তিত্ববাদী!...এখনো কি বিদ্রোহী আছ?' উদাসীন গলায় প্রশ্ন করে।

তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে : 'মানুষ, তাদের আর কি? নিজেরাই তো পারস্পরিক দল গড়ে নিয়েছে, নির্বোধ নিমর্মতায়। তার জন্যে কঠোর মূল্য দিতে হবে বই-কি।'

ক্লিমের অতি-পরিচিত উক্তির পুনরুল্লেখ ক'রে বলে :

'বাস্তবের বিষাক্ত তিক্ততাকে মনুষ্যত্বের রসে জ্বাল দিয়ে মিষ্টি ক'রে তুলতে পারবে না। আর তা ভিন্ন বাস্তবের অসুয়া তো বহুদিন হলো সব শাস্ত্রীয় বচনকে ধ্বংসে ক'রে ফেলেছে।'

কুতুজভের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ক্লান্তিতে আর বসে থাকতে পারছে না। একবার শরীরটাকে টান-টান ক'রেও দিল, মহিলার উপস্থিতি-টুপস্থিতি মানল না। ঘাড়ের পেছনে এলিয়ে দেওয়া হাতদুটো ফুটেও উঠল।

'ডেরা-ডান্ডাহীন হা'ঘরেদের মতো সবঠাঁইকেই ঘর ক'রে নিতে পারে,' মনে-মনে সামঘিন ভাবে।

কিন্তু ভারভারার মনোযোগ যেন কুতুজভকে এখনো চাঙ্গা ক'রে রেখেছে। বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল :

'বুর্জোয়া সমাজ মৃতপ্রায়, তার মাথার দিক থেকে পচন আরম্ভ হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সম্বন্ধে বোঝা যায় যে তারা অত্যাধিক কাজ ক'রে নিজেদের অবসন্ন ক'রে তুলেছে। কিন্তু আমাদের বেলায় অবক্ষয়ের এইসব কারণ দেখা য'বার এখনো তো সময় হয় নি। আমাদের অবক্ষয়-ভদ্রলোকটির চেহারা বেশ নাদুস্নুদুস্, বেঁটে খাট, আরামসে খায় দায়, গোলাপী রঙের গাল—আর প্রতিভাহীন। এদের মধ্যে ভার্লেইনদের দেখা পাবে।'

চা-টুকু গিলে ফেলল। মদ মিশিয়েই সেটাকে ঠান্ডা ক'রে রেখেছিল। তাল-গোল পাকানো রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিল।

সামঘিন কুতুজভের কথাই ভাবে। লোকটাকে শত্রু বলে মনে হয়, কিন্তু এক-সময়ে নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো আত্মরক্ষার জন্যেই বোধহয় ও-রকম একটা ভাব জেগেছে। চিন্তার মধ্যে কই একটুওতো তিক্ততা বা বিদ্বেষ নেই, বরঞ্চ নিজের মধ্যেই যেন কিছু চেপে রেখেছিল।

'শাসক-সম্প্রদায়ের আদর্শ হলো, "সাহিত্য, শিল্প বা সব কিছুতেই একেবারে আদিম অবস্থায় ফিরে যাও।" তোমার মনে আছে সেই ধ্বনিটি : "ফিখ্টে-তে ফিরে যাও?" কিন্তু এই আওয়াজ তো হলো ভয় পাওয়া পন্ডিতের, যে সব কিছু— কল্পনা বা ভীতি—যান্ত্রিকভাবেই আত্মসাৎ করে। আমাদের অবশ্য আশা যে আমাদের ক্ষেত্রে আহ্বানটা আরো পেছনে যাওয়ার হবে, গির্জায়, তন্তর-মন্তরে, শয়তানে। কোথায় সেটা বড় কথা নয়, যতক্ষণ তা ঐতিহাসিক যুক্তি থেকে দূরে আছে, কারণ এই যুক্তিই ক্রমশঃ অন্যের শ্রম যারা শোষণ ক'রে থাকে তাদের চোখে বিষ হয়ে উঠছে।'

ভারভারার চোখ পাতা নামিয়ে আঁধার হ'য়ে উঠল, বলল :

'হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে লোকে অ-যুক্তিতে বেশ প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ছে। কিন্তু কারণটা আপনি যা বললেন তা হয়তো না।'

কুতুজভ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে : 'কি তাহলে?'

'চালাক হ'য়ে পড়বার বৈচিত্র্যহীনতা থেকে,' ভারভারা একটু থেমে জবাব দেয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বলে : 'মানুষ চায় পাগলামি...'

কুতুজভ্ কাঁধ ঝাঁকায় :

'বাস্তব জীবনের চেয়েও পাগল কিছু কি কেউ আবিষ্কার করতে পারে?'

'হ্যাঁ', সামঘিন জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। কোন কারণে নিজেকে ভয়ানক বেখাপ্পা

ঠেকে। বলে ওঠে :

'তোমার কি শুতে যাবার সময় হয়নি?'



আধ ঘণ্টা পরে ওর ঘরে ব'সে সামঘিন অন্ধকারের মধ্যে আয়নার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছিল আয়নার ওপর। দেখতে পাচ্ছিল একটা লোক অর্ধবাস প'রে ডীভানে ঝুঁকে বসে আছে, লেস ধ'রে একটা বুট দোলাচ্ছে, যেন বুঝতে পারছে না ওটকে কোথায় ছুঁড়ে ফেলবে। লোকটা ডানহাত মুঠো ক'রে নিঃশব্দে হাঁটুর ওপর আঘাত করছে। মিনিট খানেক কি মিনিট দুই, এইভাবে ব'সে রইল। তারপর মেঝের ওপর বুট ফেলে দিয়ে টেবিল থেকে জ্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। কোলের ওপর সেটা মেলে দিয়ে পকেট থেকে একতাড়া কাগজ টেনে বের ক'রে আনল। সেগুলো পরীক্ষা ক'রে ক'রে দেখে, কাগজ টুকরো টুকরো ক'রে ছেঁড়ে, ছেঁড়া টুকরোগুলো মুঠোর ভেতর পুরে সজোরে চাপ দেয়। চারদিক দেখে নেয়, এত-জোরে ঠোঁট কামড়ায় যে তার ছুঁচালো দাড়ি বেরিয়ে আসে, ভুরুদুটো একটা সম্পূর্ণ গোটা রেখায় পরিণত হয়। কঠোরতায় মুখটাকে অপরিচিত ব'লে মনে হয়। সার্টের খোলা কলারের ভেতর দিয়ে সাদা পেশীবহুল ঘাড় দেখা যায়, কণ্ঠার হাড়ের অর্ধবৃত্ত দুটোকে ঘেড়াব পায়ের নালের মতো দেখায়। নিশ্চয়ই লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে ছিল কেন-না চোয়ালের হাড়দুটো অতি তীক্ষ্ণ হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। স্পষ্টই বোঝা গেল, কুতুজভ কঠোর কোন অনুভূতির পাল্লায় পড়েছে, হয়তো রাগ বা হয়তো দুঃখ। উঠে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার পুরো শরীরটার ছায়া পড়ল আয়নার ওপর, তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সামঘিন জানলার-পর্দা তুলে দেবার শব্দ শুনতে পেল।

পাশের ঘরের লোকটিকে নিভৃতে লক্ষ্য করতে করতে সামঘিন বুঝতে পারে তার নিশ্চয়ই কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে। মনে-মনে তাই লোকটার ওপর সহানুভূতি জাগে। যন্ত্রণার বেদনা তো এক রকমের দুর্বলতা, তাই এখন যদি ও লোকটার কাছে যেতে পারে, এই যন্ত্রণার মুহূর্তে, তো নিশ্চয়ই অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় সে ওকে জানিয়ে দেবে কোন্ শক্তি তাকে বাধ্য করছে এমনি এক নেকড়েসুলভ ভবঘুরে জীবন যাপন করতে। এ-কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব এবং অযৌক্তিক যে এই শক্তি লোকটা পেয়েছে শুধু বই থেকে বা যুক্তির প্রয়োগ থেকে। হ্যাঁ, ও যাবে, নিশ্চয়ই যাবে, খোলাখুলি আলোচনা করবে, কোনো ছেদ না রেখেই তার সঙ্গে কথা বলবে, সমভার সম্বন্ধেও নিশ্চয় বলবে। মনে হয় লোকটা তাকে ভলোইবাসে।

'আমি তিরিশে পড়েছি,' ক্লিম নিজেকে মনে করিয়ে দেয়। 'এমন কোনো কাঁচা যুবক নই যে জানে না কি ভাবে বাঁচতে হয়..'

কিন্তু নিজের অভিমানকে খুঁচিয়ে তোলায় ভাবতে বসে : এই বিশেষ 'বাক-রীতির' মানুষটার সঙ্গে ওর কিসের টান?

'বংশগতি?'

চাপা কাষ্ঠহাসি হেসে বাপ, মা, পিতামহের কথা স্মরণ করে।

'ছোটবেলার প্রভাব?'

পর্দা ঠেলে নামিয়ে কুতুজভ আবার আয়নায় ফিরে এল। বিশাল সাদা মুখে

নির্মম দুঃখময় অভিব্যক্তি। দুই হাত দিয়ে ক'দিন-মাত্র-আগের ছাঁটা চুলে হাত বুলোয়। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যায়। সামঘিনের ঘরের চেয়েও ওই ঘরে আরো ঘন অন্ধকার। ক্লিম উঠে দাঁড়ায়, পর্দা-তোলা জানলায় পা টিপে-টিপে যায়। রাস্তায় বাতি জ্বলছে, যেমন রোজ জ্বলে। যেমন রোজ হ'য়ে থাকে. আজও ঠিক তেমনি ক'রেই সেই আলো আবার স্যাঁতসেঁতে ভিজে দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়।

'এ' ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত—। মানুষ টের পায় না যে আরেকজন তাকে লক্ষ্য করছে। বোধহয় আমাকেও অমনই দেখাতো—নাঃ, ওর মতো নিশ্চয়ই না।'

শোবার ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। ভারভারা বোধহয় এখনো জেগে। সামঘিন ভাল ক'রেই জানে কুতুজভের সঙ্গে যে-সব কথাবার্তা হয়েছে তার সবটাই ভারভারার মনের বিপরীত। যে-মনে যোগের ভাব নিয়ে শুনেছিল তার সবটুকুই ছলনা। মনে পড়ল, একবার ও যখন ভারভারাকে বলেছিল যে বিপ্লবী আন্দোলনের অস্তিত্বের কথাটা কোনো "সরকারী ভাষণে" স্বীকৃত হ'য়েছে, তখন ভারভারা আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করেছিল :

'সত্যি-ই? কেমন বোকা সব...'

*

পরদিন সকালে সামঘিন যখন সাজপোশাক ক'রে ডাইনিংরুমে এল ভারভারা আর কুতুজভ বেরিয়ে গেছে। সেই সন্ধ্যাতেই ভারভারা তার গ্রন্থ-প্রকাশনার কাজে সেন্ট-পীতর্সবুর্গে চলে গেল। ক'টা দিন অনিশ্চিত জল্পনাতে সামঘিনের কাটল। তারপর ও-ও একদিন রওনা হলো কালুগা প্রদেশের দিকে। গোটা একটা হপ্তা মাঠে-জঙ্গলে. গাঁয়ের সড়কে, আর ঘুমন্ত ছোট ছোট শহর দেখে কাটিয়ে শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল বটে কিন্তু মনে আবার নতুন ক'রে শান্তি ফিরে পেল।

বাড়ি ফেরাব পথে একটা ডাক-বদলের ঘাঁটিতে ও আটকা প'ড়ে গেল। ঘোড়া নেই। অর্ডার দিল এক সামোভার চা। চা তৈরি হ'তে হ'তে গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টি শুরু হলো। ধীরে ধীরে তার তেজও বাড়ল, অবাধ্য হ'য়ে উঠল, গায়ে-মাথায় এসে ঘা দেয়। আকাশ চিরে নীল বিদ্যুৎ আর সেই সঙ্গে বজ্র হুঙ্কার। চিমনির ওপর ঝড় পাগ্‌লা ঘোড়ার মতো দাপাদাপি শুরু করে। বন্যার ধারায় বৃষ্টি পড়ে, জানালার সার্সিতে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ে। ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কে একজন ছুটে সেই ঘাঁটিটার গাড়ীবারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায় জানালার বাইরে কালো একটা ঘোড়ার ভিজে মাথা। দরজাটা হটাস্ ক'রে খুলে যায়। ভেজা কাকের মতো গা ঝাড়তে ঝাড়তে একটা লোক এসে চৌকাঠে দাঁড়ায়, তার পরনে অয়েলস্কিনের ঝোলা-কোট। লোকটা তার সুন্দর ঘন গোঁফের ডগা থেকে বিন্দু বিন্দু জল ফুঁ দিয়ে ঝরিয়ে দিচ্ছে। একজন মেয়েমানুষকে এগিয়ে আসার রাস্তা দেবার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়ায়। গম্‌গমে ক্রুদ্ধ গলায় হাঁক পাড়ে :

'তখনি বলেছিলাম না, আসতে আসতে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে যাবে।'

'বোধহয় স্বামী।' ক্লিম ভাবে।

'সামঘিন? আপনি?' মেয়েটি এমনভাবে চিৎকার ক'রে ওঠে যেন সাপ দেখেছে। মাথা থেকে ক্যানভাস-কোটের সপসপে ভেজা হুড্‌টা খুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। আর তাইতেই সঙ্গীর সগুম্ফ মুখকান্তি কিছুক্ষণের জন্যে সামঘিনের

চোখের আড়াল হ'য়ে রইল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ' মেয়েটাও চেঁচিয়ে উঠল : 'এখন তাড়াতাড়ি যাও বাপু! এক্ষুণি!'

লোকটা পিছন ফিরল। তার পিঠটা লোহাপেটা ছাদের মতো চকচক ক'রে ওঠে। দরজা সজোরে বন্ধ ক'রে দিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই মারিয়া ইভানোভনা নিকনোভা কাঁধ থেকে ভেজা কোটটা খুলে নিয়ে বেশ ফূর্তির সুরে বলল :

'কি বৃষ্টি! মিনিট পাঁচেকের মধ্যে কোথাও আর একটুও শুকনো জায়গা থাকবে না!'

সামঘিন ওকে এক লহমা দেখেই ঠাওর ক'রে নেয় যে ওর আজকের মূর্তিটা ঠিক সাধারণ নয়। ভাবতেই বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। লোককে যে-ভাবে দেখতে অভ্যস্ত সেই সীমানার চৌহদ্দি কাটিয়ে কাউকে দেখতে ও প্রস্তুত নয়। বিতৃষ্ণা জাগে। মেয়েটি যে ওকে পদবী ধরে ডাকল তাইতে একটু অবাক হয়েছে ও, স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা তো এতে স্পষ্টই অনুপস্থিত। যখন তার ছোট ছোট হাত দিয়ে মেয়েটি ভেজা মুখটাকে মোছে, তখন সামঘিন যেন ওর মুখে এক অপরিচিত হাসির ইঙ্গিত দেখতে পেল। হাসিটা বেশ অমায়িক আর বিস্তীর্ণ। এর আগে ও আর কখনো এমন হাসি হাসেনি। সামঘিনের মনে সন্দেহ হয় যে মেয়েটি বোধহয় ওই হাসিটাকে মুখোশ হিসেবে ব্যবহার করছে। ডাকবদলের এই ঘাঁটিতে ওকে অনেকেই চেনে। মোটামতন একটা মেয়েছেলে 'মারিয়া ইভানোভনা'—ব'লে ওকে সম্বোধনও করলে। 'আচ্ছা, আচ্ছা—বলতে বলতে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। দশ মিনিট পরে নিকনোভা উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট আর লাল ব্লাউজ পরে ফিরে এল, বোধহয় শুধু গায়ের ওপরেই এগুলো চাপান। মাথাটাকে হলুদ ফুল-ওয়ালা রুমালে ঢেকে নিয়েছে। নিকনোভাকে এই বেশে অনেক কমবয়সী বলে মনে হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে মুখটাও অনেক পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে, রক্ত যেন ফুটে বেরুচ্ছে। চোখদু'টোয় খুশীর ঝিলিক্।

'এখন আপনি আমাকে চা খাওয়াতে পারেন। উঃ, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছি!'

কিন্তু সামঘিনকে অপটু-হাতে সামোভার নাড়তে দেখে চায়ের পট্টা ওর হাত থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিল।

'ছাড়ুন, এ আপনার কর্ম নয়।'

নিজের জন্যে চা-ঢালা শেষ হ'য়ে গেলে রুটী কাটতে আরম্ভ করল। চাষাদের মতো কায়দায় গোটা রুটীটাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছিল, উঁচু বাধাও পেল যথেষ্ট। কোনরকম দ্বিধা না করেই ব্লাউজাকে স্কার্টের মধ্যে গুঁজে দেয়। তা'তে বুক দুটো পরিষ্কার ফুটে ওঠে। সেই দিকে চোরা-দৃষ্টি দিয়ে এক ঝলক্ দেখে নিয়ে সামঘিন জিজ্ঞেস করে :

'সঙ্গে কে এসেছিল?—স্বামী?'

'নাঃ, কয়েকজন বন্ধুর একটা এস্টেট্ আছে, সেখানে আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম। লোকটা সেই এস্টেটের ম্যানেজার।'

'অফিসার নাকি?'

রোস্ট-চিকেন কাটতে কাটতে নিকনোভা সামঘিনকে এক ঝলক্ দেখে নেয় :

'দেখে কি সৈনিক মনে হয়?'

'হ্যাঁ।... কোথায় যেন দেখেছি।'

'সাশা, ছোট একটা শাল এনে দাও তো আমাকে,' কাঠের পার্টিশনটার ওপর হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে, নিকনোভা চেঁচিয়ে ওঠে।

বাইরে ঝড়ের তীব্র গোঙানি। একটানা সোঁ-সোঁ শব্দ। কড়কড় শব্দে মেঘ

ডাকছে। ঝোলান বাতিটা দুলে দুলে উঠছে। বিদ্যুতের চমকানিতে জানালার কাঁচ বাইরের নীল আলোয় মিশে একাকার। ছাঁট এসে জানলার ওপর সজোরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

মেয়েটি শান্তস্বরে বলে: 'মনে হচ্ছে আমরা যেন বিশাল ফুটন্ত কড়াইয়ের তলায় ব'সে আছি।'

সামঘিন স্বীকার করে: 'হুঁ, তাই মনে হয় বটে।'

দু'জনেই নীরব হ'য়ে যায়। সামঘিন বোঝে চুপচাপ থাকাটা ভাল দেখাচ্ছে না, কিন্তু অভ্যস্ত অধ্যাপকী ঢঙে এখন এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে কেমন বাধ-বাধ ঠেকছে। মেয়েটিও কিছু বলে না, কৌতূহলের চোখে শুধু সামঘিনের দিকে চেয়ে থাকে। যেন ও কিছু বলুক, তারি অপেক্ষা করছে। কিন্তু ও কিছুই বলল না দেখে, মেয়েটি শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে:

'থামবে ব'লে মনে হচ্ছে না। সারারাত হয়তো এখানেই কাটাতে হবে। এমন রাতে বা শীতকালে ঝড়ের সময় মনে হয় যেন পৃথিবীর বুকে আমরা নেহাৎ অনাবশ্যক।'

'মানুষ সবার কাছেই অনাবশ্যক, শুধু নিজের কাছে ছাড়া,' ক্লিম ব'লে ফেলে। মনে-মনে কিন্তু ভাবে: 'নির্বোধ।' একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলে।

'ধন্যবাদ। খাই না।'

মেয়েটি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে। বুকদু'টো অশোভনভাবে উদ্ধত, ব্লাউজ এমনভাব আন্দোলিত হচ্ছে যেন আবরণ কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্য ওরা উন্মুখ। মুখের ভঙ্গীতে হিম-শীতল উদ্বেগ,—কিছু শোনাবার জন্যে উদ্গ্রীব হ'য়ে থাকে, মানুষ মাত্রেরই যে-উদ্বেগ তাই-ই যেন।

'কাল, ওই জায়গাটায়,' চোখ দিয়ে জানালার দিকটা দেখিয়ে বলে: 'ওরা একজন চাষীকে কবর দিলে। তার ভাই গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার। আমার বান্ধবীকে সে বলেছিল: "জান, মানুষ বীজবপণ করে, বীজ মাটি ফুঁড়ে গাছ হ'য়ে বেরিয়ে অন্ন দান করে, যখন মরে তখনো রেখে যায় খড়ের আঁটি। কিন্তু মানুষ যখন মাটির তলে চলে যায়, তখন সেখানেই পচে—কোনো উপকারও আর হয় না তার দ্বারা।"—'

উঠে পড়ল, ফোঁটা-ফোঁটা ঘামের মতো জলে ভেজা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। সামঘিন ওর মাখন-হলুদ খালি পায়ের দিকে চেয়ে বলে:

'সাধারণ লোকের জ্ঞানী কথাবার্তা আমার একদম পছন্দ হয় না। কখনো-কখনো মনে হয় আমাদের কৃষাণেরা যে-সব দরদ-ভরা সাহিত্য আমাদের সাহিত্যিক-ভদ্দরলোকেরা তাদের নিয়ে রচনা ক'রে গেছেন, সে সব খবর খুব ভালভাবেই রাখে। বাইরের সাহায্য প্রত্যাশা ক'রে করে নিজের থেকে জীবনকে উন্নত ক'রে তোলবার কোন চেষ্টাই করে না।'

ও-পক্ষ থেকে কোনো জবাব নেই। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। জানলাটা যেন দেওয়াল থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তের জন্যে নীল-আলোর শিখায় নিকনোভাকে মনে হলো অদ্ভুত সুন্দর।

'মেরে ফেলবে দেখছি', নিঃশ্বাস ফেলে বলে। হাসতে হাসতে টেবিলে ফিরে আসে। ক্লিমের মনে হয় ওই হাসির মধ্যে যা-নতুন তা'হচ্ছে গতি আর ভারহীনতা। বিরক্তিকর এই মেয়ে। কেন যে ও বিপ্লবের কাজ করে, ওর দ্বারা কীই বা হ'তে পারে—ওতো অতি নগণ্য, কোনো রকম কুশলতাই নেই? উচিত ছিল হাসপাতালের নার্স হওয়া বা বড়জোর কোনো নিঃসঙ্গ-গ্রামে ছোটদের মাস্টারণী।...' সামঘিন ওকে কৃষাণদের কথা বলে, কি ক'রে তারা ঘণ্টা তুলে বসিয়েছিল, কি ক'রে তারা শস্য গুদাম থেকে লুট করেছিল। উপহাসের সুর টেনে বলে যাতে ও আহত হয়।

ওর কথার প্রতিধ্বনিতে শুধুই বৃষ্টি নির্লিপ্তভঙ্গীতে আঝোর ধারায় ঝরে।

'আমি একটা গল্প পড়েছিলাম, নামটা ছিল "রুজু"।—তা'তেও ছিল ওই একই বিষয়,' মেয়েটি বলে : 'কে লিখেছিল মনে নেই। বোধহয় কোনো মহিলা,' একটু চিন্তা ক'রে বলে। আবার জানলায় ফিরে যায়। প্রশ্ন করে :

'আপনি তা'হলে কি চান্?'

বয়োজ্যেষ্ঠদের ভংগীতে অত্যন্ত অমায়িকসুরে সামঘিনকে কত কথা বলে, এমন এমন প্রসঙ্গ যা ছেলেবেলা থেকেই সামঘিনের অতি-পরিচিত, দেখতে দেখতে বুড়ো হ'য়ে গেছে। কিছু মন্তব্যও করল, নিজের কিছু কাহিনীও বলল,—কিন্তু বলল এমন সুরে যেন ওর ওপর কিছুই চাপাতে চাইছে না, চেষ্টাও করছে না চাপানোর, বরঞ্চ যেন প্রশ্নেরই সুর, নিজেই বোঝাবার চেষ্টা করছে। ওর মৃদু-শান্ত স্বর শুনতে বেশ ভাল লাগল, সামঘিনের মন থেকে বিদ্রূপ-বাসনা কখন লোপ পেয়ে গেল। ওর বিশ্বাসেও যেন সুখের অনুভূতি।... মাথার ওপরের রুমালটা সোজা ক'রে নেবার জন্যে যেই হাত তুলল, সামঘিন ওর আঙুল ধ'রে ফেলল, তা'তে চুমু এ'কে দিল। কোনো বাধা দিল না মেয়েটি, আগের প্রসঙ্গ টেনে বলল :

'গ্রামের সব লোক মদ খায়—ক্রমে ক্রমে গরীব হ'য়ে পড়ে—মরতে বসেছে...'

সামঘিন এক মিনিট ওর কথা শুনল। তারপর বাঁদিকের বুকের ওপর হাত রাখল। হঠাৎ ও স্তব্ধ হ'য়ে যায়। সামঘিন বাহু দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে, ওর মুখে চুমু খায়।

'তুমি তো এমনিই মানুষ!' নিকনোভা ধীরস্বরে উচ্চারণ করে।

ঘন ক'রে সামঘিনকে কাছে টেনে নেয়। চাপা গলায় বলে : 'ওরা এখনো ঘুমোয়নি। তুমি বিছানায় যাও। আমি পরে আসছি, কেমন?'

'আচ্ছা।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত টানে নিকনোভা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়। পোশাক ছাড়তে ছাড়তে সামঘিন ভাবে :

'খুব সহজেই তো! নিশ্চয়ই অভ্যস্ত, কমরেডরা দাবী করলেই কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবেই হয়তো নিজেকে দিয়ে দেয়।'

বাতি নিভিয়ে দিল। ঘরের এককোণে পাতা চওড়া খাটে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির অচঞ্চল প্রতীক্ষা যেন বিছানায় শুয়ে স্ত্রীর অপেক্ষা।—অথচ ভারভারার কথায় এই মুহূর্তে মনে বিদ্রূপেরই ছায়া ঘনায়। পুরোনো ফরাসী লেখকদের বক্তব্য মনে পড়ে—বোধহয় কেভাল বা পল দ্য কোক—কোথায় যেন পড়েছে যে বিবাহিত দম্পতিদের ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কের মধ্যে এমন কতকগুলো চিহ্ন আছে যা দিয়ে স্বামীটি সবসময়েই—যদি সে বোকা না হয়—বুঝতে পারবেই স্ত্রী অন্য কারো বাহুলগ্না হয়েছে কি না। ফরাসী ভদ্রলোকটি সে-সব চিহ্নের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেননি, কিন্তু অন্য নারীর প্রতীক্ষায় কাটাতে কাটাতে সামঘিনের এই মুহূর্তে মনে হলো ভারভারার আচরণে সে-সব চিহ্নই ফুটে উঠেছে। চালচলনের মধ্যে নিস্তেজভাব দেখা গিয়েছে, বিগড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতে হয় তেমনি আদর চাওয়া যেন ওর স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এমনি ধরনের মেজাজ তো শুধু যে-সব মেয়েমানুষ কোমল এবং সতেজ ভালোবাসার আস্বাদ পায় তাদেরি হ'য়ে থাকে। এমনটি তো ওর আগে ছিল না। কাজেই নিকনোভার সঙ্গে প্রেমের খেলায় কোন দোষই নেই।... ঠিক পরমুহূর্তে, যেন অনিচ্ছাতেই, যেন কর্তব্যবোধ থেকেই, এ-কথা ভাবে :

'হ্যাঁ। ওরা অমনিই—মেয়েরা।'

বৃষ্টির শব্দ ক্রমে একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে। যেন কোন শব্দই হচ্ছে না, চুপচাপ। সামঘিনের মনে অশান্তি, অঘটনের আশঙ্কা যেন পাচ্ছে। মেয়েটি এলে পরে

অভিযোগ জানায় :

'কত দেরী করলে!'

'চুপ!' ফিসফিস ক'রে ওঠে।

একঘণ্টা পেরিয়ে গেল, বোধহয় দু-ঘণ্টাও। সামঘিনের মাথাটা বুকে চেপে ধরে নিকনোভা জিজ্ঞেস করল—প্রশ্নের ভাষাটি বহুশ্রুত :

'আমার সঙ্গে ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ,' আন্তরিক জবাব।

একটু থেমে, আবার জিজ্ঞেস করে :

'কিন্তু, খুব নীচু ধারণা হচ্ছে, না, আমার—আমার নীতিজ্ঞান-সম্পর্কে?'

'এ কি ক'রে ভাবতে পারলে?' সামঘিন চাপাস্বরে বলে।

'হ্যাঁ। আমি জানি।...কারণ তুমি যুক্তি দিয়েই ভাব, বিবেক-প্রয়াসী।'

শেষ পর্যন্ত এ-ও কি লিদিয়ার মতো বিছানাতেই দর্শন আওড়াবে, বা, ভারভারার মতন ব্যবসায়ের আলাপ জুড়বে? কথায় কিন্তু কোন গঞ্জনা শুনতে পেল না, মুখের ভাব তো দেখাই যাচ্ছে না। মেয়েটা ওকে আদর দিয়ে দিয়ে বিহ্বল ক'রে তুলল। এত নিবিড় কোমল স্পর্শ আর কোনদিন পায়নি সে। এরই জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় বিশেষ কিছু ব'লে। কিন্তু তেমন কোন শব্দই চয়ন ক'রে আনতে পারে না। কথা বলে শুধু ভঙ্গীতেই। নিকনোভা কিন্তু ফিসফিসিয়ে জানায় :

'আমাদের সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিন থেকেই তুমি আমার মনে বাসা বেঁধেছ। মনে আছে—গ্রামের সামার-হাউসে? লিউতভের পাশে তুমি এমনি ভেড়া হ'য়ে ছিলে। আমি তখন ষোলয় পড়েছি...' দুই-দুইবার হেঁচে ফেলল। অপ্রস্তুত হয়ে বেশী-বেশী ভয়ের গলা করে :

'মনে হচ্ছে সর্দি লেগে গেছে। আমি যাই, কেমন?...না, না, চুমু খেয়ো না।'

কয়েক মিনিট পর মেঘের মতো উধাও হ'য়ে গেল। সামঘিন ভাবে :

'অদ্ভুত মেয়ে। এমন কখনো ভাবি নি।'

ভোর হলো। জানলার শার্সিতে ধূসর ছোপ। বৃষ্টির আওয়াজ বয়ে যাওয়া জলের কল্‌কল্‌ শব্দে মিশে গেছে। কাছেই কোথাও জল গড়িয়ে গড়িয়ে ডোবার সৃষ্টি হচ্ছে। ঘুম ভেঙ্গে উঠে সামঘিন দেখল নিকনোভা সেই কোন্ ভোরে চলে গেছে। মনে মনে তারিফ করল :

'বাঃ, বেশ চালাক তো। যেন আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে গেল।'...ভেজা সড়কের ওপর লাফ দিয়ে দিয়ে ব্রিৎস্কা চলে। চারপাশের মাঠ রেশমের মতো ঝল্‌মল্‌ করছে। সূর্য যেন হাসি-খুশী মত্ত শিশু। পৃথিবীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে লুকোয় আর মুখ বের করে। মেঘগুলো হাল্কা, নরম, —ধোয়ামোছা তকতকে তুলোর আঁশ যেন। বার্চের তরুণ পাতায় হাওয়া যেন পালকের আঙুল বুলিয়ে বিলি কাটছে। চিত্রবিচিত্র পালক-পরা একটা পাখী এসে উইলো গাছের নেড়া শাখায় বসেছে। তার আবলুশ-কালো মীন-চোখে ডোবার রুপোলী ছায়া। ঘোড়ার খুরগুলো ঢিমেতালে রাস্তার কাদা ছেনে তুলছে, আশে-পাশের জগৎকে শুধু একটানা শব্দে ভরে উঠিয়েছে—ক্লপ্‌-ক্লপ্‌। চাকার জল থেকে দুধ-সাদা রেখা ছিট্‌কে ওঠে। কোথাও ভরতপাখী গান ধরেছে। সতেজ বাতাসে আনন্দের নেশা। সামঘিন প্রায় ঢুলতে ঢুলতে ভাবালু হয়ে ওঠে :

'উজ্জ্বল শুধু প্রেমের প্রভাত;
মধুর শুধু প্রথম সাক্ষাৎ।'

'বোকা-বোকা কবিতা। কিন্তু কবিতা তো বোকা-ই, কে যেন বলছে সুখও তাই।

"সাঁকোর ওপর পেয়ালা-হাতে সুখ"—এতো ভিখারীদের প্রবচন। প্রবাদগুলো সব সময়েই বড্ড হিংসুটে। সুখ মানে তো নিজের সঙ্গে শান্তি স্থাপনা ক'রে বেঁচে থাকা। সৎ জীবনের অর্থই তো তাই।'

ঝোপে-ঝোপে গঙ্গা-ফড়িংগুলো মহা ব্যস্ত হয়ে ফড়-ফড় ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই দিকে চেয়ে সামঘিনের মন কথাটা বোধহয় এই নিয়ে একশ' বার উদয় হলো। সেই ছোটবেলা থেকে বাসায়, তারপর ইস্কুলে আর তারও পরে ইউনিভার্সিটিতে কত রকম ভাব আর কত রকম তথ্যের পাহাড় এসে জমেছে মনটার ভেতরে—অর্থ-হীন বিশাল স্তূপ—পরে কত অসংখ্য বইও ও পড়েছে। কাজেই জোর ক'রে আহরিত এই পরস্ব জ্ঞানের জটিল জালের পাকে পাকে নিজেকে আর এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা ঠেলাগাড়ীকে ধরে ফেলল। গাড়ীটায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে একজন ল্যাক্‌প্যাকে চাষা, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। পাঁশুটে রঙের নাদাপেটা ঘোড়াটার সর্বাঙ্গ কাদায় ভরা, আলসের মতো ঠুকঠুক ক'রে চলেছে। সামঘিনের কম বয়সী কোচোয়ানটি, তার কবুতর-মার্কা খাঁদা নাক তুলে, আধ-খাড়া হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: 'হেই! ধার লাও হে।'

'ঠিক সময়ে পেঁাছে যাবে,' চাষাটা ঘষা গলায় জবাব দেয়, সরে যাওয়ার কোনো লক্ষণই নেই।

হাসিমুখে সওয়ারীর দিকে ফিরে ছেলেটা বলে: 'ও সরবে না।...মানুষটা শক্ত। আমাদেরই গাঁয়ের। কান সেলাই ক'রে নিতে যাচ্ছে। কাল ঝড়ে এক খণ্ড টালি এসে দিয়েছে ওর কানটা ছিঁড়ে—'

'ও-পাশ দিয়ে ঘুরে যাও।' সামঘিন হুকুম দেয়।

ছেলেটা ঠেলাগাড়ীর পাশ-ঘুরে যেতে গিয়ে দিল একটা ঘোড়াকে কাদা-ভর্তি খন্দে ঠেলে। ব্রিৎস্কা গিয়ে ধাক্কা লাগায় ঠেলার নেমীতে। কিষাণটা মাথা তুলে গাল পাড়তে থাকে: 'এ্যাই শালা নেড়িকুত্তা, ঠেলছিস কোথায়? কোন্ চুলোয়?'

ঝগড়াটায় চিন্তার লয় কেটে যায়। সামঘিন জ্বলে ওঠে। উঁচু হয়ে উঠে কোচয়ানের কাঁধে ভর দিয়ে চাষাটাকে ধমক মারে। আশ্চর্য হয়ে চোখ পিট-পিট করতে করতে ঠেলাগাড়ীর কিষাণ তার ঘোড়াকে পিছিয়ে নিয়ে যায়।

'গাল পাড়ছেন কেন কত্তা? সব্বাইয়ের তো তাড়া—কেউ তো হাওয়া খেতে যাচ্ছে না।'

'এগিয়ে চল্।' হুকুম দেয় সামঘিন। মনে মনে আর একবার ভাবে: 'এই বজ্জাত গুলোর জন্যেই—'

এখনকার মেজাজে নিকনোভার কোনই স্থান নেই। দু-হপ্তার মধ্যে তার কথা শুধুই ক্ষণিকের জন্যে সামঘিনের মনে পড়ল, যখন মনটা শূন্য থাকে শুধু তখনই। আস্তে আস্তে তাকে আর একবার দেখবার ইচ্ছাটা তীব্র হয়ে উঠল। কিন্তু ঠিকানা যে জানা নেই। ভারি রাগ হয় নিজের ওপর, কেন জিজ্ঞেস ক'রে রাখে নি।

'কি জ্বালা! আর কেমন ঠাট্টা ক'রে আমাকে ভেড়া বলেছিল। তার মানে কি, কি বোঝাতে চেয়েছিল?'

বাড়িতে পেঁাছে ভারভারাকে জিজ্ঞেস করে, 'নিকনোভার ঠিকানা জান?'

ভারভারা জবাব দেয়: 'না। লুবাশার এ্যারেস্টের পর আমি "রেড-ক্রশ"-এ কাজ করতে অস্বীকার ক'রে দিয়েছি। কাজেই নিকনোভার সঙ্গে আর দেখা হয় না।' উদাস স্বরে বলে: 'বোধহয় এত দিনে গ্রেপ্তার-কেপ্তার হয়ে গেছে।'

চুলের কাঁটা দিয়ে একটা বইয়ের প্যাতা কাটছিল ভারভারা। সামঘিন তাই দেখে ভাবে: 'কি কুঁড়ে! একটা ছুরিও নিয়ে আসতে পারে না!'

সেণ্ট-পীতর্সবুর্গ থেকে ভারভারা চেহারা ভাল করে ফিরেছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে তা। চোখের নীচে কতকগুলো ছোট্ট ছোট্ট তিল, সবুজ দৃষ্টি সেগুলোতে যেন ছায়া-ছায়া হয়ে পড়ে। দুবিনুনী করা, কপালের প্রান্ত আর কানের ওপর দিয়ে কয়েক গুচ্ছ কোঁকড়ান চুল। মুখটা যেন তাতে অনেক চওড়া হয়ে উঠেছে. দেখাচ্ছেও সুন্দর। সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে চওড়া-চওড়া কোমরের ঘের ছাড়া ফ্রক। তাই দেখে সামঘিন ভাবে কত সহজেই না ওগুলোকে টেনে খোলা যায়। সাহিত্য সম্বন্ধেও নতুন দৃষ্টি নিয়ে ফিরেছে ভারভারা :

'বই যেন জীবনকে আবো গম্ভীর না ক'রে তোলে। অবসর কাটানর মেজাজ দরকার, চিত্তবিনোদনের. '

তাবপর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বলে :

'জানো, একজন আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হলো। প্রতিভা আছে কিনা জানি না, কিন্তু লোকটা আশ্চর্য। দার্শনিক ছবি আঁকে—আমার তো তাই মনে হলো। একটা ছবিতে অদ্ভুত চড়া রঙ, আর সাপ—বা, মাথা-ছাড়া পোকাও বলতে পার। প্রত্যেকটি ফিগারে চারটে ক'রে রামধনু রঙের ডানা। আর সব ফিগারগুলো জড়া-জড়ি ক'রে আছে, গিণ্ট দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, একে অন্যের ভেতরে ঢুকে আছে। পেছনের নীলচে ধূসর পটকে যেন সম্পূর্ণভাবে গ্রাস ক'রে আছে, বয়ে চলছে নদীর মতো। এরা হচ্ছে কসমিক শক্তি, যুক্তি এসে তাদেরকে বাধা দেওয়ার আগে যেমনটি ছিল। নামটাও কেমন দেওয়া হয়েছে : "মনুষ্য-পূর্ব জগৎ"। বুঝতে পারলে? দেখলেই মনে হবে যেন এক বিশৃঙ্খল সুরম্য খেলা।'

মাদাম রেকোমিয়েরের ভঙ্গীতে কৌচে হেলান দিয়ে বসেছিল ভারভারা। ভুরুর নীচ থেকে সামঘিন ওকে লক্ষ্য করে। মুখটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে...দেখে দেহটাকে, ওর সমগ্র সত্তাকেই যেন। এর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত তো ওর জানা। অবাক হয়ে ভাবে কি ক'রে এই ধারণা ক'রে বসেছিল যে এই নারীকে ও ভালবাসে, এত স্বার্থপর আর এত অহঙ্কারী মেয়েটাকে।

'এগুলো আমাকে বলছে শুধু রপ্ত ক'রে নেওয়ার জন্যেই, যাতে অন্যদেরকে বেশ গুছিয়ে বলতে পারে—বোধ হয় অন্য কোন পুরুষকেই।'

'আরেকটা ক্যানভাসে, জান, রঙগুলোকে নরম ক'রে দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট ফিগারগুলোতে আর ডানা নেই, কিন্তু ওদের বেশ সোজা-সোজা ক'রে রেখেছে। নদীর মতো বয়ে চলার এফেক্টটাও নেই, ওই থেকেই তো উন্মত্ত গতির ইম্প্রেশন হয়েছিল। তাও নেই। আসলে গোটা ছবিটাই যেন অন্তর্হিত, শুধু রয়ে গেছে বহু রঙ—রঙ-কারখানার এক বিজ্ঞাপন যেন—বিভিন্ন রঙের নিষ্প্রভ, মৃত-মৃত টান। এটা হলো "মানুষের বন্দীত্বে জগৎ।" শিল্পী—লোকটা কি লম্বা, হাড্ডিসার, হলদেটে, খুদে-খুদে কালো চোখ, খুব অভদ্রও—শিল্পী বললে : "মানুষ কিভাবে জগৎকে নষ্ট করেছে এ হচ্ছে তাই। কিন্তু মানুষ এ-কাজ ক'রে তো নিজেরই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। কসমিক শক্তির অবাধ খেলার শত্রু হয়ে পড়েছে সে। হয়ে পড়েছে ফন্দীবাজ। মুক্তির ওপর তার যে ঘৃণা, তা থেকেই সৃষ্টি ক'বে নিয়েছে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান. রাষ্ট্র, জীবনের সমস্ত জঘন্যতা। শীগগির জগতের অবাধ শক্তির ভাণ্ডারে সে খুইয়ে বসবে তার হাস্যকর যান্ত্রিক কলা-কৌশল। আর তারপরেই জীবনহীন নিঃসাড়তা এসে তার শ্বাসরোধ করবে...'

'এনট্রপি-থিয়োরির দৃষ্টান্ত বলে মনে হচ্ছে যেন,' সামঘিন বলে।

ভারভারা চোখের পাতা উঁচু ক'রে ভুরু দু'টোকে ঠেলে তোলে :

এনট্রপি? আমি জানি না তো।'

আগের প্রসঙ্গে ফিরে যায়, যেন কোন পাঠ শিখে নিচ্ছে :

'তারপর আরো একটা ছবি। দু'টো গিট-গিট হাত; সবজে রঙের, লাল-লাল নখ, ওপর থেকে বাড়িয়ে আছে। একটায় আছে ছয় আঙুল, আরেকটায় সাত। নীচের দিকে, ওদের দিকে চেয়ে হাঁটুগেড়ে আছে একটা ছোট্ট মানুষ। সে তার কাঁধ থেকে দুই-মুখওয়ালা মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়েছে। শরীর আন্দাজে মাথা অনেক বড়। লম্বা সরু-সরু হাতে মাথাটাকে ওই তের-আঙুলকে দিয়ে দিচ্ছে। শিল্পী আমায় বুঝিয়ে বললে যে ছবিটার নাম: "তব করে অর্পিত হোক মম আত্মা"। কিন্তু হাত দু'টো শয়তানেরই যার অপর নাম যৌক্তিকতা, ঈশ্বরকে তো সেই হত্যা করেছে।"

ক্ষান্ত হয়। সিগারেটে টান দিয়ে, সুন্দর আঁখিপল্লব নত ক'রে আবার বলে:

'ছবিটা আমার ভাল লাগেনি। বোধহয় কুতুজভের কথা মনে হচ্ছিল তাই। হ্যাঁ, ভাল কথা, লোকটার কিন্তু খুব ভাগ্য। সবাই ওকে বেশ পছন্দ করে দেখলাম। মস্কোতেই আছে নাকি?'

'জানি না,' সামঘিন বলে।

'মস্কোর মতো এত ইন্টারেস্টিং জিনিস কিন্তু সেন্ট-পীতর্সবুর্গে ঘটে না। কিন্তু যে-টুকু ঘটে তা' আরো তীক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্ম! আমার তো মনে হয় মস্কো বড্ড তেলতেলে।'

ফিরে আসার পর ওই প্রথম দিনেই যা বলল। আর কখনো এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই করেনি। সামঘিনও ক'দিনের মধ্যে ধরে ফেলে, 'যা বলেছে তা নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেই, কোনো সাহায্য-পরামর্শে ওর কোনই প্রয়োজন নেই। নিজের কাজেই ব্যস্ত, কাজেই দোষ যে ধরবে সে অবসরটুকুই বা সামঘিনের কোথায়!



অপ্রত্যাশিতভাবে নিকনোভার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মেস্‌চানস্কাইয়া স্ট্রীটের পাড়া দিয়ে নড়বড়ে ক্যাবে ক'রে যেতে যেতে হঠাৎ ওর দেখা পেল। ধূসর পোশাকে তাকে দেখাচ্ছিল বেশ গম্ভীর। হাঁটছে না তো যেন ভেসে-ভেসে চলেছে। চলার দ্রুত ছন্দ নানদের মতো, সারাক্ষণই যেন মনে রয়েছে দুনিয়াটা দুশমন। সামঘিন আনন্দের চোটে হয়তো চিৎকারই ক'রে ফেলত, যদি না সুন্দর দেখতে একটা বাড়ির গেট থেকে ঝোপ-ঝোপ দাড়িওয়ালা মানুষটা না বেরিয়ে আসত। লোকটার বগলের তলে ছোট্ট একটা কফিন। পেছনে-পেছনে অন্ধকার থেকে যেন গড়িয়ে এল একটা কালোমত মোটসোটা বুড়ী। গড়গড় ক'রে চলল যেন। গোল-গাল ছোট্ট এক ইস্কুলের ছেলেও তাদের সঙ্গে, মাথাটা যেন রবারের বল। ছুঁচলো মুখের একজন সৈনিক গেটটা বন্ধ করতে করতে কোচোয়ানের দিকে চেঁচিয়ে বলল: 'এই, বেওকুফ্! গাড়ী থামা!'

ক্যাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে সামঘিন দেখল নিকনোভা ফিউনের‍্যালটাকে দেখবার জন্যে পেছন ফিরে তাকাল। ওকে দেখেই কিন্তু হন্‌হন্ ক'রে চলতে আরম্ভ করে।

'নিশ্চয়ই রেগে আছে।'

কোচোয়ানকে ভাড়ার পয়সাটা বের ক'রে দিয়েই, মেয়েটার দিকে ও প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে। বগলের নীচে রাখা ব্রীফকেসটা গতিকে আড়ষ্ট ক'রে তোলে। হেঁচকা টানে সেটা ওখান থেকে সরিয়ে স্যুটকেসের মতন ক'রে হাতে ঝুলিয়ে নেয়।

নিকনোভা একতলা একটা বাড়ির অঙ্গনে ঢোকে। পাটাতনের ওপর তার পায়ের শব্দ ও শুনতে পায়। সামঘিনও দৌড়ে এসে সে-বাড়িতে ঢোকে, দেখে সামনে তিনটে সিঁড়ি উঠেছে।

করিডরের অন্ধকার একটা কোণে, নিকনোভা ধীরে-ধীরে তালা খুলছিল। শব্দ শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল ঝোলান তালা।

'মারিয়া ইভানোভনা—'

'এ্যাঁ? ও তুমি! তুমি!'

'এভাবে আসবার জন্যে মাপ করো।'

দরজা খুলে দেয়। ঘরের আলো এসে করিডরে পড়ে। সামঘিন দেখল নিকনোভার মুখে অপ্রস্তুত ভাব। হয়তো ভয়ের, হয়তো বিদ্বেষের। মেয়েটা ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরে। তার তরল চোখে নীল-নীল উদ্ধত শিখা দেখতে পায়।

ব্রীফকেস দুলিয়ে, টুপী খুলে বুকে চেপে ধরে সামঘিন বলে: 'এসে গেলাম। তখন তো তোমার ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি। তবু জানতাম দেখা হবেই।'

নিকনোভা তখনও ওর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। মুখের ওপর ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়াগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। গাল দু'টো লাল হয়ে উঠেছে।

ওর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিয়ে নিকনোভা বলে, 'কোটটা খুলে ফেল।' কোট খুলে রেখে সামঘিন ঘরে ঢুকে দেখে দরজার এক পাশের কোণটায় একটা খাট, বিছানাটা ঠিক যেন সেই ডাক-বদল স্টেশনের ঘরটার মতো। তফাতের মধ্যে শুধু লেপ নেই, আছে একটা চেক-চেক কম্বল। খাটের ওপাশে বাঁকা-বাঁকা পায়ের ছোট একটা কার্ড-টেবিল, তার ওপরে একটা বাতি আর একগাদা বই। তলের দিকে গ্যাব্রিয়েল ম্যাক্সের আঁকা খ্রীষ্টের ছবি।

'ক্ষমা করেছ তো?' নিকনোভার হাতটা নিয়ে তাতে আলতো ক'রে চুমু খেয়ে সামঘিন বলে। হাতটা ঘামে সামান্য ভেজা।

'তোমাকে চা'ও খাওয়াতে পারি।' নিকনোভা জানায়। সামঘিনের মাথায় আর গালে আস্তে আস্তে চাপড় মারে। এবারে হাসে ও, ওর সেই চিরাচরিত জোর ক'রে হাসির ধরণটা নয়, অমায়িক মিষ্টি মিষ্টি হাসি। মুহূর্তেই ক্লিম স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে।

'ফিসা!' দরজা খুলে জোরে ডাকল।

ছোট্ট ঘরটাকে সামঘিন লক্ষ্য ক'রে ক'রে দেখে। ভাবে, গরীবের মতোই থাকে। একটাই জানালা, খুললে বাইরের বাগান চোখে পড়ে। জানালাটা একটু যেন বাঁকা পাল্লায় চারটে ভাগ। একটায় ছ্যাঁতলা ধরেছে, দেখেই বোঝা যায় ফ্রেমের মধ্যে বহু যুগ থেকে আটকে আছে। জানালার নীচে একটা ছোট গোল টেবিল, তার ওপরে কুরুশের কাজ-করা টেবিল-ঢাকনি। খাটের দিকে মুখ ক'রে একটা স্টোভ, মাথাটা সমতল, ওপরে যে কেউ শুতেও পারে। স্টোভের কাছে টানা দেরাজ, তার ওপর নানা রকম টুকিটাকি--একটা বাক্স, সেন্টের বোতল ইত্যাদি। দেওয়ালে আরশী ঝুলছে। ঘরে তিনটে চেয়ার—তাদের পেছনটা আর পাগুলো বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে তৈরি। বেতের সীটগুলো ঝুলে ঝুলে পড়ে ঘরের দারিদ্র্যকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়।

নিশ্চয়ই এও তানিয়া কুলিকোভার মতো মেয়ে—সবল, আত্মোৎসর্গী।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিকনোভা ফিসফিস ক'রে কথা বলছিল একজন সুন্দর মতো দেখতে গোলাপী ব্লাউজ পরা বিশাল বক্ষ মেয়ের সঙ্গে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' নিকনোভার অধৈর্য সুর: 'ভেতরে নেই।'

সামঘিনের কাছে এসে বলে: 'বেশ মিষ্টি ছোট্ট নিবিড় জায়গাটা, না?'

সামঘিন ওর হাত দু'টো নিয়ে আবার চুমু খেতে আরম্ভ করে। যতটা কোমল হওয়া সম্ভব তাই হয়। দারিদ্র্য দেখে ভাবের উচ্ছ্বাস জেগেছে, মানুষকে সেবা করতে করতে যারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাদের নিরহঙ্কার দুঃখের কথাটা মনে হয়, এই মেয়েটার কথাও অনুভব করে জড়পদার্থের মতোই মানুষের সেবা ক'রে চলেছে। অনভ্যস্ত অনেক কথাই জিভের ডগায় এসে জড়ো হয়। এমন এমন নাম ধরে ওকে ডাকতে ইচ্ছে ক'রে যা অন্য কোনো মেয়েকে কোন দিন বলেনি :

'আমার প্রাণের রাণী!'

কিন্তু নির্বাক হয়েই রইল। ওর কোমরটা হাত দিয়ে ঘিরে ধরে বুকের দিকটায় চাপ দিয়ে সামঘিনের মনে অস্পষ্ট ভীতি আসে। নিজেকে প্রশ্ন করে :

'সত্যি-সত্যিই সীরিয়াস নাকি?'

পিঠটায় মোচড় দিয়ে নিকনোভা হাত ছাড়িয়ে নেয়।

'তাহলে তুমি—খুশী হয়েছ আমাকে দেখে?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই এত খুশী হয়েছি যে নিজেই অবাক।'

'এতটা?'

নিকনোভার চোখ দু'টো ঘন-নীল হয়ে আসে। হাসতে হাসতে প্রায় চিৎকার করে :

'আঃ! তুমি—তুমি আমার লক্ষ্মীটি!'

ক্রীম আর রাস্ক দিয়ে চা খায়। কত বিষয় নিয়ে কথা। বইয়ের কথা, থিয়েটারের, বন্ধুদের। নিকনোভা খবর দিল লুবাশাকে হাসপাতাল থেকে জেলখানার সেলে বদলি করা হয়েছে, শীগগির বোধহয় নির্বাসনে পাঠাবে। সামঘিন দেখল পার্টি-ওয়ার্কার আর বিপ্লবের কাজকর্ম সম্বন্ধে ও বেশ রেখে-ঢেকে কথা বলছে, অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন।

'সুশিক্ষিত,' সামঘিন মনে-মনে প্রশংসা করে।

বাগানে একটা বুড়ো লোক চেক-চেক ওয়েস্টকোট পরে ফুলের বেড থেকে ঘাস নিড়াচ্ছিল। মুখ আর ঘাড়টা পচা মাংসের মতো লাল। সামঘিনের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে নিকনোভা তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিল :

'বাড়িওয়ালা। পুরোনো নারোদনিক, বহু দিন সাইবেরিয়ায় ছিল। মনুষ্য-বিদ্বেষী।'

আবার সাহিত্যতত্ত্বে ফিরে এল নিকনোভা :

'কাউন্টেস তলস্তয়ের সঙ্গে আমি একমত। "দি এ্যাবিস"-এর মতো গল্প লিখে কি হয়?'

'ওর কাছে সবই অদ্ভুত রকম সরল,' সামঘিন ভাবে; বলে : 'যখন এলাম মনে হলো তুমি বিরক্ত হয়েছিলে, ভয়ও পেয়েছিলে যেন।'

'ভয়? কিসের?' মেয়েটি ক্লিমকে তীক্ষ্ন চোখে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে :

'তাই-ই তো মনে হয়েছিল...'

হাত বাড়িয়ে ধরে নিকনোভা বলে : 'থাক, ও-সব কথা আর না।'

শেষ পর্যন্ত যখন সামঘিন নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে তুলল, তখন আঁধার হয়ে গেছে। অর্ধ-নিরাবরণ দেহে খাটে বসে বসে নিকনোভা চাপা-স্বরে বলল :

'কখন আসবে? সঠিক জানিয়ে যাও!'

প্রায়ই দেখতে চাই যে, সামঘিন জানায়।...চুল ঠিক করতে গিয়ে নিকনোভা হাত দু'টো মাথার ওপর তোলে। সেখানেই সে-দু'টোকে অনেকক্ষণ রেখে দেয়। আঙুলগুলো এমনভাবে নাড়ায় যেন কোনো পঙ্গু ওঠবার আগে শূন্যের ভেতরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কিছু খুঁজছে।

'বেশ। প্রায়ই দেখা হবে। এত তাড়াতাড়িই যদি আমার ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে পড়তে চাও তো তাই-ই হবে,' নীচু গলায় জবাব দেয়।

'রসিকতাটা কিন্তু তেমন হলো না,' সামঘিন মন্তব্য করে। কিন্তু আসলে কোন রসই খুঁজে পায়নি।

বেরিয়ে যেতে যেতে সামঘিন ভাবে: 'ওর জীবনটা নিশ্চয়ই খুব কঠোর, ক্লান্তিকর।'



বার দশেক দেখা-সাক্ষাতের পর সামঘিন বোঝে এতদিনে এমন একজন বন্ধু পেয়েছে যার সঙ্গে কথা বলা চলে। হাল্কা মনে সব কিছু আলোচনা করা যাবে, বিশেষ ক'রে নিজের সম্বন্ধে। নিকনোভা সব সময় মন দিয়ে শোনে। কি ক'রে চুপচাপ শুনতে হয় তা বেশ ভাল করেই জানে, এতটুকু কৌতূহলের উগ্রতা প্রকাশ না ক'রে। কথা বলে খুব কম, তাও সাদাসিধে ভাষায়, নরম শান্ত গলায়। বোধ-হয় লোকের ওপর প্রসন্ন হয়ে উঠতে পারলে আর কিছুও চায় না। এক-এক সময় সামঘিনের মনে হয় ও বোধহয় দূর থেকেই লোকের ওপর কৃপাদৃষ্টি হানে। তানিয়া কুলিকোভার সঙ্গে ওর সাদৃশ্যটা যেন এতে নষ্ট হয়ে গেল। চায়ের টেবিলে সামঘিন ওকে ঠাট্টার সুরে বলে:

'তুমি ভুল বলশেভিস্ট নও।'

'কেন?' ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞেস করে। মুখের ওপর সেই জোর ক'রে টেনে-আনা নিবানন্দের হাসি।

সামঘিন বুঝিয়ে বলে:

'বুর্জোয়ার ওপর তোমার মনোভাবে বলশেভিকসম্মত নিরাবরণ তিক্ততা কই।'

'তোমারও তো নেই' খুব শান্ত সুরে বলে নিকনোভা।

শেষের কথাটা সামঘিনের কিন্তু ভাল লাগল না। ছোটখাট একটা বক্তৃতাই শুনিয়ে দিল বুর্জোয়া সমাজের বিত্ত-সচেতনতা সম্পর্কে, তাদের মানবদ্বেষী এবং মুখ্যতঃ অদূরদর্শী অস্মিতার ওপর। নিকনোভা শান্ত হয়ে শোনে, কোন তর্কই তোলে না। দেখেই বোঝা যায় বক্তৃতা শুনতে শুনতে ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। মোটমাট, শিখতেই হবে ধরে নেয় যে ছাত্রী ওর ধরনটাও যেন তেমনি, ললাটের লিখন মেনে নিয়েই বসে আছে। সামঘিন কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পায় যে এই বিনয়ী মেয়েটি হয় ওর চেয়ে অনেক দৃঢ়, নয় তো অনেক চালাক। মিত্রোফানভের সঙ্গে খানিকটা যেন মিল আছে। অথচ ওই একটা লোক, যার সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাস ক'রে কি ঠকাটাই না ঠকেছে। তবু মেয়েটি যা হোক গোয়েন্দা-পুলিশের টিকটিকিটার মতো দর্শনও আওড়ায় না, চোখে জলও টেনে আনে না। তাহলেও ও যেন সেই লোকটার মতোই একই সুরে বাঁধা। রাজনীতি বা পার্টির কাজ নিয়ে কোন কথাই বলল না। অবশ্য আন্ডারগ্রাউন্ড কাজের গোপনীয়তার জন্যই বোধহয় ওর এমন আচরণ। বা হয়তো বিষয়টায় অরুচিই ধরে গেছে, বিপ্লবীর পেশাদারী কাজ তো ওর। মেয়েটাকে সামঘিন যা দেখল, তাতে মনে হয় ওর কাজটা নিশ্চয়ই টেকনিক্যাল। উস্কানী দেওয়া বা প্রোপ্যাগ্যান্ডা করার মতো ধাত ওর নয় বা শ্রেণী-যুদ্ধের থিয়োরিও যে ওর বেশ ভাল মতন জানা আছে তাও তো মনে হয় না। সামান্য লোকদের জীবনের গল্প বলতে ভালোবাসে, বলেও ভাল। সুখের

অন্বেষণে তাদের কত-শত ফন্দী, কখনো সফল হয় কখনো হয় না। কিভাবে তারা বেঁচে থাকে সে-খবরও ওর বেশ ভাল ক'রেই জানা। এই সব জীবনকাহিনী শুনতে শুনতে সামঘিনের মনে পড়ে যায় ভারভারার শয়ন-কক্ষের পরিচারিকাটির কথা, কি অক্লান্ত পরিশ্রম করত। পরিচারিকাটির দয়া-মায়া খুব, কিন্তু বুদ্ধি একটু কম। নানা রঙের কাপড়ের টুকরো সেলাই ক'রে ক'রে সুন্দর সুন্দর বেড-কভার তৈরি করত, সেগুলো আবার বিক্রি করত। মানুষের জীবনের এই সব শান্ত ছবি সামঘিনের খুব ভাল লাগে, যদিও প্রায়ই বিদ্রূপের সুরে বলে ওঠে :

'তুমি যে রকম ছবি আঁকলে, তাতে মনে হচ্ছে বিবর্তন বেশ ভালই কিন্তু বড়ই বৈচিত্র্যহীন।'

'জীবনই যে তাই।' নিকনোভা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

"দয়ালু' মানুষ আর "উজ্জ্বল" ব্যাপার নিয়ে যখনি কথা বলত তখনি মেয়েটার গলার সুর হতো অদ্ভুত মিষ্টি। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় এমনভাবে বলত যেন এই ছোট ছোট রহস্যের পেছনে আছে অতীন্দ্রিয় মহারহস্য, তার জাদুর কাঠির ইঙ্গিতেই তো সব ছোট ছোট ঘটনা ঘটে। কখনো কখনো ওর গল্প-কাহিনীতে ধরা পড়ত দৈনন্দিনের জীবনের কবিতা—যেমন বলেছে বুড়ো কজলভ। কিন্তু এ সবই তো সামঘিনের কাছে অপ্রয়োজনীয়, মেয়েটাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে এগুলো তো কোন বাধাই দেয়নি, বরঞ্চ এত ভীষণ দ্রুত এসেছিল সেই অভ্যাস যে ও নিজেই অবাক হয়েছে।

সামঘিনের কাছে মেয়েটা যেন টেবিলের দেরাজ, ছোটখাটো একান্ত জিনিস লুকিয়ে রাখবার। অথবা ওকে তুলনা করা যেতে পারে এমন এক কুণ্ডের সঙ্গে যেখানে সামঘিন তার প্রাণের আবর্জনা ঢেলে ফেলে। শিশুকাল থেকে ব্যাঙের ছাতার মতো কথা আর কথায় ওর অন্তরটা ছেয়ে গেছে। এখন মনে হলো যে এই মেয়ের ওপর সেগুলো কিছুটা ঢেলে দিতে পেরে ও যেন নিজেকে তাদের চটচটে ভার থেকে মুক্ত করতে পারছে। নিজের মধ্যে ইচ্ছাশক্তিভরা একটা মানুষকে মুক্তি দিতে পেরেছে যে মানুষটা অনেক কাজের। নিকনোভার সঙ্গে কথা বলে যেন ও দৈহিক আরাম পায়। বার বার ডীকনের কথা মনে পড়ে :

'কথা হচ্ছে প্রাণের বিষ্ঠা।'

মেয়েটা ওকে বুঝতে পেরেছে কি-না সে-বিষয়ে কিন্তু ও অনিশ্চিত। তবু তাতে কি, ভাবেই না এসব কথা। ওর যা প্রয়োজন তা হচ্ছে শেষ অবধি যেন নিকনোভা মন দিয়ে ওর কথা শোনে। আর তা হতোও। মেয়েটা এ ধরনের প্রশ্ন করত খুব কমই : 'তা কি ক'রে বলতে পার ?'

দরদী চোখ মেলে মেয়েটি হয়তো চেয়ে-চেয়ে থাকে। 'একজন বন্ধুর মারফৎ আমার ভাই আজই একটা চিঠি পাঠিয়েছে,' সামঘিন বলে : 'ভাইটির আমার তেমন কিছু অনুসন্ধানী মন-টন নেই। বড্ড নরমগোছের। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষাণ-আন্দোলনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। চাষীদের ওপর যেসব অমানুষীক শাস্তি দেওয়া হলো তাতে তো ও হকচাকিয়ে গেছে। কিন্তু লিখেছে কি জান,—যারা এই বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে তাদের ঘৃণা করবার মতো নাকি ওর শক্তিই নেই, কেন-না বিভীষিকার খড়্গ এসে পড়েছে যাদের ওপর, তারাও তো ঠিক অতটাই উন্মত্ত, তাদের কাজেও তো কেঁপে উঠবার কথা।'

'উনি কি তলস্তয়বাদী ?' মৃদুস্বরে নিকনোভা জিজ্ঞেস করে।

"বিপ্লবী যে তাকে তো এমন মানুষ হতে হবে যে ঘৃণা করতে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে তেমন কোন অনভূতি মনের দিক থেকেই সম্ভব নয়।" আমার মনে হয়, আমাদের উভয়ের পরিচিত লোকদের মধ্যে অনেক এমন আছে যারা বাস্তবকে

যুক্তি দিয়েই ঘৃণা করে, শুধু থিয়োরী অনুসারেই।' নিকনোভা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। সামঘিন জানে যে এই ভঙ্গীটির অর্থ ওর সঙ্গে মেয়েটি একমত। ভাবে, এমন কিছু বলতে হবে যে-কথার নতুনত্ব এবং যুক্তি ওকে আশ্চর্য করে তুলবে। ফলে সামঘিনের ওপর ওর মন পুলকিত-শ্রদ্ধায় ভরে উঠবে। এ-রকম একটা জিনিসের প্রয়োজন থাকলেও, তা আর হলো কই? সামঘিন ভাবে, বোধহয় নিশ্চিতও বটে, যে এমন একটা দিন আসবেই যখন এরকম একটা কিছু ঘটবেও। কারণ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে ওর দিকে মেয়েটিকে তো প্রায়ই তাকিয়ে থাকতে দেখে। মনে মনে বোঝে যে নিকনোভা ক্রমশঃ ওর পক্ষে প্রয়োজনীয়ই হয়ে উঠছে।

দৃশ্যের পরিণতি ঘটত যৌন সম্পর্কের সামগ্রিকতায়। দুটো দেহের মিলন-তন্ত্রীতে একটিই সুর ধ্বনিত হতো। সামঘিন চরমতম আনন্দের উপলব্ধি করত, এমনটি আগে আর কখনও অনুভব করেনি। নিকনোভার আদর-সোহাগের পর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠত। মেয়েটি কি কোমল, কি স্নেহশীল! মুখকান্তির সঙ্গে অতি-পরিচিত হবার পর এখন যেন ওকে আগের চেয়ে অন্য রকম দেখায়। মেয়েটির মুখাকৃতি ছোট, বিশেষ কোন চাপল্য নেই, হৃদয়ের বিরাট অনুভূতির প্রেরণাতেই বুঝি ওর ত্বক অচপল হয়ে আছে। ফিকে-নীল চোখ দু'টি বিভাসে প্রায় প্রোজ্জ্বল, শুধু উত্তেজনার ক্ষণেই সেখানে আঁধার ঘনায়, এত উত্তাপ তখন বিচ্ছুরিত হয় যে, সেই তাপ অনুভব করবার জন্যে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখবার লোভ আর সম্বরণ করা যায় না।...মেয়েটিকে অতীত সম্বন্ধে যখন সামঘিন প্রশ্ন করল, ওর করুণ চোখে ফুটে উঠল নীলিম-রশ্মি :

'নিজের কথা বলতে আমি ভালোবাসি না,' কঠিনভাবেই যেন শেষ উত্তর দিয়ে দিয়েছিল সামঘিনের আপাত প্রশ্নের :

'মনে হয় অতীতের কথা বলতে ভয় পাও।'..

একবার আদরের উচ্ছ্বাসে বাহিত হ'য়ে সামঘিন বলল :

'তোমার কি সন্তান হয়েছিল?'

'একটি। আট-মাস বয়সে মারা গিয়েছে।'

সামঘিন গভীর অন্তরিকতায ওকে জানাল :

'তোমার কাছ থেকে যদি একটা সন্তান পেতাম!'

নিকনোভা চোখ বন্ধ ক'রে রইল। নিজেকে এলিয়ে দিল। সামঘিন তখনো ব'লে চলেছে :

'তুমি আমার জীবনে তৃতীয় নারী। তবু প্রথম দু'জনে আমার মনে এমন কোন ইচ্ছা কখনো জাগিয়ে তুলতে পারে নি।'

'তুমি আমার সোনা—,' মৃদুভাষে ও ব'লেছিল। চোখ দুটো তখনো বন্ধ, হাতের চেটোয় নিজের বুক দুটোয় আস্তে আস্তে আঘাত ক'রে পুনরাবৃত্তি করল . 'সোনা-মানিক...'

এই ঘটনাটির পর সামঘিনের ওপর ওর সোহাগ যেন উথলে উঠল। আরো, কোমল, আরো স্নেহশীল। তারপর, একদিন কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না ক'রেই অল্প কথায় নিতান্ত সাদা ভাষায় জানিয়ে দিল ওর অতীত জীবনের কথা। নারোদোপ্রাৎজির কেসে প্রথম এ্যারেস্ট হ'লো সতের বছর বয়সে। তার অল্প কিছুদিন আগেই লিউতভের সঙ্গে ওকে দেখেছিল সামঘিন। দশ মাস জেলে কাটায়, আর তারপর পুলিশের নজরবন্দীতে সৎ-মায়ের বাসায়। বাবা ছিলেন একজন "অভিজাত", রিটায়ার্ড কর্নেল। মদ খেতেন প্রচুর, এক ব্যবসায়ীর বিধবাকে বিয়ে করেছিলেন। মহিলাটি অত্যন্ত নির্বোধ আর হিংসুক। উনিশ বছর বয়সে,

নিকনোভার সঙ্গে দেখা হলো একজন থিয়োলজিক্যাল স্টুডেন্টের, সে-ই ওকে নারোদনিকের একটা দলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। লোকটি শেষে মার্ক্সিজমের দিকে ঝোঁকে, গ্রেপ্তার হয়, নির্বাসনের দণ্ড হয়। নির্বাসনের জায়গাটিতে যেতে যেতে পথেই মারা যায়। সেই ওকে দিয়ে যায় একটি সন্তান। দ্বিতীয় প্রেমিক ফর্সা-মতো সেই লোকটি,—তাকে তো ক্লিম লিউতভের ওখানে ওর সঙ্গে দেখেইছে, সেই করোনেশনের বছরে।

'সে ছিল খুবই নীরস আর উদ্ধত-ধরনের লোক,' নিঃশ্বাস ফেলে বলে : 'বোধ-হয় ঠিক ভালোও বাসতাম না, কিন্তু—একা-একা থাকা তো বড়ই কষ্টের।'

তারপর পরিচয় হলো একজন মার্ক্সিস্টের সঙ্গে।

'ছাত্র ছিল, খুব ভাল লোক,' বলতে বলতে ওর মসৃণ কপালটায় গভীর কুঞ্চন ফুটে ওঠে, দগ্‌দগে লাল ক্ষতের মতো। 'খু-উ-ব,' আবার বলে : 'কমরেড ইয়াকভ ..'

'করনেভ?' সামঘিন জিজ্ঞেস করে।

'না,' জোর দিয়ে ব'লে ওঠে। বডিসের মধ্যে স্তনদুটো গুঁজে গুঁজে দেয়। সামঘিনের মনে হয় ফেরিওয়ালা যেমন লাভের পয়সা গুণে নিয়ে থলি লুকোয় ও-ও যেন তেমনিই। কথাটা ওকে বলতেও চায়। মনে হয় স্তনদুটোর ওপর ওর যা যত্ন, আর খরদৃষ্টি, হাসিই পায়।

'করনেভ কে? প্রশ্ন করে। লোকটার সম্বন্ধে যা জানত সব বলল সামঘিন। শুনে নিয়ে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। একটু হেসে বলে :

'এই তো আমার ইতিহাস। জানলে তো এখন। খুবই সাধারণ, নয়?'

বিছানায় ব'সে খোঁপা বাঁধে। নরম পাতলা চুল। খোঁপাটাকে মাথার ওপর স্তূপ ক'রে রেখে দেয়, ঢিবির মতন। চুল বিশেষ নেই ব'লেই মনে হতো, তবুও যখন চুল ছেড়ে দেয় কোমর পর্যন্ত নামে। আর তখন সেই এলোচুলে মনে হয় অনুতপ্ত ম্যাগডালেন যেন।

॥ ২১ ॥

দক্ষিণের কৃষকদেরকে অমানুষিক শাস্তি দেবার প্রত্যুত্তরে কোচুরা খারকফ-প্রদেশের গভর্নরকে গুলী করল। যে-সব লোক সন্ত্রাসবাদকে অস্বীকারই করত তারাও, সামঘিন দেখে, গোপনে-গোপনে প্রতিহিংসার এই কাণ্ডকে সমর্থন জানায়।

মিত্রোফানভ এসে ধপাস ক'রে চেয়ারে বসে। চিন্তান্বিত মুখে জিজ্ঞেস করে :

'এই যে এই কোচুরা—ইহুদী নাকি? ঠিক জানেন, ইহুদী না? নামটাতে তো সন্দেহই হয়। শ্রমিক একজন? হুঁ। তবুও বুঝতে পারলাম না। একজন শ্রমিক কি ক'রে নিজে-নিজেই শাস্তি-বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নেয়? কৃষকদের ওপর যে-অবিচার হ'য়েছে তারি প্রতিশোধ নেবার জন্যে? বাইরে থেকে নিশ্চয়ই উস্কানি দেওয়া হ'য়েছে, তাই কি মনে হয় না? এইসব পিস্তল-টিস্তলের কাণ্ডগুলো থেকে সাধারণতঃ কিছুই বোঝা যায় না।'

সামঘিন প্রশ্ন শুনে শুনে মাথা নাড়ায়। প্রায় উৎফুল্ল হ'য়েই মিত্রোফানভ বক্তব্য শেষ করে :

'এ কাজটা আমার নয়, বুঝেছেন। আমি শুধু, যা'কে বলে গিয়ে স্বদেশভক্তি, তা' থেকেই এইসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। মানে, ধরুন : আপনার নিজের চোর—বেশ সহজবোধ্য কথা তো। কিন্তু ধরুন সেই জায়গায় যদি পান একটা গ্রীক বা পোলকে—বড়ই গোলমেলে ব্যাপার, না? সবাই নিজের লোকদের মধ্যেই তো চুরি করে।'

নিকনোভার কাছে এই কাহিনী বলতে গিয়ে সামঘিন বেশ গর্ব ক'রে বলে :

'লোকটা আমার ভীষণ অনুরাগী। গোয়েন্দাদের তো ও নিশ্চয়ই চেনে, তাই আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল আমার ওপর নাকি নজর রাখা হয়েছে। তোমার নামেও বলেছিল, তুমিও নাকি সন্দেহজনক।'

'তাই নাকি?' উত্তেজিত হ'য়ে বলে : 'বাঃ, বেশ তো।'

'হ্যাঁ, নয় কি?'

'খুব সুন্দর। ওকে লাগিয়ে রাখ। অনেক বড়-বড় কাজ করান যাবে। ওকে ওখরানার ভেতরে কোন-কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, চেষ্টা ক'রে দেখেছ? আমি হ'লে কিন্তু তা-ই করতাম।'

'এ্যাডভেঞ্চারের মোহ আছে দেখছি,' সামঘিন ভাবে।

জীবনে ক্রমশঃ ঘটনার ঘন-ঘটা দেখা যায়। প্রত্যেকটি দিন নতুন নতুন নাটকের সূচনা নিয়ে আসে। উদারপন্থী কাগজগুলোয় অসন্তোষ বাড়ে, সাহস-ও। মতান্তরের তিক্ততা এখন অনেক বেশী। রাজনৈতিক দলগুলোর কাজকর্ম অনেক জোরদার হ'য়ে ওঠে। বহুবার সামঘিনের কানে এল ক'টি কথা :

'বে-আইনী। গোপন কর্মী...'

সামঘিন যখনই ভারাভকা বা বড়-উকিল মশাইয়ের কাজে এখানে-ওখানে যেত, তখনই আলেক্সেই গোঘিন বা পার্টির অন্যান্য লোকদের নানা কাজের ভার হাতে নিত। ইদানীং সে-সব কাজের ভার এত বেড়ে উঠছিল যে ও স্পষ্ট বুঝতে পারে মস্কো শহরের কারখানা-এলাকায় পার্টির যোগাযোগ বেশ বাড়ছে। না বুঝেই কাজগুলো করবার অভ্যাসটা বেশ রপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। কাজ খতম হলেই

কৌতূহলও শেষ। এক এক সময় মনে মনে হেসেও উঠত। নিজেকে মনে হতো 'বিপ্লবের অনুগত ভৃত্য'। লুবাশা সমভাকেও সে-রকমই মনে হতো, নিকনোভাকেও। কত লোকের সঙ্গে কত অদ্ভুত রকমের সাক্ষাৎ হয়েছে। তারই মধ্যে একটি ঘটনা বহুদিন স্মৃতিতে জেগে রইল।

একদিন সন্ধ্যে যখন ঘোর হয়েছে, হোটেলে একটা লোক এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। লোকটি মাঝারি উচ্চতার, সটান খাড়া-হ'য়ে দাঁড়ান চেহারা, মাথাটা কিন্তু শরীর আন্দাজে অনেক বড় আর তাইতেই ওকে বেশ ছোটখাট দেখায়। চুলগুলো ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, সোজা শক্ত হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে, মাথার বিশালতা যেন তাতে আরো অনেক বেড়ে গেছে। গোলগাল কামান মুখে দুটো গোল চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আছে। মোটা-মোটা ঠোঁট, ওপর-ওষ্ঠে খোঁচা খোঁচা গোঁফের শোভা, মনে হয় যেন নেহাৎ বিদ্বেষের বশেই গোঁফটাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরা হয়েছে। গায়ে সাদা উর্দির জ্যাকেট, হাইবুট, আর হাতে মোটা একটা লাঠি। ,

সামঘিনের কাছ থেকে চিঠি আর বইয়ের একটা ছোট বান্ডিল নিয়ে জিজ্ঞেস করল : 'এই নাকি সব?' বান্ডিলটি হাতে ধ'রে তার ওজন আন্দাজ ক'রে নেয়। মেঝের ওপর রেখে পা দিয়ে ডীভানের নীচে সরিয়ে দেয়। চিঠিটা ডান চোখের একেবারে কাছে ধ'রে পড়তে থাকে। পড়া শেষ হয়ে গেলে বলে :

'বাঁ-চোখটা দিয়ে একেবারেই দেখতে পাই না। বলেছে, সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে যাব। বড়জোর আর দু'বছর আছে আমার দৃষ্টিশক্তি, আর তারপর—অন্ধকারে তলিয়ে যাব।'

এমনভাবে বলে যেন অন্ধ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনায় ওর খুব গর্ব। মানুষটা যেন একটু কাঠ-কাঠ; সেপাইয়ের মতো ভাবসাব। চিঠিটাকে ভাঁজ ক'রে ক'রে ক্রমশঃ ছোট্ট ক'রে ফেলল। বেশ একটু বিস্তৃত হাসি হেসে বলে :

'ওরা আমাকে জানিয়েছে লিব্যারেলেরা নাকি কনস্টিটিউশন বানাবার জন্যে সোরগোল করছে। পুরোনো খবর। নিশ্চয়ই উকিল, অধ্যাপকেরাই।... বেশ, আমাদের জন্যে কিছু স্বাধীনতা ওরা না হয় নিয়েই এল।'

চিঠিটা খুলে ডান চোখ দিয়ে আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, জেরা করার ভঙ্গীতে শুধায় : 'হ্যাঁ, ছাত্রদের কি খবর?'

সামঘিন বুঝে নিয়েছে সামনে যে দাঁড়িয়ে সে এক বিচিত্র টাইপ—এ ধরনের লোক দেখা যায় যথেষ্ট, ওরা একটুও প্রীতিকর নয়। লোকটার বেড়ে-ওঠা অন্ধত্বকে বাহবা দেবার ইচ্ছা সামঘিনের মোটেই নেই। যদিও তার বাঁ চোখটা বেশ ঘোলাটে, অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপেও উঠছে তবুও এই অবস্থার পেছনে কোন একটা উদ্দেশ্য থাকাটাও বিচিত্র নয়। হয়তো আরও বেশী ক'রে মৌলিক হ'য়ে পড়বার অছিলাই এটা। লোকটার প্রশ্নের উত্তর সামঘিন যথেষ্ট সাবধান হয়েই দেয়, গলার স্বরটাও কঠিন শোনায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লে :

'মোটের ওপর তরুণের দল ক্রমেই বেশ সীরিয়স হ'য়ে পড়ছে। অনেকেই তো রাজনীতি ত্যাগ ক'রে বিজ্ঞানের দিকে চলেছে।'

'ত্যাগ করা মানে? কি বলতে চান? ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেটা কোথায়?' অবাক হ'য়ে অতিথিটি জিজ্ঞেস করে : 'লোকে কি রাজনীতির জন্যে বিজ্ঞানের পাঠ নেয় না? জানি, ছাত্রদের এক-অংশে আজ রব উঠেছে : "আমাদের শিক্ষায় বাধা দিও না।" কিন্তু সেটা তো বোঝার ভুল। ইউনিভার্সিটির অর্থ কি জানেন? যেন একটা মিলিটারী ইস্কুল, বেসামরিক লোকদের শেখানো হচ্ছে কি ক'রে পদাতিক জনতাকে চালনা করতে হবে। এ-ও তো বিজ্ঞান, অবশ্য আরো নানা রকম সামরিক

জ্ঞানও দেওয়া হয়।'

বলতে বলতে ওর খোঁচা-খোঁচা ভুরু ক্রমশঃ ওপরের দিকে ওঠে অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে। খোঁচাটা বিঁধল না দেখে সামঘিন অন্য কথা পাড়ল :

'আপনিও কি তাহ'লে মিলিটারী?'

'আমি ফিজিক্স এবং ম্যাথেমেটিক্‌সের ছাত্র ছিলাম। তারপর ১৪৪তম স্কভ রেজিমেন্টে জওয়ান হলাম। কিন্তু চোখের দুর্বলতার জন্যে—এক কশাক একবার চাবুক দিয়ে ও-দুটোর মাথা খেয়ে দিয়েছিল—হ্যাঁ, সেই দোষে ফৌজের কাজ থেকে সরিয়ে দিল, পাঠাল এখানে বাস করতে, আমার নিজের শহরে,—তিন বছরের জন্যে, মুহূর্তের জন্যেও স্থানত্যাগ না ক'রে।'

দ্রুতকণ্ঠে কাহিনী বলা শেষ ক'রে শ্লেষের সুরে বলে :

'বোধহয় আপনিও ওই দয়ালু লোকদের একজন যারা লিব্যারেলদের বাঁ-হাত ধ'রে তাদেরকে ক্ষমতা পাইয়ে দিতে উদগ্রীব, আর তারপর তাদের ডান-হাত থেকে পায় মোক্ষম এক ঘুসী, ঠিক কানের ওপরটায়?'

বেশ অভদ্রভাবেই কথাটা বলে। হঠাৎ যেন ওর বয়স কমে গেছে ব'লে মনে হয়, যেন লড়াই করবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলেছে। সামঘিন কিন্তু তার ধারকাছ দিয়েও গেল না :

'এখানেই আপনার জন্ম?'

'দুর্ভাগ্য আমার, তাই-ই বটে! কিন্তু মস্কোকেই—ইউনিভার্সিটিকে—প্রকৃত জন্মস্থান ব'লে ভাবি।'

'বড় একঘেয়ে এখানে, না?'

'আমার কোন একঘেয়েমিই লাগে নি তবে কিছু-কিছু অসুবিধা হ'য়েছে বই কি · চোদ্দ মাস সময়ের মধ্যে দু'বার সার্চ আর চুয়াত্তর দিন কয়েদ।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে রইল। দূর থেকে যেন সামঘিনকে যাচাই ক'রে দেখছে। তারপর বেশ মুরুব্বিয়ানার গলায় বলে :

'গোঘিন আর পয়ারকভকে বলবেন যেন আরো বেশী ক'রে লিটারেচার পাঠায়। আর বলবেন কমরেড দুনায়েভের এখানে আসাটা একান্ত জরুরী। সেই কাণ্ডজ্ঞান-হীন মেয়েটাকে যেন আমার কাছে আর না পাঠায়।

ডীভানের তল থেকে প্যাকেটটা টেনে বের ক'রে আবার সেটা হাতের তালুতে রেখে নাচায়। কঠিনস্বরে শেষ কথা ক'টি বলে :

'আর বলবেন, আমার নাম পেতর উসভ, রুসভও নয় বা পেতরুসভও নয়, যা' ওরা খামের ওপর লিখে থাকে। এই অনবধানটুকুর ঝামেলা আমাকে পোস্টাফিসে পোয়াতে হয়।'

প্যাকেটটা কোটের ভেতরে বগলের নীচে চালান করে নিঃশব্দে সামঘিনের আঙুল টিপে দিয়ে হাঁটা দেয়।

'একজন নেতা—"শিক্ষাদানকারী ভদ্রলোক"। অন্ধ হ'য়ে পড়াটা প্রতীক হিসাবেও বেশ মানিয়েছে।' সামঘিন ভাবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই ছোট-ছোট শান্ত বাড়িগুলো নজরে পড়ে। চাঁদের আলোয় ওরা যেন ধুয়ে মুছে তক্‌তকে হ'য়ে উঠেছে। দোতলা বাড়িগুলো বেশ শক্তসমর্থ, বাগান দিয়ে এমনভাবে ঘেরা যেন ফারের কোট পরে আছে। নীচের মাটিও নিশ্চয়ই শক্ত। রাস্তাগুলো খোয়া-বাঁধানো। ধুলো আর জোছনার পালিশ প'ড়ে চকচকে হ'য়েছে। পাশের পায়ে-চলার পথ দিয়ে ঘনীভূত ক্লান্তিকরতার এক বিশাল বাদামী ছোপ রাজকীয় মর্যাদায় ভেসে চলেছে—সুবেশা মহিলা একজন, নাবিক-জ্যাকেট আর ক্যাপ পরা একটা ছোট ছেলেকে হাত ধ'রে নিয়ে পথ হাঁটছে। পেছনে-পেছনে চেক্‌-স্যুট পরা একটা

কৌতূহলও শেষ। এক এক সময় মনে মনে হেসেও উঠত। নিজেকে মনে হতো 'বিপ্লবের অনুগত ভৃত্য'। লুবাশা সমভাকেও সে-রকমই মনে হতো, নিকনোভাকেও। কত লোকের সঙ্গে কত অদ্ভুত রকমের সাক্ষাৎ হয়েছে। তারই মধ্যে একটি ঘটনা বহুদিন স্মৃতিতে জেগে রইল।

একদিন সন্ধ্যে যখন ঘোর হয়েছে, হোটেলে একটা লোক এল ওর সঙ্গে দেখা করতে। লোকটি মাঝারি উচ্চতার, সটান খাড়া-হ'য়ে দাঁড়ান চেহারা, মাথাটা কিন্তু শরীর আন্দাজে অনেক বড় আর তাইতেই ওকে বেশ ছোটখাট দেখায়। চুলগুলো ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, সোজা শক্ত হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে আছে, মাথার বিশালতা যেন তাতে আরো অনেক বেড়ে গেছে। গোলগাল কামান মুখে দুটো গোল চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আছে। মোটা-মোটা ঠোঁট, ওপর-ওষ্ঠে খোঁচা খোঁচা গোঁফের শোভা, মনে হয় যেন নেহাৎ বিদ্বেষের বশেই গোঁফটাকে উঁচু ক'রে তুলে ধরা হয়েছে। গায়ে সাদা উর্দীর জ্যাকেট, হাইবুট, আর হাতে মোটা একটা লাঠি।

সার্মাঘনের কাছ থেকে চিঠি আর বইয়ের একটা ছোট বাণ্ডিল নিয়ে জিজ্ঞেস করল : 'এই নাকি সব?' বাণ্ডিলটি হাতে ধ'রে তার ওজন আন্দাজ ক'রে নেয়। মেঝের ওপর রেখে পা দিয়ে ডীভানের নীচে সরিয়ে দেয়। চিঠিটা ডান চোখের একেবারে কাছে ধ'রে পড়তে থাকে। পড়া শেষ হয়ে গেলে বলে :

'বাঁ-চোখটা দিয়ে একেবারেই দেখতে পাই না। বলেছে, সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে যাব। বড়জোর আর দু'বছর আছে আমার দৃষ্টিশক্তি, আর তারপর—অন্ধকারে তলিয়ে যাব।'

এমনভাবে বলে যেন অন্ধ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনায় ওর খুব গর্ব। মানুষটা যেন একটু কাঠ-কাঠ; সেপাইয়ের মতো ভাবসাব। চিঠিটাকে ভাঁজ ক'রে ক'রে ক্রমশঃ ছোট্ট ক'রে ফেলল। বেশ একটু বিস্তৃত হাসি হেসে বলে :

'ওরা আমাকে জানিয়েছে লিব্যারেলেরা নাকি কন্সটিটিউশন বানাবার জন্যে সোরগোল করছে। পুরোনো খবর। নিশ্চয়ই উকিল, অধ্যাপকেরাই।... বেশ, আমাদের জন্যে কিছু স্বাধীনতা ওরা না হয় নিয়েই এল।'

চিঠিটা খুলে ডান চোখ দিয়ে আবার খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখে, জেরা করার ভঙ্গীতে শুধায় : 'হ্যাঁ, ছাত্রদের কি খবর?'

সার্মাঘন বুঝে নিয়েছে সামনে যে দাঁড়িয়ে সে এক বিচিত্র টাইপ—এ ধরনের লোক দেখা যায় যথেষ্ট, ওরা একটুও প্রীতিকর নয়। লোকটার বেড়ে-ওঠা অন্ধত্বকে বাহবা দেবার ইচ্ছা সার্মাঘনের মোটেই নেই। যদিও তার বাঁ চোখটা বেশ ঘোলাটে, অদ্ভুতভাবে কেঁপে কেঁপেও উঠছে তবুও এই অবস্থার পেছনে কোন একটা উদ্দেশ্য থাকাটাও বিচিত্র নয়। হয়তো আরও বেশী ক'রে মৌলিক হ'য়ে পড়বার অছিলাই এটা। লোকটার প্রশ্নের উত্তর সার্মাঘন যথেষ্ট সাবধান হয়েই দেয়, গলার স্বরটাও কঠিন শোনায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লে :

'মোটের ওপর তরুণের দল ক্রমেই বেশ সীরিয়স হ'য়ে পড়ছে। অনেকেই তো রাজনীতি ত্যাগ ক'রে বিজ্ঞানের দিকে চলেছে।'

'ত্যাগ করা মানে? কি বলতে চান? ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেটা কোথায়?' অবাক হ'য়ে অতিথিটি জিজ্ঞেস করে : 'লোকে কি রাজনীতির জন্যে বিজ্ঞানের পাঠ নেয় না? জানি, ছাত্রদের এক-অংশে আজ রব উঠেছে : "আমাদের শিক্ষায় বাধা দিও না।" কিন্তু সেটা তো বোঝার ভুল। ইউনিভার্সিটির অর্থ কি জানেন? যেন একটা মিলিটারী ইস্কুল, বেসামরিক লোকদের শেখানো হচ্ছে কি ক'রে পদাতিক জনতাকে চালনা করতে হবে। এ-ও তো বিজ্ঞান, অবশ্য আরো নানা রকম সামরিক

জ্ঞানও দেওয়া হয়।'

বলতে বলতে ওর খোঁচা-খোঁচা ভুরু ক্রমশঃ ওপরের দিকে ওঠে অবাক হওয়ার ভঙ্গীতে। খোঁচাটা বিঁধল না দেখে সামঘিন অন্য কথা পাড়ল :

'আপনিও কি তাহ'লে মিলিটারী?'

'আমি ফিজিক্স এবং ম্যাথেমেটিক্‌সের ছাত্র ছিলাম। তারপর ১৪৪তম পসকভ রেজিমেণ্টে জওয়ান হলাম। কিন্তু চোখের দুর্বলতার জন্যে—এক কশাক একবার চাবুক দিয়ে ও-দুটোর মাথা খেয়ে দিয়েছিল—হ্যাঁ, সেই দোষে ফৌজের কাজ থেকে সরিয়ে দিল, পাঠাল এখানে বাস করতে, আমার নিজের শহরে,—তিন বছরের জন্যে, মুহূর্তের জন্যেও স্থানত্যাগ না ক'রে।'

দ্রুতকণ্ঠে কাহিনী বলা শেষ ক'রে শ্লেষের সুরে বলে :

'বোধহয় আপনিও ওই দয়ালু লোকদের একজন যারা লিব্যারেলদের বাঁ-হাত ধ'রে তাদেরকে ক্ষমতা পাইয়ে দিতে উদগ্রীব, আর তারপর তাদের ডান-হাত থেকে পায় মোক্ষম এক ঘুসী, ঠিক কানের ওপরটায়?'

বেশ অভদ্রভাবেই কথাটা বলে। হঠাৎ যেন ওর বয়স কমে গেছে ব'লে মনে হয়, যেন লড়াই করবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে তুলেছে। সামঘিন কিন্তু তার ধারকাছ দিয়েও গেল না :

'এখানেই আপনার জন্ম?'

'দুর্ভাগ্য আমার, তাই-ই বটে। কিন্তু মস্কোকেই—ইউনিভার্সিটিকে—প্রকৃত জন্মস্থান ব'লে ভাবি।'

'বড় একঘেয়ে এখানে, না?'

'আমার কোন একঘেয়েমিই লাগে নি তবে কিছু-কিছু অসুবিধা হ'য়েছে বই কি। চোদ্দ মাস সময়ের মধ্যে দু'বার সার্চ আর চুয়াত্তর দিন কয়েদ।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে রইল। দূর থেকে যেন সামঘিনকে যাচাই ক'রে দেখছে। তারপর বেশ মুরুব্বিয়ানার গলায় বলে :

'গোঘিন আর পয়ারকভকে বলবেন যেন আরো বেশী ক'রে লিটারেচার পাঠায়। আর বলবেন কমরেড দুনায়েভের এখানে আসাটা একান্ত জরুরী। সেই কাণ্ডজ্ঞান-হীন মেয়েটাকে যেন আমার কাছে আর না পাঠায়।

ডীভানের তল থেকে প্যাকেটটা টেনে বের ক'রে আবার সেটা হাতের তালুতে রেখে নাচায়। কঠিনস্বরে শেষ কথা ক'টি বলে :

'আর বলবেন, আমার নাম পেতর উসভ, রুসভও নয় বা পেতরুসভও নয়, যা ওরা খামের ওপর লিখে থাকে। এই অনবধানটুকুর ঝামেলা আমাকে পোস্টাফিসে পেতে হয়।'

প্যাকেটটা কোটের ভেতরে বগলের নীচে চালান করে নিঃশব্দে সামঘিনের আঙুল টিপে দিয়ে হাঁটা দেয়।

'একজন নেতা—"শিক্ষাদানকারী ভদ্রলোক"। অন্ধ হ'য়ে পড়াটা প্রতীক হিসাবেও বেশ মানিয়েছে।' সামঘিন ভাবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই ছোট-ছোট শান্ত বাড়িগুলো নজরে পড়ে। চাঁদের আলোয় ওরা যেন ধুয়ে মুছে তক্‌তকে হ'য়ে উঠেছে। দোতলা বাড়িগুলো বেশ শক্তসমর্থ, বাগান দিয়ে এমনভাবে ঘেরা যেন ফারের কোট পরে আছে। নীচের মাটিও নিশ্চয়ই শক্ত। রাস্তাগুলো খোয়া-বাঁধানো। ধুলো আর জোছনার পালিশ পড়ে চকচকে হ'য়েছে। পাশের পায়ে-চলার পথ দিয়ে ঘনীভূত ক্লান্তিকরতার এক বিশাল বাদামী ছোপ রাজকীয় মর্যাদায় ভেসে চলেছে—সুবেশা মহিলা একজন, নাবিক-জ্যাকেট আর ক্যাপ পরা একটা ছোট ছেলেকে হাত ধ'রে নিয়ে পথ হাঁটছে। পেছনে-পেছনে চেক্‌-সুট পরা একটা

সঙের মতো লোক, নাক টানছে আর সশব্দে রুমালে ঝাড়ছে। ছোট রুশ শহরের অতি-পরিচিত নিস্তব্ধতা। শুধু হোটেলের নীচ থেকে ভেসে-আসা বিলিয়ার্ড-বলের ঠোকাঠুকিই নীরবতাকে যা একটু ভেঙে দিচ্ছে। মনে হয়, শব্দটা বোধহয় পথের খোয়া থেকেই জাগছে,—নিছক একঘেয়েমির বিরক্তিতে ইঁটের টুকরোগুলোই হয়তো পরস্পর মাথা ঠুকছে।

এই শহরে যে লোকটা অন্ধ হ'তে বসেছে তার কথা সামঘিনের মনে হয়। নিজেকে এত অপরিচিত ঠেকে যেন বিদেশী। লোকটার জায়গায় যদি ও হতো—! সামঘিন থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে, যেন হঠাৎ হিম-ছোঁওয়া লাগে।

'তবুও মানতেই হবে যে, এরা সাহসী,' অনিচ্ছুক ভাবেই যেন সামঘিনকে মানতে হয়। 'তবে এই লোকটা, বলতে গেলে, ব্যক্তিগত স্বার্থেই বিপ্লবী হ'য়েছে।...কিন্তু ক্লান্তিকর একঘেয়েমি কাটিয়ে ওঠা ওদের পক্ষে বেশ মুস্কিল।'



যেদিন বাড়ি ফিরে এল সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই মিত্রোফানভ এসে হাজির। মুখের ওপর জোর ক'রে একটু হাসি টেনে বলল: 'বিদায় নিতে এলাম। কালুগাতে আমি বদলি হ'য়ে গেছি। কিন্তু—কেন তা জানি না। বুঝতেও পারছি না। হঠাৎ—' কথা বন্ধ ক'রে বসে রইল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অভ্যাসবশতঃ হাঁটুর ওপর মৃদু মৃদু চাপড় মারতে মারতে দুলে দুলে উঠল।

'সত্যি বড়ই বিশ্রী ঘটনা—আপনার সঙ্গ পেতে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলম,' সামঘিন আন্তরিক ভাবেই বলে ওঠে।

মিত্রোফানভের মুখের ওপর থেকে অপ্রস্তুতের হাসিটা কখন মিলিয়ে গেছে। গভীর নিশ্বাস ফেলে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। যথেষ্ট উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলে:

'আর আমি,—আশা করি এ-কথা বলার জন্যে আমায় মাপ করবেন—ক্লিম ইভানোভিচ, আমি আপনাকে সমস্ত প্রাণ মন দিয়েই ভালোবেসে ফেলেছি। আমার কাছে আপনি একজন, নিশ্চয়ই জানবেন, জ্ঞানীব্যক্তি আর, সাধারণভাবে বলতে গেলে, একজন মানুষের মতো মানুষ!

'কিন্তু হঠাৎ এ-রকম হলো কেন? কোন ত্রুটি হয়েছিল কি আপনার কাজে?'

পুলিশের চরটি আবার বিষাদে ডুবে যায়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে।

'ত্রুটি তো নয়ই বরঞ্চ—,' থমকে যায়: 'ভারভারা কিরিল্লোভনা ভেতরে নেই তো? বরঞ্চ—' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'লে: 'আমি বেশ সফলতাই অর্জন ক'রে-ছিলাম। দয়া দেখিয়ে চোরগুলোকে বেশ চটপট ধরে ফেলছিলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম ফরাসী শেখবার। বিরাট কোন চুরি-টুরি হ'লে চোরের সর্দারেরা প্যারীতেই গিয়ে থাকে তো।...কিন্তু নাঃ—এই ব্যাপারটায়—সবই ভাগ্যের ফের।'

আস্তে আস্তে উঠে জিজ্ঞেস করে:

'আপনার স্ত্রীকে তাঁর সদয় ব্যবহারের জন্য আমার হ'য়ে অনুগ্রহ ক'রে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাবেন। আর আপনাকে—জানি না কি ভাবে ধন্যবাদ দেব, আপনার—সহৃদয়তার জন্যে।...আরেঃ, আমি বলি একি অদ্ভুত ব্যাপার,'—বেশী জোরে না বললেও বেশ দুঃখের সঙ্গেই ব'লে ওঠে: 'লোকে আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে জানেন, কুকুরের মতো। কিন্তু আমরাও তো উপকারই করি। অনেকটা—

ডাক্তারদের মতোই আমাদের পেশা, বলতে পারেন!'

মিত্রোফানোভের গোল-গোল চোখ জলে ভরে আসে। যন্ত্রণাটা লুকোনোর জন্যেই যেন মুখ ঘোরায়। আর তারপর সাম্‌ঘিনের হাতটা তাড়াতাড়ি একবার মুহূর্তের জন্যে আঁকড়ে ধ'রে চলে যায়।

সাম্‌ঘিন ওর জন্য দুঃখিতই হয়। কিন্তু ওর কথা বেশী ভাববার মতো সময় কই।...আজকাল বিরক্তি জাগানর মতো কত কী-ই যে সব ঘটছে। দেখতে পায় তরুণের দল এখন সহজতর হ'য়েছে বটে, কিন্তু ঠিক ও যেমনটি চাইত তা' নয়। নতুন-নতুন লোকেরা ইস্কুল থেকে বেরিয়েই সাত-তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে সোস্যাল-ডেমোক্রাট বা সোস্যাল-রেভলিউশনিস্ট ব'লে ঘোষণা করছে। বিশ্রী লাগে ওর, ন্যক্কারজনক মনে হয়। এত অল্প-আয়াসেই ওরা সামাজিক সমস্যার সমাধান করছে। বিরক্তিকর!

মনে-মনে ভাবে: 'যত সব দুধের ছানা!'—এরা তো ওর থেকে কত ছোট,—ব্যবধানটা ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত। ওদেরকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তুলতে চায়, আবেগের উত্তাপটা কমিয়ে দিতে। কিন্তু কাজেকর্মে আসে তীব্র বাধা ওদেরি কাছ থেকে।.. ঠেকে শেখে যে এই দুধের-ছানাদের ভাবাবেগ অনেক বেশী, সামাজিক জ্ঞানের চর্চা ওর চেয়েও অনেক ব্যাপক।...

অনেকেই উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এ রকমই একজন—বছর বিশেকের এক সরল ছোকরা, পাঁকাল মাছের মতোই চালাকচতুর,—উ'চু কপাল আর উদ্ধত চোখ। ভারভারার সেক্রেটারী আর ইংরেজীর শিক্ষক সেজে তার চারপাশে ঘুর-ঘুর করে। একদিন সাম্‌ঘিন ওর সামনেই বলে ফেলল:

'বিপ্লবী তো সর্বপ্রথমে একজন সমাজকর্মীই বটে।'

তাই শুনে পাঁকাল মাছটি দে'তো-হাসি হেসে বলে:

'কিন্তু কোন্ সমাজের খাতিরে বিপ্লবীটি কাজ করেন? যে টি রয়েছে যদি তারি জন্যে হয়, অর্থাৎ শ্রেণীগত সমাজের জন্যে, তবে তিনি বিপ্লবী হয়েছেন কেন, প্রতিবিপ্লবী হলেই পারতেন?'

সাম্‌ঘিন কাটা-কাটা জবাব দেয়, প্রায় কঠোরভাবেই। কিন্তু ছোকরাও দমবার পাত্র নয়। কথাগুলো চুপচাপ শোনে, মন দিয়েই, কিন্তু তার পরেই কদম-ছাঁটা মাথাটা নাড়িয়ে বলে:

'না, যুক্তিগুলোয় তেমন জোর নেই।...আমাদের কাজ নতুনের সৃষ্টি, পুরাতনের মেরামত নয়।'

যুবকটির নাম ভ্ল্যাসভ। বাপের পরিচয় জানতে চাওয়ায় ভারভারাকে বলেছিল: 'আমি হচ্ছি ইতিবৃত্তের মতো—লেখক অজ্ঞাত। আমার যখন এগার বছর বয়েস, মা মারা গেলেন। বেড়ে উঠলাম আপনা-আপনি—ডিকেন্স মনে আছে? —সেই রকমই, মায়ের এক বান্ধবীর কাছে, এক মেয়ে-দরজী। সে-ও মারা গেছে গত বছর।'

সাম্‌ঘিন বিরক্ত না হয়ে পারে না। বিদেশে যে বিবাদ বেধেছে সেই কথায় ছেলেটা শুধু বলে ওঠে:

'এত সব কাণ্ডের গোপন তাৎপর্যটুকু কি জানেন, যুদ্ধ বেধেছে দুই দলে—এক দল হলো যারা মার্ক্সের মতো কথা বলে, আর দ্বিতীয় দল হলো যারা মার্ক্স-অনুযায়ী কাজ করতে চায়।'

শরীরে বেশ শক্তি আছে বলে মনে হয়, বেশ দৃঢ় পায়ে হাঁটে। তার কালো মুখে ছোট্ট কালো চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করে, সে-দু'টো যেন বিদ্রূপভরে পে'চিয়ে পে'চিয়ে বসান। কয়েক বার ঠোকাঠুকির পর সাম্‌ঘিন ভারভারাকে জিজ্ঞেস করে:

'এই খোকা-সিনিক্‌টিকে রেখেছ কেন?'

'বেশ কাজের,' ভারভারা জবাব দেয়। দাঁতের পাটি বের ক'রে বিশ্রী হাসি হাসে। বলে: 'কুমভ তো এই জগতের নয়। সে সর্বক্ষণ রয়েছে আত্মা নিয়ে। কিন্তু এ আবার ভৌতিক কিছুর ধারও ধারে না।'

কুমভ এমন একটা ফ্রক-কোট বানিয়ে এনেছে যার ডিজাইনটি খুবই মৌলিক, পেছন দিকে একটা আধা বেল্টও রয়েছে। ওটা পরে ওকে আরো লম্বা দেখায়। ভারভারাকে শান্ত গলায় বোঝায়:

'মানুষেব কাছে পৌঁছবার পথ মার্ক্স থেকে পাবেন না, পাবেন ফিখটে-র কাছ থেকে। বস্তুবাদ জনপ্রিয়তার বাইরে। বস্তুবাদ শুধু আত্মার হয়রানিই। জীবনের সৃজনধর্মী স্পৃহা শুধু আদর্শবাদেই প্রাপ্তব্য।'



ভারভারা সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে থাকত খুবই কম, আর থাকলেও ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত বহু লোক। নিজের কাজ করবার ঘরে বসেও সামঘিন স্বাচ্ছন্দ্য পেত না। কত রকম কণ্ঠস্বর ভেসে আসত—কত কবিতা আর গদ্যের আবৃত্তির কত অংশ, এত দূর থেকে শোনাত একই রকম। নিকনোভার ঘরটাকেই মনে হতো নিজের—সব স্বাচ্ছন্দ্য, সব আরাম সেখানেই। ওখানেও কিছু কিছু অসুবিধা যে না ছিল তা নয়। চশমা-চোখে বাড়িওয়ালাটাই তো এক মহা অসুবিধা। যেন সামঘিনের খোঁজেই ভদ্রলোক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন। সব সময়েই অঙ্গনে তাঁর দেখা পাওয়া যেত। চশমার নীচ থেকে তাঁর লাল-লাল চোখগুলোয় ঘৃণা ঝরত সামঘিনের দিকে। কেটে কেটে বলতেন:

'গেটটা বন্ধ ক'রে ল্যাচটা তুলে দেবেন। পা মুছে যেন ওঠা হয়, পর্চে ম্যাট রাখা হয়েছে সেইজন্যে।'

'আচ্ছা, আমাকে এত অপছন্দ করে কেন?'

'বুড়োরা বোধহয় কাউকেই দেখতে পারে না, শুধু সময়-সময় ভান করে।' নিকনোভা ভেবে-ভেবে জবাব দেয়।

ঘরটায় জায়গা কম। বাগান থকে ভ্যাপসা সারের গন্ধ এসে ঘরে ভরে দেয়। সরু খাট, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে। কতবার সামঘিন ওকে বলেছিল অন্য কোথাও উঠে যেতে।

কিন্তু শোনে নি। ঠাট্টা ক'রে বলেছে: 'আমার তো "প্রিয়র সাথে যদি তাঁবুও হয়, তবুও তাতে স্বর্গসুখ।"' ওর আত্মবঞ্চনা সামঘিনের কাছে বেকামিই মনে হয়েছে, কিন্তু আর ও-কথা তোলে নি।

ওদের বন্ধুত্বের বয়স এক বছর হলো। তবুও এখনো সামঘিনের কথা মন দিয়ে চুপচাপ শোনে। ক্লান্ত হয়ে ওঠে নি।

'"স্যাবাথ মানুষের জন্য, মানুষ স্যাবাথের জন্যে নয়,"' সামঘিন হয়তো বলে।

'নিজেকে উৎসর্গ করা না করা তো নিজের ওপর। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে চেতনার নির্ধারণ হয় বাস্তবের দ্বারা, তবু তা দিয়ে তো আর এ-কথা বলা যায় না যে চেতনা আর ইচ্ছার মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই।'

নিজেই বোঝে এই সব শুকিয়ে-ওঠা শতকুণ্ঠিত চিন্তা যথেষ্ট নয়। ভয়ও হয় মেয়েটা যদি এ-সব কথার সঠিক অর্থ ক'রে ওকে শ্রদ্ধা করা ছেড়ে দেয়।...কিন্তু

নিকনোভা ঘাড় নেরে সমবেদনা জানায়।

নিষিদ্ধ পার্টির মেম্বারদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্তার গল্প যখন সামঘিন করত তখন নিকনোভা এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলত যেন এ-সব কথা শোনার আশা ও করেনি। শুধু দার্শনিক আলোচনাই যেন ওর প্রত্যাশা। কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করে না—কোন লোক সম্পর্কে কোন প্রশ্নও তোলে না। একবার কিন্তু ওর ধৈর্যচ্যুতি হলো। সামঘিন যখন জানায় যে উসভ্ বলেছে 'কান্ড-জ্ঞানহীন' মেয়েটাকে তার কাছে যেন আর না পাঠান হয় তখন অধীর উত্তেজনায় নিকনোভা বলে ওঠে: 'কান্ড-জ্ঞানহীন?'

সামান্য বিরতির পর আবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কণ্ঠস্বর একেবারেই উদাসীন: 'কে হতে পারে?'

এত গোপনতা সামঘিনকে অবাক করে তুলেছিল, ভালও লাগে, মেয়েটার ওপর শ্রদ্ধা জাগে—মনে হয় লোকে যেমন কোন চাকরি বা ব্যবসা নিয়ে থাকে, নিকনোভার বিপ্লবের কাজে অভ্যস্ত হওয়াটাও বোধহয় তেমনি কোন ঘটনা। মস্কো শহরের নানা গোলকধাঁধা রাস্তা ঘুরে ঘুরে পোস্টম্যান যেমন চিঠি বিলি করতে করতে একদিন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, এ অভ্যাসও অনেকটা সেই জাতীয়ই। মেয়েটা কিন্তু তানিয়া কুলিকোভার মতো দুর্বল-মনা বা অপটু নয়। অথবা লুবাশার দলেও তাকে ফেলা যায় না। বিপ্লব যারা করে তাদেরকে বিপ্লবের চাইতেও উত্তেজক বা মূল্যবান মনে করে না ও লুবাশার মতো। বরঞ্চ ও যেন একটা রহস্য—নিপুণ-ভাবে প্লটটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মেয়েটি প্রায়ই মস্কো থেকে উধাও হয়ে যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। বহুবার এমন হয়েছে যে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে এসে সামঘিন দেখে ও নেই। বাড়িওয়ালার হাত থেকে কোন-না-কোন বন্ধ খাম পেয়েছে। মধ্যে হয়তো ছোট্ট স্বাক্ষরবিহীন লিপি: "আমি এক সপ্তাহ পরে আসব," বা হয়তো "অপেক্ষা করো না। দু'দিনের জন্যে যাচ্ছি।"

ওর ঘরের একটা ল্যাচ্-কি সামঘিনের কাছে আছে। এক সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঢুকে নিকনোভার অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছিল। চোখে পড়ল তরুণ লেখকের লেখা একটা বই। সেই লেখককে যেন ওর একটু অপছন্দই। বইটা নাড়তে নাড়তে সরু একফালি কাগজ বই থেকে পড়ে যায়। ফাঁকা কাগজ, ক্লিম এ্যাশট্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে। সিগারেট জ্বালিয়ে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটাও সেখানে ফেলে। কাগজের একপ্রান্ত গরম হয়ে উঠে প্রায় আগুন ধরছিল। সামঘিনের হঠাৎ চোখে পড়ে, আরে। কাগজটায় তো লেখা ফুটে উঠছে! এক ঝট্‌কায় সেটা তুলে নেয়।

পড়ে দেখল লেখা আছে: 'উসভ্।' মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে নিয়ে আর একটা দেশলাই জ্বেলে কাগজটাকে গরম করতে থাকে। এইবারে কাগজে ফুটে উঠল: "ফর্ম, ছাত্র, রাখো সামরিক শিক্ষ, সোফিয়া লুবাচেভা, নিয়োগ, হোটেল 'মস্কো,' ফর্ম, কাজ, ভিখ্‌সুনস্ক ফ্যাক্টরী আন্দ্রেই আন্দ্রেয়েভ।"

ঠিক তক্ষুণি নিকনোভা ফিরে এসে সামঘিনকে ওই অবস্থায় দেখে ফেলে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে সেটা ভেজিয়ে দেয়, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকে। বিবর্ণ মুখে কালো হয়ে-ওঠা চাখ দু'টো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলতে থাকে। কয়েকটা বিলম্বিত মুহূর্ত ভয়ানক অস্বস্তিতে কাটবার পর মৃদুকণ্ঠে থেমে-থেমে জিজ্ঞেস করে.

'কি, করছ কী? কেন?'

বোঝা যায় উত্তেজনার মধ্যে ভীতিও আছে। এত তীব্র সেটা যে সামঘিন ঘটনাটা বুঝিয়ে বলে ক্ষমা চেয়ে নেবার পরেও অনেকক্ষণ ও স্বাভাবিক হতে পারে না।

বার-বার প্রশ্ন করে : 'কিন্তু কাগজটা ডেভেলপ করলে কেন ?' সামঘিনের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সকরুণ সে-দৃষ্টি। 'দেখলে যে কিছু লেখা আছে। বাস্, ও-ভাবেই রেখে দেওয়া উচিত ছিল। তা নয়, ডেভেলপ আরম্ভ করলে। কেন ?'

একই কথা বার বার জিজ্ঞেস করায় সামঘিন চটে ওঠে। শুকেন কাটা-কাটা কথায় বলে :

'ক্ষমা তো চাইলাম, নেহাৎই যন্ত্রের মতো কাজটা ক'রে গেছি, বোধহয় একঘেয়ে লাগছিল, সেইজন্যেই। তোমার নিজের অসাবধানতার জন্যেই তো এখন ভয় পাচ্ছ, আর আমার ওপর অকারণেই রাগ করছ।'

এতক্ষণে এই কথাগুলো শুনে শান্ত হলো। সামঘিনের কোলে বসে স্নেহভরে গালে হাত বুলিয়ে দেয়, কোমল কণ্ঠে বলে :

'না, রাগ করিনি।' হেসে-হেসে আরো জানায় : 'বুঝতে পারছি না কেন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।'



সেই সন্ধ্যায় ওর ওপর নিকনোভার মায়া-দয়া যেন অনেক বেড়ে গেল। অদ্ভুত বিষণ্ণতাও ছিল তার মধ্যে। সামঘিন কিছু দিন হলো বার-বার অনুভব করেছে যে জীবনের প্রতি নিকনোভার যে সমর্পণ, কাঁধে তুলে নেওয়া কর্তব্যের প্রতি ওর যে অবাধ অনুরাগ, সেগুলো যেন ওর মনেও বিস্তার লাভ করছে, ওর মধ্যেও সংক্রামিত হচ্ছে। কিন্তু এখন ওর মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে যা এর আগে আর কখনো লক্ষ্য করে নি। এই বৈশিষ্ট্য মেয়েটিকে নেখায়েভার সমপর্যায়ে এনে ফেলেছে : নেখায়েভার মতোই ও-ও দূর থেকে মানুষকে দেখে নিতে পারে, তাদের ছোট-ছোট স্ববিরোধ ধরে ফেলে।

'শুনেছ কি, শেড্রিন নাকি মৃত্যুশয্যাতে ক্রনস্টাড্টের ইভানকে স্মরণ করেছিলেন ?' সামঘিনকে জিজ্ঞেস করে। নানা কাহিনী শোনায়, লেভ তলস্তয়ের কত গল্প, যেগুলোতে আত্মপ্রেমী ব্যক্তি বলেই মনে হয়, ভঙ্গীতে সুদক্ষ। মোটের ওপর জীবিত বা মৃত বিখ্যাত ব্যক্তিদের নানা কুৎসা-কাহিনী ওর জানা। কিন্তু মনের ভেতর কোনো ব্যঙ্গবিদ্বেষ না রেখে নিতান্ত সাদা কথাতেই সে-সব কাহিনী বলে; উদাস সুরে. এমন এক দুনিয়াদারী ভঙ্গীতে, যে-দুনিয়ায় যা কিছু নীচ-নয় তাতেই যেন সন্দেহ আর অবিশ্বাস. নীচুতাই যেন স্বাভাবিক, মানুষকে যথার্থ বোঝবার একমাত্র মাধ্যম। এই সব গল্পকাহিনী ওর মুখের অন্য সব সরল কাহিনী, —সাধারণ মানুষের জীবন-নাটকের কথার সঙ্গে কিন্তু বেশ মিলেমিশে খাপ খেয়ে আছে। সম্পূর্ণ যে ছবিটা ফুটে ওঠে তার মধ্যে নায়কও নেই, দাসও নেই, আছে শুধু সাধারণ মানুষ।

'খুব ভাল ক'রে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে,' ওর মুখের কাহিনী শুনতে শুনতে সামঘিন ভাবে। এই কাহিনীগুলোর ওপর ওর মোহ বোধহয় সেই শিক্ষারই অঙ্গ। পুরানো দুনিয়ার ওপর বিপ্লবীদের ঘৃণার অভিব্যক্তিই বোধহয়। ঘৃণাটাকে সামঘিনের মনে হয় গোয়ার্তুমী, কিন্তু তর্ক তোলে না। মানুষের ওপর ওর নিজের যে ধারণা তার সঙ্গে তো এর বেশ মিলই আছে। বিশেষতঃ নেতৃবৃন্দের প্রতি ওর যা মনোভাব তার সঙ্গে "জীবনের শিক্ষক"দের প্রতি, "শিক্ষাদানকারী

ভদ্রলোকেদের" প্রতি মনোভাবে মিল আছে।

সামঘিন বোঝে ভ্রাস্তভ বা উস্ভের মতো কঠোর চিন্তা-ধারণার তরুণদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য পক্ষের লোকও যথেষ্ট পরিস্ফুট হয়ে পড়ছে—যাদের কাছে বলশেভিষ্টদের বিপ্লববাদ সম্পূর্ণভাবে ঘৃণ্য। সামঘিন নিজেকে এদের এক জন মনে করে না, কিন্তু বোঝে তাদের সঙ্গে একটা অস্পষ্ট মিল যেন কোথায় লুকিয়ে রয়েছে। নিকনোভার সামনে এমনভাবে কথা বলে যেন নিজে-নিজেই চিন্তা করছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বা এক খণ্ড সাদা কাগজের ওপরে ঝুকে পড়ে :

'সন্দেহ নেই যে লেনিনের শিষ্যরা বিপ্লব সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার মধ্যে স্পষ্টতা নিয়ে আসছে। শ্রমিক-আন্দোলনের কিছু কিছু সমর্থকদের মনে এই স্পষ্টতার ফল হবে অতি উত্তম, কারণ তাদের অনেকেই সমর্থনের কারণটাই বোঝে না অথবা সমর্থন তাদেরকে কতদূর নিয়ে যেতে পারে সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। লেনিন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে বিপ্লবের আদর্শকে উন্মুক্ত করতে হবে, এত তীক্ষ্ণ ক'রে তুলতে হবে যে যা-কিছুই তার বিরোধী তাদের সকলকেই পরাভূত করার ক্ষমতা যেন তার হয়। স্তেপান কুতুজভের সঙ্গে তোমার কোন দিন দেখা হয়েছে?'

'কোন দিন না,' নিকনোভা বলে। ভুরু দুটো কুঁচকে তোলে. ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়ে অস্বীকৃতি জানায়।

কুতুজভ সম্বন্ধে সামঘিন ওকে জানায়. বিপ্লবীদের ও যে শ্রেণীবিভাগ করেছে সে-সম্বন্ধেও। নানা কথার জাল বুনে যায় এ-ভাবে; জীবনে সুরক্ষিত আসন খুঁজে নেবার ততটা আগ্রহ নেই যতটা জীবনের অভিরুচির কাছে নিজেকে যথাসম্ভব অহিংসভাবে সমর্পণ ক'রে দেবার। যে-সব লোকের মধ্যে নিজের সামান্য প্রতিচ্ছবি ও খুঁজে পায় বা সন্দেহ করে, তাদের সঙ্গ ক্রমশঃ এড়িয়ে চলে! ঘৃণা হয় তাদের ওপর. বোধহয় এইজন্যেই পাছে তারা ওর স্বরূপটা বুঝে ফেলে।



সেবারে শীতকালে লিউতভের সঙ্গে সামঘিনের একটা বড্ড অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকার ঘটে গেল। পদোল্স্কে পৌঁছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর এক হোটেল-কামরায় বসে চা খাচ্ছিল। মনটা নিবদ্ধ কোন এক অগ্নিকাণ্ডের সরকারী তদন্ত-রিপোর্টে। জানালা দিয়ে দেখা যায় তুষারের ঘন-মসলিন চাদরটা নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ করিডরে দরজার পাল্লা দড়াম ক'রে শব্দ ক'রে উঠল। মেঝের ওপর কিচকিচ আওয়াজ তুলে সামঘিনের কামরার চৌকাঠে এসে দাঁড়ায় পালক-আর লোমের ব্যবসায়ীটি, অভিবাদনের মত কি দুর্বোধ্য স্বরে উচ্চারণও করে। লিউতভের পরনে চিত্রবিচিত্র মার্মটের জ্যাকেট। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠে-আসা ফেল্ট-বুট। পা দু'টো বেশ ফাঁক ক'রে চেয়ারে বসে। বাজখাঁই গলাটাকে যথাসাধ্য কোমল করার চেষ্টা ক'রে জানায় যে একটা ঘোড়া কিনতে এসেছে সে।

'অতি-সুন্দর ঘোড়া। আলেনার জন্যে।'

সাদা শার্ট গায়ে কোঁকড়া-চুলের এক ছোকরা হাসি-হাসি মুখে ঘরে ঢোকে। তার হাতে বাদামী রঙের সোনা-সোনা ভদ্‌কার বোতল আর এক প্লেট ভিজান আপেল। দেবদূত মার্কা হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে, আরো কিছু চাই কি?

'পালা, বেটা!' লিউতভ হুকুম দিয়ে ওঠে।

আগের চেয়ে কদাকার চেহারা। এলোমেলো চুল পাতলা হয়ে পড়ায় শক্ত খুলির অনেকটাই নিরাবরণ। টাকের অংশ কপালের সীমানা বাড়িয়েছে, চোখের কোটরকে আঁটো ক'রে তোলায় সে-দুটো এখন আরো ছোট আর তীক্ষ্ম। সাদা-সাদা অংশগুলোয় যেন পারার মতো ধাতব-ঔজ্জ্বল্য, লাল-লাল সূক্ষ্ম শিরায় ছেয়ে গিয়েছে। মণি দুটো সুস্পষ্ট আকৃতি হারিয়ে ঝাপসা, আগের চাইতেও যেন অনেক বেশী বেয়াড়া। চোখের নীচে নীল-নীল ফোলা-ফোলা থলি। নাকটা মোটা, হাঁমুখের আরো কাছে এসে ঝুলে পড়েছে।...লোকটার সব কিছুই যেন উচ্ছৃঙ্খল-বেয়াদপ, টেনে-হিঁচড়ে রাখা হয়েছে। যেন দাড়ি আর গোঁফের কয়েক-গোছা চুল ইচ্ছা ক'রেই না-কেটে রেখেছে যাতে মুখের বিশ্রী কদর্যতা আরো চোখে পড়ে। চেয়ারে দুলতে-দুলতে ঢিলেঢালা হাড়গুলো কটকট ক'রে ওঠে। ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করে :

'আলেনার কাছে আর আসছ না যে? বৌ কড়া? না, নীতির খোঁচা?'

বিরক্ত হয়ে ওঠে সামঘিন। ভারী অভদ্র তো। বলা নেই কওয়া নেই এলেন নাক গলাতে। বলে, না, কাজকর্ম নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। কিন্তু লিউতভের সেদিকে কান নেই। গেলাশের পর গেলাশ ভরছে আর হলদে-হলদে খুদে দাঁত বের ক'রে তামাশা ওড়াচ্ছে :

'নীতিবাদী। য়্যাঁ?—হিঃ হিঃ! বেশ বেশ, ব্যবসাটা মন্দ নয়!.. এস, নীতিবান মশায়, কিছু গেলা যাক।. বুঝলে, দোস্ত, লোককে বোঝান খুব সোজা যে তারা কিস্যু না, তাদের জীবন কিস্যু না। বেশ সহজেই এ-সব কথা আবার তারা বিশ্বাসও করে, কে জানে কেন! আর বিশ্বাস করে বলেই তো তুমি আর তোমার মতো লোকেরা সাধু সেজে থাকতে পার।. .না, না, রাগ ক'রো না হে,' সামঘিনের হাঁটুতে থাপ্পড় কষিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। 'আরেঃ, এ-সব বলি কেন জান না, ঠাট্টা-টাট্টা যাতে অভ্যেস থাকে। নইলে বল তো বন্ধু, আমোদ কিনব কি ক'রে নিজের জন্যে, ঠাট্টা-তামাশা-ই যদি ভুলে গেলাম?'

মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে বাঁচোখ মারে, ফিস্‌ফিসিয়ে বলে :

'"আমরা জীবন পেয়েছি মিথ্যে বলার জন্যে।" কথাটা কেমন মনে হয়? অন্ততঃ বিদ্রূপ হিসাবেও?'

'বাজে,' ক্লিম মন্তব্য ছোঁড়ে।

'নৃশংস!' সায় দেয় লিউতভ।

সামঘিনের অনেক সময় মনে হয়েছে যে এই বাঁকা-বাঁকা লোকটা অনেকের চাইতেও বোধ হয় ভাল করেই বোঝে। ইচ্ছা ক'রেই বোধহয় ওকে রাগিয়ে তোলে বা জ্বালায়, যেন কোন গোপন জ্বালাতনের খেলা খেলছে।

'অতি চালাক, পাজী, যদিও অসুস্থ। ওর সত্যিকারের চিন্তাভাবনাগুলো কখন প্রকাশ করে, যেগুলোতে ও বিশ্বাস করে? এখন বোধহয় মাতাল হয়ে নিজের অনেক কথা বলে ফেলবে, যা আগে কক্ষণো বলে নি।'

লিউতভ আরো খানিকটা গিলল। একটা আপেল তুলে নিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে সেটা নেড়ে-চেড়ে দেখে আবার প্লেটে রেখে দিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিস দিয়ে উঠল।

'পান কর না হ!' অনুনয় করে : 'সঙ্গী যখন মাতাল হয়ে পড়ে তখন সাদা-চোখে থাকাটা তো অভদ্রতা।...এস, পান করা যাক, ধর, সেই সব নারীর উদ্দেশ্যে যারা স্বামী-নামক পশুদের কাছে তাদের সৌন্দর্য বিকিয়ে দেয়।'

বেশ নাটুকে ঘোষণা, এমনকি হাতও নাড়ায়। কিন্তু মুখ দেখে সঙ্গে সঙ্গে

বোঝা গেল, কথাগুলো কত মিথ্যে। মুখটা নরম হয়ে ঝুলে পড়েছে। পারার মতো চোখ দু'টো আর কাঁপছে না। মদ খাওয়ার টোস্টটা যেন ওকে ভয়ের মশালে পুড়িয়ে দিল।

'আমি শুধু না-জেনেই বিড়বিড় করছিলাম,' ক্যেণের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট-স্বরে বলে ওঠে : 'ওটা হচ্ছে মাকারভের কথা শুনে-শুনে বলা—নচ্ছার বেটা! হিঃ হিঃ!'

দু'হাত দিয়ে সামঘিনের বাহু জড়িয়ে ধরে। কব্জীতে আর কনুইয়ে। ওকে নিজের দিকে টানতে টানতে চাপা গলায় বলে :

'ওহে আমার ইন্সিওরেন্সের প্রচণ্ড আইনজ্ঞ—এই নাও, তোমার জন্যে একটা হাসির কথা : সব হিংস্র চিন্তার মধ্যেই কোনো না কোনো সত্যের কণা লুকিয়ে আছে! পাইলেট বেটা নীরেট, জানা উচিত ছিল যে সত্য হচ্ছে শয়তানের খেল্! আমাদের সব সত্যই তো সেখান থেকে উদ্ভূত। আর সব মাথাওয়ালা লোকদের নির্বোধ আব সশঙ্ক অনিদ্রারোগের ও-ই তো প্রথম হেতু।...তোমারও কি ঘুম হয় না বন্ধু?'

'দস্তয়েভ্স্কির পাগলাগারদে তোমার স্থান, লিউতভ,' সামঘিন খুশী হ'য়েই ব'লে ওঠে।

'নাঃ। সত্যি?' লিউতভের চিঁ-চিঁ সুর।

'তোমার চিকিৎসা দরকার '

'তাই নাকি? দস্তয়েভ্স্কি থেকে বললে না? যাক্, তা'হলে এমন কিছু খারাপ না। মিখাইল শেড্রিনের পাগলা-গারদও তো আছে...'

'কী যা-তা বল? এইসব—বিকৃতি কেন? এর সঙ্গে শেড্রিনের কি সম্বন্ধ?' সামঘিন জোরগলায় কৈফিয়ৎ তলব করে। রাগ চাপতে পারে না।

'কেন, বোঝ না?' লিউতভ অবাক হবার ভান করে। 'আঃ, তুমি দেখছি নিতান্তই ন্যাচারালিষ্ট! কিন্তু, কেউ যদি ভাল সাজপোশাক করে, অন্ততঃ আত্মগৌরবের জন্যেও, তা-ও কি করতে পারবে না নাকি? দস্তয়েভ্স্কির কষ্ট-করুণ ছিন্নবেশ-ও তোমার ওই মিখাইল শেড্রিনের দাগ-ধরা ড্রেসিং-গাউন বা ফ্যাশানদুরস্ত জ্যাকেটের চাইতে লোককে অনেক ভাল মানায়। এখন বুঝলে? হিঃ-হিঃ।'

মুখ টিপে টিপে হাসে আর চোখ পিট্‌পিট্ করে। সামঘিন সঠিক মুহূর্তের প্রতীক্ষায় থাকে যখন এই ঈর্ষাভরা প্রলাপ বন্ধ ক'রে দেবে। মনের মধ্যে কঠিন-কাঠন কালো কথার ভীড় এসে জমে। ভাবে :

'এমন ঝগড়া করব ওর সঙ্গে। চিরদিনের জন্যে।'

লিউতভ কিন্তু আরেক পাত্র ভদ্‌কা গিলে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে পড়ে। আগের চেয়ে অনেক শান্ত গলায় বলে :

'স্বৈরতন্ত্রের ঘাড়ে সোস্যালিস্ট-রেভলুশনিস্টরা বেশ ভাল মতন রদ্দা মারছে, কি বল?'

সামঘিনের হাত সরিয়ে তার গেলাসটা ও ভরে দেয়, বলে :

'"পাপীদের দন্তোৎপাটন করিব", জেহোভা শাসিয়েছিল, আর বহুরাজ্য ধ্বংস করেছিল। তোমার কি মত? দু'টো পার্টির মধ্যে কে আগে কনস্টিট্যুশন আনতে পারবে?'

'এ-সব আলোচনার জায়গা কি আর এটা,' সামঘিন ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মন্তব্য ক'রে ওঠে। ওর হঠাৎ-গাম্ভীর্যে ও হক্‌চাকিয়ে গেছে।

'না, আস্তে আস্তে করব তাতে কি,' লিউতভ বলে : 'তাছাড়া এখানে কে আর জানে কনস্টিট্যুশর-ই বা কি, কোন্ ডিশের সঙ্গেই বা খাবে? এখানে কারইবা

ওতে দরকার? শুনেছ, সেন্ট-পীতর্সবুর্গে কিছু সংখ্যক খ্রীস্তি, এ্যানার্কো-থিওলজিয়ান,—মানে ঠিক আমাদের ঈশ্বরের শয়তানগুলো না—কোন এক ধরনের সিজারো-পাপিজম্ প্রচার করছে? অদ্ভুত ব্যাপার, বুঝলে।' সামঘিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বলে : 'ভয়ানক দূরদর্শিতার লক্ষণ। যাজকেরা, খাঁটি রুশ রক্তের মানুষ তো, তারাও নিশ্চয়ই তাদের কথা বলবে। সে সময় তো এসেছে আর তুমি দেখে নিয়ো—আরও অনেক কিছুই বলবে!'

সামঘিনের দিকে আরও ঝুঁকে প'ড়ে ওর চোখেমুখে গরম নিঃশ্বাসের ঝাপ্টা দিয়ে লিউতভ হিস্‌হিসে গলায় বলে :

'এ্যান্টি-স্যোসালিস্ট শক্তির সংগঠন হচ্ছে—বুঝলে?'

দু'এক মিনিট পরেই সামঘিন বুঝতে পারে যে এতক্ষণ ধরে লোকটা শুধুই মাতলামির ভান ক'রে পড়েছিল। মহাচালাক ব্যাটা। একটুও মাতাল হয়নি, জ্ঞান-ট্যান পুরো মাত্রাতেই ছিল. রাজনীতি নিয়ে এখন যে আলোচনা শুরু করেছে তার কারণ ওর নিজের মতামত জাহির করা নয়. সামঘিনেরটা খুব্‌লে বের ক'রে নিতে চায়।

'লেনিন পরিষ্কারভাবে জুবাতভিজমের অর্থ করেছিলেন, সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন যে রুশদের পক্ষে প্রয়োজন এক জন নেতার। তাই না?' লিউতভ মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে।

'বেশ তো. তাতে কি হলো?' ক্লিম মুখ টিপে বলে, মদের ঘোর লাগতে শুরু হয়েছে।

'কিন্তু কোন ধরনের নেতা? বেবেল, না, সান ইয়াৎসেন? কোনটা? টমাস্ মুনৎজার না সান ইয়াৎসেন? য়্যাঁ?'

সামঘিনের মনে হয় লিউতভ আর ও যেন লড়ুয়ে মোরগ, পরস্পরের দিকে কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে আছে।

'তুমি ভাল অভিনেতা নও হে,' বলতে বলতে সামঘিন জানালার দিকে এগিয়ে যায়। একটু হাওয়ার দরকার, ওপরের ছোট ঘুলঘুলিটা টেনে খুলতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখতে পায় ঘন তুষারের ধূসর স্তূপ দুলে দুলে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন একটা কাপড় ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ছিঁড়ে পড়ছে। হোটেলে ঢুকবার রাস্তায় ছোট্ট ল্যাম্পের বাতিটা তুষারের মধ্যে ঝুলে রয়েছে, তেমনিই হিম শীতল। সামঘিনের পেছনে দাঁড়িয়ে লিউতভ বিড়বিড় করছিল :

'ওরা আদর্শবাদীর ভান করছে—আর এই ছলনাই এদের ধ্বংস করছে। জুডার পুত্র ওনানও তো আদর্শবাদী ছিল।'

সামঘিন ভিজে হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়, হাওয়াটা আপাতঃ দৃষ্টিতে কিন্তু উষ্ণই। তুষারের খস্‌খস্ শব্দ শোনে, কত রকম স্বর এবং শব্দের প্রক্ষেপ যেন ওখানে।... পেছনে একটা গোলমালের শব্দ। লিউতভ উঠ্‌তে গিয়ে আপেল বোঝাই প্লেটটায় হাত দিয়ে ফেলেছে। মেঝের ওপর ধপাধপ্ দু'তিনটে আপেল পড়ে গেছে। 'আমি শুতে যাচ্ছি,' লিউতভ পায়ের ওপর. একটুও না ট'লে সটান খাড়া হ'য়ে ঘোষণা করে। চিবুকটা মুছে দাঁত বের ক'রে বলে : 'তুমি কি—আমার সঙ্গে আসবে ঘোড়া যাচাই করতে কাল?

সামঘিন অস্বীকার করে। ঘোড়াটোড়া দেখতে যাবে না ও। লিউতভ চলে যায়। শুভরাত্রি বলবার ভদ্রতাটুকুও দেখায় না।

*

জানলায় দাঁড়িয়ে ক্লিমের মনে হয় যে শব্দের একটাই অর্থ—বিরোধ-বৈসাদৃশ্য দূর করা, মানুষ আর বাস্তবতার মাঝে যে অতল-খাদ আছে সেটা ভরে তোলা। মনে পড়ল ভ্যাসতভ আর কুমভের কথা কাটাকাটি।

'রহস্য?' ভ্যাসতভ জিজ্ঞেস করেছিল কুমভকে আপাদমস্তক শ্লেষ-ভরা দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে। 'অপরিজ্ঞাত, বললেন না? যদি কথার কারচুপি করার উৎসাহ থাকত তো বলতাম যে অপরিজ্ঞাতই যদি হয় তার মানে বিজ্ঞান তাকে তো সেই ভাবেই জেনে ফেলেছে। কিন্তু কারচুপি হচ্ছে আদর্শবাদীদের পেশা। বিজ্ঞান যদিও দ্যুবয়রেমণ্ডদের মানে না, তবুও অপরিজ্ঞাতের কথাও তারা জানে না, জানে শুধু অজানার কাহিনী। আপনি যে জ্ঞানের কথা বলছেন আমার কাছে তা' শুধু কথার তুচ্ছতা। বিজ্ঞানজাত অভিজ্ঞতার সামগ্রী থেকেই জন্ম হয় সত্যমূল্যের। আদর্শবাদীদের সৃষ্টি হ'তে যা উৎপন্ন সে তো অচল মুদ্রা।'

সজোরে জানালার ঘুলঘুলি বন্ধ ক'রে দেয় সামঘিন। ভ্যাসতভের কথা মনে পড়ায় বিরক্তি আনেক বাড়ে, লিউতভের সঙ্গে কথাবার্তাতেও এত বিরক্তি ধরেনি। হ্যাঁ, এই ভ্যাসতভেরা পিল্‌পিল্‌ ক'রে জন্ম নিচ্ছে, সংখ্যায় বাড়ছে, ওর দিকে এমন-চোখে তাকিয়ে থাকছে যেন এই জগতে ও অপ্রয়োজনীয়ই। অনুভব করে কত দ্রুতই না ওরা তাকে ঠেলে দিচ্ছে কোনো এক ধারে, একটা কোণের দিকে—পূর্বতন ভূমিকা থেকে রাশভারী তথ্যজ্ঞানী মানুষের স্থান হ'তে, যে-স্থানটায় থেকে ও নিজের অস্মিতাকে তুষ্ট ক'রে তুলত। ভ্যাসতভের ঔদ্ধত্যে মন বিষিয়ে ওঠে। ভারভারার প্রিয়-উক্তি 'অবক্ষয়ীরাও তো বিপ্লবী' শুনে সে বলেছিল:

'ওটা মানা যেতে পারে। পচনের রাসায়নিক প্রক্রিয়াও বিপ্লবী ক্রিয়া। "অবক্ষরী-চারুকলা" যে বুর্জোয়া সমাজের পচনের অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ তা' দেখেই তো বোঝা যায় যে অবশেষে এই-সব "বৃশ্চিক" বা "আঁশ" বা ওই-ধরনের আরো-সব আমাদেরই ঘানিতে জল ঢালছে।'

সামঘিন ভাবে: 'কি বিশ্রী, ছোট মন!' ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে পচা আপেলে পা পড়ে, পিছলে যায়। হঠাৎ নিজেকে বড় দুর্বল মনে হয়, মাথার ওপর যেন কোনো ভারী ও নরম জিনিসের চোট লেগেছে। ঘরের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে, মুখটায় খুঁতহীন ভেঙচি কেটে, চশমার তল থেকে থে'ৎলে-যাওয়া আপেলটার দিকে চেয়ে থাকে, চেয়ে থাকে নোংরা জুতোটার দিকেও। মন কিন্তু যন্ত্রের মতন নির্মম-ভাবেই নানা স্মর্তব্য-উক্তির সন্ধান ক'রে ফেরে:

'মৃত্যুর জন্য চিহ্নিত করা উচিত মিনিস্টারদের নয়, কিন্তু তথা-কথিত রুচিশীল ও মননসম্পন্ন লোকদের কুসংস্কারকেই,' কুমভ বলেছিল, বুকের ওপর হাত চেপে রেখে আর অপ্রস্তুত হাসি টেনে এনে। এ ছাড়া তাতিয়ানা গোঘিনারও একটা কথা মনে এল:

'ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশের ইতিহাস একটা অবিচ্ছিন্ন কথোপকথন, যার মাঝে-মাঝে রিভলভারের গুলী আর বোমা ফাটানর ক্ষণিক বাধা আছে।'

জেলে কয়েকমাস বন্দী থাকবার পর ওকে ভিয়াত্‌কা প্রদেশের এক ছোট শহরে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। যাবার আগে ওর সাজপোশাক অনেক ভদ্র হ'য়ে উঠেছিল। দীর্ঘচুল কেটে ছোট ক'রে ফেলেছিল, গর্ব ক'রে বলেছিল: 'এখন আমি পুরোপুরি বিপ্লবী-শপথ নিয়েছি।'

সামঘিন ব'সে পড়ে। প্যাচ্‌পেচে নোংরা জুতোটা ধ'রে টানাটানি করে, ভয় হাতটাও আবার নোংবা না হ'য়ে যায়। এই দুঃসহ অবস্থা কুতুজভকে মনে করিয়ে দেয়। পায়ের থেকে জুতোটা খুলে আসতে অস্বীকার করছে, যেন বড় হ'য়ে গজিয়েছে। ঘরেব মধ্যে টক্‌-টক্‌ গন্ধ বেড়ে উঠেছে। বেশ রাত হ'য়েছে। মেঝেটা সাফ্‌ ক'রে দেবার জন্যে ওয়েটারকেও এখন ডাকতে চায় না। কারও সংগে দেখা হবার ইচ্ছে করছে না, তা সে যেই হোক।

'আর এই হচ্ছে জীবন?' মনে-মনে আওড়ায়। ঝুঁকে ব'সে পা নিয়ে পড়েছে। আঙুলগুলো চট্‌চটে হ'য়ে উঠল। সেইদিকে তাকিয়ে ও যেন নিস্পিষ্ট দিয়োমিদভকে দেখতে পেল, শুনতে পেল তার চিৎকার :

'সব্বাইকে স্থান দিতে হবে!'



"নির্দোষ" খে'কশিয়ালটা ঠিক তার "স্থান" খুঁজে পেয়েছে। "মিতাচার" শিখিয়ে জীবনধারণ করছে। দশ-বিশজন চেনে জানে, তার কথা শুনতে আসে,— শতেক লোক হওয়াও বিচিত্র নয়।...শরৎকালে ভারভারা আর কুমভ অনেক ব'লে-ক'য়ে সামঘিনকে রাজী করাল, একদিন গিয়ে দিয়োমিদভের বাণী-প্রচার দেখে আসবে। গেলও এক বেশ উষ্ণ সন্ধ্যায়। সামঘিন ওর দেখা পেল কাঠের দোতলা এক বাড়ির পশ্চাৎ-অঙ্গনে। বাড়িটা ছোট্ট একটু গড়ানো জমির ওপরে দাঁড়িয়ে,—ঢালু চাল, খান দুয়েক জানালা, নতুন চিমনিটা এখনো কালিঝুলিতে ভরে ওঠেনি। নড় বড়ে কুটীরটা লম্বা এক গুদামঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। গুদামটা বয়সে পাণ্ডুর, সামান্য হেলান-গোছের, যেন হয় গড়ানো জমিটাকে সুনিবিড় আশ্রয় দিচ্ছে নয় তো তারি ওপর পতনের আয়োজন করছে। দিয়োমিদভের ঝুঁকে-পড়া আস্তানাটা নতুন, দুটো থামের ওপর ভর, আলসে-ওয়ালা ছাদ আর আর তারি নীচে নীল-ত্রিভুজ আঁকা। ত্রিভুজটার মাঝখানে সাদা একটা কবুতর, যার চেহারাটায় মুরগীর সাদৃশ্যই বেশী।

জমি থেকে তিন ধাপ উঁচুতে একখানা চেয়ারে বসে আছে দিয়োমিদভ। পায়ে ঝকঝকে লম্বা বুট,—প্রান্তটায় কুঁচকে উঠেছে—গায়ে লম্বা সাদা শার্ট। লম্বা-লম্বা চুল, হলুদ মুখ আর খ্রীষ্টের মতো দাড়িতে তাকে যেন কেসে-ভরা আইকন মনে হাচ্ছে। তার সামনে, ওই নোংরা উঠানে ব'সে আর দাঁড়িয়ে কালো-ধূসর অনেক মনুষ্যমূর্তি। তাদের দিকে ঝুঁকে, ডান-হাত দিয়ে বাতাস ঘুলিয়ে আর বাঁ-হাতে নিজের হাঁটু চাপড়ে, দিয়োমিদভ বলছিল :

'ড্যানের বংশের একজন, নাম ম্যানোই, তার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা। দেবদূত এলেন; বন্ধ্যা-স্ত্রীলোকটি অন্তঃস্বত্ত্বা হলো, জন্ম দিল স্যামসনের। স্যামসনের প্রচণ্ড শক্তি, শুধু হাতে সিংহের চোয়াল ফেড়ে ফেলতে পারত। খ্রীষ্টও ওইভাবে জঠরস্থ হ'য়েছিল—আরো কতজন...'

তার কণ্ঠস্ববটা আগে ছিল বিবর্ণ, ভয়-মাখান। কিন্তু এখন প্রত্যয়ের ধ্বনিতে মুখর। কথাগুলো উচ্চারণ করে কঠোরভাবে, সামান্য টান দিয়ে-দিয়ে, অনেকটা গির্জাই কায়দায়। তার মাহাত্ম্য প্রচারে সামঘিনের মোটেই কোন আগ্রহ নেই, ও দর্শকদের খুটিয়ে দেখতে শুরু করে। পেছন-উঠানে জমা হ'য়েছে কয়েক ডজন লোক। বেশীর ভাগই পুরুষ, বোধহয় কারিগর-জাতীয়, সবাই বয়সে প্রবীণ।

স্ত্রীলোকগুলোকে দেখে মনে হয় ওরা সব্জীওয়ালী বা ধোপানী। কয়েকজনের বেশভূষা একটু ভাল, তারা বোধহয় ছোটখাট জিনিস-টিনিসের বেসাতি করে, বা হয়তো বেকার চাকরাণী। নীচু-নীচু চাল, গুদাম ঘরের দেওয়াল আর বাড়ির পেছন দিকটার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে তারা জমিতে গাদা ক'রে রাখা আটপৌরে কাপড়ের মতো হ'য়ে আছে,—সাবান, পুরনো চামড়া আর ঘামের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাড়ির জানালা দিয়েও লোকের মাথা বেরিয়ে আছে। একটা জানালায় ব'সে আছে এক মুচী, হাত নাড়াচ্ছে, একঘেয়ে হতাশায় তার মোম-মাখা সুতো চলেছে। ক্লিমের পাশে, গাদা-করা তক্তার ওপর ব'সে আছে ছুঁচ্‌লো দাড়িওয়ালা একজন মাঝ-বয়সী লোক, তার পরনের কৃষক-কোটটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। সঙ্গে বছর চল্লিশের এক মোটা মেয়েমানুষ। দিয়োমিদভ যখন স্যামসনের জন্মকথা বলল, তখন স্ত্রীলোকটা বিড়বিড় ক'রে ওঠে :

'যাকে দিয়েই গর্ভ হোক না কেন, ছেলেটাকে লালন-পালন তো করতে হবে।'

সঙ্গের লোকটা মাথা নেড়ে সায় দেয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সামঘিনের দিকে ফিরে চাপাসুরে বলে : 'ওরা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামায়, আমাদেরকে শেখায়, আর আমাদের বেলায়--আমরা পরোয়াই করি না...'

সামঘিনের পায়ের কাছে আধশোয়া হ'য়ে ছিল একটা লোক, তার সর্বাঙ্গে পেট্রল লেগে আছে। কড়া তামাক টানছিল, খকর্‌খকর্ ক'রে কেশে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে থুতু ফেলবে কোথায়। তেমন কোনো জায়গা নজরে না পড়ায়, হাতেই থুতু ফেলে। তেল্‌তেলে প্যাণ্টে হাতের চেটো মুছে নিয়ে পাশের সেলাই-বরাবর ফাটা জ্যাকেট-পরা লোকটাকে বলে :

'শুনেছ? ব্যঙের ছাতা খেয়ে ইয়াকভের বিষ লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

'কিছু না কিছু লেগেই আছে ওর,' লোকটা চাপা উদাসকণ্ঠে বলে : 'ঝামেলা-মুস্কিল ওকে ঘিরেই আছে—'

কিন্তু কথাবার্তা হয় খুব কমই। কণ্ঠস্বর, কেমন চাপা-চাপা। দিয়োমিদভের কণ্ঠ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে :

'রাজা সলোমন বলেছিলেন "পরিতৃপ্ত দেহ ছাঁকা-মধুও ফেলে দেয়, কিন্তু ক্ষুধিত প্রাণে তিক্ততাও মধু।"'

দিয়োমিদভ মাথা নাড়ে। তার ফ্যাকাসে নীল চোখ লোকগুলোকে কঠোরভাবে, হিম দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। শ্রোতাদের সবাইয়েরই লক্ষ্য গিয়ে পড়ে তার দিকে। সবাই অদৃশ্যভাবেই যেন ওই স্তূপটাব দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে প্রচারকের পায়ের কাছে ব'সে আছে ভারভারা আর কুমভ। প্রথম জনা ভীড়ের দিকে তাকিয়ে আছে আর দ্বিতীয় জনের দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী। আকাশে নানা বর্ণের বিশ্রী চাপা-চাপা ছটা, চোখে লাগে। সামঘিনের কেমন মনে হয় যে এই ভীড়ে হতাশা আর গ্লানির অনুভূতি রয়েছে। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভীড়টাকে এই অপ্রশস্ত অঙ্গনে ঠেসে রাখা হ'য়েছে—ধ্বংসপ্রায় দালানগুলোর মাঝখানে অঙ্গনটা যেন একটা এক ছিদ্র বিশেষ। স্তূপের পেছনে দাঁড়িয়ে কমবয়সী এক পুলিশ অফিসার, ঠোঁটে সিগারেট ধরা, বেশ দুধে-ঘি'য়ে থাকা চেহারা, রক্তিম গাল, ফুলবাবুটি, পুলিশ ইউনিফর্মের মধ্যেও মফঃস্বলের নবাগত কলেজী ছাত্রটির চেহারা ফুটে রয়েছে যেন। দস্তানাকে সযত্নে ভাঁজ ক'রে দু'বার মুখের কাছে ধরল, ফুঁ দিয়ে ও-দুটোকে তুল্‌তুলে জীবন্ত হাত ক'রে তুলল।

'যথেচ্ছাচারী বুদ্ধিবৃত্তির আমোদ-প্রমোদ ইন্দ্রিয়-সুখের চাইতেও ক্ষতিকর,' দিয়োমিদভ জোর গলায় ঘোষণা ক'রে ওঠে। সামনের দিকে এতটা ঝুঁকে পড়ে যেন

মনে হয় ভীড়ের মধ্যে বোধহয় এখ্নি লাফ দেবে। 'আর সেইজন্যেই ছাত্র এবং অন্যান্য অর্ধশিক্ষিত লোক, বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, যশপ্রত্যাশী ও বেপরোয়া দুষ্কৃতি-কারীর দল, তোমাদের ওপর যাদের বিন্দুমাত্র দয়া মায়া নেই, তারা তোমাদের ক্ষুধিত প্রাণে, যেখানে তিক্ততাও মধু, সেখানে ভরে দেয় কোনো এক সমাজবাদ সম্পর্কিত নানা কষ্টকল্পিত স্বপ্নকাহিনী, তোমাদের মধ্যে এমন সব ধারণা সঞ্চারিত করে যা'তে ঘোষণা করা হয় যে একবার যদি দেহ পরিতুষ্ট হয় তবে সেই তৃপ্তি প্রাণকেও সন্তুষ্ট ক'রে রাখবে।—না! ওরা মিথ্যা বলে!' প্রচণ্ড জোরে দিয়োমিদভ চিৎকার ক'রে ওঠে, সুগম্ভীরভাবে হাতদুটোকেও ওপরে উত্থিত করে।

সামঘিন উঠে দাঁড়ায়, বিস্ময়ের প্রবাহ ওর গায়ে লেগেছে। মনে হয় ভীড়টা তার জমাট দেহ নিয়ে যেন আরো ঘন হ'য়ে আসছে, স্তূপের দিকে এগোচ্ছে। এমন কি ওর মনেও হ'লো যে ভীড়ের মধ্যে গলাগুলো লম্বা হ'য়ে পড়েছে, ঘাড়গুলো স্পষ্টতর হয়েছে। জমায়েতটা দেখে মনে হয় এখানে কোন হাতের বালাই নেই,—কেন না প্রত্যেকের হাতই তো লুকোন; জীর্ণ বেশের মধ্যে সংগোপনে রাখা, হয় পকেটে নয়তো বুকে। এমনও মনে হলো যে লোকগুলোর একান্ত মনোযোগ দিয়োমিদভকে যেন চুম্বক-আকর্ষণ করছে, এদের কাছে সে নেমে আসছে। কাঁপা-কাঁপা পায়ে সে-ও উঠে দাঁড়িয়েছে। হাঁতদুটোকে বাতাসে এলোপাথাড়ি ছুঁড়ছে, যেন কোনো-কিছুকে বারবার সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। পা দিয়ে জোরে মাটি ঠুকে চিৎকার করে :

'আর ওরা হত্যা করে বিশ্বস্ত ভৃত্যদের, আমাদের পার্থিব...'

'হ্যাঁ, এইবারে ওর খতম!' তেল-তেল দাগ ধরা লোকটা ব'লে ওঠে। কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়ায়।

পুলিশ অফিসারটি স্তূপের ওপর একলাফে উঠে দাঁড়ায়। দিয়োমিদভের দিকে দস্তানাটা নাড়ে, যেন মাছি তাড়াচ্ছে। কি একটা বলেও।

'কিন্তু আমি তো রাজনীতি আলোচনা করি না!' দিয়োমিদভের কণ্ঠস্বর গমক, যদিও সবিষাদ। 'এতো রাজনীতি নয়; মিথ্যা কথা! অর্থাৎ—বুঝে দেখুন—এই তো সত্য—সত্য!'

'আপনাকে চুপ করতেই বলছি। অনুগ্রহ ক'রে সরে দাঁড়ান,' পুলিশ অফিসার দস্তানা নেড়ে-নেড়ে গমগমে গলায় বলে।

লোকে মাটির থেকে উঠে দাঁড়ায়। ধাক্কাধাক্কি লাগে, নিজেদেরকে ঝেড়ে ঝুড়ে তোলে। পেছন-উঠান ভরা চাপা গুঞ্জন, খস্‌খস্‌ আওয়াজ। ভারভারা, কুমভ ও আরো তিনজন সুবেশ ভদ্রলোক পুলিশ-অফিসারকে ঘিরে ধরে। কিন্তু অফিসারটি বেশ কর্তৃত্ব আর মর্যাদার সুরে ঘোষণা করে :

'না, তা' হয় না। আমি অনুমোদন করতে পারি না...'

'ওকে বুঝিয়ে বল!' দিয়োমিদভ চেঁচিয়ে ওঠে।

'তা'তে কোন লাভ নেই। উনি আক্রমণ করবেন। অন্যে পক্ষ-সমর্থন করবে। এ কিছুতেই হ'তে দেওয়া যায় না। না। আমি নির্বোধ নই। বিতর্ক? জানি। বিতর্ক তো রাজনীতিরই নামান্তর! নাঃ। আমি একমত নই। যদি রাজনীতিই নেই তো এত তর্কবিতর্ক কি নিয়ে? যদি আপনারা দয়া ক'রে...'

'আমি রিপোর্ট করব!' পা দিয়ে চেয়ার ঠেলে দিয়োমিদভ চেঁচায়।

'বড্ড রেগে গেছে,' ছুঁচলো দাড়িওয়ালা লোকটা ব'লে ওঠে : 'কিন্তু বলে বেশ।'

মোটা মেয়েছেলেটা উঠে দাঁড়ায়। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মোছে, বেশ জোর গলাতেই ব'লে ওঠে :

'সব মেয়েভোলান পুরুষেই বেশ ভাল বলে-টলে।'

'ও-ও কি তাই?'

'নয় মানে?'

'কার কথা বলছ?' ছেঁড়া-জ্যাকেট পরা লোকটা জিজ্ঞেস করে। 'পুলিশ-অফিসারের?'

'সব সমান,' হাত নেড়ে মেয়েছেলেটা যেতে-যেতে বলে যায়।

'কাউয়া!' জ্যাকেট-পরা লোকটা নিঃশ্বাস ফেলে ব'লে ওঠে: 'তোমাদের মতো মানুষের সঙ্গে বাস করা রক্তমাংসে সহ্য হয় না।'

সামঘিনের দিকে ফিরে নীচুগলায় বলে:

'পুলিশটা কমবয়সী, কিন্তু চালাক খুব। ইচ্ছা ক'রে থামিয়ে দিল, তক্কে-তক্কে আছে কেউ টুঁ-ফাঁ করে নাকি। আরেকদিনও এমনি একটা কোত্থেকে গজিয়ে উঠেছিল, আর অফিসারটাও—নিয়ে গেল পাকড়ে! থানায় গেল দু'জনাই। এদের নিশ্চয়ই যোগসাজসে কাজকারবার।'

ভীড় পাতলা হ'য়ে এল। সামঘিন স্তূপ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ভারভারাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে অফিসারটি অত্যন্ত বিনীতভাবে, ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলল:

'বিশ্বাস করুন। আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই। নির্দেশ রয়েছে। সেমিয়ন পেত্রোভিচ আগুনের মতো মানুষ, লোককে খেপিয়ে তুলতে পারেন—আহা, বঁ-সোয়া!'

ভারাভারাকে নমস্কার জানিয়ে ভীড়ের পিছনে পিছনে চলে গেল। মেষপালকের মতো।

মনের ভারসাম্য ফিরে পেয়ে দিয়োমিদভ ভারভারাকে সানন্দে কিছু শোনাচ্ছে, যেন প্রিয়-ছত্রের আবৃত্তিই করছে:

'ও-হ্যাঁ, একেবারে পাগল হ'য়ে গেছে। জেমলিয়ানি ভাল-য়ের ওপর বাস করে এক ফার-ব্যবসায়ীর সাথে, দয়া ক'রে সে ওকে রেখেছে। রাত্রিবেলায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, বিড়বিড় ক'রে বলে: 'ফিলিস্টিনদের সঙ্গে মরে যাও, হে আমার আত্মা!' নিজেকে ও স্যামসন ব'লে কল্পনা করে। অচ্ছা, এখন বিদায়। আমি খুব ব্যস্ত আছি—এক আলোচনার আমন্ত্রণ আছে—গুড-বাই!'

হঠাৎ ঘুরে গিয়ে সরু একটা দ্বারপথে ঢুকে পড়ে। দরজাটা পেছনে সজোরে আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

'শুনলে?' ভারভারা জিজ্ঞেস করে। 'ডীকন—মনে আছে তোমার—পাগল হ'য়ে গেছে!'

সামঘিন নীরবে কাঁধ ঝাঁকায়।

ভারভারার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। চোখের মধ্যে এমন একটা আলো যাকে বিজয়-বহ্নির মতোই দেখায়।...

দৃশ্যটা মনে করতেই সামঘিন লিউতভের কথায় কিন্তু আর অশান্তি বোধ করে না। বাতি নেভাতে উঠে গেল। নীল শিখাটা নিভবার আগে বার কয়েক ঝটপট করে। অন্ধকারে জানালার ঘোলাটে আকারটা দৃশ্যমান হ'য়ে পড়েছে। চওড়া টার্কিশ তোয়ালের মতোই দেখায়। থেঁতলান আপেলের ওপর দিয়ে আলগোছে পা ফেলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ বন্ধ ক'রেই কিন্তু নিকনোভার কথা ভাবতে শুরু করে। হ্যাঁ, ও বেশ স্বাভাবিক, দীর্ঘস্থায়ী সম্বন্ধ গড়ে তোলবার মতো মেয়ে। এ মেয়ে যেন সযত্নে লালিত, যেমন এই সামনের বাগানে, ফুলের সংখ্যা কম, কিন্তু প্রত্যেকটিই সযত্নে লালিত। আশ্চর্য, ও কোনরকম অলঙ্কারই পছন্দ করে না। মনে পড়ল কেমন ভাবে বডিসের মধ্যে স্তনদুটো গুঁজে দিচ্ছিল।

'বোধহয় সন্তানের জন্যে সুরক্ষিত ক'রে রাখছে।'

ভারভারা আজকাল বিদেশী হ'য়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ নিজের জীবনই সে যাপন করছে। খুব সহজ সে-জীবন, সন্দেহ নেই। নিরপেক্ষ সদ্ভাবনাতেই সবাইকে সে বিদ্রূপ করে,- আদর্শবাদীই কি আর বস্তুবাদীই কি। তার মুখের আদলটা লম্বা হ'য়ে পড়েছে, ঠোঁট-দুটো অনেক দৃঢ় হ'য়েছে। বেশ বোঝা যায় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। ভোজনেও বেশ স্পৃহা হয়েছে, পরিমাণও বেড়েছে। এই কিছু-দিন হলো নিলামে ছাপার কাগজ কিনেছিল, বিক্রিও করেছে বেশ লাভ রেখে।

'বেশ চালাকচতুর। আমরা পৃথক হবো, নিশ্চয়ই বিনা-নাটকেই,' ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে ক্লিম ভাবে।

॥ ২২ ॥

জাপানের সঙ্গে যেদিন যুদ্ধ ঘোষণা হ'লো, সেদিন সামঘিন সেণ্ট পীতর্স্বুর্গে নেভস্কি প্রস্পেক্টের এক রেস্তোরাঁয় ব'সে লিদিয়ার সাথে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যাবার কথাটা ভাবছিল। খুব অবাক হয়েছে, ঈর্ষাজড়িত আত্মতৃপ্তিও রয়েছে। ঘণ্টা-খানেক আগে মুখোমুখি হ'য়ে পড়েছিল; ওষুধের দোকান থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতেই লিদিয়া একেবারে ওর সামনে এসে পড়েছিল।

'ক্লিম!'

শুধুমাত্র গলার স্বরেই ভদ্রপোশাক পরা এই দীঘল মেয়েটাকে ও চিনতে পারে। মুখের ওপর ওড়নার আবরণ, মাথায় সাদা-পালক বসান এক অসাধারণ টুপী, কিন্তু টুপীটা মোটেও ফ্যাশনেবল্ নয়।

'লিদিয়া!' চেঁচিয়ে ওঠে।

'ও-মা!' বারবার ক'রে বলে। আনন্দে তো বটেই, কিন্তু ক্লিমের মনে হয় ভয়ও বোধহয় আছে। অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে চলেছিল,—বুকের সঙ্গে চেপে-ধরা আছে কতকগুলো আর কতকগুলো পাত্‌লা শীতের কোটের নানা বোতামের সঙ্গে ঝুলছে। হাত সরিয়ে নিতেই একটা প্যাকেট পড়ে গেল। সামঘিন ঝুঁকে পড়ে তুলতে যেতেই লিদিয়া ওর গায়ে ধাক্কা খায়। ও-ও উল্টে ধাক্কা দেয়। দু'জনেই হেসে ওঠে বোকার মতো।

'কি আশ্চর্য, না! যুদ্ধ, আর কোথাও কিছু নেই—তুমি! তুমি কিন্তু বুড়িয়ে গেছ,' লিদিয়া বলে।

মুখের ওপর থেকে ওড়না সরাতেই সামঘিন দেখল চল্লিশে পা-দেওয়া এক নারীর মুখ। কালো চোখের তারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের ব্যঞ্জনা অপরিচিত ও দুর্বোধ্য। রেস্তোরাঁয় যাবার প্রস্তাব করে ক্লিম।

'না, তা হয় না। আমার স্বামী অপেক্ষা করছেন। হ্যাঁ বিয়ে করেছি বই কি। এই পাঁচ মাস হ'লো। জানতে না বুঝি? অবশ্য বাবাকে এখনো লিখিনি।'

কথা হলো তার বাসায় যাবে একদিন সামঘিন। তাড়াতাড়ি একটা ক্যাব ঠিক ক'রে লিদিয়া চলে গেল। যেতে যেতে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলল: 'ঠিকানা ভুল না কিন্তু!'

'বিবাহিত!' সামঘিন ভাবে। বিশ্বাস হয় না। ওর স্বামীর চেহারাটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। রেস্তোরাঁয় অস্বাভাবিক রকম উত্তেজিত লোকের ভীড়। খবরের কাগজগুলো আন্দোলিত ক'রে, গেলাসের ঝনঝন আওয়াজ তুলে, সপ্তম সুরে সবাই চেঁচাচ্ছে। নীল গালওয়ালা একটা গাঁট্টাগোট্টা লোক হাতে শ্যাম্পেনের গেলাশ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোঁফজোড়া না থাকলে ওকে অভিনেতা বলেই হয়তো মনে হতো। উদাত্ত-গম্ভীর গলায় কর্কশ সুরে চেঁচিয়ে ওঠে বিশেষ ভঙ্গী ক'রে:

'ভদ্রমহোদয়গণ! অবশেষে—আমরা অবশেষে জানি যে...'

কলারের পেছনে আঙুল ঢুকিয়ে ঘাড়টা ফিরিয়ে বড় মুক্তো-লাগান নেকটাইটাকে টানলে। একটা পা প্রথমে এগিয়ে দিয়ে তারপর আরেকটা টেনে আনে। সবাইকে কিছু বোঝাতে চায়। কিন্তু আর সকলেও যে বলতে চায়!

বিশেষতঃ ভারিক্কী চেহারার খাটো বুড়ো লোকটা। চকচকে টাকের ওপর দিয়ে শুধু দশ-বারটা যা চুল আছে, তাকে পরম যত্নে বাঁ-কান থেকে আঁচড়িয়ে ডান-কানের ওপর এনে ফেলেছে।

'এ এক অশ্রুতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতা!' চিৎকার ক'রে বলে। লাল মুখটা এমনভাবে কুঁচকে উঠেছে যেন এক্ষুণি হেঁচে ফেলবে।

'তিখন ভাসিলিয়েভিচ, আমার অভিনন্দন! আপনি ভবিষ্যৎ-বক্তা!'

'আহা! বন্ধু, বুঝলেন তো—

সামঘিনের ডান দিকের লোকগুলো সবাই প্রায় এক রকম দেখতে। টেবিল ঘিরে বসে আছে। তাদেরি একজন হাত নেড়ে প্রার্থনা-চালনার ভঙ্গীতে ভজনের সুরে সজোরে চিৎকার করে—হাতে রয়েছে কিন্তু একটা সিগারেট-কেস :

'প্রস্তুত আন্তরিকভাবে সমর্পণ করতে...'

'"নিঃস্বার্থভাবে"-টাই কি ভাল লাগে না?'

'এসব তুচ্ছ কচকচি বাদ দাও না!'

'উস্তিন, চুপ কর, বাধা দিও না .'

'ভদ্রমহোদয়গণ! একটা টী-ডিয়াম...'

'ছোট কর। কোর্টের আপীল তো আর নয়।'

সামঘিনের কানে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে :

'বাইবেলে তো ইংরেজদের কথা আছেই : "নম্র ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ তাহারাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী।"'

হো-হো ক'রে হেসে উঠে স্রাতনভ বলল : 'ও-তো মার্ক টোয়েইন থেকে।'

হঠাৎ কে-একজন ভয়-পাওয়া সুরেলা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল : 'ও মশায়—মিছিল—!'

মেঝে কেঁপে উঠল। সবাই দৌড়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। কোলাহল থেমে যায়। কিন্তু স্রাতনভের গলা গম গম ক'রে ওঠে :

'মিছিল নয়, দেশ ভক্তির শোভাযাত্রা।'

ক্লিম বিলের টাকা টেবিলে রেখে দ্রুতপায়ে বাইরে চলে আসে। এক মিনিট পরে দেখা গেল. কোটের বোতাম সাঁটতে-সাঁটতে ও রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তিন জন অফিসার উল্লসিত মুখে পাশাপাশি চলছিল সমতালে। তাদেরি একজন যেতে-যেতে সামঘিনকে খুশ-মেজাজে বলে ওঠে :

'মাপ করবেন, চশমা-দাদা।'

মধ্যবয়সী একজন মাতাল, গায়ে বোতাম-খোলা ফারকোট, হাতে ছোট বালতি, টলতে টলতে পথ হাঁটছিল। পায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে :

'ঈ-ঈশ্বর জারকে রক্ষা করুন...'

সামঘিনের কাছে পেঁছে লোকটা ওর সামনে হঠাৎ থেমে পড়ে। ঠোঁট চেপে লাল-লাল গাল ফোলায়, আওয়াজ ক'রে বলে : 'বুম্! বুম!'

কাঠের পেভমেণ্টে ছোট-ছোট ভীড়। কয়েক জন ক'রে ক'রে লোক। গড়িয়ে-গড়িয়ে চলেছে যেন। পায়ের এক ঘেয়ে আওয়াজে বাতাস ভরে উঠেছে। তারা যেন ঝাঁটা, হাতলটা হচ্ছে পেছনে ধীরে-ধীরে এগিয়ে-আসা ঘোড়ারগাড়ীর সারি। এদিক থেকে আর ও-দিক থেকে গাড়ীগুলো এসে পাশের হাঁটা-জায়গাটা অবরোধ ক'রে ফেলেছে। একজন লম্বা মতন ছাত্র, মাথায় কোচোয়ানী ছাঁট কোঁকড়া চুল, বোধহয় 'সেই ভাব'টা ফুটিয়ে তোলার জন্যই ওই রকম ছেঁটেছে। ভীড়ের সামনে দিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলেছে সে। ঘোড়াগুলোর মুখে তার কালো-স্কার্ফটা নাড়িয়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠছে : 'পাশ দিয়ে চল!'

পাশের পথে উপচে পড়ে ভীড়টা সেখানকার লোকগুলোকে হঠিয়ে দেয়। ভীড়টা কিন্তু বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। শুধু স্ফীত হয়েছে যেন। চলার গতি কমে গেছে। যত লোক সামনে পড়ছে তাদের সবাইকে টেনেও নিতে পারেনি, মিশিয়েও ফেলতে পারেনি। অনেকেই দেওয়ালের ওপর উঠেছে ছুটে গেটের ভেতর ঢুকেছে বা দোকানের দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

'কানুন বানানো দুশমণেরা ভয় পায়, বুম!' মাতালটা হল্লা ক'রে ওঠে। ভীড়ের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে যায় যেন রাসবেরী ঝোঁপে ভাল্লুক ঢুকছে।

স্তাতনভ ঠিক সেই মুহূর্তে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোল। পেছনে-পেছনে ধীর-স্থির চেহারার মানুষগুলোর সেই দলটা। সার্মাঘিনকে ওরা পথের পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেয়। ওদের ভালমানুষী অত্যাচার ক্লিম মেনে নেয়। ভীড়ের মধ্যেই তাদের সঙ্গে চলে। ভাবে, কোন একটা গলির মুখে কেটে পড়বে। কিন্তু মোড়-গুলোয় জনতার স্রোত এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, অবশেষে ভীড়ে এসে মিশছে। ধাক্কা খেতে-খেতে সার্মাঘিন মাঝখানে গিয়ে পৌঁছয়। কানের কাছে অবিরত চিৎকার : 'হুররা!' সর্বকণ্ঠনির্গত ধ্বনি নয়, সাবধানী চিৎকার যেন।

দ্রুত ঘনায়মান কালো রঙের ভীড়টায় ছাত্রদের নীল আর সবুজ কোটের রঙটাই বেশী ক'রে চোখে পড়ে। তাদের বোতামগুলো চক চক করে। এখানে-ওখানে জনতার সব পাশেই পুলিশ-অফিসারদের ধূসর মূর্তি ছড়িয়ে আছে। সম্মুখে বেসুরো কণ্ঠে জাতীয়-সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। সেই লম্বা ছাত্রটি পুলিশের মতো অক্লান্তভাবে আদেশ জারী ক'রে চলেছে : 'পাশ দিয়ে চল!'

সার্মাঘিনের পেছনে, উল্লসিত সামান্য চড়া সুরের গান ভেসে আসে :

'আন্দ্রিউস্কার তাঁবুতে,
ওগো, মদ খেতে,
গেল সখীর দল...'

পেছন ফিরে তাকায় সার্মাঘিন। এক দল তরুণ মার্চ ক'রে ক'রে আসছে, তাদের আগে-আগে একজন টেকনিক্যাল ছাত্র সর্দারি করছে। মুখটা খুব স্ফীত, বোধহয় আয়ত্বে নেই, নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে চলেছে :

'বল সখী, বল মোরে,
কেন তার ঘরে
কাটালে তুমি রাত।'

খুব স্ফূর্তিভরে গান ধরেছে, একেবারে সোজা সার্মাঘিনের মুখের ওপর। কার একটা মন্তব্য মনে পড়ে যায় ওর · 'ভীড়ের কাছে জনতার সঙের দরকার অনেক বেশী।'

এর মধ্যে ভীড়টা এত ফেঁপে উঠেছে যে পলিতিজেইস্কি পুলে ওঠা দুঃসাধ্য। কাজেই সেখানেই থেমে গেল, যেন বিবেচনা ক'রে দেখছে আরো এগিয়ে যাবে কি না। অনেকে ময়কা নদীর পাশ দিয়ে দিয়ে দৌড়ে পেভ্চেস্কি পুলের দিকে যাচ্ছে। সামনে যারা তাবা আগেব দিকে চলেছে কিন্তু পেছন দিকটায়, ওরও পেছনে, সার্মাঘিন যেন অনিশ্চয়তার ভাব দেখল।

'ঠাণ্ডা প্রাণে মার্চ করছে; কৌতূহলের টানে,' সার্মাঘিন ভাবে। চশমার নীচ দিয়ে ঘৃণা ঝরল তাদের ওপর যারা দেখি কি হয় বলে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে তো ভীড় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে, সব বারই তো তাই-ই হয়, যেন বহিরাগত। মনকে বোঝাতে চায় যে ও-ও তো কৌতূহলের টানেই মার্চ করেছে। মনকে আশ্বাসও দেয় অদ্ভুত কিছু একটা অকস্মাৎ ঘটে যেতে পারে, কারণ ওর ভাবনার মধ্যে এমনি একটা আবছা আশার রেখা দেখা দিয়েছিল।



তবুও ভীড়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ল্যাজের সাথে সাথে ও যখন প্যালেস-স্কোয়ারে এসে পড়ল, তখন সামনের লোকদের হঠাৎ বেঁটে হয়ে যেতে দেখে ও একটুও অবাক হলো না বা ভয় পেল না। লোকগুলো যে হাঁটু গেড়ে বসেছে, চটপট নীচু হয়ে পড়ছে, এ-কথাটা বুঝতে খানিকটা সময় লাগল। এমনভাবে অবনমিত হয়ে পড়েছে সবাই যেন কোন অদৃশ্য শক্তি হঠাৎ তাদের পাগুলো ভেঙে দিয়েছে। প্রাসাদের বাদামী রঙের স্তূপটার দিকে যতই একাগ্র দৃষ্টিতে দেখা যায় ততই সামনের লোকেদের নিরাবরণ মাথাগুলো ছোট হয়ে ক্রমশঃ বিন্দু হয়ে চোখে পড়ে। স্কোয়ারটা ওদের দিয়েই গাঁথা। ওদের মধ্যে থেকে, হাজার কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ, মুখভার আকাশে প্রতিধ্বনি তোলে :

'মোদের করুণাময় সম্রাটের জয় হোক...'

সামঘিন একটা লোহার-রেলিঙে বিশ্রীভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। চিৎকারটায় কানে তালা লাগে, মনে হয়, এ চিৎকার যেমন পরিচিত তেমনি অপরিচিতও বটে। লৌহ-শলাকাহত ঘণ্টাধ্বনির মতো ভেঙে-ভেঙে নানা তরঙ্গে ওর কানে এসে পৌঁছোচ্ছে।

'উনি আজ জয়ী—সর্বদোষ মাপ হয়ে গেছে—এমনকি খোন্দিকাও!'

অদ্ভুত শিহরণ জাগিয়ে তোলবার মতো ঘটনা। লোকে কিন্তু ওকে ওর আনন্দ-অনুভূতি একত্রিত করতে দিলে না, সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতেও বাধা দিলে। ...ঠিক ওর সামনে মোটা, টাকমাথা জনৈক ব্যক্তি লাফিয়ে উঠে জামার কারাকুল-কলারের ভেতর থেকে সারসের মতো গলা লম্বা ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল :

'উনি কি বাইরে বেরিয়ে আসবেন? আসবেন না?'

পাশের একজন রাগে ফুঁসে ওঠে : 'দেখুন মশাই! ধাক্কা দিচ্ছেন যে!'

'উঃ বাব্বা, কি একটা মুহূর্ত!'

'বসুন, বসুন আপনারা সকলেই বসে পড়ুন।' স্ত্রাতনভ কাছেই কোথাও চেঁচাচ্ছিল।

'হুর্‌রা!' গোটা স্কোয়্যারটা চেঁচিয়ে উঠল। টেকো লোকটা পেছনে মাথা হেলাতেই সামঘিনের বুকে ধাক্কা লাগে। সরু গলায় কাতরস্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে :

'বাইরে এসেছেন—ঈশ্বর ওঁকে আশীর্বাদ করুন—উঃ, কি বুদ্ধি ওঁর!'

কথার তোড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। কাটা-কাটা অসংলগ্ন শব্দের টুকরো, অত্যন্ত বেগে বেরিয়ে আসছে একের পর এক। সামঘিনের ওপর সজোরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, সামঘিন পড়ে যাচ্ছে যেন, ওর পায়ের নীচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। সামঘিন দেখল প্রাসাদের অলিন্দ-দ্বার হঠাৎ একেবারে খুলে গেল; দরজার তুষার-শুভ্র শার্সি ঝিলমিলিয়ে উঠল, আর তারি ভেতর দিয়ে জারের অতি-পরিচিত খর্ব দেহটি বেরিয়ে এল, সঙ্গে বাহুলগ্না দীর্ঘা শ্বেতবসনা এক রমণী। বিরাট প্রাসাদের পটভূমিকায়, হাজার কণ্ঠের কলরবমুখর জনতার শীর্ষে মূর্তি দুটোকে পুতুলের মতো দেখায়। অকস্মাৎ সামঘিনের মনে হয় যে জনতা তাদের শাসককে যতই পুতুলের মূর্তিতে দেখতে পায়, ততই তাদের শ্রদ্ধা বাড়ে। স্কোয়্যারে কর্ণ-বিদারক সহৃদয় গর্জনের এমন তুমুল প্রতিধ্বনি উঠল যে সামঘিনের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে এল। আর একবার নির্জান-নভগোরদে যেমনটি হয়েছিল, সেই অনুভূতি যেন

ওকে আবার পেয়ে বসল; মনে হলো, মাটি থেকে কে যেন ওকে ক্রমশঃ ওপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।...সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধের ওপর কে ঘুসি মারল বলেই মনে হলো, কোটেও যেন টান পড়ল :

'বসুন, বসুন...টুপী নামান!'

হাঁটু ভেঙে বসতেই মনে হলো পাশের ওই গাঢ় নীল রঙের ওভারকোট-পরা পাকা চুল মানুষটার মতো নির্লজ্জভাবে ও-ও বোধহয় কেঁদে ফেলতে পারে। বারান্দার ওপর জার এবং জারিনা যে দাঁড়িয়ে আছেন তা দেখেই ও অস্বাভাবিক-ভাবে বিচলিত হয়। হঠাৎ মনে হয় যে ওই খর্বকায় অতি-ভুক্ত মানুষটি, লোকের শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে এক্ষুণি এমন কিছু ওদের বলবেন, এমন ঐতিহাসিক এমন রহস্যময়. যে সব মানুষ সব কিছু ভুলে ভাই-ভাই হয়ে উঠবে। এ চিন্তা যেন ওর একারই নয়, আশে-পাশে নানা অস্ফুট ধ্বনির তরঙ্গ ওর কানে এল, এল নানা চিৎকার :

'বলছেন নাকি?'

'চুপ—হা-ভগবান!'

'জারিনা—কি সাদা, না! যেন সর্বরক্ষক দেবদূতের মতো!'

'শুরু করেছেন? কথা বলছেন?'

ওঁরা ঠিক যেন হানজেল আর গ্রেটেলের মতো.'

'লক্ষ্য করছ কি জনতার আনন্দটায় ধর্মভাব মিশ্রিত—'

'বলছেন? এ্যাঁ?'

সামঘিন উঠে দাঁড়াতে যায়, কিন্তু কে-একজন আবার তার কোট টেনে ধরে পিঠে চড় মারে।

'দাঁড়িয়ে উঠতে চাও? এস, দেখাচ্ছি, কি ক'রে দাঁড়াতে হয়...'

সামঘিনের উত্তেজনা কিন্তু এতে মোটেই কমল না। ও রাগও করল না। শুধু জিজ্ঞেস করল : 'উনি কিছু বলছেন নাকি?'

'এন্দূরে থেকে কি আর বলা যায়!'

"রক্ষা করি তব—" বহুদূরে. আলেকজান্ডার কলামে, জনতা গান ধরেছে।

'গেছেন? দু'জনেই?'

'হুর্‌রা!'

হ্যাঁ, জার অদৃশ্য হয়ে গেছেন। দরজার হিমানী-শুভ্র শার্সি আবার চকমকিয়ে উঠল। বিপরীত দিকে জনস্রোত ধীরে-ধীরে পাতলা হয়ে পড়ছে। মুহূর্তের মধ্যেই শান্ত হয়ে গেল সব।

'জনতার সেবা আমরা করেছি!' ভীড়ে গুঁতো-গুঁতি করতে করতে টেকনি-ক্যাল ছাত্রটি চেঁচিয়ে উঠল। কাছেই কোথাও স্ত্রাতনভের বিশাল আওয়াজ গম গম ক'রে ওঠে :

'জাতীয় অহঙ্কার ও শক্তির সেই সংহত-প্রকাশ, যা একদিন নেপোলিয়নকে মস্কো থেকে এল্‌বা দ্বীপে ছুঁড়ে ফেলেছিল..'

সামঘিন চার পাশে তাকিয়ে দেখে। রেলিঙে ভর দিয়ে, গাছের ডাল আঁকড়ে, স্ত্রাতনভ ভীড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাতের লাল-মুঠি দুলিয়ে চিৎকার করছে, দস্তানাটা হাত থেকে ঝুলছে। মোটা মুখটা ফুলে ফুলে উঠছে আর চুপসে যাচ্ছে। চোখগুলো এখন বরফের মতো চকচক করছে। তার বিশাল শরীর, মস্ত বড় বুক, যেন আরো বড় হয়ে উঠছে। খোলা ফারকোটের মধ্যে দিয়ে আঁটসাঁট পেট আর মোটা-মোটা উরু দেখা যাচ্ছে। সামঘিনের চোখে পড়ে স্ত্রাতনভের ট্রাউজারের নীচের বোতামটা খোলা, কিন্তু তবুও তো তাকে এতটুকু অভব্য বা

অলস মনে হয় না। এও যেন উত্তেজনারই সূচক। এমন অবস্থায় লোকে হয়তো ইন্দ্রিয়ানুগও হয়ে পড়ে। তার সবল কণ্ঠ আর উচ্চারিত শব্দের কঠোর শক্তিতেও সেই উত্তেজনা :

'আমাদের হাঁটু দিয়ে মারব কষে লাথি ওদের—একেবারে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে ফেলব,' নীচের ঠোঁট বেঁকিয়ে সে তড়পাচ্ছিল, ঝকমকে একটা সোনা-বাঁধানো দাঁত দেখা যায়। ছাঁটা গোঁফের ডগাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে। কান দুটোও যেন একটু-একটু কাঁপে। ওর তলপেটের কাছে দণ্ডায়মান লোকগুলো চেঁচিয়ে ওঠে : 'সাব্-বাস্!!

টেকনিক্যাল ছাত্রটি গর্জায়, হাতটা চোঙা ক'রে মুখের সঙ্গে লাগিয়ে :

'সাব্বা-আ-আ-আ-স্!'

'হল্লা-হাঙ্গামা কেন?' সীলস্কিন-হ্যাট আর ঘষা-কাঁচের চশমা পরা একটা লোক জানতে চায়। 'কোথায় চল্লে এখন? না। এখানে দাঁড়াও...'

সাম্‌ঘিন ধীর পায়ে চলে এল।

'হ্যাঁ, অতি সাধারণ মানুষ একটা,' মনে-মনে ভাবে, বিশ্রী তিক্ত অনুভূতি। 'ইভান, দি টেরিব্‌ল, বা পিটার—ওঁরা হলে নিশ্চয়ই কিছু বলতেন। সময়োপযোগী কথা খুঁজে পেতেন—'

এই দ্বিতীয় বার নিজেকে যেন প্রতারিত মনে হচ্ছে ক্লিমের। কিন্তু ধূসর রঙের বেঁটে মানুষটার ওপর করুণাও জাগছে। নেতা হয়ে সামনে হাঁটু গেড়ে থাকা লোকগুলোকে কি বলতে হবে, তাই জানে না।

'নির্দোষ দিয়োমিদভও লোককে নাড়িয়ে তুলতে পারে। তারা ওর কথা শোনে, বিশ্বাস করে।'

ঠিক এই মুহূর্তে ওর মনে হয় খোদিঙ্কার পর জারের সঙ্গে সাদৃশ্যটুকু দিয়োমিদভ হারিয়েছে।

দোকানে-দোকানে আলো জ্বলে উঠছে। রাস্তায় ঘোলাটে ঠাণ্ডা ঘন হয়ে আসছে, ধূসর ধুলোগুলো নীচে জমছে আর মুখের চামড়া কেটে-কেটে বসছে। লোকে একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে পথ হাঁটছে, যেন কিছুই হয়নি, দুঃখের কোন-কিছুই ঘটেনি। বড্ড বিরক্তিকর ঠেকে। কাঠের পেভমেণ্টে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর মেয়ে-ছেলেদের কণ্ঠস্বরও বিরক্তিকর মনে হয়। অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে ওই ঘোড়ার পায়ে আর কাঠের পাটাতনে—যেন পৃথিবী আর আকাশের বুকে পেরেক ঠুকে ঠুকে বহু হাতুড়ি, শহর আর প্রাণকে বৈচিত্র্যহীন হিম-অন্ধকারে তালাবন্ধ ক'রে রেখে যাচ্ছে!

'আমি জার হলে কি বলতাম?' সাম্‌ঘিন আত্মজিজ্ঞাসা করে। চলার গতি বাড়িয়ে দেয়। প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু ও চায়নি, জারের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্যের সম্ভাবনায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে।

'হাস্যকর। একেবারেই অতি-অদ্ভুত.' মনে-মনে ভাবে। আগের চিন্তাটাকে উড়িয়ে দেয়।



ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সাম্‌ঘিন ছোট একটা ঘরে একটি লোকের বিছানার পাশে এসে বসল। লোকটা বালিশে ঠেস দিয়ে আছে—নেড়া-মাথা, কালো দাড়ি ছোট-

ছোট ক'রে ছাঁটা, শুধু চিবুকে এসে সেটা পাকাচুলের ক্ষীণ রেখা দিয়ে দু'টো ভাগ হয়ে পড়েছে।

নিজের পরিচয় দিয়ে বলল : 'আন্তন মুরম্স্কি।' নামটা শোনাল যেন কোন বিশপের।

মুখের রঙ কালো, স্পষ্ট সুঠাম ছাঁদ। কিন্তু বেশ চওড়া আর ভারী কপাল এসে প্রায়-সুন্দর মুখশ্রীটাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে। নাকটা লম্বা। বড়-বড় বাদামী চোখে জ্বরের জ্বালা। কোটরের গভীর গর্তে ঘন ছায়া। কাঁপা-কাঁপা আঙুলে প্রেস্ক্রিপসনকে গুটিয়ে-গুটিয়ে টিউবে ঢোকাচ্ছিল। নরম গলায়, 'র'-উচ্চারণটাতে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে-দিয়ে বলে :

'কেউ কেউ ওঁকে বলে থাকে জার ফিয়েদর ইভানোভিচ—নাঃ! বেঁটেখাটো লোকদের জার উনি, নৈতিক বামনদের জার।'

পাশের ঘর থেকে প্লেটের শব্দ আর ছুরি-কাঁটার ঠুন্ঠান্ শব্দ ভেসে আসছে। বেশ জোরে-জোরেই একটি সানন্দ-কণ্ঠ অনুনয় জানাচ্ছিল :

'ছাড়ুন না, মাদাম। আমি নিজেই সব করব।'

মুরম্স্কি ভুরু কোঁচকায়। ডাক দেয় : 'লিদিয়া।'

সঙ্গে-সঙ্গে এল মহিলা। ধূসর রঙের কোমরের ঘের-ছাড়া পোশাক। ক্ষীণ দীর্ঘাঙ্গী তন্বী, বব্-করা চুলের আশ্চর্য-সুন্দর গুচ্ছ। রাস্তায় যেমন দেখাচ্ছিল তার চেয়ে যেন এখন কত কম বয়েস। কিন্তু অধৈর্য মুখকান্তিতে অদ্ভুত পরিবর্তন। আন্তরিক শুভেচ্ছার ব্যঞ্জনা যেন সেখানে হিমায়িত; দেখাচ্ছে যেন ইংরেজ গভর্নেস, যে এ-জীবনে স্বামী পাবার সব আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে। স্বামীর পায়ের কাছে বিছানায় বসে, তার হাত থেকে প্রেস্ক্রিপ্সনটা টেনে নিয়ে বলে :

'আবার এটা তুমি ছিঁড়ে ফেলবে।'

মুরম্স্কি টেবিল থেকে কাগজ-কাটা ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে নাড়তে-নাড়তে বলে .

'যখন আমি ক্যাডেট ছিলাম, অনেক সময় আমাকে প্যালেস গার্ড ডিউটি দিতে হয়েছে। তখনো জার উত্তরাধিকারীই ছিলেন। সেই তখন থেকেই দেখেছি যে ওঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে ব্যক্তিত্বহীন লোক বা অতি-সাধারণ মানুষ। তারপর দেখলাম সামরিক ম্যানুভরে, রেজিমেণ্টের উৎসবে। আমার মনে হয় উনি প্রতিভাশালী লোক অপছন্দ করেন, ভয়ই করেন হয়তো।'

সামঘিন ভাবে : 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ইনি নিজেকে প্রতিভাশালী মনে করেন, ওঁর ওপর জারের ঔদাসীন্যে আহত হয়েছেন।' বেঁটেখাটো লোক সম্বন্ধে কথা বলার পর থেকেই সামঘিন এর ওপর বীতশ্রদ্ধ।

লিদিয়া বলে : 'মনে আছে তুরবোয়েভ একবার বলেছিল যে জার এমন একজন মানুষ যে সাধারণভাবে জীবনের বিপক্ষেই, আর তার কাছেই নিজেকে সমর্পণ ক'রে আত্মবিরোধ সৃষ্টি করেছে?' বহু দূর থেকে বিমর্ষভাবে সামঘিনকে লক্ষ্য করতে-করতে যেন কথা কয়টি বলল।

'আমি বিশ্বাস করি না উনি দুর্বলচিত্ত, অন্য কেউ যে ওঁর ওপর হুকুম চালাবেন সেটা তিনি বরদাস্ত করবেন। উনি ধর্মভীরু, এ-কথাও বিশ্বাস করি না। উনি নিহিলিস্ট। আমরা বাধ্য হয়েছি এমন অবস্থায় আসতে যখন সিংহাসনের ওপর থাকবে এক নিহিলিস্ট। আর হয়েছেও তাই...'

দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বের ক'রে স্থূলাঙ্গী এক পরিচারিকা বলে : 'ডিনার দেওয়া হয়েছে।'

মুরম্স্কি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালে দেখা গেল লোকটা মাঝারি উচ্চতার।

কালো রঙের ব্লাউজের মতো জ্যাকেট পরে আছে। পা-দুটোয় ফারের স্লিপার। থাবার কথা মনে করিয়ে দেয়। সামরিক লোকের পক্ষে হাঁটা-চলায় যেন একটু বেশীই ঝাঁকুনি। খেতে বসে জানা গেল ভদ্রলোক মদ-মাংস কিছুই খান না।

'স্বাস্থ্যের খাতিরে,' লিদিয়া বোঝায়। কিন্তু কথায় তেমন গভীরতা নেই। মাথাটাকে অবজ্ঞাভরে পেছন দিকে হেলিয়ে দেয়।

ঝল্‌সানো স্যামনে অন্যমনস্কভাবে কাঁটা বেঁধাতে-বেঁধাতে মুরম্‌স্কি বলে :

'হ্যাঁ। জার খাঁটি রাশিয়ান নিহিলিস্ট—বুদ্ধিজীবীদেরই একজন। লোকে যখন বলে যে ইনিই হচ্ছেন শেষ জার, আমার মনে হয় তারা ঠিকই বলে! কারণ রাশিয়াতে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবীদের পরমায়ু কবে শেষ হয়ে গেছে। দেশের পক্ষে দরকার অন্য এক গোষ্ঠী। প্রয়োজন ধর্মীয় স্বেচ্ছাসেবকবাদ—হ্যাঁ! আমি এর ওপরই জোর দিই—ধর্মীয়!'

টেবিলের ওপরে কাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে মুরম্‌স্কি দু'হাত দিয়ে রুপোর রাশ মাথার চাঁদিতে ঘষতে ঘষতে আকস্মিক প্রশ্ন ক'রে ওঠে :

'যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?'

'পাগলামো।' ক্লিম কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করে।

'তাই কি?'

'নিশ্চয়ই।'

মুরম্‌স্কি দু'টো হাত পকেটে ঢুকিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে ঘোষণার সুরে বলে ওঠে : 'আমি যুদ্ধে যাচ্ছি ভলেণ্টিয়ার হয়ে।'

'আর আমি নার্স হয়ে,' লিদিয়া একটু উচ্ছল হয়ে বলে : 'কাল আমরা ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

ভয়নক অপ্রস্তুত হয়ে সামঘিন জিজ্ঞেস করে : 'আপনি কি অশ্বারোহী?'

'আর্টিলারী গার্ডসের লেফ্‌ন্যাণ্ট, অবসরপ্রাপ্ত।' মুরম্‌স্কি অতি দ্রুত বলে ওঠে। অতিথির দিকে তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে : 'যুদ্ধ তো শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকেই লড়তে হয়, কিষাণদেরকে। তাদের সঙ্গে আমাদেরও যেতে হবে। পাগলামোর মধ্যেও? হ্যাঁ পাগলামোর মধ্যেই যেতে হবে।'

'তাহলে বিপ্লবেই বা কেন নয়?' সামঘিনের কথার সুরে অত্যন্ত বেশী অধ্যাপকীয় ঢঙ্‌ ফুটে ওঠে।

'বিপ্লবেও বইকি। যখন লোকে নিজেরাই সেটা চাইবে।' মুরম্‌স্কি জবাব দেয় "নিজেরাই" শব্দটার ওপর অত্যাধিক জোর দেয়। চোখ নামিয়ে চামচে ক'রে রাইস্‌পুডিং কেটে কেটে প্লেটের ওপর রাখে সে।

সামঘিনের ভয়ানক বিশ্রী লাগে; অক্ষম মনে হয় নিজেকে। এই লোকটার সামনে, ইস্কুলের মেয়ের মতো হাঁ-ক'রে-থাকা লিদিয়ার সামনে। ভয়ানক বিরক্তিকর! লিদিয়া যেন অবুঝ ছাত্রী, সাহিত্যের মাস্টার মশাইকে ভালোবেসে ফেলেছে—চোখ বড় বড় ক'রে কথা গিলছে এখন।

'মানুষকে বশ করা যায় শুধু ধর্ম দিয়ে,' মুরম্‌স্কি একটা তর্জনী দিয়ে আরেকটাকে মেরে ঘোষণা করে উঠল। রোগা, শীর্ণ, আকারবিহীন আঙুল, পার্সলিপাতার মতো হলুদ। 'বশ-করা অর্থে আমি যা বুঝি সেটা হচ্ছে নিজেদের অহমিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য মানুষের সংগঠন। যুদ্ধে মানুষের অহংভাব আর থাকে না—'

মুরম্‌স্কি টেবিলের ওপর ন্যাপকিন ছুঁড়ে ফেলে যখন শুতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করল, তখন সামঘিনের সত্যিই আনন্দ হলো।

'আমি আবার কোলাইটিস্‌-এর রুগী—' এমন স্বরে বলল মুরম্‌স্কি যেন

অহঙ্কার করবার মতোই কিছু। মুরমুস্কি চলে গেল শুতে।

হাসিখুশী পরিচারিকাটি কফি দিয়ে গেল। লিদিয়া কফি-পট তুলে নিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক শব্দ ক'রে সেটা আবার রেখে দিয়ে আঙুলে ফুঁ দেয়। কোন রকম করুণা প্রকাশ না ক'রে সামঘিন চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে কি বলে তা শুনবার জন্যে। লিদিয়া জিজ্ঞেস করল, বাবার সঙ্গে কতদিন হলো দেখা হয়েছে। ভাল আছেন কি না। জবাবে ক্লিম জানাল ভারাভকার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হয়। এবারে গ্রীষ্মে বোধহয় তিনি স্তারাইয়া-রুশাতে গিয়ে থাকবেন, অস্বাভাবিক মোটা হ'য়ে পড়ছেন, তারই চিকিৎসা করাবেন।

'গত বছর সবচেয়ে লম্বা চিঠি যেটা পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে তা'তে ছিল চোদ্দটা লাইন, সবই "পান",' লিদিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে। অবান্তর কথা যেন বলছে এমনি ভাবে যোগ করে: 'হ্যাঁ, আমরা এরকমই। আন্তন ভাবে যে আমাদের কালটা ভীমবেগে বুড়িয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি কি খুব বেশী ঘুরে বেড়াচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'সাধু-সন্তদের খোঁজে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ, পেয়েছি একজনকে,' শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয়। কফিটা অমানুষিক গরম, বড্ড বেশী পাতলাও। লিদিয়ার সঙ্গে বসে সামঘিন ঠিক স্বস্তি পায় না, অস্থির-অস্থির ঠেকে। একটু যে দুঃখও না হচ্ছে তা' নয়, তবু কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দেবার ভারী ইচ্ছে হয়। বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে যে-মেয়ে অমন আঘাত দিয়ে চিঠি লিখতে পেরেছিল সে এই-ই।

'অত্যন্ত দুঃখী মনে হয়, কিন্তু তা' মানতে চায় না, অহঙ্কারে ঘা লাগবে যে,' লিদিয়া সম্বন্ধে সামঘিন মনে-মনে ভাবে।

'আর তুমি, সত্যিই কি তুমি বিশ্বাস কর বিপ্লব লোকের উন্নতি এনে দেবে?' শোবার ঘরে স্বামীর খস্‌খস্‌ আওয়াজ কান পেতে শুনে লিদিয়া প্রশ্ন করে।

'তুমি কি তা' বিশ্বাস কর না?'

'নাঃ,' মাথাটাকে সজোরে নাড়িয়ে জবাব দেয়, পূর্ণদৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে চেয়ে থাকে। 'বিপ্লব হবেও না। যুদ্ধ একে দাবিয়ে দেবে। আন্তনই ঠিক।'

'"যিনি ইহা বিশ্বাস করেন তিনিই ধন্য"' সামঘিন উদাসীনকণ্ঠে বলে। তারপর তুরবোয়েভের কথা জিজ্ঞেস করে।

'ও আমার স্বামীর তুতো-ভাই,' লিদিয়া সর্বপ্রথমে এই খবরটা জানাল। তারপরে, অবজ্ঞার সুরে তুরবোয়েভ-কাহিনীর বর্ণনা করে। ও নাকি কোন্ এক কমিটিতে একটা পোস্ট নিয়েছিল, সেই কমিটির নাম ও দিয়েছে "ত্রিশকা'র কোটের কমিটি*"। তারপর মফঃস্বলের ইনস্পেক্টরের একটা পদ পেয়েছিল, কিন্তু নিলে না। বললে, পুলিশে ঢুকবে না। এখন 'দি সেন্ট পীতর্সবুর্গ রেকর্ড' পত্রিকায় অবোধ্য যত প্রবন্ধ লিখছে। বলে পত্রিকার সম্পাদক প্রিন্স উখতম্‌স্কির প্রেরণা সত্যিকারের এক নীলনদের কুমীর, তাঁর বাসায় জিঙ্কের চৌবাচ্চায় থাকে আর সম্পাদকীয় লিখতে প্রিন্সকে অনুপ্রেরণা জোগায়।'

'ইগর এইসব বাজে কথা এত সিরিয়াসলি বলে যে শুনে মনে হয় ওর বোধহয় মাথাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।' আঙুল দিয়ে রগ চাপতে-চাপতে লিদিয়া বলে।

আরো ক'মিনিট গল্পগুজব করার পর সামঘিন ওঠে। লিদিয়া বাধা দেয় না কিন্তু শোবার ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

* "ত্রিশকার কোট" উপকথা। একটি লোক তার কোটে কেবল তালি দেয়; তালির কাপড় ঐ জীর্ণ কোটের অংশ।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও ঘুমুচ্ছে! রাতে আবার ওর অনিদ্রা হয় কিনা—। আচ্ছা, বিদায়...'

'কি অপ্রয়োজনীয় সাক্ষাৎ,' সামঘিন যেতে-যেতে ভাবে। ঠাণ্ডা কুয়াশার ভেতর দিয়ে চলেছে। রাস্তাটা মফঃস্বলের মতো, দু-পাশে ব্যারাক-ধরনের বাড়ি। কৃত্রিম দাঁতের পাটি যেন। শুধু কাঠের বাড়িগুলোই যেন আসল দাঁত, যদিও ক্ষয়ে-ক্ষয়ে আসা।

বেঁটেখাটো লোকেদের জার', সামঘিন আবার আবৃত্তি করে, তিক্ত-বিরক্তির সাথে। 'ঈশ্বরে গিয়ে মুখ লুকোচ্ছে—বুদ্ধিজীবীদের প্রতিস্থাপনা...'

কল্পনায় দেখতে পায় আবার সেই পায়রা-রঙের ছোট্ট মানুষটি। পেছনের পটভূমিতে অলিন্দ-দ্বারের হিমানী-শুভ্র শার্সি। ওই ছোট্ট মানুষটার আকারই যেন এক বিশ্রী রূপক। ওই বিশাল প্রাসাদের নানা বাকহীন অংশের মতোই সে যেন নিষ্প্রাণ, অমনি নিস্পৃহভঙ্গীতে নতজানু মানুষের গর্জনরত উদ্বেল পিণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটার কথা ভুলে যেতে চায়, যেমন চায় লিদিয়া ও তার স্বামী... কথাও ভুলতে।



কয়েক মাস পর আবার জারের দর্শন হলো। ক্লিম এক রোদ-ঝলমলে গ্রীষ্ম-দিনে স্তারাইয়া-রুশা যাচ্ছিল। নড়বড়ে রেলগাড়ী ঝকর্-ঝকর্ করতে করতে নভগোরদ-প্রদেশের অবারিত মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে অলস-মন্থর গতিতে। গোটা রাস্তা জুড়ে লাইন-বরাবর ঝক্‌মকে নতুন মুখ, প্রতি পঞ্চাশ পা অন্তর এক-একজন সৈন্য পাহারা। সূর্যকিরণে বেয়নেটগুলো চকচক করছে। একই চেহারার অজস্র মুখে টিনের চোখগুলো ঝিলিক দিয়ে-দিয়ে উঠছে, মুখগুলোর সাদৃশ্য যেন জারের কোপেকের সঙ্গে তুলনীয়। কিষাণেরা,—মেয়েমদ্দা সবাই, উৎসবের বেশ প'রে বিচালী জড়ো করছে। লাইনের কাছে আছে যে-মেয়েগুলো তারা যেন ভেনেৎজিয়ানভের আঁকা ছবি, পট থেকে বেরিয়ে প'ড়ে ঘুর্‌ঘুর্ ক'রে বেড়াচ্ছে। যারা দূরে রয়েছে তাদের দেখে মনে হয় মস্ত-মস্ত ফুল, হলুদ-সোনা রঙের আর পপি। গাড়ীর কামরায় সামঘিন ছাড়া আর দু'জন চলেছে। একজন মসৃণ চেহারার ছোট্ট বুড়ো, চাষী-কোট পরা, গলায় বিরাট রুপোর মেডেল,—পাকা দাড়ির ভেতর থেকে উঁকি মারছে তার গোলাপী মুখ। তার পাশের লোকটি বিশাল গোঁফওয়ালা। মস্ত বড় ভুঁড়িটা হাঁটুতে ভর রেখে বেশ যেন জিরিয়ে নিচ্ছে। ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে বসেছে, ঘর্মাক্ত কলেবর। গোঁফজোড়া চিংড়ীমাছের মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে নড়ছে। প্রতিমুহূর্তেই লোকটি ঘোঁত্-ঘোঁত্ ক'রে উঠছে। ছোট্ট একটা স্টেশনে গাড়ী থামলে ওদের কামরায় উঠল এক সৈন্যরক্ষী সার্জেণ্ট আর দু'জন ভদ্রলোক। সার্জেণ্ট তার হলদে চোখ পাকিয়ে কামরার সব যাত্রীর দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, অসাড়-পঙ্গু লোকের মতো ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে হুকুম দিল :

'জানলাগুলো সব বন্ধ করো। খড়্‌খড়ি টেনে দাও। খবর্দার, বাইরে তাকাবে না।'

এক ভদ্রলোক এসে সামঘিনের পাশে বসল। বেশ লম্বামতন, মুখটা থেঁত্‌লান, নাকটা মোটা। ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে হাতের ওপর ব্যালান্স করতে করতে র‍্যাকের ওপর রেখে দিল। ফোঁস-ফোঁস্ ক'রে নিঃশ্বাস ফেলছে। মেডেল-ওয়ালা বুড়োটা

অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ ক'রে খড়্‌খড়ি টেনে দেয়। গোঁফ-ওয়ালা ভদ্রলোক সশব্দে প্রশ্ন করে : 'ব্যাপারটা কি?'

'মানে সম্রাটের জন্যে আমরা রাস্তা পরিষ্কার ক'রে রাখছি,' বুড়ো লোকটা হাসতে হাসতে বুঝিয়ে বলে।

সামঘিন করিডরে চলে যায়। ধুলোভরা একটা খড়খড়ির একপ্রান্ত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাইরে উঁকি মারে প্ল্যাটফর্মের দিকে। দেখল স্টেশনের কর্মরত স্টাফ কাঠের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে, সকলের সামনে স্বয়ং স্টেশনমাস্টার। স্টেশন পেরিয়ে জ্যাকেট আর চাষীকোট পরা মানী লোকেদের এক জমাট প্রাচীর যেন দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনাদের না বলা হয়েছে যে বাইরে তাকাবেন না,' সামঘিনের কাছে আসতে-আসতে এক ভদ্রলোক ধীর-মন্থর গলায় ব'লে, কাছে এসে ওকে জানালা থেকে কনুইয়ের গুঁতোয় সরিয়ে দেয়। কিন্তু খড়্‌খড়িটা না-ছুঁয়েই সে চলে যাওয়ায়, সামঘিন দেখতে পেল জানালার পাশ দিয়ে এক অপূর্ব-সুন্দর ইঞ্জিন ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ভোঁস-ভোঁস্ ক'রে ধুঁয়ো ছাড়তে ছাড়তে। পেছনে নতুন-নতুন গাড়ীর সারি। একেবারে শেষের গাড়ীটায় দেখল কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে শৌখিন এ্যাকোয়ারিয়ামের ট্রাইটনের ন্যায় জার বসে আছেন, ব'সে ব'সে হলুদ কর্ডে বাঁধা সোনার সিগারেট কেস্ দোলাচ্ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল বহুদূরে, কারো দিকে চেয়ে সুবিন্যাস্ত মস্তকটিকে নাড়ালেন। স্টেশনে চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠল :

'হুর্‌রা!'

মস্তবড় একটা হাঁই তুলে সেই ভদ্রলোক ফিরে গেল। মোটা লোকটা গোঁফ সোজা করতে করতে সামঘিনকে বলে : 'আপনি তো বেশ সাহসী।'

'উনি তাহলে চলে গেলেন?' বুড়ো লোকটা বিড়বিড় ক'রে ওঠে। হতভম্ব দৃষ্টি। 'উঃ, হায় ভগবান! আর আমাকে ওঁর কাছে হাজির হতে হবে। আমার ভাইপোই আমাকে পথে বসাল, মূর্খ কোথাকার? গতকালই আমার রওনা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, হতচ্ছাড়া! বুঝলেন, সম্রাটের পরম করুণায় একটা কেসের মীমাংসা আমার স্বপক্ষেই হয়েছে।'

ট্রেনটা হঠাৎ খুব জোরে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। ঘটাং ঘটাং ক'রে লোহার জোড়ে শব্দ ওঠে, বাফারে বাফারে ধাক্কা খায়, বুড়ো লোকটা হক্‌চকিয়ে ওঠে, আর তার দুঃখের কাহিনী শ্রুতির বাইরে চলে যায়। এই প্রথম জার সামঘিনের মনে কোন চিন্তার উদ্রেক করে না, কোন অনুভূতিও জাগিয়ে তোলে না। ঝিলিক দিয়ে তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। শুধু রয়ে গেল সেই অবারিত মাঠ, শস্যের দৈন্য, রেললাইন-জোড়া ছোট ছোট সৈনিকের এ'টে-বসানো মূর্তি। নানা বর্ণের জামা-পরা চাষী মেয়ে-পুরুষেরা চোখের ওপরে হাত তুলে ঠাওর ক'রে দেখে, একটা রাখালকেও দেখা যায়—লাল সার্টে চমৎকার ছবির মতো দেখায়। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা গাড়ীর পিছু পিছু ধাওয়া করে।

'সতের বছর ধরে বৃথাই চেষ্টা করেছি আইনকে ধরবার জন্যে...'



দু'ঘণ্টা পর ক্লিম সামঘিনকে দেখা গেল কোনো এক স্যানাটোরিয়ামের পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকত। সামনে হুইল-চেয়ারে ভারভকা এলিয়ে পড়ে আছে। এমন ফুলে উঠেছে যেন মস্ত এক গ্যাসের ব্যাগ। নীল মুখটা পাকা ফোঁড়ার মতো

চক্‌চকে। ভালুকচোখে অস্পষ্ট চাউনি, ঘুম-ঘুম আর বোবাদৃষ্টি। বাতাসে মাথার সামান্য কটা চুল একপাশে হেলে পড়েছে, ভুঁড়ি ছুঁয়ে-থাকা পাকা দাড়ির গোছকে উল্টেপাল্টে এক'শা ক'রে দিয়েছে, চিবুক থেকে সেগুলো এখন এক নিরবিচ্ছিন্ন স্তূপ। ফোঁস-ফোঁস ক'রে দম নিয়ে-নিয়ে সামঘিনকে বোঝায়:

'এ্যাঁ? ওঃ-হো! সাঁইত্রিশ হাজার? ও একটা বোকা। বেশ তো—বেচে দাও।' সসেজের মতো আঙুল দিয়ে চেয়ারের হাতল ধ'রে ওঠবার বৃথা চেষ্টা করে। শরীরটা কিন্তু এখন আর বাধ্য নেই। চেয়ারের চাকাগুলো গড়্‌গড়্‌ ক'রে চলে, বালির ওপর কিচ্‌কিচ্‌ আওয়াজ তোলে কিন্তু দেহটা একটুও নড়তে চায় না। অদৃশ্যে গলা ঘুরিয়ে, অবজ্ঞার সুরে বলে:

'জাহান্নমে যেতে বসেছি হে! ভেঙেগ-চুরে চুরচুর্‌ হ'য়ে গেছি! শেষ হ'য়ে এল! সারা জীবন ধ'রেই তো কত কি বানালাম, কিন্তু কিছুই বানিয়ে যেতে পারলাম না।'

তার ছাড়া-ছাড়া রুদ্ধ কথাগুলো শুনতে শুনতে সামঘিন চারদিকে চেয়ে পার্কের রাস্তায়-রাস্তায় নির্বোধ পরিচারকদের দেখে। একান্ত নিস্পৃহতায় চেয়ার ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে কত মরণোন্মুখ স্ফীতদেহ। ছোট পার্কটির মাঝ-খানে মোটা ধারার জল ঝরছে। মরচে-পড়া ঘোলাটে জল সব জায়গায় গড়িয়ে গিয়ে মাছের বাজারের আঁসটে গন্ধ ছড়িয়েছে। লম্বা ধরনের শক্তসমর্থ এক মেয়েছেলে হলুদ জেলির মতো মুখ নিয়ে পাশ দিয়ে চলে যায়, "বেস্‌ডাউয়ের" রোগে তার কাঁচের মতো চোখ দুটো কোটর থেকে ঠিকরে বের হ'য়ে এসেছে। এত জোরে মাথাটা ধরে আছে, যেন মনে হয়, মেয়েটির খুব ভয়, চোখদুটো পাছে গাল বেয়ে গড়িয়ে বালিতে না প'ড়ে যায়। বিশাল মোটা একটা মেয়েকে চেয়ারে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল। মেয়েটা ঢোলে, গোলাপী রঙের আধখোলা মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। খাটো-পায়ের একজন লোক বলের মতো তিড়িং-তিড়িং ক'রে চলে গেল, পায়ে-পায়ে তাল রেখে মাথা নাড়াতে নাড়াতে। মাথাটা ব্লাডারের মতো ফাঁপা, মুখটা কাঁচের মুখোশের মতো। সামরিক বাজনার তালে তালে, নানা ধরনের স্থূলাঙ্গ-দেহ একের পর এক পরপর চলে যায়, নিষ্ঠুর রোদের তাপে নিজেদেরকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়ে।

'একে ন্যায্য ব'লে ঠিক মানতে পারি না, ক্লিম। আমার তো সবে বাষট্টি বছর,' ভারাভকা নালিশ জানায়, কথাগুলোকে কর্কশধ্বনি তুলে চিবোয় যেন: 'আমরা যুদ্ধ করছি? আহাম্মুকী কাণ্ড। জার এসেছেন রিজার্ভিস্টদের বিদায় জানাতে। দস্তয়েভস্কিও এই শহরে বাস করতেন।'

একজন কুঁজোমতন আঁচিল-চোখের অ্যাপ্রণ-পরা পরিচারক ভারাভকার কাছে এসে পাখীর মতো কোমল কণ্ঠে জানায়: 'সময় হ'য়ে গেছে, স্যার।'

'স্নানের জন্যে,' ভারাভকা চেঁচিয়ে ওঠে: 'তারপর আমাকে ধ'রে চিপ্‌বে।'

পরিচারক ঝুঁকে প'ড়ে চেয়ারটাকে নড়াবার চেষ্টা করে। অবশেষে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে যায়। সামঘিন পার্কের বাইরে চলে এল। গেটে দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে—রোদ-পোড়া ধুলোটে কোট-পরা দুটি খুঁটি যেন। ছোট কেঠো শহরটার রাস্তায়-রাস্তায় জোর হাওয়া ওঠে, ধুলোর মেঘ আকাশে ছড়ায়, গাছপালা দুলে-দুলে ওঠে। একটা দেওয়াল ঘেঁষে ক'জন ফৌজী জওয়ান ছড়িয়ে ব'সে আছে—প্রায় জনা দশেক। বাঁধের ওপর এক সার্জেন্ট মুখে পেন্সিল কামড়ে ব'সে আছে আকাশের দিকে চেয়ে যেখানে এক ঝাঁক সাদা পায়রা উড়ন্ত চক্র কেটে কেটে ঘুরছে।

লালমুখো বাজনদারেরা অর্ধবৃত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য ট্রাম্‌পেট্‌ ফুঁক্‌ছে। নানা রকম বেহায়া চিৎকার আর ট্রামপেটের বুম্‌-বুম্‌ শহরটার অবিরত কর্কশ-

গর্জনের মধ্যে গিয়ে মেশে। এমন প্রচণ্ড সে আওয়াজ যে মনে হয় বাগানে বাগানে গাছপালা বুঝি কাত হ'য়ে পড়ল; পিঠে বোঁচকা বাঁধা দাড়িওয়ালা চাষীর দল আর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে পথচলা মেয়েরাও ওই শব্দে ভয় পেয়ে বুঝি দিক বিদিক ছোটে, যেন তাড়া-খাওয়া আরশোলা।

কাঠের দেওয়ালে আগুনে-মাথাটা চেপে ধ'রে দু'টো তক্তার ফাঁকের মধ্যে দিয়ে একজন চাষা চিৎকার ক'রে ওঠে :

'দু' রুবল তিরিশ—নেবে? আমার পরাণটাই যে বেচে দিচ্ছি, ওরে কুত্তার ছা...'

দেওয়ালে দমাদম্ লাথি চালায়। ডান হাত দিয়ে মারে ঘুঁসী এলোপাথারি। বাঁ-হাত থেকে ঝুলছে পুরনো-জীর্ণ একটা অ্যাকর্ডিয়ন, তার ঝোলা-ঝোলা বেলোর জন্যে যন্ত্রটা যথেষ্ট নুয়ে পড়েছে।

'হায় রাম—' সমানে চেঁচাচ্ছে। 'ঘাট ক্কোপেক? অত্তো সখ নাই!'

অ্যাকর্ডিয়নটাকে দেওয়ালে ঠাস ক'রে ছুঁড়ে মেরে, পায়ের তলে ফেলে মাড়ায়। দুই লাথিতে চুর্‌চুর্ ক'রে দিয়ে গম্ভীর পদক্ষেপে পথ দিয়ে দ্রুত চলে যায়।

শান্ত পোরুশার তীরে চওড়া-দাড়িওয়ালা এক রিজার্ভিস্ট ফৌজী টুপী মাথায় চড়িয়ে বসে আছে, নীলাক্ষি অ্যাডনিস যেন। খোলা মাথা একটা মেয়েছেলেকে এক হাতে আদর করে, মেয়েটার গোলাপী মুখ আর ফুলো-ফুলো চোখ। অন্য হাতে ধরা আছে মেয়েটারই উজ্জ্বল মাথার রুমাল আর এক বোতল ভদ্‌কা। লোকটা দেখতে বিশাল, দশাসই জোয়ানও বটে, তবু গলার স্বর আশ্চর্য সরু, মেয়েদের মতো। বলছিল :

'তবে, তাই হোক্। তা'হলে, বেচে দাও ঘোড়াটা...' মুখ-খিস্তি ক'রে ওঠে।

মেয়েটা ওর কাঁধে মুখ গুঁজে করুণ স্বরে কাতরায় : 'আলেকজাণ্ডার, দোহাই. .'

'থাম! চুপ কর ! আমাকে ভাবতে দাও...'

বোতলটার গলা মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘাড়টা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়েছে। ঘন দাড়ির গোছ ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে। গিলেই যায়, গিলেই যায়, যতক্ষণ না চোখ দুটো ভ'রে জল এল। তারপর শেষ না-হওয়া বোতলটাকে এক ঝটকায় নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেঁপে-কেঁপে উঠে বিরক্তিতে মাথা নাড়ে। আবার চেঁচিয়ে ওঠে :

'তা'হলে বেচেই দাও! শেষ হয়ে যাক্। কি দাঁড়াল, ঠিক সে-ই অবস্থা—অথচ এ্যাদ্দিন কি খাটুনিটাই না খাটল্যাম—' আবার অরেকটা খিস্তি দিয়ে কথাটা শেষ করল।

মেয়েটি ওর হাত থেকে রুমালটা কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে ওর কপাল থেকে ঘাম আর চোখ থেকে জল মুছে নেয়। আরও একটু তারস্বরে কাঁদুনি গেয়ে ওঠে : 'ওগো, আমাদের ওপর কেউ একটুও দয়া করে না...'

'চুপ কর! মারব এক—'

লাফ দিয়ে উঠে পড়ে মেয়েটিকে হিড়-হিড় ক'রে টেনে তোলে। লম্বা লম্বা বাহু আর আঙুল দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে অনুভব করে, চুমু খায়। তারপর মেয়েটিকে ঠেলে একপাশে ক'রে দিয়ে মুঠি পাকিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে :

'মনে থাকে যেন!'

'আলেকজাণ্ডার—'

'চুপ কর! বুঝলে তো? বেচে দিও! এস এখন!'

'হায় ভগবান! কি ক'রে তা হবে?' মেয়েটি মৃগী-রোগীর মতো চিৎকার ক'রে ক'রে ওঠে। পথ হাতড়ে হাতড়ে চলে, যেন অন্ধ। চাষীটা হাত নাড়ায়, মুখটা হাঁ করে তোলে, এদিক-ওদিক মাথা নাড়ায়। মনে হয় ওকে যেন কেউ গলা টিপে ধরেছে।

সেই মুহূর্ত থেকে সব রিজার্ভিস্ট সামঘিনের চোখে যেন মুখ হাঁ-করা আর গলা টিপে ধরা মনে হলো। বাতাস, ধুলো, মেয়েটির কাতরানি, মাতাল-গান আর অবিরাম অর্থহীন মুখখিস্তিতে ওর মাথা ঘুলিয়ে গেল। গির্জার পর্চের সিঁড়িতে গিয়ে উঠল। সেখানেও ক'জন লোক দাঁড়িয়ে, তারা সবাই শান্ত। তাদের মধ্যে দেখল সেই ছোটখাটো বুড়ো মানুষটাকে, সেই মেডেলওয়ালা, ট্রেনের সেই সঙ্গী।

'যুদ্ধ এখন অনেক সোজা,' বুড়ো বলছিল: 'রাইফেলের ওজনও কমে গেছে, অফিসারদেরও।'

'তা বটে।'

স্কোয়্যারে অলস শহুরে লোকেদের ভীড়। লোক উপচে পড়ছে সেখানে। সবাই যেন পার্বনের পোশাক পরে এসেছে। ছাতার নীচে মেয়েগুলোকে দেখাচ্ছে যেন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা। চারদিক থেকে রিজার্ভিস্টরা ঠেসে-ঠুসে আসছে, যেন প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত। পিঠের ওপর তাদের কিট্‌গুলো দুলে-দুলে উঠছে, দৌড়ুচ্ছে, সম্মোহিত হয়ে পড়েছে যেন। লক্ষ্যটা সেই যেখানটায় সামরিক ট্রাম্‌পেটের গান আর বুম্‌-বুম্‌ আওয়াজের নির্লজ্জ চিৎকার।

'প্রশান্ত মহাসাগর,' সামঘিনের মনে পড়ল 'জাপানীদের প্রশান্ত মহাসাগরে লাথি মেরে ফেলে দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি ছুটে চলেছে। 'উঃ, কী বিকট দুঃস্বপ্ন!'

কিছুটা হাস্যকর এবং কিছুটা দুঃস্বপ্নের ঘোরও ছিল বই কি দৃশ্যটায়। যেভাবে দাড়িওয়ালা মুখ হাঁ-করা লোকগুলো ছুটে-ছুটে পরস্পরের থেকে এগিয়ে যেতে চাইছে, ছোট-ছোট কাঠের বাড়িগুলোকে পেছনে ফেলে দৌড়ে ছুটে চলেছে, বিভিন্ন গলায় প্রাণোচ্ছল শাপ-শাপান্ত করছে, মৃগী-রুগীর মতো ছটফটে মেয়ে-ছেলেগুলোকে গাল পাড়ছে, তাদের চিৎকার আর কাতরানি পেছনে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছে। প্রায় সব বাড়ির সব জানলাই একভাবে অর্গলবদ্ধ। মনে হয় যে বাড়িগুলোর অধিবাসীরা, সু-ভুক্তা বৃদ্ধা পরিচারিকা বা তরুণী, ধীরস্থির বৃদ্ধ পুরুষ এবং স্ত্রী যারা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতেই অভ্যস্ত—ধূলি-ধূসরিত কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে গ্রামবাসীদের দেখছে, হঠাৎ যেন ওরা উন্মাদ হয়ে গেছে।

'মহাসাগর—'

ভীড় পাতলা হয়ে পড়ছিল। গরম ধুলোর ঝড়ে মানুষগুলো যেন ভেসে গেল। স্কোয়্যারের ওপর পড়ে রইল শুধু কাঠের তক্তার স্তূপ, বিশৃঙ্খলা, নানা-রকম বোতল-ভাঙা, একটা পিপে যার ওপর বসেছিল ধূসর রঙের এক সৈনিক, হাঁটুর ওপর রাইফেলটাকে আড়াআড়ি ক'রে রাখা। ঘূর্ণি হাওয়া এসে রঙ-চঙে মিষ্টির মোড়ক আর খড়ের টুকরো উড়িয়ে নিয়ে গেল, গির্জার পর্চে এসে আছড়ে পড়ল, ফুটো-ফাটার মধ্যে দিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দ তুলল। সামঘিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখল। এই শহর আর এই লোকজনের ওপরে বিরক্তি ধরে গেছে। স্যানাটোরিয়ামে ও ফিরে গেল। যদি পারত এসব এড়িয়ে যেতে, নিকনোভার ছোট কনভেন্ট ঘরে গিয়ে পড়তে! তাহলে তো এই দুঃস্বপ্নের কথা ওকে বলা যেত। তারপর স্রেফ ভুলে যাওয়া।

। *

তিন দিন পর ক্লিম বাড়িতে বসেছিল। দিনের কাজ শেষ ক'রে স্টাডিতে ডিভানের ওপর বিশ্রাম ক'রছিল। সন্ধ্যা হবার প্রতীক্ষা, তাহলেই নিকনোভার ওখানে যাওয়া যাবে। ভারাভারা গ্রামে চলে গেছে বেড়াতে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে। ঘরের মধ্যে এসে পরিচারিকা জানায় যে গোঘিন এসেছে।

'টেলিফোনে? ওকে বলে দাও যে...'

'এই যে তিনি এখানে।'

সামঘিন উঠে দাঁড়ায়। মনে মনে নিশ্চিত, ওই ফুলবাবুটি যে বিপ্লব-বিপ্লব খেলা করে, নিশ্চয়ই কোন সাহায্য চাইবে। অস্বীকার করাও সম্ভব হবে না। ভুরু কুঁচকে ডাইনিং রুমের দিকে যেতে-যেতে চশমা জোড়া ঠিক ক'রে নেয়। গোঘিন ফ্ল্যানেল-স্যুট আর সাদা জুতো পরে ঘরময় পাইচারি করছিল। অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাকে। সামঘিনের হাত ঝাঁকিয়ে মৃদুস্বরে টেনে টেনে বলল—পাইচারি কিন্তু বন্ধ হলো না :

'নিকনোভা কোথায় গেছে জানেন?'

'না তো।'

'আচ্ছা, ওর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? মানে সাধারণভাবে।'

'খুব সামান্য। কেন?'

গোঘিন টেবিলে এসে বসে। পকেট থেকে ইচ্ছে করেই সিগারেট কেসটা বের করে সামঘিনের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কথার জবাব কিন্তু দেয় না। বরঞ্চ ওই আবার প্রশ্ন করে :

'কিন্তু বহুদিন ধরেই তো জানা—বেশ বন্ধুই তো আপনারা?'

প্রশ্নটা খুব চাপা-সুরে উদাস-কণ্ঠের, যেন নিকনোভার কথা ভাবছেই না, ভাবছে অন্য কোন কথা। তবুও কথাগুলো সামঘিনের কানে শেল হানে। এসব প্রশ্ন যে কেন, সে-কথাটা যাতে ভাবতে সময় না পায়, তাই ও তাড়াতাড়ি কথা বলা আরম্ভ ক'রে, যদিও বিব্রত কণ্ঠ :

'বন্ধু? হ্যাঁ, তা'—মানে, কি রকম বলি? অন্ততঃ, কমরেডের মতন সম্পর্ক—সম্পূর্ণ বিশ্বাস...'

চুপ হয়ে যায়। সিগারেট জ্বালানর জন্যে গোঘিন কি কসরতটাই না করছে। কি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়েই না সিগারেটটা দেখল! কল্পনায় যে সিদ্ধান্তটা ক'রে তুলল সেটা মনের ভেতরে খুব নাড়া দিয়ে উঠল। চশমা খুলে ছাদের দিকে স্মৃতি রোমন্থনের ভঙ্গীতে চেয়ে সামঘিন বলল :

'আচ্ছা, দাঁড়ান দেখি—প্রথম যখন ওকে দেখি সেটা, মনে হয় প্রায় বছর দশেক আগের কথা। তখন ও নারাদোপ্রৎসিদের দলে, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে।'

'ওঃ', গোঘিন মাথা নুইয়ে বলে ওঠে, উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গীতেই যেন, সমর্থনের সুরে নয়।

'তাইতেই কিছু— ?' সামঘিন জিজ্ঞেস করে।

'তারপর?' গোঘিনের প্রশ্ন।

'তারপর ওকে দেখলাম লিউতভের আসে-পাশে—জানেন তো, বিপ্লবের এমন একজন মেসেনা আছে, আপনার বোন তো তাই নাম দিয়েছে।'

'ল্যুবাশা সমভা ওকে যখন "শ্রমিক আন্দোলনের সহায়ক সমিতি" গড়ে ওঠে

সেখানে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয়—বা, ঠিক মনে পড়ছে না বুঝলেন—বোধহয় রেড্-ক্রশেই হবে।'

'হুঁ,' গোঘিন উঠে ঘরে পাইচারি করতে করতে বলে। হাতে তার সিগারেট কিন্তু টানতে যেন অনিচ্ছা। সামঘিন মনে মনে বুঝতে পারে লোকটা কি বলতে চায়। কিন্তু তাতে ভয় পাওয়াটা একটুও কমল না, যখন শুনল গোঘিন বলছে :

'সংক্ষেপে বলতে গেলে—সেনারক্ষীদের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে এমন সন্দেহের কারণ ঘটেছে।'

'নাঃ এ অসম্ভব!' সামঘিন আন্তরিক ভাবে বিস্ময়োক্তি ক'রে ওঠে, যদিও মনে মনে এই কথাটাই ও আশঙ্কা করছিল। এমন কি মনে হলো, অনেক দিন আগেই এ-ধারণা ও করেই রেখেছিল। অদৃশ্য কালিতে লেখা নোটটা পড়বার পর ওর ওই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু সে-কথা গোপন রাখতে হবে, শুধু গোঘিনের কাছ থেকেই নয়, নিজের কাছ থেকেও। আবার বলে উঠল : 'এ অসম্ভব।'

'কেন?' গোঘিন ধীরস্বরে প্রশ্ন করে—'এমন তো কতই ঘটেছে—ঘটেও থাকে।'

'আপনাদের কাছে প্রমাণ কী আছে?' সামঘিন জিজ্ঞাসা করে, তেমনি মৃদু স্বরে। গোফিন থেমে যায়, কাঁধ ঝাঁকিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালায়। এক দৃষ্টিতে শিখার দিকে তাকিয়ে বলে :

'কিছু—সংশয় দেখা দিয়েছিল ওর আচরণে। কেমন যেন বেঠিকগোছের। যখন আভাসে-ইঙ্গিতে কথাটা বলা হ'ল—অবশ্য মানতেই হবে যে বলাটা হয়েছিল বড় অসাবধানতায়, আনাড়ির মতোই--তখন ও অদৃশ্য হয়ে গেল।'

বড় ধীরে-ধীরে গোঘিন কথাগুলো বলল, যন্ত্রণা দিয়ে-দিয়েই যেন। সামঘিন জ্বলে ওঠে।

'আমাকে কেন জানান হয়নি?' চটে উঠে জিজ্ঞাসা করে।

'এসব কথা তো আর সকলকে জানান হয় না,' বসে পড়ে গোঘিন বলে। সিগারেটটাকে ছাইদানীতে ঠুসে দেয়। 'বুঝলেন,' আবার শুরু করে,—আরো কঠিন গলায় আরো দৃঢ়স্বরে : 'বলতে গেলে, আমি আপনার কাছে অফিসিয়্যালিই এসেছি। কমিটি থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আপনার কাছ থেকে, যেন জেনে নিই আপনি কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কিনা—ওর ব্যবহারের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা অদ্ভুত কিছু—'

'নাঃ,' সামঘিন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। বলেই কিন্তু সন্দেহ হয় বড্ড তাড়াতাড়ি বলা হয়ে গেল, যদি তাতেই সন্দেহ করে। 'আমি এসব কিছুই দেখতে পাইনি,' ধীরে-ধীরে এবার বলে। মনে-মনে ভাবে মিত্রোফানভের বিরুদ্ধে নিকনোভাই তো রিপোর্ট করেনি।

আবার ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেট-কেস বের করে আনে গোঘিন—এবারে এতে যেন অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হলো ওকে। কেসটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। ঠোঁট কামড়ে ধরে।

'শোনা যায় আপনি নাকি ওর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন,' কপালের পাশটা এক আঙুল দিয়ে চুলকোতে-চুলকোতে নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে।

সামঘিনও যেন ওর কপালের পাশে হঠাৎ একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করে।

'হ্যাঁ, ওর কাছে যেতাম—প্রায়ই যেতাম। কিন্তু সে হচ্ছে অন্য ধরণের সম্পর্ক।'

'বোধহয় সেজন্যেই আপনার চোখে কিছু পড়েনি।' গোঘিন আভাসে-ইঙ্গিতে কথা বলে।

'ওকে তো আমার মনে হয়েছিল নিরহঙ্কারী মেয়ে, কাজের ওপর খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা—বেশ সাদাসিধে মানুষ। মোট কথায়, অভিনব কিছু নয়।'

'ওর বাড়িওয়ালাও কিন্তু লোক হিসেবে একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন। তার সঙ্গে কি ওর কোন সম্পর্ক ছিল, জানেন?'

'না, আমি জানি না,' সামঘিন জবাব দেয়, মনে হয় কপাল ফেটে ঘাম ঝরছে, চোখ দুটো শুকিয়ে যাচ্ছে। 'ওর যে কি কাজ ছিল তাও আমি জানি না। ও কি টেকনিক্যাল দিকটায় ছিল? না, প্রচারে? আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ গোপনতা বজায় রেখে চলেছিল। আর রাজনীতি আলোচনাও আমরা করতামই না। সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা ওর বেশ সুন্দর জানা আছে, আর তাইতেই তো আমার আগ্রহ। একটা বইয়ের জন্য এসব আমার দরকার।'

সামঘিন বোঝে ও বড় বেশী কথা বলছে। যে-লোকটা এত কাছ থেকে ওকে লক্ষ্য করছে, শুনছে শুধু ওর মুখের কথাই নয়, মনের চিন্তা-ভাবনাকেও, তার সঙ্গে তো আরো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলা উচিত। চিন্তা-ভাবনাগুলোও তো নির্দোষ নয়; ভাসা-ভাসা, অসংলগ্ন, অবিশ্বাসী কিন্তু কথা থামাতে পারল না। যেন ভেতর থেকে অন্য লোকে কথা বলছে, ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। ভয়ও পায়, ও-লোকটা যদি সেই নোটটার কথা বলে দেয় বা মিত্রোফানভের কথা।

গোঘিন নির্বাক। তার নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে ওঠে। বসে-বসে পা দোলাচ্ছে সে। সামঘিনের কেমন যেন মনে হয় যে গোঘিনের একটা কান, যেটা ওর দিকে রয়েছে, সেটা অস্বাভাবিকভাবে টান্-টান্ হয়ে উঠেছে।

'বোধহয় ও আমাকেও সন্দেহ করে?' হঠাৎ মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। জোরে চেঁচিয়ে ওঠে: 'এ যে অতি ভয়ঙ্কর!'

"বিশ্রী ব্যাপার," গোঘিনও সায় দেয়। আঙুলগুলো মটমট ক'রে ফোটায়। 'কিন্তু আসল কথা হলো মেয়েটা উবে গেছে...'

বসেই থাকে গোঘিন একই ভঙ্গীতে। সব প্রশ্নই করা হয়ে গেছে, চলে গেলেও যেতে পারত, তবুও। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে: 'এমনভাবে চলে গেল যে...'

দরজায় টোকা পড়ল।

'কে? আমি এখন ব্যস্ত,' সামঘিন চিৎকার ক'রে জানায়।

'টেলিগ্রাম।' পরিচারিকা উত্তর দেয়।

তার হাত থেকে নীল খামটা নিয়ে না খুলেই টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে রাখে। কিন্তু দেখল সঙ্গে-সঙ্গে গোঘিনের দৃষ্টিও সেদিকে পড়েছে, ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। তাই দেখে, ও ভয় পেয়ে গেল। নিকনোভার কাছ থেকে তো আসে নি?

মনে-মনে ঠিক করে: 'নাঃ, খুলব না।' কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত ওই নীল চৌকো কাগজটার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। গোঘিন যে ওকে লক্ষ্য করছে তা বেশ বুঝতে পারে, হয়তো অপেক্ষা করছে।

'স্টুপিড, সন্দেহবাতিক,' মনে-মনে ভাবে। কোন তাড়া নেই, ধীরে-ধীরে টেলিগ্রাম খোলে। জোরে-জোরে পড়ে, যন্ত্রের মতো:

'তিমোফেই মারা গেছেন। অবিলম্বে শবদেহ নিয়ে এস। সামঘিনা।'

মনের ভাবকে একটুকুও চাপবার চেষ্টা না ক'রে ও বলে:

'মা তার করছে আমার সৎ-পিতা মারা গেছেন। আমাকে স্তারাইয়া-রুশা যেতে হবে।'

'হ্যাঁ, বড় বিশ্রী ব্যাপার,' গোঘিন বিমর্ষ সুরে আবার বলে ওঠে। প্রশ্ন করে: 'যদি নিকনোভা আপনাকে চিঠি লেখে, ঠিকানাটা আমাকে জানাবেন?'

'নিশ্চয়ই। জানাব না কেন?'

'আচ্ছা।...অবশ্য এখন এসব আমাদের দুজনের মধ্যেই রইল, বুঝলেন। যদ্দিন না ঠিক সময়টি হচ্ছে। তাছাড়া, বোধহয়, সবকিছু ওর পক্ষে বুঝিয়ে

দেওয়াও যেতে পারে,' গোঘিন বিড়বিড় ক'রে ওঠে।

সামঘিনের হাতে দুর্বল-ঝাঁকি দিয়ে চলে গেল।

'আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে বোধহয়,' সামঘিন সাইড-বোর্ডের দিকে যেতে-যেতে ভাবে। গেলাশে ভদ্‌কা ঢেলে নেয়।

নিজেকে বিধ্বস্ত মনে হয়, অপমানিতও। স্টাডিতে যেতে-যেতে পাও টলে ওঠে। রগের কাছে কট্‌কট্‌ ক'রে উঠছে যেন ভেতরে কোন ঘড়ি লুকানো রয়েছে।

'আমার নিজের সন্দেহের কথাটাও ওকে বলা উচিত ছিল,' ডেস্কে বসে পড়ে ভাবে। কিন্তু—আবার উঠে দাঁড়ায়, ডিভানে গিয়ে শোয়। 'যত সব ননসেন্স, আমার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। ওই তো এসব আমার মাথায় ঢুকালো।'

চশমা খুলে ফেলে চোখ দু'টো শক্ত ক'রে বন্ধ করে। দুঃখ হচ্ছে, ওই নারীকেও হারাতে হলো। নিজের জন্যেও দুঃখ হয়। তিক্ত হাসি হেসে আত্ম-সংলাপ শুরু করে :

'কেন? আমার ভাগ্য এমন কেন হবে যে, সব সময় এই রকম আহাম্মুকের মতো পরিস্থিতিতে আমাকে পড়তে হবে?'

আনফিমিয়েভনা ডাইনিং-রুমে এল। সামঘিন ওকে বলে দেয় যে ওর ব্যাগটা যেন গুছিয়ে রাখে, ভারভারাকেও যেন একটা তার ক'রে দেয়। তারপর তুচ্ছ চিন্তার স্রোতে নিজেকে এলিয়ে দেয় সামঘিন।

'ওই মেয়েটাকেই তো উসভ বলেছিল কাণ্ডজ্ঞানহীন। সেনারক্ষীদের সাহায্যই যদি ও ক'রে থাকে, তবে তা' নিশ্চয়ই ভয়ের কারণেই। হতে পারে কোন কর্নেল ভাসিলিয়েভ ওকে ভয় দেখিয়েছে। নিশ্চয়ই টাকার জন্যে এসব ও করে না? নাকি, প্রতিহিংসা নেবার জন্যে, যারা ওর ওপর হুকুম ক'রে খাটিয়ে মারে? উসভ, ভ্লাসভভ, পয়ারকভ, এই সব জাতীয় লোকদের ওপর তিক্ততাটা সহজবোধ্য, যদিও ওর স্বভাবের মধ্যে বিদ্বেষ কিছু নেই। আর তা'ছাড়া এখনো তো কিছু প্রমাণ হয়নি' নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ডিভানের ওপর এক মুষ্ঠ্যাঘাত ক'রে বলে ওঠে : 'কিছুই প্রমাণ হয়নি!'



রাতে ট্রেনে যেতে-যেতে আবার সেই সব অতি-পরিচিত আলো প্রতিবারের মতো জানালার বাইরে সাঁ-সাঁ ক'রে চলে গেল, সেই কালো-কালো গাছের দুলুনি, যেন গাড়ীর ঘাড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। নিকনোভার কথা বার বার মনে পড়ছে। চেষ্টা করে মনে করতে কখন কোন্‌ মুহূর্তে মেয়েটা তার নিজের কথা ওকে খুলেমেলে বলতে চেয়েছিল আর ও সেটা বুঝতে পারেনি, তার আকাঙ্ক্ষাটাকে ধরতে পারেনি। কিন্তু না, চোখের সামনে শুধু অভিব্যক্তিহীন একটা মুখ ভেসে ওঠে,—'মেয়েলি বৈচিত্র্যহীনতায়' হিমায়িত। নিকনোভার অসাড় ভাবে-ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট হয়ে ওই তো তার বোবা-মনোযোগকে একদিন ওই নামে অভিহিত করেছিল। মনে পড়ল মনোযোগটাতেও অনেক সময় ঔদাসীন্যের আভাস থাকত। ইনোকভের উক্তি যখন তাকে শুনিয়েছিল : 'মানুষ কথা নিয়ে এমন খাবি খায় যেন ডাঙায় তোলা মাছ,' তখন সে যে জবাবটা দিয়েছিল সেকথা ও আজও ভোলে নি। একটু হেসে বলেছিল : 'অপূর্ব রসিকতা, কিন্তু—সত্য।' হ্যাঁ, বাক্‌সংযম ক'রেই ছিল এতদিন, যত না বলত তত শুনে নিত। নিকনোভাই বোধহয় একমাত্র লোক যার

কোনো আশ্চর্য-উক্তি মনের কোনোখানে গেঁথে নেই, শুধু ওই একটা ছাড়া : 'অপূর্ব রসিকতা কিন্তু সত্য।' যেন মেয়েটার ধারণা যা-কিছুই রসের কথা তাই বোধহয় সাধারণতঃ মিথ্যা। সব মিলিয়ে, মানুষ হিসাবে সে একেবারেই স্বাভাবিক, সহজ-সাধারণ।

'মিগ্রোফানভের মতো ও কথার পেখম ছড়াতে পারত না।'

ঠিক এই জায়গায় পেঁৗছে সামঘিনের মনে হলো, মিগ্রোফানভকেও তো প্রথমে প্রখর বাস্তব বুদ্ধির স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু শেষে সেও তো তার কর্তব্যচ্যুত হয়েছে—অবশ্য, উল্টো দিক দিয়ে, কিন্তু তবুও তো বিশ্বাসভঙ্গ।

'কোনই প্রমাণ নেই যে ও বিশ্বাসঘাতিনী,' সামঘিন আবার নিজেকে মনে করিয়ে দেয়। 'শুধুই সন্দেহ।'

ট্রেন ঢাল বেয়ে নামে। কানে তালা লাগার মতো প্রচণ্ড শব্দ, লৌহ-দানবটার সারা দেহে যেন ঝনাৎকার উঠছে। কামরার পাটাতনের তলে, কোন্ একটা অংশ সকরুণ ঠন্-ঠন্ আওয়াজ তুলেছে :

'বড়-বড়—বড়-বড়—ঠক্, সর-সর—ঠক্।'

ভয়-মাখান আর্ত-বাঁশী বাজিয়ে ট্রেনটা একটা ব্রিজের লৌহপিঞ্জরে গিয়ে দৌড়ে ঢোকে। মনে হয় পুলটাকেও বোধহয় সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে, গার্ডারের হেলানো কড়িগুলোকে যেন বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছে। খাঁচাটাকে শেষ ক'রে, রাস্তা থেকে পাহারাদারের একচোখওয়ালা কুঁড়ে-ঘরটাকে উধাও ক'রে দিয়ে, গাড়ীটা যখন এগিয়ে চলল তখন তার ঝনাৎকার অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। পাটাতনের নীচে ঠন-ঠন্ শব্দটা অনেক স্পষ্ট হয়েছে :

'বড়-বড—বড়-বড়—ঠক্-ঠক্, বড়-বড়-ঠক।'

সামঘিনের মনে হয় দশ-বছর ধরে ও দুই রাস্তার মোড়ে ধুলোর মধ্যে বাস করছে। কোনটা ধরেই চলতে মন চায় না। আগে এ-কথাটা ভাবেনি, কিন্তু এখন সব কিছু অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল, অনেক বেশি ভীতিকর। এমন জীবনের পথিক ও একাই নয়, শ'য়ে-শ'য়ে, হাজারে-হাজারে এমন লোক আছে। মনে হলো এ-কথাটা জানা আছে। ঘূর্ণিটা ক্রমশঃ বন-বন ক'রে পাক খাচ্ছে, উত্তাল মাতাল বেগে। বাধা দেবার শক্তি যাদের নেই, পাশ কাটাতে যারা না পারে, তারা ঘূর্ণির আবর্তে পড়ে চলে যাচ্ছে। আর কুতুজভ, পয়ারকভ, গোঘিন, উসভের দল অক্লান্ত-ভাবে উন্মত্তের মতো সেই ঘূর্ণিরই ইন্ধন জোগায়। এই সব লোকেরাই অত্যাশ্চর্য গতিতে দিন-দিন অসংখ্য হয়ে পড়ছে। আর যারা ভুল বোঝে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে, তাদেরই ওপর এরা হুকুম চালায়, কঠোর এবং অপমানকর আদেশ দেয়।

তাতিয়ানার কথা মনে পড়ল। কুড়ি বছরের মেয়েটা এক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ প্রৌঢ় প্রফেসরের মুখের ওপর বলল কিনা :

'আপনি এমন যুক্তি দেখান যেন আপনার বিমাতা, ইতিহাস, এসে আপনাকে আদেশ করছে : ভানিয়া, বিপ্লব কর! কিন্তু আপনি বিমাতাকে বিশ্বাস করেন না, আপনি বিপ্লব চান না। কাজেই, বেজার মুখে আপনি আমাকে এডুয়ার্ড বার্নস্টাইনের কোরাণ পড়িয়ে শোনান, তার যেসব তর্ক-মীমাংসা তারই সমর্থনে রিখটার এবং লা বন আউড়িয়ে বলেন : আমরা যেন কখনই বিপ্লব না করি!'

ক'মাস জেলে কাটিয়ে গোঘিনা খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে। এখন ওর কথাবার্তায় একটা ব্যক্তিগত সুরের আমেজ। সামঘিনের স্মৃতিতে তাতিয়ানার সঙ্গে ওর সাক্ষাৎকারটা ভেসে উঠল।

*

মস্কোর কাছে জনৈক লিবারেলের কাশ্মির-সামার-হাউসে সান্ধ্য-মজলিশ বসেছিল। অনুষ্ঠানের রত্ন ছিলেন এক আধুনিক কেতা-দুরস্ত লেখক। ভদ্রলোকের মাথাটা বেশ একটু মোটা, মুখখানা ভাবলেশহীন আর কাঠের মতো নাকের ওপর একজোড়া পাঁশনে। লোকটার সংগে সার্মাঘনের আগেও দেখা হয়েছিল, জানত যে ও'কে বলশেভিস্ট-দরদী বলে ধরা হয়। নিজনিনভগারোদের বন্দরে উদ্ধত খালাসী আর এই লোকটার মধ্যে ও যেন কিছু মিল খুঁজে পায়। সেই কশাকটার সংগেও, যে সমুদ্রকেই যেন টেবিল বানিয়ে বসেছিল। খালাসীগুলোর সংগে ও'র মিল কর্কশ বাক-শয়তানীর প্রতি দুর্বলতা আর কশাকটির সংগে নিজের স্বাতন্ত্র্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর বাহাদুরীতে। পরিপাটি ক'রে মদে ডুবে লেখক ভদ্রলোক নিজের চারদিকে ডজনখানের যুবক জুটিয়ে নিয়েছিলেন। তাদেরকে নিয়ে ছাদের বারান্দায় উঠে উদাত্ত গলায় ঘোষণা করলেন :

'দশ মিনিটের মধ্যে আপনাদের সামনে এক আশ্চর্য কিছু উপস্থিত করব।'

'আশ্চর্য!' তাতিয়ানা বলে ওঠে : 'লোকটা বোধহয় একটু বোকা।'

বাগানে সামান হিস-হিস শব্দে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। গাছগুলো যেন ফিস-ফিস ক'রে কথা বলছিল। ছাদের ওপর থেকে ওদের চাপা গলার কথাবার্তা শোনা যায়। সবাই চুপচাপ, যেন কিছু ঘটবার প্রতীক্ষা। সার্মাঘন মনে মনে ভাবে ভাল কিছু ঘটবে না। এবং ওর হিসেবে কিছু ভুলও হয়নি।

মিনিট কুড়ি পরে লেখক হল-ঘরে ফিরে এলেন। বিরাট কোণ-ওয়ালা কাঁধ নিয়ে উনি জড়ের মতো চলাফেরা করেন, হাঁটু না বেঁকিয়ে রণ-পায়ে-চড়া-মানুষের মতো। সারসের মতো ওই রাজকীয় ভঙ্গী দেখে সার্মাঘনের মনে হলো, লেখক যা কিছু বললেন সে সবেরই মধ্যে যেন রণ-পায়ে-চড়া আরোপিত মূল্য। যুবক দলের মাথায় সারসের মতো পা ফেলে ফেলে ভদ্রলোক-দলটাকে ঘরের এক কোণায় নিয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে হাত দু'টো কয়ার মাষ্টারের মতো দুলিয়ে বললেন :

'আমরা শুরু করছি!'

উচ্ছ্বসিত আবেগে বেশ তালে তালেই কয়ার জনপ্রিয় একটা সুরে গান ধরল। গীতটা কোন এক প্রাচীন নারোদনিকের লেখা, হাতে লিখে-লিখে আর কপি প্রচার করা হতো। সার্মাঘনের কাছেও এর একটা কপি ছিল, ওর যে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহটা সেন্সার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়ে আছে, তারি মধ্যে রয়েছে তার নকল। এক জন ছোট মতন পাকানো লোক, পরণে নাবিকদের নীল জার্সি, ভাঁড়টার বেশ সুপ্রকট হয়ে ছিল। সুন্দর মুখ, হাসিখুশী, তাতে কোঁকড়ানো দাড়ি। তার সরু গলায় বেশ মিঠে ব্যঞ্জনা। অফুরন্ত কণ্ঠ। তৃতীয় একটা গান গাইল, কয়ারের বাকী কণ্ঠ থেকে উঁচু গ্রামে। বিপ্লবী শব্দগুলো এমন হাসির সুরে উচ্চারণ ক'রে তুলছিল যে সমবেত সবাই হেসে ওঠে, ক'জন গাইয়েও বাদ যায় না। কিন্তু সার্মাঘন হত-চকিত, এর মধ্যে "আশ্চর্যটা" কই, জাদু গেল কোথায়? তার দেখা অবশেষে গেল। লেখক-ভদ্রলোক ডানার মতো হাত ছড়িয়ে কয়ার থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় গমক তুললেন, যেন কোন ডীকন এ্যাক্ট পড়ছে :

'স্বৈরাচার মুর্দাবাদ! আজাদী জিন্দাবাদ!

'জিন্দাবাদ বিধান-পরিষদ!'

সংগে-সংগে কয়ার লাইনদুটো তুলে নিয়ে বারবার বলে। কিন্তু এমন ভঙ্গীতে

যেন বিশৃঙ্খল কথা আর শব্দের বিশেষ ক্যারিকেচার। প্রতিটি গাইয়ে ইচ্ছাকৃত ব্যঞ্জনা তুলে গায়। সবাই মুখভঙ্গী করে,—ভয়, অবিশ্বাস আর মনের অস্থিরতার প্যারডি যেন। একজন শ্রোতাদের দিকে পেছন ফিরে প্রশ্নটাকে একটা কোণের দিকে চেয়ে পুনরাবৃত্তি করল: 'মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ।'

উঁচু-কণ্ঠটা পা-বাঁকিয়ে বসে-বসে বিলাপ করছিল: 'মুর্দা-বাদ—মুর্দা-বাদ...'

দীর্ঘজীবী হোক স্বাধীনতা!' লেখক গেয়ে উঠলেন দৃঢ় কণ্ঠে, তেড়ে-আসা ভঙ্গীতে। তার রেশ তুলে প্রত্যেক গাইয়েই কথাগুলো আবার গায়,—বেসুরোভাবে, বেতালভঙ্গীতে।

ফলে, শব্দের হই-চইয়ে সূক্ষ্ম হতাশাব্যঞ্জক, বিমর্ষ বিলাপের একটা ধ্বনি গড়ে ওঠে। তেমনি ধ্বনি উঠতে থাকে নিরাশায়-ভরা ওই কটি শব্দের:

'—বিধান পরিষদ।'

সমস্ত জিনিসটার পরিসমাপ্তি হলো গাইয়েদের কান-ফাটান হাসিতে। শ্রোতাদের কয়েকজনও হেসেছিল বটে, কিন্তু সামঘিন দেখল যে সবাই একটু গম্ভীর, তারা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, অপ্রস্তুত বোধ করল। সব ছাপিয়ে উঠল লেখকের বিরাট আত্মপ্রসাদের ছাড়া-ছাড়া হাসির মূর্ছনা: 'হোঃ-হোঃ-হোঃ!'

পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। মাথাটা এত পেছনে হেলান যে গলার কণ্ঠমণিটা কুড়ালের ফালের মতো তীক্ষ্ম হ'য়ে উঠেছে। তাঁর গম্ভীর মূর্তি দেখে,—এত গম্ভীর যে ক্যারিকেচার বলেই মনে হয়—সামঘিনের মনে বিতৃষ্ণার অকস্মাৎ জোয়ার আসে। পাছে অন্য কেউ ওঁর সামনে লাফিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে ও তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে চিৎকার ক'রে বলে: 'উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ!'

লেখকটি "নীচের মহল" নাটকের কোন এক অভিনেতার ঢঙ নকল ক'রে বলতে শুরু করে:

'পরম সত্যের দিকেও যদি
এ-দুনিয়া পথ না পায় খুঁজি—হোঃ! হোঃ!'

'শুনুন, অনুগ্রহ ক'রে শুনুন!' সামঘিন কঠিনকণ্ঠে চিৎকার করে, একটা চেয়ারের পেছন দিকটা দুটো হাতে আঁকড়ে ধরে। চেয়ারটা সামনে এনে ফেলে, লেখককে সম্বোধন ক'রে বলে:

'আপনি এক্ষুণি ফিউনেরাল-মাসের ব্যঙ্গ অনুকরণে যে গানটি গাইলেন, তার কথাগুলো এলোমেলো হ'লেও নিঃসন্দেহে সেটা অন্তর থেকেই রচিত। যিনি রচনা ক'রেছেন তিনি প্রবীণ শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী লেখক, যিনি দশ বছরের নির্বাসন ভোগ ক'রে চরম-মূল্য দিয়েছেন...'

'ঠিক!' একটা স্বর উঠল। শ্রোতারা শান্ত হ'য়ে এল। সামঘিন নিজের বিতৃষ্ণার শিখাকে আরো উস্কে দিয়ে, চেয়ারটাকে ওপরে তুলে মেঝের ওপর ধপাস্ ক'রে ফেলে গলায় যত জোর আছে, তত জোরে চেঁচিয়ে ওঠে:

'গীতিকবিতার কথাগুলোকে বিদ্রূপ ক'রে আপনি কি প্রতিনিধিমূলক সরকারের আইডিয়াটাকেই ব্যঙ্গ করলেন না, যে-আইডিয়ার বাস্তব রূপদানের জন্যে আপনার পিতা-পিতামহরা সংগ্রাম করেছেন, কারাগারে-নির্বাসনে মৃত্যুবরণ করেছেন?'

'কি এটা? আরেক ধরনের সেন্সর?' লেখক দাবী করার গলায় প্রশ্ন করেন, তীরক্ষি মেজাজে কিন্তু অপ্রস্তুত-ভাবেই। পাঁশনে সোজা করার অছিলায় অপ্রয়োজনেই মুখভঙ্গী ক'রে ওঠেন।

'হ্যাঁ, সে-একটা প্রশ্ন বটে.' সামঘিন সায় দিয়ে ওঠে: 'এমন এক প্রশ্ন যা আমার মনে হয় উপস্থিত অনেকের মনেই জেগেছে।'

'আমার মনে হয়,' তাতিয়ানা চেঁচিয়ে বলেছিল। দু'তিনজন সীরিয়াস-চেহারার

অতিথি ওকে থামিয়ে দিল। একজন আহত ভঙ্গীতে বলেও উঠল :

'হ্যাঁ, এ কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি। বিধান-পরিষদকে উড়িয়ে দেওয়া, অর্থাৎ...'

'আইডিয়াটায় তো আমি হাসি নি,' লেখক-ভদ্রলোক বিড়বিড় করলেন : 'হেসেছিলাম ছড়াটায়।'

'ওঃ,' সামঘিন বিদ্রূপ ক'রে ওঠে : 'শুনে খুব খুশী হ'লাম। মনে হ'য়েছিল রক্‌বাজ ছেলে-ছোকড়াদের স্থূল রসিকতা বোধহয়, প্রতীকী-বিদ্রূপ বললেও বলতে পারেন। আর খুবই দুঃখের।'

তাতিয়ানা বাধা দিয়ে ব'লে উঠেছিল :

'সামঘিন, আপনি নিশ্চয় জানেন, আপনি যে কনস্টিট্যুশনই চান, তা মুলো দিয়ে পাকান' 'স্টার্‌জনের ঝোল নয়?' সেই মুহূর্ত থেকে সামঘিন যে-যে কথা বলেছিল তার প্রতিটি বাক্যে তাতিয়ানা শ্লেষ আর বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল। চারদিক থেকে হাসির ফোয়ারা ছুটল। যুবকেরাও রসের টিপ্পনী ছাড়তে কসুর করল না। এখন এই ট্রেনে বসে ওর প্রতিটি উক্তি সামঘিন মনে করতে পারল না, যখন বলা হয়েছিল তখনো ঠিক সেগুলো ধরতে পারে নি। ওর স্মৃতিতে যা দাগ কেটে বসেছিল, তা' হচ্ছে তাতিয়ানার সুদীপ্ত মূর্তি, সুগঠিত দেহ, যেটা ওর শরীরের ওপর দৈহিক আক্রমণেই লিপ্ত হবে ব'লে মনে হ'য়েছিল তখন। সেই রক্ত-উছলে পড়া মুখ, শত্রুতার ঘোর-লাগা জ্বলন্ত চোখ। সামঘিনের কথা শুনতে শুনতে ও চোখদুটোকে নির্মমভাবে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে তুলছিল। যখন জবাব দিচ্ছিল, তখন সে-দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে পড়ছিল, আক্রোশের বহ্নিতাপ তা'তে আরো ছড়াচ্ছিল। ওর মন্তব্যে জ্বলে উঠে সামঘিন নিশ্চয়ই জবাব দিতে নানা ভুল করেছিল। যুবক-দের মুখের হাসিতেই তার প্রমাণ। আরো প্রমাণ পেল যখন গম্ভীর-ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন ওর মুখে জবাব জুগিয়ে দেবার অশোভন চেষ্টা করছিলেন,—যেন সহৃদয় শিক্ষক, ছাত্র পরীক্ষায় নাজেহাল হচ্ছে দেখে এগিয়ে এসেছেন সাহায্য করতে। শেষে গোঘিনা ওকে কথার বেড়াজালে আটকে ফেলল, তরুণের দল হাততালি দিয়ে উঠল আর ও এক সাবধান-বাণী দিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করল :

'দেখো, শেষে মার্ক্সবাদকে নৈরাজ্যবাদে পরিণত ক'রে তুলো না।'

'ওঃ-হো, সেই চর্বিত-চর্বন!' তাতিয়ানা চেঁচিয়ে ওঠে, ওকে প্রশ্নের শ্লেষ দিয়ে-দিয়ে বিদ্ধ করে : 'বোধহয় এখন ব্লানকুই মনে পড়েছে? মেন্‌সেভিস্টদের হাতেও তো এই তুরুপেরই টেক্কা।'

॥ ২৩ ॥

সারারাত এমনি ধারা স্মৃতি-রোমন্থন চলল। একমুহূর্তের জন্যও ঘুম নেই। সেন্ট পীতর্সবুর্গের স্টেশনে যখন নামল তখন ক্লান্তিতে শরীর আর বইছে না। নিজের সম্বন্ধে উদাসীন হয়েই পড়েছে ইতিমধ্যে।

যে-হোটেলে প্রতিবার এসে ওঠে, সেই হোটেলে আসতেই কেরাণীটি একটা চিঠি এগিয়ে দিল। ক্ষমা চেয়ে বলল যে গতবার রওনা হ'য়ে যাবার দিন চিঠিটা দিতে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল।

স্মিতহাসি হেসে বলে: 'ঠিক যেন বুঝে নিয়েছিলাম আপনি আজই ফিরবেন।'

সামঘিন হাতের লেখার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। হাতটা যেন অসম্ভব ভারী হ'য়ে গেছে। কোনরকমে কোটের পকেটে চিঠিটা ঢুকিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে, দৌড়ে উঠবার ইচ্ছেটাকে দমন ক'রে ফেলে। নিজের ঘরে ঢুকেই খানসামাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে। টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে খামটা খোলে।

'বিদায়! অবশ্য আর কখনো আমাদের দেখা হবে না। আমাকে যে-ভাবে চিত্রিত করা হবে ঠিক ও-রকম ইতর আমি নই। খুবই অসুখী আমি। মনে হয় তুমিও—' এই জায়গায় কয়টা কথা ভীষণভাবে কেটে দেওয়া, '—অসুখী। যদি সম্ভব হয়, এ-সব ছেড়ে দাও। সারাজীবন লুকিয়ে থাকতে পারা যায় না, বুঝেছ। ছেড়ে দাও। সংস্রব ত্যাগ কর। তোমাকে ভালোবাসি আর তোমার ওপর মায়া হয় ব'লেই এ-কথা বলছি।'

এমন অসাবধানে লেখা যে জায়গায়-জায়গায় বাঁকা লাইনগুলো পরস্পর জড়িয়ে গেছে। যেন অন্ধকারে লেখা।

'এ-র অর্থ কি?' সামঘিন নিজেকে জিজ্ঞেস করে। চিঠিটাকে ছিঁড়ে কুটি-কুটি ক'রে ফেলে দিল। 'ছেড়ে দেব কি? তা'হলে ও-ও কি ভাবে নাকি যে আমি. .'

কাগজের টুকরোগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে নিয়ে ট্রাউজারের পকেটে সেগুলোকে গলিয়ে দেয়। খামটা হাতে নিয়ে দেখে পোস্টাপিসের মার্কা: ইয়ারোস্লাভ্ল্।

'ওর নিশ্চয়ই মাথা খারাপ যে ভাবতে পারল আমি—আমিও ওর মতো একই পথের পথিক।'

খামটাকে পাতলা ফালি ফালি ক'রে সযত্নে ছিঁড়ে ফেলে। সেগুলো আবার তিন টুকরো ক'রে ছিঁড়ে পকেটে পুরে রাখল।

'পাগল!'

বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিকনোভার সাধারণ দেহশ্রী। ধীরে ধীরে সেটা বদলে গেল, অনিচ্ছার জোর-করা হাসি ফুটে উঠল, ক্রমশঃ সেটা বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল। চোখদুটোতে চিন্তার দৃষ্টি। কখনো এ-মুখে তিক্ততা দেখেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মন থেকে চিন্তারাশি দূর ক'রে দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। পকেট থেকে কাগজের টুকরোগুলো নিয়ে টয়লেটে ছুঁড়ে দেয়, পকেটটা ভেতর থেকে উল্টে সযত্নে ঝেড়ে ফেলে। ধুয়ে যাবার জন্যে জল খুলে দেয়। কয়েকটা টুকরো

তখনো ভাসতে থাকে। ট্যাঙ্কটা আবার জলে ভরে আবার ফ্লাশ টানে। এবারে সব টুক্‌রোগুলো অদৃশ্য হ'য়ে যায়। সামঘিন ঘরে ফিরে আসে। এক্ষুণি যেতে হবে, ভারাভকার জন্যে একটা দস্তার কফিন কিনতে হবে। তারপর তাড়াতাড়ি স্টেশনে যেতে হবে স্তারাইয়া-রুশার গাড়ী ধরতে। চিঠিটার ব্যবস্থা ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছে—কিছু একটা শেষ হ'য়ে গেল। কিন্তু মেজাজটা এখনো বিক্ষিপ্ত। মনের মধ্যে পরিচিত আমেজ। আগেও এইরকম একটা অনুভূতির অভিজ্ঞতা হ'য়েছে। উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে, সশঙ্কিতও। কবে, কেমন-ক'রে এসেছিল সে-অভিজ্ঞতা, মনে করতেই হবে যে।

রাস্তায় বেরিয়ে সেনারক্ষীদের ছোট একটা দলকে তাদের জবুথবু ঘোড়ার ওপর দুল্‌কি চালে চলতে দেখেই কথাটা মনে পড়ল। নিকনোভার সন্দেহ বা আশ্বাসে ও কিছুই মনে করে নি, যেমন কিছু মনে করেনি কর্নেল ভাসিলিয়েভের প্রস্তাবে। শেষোক্ত ব্যাপারটার সময়েই এই অভিজ্ঞতাটা হ'য়েছিল, ভাসিলিয়েভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে। ঠিক এখন যেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি এসেছে তেমনিই—নিজেকে ভয় পাওয়া, আত্মভীতি।

'ভীতির সীমানা-ঘেঁষা হতবুদ্ধিকর অবস্থা একটা,' চোখের আড়াল হ'য়ে-যাওয়া সেনারক্ষীদের দেখতে দেখতে অনুভূতিটার সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করে।

রাস্তায় বিরক্তিকর হৈ-চৈ। লোকে এদিক-সেদিক যাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে। রাশভারী শহরটার পক্ষে নিতান্তই বেমানান। লোকগুলো যেন পিঁপড়ের সার, দেখা হ'তেই শুঁড়ে শুঁড় মেলাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে। যেন সকলেই কিছু-না-কিছু হারিয়ে খুঁজে-খুঁজে ফিরছে। অথবা যেন শহরে পথ-হারিয়ে রাস্তা জিজ্ঞেস ক'রে ফিরছে। এই হট্টগোল হৈ--চৈ-এর মধ্যে সামঘিন অস্বাভাবিকতার সন্ধান পেল।

কফিন কিনে পয়সা দিচ্ছিল। গোলাপী-গালের নিখুঁত দাড়ি-কামান দোকান-দারকে দেখাচ্ছে যেন সরকারী অফিসার—একপদ থেকে অন্য পদে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, নিজের ওপর খুব সন্তুষ্ট। এমন সময়ে এল এক যুবক। মুখে কালো-ব্যান্ডেজ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে দোকানে ঢুকে স্ট্র-হ্যাট দুলিয়ে ব'লে ওঠে : 'মিনিস্টার প্লেভেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে!'

'তিন-নম্বর,' কফিনওয়ালা আঁৎকে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজেকে ক্রশ ক'রে বলে : 'কোথায় ?'

'রাস্তায়, ওয়ারশ-টার্মিন্যালের কাছে।'

ফেরৎ-পয়সা সামঘিনকে গুনে দিতে-দিতে ওর দিকে প্রকাশ্য তিরস্কারের ভঙ্গীতেই তাকিয়ে দোকানদার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে : 'রাস্তায়। হ্যাঁ-মশাই!'

সামঘিন টুপীটা সামান্য তুলে ধরে। কথা না-বলে দোকানের বাইরে চলে যায়। মনে-মনে ভাবে : 'কফিনওয়ালাকে কিছু বলা উচিত ছিল। আমার নীরবতার ও নিশ্চয়ই উল্টো মানে করবে। হ্যাঁ, এ-বারে প্লেভেও খতম হলো...'

একটা ক্যাব ডেকে নিল। ভেতরে বসে চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে লোকজনকে দেখতে দেখতে নিজেকে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়, চালুনির মতো যেন। দুলে-দুলে উঠছে। যাই দেখল বা শুনল, সবই ভেতরে গিয়ে পড়ছে, চালুনির জালে কিছুই লেগে থাকে না। স্টেশন-বুফেতে গেলাশের দিকে তাকিয়ে মরচে-ধরা স্যাঁতলা কফির দিকে চোখ রেখে মাছি তাড়াতে তাড়াতে শুনতে পেল : 'যুদ্ধে হাজার-হাজার লোক মরে, কিন্তু তা ব'লে তো জীবন সহজ হয় না।'

ভাঁজ-পড়া শানটুঙ-জ্যাকেট দিয়ে মোড়া গোলগাল নরম পিঠওয়ালা একজন

লোকের মুখ থেকে মন্তব্যটা এসেছিল। পিঠের শান্টুঙ অদ্ভুতভাবে নড়ে-নড়ে উঠছিল, যেন তল দিয়ে ক'টা ইঁদুর রেসের দৌড় দিচ্ছে। পিঠটার ওপরে বেয়াড়াভাবে বসান একটা টেকো-মাথা, দু'ধারে দুটো মোটা-মোটা নীলাভ কান। সামঘিনের মনে হয় বেশীর ভাগ মানুষই এ-রকম হতকুচ্ছিৎ। সরল লোকও তো কই চোখে পড়ে না। কেউ কেউ ভান করে বটে কিন্তু আসলে দেখা যায় তারা বীজগণিতের সমীকরণের মতো, তিনটে বা আরও বেশী 'আন্‌নোন' থাকে।

টেবিলের ওপর মাছি ঘুরে বেড়ায়, উড়ে -উড়ে বসে। ছোট্ট ছোট্ট হুল দিয়ে চিনি আর নুনের গুঁড়ো অনুভব ক'রে ক'রে দেখে।

'মনের চিন্তা যেন কালো মাছি,' কোন কবিতার একটা চরণ সামঘিনের মনে পড়ে। ওর মনে হয় তথাকথিত সরল লোকেদের চেয়ে কুতুজভ বা মোটামুটি সব বিপ্লবীরাই অনেক বেশী সহজ-বোধ্য। পয়ারকভ্, উসভ্ বা ওই জাতীয় লোকেদের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে তা বেশ ভাল ক'রেই জানা আছে। কিন্তু কে বলতে পারে শান্টুঙ-পরা লোকটা "রুশ জনসঙ্ঘের" সদস্য নয়, বা কোন বিপ্লবী নয়।

*

রাশি-রাশি এমনি অনেক চিন্তা যন্ত্রের মতোই ওর মনের মধ্যে জেগে ওঠে নিতান্ত অগভীর ভাবে, ওকে বিচলিত না ক'রে। মনটা অদ্ভুত ফাঁকা-ফাঁকা, সব জিনিসের ওপরে অচৈতন্য মানসের উদাসীন দৃষ্টি। নিজের শহরের ষ্টেশনে যখন এসে পৌঁছুল তখন ওর অবস্থা এমনিই। পরিচিত-অপরিচিত নানা লোক এসে ওকে যেন বন্দী ক'রে ফেলল, ব্যবসাদারী ধরনের নানা প্রশ্নে-প্রশ্নে অস্থির ক'রে তুলল। ফুলের তোড়া হাতে ক'রে ডেপুটেশনও এসেছিল, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে, ভারভাকার কর্মচারীদের তরফ থেকে এবং আরো অনেক। পাশে সরে তারা ভেরা পেত্রভনা সামঘিনাকে জায়গা ছেড়ে দিল। এলিজাবেথা স্পিভাকের বাহু জড়িয়ে সে চলেছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো ভেলে ঢাকা। দেখাচ্ছে যেন উৎসগীকৃত হবার জন্যেই তৈরি কোন মনুমেণ্ট।

'ক্লিম,' চাপা গলায় মা বলে ওঠে। লাগেজ-কামরা থেকে কফিন সযত্নে টেনে নামান হচ্ছে দেখে প্রশ্ন করে: 'উনি কোথায়?'

স্পিভাকও কালো পোশাক পরা। ফ্যাকাশে আর বিষণ্ণ। ইভান দ্রোনভ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, হাতে সোনার ঘড়ি, মাথাটা চক্‌চকে পালিশ করা জুতোর মতো ঝিলিক দিচ্ছে। দৌড়ে যাচ্ছিল, ঘড়িটাকে চেনের সঙ্গে জোরে জোরে দোলাচ্ছে, মুখটা হাঁ ক'রে খোলা। ষ্টেশনের সামনে অনেকগুলো নিরাবরণ মাথার জটলা। এই বিচিত্র পটভূমিকার সামনে পুরোহিতদের সোনালী মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথায় মস্ত বড় সোনা-মাথা বিশপ্-চেহারাটা যেন ঘণ্টার মতোই। করভিন টিউনিঙ্-ফর্কটাকে মোটা মোটা দাঁতে ঠুকে বাজায়, হাত দু'টোকে ডুবন্ত লোকের মতো নাড়ায়। শিশু-কণ্ঠের কোমল তরঙ্গ গরম বাতাসে বিষণ্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভেরা পেত্রভনা মুখের ভেল রুমাল দিয়ে ঘষে ছেলের বাহুটা টেনে নেয়।

'হায় ভগবান! তোর মুখখানা কি রকম হ'য়ে উঠেছে...'

প্রকাণ্ড ভারী কফিনটাকে টানতে টানতে শবযানে নিয়ে যাওয়া হলো, গাড়ীটা ফুলের মালা দিয়ে সাজান। শবযান কেঁপে ওঠে। কালো ঘোড়াগুলো মাথার ওপরের পালক নাড়ায়। সামঘিনের পেছনে কে একজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'লে

ওঠে :

'এমন লোককে বাজনা বাজিয়ে কবর দিতে হয়।'

নিজের হাতের তৈরি ঝকমকে নতুন স্টেশন থেকে সমাধিভূমি পর্যন্ত ভারাভকার শেষযাত্রাটা অজান্তেই বড়ই দীর্ঘ হ'য়ে পড়েছিল। ক্যাথেড্রালে, ক্লাবের সামনে, টেকনিক্যাল-ইস্কুল আর সার্মাঘিনদের বাড়িতে হ'লো শোক-প্রার্থনা। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল সুন্দর-মতন লালচুল একটি মেয়ে। পাশে বছর ছয়েকের একটি ছেলের ঘাড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার পা হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত খালি, পায়ে স্যাণ্ডাল। মেয়েটা ক্রুশের চিহ্ন আঁকল, ছেলেটা তার কালো-ভুরু কুঁচকে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। স্পিভাক তার কাছে গিয়ে নীচু হ'য়ে কি-যেন বলল। ছেলেটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে হাতদুটো বের ক'রে বুকের ওপর ক্রুশ করল।

বাড়ির বাইরে প্রার্থনা হ'য়ে যাওয়ার পর মিছিলটা দ্রুতগতিতে চলে। পথ হাঁটা মুস্কিল। জুনিপারের ডাল এসে মাদাম সার্মাঘিনের স্কার্ট আটকে ধরে। পা দিয়ে লাথি মেরে মেরে ছাড়িয়ে নেয়, দু'দুবার ক্লিমের পায়ে বেশ জোর আঘাত দিয়ে বসে। ,

সমাধিভূমিতে ক্যাথেড্রাল-পুরোহিত নিফন্ত স্লাভোরসভ বাণী দিলেন। মানুষটা বেশ বড়-সড়, কাঁধ পর্যন্ত পাকা চুলের গোছ, সিংহসদৃশ মুখাবয়ব। ঠাণ্ডা জিংক কফিনটার দিকে এক হাত তুলে, অন্য হাতটা তার ওপর দুলিয়ে গমগমে গলায় বললে : 'জীবনক্ষেত্রের এই ভ্রাতৃপ্রেমিক কর্মী, ভগবৎ-করুণায় পুষ্ট হ'য়ে ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ভূগর্ভস্থ ক'রে রাখেন নি, বরং আমাদের নিরিবিলি শহরের উন্নতি আর বিকাশের জন্যই তার যদৃচ্ছ সদ্ব্যবহার করেছেন।'

পাকাদাড়ির ভেতর দিয়ে মোটা-মোটা ঠোঁটের অত্যাশ্চার্য মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। পুরোহিতমশায় ঠোঁট না নাড়িয়েই বললেন। তাই বোধহয় তার সুডৌল মুর্চ্ছনা-মধুর কথাগুলো বুদ্বুদের মতো বাতাসে ঘুরে-ঘুরে বেড়াল।

'আজ কিছুসংখ্যক অগভীর-মস্তিষ্কের এবং হীনবুদ্ধির লোক ঈর্ষার ন্যায় পার্থিব প্রবৃত্তির তাড়নাতে চালিত হ'য়ে ব'লে থাকে যে ধনীরা জনগণের শত্রু; কিন্তু তারা ইচ্ছা ক'রেই এ-কথা ভুলে যায় যে আমাদের আত্মার মুক্তি পার্থিব সম্পদের মধ্যে নয় এবং আমাদের সকলেরই বিনাশ মৃত্যুতে, যেমন এখন, খৃষ্টের এই বিশ্বস্ত ভৃত্যের হ'য়েছে...'

আকাশ থেকে নীল-শিখা সোনালী অঙ্গবাসের ওপর ঝলকে গেল,—পোশাকটায় কালো ক্রুশের প্যাটার্ন। এক ঝাঁক সাদা পায়রা কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরের নীলখাদে ডানা ঝাপটায়।

'ব্রিনভের তিতিরছানার ঝাঁক,' ক্লিমের পেছনে চাপা-গলা।

'লোকে বলে ওর ছেলে নাকি সোস্যালিস্ট-রেভল্যুশনিস্ট...'

'কার? ব্রিনভের?'

!না। প্রধান পুরোহিতের।'

'আমি তো শুনিনি। তা,-আজ সবাই তো সোস্যালিস্ট-রেভল্যুশনিস্ট।'

একটা কবরের ওপরে দাঁড়িয়ে উকিল প্রাভদিন তড়্বড়্-তড়্বড়্ ক'রে ভারভকার অন্ত্যেষ্টি-বক্তৃতা দিচ্ছিল। হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল :

'না, কথা নয়, কথা নয়, কাজ চাই!' তারপরে কয়েকটা জার্মান শ্লোক জোরে জোরে পড়তে আরম্ভ করে।

সমাধিভূমির ওপর ঝাপসা সূর্য। গুমোট কুয়াশার ভেতর দিয়ে রোদ এসে কবরগুলোর ক্রুশের ওপর পড়েছে। ক্রুশগুলোর ওপরে, পাহাড়েরও ওপরে, বিরাট

ত্রিশির বার্চ গাছের চাঁদোয়ার নীচে মার্বেল পাথরের দেবকন্যার এক মূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল—অনেকটা হাসপাতালের নার্সের মতো দেখতে, কুমারী কন্যা।

ক্লিম বন্ধ গাড়ীতে চড়ে মা আর স্পিভাকের সঙ্গে চলে এল। শ্রান্ত গলায় মা অভিযোগ জানাচ্ছিল :

'আর্মিতে তার করেছিলাম, লিদিয়ার কাছে। টেলিগ্রামটা নিশ্চয়ই পায়নি। ওদের খুব তাড়া, না?' লর্নেত্ দিয়ে রাস্তার একটা দিক দেখিয়ে মন্তব্য করে। যেদিকটায় দেখাল সেখানে কয়েকজন বাড়ির পরিচারক জুনিপার আর ফারের ডাল-পালা ঝাঁড় দিয়ে দিয়ে স্তূপ ক'রে রেখেছে। 'ভুলে যেতে খুব তাড়া ওদের যে কোন দিন তিমোফেই ভারভ্কা ব'লে কোন একজন লোক বাস করত।' চাপা নিঃশ্বাস ফেলে। 'রাস্তার ওপর জুনিপার ছড়িয়ে দেওয়াটা তো বেশ ভালরীতি—ধুলো মরে যায়। ধর্মীয় শোভাযাত্রার সময়ও এরকম করলে বেশ ভাল হয়।'

চোখ দুটো বন্ধ করে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর আবার বলতে শুরু করে :

রেড্ক্রশ নার্সের পোশাকে লিদিয়াকে বেশ চমৎকার মানায়। ওতো আর দেখতে ততটা ফর্সা নয়। ওর স্বামী দেশভক্ত হলে কি হবে, মনে হয় একটা পাগল।'

সামঘিন বুঝতে পারে মায়ের এত কথা বলার কারণ একাকীত্বটা যেন অনুভব না করতে হয়। ভয় দেখান নিঃসঙ্গতাকে কথা দিয়েই চেপে রাখা যাবে। কিন্তু মায়ের জন্যে ওর একটুও মায়া হয় না। মায়ের গা থেকে গন্ধ বেরোয় রজনীগন্ধার, অন্তেস্টিক্রিয়ার প্রিয় ফুল।



মেমোরিয়াল ডিনারের আয়োজন মার্চেন্ট-ক্লাবের হলঘরে হলো। রক্তিম পর্দা, চাদর আর দেওয়ালে ছাদ পর্যন্ত গিল্টি করা হলঘরটাকে কসাইয়ের দোকান ক'রে তুলেছিল। কথাটা ক্লিমকে বলল আর্কিটেক্ট দিয়ানিন। মেয়ে-মহাজন ব্রুশোভার পাশে ব'সে প্যানকেকের মধ্যে স্যামনের লাল টুকরো জড়াতে-জড়াতে সে ব'লে ওঠে :

'ভারাভকা খেতে পারতেন প্রচুর কিন্তু রুচি মোটেই ছিল না।'

'দুঃখ কিসের,' ব্রুশোভা সান্ত্বনার গলায় বলে : 'যত্তো পার খাওনা এখানে, পয়সা তো আর লাগছে না।' ঠিক্রে-বেরোন উদ্ধত ঘৃণায় চোখদুটো তুলে যে-টেবিলে শহরের গণ্যমান্যরা বসেছে সেদিকটায় চেয়ে-চেয়ে দেখে। ওদের মধ্যে সামঘিন ঝকমকে জেনারেল অবুকভকে দেখতে পেল,—চিবুক থেকে পেট পর্যন্ত চকচকে সাজ, গোঁফ এত বিশাল, নায়কোচিত ঢঙের যে মনে হয়; ওটাকে বোধহয় ছোটদের মনে ধরানোর জন্যেই বিশেষভাবে তৈরি করা হ'য়েছে। ভাইস-গভর্নর, জেলা নোবিলিটি-মার্শাল এবং আরো জন দশ-বার ইউনিফর্ম ও সাজ-সজ্জায় বিভূষিত হ'য়ে টেবিলে ব'সে আছে। ওই টেবিলেই শহরের মেয়র রাদিয়েভ ও প্রধান পুরোহিতের মাঝখানে মা ব'সেছে। মেয়রের বুকে লাল-রিবনের ওপর একটা মেডেল, পুরোহিতের বুকে ক্রুশ। সামঘিনের মা স্থির-অনড়, যেন ভয় পেয়েছে। অন্য-টেবিল থেকে ও-টেবিল যে অনেকটা দূরেই শুধু তা' নয়, উপবিস্ট সজ্জনদের ভাবেভঙ্গীতে বিপুল আত্মগরিমার চেতনাটাও টেবিলটাকে সাধারণের কাছ থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছে। অন্যান্য টেবিলে গোটা পঞ্চাশেক ওদের চেয়ে নীচু স্তরের লোক। তারা আঁটো-বোতামওয়ালা ফ্রক-কোট আর কালো রেশমী

পোশাক পরে আছে। মন দিয়ে খাচ্ছে আর শান্ত সুরে ফিসফিস ক'রে কথাবার্তা বলছে।

প্রাক্তন জেলা-এ্যাটর্নী কিতায়েভ উঠে দাঁড়াল। লোকটা লম্বা, কালো দাড়ি, মাথার মাঝে টাক, চারপাশে ঘন চুল। ছুরি দিয়ে দিয়ে বোতলের গলা ঠুকে অভি-যোগের নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে :

'আজকের দিনে যখন পূর্বদিকে ভাগ্য আমাদের মুখ ফিরিয়েছে...'

'পূর্বদিকে যাবার কোন দরকারটা ছিল,' কণ্ট্রাক্টর মেরকুলভ বিড়বিড় ক'রে ওঠে।

একটা ক্রুদ্ধ গলা সঙ্গে-সঙ্গে সমর্থন জানায় : 'ঠিকই তো। হাতের কাছে লড়াই করবার কি আর কেউ ছিল না...'

কাঠের ব্যবসায়ী মাজিন এক-আঙুল দিয়ে নকল দাঁতটা ঠেলে জায়গায় বসাতে-বসাতে ফোঁস ক'রে ওঠে : 'চারদিকে এততো জার্মান যে নড়তেই পারি না। তা'-না, এখন...'

'তাদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি তা'তে কিন্তু বশ্যতার গন্ধ...'

'মোট কথা কি জানেন? আমরা আমলাদের বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েই যে বাস করছি। খবরের কাগজগুলো লিখছে কিন্তু ঠিকই,' স্নানঘরের মালিক দমোগাইলভ চেঁচিয়ে ওঠে। কেন তাকে ফাইন করা হ'য়েছিল সে-বৃত্তান্তও শুরু হয় :

'বলে কিনা সাধারণ মানুষদের ঘরটা পরিষ্কার না। আরে মশাই, পরিষ্কার থাকবে কি ক'রে বলুন তো, যখন সকাল থেকে সন্ধ্যে রোজ হপ্তায় ছ-ছ'টা দিন লোকে সাবান মেখে-মেখে চান করে?'

প্রাক্তন জেলা-এ্যাটর্নী বক্তৃতা শেষ করল। যাজকমশায় "চিরস্মৃতির" একটা গান ধরলেন। সবাই খাড়া হ'য়ে দাঁড়াল। মেরকুলভ মুখ না খুলেই সুরটা ভাঁজে। দমোগাইলভ গোল-গোল চোখ পাকিয়ে ছাদের কারুকার্য দেখতে-দেখতে বিষণ্ণ-সুরে একটানা আওয়াজ করে :

'মি—ই—মো—',

সামঘিনের অতি-পরিচিত এই সব লোকদের অসন্তোষের গুঞ্জন কিন্তু গান গাওয়াতে একটুও বন্ধ হ'লো না। এদেরকে হীনবুদ্ধি ব'লেই ও ভাবে, রাজনীতির নানা প্রশ্ন সম্পর্কে মনে হয় এরা একেবারেই উদাসীন। কাজেই যখন দেখল যে এইসব উপকথার চরিত্র তাদের নিজেদের তুচ্ছ স্বার্থের ওপর উঠে গেছে, জার্মানীর সঙ্গে সন্ধিচুক্তির আলোচনা করছে, আমলাতন্ত্রের নির্যাতন নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে তখন ও বেশ আশ্চর্যই হয়। এইসব প্রসঙ্গে এদের গলাও তো বেশ চড়া, সংবাদপত্র-ওয়ালাদের চাইতে-ও। অবশ্য তার কারণ আর কিছুই নয়, খবরের কাগজের চেয়ে এদের ভাষা অনেক সরল বলেই তীব্রতর।

পুরোহিত স্লাভরশভ উঠে দাঁড়ায়, বুকের ওপরের ক্রুশটা চেপে ধরে। লম্বা চুলের গোছা পেছনে ঠেলে বিকট মুখটাকে রাজকীয়ভাবে তুলে ধরে। বলে :

'সিরা-পুত্র জোশুয়া জ্ঞানের কথাই বলেছেন : "হাস্যে উচ্চকণ্ঠ হয় শুধু নির্বোধরা; জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কেবল স্মিতহাসিই হাসেন..."'

'ওই শুরু হ'লো, বাচালের কচকচি!' একচুমুক মদ খেয়ে ফিয়োনা ব্রুশোভা ব'লে ওঠে। মদটুকু গিলেই কিন্তু মুখ কুঁচকিয়ে ওঠে : 'মদটা বোধহয় গরীব আত্মীয়স্বজনের জন্যে...'

ভেরা পেত্রভনা পুরোহিতের বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত শোনে। তারপর উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। গণ্যমান্যেরা তার সঙ্গে-সঙ্গে যায়। সাধারণেরা দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নত ক'রে অভিবাদন জানায়, যেন মাদার-সুপিরীয়র। অভিবাদনের প্রত্যুত্তর

না দিয়েই রাজকীয় মর্যাদায় হে'টে যায়, পেছনে-পেছনে তার বিধবার বেশ নক্‌শা-কাটা মেঝের ওপর লুটিয়ে চলে যায় যেন তারই কোন লুকানো ছায়া।

'এখনো তেমনি অহঙ্কারী। কিন্তু অহঙ্কারটা কিসের?' ক্লিম ভাবে।

'যাক, হাঙ্গামা চুকল,' বন্ধ গাড়ীতে ব'সে ভেরা পেত্রভনা বলে। 'এই স্মৃতি-ভোজের রীতিটা এশিয়াটিক। কিন্তু হায় ঈশ্বর, আমরা রাশিয়ানরাও এটা মানি!'

বাড়িতে ফিরে ঘোষণা করে: 'বিশ্রাম করতে হবে এখন।'

সামঘিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিজের ঘরে গেল। ঘরটায় বন্ধ হাওয়া ন্যাপথেলিনের গন্ধ। বাগানের ধারের জানালাটা খুলে দেয়। মোটা-মোটা ভুরু আর লম্বা চুলওয়ালা আরকাদি স্পিভাক মেপল্‌গাছের ঘাসের ওপর ব'সে পাখীর খাঁচার ভাঙ্গা দরজা সারাবার চেষ্টা করছে। তার সুন্দরী নার্সকে সে শুধোয়:

'মরামানুষকে কবর দিয়ে পকেটে হাত ঢুকান বারণ কেন? আচ্ছা, দাঁত পড়ে গিয়েছিল তাই মরে গেল,, না?'

ক্লিম জানালাটা বন্ধ ক'রে পেছনের উঠানের দিককার আরেকটা জানালা খোলে। মনে হয় শুলেই বোধহয় চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসবে। ধারণাটা মোটেই মিথ্যা নয়।



এর পর এল কঠিন দিন। মনে হ'লো গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে ক্লিমের মা যত কথা অব্যক্ত রেখেছে তা-সবই যেন এখন উজাড় ক'রে বলে দেবার পণ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্‌র-বক্‌র ক'রে যায়, রক্তিম গাল বিশ্রীভাবে ফুলে-ফুলে ওঠে। ক্লিম লক্ষ্য ক'রে দেখে প্রতিবারই তার এমনি ভাবে বসা চাই যেন আয়নায় প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে। নিজের বাস্তব-অবস্থার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, এমনিই আচরণ যেন।

'হ্যাঁ, ক্লিম' মা বলে: 'যে-দেশের সব লোক রাজনীতি নিয়ে পাগল, যথার্থ কাজ নিয়ে কেউই থাকতে চায় না, সে-দেশে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

তার গালের চামড়া ঝুলে প'ড়ে নীচের দিকে চোখের পাতাদুটোও যেন সেই টানে কিছুটা ঝুলে পড়েছে, আর সেই কারণে চোখের সাদা অংশ যেন বড় বেশী প্রকট হয়ে পড়েছে।

'কয়েকটা জাপানী, ভাব দেখি, যাদের শুধু বাজিকর হিসাবেই লোকে জানে, তারাই—হঠাৎ! কী ভয়ঙ্কর! আলেনার কলঙ্কিত জীবনের কথা কিছু শুনেছিস নাকি?' প্রশ্ন করে। পরমুহূর্তেই এমন উক্তি করে যে ক্লিম শুনে অবাক হয়। হাসি চাপবার জন্যে মুখ নীচু ক'রে শোনে:

'মেয়েছেলের সামনে দু'টো রাস্তা খোলা: হয় সে বলদৃপ্তা মাতৃকা নয়তো উচ্ছ্বসিতা কামার্তিনী।—ভারাভকা ঠিকই বলত।'

সামঘিন জানে মা দিমিত্রিকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেনি, ওকেও শুধু পাঁচ সপ্তাহই দিয়েছিল। প্রায় সব কথারই শুরুতে বা শেষে তিনটি শব্দ: 'ভারাভকা ঠিকই বলত।' যেন সবসময় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভারাভকা একদিন বেঁচে ছিল।

শোকের পোশাকে মাকে অনেক বেশী বুড়ী দেখায়। এ-বিষয়ে বোধহয় মা-ও সচেতন। পোশাকটা প্রায়ই টেনে-টেনে দেখে, নাড়ে-চাড়ে। গম্ভীরভাবে হাঁটে, দেহ সোজা ক'রে, শুকন বুক চিতিয়ে। সব লোকই যে স্বেচ্ছাচারী এ-কথাটা প্রমাণ করবার তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

'এ-তো খুবই স্বাভাবিক। সমাজের বুনিয়াদেই যে স্বৈরতন্ত্র,' স্পিভাক অনিচ্ছাবশতঃ বলে।

ক্লিমের মা মুখ কুঁচকিয়ে ওঠে। পাউডারের ঘন প্রলেপ-দেওয়া-গালের চামড়া শ্যাময়ের মতো কর্কশ হ'য়ে পড়ে।

'হা-ভগবান! সব সময়ই তুমি এই নিয়ে পড়!' রেগে চেঁচিয়ে উঠে স্পিভাকের দিকে চামচ তুলে শাসায়। 'তোমার মত-টতগুলো বড় ভয়ঙ্কর লিজা! সারাজীবন আমি বিপ্লবীদের মধ্যে কাটিয়েছি। তাদের চিন্তাও ভুল, তবু তোমার মতো বা তোমার বন্ধুদের মতো তাদের চিন্তা ধারা কখনো ছিল না। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে জাবের শক্তি কমিয়ে দিতে হবে কিন্তু তাই বলে সম্পত্তির অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া—নিছক পাগলামী! আমায় যদি জিজ্ঞেস কর তো স্পষ্ট কথা বলব—ভগবানকে আমি ধন্যবাদ দিই কেন জান? দিই এইজন্যে যে তিনি শুধু তোমাকে কথা বলারই অনুমতি দিয়েছেন, কাজ করবার অনুমতি দেননি। আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ বসন্তকালের হরতালটা তুমি এবং তোমার দলবলই শুরু করেছিল—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তুমি বেশ ভালো মেয়ে লিজা, কিন্তু ঈশ্বরের রীতি অনুসারে নও। কেতাবী ধাঁচেব। জানিস ক্লিম, ফাদার নিফন্ত—আমার কনফেসার—ওকে মঠের নাস্তিক বলতেন? তিনি বিলিত খেলতেন, তুইও খেলিস নাকি?'

'না। আমার ভাল লাগে না।'

'জানি। যেখানে বাজী রাখা সেখানেই তোর অনাগ্রহ,' মা বেশ জোর দিয়ে সমর্থনের ভঙ্গীতেই বলে। তারপর গভর্নরের প্রসঙ্গ তোলে। মুখভঙ্গী ক'রে জানিয়ে দেয়: 'ভদ্রলোক বেশ সৌম্যবৃদ্ধ। লিবার‍্যাল-গোছের কিন্তু নির্বোধ।' বলতে বলতে ঝুলে পড়া চোখের পাতা ওপর দিকে উঠে যায়, চোখদুটো আরও ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। 'তিনি বলেন: "আমরা তাড়াতাড়ি করিনা কারণ আমরা সব কিছুই সর্বোত্তমভাবে করতে চাই; ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি যাতে দেশের লোক মানুষ হ'য়ে ওঠে, দেশের শাসনব্যবস্থায় যাতে তাদের কথা বলার অধিকার জন্মায়।" কিন্তু আমি তাই ব'লে তার কাছ থেকে কনস্টিটুশন চাইনি। চেয়েছিলাম শুধু আমার স্কুলের জন্য ইম্পিরীয়াল মিউজিক্যাল সোসাইটিব পৃষ্ঠপোষকতা।'

এলিজাবেথা স্পিভাকের ওপর তার ব্যবহারটা এমন যেন মানুষটা নেহাৎই অপছন্দের কিন্তু তাকে না হলেও চলে না। ভারাভকার অগুন্তি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে তুলে দেবার জন্যে যত সভা সমিতি হয় তার সবটাতেই এলিজাবেথার উপস্থিতি ক্লিমের মায়ের পক্ষে অতি আবশ্যক। তার পরামর্শ, উপদেশ শুনে নিয়ে ভেবা পেত্রভনা প্রায়ই প্রসন্ন চিত্তে সায় দেয়:

'হ্যাঁ, আমিও তো তাই ভাবছিলাম।'

হপ্তায় দু'দিন ক'রে তার বাসায় সভা বসত। স্থানীয় "সোসাইটি"-র সদস্যেরা উপস্থিত হ'তো: পিপা-কারখানার মালিকের বৌ মাদাম আর্ভেলিনা ব্রেশের,—ছোট্টখাট্টো সুন্দরী মেয়েছেলে, বেশ হাসিখুশী, চুলগুলো সাদা, গভর্নরের উপপত্নীও বটে; মাদাম পেলিমভা, কোর্ট-অফ-এক্সচেকারের প্রধানের বৌ, মিষ্টিস্বভাব, খনখনে গলার বুড়ী, ওপর ঠোঁটে কালো দাগ, গোঁফ কামিয়ে কামিয়ে জায়গাটা কড়া; মার্শাল-অফ-নোবিলিটির পত্নী, লম্বা লিকলিকে, নানের মতো পবিত্র মুখ; এমনি আরো কত মহিলা। পুরুষ অতিথিদের মধ্যে আছে গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারী কিয়ানস্কি, কমবয়সী যুবক, যে-রঙেব টাই সেই রঙেরই মোজা পরত; রক্তিম-কান্তি পুরোহিত স্লাভরশস্ত: জেল-ইনস্পেক্টর তপরকভ, পরিপাটি গোছের মানুষটি, বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ, কেশহীন মাথাটা প্রকান্ড এক শ্রীহীন কিন্তু চটকদার মুক্তার

মতো দেখায়, মোটা মুখে কুত্‌কুতে চোখ, গোলাপী গালগুলোর মাঝে পড়ে মোটা নাকটা প্রায় অদৃশ্য, গালদুটো স্বাস্থ্যবান শিশুর মতোই ফুলো-ফুলো। চিটেগুড় আর স্টার্চ প্রস্তুতকারক অকুনেভও আসত। আসত সমাজের উঁচু-পর্যায়ের আরো অনেকে। বিশপ-কয়ারের মাস্টার করভিনও আসত। গোলগোল বেঁটে দ্রোনভও, খুব উঁচু জ্যাকেট প'রে লোকজনের মাঝে তড়্‌বড়ে লাট্টুর মতো পাক খেত। ছোট্ট হলদে নোট বই আর পেন্সিল নাড়তে-নাড়তে একটা কোণে গিয়ে বসে, লোকগুলোকে এমন খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে যেন তাদেরকে সে অনাবৃত ক'রে দেখছে। ক্লিমের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হলো, সেদিন তার আচরণটা ছিল নেহাৎ ঠাণ্ডা। পরে কিন্তু ক্লিমকে ইচ্ছা ক'রেই এড়িয়ে যায়। ভেরা পেত্রভনার বাসায় যে আলোচনা হতো, তা' খুবই জটিল—যেমন দারিদ্র্য-উচ্ছেদ বা নিঃসম্বলদের বিপজ্জনক দুর্নীতির দমন। অবাক হ'য়ে সামঘিন দেখে যে "দুর্গত প্রতিবেশীদের উপহার দান" সমিতিতে ওর মা-কে মনে করা হয় বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে এক অবিসম্বাদী নেত্রী; সামঘিনের এ-বিস্ময় কিন্তু কারো পক্ষে গৌরবজনক নয়—না ওর মায়ের পক্ষে, না অন্য কারো পক্ষে। পেলিমভার খুব মায়াদয়া, কিন্তু যেই সে প্রতিবেশীদের জন্যে উৎকণ্ঠার আভাস দেয়, অমনি ভেরা পেত্রভনা বিশ্রীভাবে নিরুত্তাপ গলায় ব'লে ওঠে :

'বেশী তাড়াহুড়ো করা আমাদের উচিত না, আনা আন্তনভ্‌না। গরীবেরা খরচের হাত আঁটো করলেই কিন্তু সব দারিদ্র্য উড়ে যাবে।'

'ভয়ানক সত্যি-কথা,' তপরকভ উল্লসিত হ'য়ে বলে : 'আমার মনে হয় গুয়েরিয়েভই বোধহয় একথা বলেছিল যে—"অত্যাধিক বৃষ্টির চেয়েও অল্প বর্ষণেই মাটি ভাল সিঞ্চিত হয়।"

তপরকভের বিশ্বাস খরগোশ পাললেই গরীবলোকের জীবন বেশ আরামের হ'তে পারে। 'ফ্রান্সের অর্ধেক লোক তো খরগোশের চাষ করে—আর, দেখতেই তো পাচ্ছেন ফরাসীরা আমাদের টাকা জোগাচ্ছে।'

এই সব সভায় মজাদার দিকটা সামঘিনের চোখ এড়িয়ে থাকে, ও এখন বড়ই আত্মসমাহিত। তবুও কখনো-কখনো না ভেবে পারে না যে এদের অবান্তর কথা-বার্তা অন্যের মজা ওড়ান বই আর কিছু না।

'" মেন্‌স্ সানা ইন করপোরে সানো (সুস্থ শরীরে সুস্থমন)" হচ্ছে প্যাগান ধারণা এবং সেই জন্যেই মিথ্যা,' ব'লে উঠল পুরোহিত স্লাভরশভ। 'প্রকৃত খ্রীশ্চিয়ান অন্তর সর্বদাই খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম ও ভীতিতে পরিপূর্ণ।'

অধিবেশনগুলো কিন্তু সামঘিনের নিতান্তই কৌতুক-করুণ হ'য়ে উঠল। কেননা চোখে পড়ল এই বাড়িটারই ওপরতলায় যেখানে বিপত্নীক ডাক্তার লুবোমুদ্রভ বাস করে সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের লোক এসে আড্ডা গাড়ছে। কোন সন্দেহ নেই যে স্থানীয় বলশেভিস্টদের এটাই গোপন রাদেভূ'। লক্ষ্য ক'রে দেখল প্রতি মঙ্গল আর শুক্রবারে ডাক্তারের কাছে সন্ধ্যেবেলায় যত লোক আসে তার মধ্যে সর্ব-ধ্বংসনাশ-হর পরিসংখ্যানবিদ স্মলিন থাকবেই, আরো সব এমন এমন মুখ থাকে যাদের কোনক্রমেই রুগী বলা যায় না। দু'একবার দুনায়েভকে বিদ্যুৎগতিতে উঠোন দিয়ে চলে যেতেও দেখল। মুখে সেই অবিস্মরণীয় হাসিটুকু, কোঁকড়া দাড়ি আরো ঘন হয়েছে, এমন শক্ত যেন কাঠ কুঁদে তৈরি। হাঁটু পর্যন্ত হাইবুট, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় চামড়ার ক্যাপ,—এই হলো দুনায়েভের বেশ। চামড়ার পরিচ্ছদ আর টুপী মেসিন-তেলে জব্‌জবে, ভ্যাপ্সা ভ্যাপ্সা দাগে ভর্তি।

ডাক্তার তার ভাড়াটে অ্যাপার্টমেন্টের দু'টো ঘর আবার ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। একটা ঘরে থাকে "আমাদের এলাকা" পত্রিকার এক লেখক, নাম করনেভ। ছোট্ট

মানুষটি, কটা-রঙের দাড়ি, ছেলেমানুষী চোখ আর বেলেহাঁসের মতো ভঙ্গী। অন্য ঘরে থাকে ফ্লেরভ ব'লে একটা লোক, বছর চল্লিশেক বয়স, টিকলো নাকের ওপর পাঁশনে আঁটা। পাতলা কালো দাঁড়িতে সৌকর্য্য বেড়েছে কি না সন্দেহ। দেখলে মনে হবে লোকটার গলা বোধ হয় বাজখাঁই, কিন্তু আসলে তার স্বরটা খুবই নীচু-ঘাটে বাঁধা, আস্তে-আস্তে কথা বলে সামান্য একটু তোঁতলিয়ে। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে কয়েকটা বক্তৃতা-পাঠ করেছে, "আমাদের এলাকায়" বিজ্ঞানের সাফল্য নিয়ে ক'টা প্রবন্ধ লিখেছে আর এখন একটা বই লেখায় ব্যস্ত যার নাম: "মনোগত বিশৃঙ্খলার সামাজিক কারণ।"

'দেখুন প্রায় সব মানসিক বিশৃঙ্খলার আদিতেই মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ রয়েছে,' সামঘিনকে বোঝায়: 'সমাজের বর্তমান কাঠামোয় এমন সব মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে যাদের ইচ্ছাশক্তি হয় অপুষ্ট নয়তো অতি-পুষ্ট। ইচ্ছার শক্তিকে স্বাভাবিক ও মুক্ত ক'রে তুলতে পারে শুধুই সোস্যালিজম।'

ডাঃ লুবোমুদ্রোভ তার কথা শুনতে-শুনতে নিজের মনেই হাসে, টেকো মাথাটায় আঙুল দিয়ে টোকা মারে। বেশ ভদ্রভাবেই তাকে ধমকও দেয়:

'দেখো নিকোলাই, মিথ্যে কথা-টথা যেন না ব'লে ফেল।'

ডাক্তারের চেহারাটা ছিবড়ের মতো, সোজা শক্ত। নিরন্তর মানুষের যাতনা দেখতে দেখতে মনে যে মন্থর-সন্দেহপ্রবণতা আসে সেটাকে যেন কাটিয়েই উঠেছে। বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে ক্লিমকে একবার দেখে নিয়ে অনাড়ম্বর-ভঙ্গীতে ব'লে ওঠে:

'বু-বুঝলে, "কাক কখনো কাকের মাংস খায়না" এ-কথাটা কিন্তু ভারাভকার ক্ষেত্রে খাটল না। র্যাদিয়েভ তাকে ডিঙিয়েই মেয়রের চেয়ারে গিয়ে বসল। বুদ্ধি-জীবীদেরকে স্প্রিংয়ের তক্তা বানিয়ে দিল লাফ ওপরে। খুব পাক্কা বুড়ো, কাল কি হবে তার গন্ধ পায়।... ও হ্যাঁ, তুমি কি কোনক্রমে বলশেভিস্ট হ'য়েছ নাকি?'

'কোনক্রমে মানে?' সরাসরি উত্তর না দিয়ে ক্লিম জিজ্ঞেস করে। ডাক্তার কিন্তু ওর জবাবে মোটেই উৎসাহিত হয় না। আইডিনের রং লাগা আঙুল দিয়ে কানের পেছনে টোকা দিতে-দিতে বিড়বিড় ক'রে ওঠে:

'শক্ত লোক সব। ওদের একজন এসেছিল একবার—কী দাড়ি রে বাবা!—রক্তমাংসের ঝোলিয়াবভ যেন একটা।'

যে-ভাবে ডাক্তার মাথা ঠুকে-ঠুকে চাপা-চাপা কথা কণ্ঠ থেকে বের করছিল তা'তে সামঘিন একটু বিরক্তই হয়েছিল। তা-ছাড়া তার অগোছালো চেহারা, ন্যুব্জ দেহ, এ-সবও বিরক্তির কারণ হ'য়ে ওঠে। জীবনে দুমড়ে-যাওয়া এই লোকটা যে বলশেভিস্টদের ওপর দরদ দেখাচ্ছে সেটাও যেন কেমন।

'প্লেভেকে টিপে মারাটা অবশ্য এমন কিছু অন্যায় নয়,' অস্ফুট-সুরে বলে: 'কিন্তু তার মানে তো মাছির মতো একটা-একটা ক'রে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস। লোকে বলে প্রফেসররাও নাকি আজকাল পলিটিক্সে ঢোকবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছে। বুঝলে,, গরলোকগত সেচেনভই ঠিক বলেছিল হিবরচফ সম্পর্কে: 'ভাল বৈজ্ঞানিক বটে কিন্তু বাজে রাজনীতিক।' হিবরচফ কথাটার সত্যতাও প্রমাণ করল—পচা রাজ-নীতির সৃষ্টি করল।'

ডাক্তার এলিজাবেথা স্পিভাককে মেয়ের মতো দেখে, "তুমি" ব'লে কথা বলে। এলিজাবেথাও তার ঘর-গেরস্তালী দেখে। সামঘিনের বিশ্বাস মেয়েটি বোধহয় সিক্রেট-কমিটির সেক্রেটারী, বেশ দায়িত্বপূর্ণ কাজে আছে। জানতে পারে ছোট ছেলেটার নার্স সাশা দুনায়েভের ভাই-ঝি। দুনায়েভ ব্রেশেরের পিপে-কারখানাতে ইঞ্জিনীয়ারের কাজ নিয়ে আছে আর তার গোমড়া-মুখো কমরেডটি—ভারাক্সিন—রেলের মালগুদামে ওজনবাবু হয়েছে।

ব্যাঙের সুরে সামঘিন মন্তব্য ক'রে ওঠে : 'বেশ উন্নতি করেছে দেখছি।' কিন্তু স্পিভাক ঠাট্টাটা ধরতে পারল না।

'দু'জনেই ওরা বেশ চালাক।' ক্লিমকে জানায়। শহরটা যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, সে-কথাও বলে। ছোট একটা ছাপাখানা চলেছে গোপনকাজের জন্যে। কিন্তু নিষিদ্ধ পুস্তিকা আর অর্থের বড় অভাব।

'আর এখন ভারাভকা মারা যাওয়ায় অভাবটা আরো বাড়বে।'

'টাকা দিত নাকি?' সামঘিন অবিশ্বাসের কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ। কিছু কিছু।'

'কি জন্যে দিচ্ছে তা জানত কি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আশ্চর্য তো!'

স্পিভাক জবাব দিলে না। বাইরের দিক থেকে ওর বিশেষ পরিবর্তন হয় নি, শুধু যা একটু শুকিয়ে গেছে। গোল মুখে একটিও ভাঁজ পড়েনি। নীল চোখের শান্ত দৃষ্টি ঠিক ওই রকমই। সামঘিন কিন্তু লক্ষ্য করে যে ওর ওপর তার ব্যবহারটা রুক্ষ হয়ে উঠেছে। নিজেকে বোঝায় নিকনোভা ও তার নামটা ওই ব্যাপারে জড়িয়ে যাওয়াতেই হয় তো এ-রকম হয়েছে। নিকনোভা সম্বন্ধে মন এখন নিরুত্তাপ, সামান্য তিক্ততাও যেন জমেছে। কিন্তু ভাবখানা এমন যেন নিকনোভা এক সুযোগ্যা দাসী; অনেকদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রভুর সেবা ক'রে পরে বিশ্বাসের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল, যেন কোন এক কেলেংকারী কাণ্ডে লিপ্ত হয়ে ওকেও সেই ব্যাপারে লোকের চোখে হেয় করে তুলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছিল। স্পিভাকের সঙ্গে এই দুঃখের কাহিনী আলোচনা করলে হতো, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। তা'ছাড়া তা'র ছেলেটা সব সময়ই এসে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

বাচ্চাটা ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, যেন ভয়ানক অবিশ্বাস। খুঁৎখুঁতে ভাব। কালো কালো চোখের ভুরু, চেরীর মতো চোখ। চুল চিরুনীর শাসন মানে না। ছিপছিপে নরম শরীর। সামঘিন কোনদিনই ছেলেমেয়ে দেখতে পারে না। এটাকেও ভাল লাগে না, দেখে বরিস ভারাভকার কথা মনে পড়ে যায়।

সামঘিনকে ওরই চশমার নীচের দিক থেকে দেখে ছেলেটা জোরালো কচি-কণ্ঠে বলে ওঠে :

'দু' আঙুল দিয়ে শিস দিতে পার? পাখীর খাঁচা বানাতে পার? ভাল্লুক আঁকতে পার? বিড়াল? বিড়াল আঁকতে পার না? তুমি কি পার?'

সামঘিন কিছুই পারে না। আর্কাদির তা' মোটেই পছন্দ হয় না। উজ্জ্বল ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আবার গঞ্জনার সুরে বলে :

'ফ্লেরভ সব পারে। গ্রিশা-দুনায়েভকাক্যও পারে। ডাক্তারও পারে, শুধু শিস দিতে পারে না। তার তো নকল দাঁত। ফ্লেরভ, উরাল পাহাড়ের ওদিকেও ছিল। তুমি ম্যাপের ওপর আঙুল দিয়ে উরাল পাহাড় দেখাতে পার?'

উরাল পাহাড়ের ওদিকে সীমাহীন নদীতে ফ্লেরভ নাকি অদ্ভুত মাছ ধরেছিল :

'এ্যাত্তো লম্বা!'

যতটা পারে হাতদুটো ছড়িয়ে আর্কাদি সেদুটো মাথার ওপর নাড়াতে থাকে।

'কিন্তু চৌকো মাছ তো নেই।' সামঘিন বলে।

ছেলেটা ওর দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে, রেগে গেছে বলে মনে হয় :

'নেই কেন, আছেই তো? গোল, গোলও আছে। বলের মতো। ছোট্ট ছোট্ট ঘোড়ার মতোও আছে। মানুষ তো সব এক রকম হয়, কিন্তু মাছ অনেক রকম। তাহ'লে কেন বলছ নেই? আমার কাছে ছবি আছে, তার মধ্যে যা-যা হয় সব আছে।'

ছেলেটার সঙ্গ ক্লিমের কষ্টকর ঠেকে। কিন্তু ওর মায়ের মন যে নরম ক'রে তুলতে হবে। তাই ছেলেটার সঙ্গে খেলা করতে চায়, তবেই যদি মা-টি নরম হয়।... বাচ্চাটার চোখে সামঘিন এমন এক মানুষ যাকে জগতের সব কিছুই ব'লে দিতে হয়।

স্পিভাক ছেলের সঙ্গে ঘুরিয়ে কথা বলে, অদ্ভুত-ভাবে হাসিই পায় যেন। যেন ছেকেকে নিয়ে বড় ভয়, পাছে সে বিরক্ত হয়, আর্কাদির বকবক শুনে মা কখনো তথ্যের পাহাড় নিয়ে সামনে হাজির হ'তো না, শুধু কচিৎ কখনো প্রশ্ন করত :

'হ্যাঁরে, এমন জিনিস হয় কি?'

'কেন হবে না?'

'ভেবে দেখ আরেকবার।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখব।' আরকাদি সম্মতি জানায়।

তার সোজা-সোজা প্রশ্নের মা অনেক ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে উত্তর দেয়। কখনো ঠাট্টার ছলে, কখনো প্রশ্ন দিয়ে। বেশ বুদ্ধি ক'রে সরলভাবেই ছেলেটাকে দূরে সরিয়ে রাখে, যে-কথা জানবার মত তার এখনো বয়স হয়নি সে-সব থেকে বহু দূরে। আদর করত খুব কমই, করলেও খুব সাবধানে, বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে।

'বাঃ, বেশ দূরদর্শী তো। জীবন তো আর সহজ নয়,' সামঘিন মনে মনে ভাবে। নিজের কথা মনে পড়ে,—ছোটবেলায় মা কত প্রচুর আদর-ই না করত, অথচ এমন যন্ত্রের মত, এমন অভ্যাসের বশেই, যে সেই শিশুমন থেকে কোমলতা কখন জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছিল।



আগস্ট-মাস এসে গেছে কিন্তু এখনো রোদের কি তেজ। ঘোলাটে আকাশ থেকে সীসে-গলা উত্তাপ। শহরে এমন গভীর প্রশান্তি যে সজোর হুকুমের ধমকানি বাগান পেরিয়েও পরিষ্কার ভেসে আসে :

'অ্যাট্-টেন-শান্!'

গাছপালার ধুলো-ধুসরিত পত্রপল্লব বিষাদমগ্ন, স্থির-নিষ্কম্প, যেন ধমকে ভয় পেয়েছে। রাতগুলোও গরম, তেমনিই বিষণ্ণতায় নীরব। রাত্রে সামঘিন কখনো-কখনো অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। শান্ত নিরিবিলি পথে, বেনেপাড়ার আশেপাশে, যাতে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা না হ'য়ে যায়। সরু-সরু গলিপথের সেই সব নৈশ অভিযান ওর মনে নিয়ে আসত বিদ্বেষে ভরা তিক্ত মাতলামি। পাকা ভিতের সুদৃঢ় বাড়ির জানালার তল দিয়ে-দিয়ে ও পথ হাঁটত। সরল সহজ লোক, প্রখর বাস্তব বুদ্ধির সব লোক ওই বাড়িগুলোয় বাস করে। এরা সেই-সব মানুষ যাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কজলভ কত নিপুণ বিবরণ দিয়েছেন, কত সুন্দর সব কথা লিখেছেন। ডাক্তার লুবোমুদ্রভের কথাও মনে মনে স্বীকার করে :

'ঠি-ঠিকই তো, নিম্ন-মধ্যবর্গের লোকেরা অভ্যস্ত ভঙ্গীতে জীবন ধারণ করতে আর পারবে কিনা, সে-সম্বন্ধে ক্রমশই সন্দেহ জাগছে, সে-বিশ্বাসও হারাচ্ছে। এখনো সেই অবস্থা। সবাই ভাবে যে অভ্যস্ত ধারাটার যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে, ব্যাখ্যা দিতে হবে। আর এই ব্যাখ্যা-প্রমাণই বা পাওয়া যায় কোথায়? তাদের অস্তিত্বই যে নেই।'

শ্নতে-শ্নতে সাম্‌ঘিন ভাবে : যে সরকার এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনীহা নিয়ে আসতে পারে, সে সরকার তো মহা-অপরাধী। কারণ এরাই সেই শ্রেণী যারা অন্য দেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দৃঢ়-সমর্থকের ভূমিকা নিয়ে থাকে। তবু এমন কথা ভাবতে ওর ভাল লাগে না। রাজনীতির সাধারণ আর চলতি ভাষ্য ও ঠিক মেনে নিতে পারে না। ভাবে এসব ভাষ্য তো ওর চিন্তাধারার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নষ্ট ক'রে দেয়, তাদেরকে বিকৃত ক'রে তোলে। কাজেই খুশী হয়ে ওঠে যখন শোনে চাপা হাসি হেসে ডাক্তার বলছে :

'ভারাভকার মতো লোকেরা বোধহয় ব্যাবেলের টাওয়ার আর ইজিপ্সীয়ান পিরামিড গড়ে তুলতে বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছে। যথেষ্ট ক্রীতদাসও নেই, আর শ্রমিকদের তো অনর্থক-বস্তুর ওপর ভারী অনিচ্ছা।'

শেষে সাম্‌ঘিনের মনে হয়, জীবন এত বিকৃত যে যারা এর ভিত্তি ভেঙে দেওয়ার সঙ্কল্প করেছে, এর নোঙরের রশি ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে, তারাই আজ সবচেয়ে সরল আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান। মনে পড়ল নিকনোভার চিঠি পাওয়ার পর সেন্টপীতর্সবুর্গে বসে এ-রকম একটা ভাব সর্বপ্রথম ওর মনে এসেছিল। এ ভাবনাটা শুধুমাত্র ভয় থেকেই আসেনি। ভয়টা যে কেন, নিজের জন্যে না নিকনো-ভার জন্যে, সেকথা ভাববার ওর কোন প্রয়োজন নেই। কয়েকবার অবশ্য মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো মনে হয়েছে যে নিকনোভা যদি ধরা পড়ত, তাহলে হয় ভয়ে বা বিদ্বেষে সন্দেহের কথাটা নিশ্চয়ই তথ্য হিসেবে পেশ করতো আর ওকে কলঙ্কিত ক'রে তুলত।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ইনোকভের সঙ্গে দেখা। একটা বাড়ির খিড়কির দোর দিয়ে সে বেরিয়ে আসছিল। ঘোড়াটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে, আঙিনার দিকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলছিল : 'আচ্ছা চললাম রে হাঁদারাম!'—আর তারপরেই আচম্‌কা সাম্‌ঘিনের গায়ে খেল এক ধাক্কা।

'মাপ করবেন!—আরেঃ, তুই!'

'কার সঙ্গে এমন মৌলিক কায়দায় বিদায় নিচ্ছিলি রে?'

'পোয়ারে। মনে আছে তো—সেই পুলিশটা। সেই যে তোর বাড়ি যেদিন সার্চ হয়েছিল, ও ছিল। ইন্সপেক্টারের প্রমোশন পেয়েছিল, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে। বিপ্লবের ভয় লেগেছে। ফিরে যাচ্ছে ফ্রান্সে। দানব একটা!'

'বিপ্লব সম্বন্ধে এত জোর গলায় বলছিস্‌,' সাম্‌ঘিন সাবধান ক'রে দেয়। কিন্তু তাতে ইনোকভ পরোয়া করে না।

'সব কুত্তাই এই নিয়ে ভেউ-ভেউ করছে,' গলা একটুও না নামিয়ে বলে। 'সব মুর্গী চিঁ-চিঁ আরম্ভ করেছে, এমন কি, শুওরগুলো পর্যন্ত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আরম্ভ করেছে। বড্ড একঘেয়ে হে দোস্ত্‌। কিছুই করার নেই। তাস খেলতে-খেলতে লোকে ক্লান্ত। তাই একটা বিপ্লব শুরু করা যাক, কিছু একটা তো করতে হবে। বুঝলি, এমন জনসাধারণকে আমি বেশ বুঝি। এরা বিপ্লবে যায় এমন ভঙ্গিতে ঠিক যেন অবিশ্বাসী চলেছে গির্জায় বা ধর্ম-মিছিলে। হ্যাঁ, জানিস্‌, আমার একটা গল্প ছেপেছে—পড়েছিস নাকি?'

'নাঃ,' সাম্‌ঘিন বলে। গল্পটা পড়েছে কিন্তু ভাল লাগেনি। ইনোকভকে মোটেও লেখক-লেখক দেখায় না। ঝল্‌ঝলে একটা কোট,—অন্য কারো বলে মনে হয়, সাদা ক্যাপ আর দাড়িতে তার বদ্‌খত মুখটা চেনা যায় না। চেহারাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন কোন পয়সাওয়ালা চাষী, হৈ-হুল্লোড় ক'রে উচ্ছ্বাস জাহির করছে।

সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বোধহয় নয়, এমনি ভাব।

'হ্যাঁ, আমি বইটা বের করেছি। প্রশংসাও পেয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় একেবারেই যা-তা।

সেন্সর আর এডিটর দু'য়ে মিলে পাণ্ডুলিপি এমন ঘষে-মেজে তুলেছে যে আদৎ মেজাজটাই একেবারে উধাও হয়ে গেছে...হ্যাঁ বিরসভাবটা অবশ্য রয়ে গেছে। আর বুঝলি, বিরসতাকে কাটিয়ে তুলতেই তো আমি গল্পটা লিখেছিলাম। আচ্ছা, চলি তা'হলে। এই দিকটায় যাব। সব জায়গাতেই ছোটাছুটি করি। ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছি। পোল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম, জার্মানীতে, বলকানে, তুর্কীতে, ককেশাসেরও ওপর। কোনো জায়গাই ভাল না। বোধহয় এদের মধ্যে সব চেয়ে ককেশাসটাই ভাল।'

'বুনো একটা, তেমন কিছু চালাক না,' গলি দিয়ে ইনোকভের পা-চালিয়ে চলে-যাওয়া দেখতে-দেখতে সামঘিন ভাবে। তার কাঁধ দু'টো উঁচু হয়ে উঠেছে আর পিঠটা একটু ঝুলে পড়েছে, যেন মস্ত একটা ভার বয়ে নিয়ে চলেছে ও, সামনে একটা ঝাপ্‌সা ল্যাম্প-পোস্ট এগিয়ে আসছে তাকে অভ্যর্থনা করতে। ইনোকভের গল্পটা মনে পড়ল। বিশ্রীভাবে লেখা, অর্ধ-ব্যক্ত চিন্তায় ঠাসা, অনেক ফাঁক-ফাঁক। সর্বাঙ্গে বিবক্তির ক্লান্তিকর সুর। নামটা ছিল : "চলতি," আর বিষয়টা হলো সাধারণ মানুষের রোজনাম্‌চায় ছোট-ছোট অদণ্ডনীয় অপরাধের ফিরিস্তি। সামঘিনের স্মৃতিতে যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠি দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল।... রাস্তার শেষপ্রান্তে, মাঠের মাঝে, রাশি-রাশি জমকালো আগুনে-মেঘ। ইনোকভ আর ও তাদের দিকে চলেছিল। হঠাৎ মেঘ চিরে যেন বেরিয়ে এল চিকণ-পায়ের সোনালী তেজী ঘোড়া, পিঠের ওপর সাদা সওয়ারী। আর ঠিক তক্ষুণি, সেই মুহূর্তেই, দাড়িওয়ালা এক কিষাণ একটা শূন্য পিপে ঠেলতে-ঠেলতে গেটের বাইরে এল। সোনালী ঘোড়া মাথা নাড়িয়ে পেছন দিকে হটে। সামনের পা দুটো খোয়ার ওপর সজোরে ঠুকে যায়, স্ফুলিঙ্গ ছোটে। ইনোকভ থমকে দাঁড়ায়, অদ্ভুতভাবে বিড়বিড় করে :

'আন্তরিকতা!'

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে : 'আঃ, কি সুন্দর...'

দৃশ্যটা মনে পড়তেই সামঘিন ভাবে : 'বিপ্লবে ইনোকভের মত মানুষ নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে।'

এলিজাবেথা স্পিভাকের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কিন্তু কয়েক মিনিট ওর কথাবার্তা শুনে বিরস গলায় এলিজাবেথা অভিযোগ আনে :

'মনে হচ্ছে আপনি যেন বুদ্ধিজীবীদের সখের খেলায় মেতেছেন, অর্থাৎ নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া। এটা এমন—কাল-অনুপযোগী।'

স্পিভাকের অসংখ্য কাজে সহায়তা করবার জন্যে সামঘিন অতি সাবধানে এগিয়ে আসে। মনকে প্রবোধ দেয় যে তার গোপন কাজগুলো সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছাতেই এই সহায়তা। চির-শান্ত মেয়েটার বিপ্লবী মনের পেছনে কি উদ্দেশ্য তাই জানতে হবে। আবার তার দিক থেকে স্পিভাক ভাবে যে এই সব সাহায্য-সহায়তা তো আসতে বাধ্য। সামঘিন যে এতে কতটা ঝুঁকি নিচ্ছে সেটা তার মোটেই চোখে পড়ে না, ওর সঙ্গে বন্ধু হয়ে ওঠবারও কোনো আগ্রহ দেখায় না।

গোটা শরৎকালটাই ওখানে কাটায়। বাড়িটার জীবনধারা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। মনে-মনে আশা বাড়িটায় খানাতল্লাশী হবে, অ্যারেস্ট-ট্যারেস্ট হবে।...মায়ের সঙ্গে ব্যবসা'র অসীম বিবক্তিকর সব কথাবার্তা হয়। ডিসেম্বরে মাদাম সামঘিন অবশেষে বিদেশে চলে যাবার জন্যেই তৈরি হলো। সম্মানার্থে বিদায়ী-ডিনার আর

নানা স্তুতিবাচনের অনুষ্ঠান হলো। বিদায় পর্বে ফুল আর চোখের জল। বিদেশ যাত্রা করছে বলে মা'র অহঙ্কারটা বেশ চোখে পড়ে, হয়তো মনে-মনে ভাবছে যে যতটা গণ্যমান্য ছিলাম আজকের এই প্রবাস-যাত্রার ব্যাপারটায় তা আরো অনেক গুণে বেড়ে উঠল, আমি একটা কেউকেটাই হয়ে উঠেছি। তার দিকে চেয়ে-চেয়ে সামঘিনের ভয় হয় লোকে হয়তো ভাববে বুড়ীটা কি অদ্ভুত। করুণা করতেও ইচ্ছে হয় কিন্তু বৃথাই মন খুঁজে-খুঁজে সামঘিন হয়রাণ হয়, মায়ের জন্যে একটুও মায়া-মমতা পায় না খুঁজে, শুধু পায় বিরক্তির জ্বালা। বেশী ক'রে অপ্রস্তুত হয় এই ভেবে যে স্পিভাক নিশ্চয়ই মাকে হাস্যকর ভাবছে, দয়া করতে চাইছে। কিন্তু স্পিভাক শুধুই মায়াভরা চোখে বৃদ্ধার দিকে চেয়ে থাকে, এমনভাবে যত্ন নেয় যেন মা অসুস্থা, দুর্বলমনা।

সেন্টপীতর্সবুর্গের ওয়ার্‌শ-টার্মিনালে ঝক্‌ঝকে নতুন ইঞ্জিন ধুঁয়ো ছাড়তে-ছাড়তে লাল-লাল বড় দু'টো চাকা ঘুরোতেই গাড়ী নড়ে উঠে, চলতে শুরু করে। মায়ের রং-করা মুখ বিশ্রী এক দাগের মতো দিগন্তে ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সামঘিন ততক্ষণে টুপী পরে নিয়েছিল। এখন তাড়াতাড়ি সেটা আবার খুলে নিতেই মনের মধ্যে শান্ত-জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি তুলে দুঃখের কথাটা এই এতক্ষণে ঘুরপাক খেয়ে উঠল :

'চিরদিনের জন্যে কি?'



জোর বাতাস বইছে। রেলওয়ে স্টেশন ধোঁয়ায় ভরে উঠেছে, তারই সংগে পড়ছে তুষার। দেওয়ালের ছেঁড়া পোস্টারের মাঝে হাওয়া ঢুকে পতপত করে। লাইনের ওপর সাদা-সাদা বিজলী-বাতির গোলকগুলো দুলছে। শহরের ওপর দিয়ে ঘোলাটে হলুদ আকাশখানা যেন নড়ছে। ভিজে বাতাসে চাপা গোলমালের ধ্বনি, মাঝে-মাঝে শান্টিংরত ইঞ্জিনের ভয়-তীক্ষ্ম আর্তনাদে খানখান হয়ে ভেঙে পড়ছে। পিছল-সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সামঘিনের পা হড়কে যায়, একজন লোকের কাঁধ ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নেয়। ঘুরে দাঁড়াতেই বিস্ময়ের অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠে :

'সামঘিন! আর আমি ভাবলাম,...কাউকে বিদায় দিতে এসেছিলে? নাকি, দেখা করতে? দেখা পেলে না বুঝি?'

টুপীর নীচ থেকে তুরবোয়েভের চকচকে বিদ্রূপ মেশান দৃষ্টি সামঘিনের গায়ে এসে বেঁধে। বেশ খুশী খুশী ভাব।

'আমার সংগে দেখা হওয়ায় নিশ্চয়ই নয়,' সামঘিন ভাবে। দু'জনেই গাড়ীর আস্তানার দিকে এগোয়।

'কোন্ দিকে চললে?' পাতলা কোটের নীচে কাঁপতে-কাঁপতে তুরবোয়েভ বলে।

এক গাড়ীতেই ওরা ওঠে। তুরবোয়েভের মুখে শ্লেষের হাসি। উচ্ছ্বসিত হয়ে সামঘিনের খবরবার্তা শুধায়। সামঘিন সাবধানে কথা বলে।

'বড় ঠান্ডা,' কাঁপতে-কাঁপতে তুরবোয়েভ বলে : 'চল, ভদকা বা চা খেয়ে নেওয়া যাক।'

ক্লিম রাজী হয়। কৌতূহল জেগেছে, তুরবোয়েভটা কী না সাংবাদিক হয়েছে!

'আমাকে ঠিক আশা করনি, না?' রেস্তোরাঁয় বসে তুরবোয়েভ বলে: 'খুব সুন্দর পেশা, বুঝলে!'

সামঘিন চা খেতে-খেতে চোরা-দৃষ্টি হানে। সেই পরিচিত মুখ, যদিও অনেক কালচে মেরে গেছে, সেই কালো ইম্পিরিয়াল আর ছোট গোঁফ। চেহারাটায় সন্ত্-মার্কা ছোপ ফুটে রয়েছে, তারই সঙ্গে ইহুদীরও খানিকটা। কিন্তু চোখ দুটো একটুও বদলায় নি, তীক্ষ্ণতা ঝলকে-ঝলকে উঠছে আগের মতোই।

'একটি "সব-পাওয়া" লোক যেন,' সামঘিন ভাবে। তুরবোয়েভ ভদকা খায়। পানপাত্রটি অধরের কোণে চেপে ধরে মজুরের মতো থুঃ-থুঃ করে কাশে।

'মোটের ওপর বেঁচে থাকাটা অনেক হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে,' বলতে-বলতে পকেট থেকে একটা সস্তা এনামেলের ঘড়ি বের ক'রে দেখে। 'দেখ, গণ-অভ্যুদয় সম্পর্কে চমকপ্রদ যদি কিছু শিখতে চাও তো বল? শুনেছ নিশ্চয়ই, সামান্য এক পাদ্রী এখানে মজুরদের সংগঠন করছে। সম্পূর্ণ আইনসম্মতভাবেই, সরকারী আশীর্বাদ নিয়ে।'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' সামঘিন বলে: 'কিন্তু এর অর্থ কি?'

তুরবোয়েভ ঘাড় নাড়ে। ভুরু কুঁচকে তোলে। চোখ দুটো কোটরের গভীর গর্তে।

'বুঝি না। জার্মানদেরও এমন এক পাদ্রী ছিল—বোধহয় স্টেকার ছিল নাম। কিন্তু এটা ঠিক সে রকম ঠেকছে না। অবশ্য সব খবর আমার জানা নেই। হয়তো সেই রকমই। কেউ-কেউ—যারা জানে—বলে যে জুবাতভ-পরীক্ষার এটা নাকি পুনরাবৃত্তি, বৃহৎ আকারে। সেটাও যে সত্যি, তা মনে হয় না। যাই হোক, ব্যাপারটা আশ্চর্য। আমি যাচ্ছি সেই পাদ্রীর ভাষণ শুনতে। আসবে নাকি?'

সামঘিন রাজী হয়। দিয়োমিদভের মতো একজন প্রচারক দেখতে পবে বলে আশা করে। জীবনে নিষ্পেষিত শ'য়ে-শ'য়ে লোক শুধু একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে হয়তো তার কথা শোনে, অন্য কিছু করবার ক্ষমতা নেই তাদের।

অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকার পথ দিয়ে দিয়ে ওরা গাড়ীতে ক'রে চলে। ঝড়ো বাতাসে ওদের কথায় বাধা পড়ে; একের কথা অন্যের মুখে ঢুকে যায়। কারখানা-গুলোর কালো চিমনি দাঁড়িয়ে আছে ধোঁয়াটে আকাশের পটভূমিকায়, দেখে মনে হয় সরাইখানার বন্ধ দরজা-জানলার ভেতরে যেন সব...গনগনে হলদে আগুনে বেড় দিয়ে হিমেল আঁধারে ছায়া-ছায়া মনুষ্য মূর্তি নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে; মাতলামির চিৎকার...একটা মেয়েছেলের নাকীসুরে গান...যতই এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তাগুলো যেন ততই বিষণ্ণ ঠেকছে।

উঁচু মতন একটা কাঠের ফলকের কাছে গাড়ীটা আসতেই তুরবোয়েভ চেঁচিয়ে ওঠে:

'ব্যাস্ ব্যাস্, রোখো! এখানেই অপেক্ষা করো।' ঘোড়া থামতে-না-থামতেই তুষারের মধ্যে সে লাফিয়ে নেমে পড়ে।

কোণার একটা বাতি থেকে স্বল্প লাল-আলোর আভায় দেখা যায় একটা গেট একটি মাত্র কব্জায় ঝুলছে। শিপ্-স্কিন-কোট-পরা কপালে পেতলের তক্মা-আঁটা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে আর একজন একটু বেঁটে মতন। সেও শিপ্-স্কিন-কোট পরে খড়ের গাদার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনারা কে?' একজন জিজ্ঞেস করল। আর একজন মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর দেয়: 'সংবাদপত্রের লোক।' বলেই থুক ক'রে থুতু ফেলে।

কয়েকটা তক্তার ওপরে হোঁচট খায় সামঘিন। মাথা নীচু ক'রে তুরবোয়েভের পিছু-পিছু গা ঘেঁষে চলে। ধাক্কা লাগে কয়েক জনের সঙ্গে, তার চাপা কণ্ঠে

বলাবলি করছিল : 'চুপ।'

'ন্—না, ভাইসব,' খন্‌খনে তীব্র আওয়াজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে, ক্ষ্যাপাটে সুরে যেন। সামঘিন তুরবোয়েভের পিঠে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পা টিপে-টিপে খাড়া হয়ে তার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে দূরের দিকে চায়। সেদিক থেকে খন্‌খনে গলার তীব্র চিৎকার তখনো আসছে : 'নাঃ। আমরা তা বলব না। বলব—দারিদ্র্য...'

সামঘিনের মাথার ওপরেই একটা ভারী গলা রাগে চেঁচিয়ে ওঠে, যেন মেগা-ফোনের ভেতরে কথা বলছে :

'আমরা গরীব তা ঠিক নয়, আমরা লুণ্ঠিত।'

'দারিদ্র্য থেকেই হিংসার জন্ম। আমরা বলব—হিংসা, শত্রুতা, কিন্তু শত্রুতা বিধি নয়, শত্রুতা সত্য নয়...'

'শুনলে কথা?' কে একজন সামঘিনের পেছনে চাপা সুরে প্রশ্ন করে।

'শুনলাম তো।'

'শুনলে, এ্যাঁ? কেমন, বলেছিলাম না—'

চাপা সুরে কথা, ফিস্‌ফিস্-গুজ্‌গুজ্, দমিয়ে-রাখা কাশির ধমক আর নানা শব্দের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির তরঙ্গ বক্তার দ্রুত কথাকে ভারী ক'রে তোলে। নীল-নীল তামাকের ধোঁয়া, চামড়া, তেল আর আলকাতরার গন্ধ। সামঘিন দেখে সারসের মতো কত উঁচানো গলা আর ঘাড়, জাবড়া্-জোব্‌ড়া মাথা, জলের ভেতরে বুদ্‌বুদের মতো ভাসছে আর ডুবছে। ওর সামনে লোকে ঘন হয়ে বসে আছে, সবাই সামনে ঝুঁকে পড়েছে, যেন আগুনে গা-গরম ক'রে নিচ্ছে। আরো এগিয়ে মেঝেটা মনে হয় যেন ওপরে উঠে গেছে। দু'টো টেবিল পাশাপাশি জড়ো ক'রে সামঘিনের সামনে বসে আছে কয়েক জন গম্ভীর, ভাল পোশাকের মানুষ। টেবিলের সামনে ছোট মতন একজন পাদ্রী এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। তার রঙ কালো, চুল কালো। পায়চারির সঙ্গে-সঙ্গে একবার ডান হাত আরেকবার বাঁ হাতকে দোলাচ্ছে, বাদামী ক্যাশকের কলারটা কষে টানছে। হাতের চেটো দিয়ে চুল পেছনে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষগুলোর দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়ছে যেন লাফ দিয়ে পড়বে। তারা চেঁচিয়ে ওঠে :

'কিছু বল, ফাদার!'

'চুপ!'

'ফাদার, আর কদ্দিন?'

'বোধহয় নিউ-ইয়ারেই না?'

'চুপ!'

'একটা মানুষের মতো মানুষ!' ক্যাশকের হাতা দুলিয়ে পাদ্রী চেঁচিয়ে ওঠে। 'সাচ্চা লোক! তোমাদের দুঃখের যথার্থতা উনি বুঝবেন, যারা তোমাদেরই ঘামে আর রক্তে বেঁচে থাকে—তাদেরকে ইনি তাঁর শেষ কথা শুনিয়ে দেবেন—শক্তির কথা। বিশ্বাস কর!'

তুরবোয়েভ অক্লান্তভাবে মানুষ ঠেলে এগোয়। পেছনে-পেছনে যেতে যেতে সামঘিন লক্ষ্য করে যে শ্রমিকেরা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করলেও অপরিচিতদের জন্যে চটপট পথ ছেড়ে দিচ্ছে। 'আর এগুব না,' তুরবোয়েভ সানন্দে বলে ওঠে। ততক্ষণে ওরা যারা বসে আছে ঠিক তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রমিকেরা দু'টো চেয়ারে তিন-তিনজন ক'রে বসেছে, এমন ঘন হয়ে বসেছে যে ভাপ্‌ধরা চশমার কাঁচ দিয়ে সামঘিনের মনে হয় যেন এক স্কন্ধে দু'টো ক'রে মাথা।

ক্যাশক-পরা আলোড়িত মূর্তিটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সামঘিন সেটাকে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করে। ক্যাশক ফুলে-ফেঁপে উঠছে, যেন ইচ্ছে ক'রেই বাবাজী চেহারাকে কোন সঠিক দৃঢ় মূর্তি দিতে চায় না। তার মাথার ওপর গুচ্ছ-গুচ্ছ চুল ফড়ফড় ক'রে উড়ছে। কালো মুখটায় কখনো কখনো চুল লম্বা হয়ে পড়ছে। বুক চিতিয়ে, হাতের মুঠি চেপে, মাথার ওপরের নীল ধোঁয়ায় চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। যেন কান পেতে বোবা-কণ্ঠের খসখস আওয়াজ শুনছে, শুনছে ভারী নিঃশ্বাস পতনের শব্দ আর কাশির দমক। সামঘিন বুঝে নিয়েছে যে যা আশা করা গিয়েছিল তা নয়। বাবাজীর চেহারায় দিয়োমিদভের সঙ্গে কোনই সাদৃশ্য নেই।

'দম-বন্ধ-করা কাজের চাপে পঙ্গু হয়ে হয়ে যাওয়া বৌ, অসুস্থ ছেলে-মেয়ে,' খুব কোমল গলায় বাবাজী ঘোষণা করে : 'নোংরা মানুষ বোঝাই বাসা। মদ আর ব্যাভিচারেই আনন্দ।'

'চুপ কর! আমরা জানি!' সামঘিনের কানের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গলার বিশাল গর্জন ওঠে। কয়েকটা গলা সঙ্গে-সঙ্গে চাপাস্বরে তাকে নিবৃত্ত করতে চায় :

'ছাড়ান দেও, স্টোকার-ভাই...'

'মাত্‌লামির জায়গা পাস্‌নি?'

'মুখ বন্ধ কর!'

'আমার ঘায়ে খোঁচায় কেন?'

সামঘিন সাবধানে পেছন দিকে তাকায়। ওর পেছনে লম্বা-চওড়া একটা মানুষ দাঁড়িয়ে, বিশাল আবরণহীন টেকো মাথা, গোল-গাল মুখ, যেন শোথে ধরেছে। খুদে-খুদে চোখ দুটো মুখের মাঝখানে মোটা নাকের ফুটোর খুব কাছে জ্বলজ্বল করছে, হাঁটাও বিশাল, ঠোঁটহীন, যেন ছুরি দিয়ে কোরা। সাদা ঠাসবুনুনি দাঁতগুলো বের ক'রে লোকটা সামঘিনের মাথার ওপরে চাপা গলায় বলে উঠল : 'কাজের কথা বলুক না। জীবন কেমন তা আমরা জানি। আমাদের কোন্ দরকার ওর—ওর দয়ার?'

লোকটার মুখটা এমন ভূতুড়ে দেখায় যে সামঘিন চট ক'রে চোখ ফেরাতে পারে না। আশে-পাশে যত শ্রমিক দাঁড়িয়ে তাদের সকলের চেয়ে সে লম্বায় একমাথা বড়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, প্রায় গালে গাল ঠেকিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে। ঠিক ওই রকম গোমড়া মুখই যেন সবায়ের। নিশ্ছিদ্র স্তূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সব, আঁকাবাঁকা খণ্ড-খণ্ড চোখের দীর্ঘ বেখা বাদামী রঙের বেঁটে বাবাজীর ওপর নিবদ্ধ। স্তূপটার মধ্যে এখানে-সেখানে মেয়েছেলের মুখও দেখা যায়, কিছু কিছু মুখ অবিশ্বাসে গম্ভীর, আর কিছু ভক্তিতে গদগদ, যেমনটি গির্জায় দেখা যায়। তাদেরি একজন তুরবোয়েভের পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত ঠোঁট নাড়িয়ে চলেছে, যেন শক্ত কিছু চিবুচ্ছে। তার আঁকশীর মতো নাকওয়ালা মুখটা যেন ডাইনীর। যখনি মুখ বন্ধ করছে তখনি সারা মুখে এক উগ্র মরীয়া সংকল্পের ছাপ ফুটে উঠছে। এই মুখটাও ভূতুড়ে। সামঘিনের মনে হয় ও হলেও ঠিক বাবাজীর মতোই চেষ্টা করত যাতে এই সব মুখ না দেখতে হয়। ও চোখ বোঁজে। ওর মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে চার্লস অমোঁতের সেই দৃশ্যটা :—ঝকমকে উনুন আর সেই বদখেয়ালী নিগ্রোটার কথা যে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় স্টেজের ওপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মোরগ আর কুকুরছানার লড়াই দেখাচ্ছিল। বাবাজী তখনো চেঁচাচ্ছে, মোচড় দিয়ে-দিয়ে উঠছে যেন অদৃশ্য অনেক হাত দিয়ে ওকে ময়দার লেচির মতো মাখা হচ্ছে। টেবিল থেকে লোকগুলো তখন উঠে গিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে, এদিক-ওদিকে টেনে নিয়ে যায় আর তারপর একটা কোণের দিকে তাকে ঠেলে দেয়। আর দেখা যায় না। নির্জনিনভগোরদের

সম্মেলনে জারের কথা সামঘিনের স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে, তাঁকেও এইভাবে মিনিস্টারেরা ঘিরে রেখেছিল। ঠাণ্ডা জ্বালা-ধরা বন্ধ হওয়ায় ওর নাসারন্ধ্র জ্বলে ওঠে, শ্বাসের কষ্ট হয়। সামঘিন হে'চে ফেলে। চোখে জল আসে। চারপাশে গোলমাল বাড়ে। সীট থেকে লোকজন উঠে পড়ছে। চলে যাচ্ছে না, ছোট-ছোট দল ক'রে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, বিড়বিড় করছে। তুরবোয়েভ কাকে যেন বলল :

'টেলিফোন করো...'

'নিশ্চয়ই...'

'চল।' তুরবোয়েভ বলে।

ভীড়ের মধ্যে দিয়ে পথের সুতো বেয়ে বের হওয়া রীতিমত কঠিন, সময়-সাপেক্ষ। জমায়েত অনড় হয়ে আছে। টেকো মানুষটা ফুঁসে উঠছিল :

'অন্ধদের মতো নালায় পড়া। বোঝার ক্ষমতাই নেই।'

পথে এসে পড়তেই আবার হাওয়ার ঠেলা। এখন আবার সঙ্গে তুলোর মতো নরম আর ভিজে তুষার এসে জুটেছে। গুঁড়ি-সুঁড়ি হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চলতে চলতে তুরয়োয়েভ জিজ্ঞেস করে :

'হ্যাঁ, কি মনে হলো তোমার?'

'বুঝলাম না।.. একজন মজুরের সঙ্গে কথা বলছিলে যেন?'

'হ্যাঁ। চমৎকার মানুষ। চেরেমিশভ। যদি আবার কখনো এখানে আস, ওর নাম করো।'

'আমি কাল চলে যাচ্ছি। ও কি সোস্যালিস্ট-রেভল্যুসনিস্ট, না সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট?'

'ও-দুটোর কোনটাই না। বাবাজী সোশ্যালিস্টদের পছন্দ করে না। যদিও সোশ্যালিস্টরাও দূরে-দূরেই থাকছে এই খেলার থেকে।'

'খেলা?' ক্লিম প্রশ্ন করে।

'দেখলেই তো। লোকটার চারপাশে সব যথেষ্ট পাকা-বয়সের আর, মনে হয়, খুবই দক্ষ শ্রমিকদের জটলা,' তুরবোয়েভ জানায়, যেন প্রশ্নটার উত্তর হিসাবে নয়, সরল-বিষণ্ণভাবে, নিজেকেই শোনাল বোধহয়।

সামঘিন দেখে ওদের সামনে চলেছে সেই টেকো মাথার লোকটা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে তার গোল মুখটা চাঁদের মতো জ্বলছে।... তারপর সেই মুখটা যেন ভেঙে অনেক মুখ হ'য়ে গেল আবার সেই সব টুকরো মুখগুলো কোনো একসময় গেঁথে গিয়ে ওই একটি ভূতুড়ে মুখে পরিণত হলো।

'মনে হচ্ছে আমার ঠাণ্ডা লেগেছে।' বিড়বিড় ক'রে উঠল সামঘিন।

তুরবোয়েভ গরমজলে স্নান আর লাল-সুরা পান করার পরামর্শ দেয়।

'খুব দরদ দেখছি—যেন আমার কাছ থেকে কিছু চায়,' সামঘিন ভাবে। মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। গায়ের তাপ বাড়ছে। কোলাহলের মধ্যে থেকে শুনতে পায় :

'তোমার ভাইকে ব'লো।'

'কা'কে বলব?' ক্লিম আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করে।

'তোমার ভাই দিমিত্রিকে। কেন, জাননা সে এখানে আছে?'

'না-তো। আজকেই আমি এসেছি কিনা। কোথায় সে?'

তুরবোয়েভ একটা হোটেলের নাম বললে। সে-ও নাকি যাবে দিমিত্রির সঙ্গে দেখা করতে।

॥ ২৪ ॥

হোটেলে এসে সার্মাঘন একটা সামোভার আর কিছু মদের অর্ডার দিল। উষ্ণ স্নান সমাপন ক'রে এল, কিন্তু আরাম বিশেষ হলো না বরং আরও যেন দুর্বলই হ'য়ে পড়ল। কাঁধের ওপর ওভার-কোট ফেলে চা খেতে বসল। মাথাটা বড্ড ধরেছে। সর্দিও লেগেছে। চোখ দুটোয় এমন কট্‌কটে জ্বালা যে চোখ বোজে। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একটা নিরাবরণ মুখ ভেসে ওঠে...তেল-তেলে মাথা। কানের মধ্যে ভারী গলার আওয়াজ :

'জীবন—আমরা জানি সেটা কেমন।'

ওর মাথার মধ্যে বহুলোক এসে ভীড় করে। মনে হয় হাজার হাজার একটি দেহ কিন্তু বোধহয় একটাই মাথা।

মুখ টিপে হেসে সার্মাঘন ভাবে ওটা বোধহয় "নেতা।" গরম চা মদ দিয়ে মিশিয়ে লোভীর মতো গিলে ফেলে। চোখের সামনে ছোট্ট বাদামী রঙের বাবাজী লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে, অনবরত পরিবর্তনশীল দেহটা নানা পরিচিত মূর্তি নিচ্ছে। কখনো বা তিন আঙুলের প্রচারক, কখনো দিয়োমিদভ, কখনো খালাসী, কখনো গাঁয়ের স্টোভ মিস্তিরি আবার কখনো বা শয়তানের উপাসকবৃন্দ, ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা। হাতে মোটা বই নিয়ে ডীকনও মনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেল, নেস্‌চাস্ত্‌লিভ্‌ৎজেভ্‌-এর ভূমিকায় নেমেছে এমনি নাটুকে সুরে বলে ওঠে :

'সেন্সার কর্তৃক নিষিদ্ধ!'

সার্মাঘন ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ ক'রে ওঠা সামোভারটার দিকে তাকিয়ে ভাবে : 'আমার জ্বর এসেছে—বোধহয় চল্লিশ সেণ্টিগ্রেড হবে।' গরম সামোভারের গায়ে মুখ দেখা যাচ্ছে, কিছু-কিছু টান্‌-টান্‌ রেখাও, দাগও। সবগুলো যেন মানুষের রূপ নেয়, প্রত্যেকটা থেকে আবার দশ-কুড়ি-একশ' মূর্তি। একরকম চেহারার বহু মূর্তির জমাট ভীড়। মাথাগুলো এমনভাবে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে যেন গরম ফ্রাইপ্যানে কফির দাগ। নানা রঙের চোখ হাজার-স্ফুলিঙ্গে ঝল্‌কে ওঠে। মাথার মধ্যে পাঁচমেশালি যন্ত্রণার গোঙানি শুরু হয়।

'জাহান্নমে যাক! ইস্‌ কী ভীষণ একা আমি!' ক্লিমের কণ্ঠ ভেদ ক'রে বেরোয়। কথাগুলো যেন কোন্‌ সুদূর থেকে ভেসে আসছে—অপরিচিত কণ্ঠস্বর... খস্‌খসে আওয়াজ। সার্মাঘন উঠে দাঁড়ায়, পা টলে, খাটের একপাশে গড়িয়ে বিছানার প্রান্তে পড়ে যায়। ঘণ্টার রশির শেষপ্রান্তের গোলকটা ধ'রে ফেলে, হাত দিয়ে প্রাণপণে সেটা আঁকড়ে ধরে।...যেন দেখতে পাচ্ছে সেই বেঁটে-খাটো বাবাজী... ক্যাশকের হাতাদুটো পত্‌পত্‌ ক'রে নড়ছে... এমনভাবে লাফাচ্ছে, যেন প্রাচীরের ওপাশে উড়ে যাওয়ার চেষ্টায় বাড়ির মুরগীটার অনর্থক প্রয়াস...বিরাট প্রাচীর একটা অনেক উঁচু—এত লম্বা যে শেষ নেই—কোথায় কোন্‌ অজানা অন্ধকার আর কুয়াশার মধ্যে গিয়ে সে প্রাচীর বিলীন হ'য়ে গেছে। শুধু একজায়গায় রয়েছে একটা ছেদ, কোণের আকারে, আর সেইখানটায় দাঁড়িয়ে তুরবোয়েভ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাচ্ছে : 'ও বুঝবে!'

দুটো মোটা লোক বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। সার্মাঘনকে ধরে এদিক ওদিক উল্টে-পাল্টে দিল। কিছুক্ষণ পরে ওদেরি একজন, যাকে অখোত্‌নি রো'-এর নোনা-

ছত্রাক বেচ্‌নেওয়ালার মতো দেখাচ্ছিল, দিমিত্রি হ'য়ে গেল। আরেকজন ডাক্তার, যেমনটি জ্‌লে ভার্নের বইয়ে পাওয়া যায়—ওরা সবসময়েই ভুল করে; কেউ-ই বিশ্বাস করতে পারে না। সামঘিন চোখ বোঁজে। দু'জনাই অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

যখন সামঘিনের হুঁশ হ'লো, জানালার পাশে তখন দুধের মতো কুয়াশায় রোদ গলে-গলে পড়ছে। টেবিলের ওপর একটা সামোভার রাখা, এক-ঝলক্ বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে ওপরে উঠছে। সামোভারের সামনে কাগজ হাতে ওর ভাই ব'সে। মাথায় মিলিটারী ঢঙে কদম-ছাঁট। লাল গালদুটো মস্ত দাড়িতে ভরা, বেণেতী-কায়দা যেন। পরনে সাদা মাড়-কড়্‌কড়ে স্যার্ট, টাই নেই, আর নীল সাসপেণ্ডার। ট্রাউজারটার রঙ ভীষণ উজ্জ্বল।

'কী গে'য়োরে বাবা!' ক্লিম ভাবে। কিন্তু কথাটায় মনের ভাব তো সম্পূর্ণ হ'লো না। তাই একটু কেশে মনে মনে যোগ করে: 'আয়েসী ছোক্‌রা।'

মেঝের ওপর কাগজটা ফেলে দিয়ে দিমিত্রি খাটের দিকে নুয়ে পড়ে।

'কি-রে!' চেঁচিয়ে ওঠে দিমিত্রি: 'কী ব্যাপার তোর, এ্যা? ভীষণ প্রলাপ বক্‌ছিলি। বাবাজী, শুকনো মাছ, গ্লেব উস্পেন্‌স্কি।... তিন-চারদিন একেবারে শুয়ে থাকবি।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। গেলাশে ক'রে ওষুধ ঢেলে এনে ক্লিমকে দেয়। তারপর নিজের জন্যে চা ঢেলে নিয়ে গেলাশটা হাতে ক'রে জড়োসড়ো ভাবে খাটের কাছে একটা চেয়ার টেনে এসে বসে।

'পনের দিন হলো এখানে আছি। সঙ্গে নিয়ে এসেছি উত্তরাঞ্চলের এথ্‌নোগ্রাফির ওপর একটা কাজ।'

'পুলিশের নজর আছে এখনও?' ক্লিম শুধায়।

'অনেকদিন ওসব গেছে।'

'বিদেশে যাচ্ছ নাকি?'

'টাকা কই,' দিমিত্রি মেঝের ওপর গেলাশটা রাখতে রাখতে বলে। চোখে অপরাধের যে-ছাপ তা' ভাইবোর্গে যেমন ছিল ঠিক তেমনি। 'অদ্ভুত গোলমেলে ব্যাপার, বুঝলি। একটা পরিবারের সঙ্গে থাকতাম—বেশ ভাল লোক ওরা! বাড়িটা তাদের বন্ধক রাখা ছিল। বন্ধকের মেয়াদ প্রায় শেষ হয-হয়, তা'ই আমিই টাকাটা দিয়ে দিলাম। তারপর ওদের মেয়েটা বিধবা হ'লো, আর—তুই তো বিয়ে করেছিস না? আমি কী কাজ করি? ওঃ, এমন কিছু খারাপ না। এথ্‌নোগ্রাফি ভারী ইণ্টারেস্টিং। ফলের বাগিচাও করি—বেশ ব্যস্ত থাকি ওটা নিয়ে। তা-ছাড়া—বাইরের কাজকর্মও।' কড়ে আঙুল দিয়ে নাক চুল্‌কে ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করে. 'তুই কি বলশেভিস্ট? নাঃ? আঃ, কি যে খুশী হলাম।' হাঁটুর মধ্যে দু'টো হাত চেপে ধ'রে ভাইয়ের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে: 'ওদের আমি দেখতে পারি না। পাত্‌লা-ওজনের সব মানুষ, দাঙ্গাবাজ, ব্ল্যাঙ্কুইস্ট। বুঝলি, হলফ্ ক'রে বলতে পারি, লেনিনের মধ্যে নেচায়েভের খানিকটা প্রকৃতি আছে! এই দেখ না, এই যে তৃতীয় পার্টি-কংগ্রেস নিয়ে লোকটা মেতে উঠেছে, তার কারণ কি—কিসের জন্যে? হয়েছেটা কি? নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত আকাঙ্খার কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। লোকটা অপ্রীতিকর।'

ভুরুদু'টো কুঁচকে আরো এগিয়ে আসে সামঘিনের দিকে, গলার স্বর আরো খাদে নামিয়ে বলে:

'কৃষক-বিদ্রোহ আমাকে ভারী মুষড়ে ফেলেছে। ওটা যেন সোস্যালিস্ট-রেভল্যুসনিস্টদের এক ধরনের বলশেভিজ্‌ম-ই হ'য়ে গেল। দশ-বিশ হাজার কৃষককে বিদ্রোহ করিয়ে শেষে তাদের দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসান হলো। এখানে আমরা এখন

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করছি আর ওদিকে তাদের বিরুদ্ধে কয়েদখানার ঠাকুরেরা অ্যাকশন নিচ্ছে। ভয়ঙ্কর বিশ্রী ব্যাপার।'

'তুরবোয়েভকে কেমন মনে হয়?' ক্লিম জিজ্ঞেস করে।

'ওকে আর কি মনে হবে?' দিমিত্রি জবাব দেয়। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যোগ করে: 'ওর তো হারানোর কিছু নেই।... চা নিবি একটু?'

'দাও।'

চা ঢালতে-ঢালতে দিমিত্রি বলে: 'আর্ট-থিয়েটারে "নীচের-মহল" দেখেছিলাম। সেখানেও এক তুরবোয়েভ আছে, একটু বোকা। কিন্তু প্লে-টা আমার ভাল লাগে নি। কিছুই নেই, শুধু কচকচি। কাগজের কলম-লিখিয়েদের মানবিকতা সম্বন্ধে অনুশীলন যেন। আর, এ-যুগে এত অচল ওটা—মানবিকতাকে গরম ক'রে-ক'রে নৈরাজ্যবাদে তাতান! মোটের ওপর, বড্ড বিশ্রী রসায়ন।'

দাদার কথা ও যদিও বেশ মন দিয়ে শোনে, আনন্দও পায়, তবুও সামঘিনের মাথায় তখনো গোলমাল পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। কাশিটায় বড্ড লাগছে, গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। চোখ বন্ধ ক'রে ফেলে বলল: 'মা বিদেশে চলে গেছে।'

'অনেক দিনের জন্যে?'

'সেখানেই থাকবে।'

দিমিত্রি চিন্তান্বিতভাবে চিবুক চুলকোয়। বলে:

'ওঃ!...হুঁ।...তোকে বড্ড কথা বলাচ্ছি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস, না? একটা প্রায় বাজে, আমাকে আবার আকাদেমীতে একবার যেতে হবে। সন্ধ্যের দিকে আবার আসব।'

'নিশ্চয়ই। কাগজটা দিয়ে যেও তো।'

দিমিত্রি চলে গেল। একটা প্রশ্নবোধক থম্‌থমে নিস্তব্ধতায় ঘর ভরে উঠল।

সংসারী হয়েছে, সে-কথাটা বলতে লজ্জা পাচ্ছে।' সামঘিন কক্ষের নিস্তব্ধতাকে যেন কথা শোনায়। এই প্রথমবার ভাইয়ের ওপর ও টান অনুভব করে। 'কিন্তু—রুশ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা কি ভীষণ জড়ানো!' মনের মধ্যে চাপাহাসি হাসে ও। দাদার সম্বন্ধে আর কিছু ভাববার নেই। সবই পরিষ্কার! কাগজে যুদ্ধ সম্পর্কে নানা ক্রুদ্ধ প্রবন্ধ, পোর্ট আর্থার, পরিবহণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতা। ছয়-কলম ফয়ত'-তে কে একজন অধীর-উচ্ছাসে বাম'তের কবিতার প্রশস্তি লিখেছে, তার "খুদে মানুষ" থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে:

> "সামান্য-মালিক, কানুনবাজ আর ভণ্ড-সংসারী,
> ও-হো, যদি তুমিই শুধু,
> তোমার লক্ষ-মস্তক নিয়ে অকস্মাৎ হ'তে অদৃশ্য!"

সামঘিন কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চোখ দু'টো টাটাচ্ছে, পড়া মুস্কিল। কাশিটা বড় জ্বালাচ্ছে। দিমিত্রি সন্ধ্যে ঘোর হ'লে এল। বলল ক্লিমের হোটেলেই উঠে এসেছে। জ্বরের তাপ কত জিজ্ঞেস করল, সান্ত্বনার আশ্বাসও বোধহয় দিল। আর তারপর দ্রুতস্বরে ব'লে চলে গেল:

'ঘরোয়া বৈঠক বসছে ফাদার গ্যাপনকে নিয়ে,... হারামী ব্যাটা নিপাত যাক!'



পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সামঘিন আগের চেয়ে অনেক ভাল। চা খেয়ে বিছানায় বসতেই দিমিত্রি এল।

'পোর্ট আর্থার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে,' দাঁতে দাঁত চেপে দিমিত্রি বলে : 'খবরটা কালকে ঘোষণা করা হবে।'

জানালার কাছে এগিযে গিয়ে শার্সির ওপর আঙুল দিয়ে-দিয়ে কি যেন লেখে। হাত দিয়ে ঘষে লেখাটা মুছে গজর-গজর ক'রে ওঠে :

'তুরবোয়েভ বলল জার নাকি খবরটায় সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।'

'ও কি ক'রে জানল?' ক্লিম চটে-মটে প্রশ্ন করে : 'নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছে...'

দিমিত্রি পায়ে-পায়ে টেবিলের দিকে যায়। পাঁউরুটীর ওপরের ছালটা ছিঁড়ে নিয়ে মুখে ফেলে বিড়বিড় ক'রে বলে :

'নাঃ, ও জানে। আমাকে ও অ্যাডমিরাল চুখোনিনের গোপন রিপোর্ট দেখিয়েছে। তা'তে অ্যাডমিরাল জানাচ্ছে যে সেবাস্তোপল রাজনৈতিক প্রচারের ঘাঁটি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, রিজার্ভিস্টদের বেসরকারী বাসায় থাকতে দেওয়াটাই বড় দুর্ভাগ্যের হয়েছে, আর বোধহয় কুচক্রীদের মতলবেই এইরকমটা হ'তে পেরেছে। রিপোর্টটা যখন জারকে দেখান হয়েছিল, তিনি নাকি ব'লে উঠলেন : "বিশ্বাস করা শক্ত।"'

ক্লিম নীরবে দাদাব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, মুখটা ঠাণ্ডায় লাল হয়ে উঠেছে আজ যেন দাদাকে আরো পেশীবহুল দেখাচ্ছে, আরো সাধারণ। তার কথায় কোনো উত্তেজনা নেই চিন্তাকে বোধহয় বাক্যে প্রকাশ করছে না। চোখের দৃষ্টি অনুচ্চার। হাতদুটো নিয়ে কি কববে ঠাহর করতে পারছে না, কখনো মাথার পেছনে রাখছে, কখনো ঠোঁটে বুলোচ্ছে। শেষে তাদের টানটান ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে হতচকিত-ভংগীতে বললে : 'অদ্ভুত চরিত্র এই জার, না? দেশের ভাগ্যের প্রতি তাঁর উদাসীন্য অসীম, ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু নেই লোকে তো যা তা বলে..'

'অত্যন্ত ভুল বলছে, ক্লিম বলে : 'বুঝলে লোকে না-বুঝেই বলছে,' বেশ জোর দিয়ে পুনরাবৃত্তি করে : 'মনে আছে তোমার, এই তো সেদিন জেম্স্ত্ভো-প্রতিনিধিদের তিনি যেমন দু'চার কথাতেই বিদায় দিয়ে দিলেন?'

'সে-তো বলতে গেলে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।' দিমিত্রি মন্তব্য ক'রে ওঠে।

'কিন্তু, যদি জানতে চাও, আমি বলতে পারি—কেন তিনি উদাসীন,' সামঘিন হঠাৎ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে : 'এমন এক ব্যক্তির মতো তাঁর উদাসীনতা যার মনের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই এ-কথাটা বার বার গেঁথে দেওয়া হ'য়েছে যে তিনি অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন,' বল্তে-বল্তে ওর মনে হয় যে নিজের পক্ষে অতি-মূল্যবান কোনো চিন্তা প্রায় হাতের মুঠোয় এসে গেছে। 'বুঝলে তো? অনন্যসাধারণ একজন। নিশ্চয়ই এ-কথা মানবে যে, আমার যা অভিলাষ তা' কখনো বাধা পেতে পারে না, এমন বিশ্বাস নিয়ে যে লোক বেড়ে ওঠে সে কোনোদিনই কোনো বাধা মানতে চাইবে না। তবু এ'র সামনে সিংহাসনে বসবার পরই তো এমন এক দাবী উঠেছিল।'

দিমিত্রি ভুরু-জোড়া উঁচিয়ে সামান্য হাসে। হাসিটা তার দাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে, সেটায় হাত বুলোতে-বুলোতে ছাদের দিকে তাকায়। বিড়বিড় ক'রে বলে :

'কথাটা ঠিক, কিন্তু তোর যুক্তিতেও গলদ আছে।'

দাদার কথায় কর্ণপাত না ক'রে সামঘিন নিজের চিন্তার পেছনে-পেছনে ছোটে :

'দেখতে পান যে তাঁর চারপাশে যারা রয়েছে তারা অতি-সাধারণ, কাপুরুষ, সুযোগসন্ধানী, বা উইট্টের মতো মাথা মোটা...'

'কিন্তু উইট্টে...'

'বা পবেদনোস্তজেভ, অথবা মোট কথায় দানবীয় সব ভূতুড়ে-মুখ। দেখেন যে লোকে আজ তাঁর দিকে হুর্‌রে ব'লে চেঁচাচ্ছে আর কালকেই দেশের ধন-সংস্থান ধ্বংস করছে, কাজেই গভর্নররাও বাধ্য হ'য়ে সেই লোকগুলোকেই ধ'রে চাবকাচ্ছে। দেখেন যে প্রাসাদের সামনে যে-ছাত্ররা জানুপেতে ব'সে আছে তাদেরকেই কিছুক্ষণ আগে শাস্তি হিসাবে ফৌজে ভর্তি করতে হয়েছিল, আর তাদেরি মধ্যে থেকে তো বেশীর ভাগ বিপ্লবীর হয় উদয়। এ-কথাও জানেন যে হাজার-হাজার শ্রমিক যখন ওরই পিতামহের মনুমেণ্টে হুর্‌রা ব'লে গলা-ফাটিয়ে চিৎকার করতে যায়, তখন তাদেরি মাতৃভূমি এই রাশিয়াতেই এমন এক সমাজবাদী শ্রমিক পার্টির অভ্যুদয় হয়েছে যার লক্ষ্য শুধু স্বৈরতন্ত্রেরই উচ্ছেদ নয়, সে তো সবাই চায়. বরং শ্রেণী-সমাজের বিনাশ। এ-সবের বিশদ-অর্থ-বোধ যদিও তাঁর হয় না, তবুও—কেমন ক'রে জানি.—তাঁর মনে এগুলো সমতা বজায় রেখেই থাকে...'

সামঘিন অভিযোগ করবার কথা ভাবছিল না, সমর্থনেরও না। কিন্তু মনে হলো বক্তৃতাটায় সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয়। দাদা যেন বড্ড বেশী একদৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্তান্বিত সুরে ব'লে উঠল :

'পরস্পরবিরোধী জিনিসের এই যে সমতা, এ-র থেকেই তো সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য আসতে পারে জীবনেব ওপর। মানুষের প্রতি ঘৃণা হওয়াও বিচিত্র নয়।'

এতক্ষণে মনে হয় জারের কথা তো বলছে না, বলছে নিজের কথাই। নিশ্চয়ই দাদা তা' বুঝতে পারেনি। তবুও চিন্তাটায় অশান্তি জাগে। চুপচাপ ভাবে : 'সুস্থ থাকলে ওর সঙ্গে এমন-ভাবে কথা বলতাম না।'

হ'-হ্যাঁ, তুই হয়তো তা'ই ভাবিস,' দিমিত্রি অনিশ্চিত ভাবে বলে। জ্যাকেটের একটা বোতাম টানতে-টানতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে। 'সময়টা বড্ড খারাপ রে! সবকিছুই আরো তীক্ষ্ন হ'য়ে পড়েছে, মানুষকে চরম উপায়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবাব অন্যদিকে দেখ, দেশের শিল্পোন্নতিও হচ্ছে, বেশ লক্ষ্যণীয়ভাবে বলবৃদ্ধিও ঘটছে, আব দেশটা আরো ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে।'

অস্ফুটস্বরে কথা কয়টা বলে দিমিত্র যেন দাঁতের ব্যথায ভুগছে। তারপরই প্রশ্ন করে :

'চা খাবি না ?'

'বলো আনতে।'

ভারী বিশ্রী এই যুদ্ধ,' ঘণ্টা বাজানোর বোতামে টিপি দিয়ে দিমিত্রি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে : 'যত যুদ্ধ আমরা ক'রেছি তার মধ্যে সবচেযে দুর্ভাগ্যের...'

সামঘিন শুনছিল না। নিজের চিন্তাতেই মশগুল। হ্যাঁ, যা বলেছে তা' সবই ওর নিজেবি কথা, বলবার পর এখন বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। দাদার উপস্থিতিটাই যে বাধা হ'য়ে ছিল। দিমিত্রি ঘরের মধ্যে পায়চারি করে, নিজের জন্যে যেন জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। বিভ্রান্তিকর অনুভূতিগুলো বিড়বিড় ক'রে ব'লে যায় : 'সবকিছুই অদ্ভুত। লোকে যেন নতুন-ধরনের বুদ্ধিবৃত্তির সাজ পড়েছে। কিছুদিন আগে আমাকে একজন কবি দেখান হয়েছিল—বিশাল ষণ্ডাগুণ্ডা লোক। এমনভাবে খাচ্ছে যেন সব সময়েই ক্ষুধার্ত যেন কখনো তৃপ্তি পায় নি। একটা কবিতা পড়ল—জুডাসের ওপর, বিশ্বাসঘাতককে বীরের মতো মহান ক'রে তোলা। তবুও লোকটার প্রতিভা আছে মনে হলো। তার আরেকটা কবিতা খুব

ইণ্টারেস্টিং।' কদমছাঁট মাথা পেছনে হেলিয়ে, ছাদের দিকে চোখ তুলে, দিমিত্রি আবৃত্তি করে :

"শয়তান বসে তাসে জগদীশ্বরের সাথে:
সাহের আর বিবি—যা' আমরা হই;
ঈশ্বরের হাতে কিন্তু শুধু নীচু তাস-ই;
সব তুরুপই গেছে শয়তানের হাতে।"

'বেশ ইণ্টারেস্টিং, না?' দিমিত্রি খুক্-খুক্ ক'রে হেসে ওঠে।

পরের সপ্তাহে রোজ দিমিত্রি ঠিক সময় মতন এল, যেন অফিসে আসছে। দু'বার ক'রে—সকালে আর সন্ধ্যায়। এক-একটা ক'রে দিন যায় আর সামঘিনের চোখে ও যেন আরো গেঁয়ো হ'য়ে ওঠে। তার অসীম উদ্‌ভ্রান্তি সামঘিনকে বিরক্ত ক'রে তোলে; তার লোমশ, শক্তসমর্থ, ঈষৎ-তরল মুখ, আর তার ভীরু জিজ্ঞাসু ধূসর চোখ ওকে ক্লান্ত ক'রে ফেলে। তাই দিমিত্রি যেদিন জানায় যে তাঁকে তক্ষুণি মিন্‌স্কে যেতে হবে তখন ক্লিম প্রায় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।

'সামান্য একটা কাজ আছে। দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরব,' দিমিত্রি দাঁত বার ক'রে হাসে। মনে-মনে খুব গর্ব। কাজে যাচ্ছে ব'লেই হয়তো। 'যদ্দিন এখানে আছিস তুরবোয়েভকে বলে দিয়েছি দেখাশোনা করবে।'

'কোন প্রয়োজন ছিল না,' সামঘিন বলে।

বাড়ি যাবার বিশেষ ইচ্ছে নেই ওর। একা-একা জীবন বেশ লাগছে, বিদেশী-উপন্যাস প'ড়ে সময় বেশ কেটে যায়। পড়ার মনোরম অবসাদে মনে যে-সব অনুভূতি এসে জুটেছিল তাদের ক্ষুরধার সুন্দর ক'রে ভোঁতা ক'রে দিয়েছে, কাঠিন্যকে মোলায়েম করেছে। কিছু না-ভাবার চেষ্টায় সফল হ'য়ে ওঠে। অন্তরে নতুন একটু-কিছুর ধ্বনি শুনে শুনে মনকে ব্যাপৃত রাখে। নিকনোভার কথা কদাচিৎ মনে পড়ে, অনুশোচনার সঙ্গেই, অপমানের জ্বালার মত। মনে পড়লেই সে-মূর্তি তক্ষুণি দাবিয়ে দেয়। ভারভারাকে লিখল কাজে আটকে পড়েছে অনিশ্চিত-কালের জন্যে, ক'দিন আগের অসুখের কোন উল্লেখই করল না। দিন পরিষ্কার থাকলে নেভ্‌স্কিপ্রস্পেক্টে বেড়াতে যায়।

এপিফ্যানির উৎসবের দিন তুরবোয়েভ এল দেখা করতে। তার প্রবেশের ঢং দেখে সামঘিন বোঝে অঘটন কিছু ঘটেছে। যে-ভাবে কোট না খুলে, উঁচু কলার সোজা না ক'রে, সুন্দর উন্নীত-ভ্রূযুগলে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে সে এসে ঢুকল, তা'তে মনে হয় অপ্রীতিকর কিছু বলবে। ঠিকই তাই। তুরবোয়েভ পরম বিনয়ে ওর কুশল-বার্তা শুধায়, আগে না আসতে পারবার জন্যে মাপ চায়। সুঁচালো ছোট দাড়িতে রুমাল ঘষে। বলে :

'আজ সকালে পিটার-পল দুর্গ থেকে দ্বিতীয় নিকোলাসের ওপর গোলা ছোঁড়া হ'য়েছিল।'

সামঘিন ভাবে এ-টা ওর ইচ্ছাকৃত মূর্খ-ভাষণ।

'তামাশা করছ।'

'সত্যিই,' মাথা-নাড়িয়ে তুরবোয়েভ জানায় : 'খাঁটি সত্য,' অপ্রয়োজনেই পুনরাবৃত্তি করে। কোটের বোতাম খুলতে-খুলতে চাপাহাসির গলায় বলে : 'কি ধরনের আদেশ দেওয়া হ'য়েছিল জানতে পারলে বেশ হ'তো।—"ব্যাটারি! সমগ্র রাশিয়ার সম্রাটের দিকে—ফায়ার।"'

'কে গুলী করেছে?'

'একটা বন্দুক। মনে আছে?'

ক্লিম বেল্ বাজানোর জন্যে উঠে দাঁড়ায়। মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছে না, তবুও চোখের সামনে ভেসে ওঠে রেলগাড়ির কাঁচের জানালা আর তার মধ্যে অপুষ্ট-দেহের একজন অফিসার সোনার সিগারেট-কেস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

'সবচেয়ে আকর্ষণীয় শর্ট,' তুরবোয়েভ বলছিল : 'জান, শ্রমিকরা ঠিক করেছে রবিবারে জারের সামনে মিছিল ক'রে যাবে।'

'কি বলতে চাইছ? গুলীর সঙ্গে এই মিছিলের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছ।'

বুঝতে পারে কণ্ঠস্বর কঠোর হ'য়ে পড়ছে, বন্ধু-র মতো না, তবুও অন্য-সুর ফোটাতে পারে না।

'তেমন সম্পর্ক গড়ছি নাকি—? হুঁ...'

হোটেলের চাকর এসে পড়ে। সামঘিন মদের অর্ডার দেয়। অতিথির কাছ থেকে খানিক এগিয়ে গিয়ে বসে। তুরবোয়েভ ওর দিকে চেয়ে-চেয়ে কানের লতিতে হাত বুলোয়।

'স্কাউন্ড্রেলরা বেশ উদ্যমী হয়,' তুরবোয়েভ বলে : 'বেশ প্রতিভাধরও তারা।'

সামঘিন চুপ করেই থাকে। বুঝতে চেষ্টা করে যে এই ভূতপূর্ব অভিজাত ভদ্রলোকের কথার শ্লেষ এবং তিক্ততা কি মিথ্যা? তুরবোয়েভ উঠে দাঁড়ায়, কোটটাকে আলনার দিকে নিয়ে যায়। তার ভঙ্গী এখন তীক্ষ্ণতর। একটু আগেকার গাম্ভীর্যের কোন চিহ্নই প্রায় নেই। হুস্হুস্ ক'রে সিগারেট খায়, ধোঁয়া খুব জোরে টেনে নিয়ে নাকের ভেতর দিয়ে ছাড়ে।

'একেবারেই বোহেমিনিয়ান,' সামঘিন ভাবে। চাকরটা মদ রেখে ঘর থেকে চলে গেলে সামঘিন জিজ্ঞেস করে :

'বিপ্লবীরা গুলী ছুঁড়েছিল, তা' কি সম্ভব ব'লে মনে করো?'

গেলাসগুলো ভরতে ভরতে তুরবোয়েভ নিস্পৃহ গলায় জবাব দেয়, যেন মনে ক'রে ক'রে বলছে : 'বন্দুকের কাছে তো বিপ্লবীদের আসতে দেয় না, এমন কি পিটার-পল দুর্গে যারা সময় কাটায় তাদেরও নয়। কাজেই ব্যাপারটা হয় কোন অসম্ভব দুর্ঘটনা, নয় তো কোন নোংরা কাজ—হ্যাঁ, তাই! তুমি বলছিলে একটা ডেপুটেশন,' আধ গেলাস মদ খেয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে : 'পঞ্চাশ জন হবে বলে মনে কর? হিসাব একদম ভুল। পঞ্চাশ হাজার হবে—আরো বেশী হতে পারে। কি হবে জান বন্ধু, বালখিল্য ক্রুশেড।'

তুরবোয়েভকে মনে হলো না খুব বেশী উত্তেজিত হয়েছে। তবু এমন ক'রে মদ গেলে যেন ওটা নেহাৎই জল। একটা গেলাস শেষ ক'রে সঙ্গে সঙ্গে সেটা আবার ভরে নিয়ে অর্ধেকটা গিলে ফেলে। তারপর হাতদুটো আড়াআড়ি ক'রে রেখে বলতে শুরু করে :

'গতকাল একজন লেখকের বাসায় সাভা মরোজভ্ বর্ণনা করছিল উইট্টের সঙ্গে শিল্পপতিদের সাক্ষাৎকারের কথা। বলল যে, ধুরন্ধর লোকটা মস্ত বড় স্কেলে নোংরা কিছু একটা করবার মতলব নিশ্চয়ই ভাঁজছে। আরও বলল যে গ্রাণ্ডডিউক ভ্লাদিমির দু-একদিনের মধ্যেই রাজধানীর তখ্তে বসবে, আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ধরপাকড় শুরু হ'য়ে যাবে। খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনের অফিস পাইকারী হারে তছনচ্ করবার সম্ভাবনাও যে নেই তা' বলা যায় না।'

'আশ্চর্য তো,' সামঘিন বলে : 'বিপ্লবের সঙ্গে সাভা মরোজভের কি সম্বন্ধ?'

'জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু বিপ্লব বলছ কেন? নাঃ, এখনো তো এ'টা বিপ্লব নয়। ভাবতেও পারা যায় না সামনের রবিবার কেউ বিপ্লবের চেষ্টা করবে।'

'শ্রমিকেরা।' ক্লিম ওকে মনে করিয়ে দেয়।

'সামনে পাদরী রেখে? আর হাতে জারের ছবি আর আইকন?'

'কেন, তা-ই হচ্ছে নাকি?'

'হুঁ। ঠিক তাই-ই ঘটতে যাচ্ছে। আর তা-তেই তো সাধারণ জ্ঞানগম্যি চিত্তের উঠবে। হবেও তা-ই। খারাপও হ'তে পারে...'

সামঘিন খাড়া হ'য়ে পড়ে। ঘরে পায়চারি শুরু করে। পেছনে গেলাশে মদ ঢালবার ঢক্-ঢক্ শব্দ।

'আচ্ছা, চলি তাহলে। ভাল আছ দেখে খুশী হ'লাম,' এমন নিস্পৃহগলায় তুরবোয়েভ কথা ক'টা বলে যে মনে বেশ দাগা দেয়। নরম ঠাণ্ডা হাতে সামঘিনের হাত ধ'রে কাজের কথা শোনায় :

'শোন, কথা হয়েছে যে রবিবার সমস্ত ভদ্র-ব্যক্তির পক্ষে রাস্তায় বেরিয়ে পড়াটাই সমীচীন। ভগবান জানেন কি ঘটবে, সাক্ষী থাকা দরকার। কাজেই তখনো যদি চ'লে না যাও, আর কিছু মনে না করো তো—'

'নিশ্চয়ই,' ক্লিম ব্যগ্রকণ্ঠে সায় দেয়।

তুরবোয়েভ একটা ঠিকানা দিল। রবিবার সকালবেলা গোটা আটেকের সময় সেখানে যেন যায়। দরজাটা অপ্রয়োজনীয় জোরে বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল।

'উত্তেজিত হ'য়েছে। গুলী ছোঁড়ার ব্যাপারটায় ও রেগে গেছে।' সামঘিন মনে-মনে ভবে। ঘরের এদিক-ওদিক আস্তে-আস্তে পায়চারি করে। কিন্তু মন তখন গুলী ছোঁড়াটায় ছিল না। বিশ্বাস করতেই কেন যেন প্রবৃত্তি হয় না। থমকে কোণের দিকে তাকায়। গম্ভীর দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে : রোদ ঝল্‌মলে দিন, নীল আকাশ; উইণ্টার প্যালেসের সামনের স্কোয়্যারে হাঁটু-গেড়ে বসা শ্রমিকের ভীড়, প্রাসাদে-অলিন্দে নীলাভ জার দাঁড়িয়ে, পেছনে সোনালী ক্যাশক পরিহিত যাজক; জানু-পেতে বসা নির্বাক নিস্তব্ধ মানুষের মাথার ওপর দিয়ে পুনর্মিলনের জ্ঞানগর্ভ বাণী ভেসে-ভেসে বেড়ায়।

'ক'দিন আগেই না ওঁর সামনে এরা হাঁটুগেড়ে বসেছিল. তবে?' সামঘিন ভাবে : 'বিপ্লবী-আন্দোলনের মাথাতেই তো তা'হলে আঘাত পড়বে, জার আর লোকদের মধ্যে নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত হবে। বোধহয় ঠিক এমনি কোন সম্পর্কের-ই স্লাভোফিলরা স্বপ্ন দেখত. .'



সামঘিনের মনে ক্রমে-ক্রমে এমন একটি বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে যে সে এক ঐতিহাসিক ঘটনার সম্মুখীন হ'তে চলেছে। এর পরেই বোধহয় শৃঙ্খলার স্থাপনা হবে, সব প্রলাপ-মুখর লোক হয় সেরে উঠবে নয়তো ধ্বংস হ'য়ে যাবে। মনে এমন বিশ্বাস নিয়েই রবিবার ভোরবেলা নেভস্কি প্রস্পেক্ট ধরে হাঁটতে আরম্ভ করে। ধূসর দিনটা আশা জাগানোর মতোই সাধারণ, বিশেষ ঠাণ্ডা নেই, যদিও শুকনো বাতাস সোঁ-সোঁ শব্দতুলে বইছে আর হালকা তুষার বিষণ্ণ ভাবে ঝরছে। সেই ভোরেও রাস্তায় বহুলোক, মনে হয়, লক্ষ্যহীন ভাবে পথ হাঁটছে। অন্যদিনের চেয়েও ছাড়া-ছাড়া। সুসজ্জিত লোকেরা বেশী ক'রে চোখে পড়ে। এ্যাড্‌মিরালটির দিকেই বেশী লোকের লক্ষ্য। পাশের রাস্তাগুলো দিয়ে কমবয়সী লোকেরা ছোট-ছোট দল বেঁধে ছুটাছুটি করছে, স্পষ্টই বোঝা যায় তারা শ্রমিক। তাড়াতাড়ি পা ফেলে জ্নামেন্‌স্কি স্কোয়্যারের দিকে চলেছে। গাড়ীঘোড়া খুব কম। স্তম্ভের

মতো ডিউটিরত পুলিস নেই দেখে সামঘিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নেভ্স্কি প্রস্পেক্টের চেহারাটাও বেশ স্বস্তিকর, অস্বাভাবিক শান্ত আর বিনয়ী, গোমড়া মতন এক পাথুরে বাড়ির উঠোনে এসে ঢুকতেই সামঘিন একদল মানুষের মুখোমুখি হ'য়ে পড়ে, তাদের মাঝখানে একটা লম্বা লোক, পাঁশনে আর ফরাসী দাড়িতে সজ্জিত। ডীকনি ঢঙে তাড়াতাড়ি ঘোষণা করছে, খুবই ভয়বিহ্বল সুরে :

'অত্যন্ত নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে। আর্মি-কম্যাণ্ড শহরে এনে জমা করেছে প্রায় চল্লিশ ব্যাটালিয়ন ইনফ্যাণ্ট্রি, বারটা কশাকের শ,' আর দশ ক্যাভালরি-স্কোয়াড্রন...'

'দু'শ হাজারের বিরুদ্ধে এ আর এমন কি?' ঘাড়ে সাদা-স্কার্ফ জড়ানো একজন ছোটোখাটো লোক ব'লে ওঠে, তার টুপীটা মঙ্কের মতো।

'তোমার হাজারেরা যে নিরস্ত্র।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো আর যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না—'

লোক দু'টি তর্কই করতে থাকে। বাদবাকী সবাই পাঁশনে-পরা লোকটাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করে : 'আপনার খবর কি খাঁটি, নিকোলাই পেত্রোভিচ...'

'অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। শুল্ক-দরওয়াজাগুলোতে ফৌজ মোতায়েন করা হ'য়েছে, পুলগুলোয় পাহারা রাখা হ'য়েছে। শহরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমার একটু তাড়া আছে, চলি, অ্যাঁ—, একটা রিপোর্টে দিতে হবে...'

তাকে কিন্তু যেতে দিতে কেউ রাজী নয়, জিজ্ঞেস করে :

'পুলিশ নেই কেন? সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের মন্ত্রীরা কি ব'লে দিলে?

পাঁশনে-পরা লোকটা ভীড় ঠেলে উঠোনের এককোণায় ছুটে চলে যায়। পেছনে ভারী ওভারকোট পরা কালো দাড়িওয়ালা একজন লোক চেঁচিয়ে ওঠে : 'কিন্তু এতো জবরদস্তি প্ররোচনা!'

'যাদের কাজকর্ম নেই তাদের মনে আতঙ্ক ঢুকেছে।' সামঘিন ভাবে।

একমিনিট পরে বিশাল ক্লাশরুমের দরজায় এসে দাঁড়ায়, চিৎকার-চেঁচামেচির গুঞ্জনে কান পাতা দায়।

'কি, বলেছিলাম না?'

'আঃ, মশায়রা, চুপ করুন না!'

'কেমন পার্টি হে তোমাদের? এর নাম আবার পার্টি?'

'শুনুন!'

'চুপ!'

চশমার ঝাপ্সা কাঁচ মুছতেই সামঘিনের চোখে পড়ে ক্লাশরুম লোকে ঠাসা। অগোছাল ডেস্ক আর অগুন্তি মানুষ। যে যেখানে পেরেছে বসেছে বা দাঁড়িয়েছে,—ডেস্কে, মেঝের ওপর, উইণ্ডো সীলে। দশ-বারোটা গলা একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। সব ছাপিয়ে টাকমাথা একটা লোকের উচ্ছ্বসিত কথার টুকরো কানে আসে,—লোকটার মুখ বাঁদরের মতো :

'আমাদের সামনে এগিয়ে যেতেই হবে!' লোকটা চেঁচায়। কথাগুলো অদ্ভুত জোর দিয়ে বলে : 'আমাদের যেতেই হবে। সাক্ষী হবার জন্য নয়, বলি হবার জন্য, বুলেট্ আর বেওনেটের সামনে মুখোমুখি হবার জন্যে—'

'কিন্তু এ-সব পেলেন কোথায়? বুলেটের কথা কে বলেছে?'

'আমাদের অতীত, আমাদের আত্মসম্মান এই দাবী করে—' ডেস্কের ওপরে দাঁড়িয়ে লোকটা চিৎকার করছিল। দেহটাকে এদিক-ওদিক বেঁকায় যাতে দেহের ভারসাম্য বজায় থাকে। পায়ে বিরাট স্নো-সু, তাদের নিজেদেরই এক বিশেষ চলন ভঙ্গী আছে যেন—পিছলে পিছলে যেতে চাইছে ডেস্ক থেকে। 'র'-য়ের উচ্চারণে

ঘর্ঘর-আওয়াজ, গলা খুব তীক্ষ্ম। তার ঠিক নীচে ডেস্কে পেট চেপে মোটা-মতন একজন লোক,—মাঝে-মাঝেই ঘুসি মেরে-মেরে ডেস্ক পিটোচ্ছে,—মাথাটা এত পেছনে হেলান যে ঘাড়ে ভাঁজের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। গম গমে আওয়াজে ব'লে ওঠে :

'মড়ার গুনতি বাড়াতে...'

'আমাদের পথ জনসাধারণের সঙ্গে...'

'জ্-জারের ক্-কাছে যাবার জন্যেও? ত্-তার কাছেও?'

'আমি বলছিলাম, পাদ্রীকে বিশ্বাস করা যায় না!'

'এ-ও জানা গেছে...'

ছুঁচলো দাড়িওয়ালা লোকটার কথায় কেউ কান দিল না। সে একহাতে চশমা ঠিক করতে করতে আরেকহাতে চোখের সামনে নোটবই নিয়ে পড়ছিল :

'প্সকভ থেকে—দুই ব্যাটালিয়ান...'

ডেস্কগুলো এদিক-ওদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ শব্দ করে। মানুষের পায়ের আওয়াজ। স্নো-সু্য পরা লোকটা উন্মাদের মতো চেঁচায় :

'যদি আমরা বাঁচতে না পারি তো কেমন ক'রে মরতে হয় সে-কথা জানতেই হবে...'

'ওঃ, ছাড়...'

'একমিনিট, শুনুন আপনারা,' লম্বা-চুল, পাকাদাড়ি, মস্ত নাকওয়ালা এক সৌম্য বৃদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠে। ঘরটা শান্ত হয়ে পড়ে, সামঘিন পরিষ্কার শুনতে পায় :

'শোকের পূর্বকল্প-ধারণায় শোকেই জন্মায়।'

'পারীতে, ১৮৩০ সালে...'

সামঘিন দেখল বেশীর ভাল লোকই চুপচাপ ব'সে বা দাঁড়িয়ে আছে। যারা চিৎকার করছে তা'দের দিকে হয় গম্ভীরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নয়তো হতাশার ভঙ্গীতে। তাদের সকলের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন, যেন বহুদিনের অনিদ্রা রোগে ভুগছে। যা-যা শুনল তা'তে সামঘিনের মনে বেশ ধাক্কা লাগে। তুররোয়েভের ওপর রাগ হয়, কেন এখানে পাঠিয়েছে। বৃদ্ধ আবার বলল :

'আমাদের কর্তব্য যতটা সম্ভব দেখব আর সত্যখবর সরবরাহ করব। খবর গুলো—কি? খবরগুলো সাধারণ পাঠাগার বা অর্থনীতি আলোচনা সভায় নিয়ে যেতে হবে—'

ভীষণ গন্ডগোল বেধে ওঠে।

'বাজারের জিপ্‌সীদের মতো ক্যাঁচ ক্যাঁচ, সামঘিনের পেছনে তুরবোয়েভ বেশ জোরে ব'লে ওঠে।

'আচ্ছা, সত্যিই কি রাজপ্রাসাদের কাছে যেতে দেবে না?' তার পাশে দাঁড়িয়ে পিছু হট্‌তে হট্‌তে সামঘিন জানতে চায়।

'বোধহয়।'

'এরপর কি হবে?'

'দেখা যাবে,' তুরবোয়েভ্ জবাব দেয়। লোকজনকে একটু অভদ্রভাবেই কনুয়ের গুঁতো মেরে-মেবে পথ ক'রে ও চলে, ক্ষমা-টমাও চায় না। সামঘিন চলে ওকে অনুসরণ ক'রে।

*

উঠোনে বেরিয়ে প'ড়ে তুরবোয়েভ বলল: 'আমি যাচ্ছি ভাইবর্গস্কী সাইডে। আসবে নাকি?'

'চল।' কয়েক পা গিয়ে জিজ্ঞেস করে: 'নেভস্কি প্রস্পেক্টে যাওয়াটা কি ভাল না? রাজপ্রাসাদের দিকে?'

তুরবোয়েভ কিছু বলে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনে একটু ঝুঁকে জোরে-জোরে পা চালিয়ে হাঁটে। পেছনে বাতাসে ভাসে সিগারেটের সূক্ষ্ম ধূমজালে। কলার-উঁচু পাত্‌লা কোট, চেক-চেক স্কার্ফ, চেহারাটায় ক্যাবারে নাচিয়ে পারীসিয়ান্ আপাশদের ইঙ্গিতই যেন বহন করে।

'সাক্ষী একজন', সামঘিন ভাবে। তুরবোয়েভের সঙ্গ ছাড়বার কোন অছিলা খোঁজে।

সার্ঘিয়েভস্কি স্ট্রীটে একটা স্লেজের দেখা পেল। কোচোয়ানটি বুড়ো বেঁটে মানুষ, বাক্সের ওপর গুটি মেরে ব'সে আছে। হাতের লাগাম ঝুলছে, বোধহয় ঢুলছে লোকটা। লোমশ গেঁয়ো ঘোড়াটা তুষারে ধূসর, আস্তে-আস্তে মাথা নীচু ক'রে ঠুকঠুক ক'রে চলছে।

'হেই! ভাইবর্গস্কী—,' তুরবোয়েভ হাঁকে।

সোজা না হয়ে ট্যারচা-চোখে ঠাহর ক'রে নিয়ে কোচোয়ান বলে:

'যাব না।'

'কেন হে?'

'ওখান থেকেই আসছি।'

'তা'তে কি?'

'ওখানেই থাকি যে।'

'বেশ তো?'

'যাব না আমি।'

কাঁধ নাচিয়ে তুরবোয়েভ আরো জোর-কদমে হাঁটতে আরম্ভ করে। সামঘিন ভাবছিল ও একাই স্লেজটা নেবে নাকি, কিন্তু মনস্থির ক'রে ওঠবার আগেই কোচোয়ান ঘোড়া ঘুরিয়ে ডাক দেয়:

'পুলের ওপর দিয়ে যাব, যদি রাজী থাকেন—'

ওরা স্লেজে উঠে বসল। ঠাণ্ডাটা আরো জমেছে। নেভা থেকে কনকনে হাওয়া আসছে। পাঁশুটে বাতাসে তুষারের কণা। শহরের দিকে লোকের যাতায়াত অনেক কম। যারাও যাচ্ছে তাদের চলন যেন স্খলিত, নিঃসাড়।

'মেয়েছেলেরাও মার্চ করবে নাকি?' সামঘিন তুরবোয়েভকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু জবাব এল কোচোয়ানের বিশ্রীভাবে উঁচু কাঁপা-কাঁপা গলায়:

'তেনারাও মার্চ করবেন। সব্বাই করবে। কিন্তু বলেন দিকি বাবু, এ-সব ক'রে ভাল কিছু হবে কিছু?' মৃদু ফোঁপানির আওয়াজ তুলে আবার নিজেই বলে: 'ভালই হবে, যখন মজুররা সব্বাই বল্‌তেছে: এমনভাবে চলতে আমরা প্যারি না!'

কাঁধের ওপর দিয়ে কথাগুলো বলে। ওর মুখের অর্ধেকটা সামঘিনের চোখে

পড়ে। সেখানে পাকাদাড়ির ওপর আর পাকাভুরুর নীচে ছলছলে চোখ।

'এমনভাবে আমরা চলতে পারি না বাবু, তা' আপনারা যা-ই কন্ না কেনে। আমরা একদম শেষ হ'য়ে গেছি, নিকেশের পথে। আমার নাতি আছে, চার-চারটে, আর আছে এক রুগী ছেলে। কারখানাই তো তাকে বুকের রোগ দিয়েছে। ফাদার আগাফন বুঝেছিলেন। ভগবান তাঁর ভালো করেন যেন...'

হঠাৎ থেমে যায়, যেমন হঠাৎ কথা বলা আরম্ভ করেছিল তেমনিই। আবার বাক্সের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে পড়ে। পুল পেরোতেই ঘোড়া থামিয়ে দেয়।

'নেমে পড়েন এখানে, আর যাব না। নাঃ, পয়সা চাই না,' প্রবলভাবে জীর্ণ-দস্তানায় মোড়া হাতটা নাড়ায়। পয়সা নেবে না। 'আজ টাকা নেওয়ার দিন না। দোষ নেবেন না বাবু। আমারও এক ছেলে মার্চ ক'রে যাচ্ছে প্রাসাদের দিকে! আমার কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে, যদি কিছু—'

তুরবোয়েভ বিড়বিড় ক'রে ওঠে: 'হতচ্ছাড়া।' টুপীটা নীচে নামিয়ে দিয়েছে, ওই দূরে যেখানটায় বহুলোকের জমাট ভীড় দেখা যাচ্ছে সেদিকটায় তাকিয়ে থাকে। মার্চ ক'রে তারা রাস্তা পার হচ্ছে। নেভার তীর দিয়ে যেতে-যেতে তুরবোয়েভ বলে: 'এইদিকে।'

নেভ্কাতে যখন পৌঁছুল, তখন সামঘিন দেখে স্যাম্পসনিয়েভ্স্কি পুলের দিকে নদীর দু'ধার দিয়ে অগণিত শ্রমিকের কালো ক'লো রেখা মার্চ ক'রে চলেছে, ঘন হ'য়ে প্যারেড্ করছে, ধীরে সুস্থে, কোন রকম গন্ডগোল না ক'রে। বাতাসে হাজার কণ্ঠের পরিচিত গুঞ্জন। মুহূর্তের মধ্যে সামঘিন বুঝতে পারে যে এই গুঞ্জনে ঐক্য অনেক বেশী। এ-যেন মহান হৃদয়বান, মখমলের মতোই মসৃণ। জারের পিতামহের মনুমেন্টের দিকে যে ভীড় সে-দিন হেঁচ্ড়ে-হোঁচ্ড়ে জড়ো হয়েছিল তাদের বেতালা গন্ডগোলের মতো নয় এটা। যে-মুহূর্তে সামঘিন পুলের ওপর পা দিয়ে ভীড়ের মধ্যে এসে মেশে, ঠিক সেই-মুহূর্তেই শ্রমিকদের সতর্ক পদক্ষেপ দেখে ওর মনে হয় যে এরা এক বিশাল ঐতিহাসিক কাজে নিযুক্ত। জনতার উত্তাপ থেকে সামঘিনের মনে এই চেতনাটা এল। শুধু ভীড়ের আকৃতিগত বিস্তারেই এই উত্তাপের সৃষ্টি নয়, এ-যেন গম্ভীর কর্তব্যরত শ্রমিকদের একমাত্রিক সঙ্ঘ বদ্ধতা থেকে এসেছে, উপস্থিত নারীদের মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ-রকম মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে ভীড় দেখা ওর এই প্রথম, বার বার চোখে পড়ে মস্কো-তে ক্রেমলিনের দিকে মানুষের যে জটলা বিনা প্রেরণাতে এগিয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে। এ জনতার কত তফাৎ—এই সুগম্ভীর প্রতিজ্ঞা সেখানে কোথায়? নারীর সংখ্যাও সেখানে ছিল অনেক কম। পুরুষদের অধিকাংশের মতোই এরাও প্রায় পুরো বয়সেরই। এদের গাম্ভীর্য, স্থিতধী, পরিষ্কার-চেহারা সামঘিনের মনে আবার আশা জাগিয়ে তোলে যে খারাপ কিছু ঘটবে না। ও-যেন বুকে বল পায়। সত্যি সত্যি যদি অত সৈন্যের সমাবেশ হ'য়েই থাকে তো সেটা নিশ্চয়ই রাজধানীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যেই করা হয়েছে। কই, লিতেইনি ব্রীজ বলে বন্ধ হয়ে গেছে,—সে-কথা যে ভুল তা'তো দেখাই যাচ্ছে। স্কুলের মধ্যে যে ভয়ার্ত চিৎকার আর গন্ডগোল উঠেছিল সে-কথা মনে পড়তেই ওর মনে হয় যে ওই লোকগুলো ঠিক যেন, 'ইতিহাস যাদের পেছনে ফেলে চলে এসেছে, ছুঁড়ে একপাশে যাদের সরিয়ে দিয়েছে।'

তির্যক দৃষ্টিতে তুরবোয়েভের দিকে চায় ক্লিম। নুয়ে প'ড়ে চলেছে সে, যেন কোন বুড়ো লোক,—পকেটে হাত ঢুকিয়ে, স্কার্ফে চিবুক ঠেকিয়ে। শক্তসমর্থ গম্ভীর মানুষগুলোর মধ্যে ওকে ছন্নছাড়া দেখায়। সেটা নিশ্চয়ই বুঝতেও পেরেছে;

মোটা মোটা যেন এমব্রয়ডারী ক'রে তোলা ভুরু দু'টো কুঁচকে জড়ো হয়েছে, একটি মাত্র রেখায় মিশেছে। তার মুখটা বিষণ্ণ কিন্তু দৃঢ়।

'সঠিকভাবে বলতে গেলে ও নিজের বিরুদ্ধেই হাঁটছে,' সামঘিন মনে মনে বলে। ভীড়টাকে আবার ভাল ভাবে লক্ষ্য করে—সেটা ক্রমশঃ জমাট বাঁধছে, উষ্ণতর হ'য়ে উঠছে।

*

সামঘিনের মনে হলো, ও যেন ইতিহাসের যুগান্তকারী কোন এক ঘটনার নিশ্চিত শরিক।—একজন অংশগ্রহণকারী, শুধুমাত্র সাক্ষী নয়। মনের মধ্যে এই ধারণাটা জন্মাল দেভোরিয়ানস্কি স্ট্রীটের প্রবেশ-পথের এক আকস্মিক ঘটনায়। একপাশ থেকে শত খানেক যুবকের একটা দল এসে জনতার মূল স্রোতে গিয়ে মিশেছিল; তাদের পুরোভাগে একজন সামান্য-পাতলাদাড়ি-ওয়ালা সুছাঁদ লোক আর সাদাসিধে পোশাক পরা ইস্কুলের শিক্ষিকার মতো দেখতে একজন মহিলা। অল্পদাড়ি-ওয়ালা লোকটা হঠাৎ নিজেকে অদ্ভুতভাবে সটান্ ক'রে তোলে, খাড়া সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, ছোট একটা ডান্ডার ওপর লাল নিশান ওড়াতে থাকে।

'হুররা!' কয়েকটা কণ্ঠস্বর বিক্ষিপ্তভাবে চেঁচিয়ে ওঠে। আরো ক'জন বেতালা চিৎকার করে : 'সোস্যাল-ডেমক্রেটিক্ পার্টি জিন্দাবাদ! হুর্‌রা! কমরেড্ হুররা!'

ভীড় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে এগিয়ে চলা থেমে যায়। অনেক ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চিৎকার ওঠে মিছিলের আওয়াজকে সেই-মুহূর্তে ডুবিয়ে দেয়।

'নিশান হঠাও!'

'হেই, ওটা নামাও!'

'এ কিছুতেই আমরা বরদাস্ত করবো না'

মেয়েদের স্বরই সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, ভীতও। সামঘিন ধাক্কায়-ধাক্কায় গোলমালের মাঝখানটায় এসে পড়েছিল। ঝাণ্ডা-হাতে মানুষটা ওর একেবারে কাছে। এখনো সেটা মাথার ওপর ধ'রে আছে, হাতটা ভয়ানক টান টান ক'রে ছড়ান। ঝাণ্ডাটা মাথার রুমালের চেয়ে কোন অংশে বড় নয়, অত্যুজ্জ্বল রঙের, হাওয়ায় এমনভাবে পত্ পত্ করছে যেন লাঠির থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবে। কাঁধ আর পিঠ দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে সামঘিন পেছনের লোকগুলোকে সরিয়ে দেয়। ঝাণ্ডাওয়ালা নির্ঘাৎ মার খেত। কিন্তু লাল গোঁফওয়ালা জনৈক ব্যক্তি শ্রমিকদের পোশাক পরা অথচ দেখতে ঠিক ফৌজী জওয়ানের মতো, নিশান-উঁচানো হাতটাকে অতি সহজেই নামিয়ে দেয়। বলে : 'লুকিয়ে ফেল, কমরেড'

'এখন এর সময় না,' আরেকটা কণ্ঠস্বর জানান দেয়। তৃতীয় এক স্বর ঘোষণা করে :

'এ-সবে কিছু হবে না, কমরেড আন্তন।'

ডীকনের মতো দেখতে একটি লোক সাদা রুমাল নাড়াতে-নড়াতে চেঁচিয়ে ওঠে :

'এ-টা ঠিক পুলিশের কারসাজি! তাদেরকে তো জানিই।'

ঝাণ্ডা অদৃশ্য হ'লো। ফৌজী-জওয়ানের মতো দেখতে লোকটা সেটা ছিনিয়ে নিয়ে বুকের মধ্যে গুঁজে ফেলেছে। যে-লোকটা নিশান উঁচিয়েছিল সে-ও ভীড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে। সামঘিনের পেছন থেকে ওকে জোরসে ধাক্কা দিয়ে

ভূতের-মতো চেহারার স্টোকার ইলিয়া বেরিয়ে এল। শিঙা-ধ্বনির মতো চিৎকার করতে করতে ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে চলল :

'ভাইসব, কোন ঝাণ্ডার দরকার নেই। এই কাজটাই অন্যরকম—অন্যরকম, বুঝেছ?'

মাথায় টুপী নেই। উঁচুনীচু নেড়া মাথাটা খোয়ার মতো, ইঁট-ইট রঙের। কোটের কলারের পেছনে ক্যাপটা গুঁজে রেখেছে। তার খানিকটা বেরিয়ে আছে ঠিক ওর চওড়া চিবুকের নীচে। ভীড়ের মধ্যে মানুষের যে গিঁট টা পড়ে গিয়েছিল সেটা খুলে গেছে, লোকের সার আবার রাস্তা দিয়ে শান্তভাবে ব'য়ে চলেছে রাস্তা কানায় কানায় উপচে পড়ছে। দৃশ্যটায় ভীষণ খুশী হ'য়ে সামঘিন শ্বাস ফেলে বলে :

'কি গম্ভীর মেজাজ নিয়ে আছে এরা.'

ভেবেছিল তুরবোয়েভের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু জবাব এল অল্প-অল্প দাড়িওয়ালা হলদে হাড়গিলে-মুখের একটা লোকের কাছ থেকে :

'ওতে গম্ভীর-মেজাজ কিছুই নাই ওই ছোট্ট একটা লালঝাণ্ডা ওড়ানোতে।'

সামঘিন ফিরে তাকায়। তুরবোয়েভ কাছেভিতে কোথাও নাই।

'আপনি শ্রমিক?'

'আবার কি? বাইরের কেউ নেই এখানে। থাকলেও জন দশ-বার। আপনি, কেরানি?'

'আমি লিখি কাগজের জন্যে' সামঘিন জবাব দেয়।

'আর আমি কুঁদ চালাই—আসবাবপত্র তৈরি করি।'

একটু থেমে সামঘিন সাহস ক'রে বলে 'লোকে বেশ খোশ মেজাজেই আছে। মোটের ওপর ব্যাপারটাই তো খুব আনন্দের। জার আর শ্রমিকদের মিলনের স্বপ্ন দেখত..'

'স্বপ্ন-টপ্ন আমাদের জন্যে নয়' কুন্দকার বলে ওঠে। গলায় স্পষ্ট বিরক্তি; ওর সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা সামঘিনের মন থেকে উবে গেল। লোকটা বলে ওঠে : 'তোমার আসা উচিত হয়নি পেলাঘেইয়া। তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম যে সন্ধ্যের আগে ফেরা যাবে না।'

মাথা ঘুরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে কথা কয়টা বলে।

'এগোও, এগোও' একটা কর্কশ পুরুষালি কণ্ঠ হাঁকে।

এইৎজকি স্কোয়্যারে আসতেই সামনের সারি যেন কিছুতে ধাক্কা খেল। সবাই থেমে যায়। জোরে জোরে আওয়াজ করতে থাকে। সামঘিনের আসে পাশের লোকগুলো এদিক-ওদিক লাফাতে থাকে এ-ওর কাঁধ ধরে দূরের দিকে তাকায়।

'হেই জওয়ান, সব থাম!'

নানা সুরে, ভয় বিস্ময়, রাগ বা মজা-পাওয়া কণ্ঠে একই কথা বার বার চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়। 'আমাদের এগোতে দেবে না?'

কিছু কিছু শ্রমিক থমকে দাঁড়ায়, পেছন দিকে ঠেলতে থাকে। অনেরা সামনের দিকে চাপ দেয়, চিৎকার ক'রে বলে :

'থেমনা! এগিয়ে চল!'

*

ভীড়ের মধ্যে গুঁতো খেতে খেতে সামঘিন দু-দু'বার পুরো চক্কর খায়, শেষে হঠাৎ দেখতে পায় একেবারে সামনে এসে পড়েছে, আর এগোনর উপায় নেই, সম্মুখে প্রাচীরের বাধা। পঞ্চাশ হাত দূরে ফৌজ দাঁড়িয়ে। পুলের প্রবেশ-পথে তারা শক্ত পাথুরে বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাথার সাদা সাদা ব্যান্ড কপালের ওপরে একই রকম ভাবে এসে পড়েছে, সবাই একভাবে ঝুঁকে আছে। তাদের পরস্পরের মাঝে বেয়োনেটের লম্বা সুঁচালো মুখ বের হ'য়ে আছে। সৈনিকদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একজন অফিসার, পিঠটায় দুই বেল্টের ঢ্যাঁড়া-কাটা। খোলা তরোয়ালের সরু নীলচে ব্যান্ড দোলাচ্ছে সে, উইন্টার প্যালেসের দিকে সেটা তুলে ধরেছে। মনে হয় সৈনিকদের ওপর লোকটা বোধহয় এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে। সামঘিনের ঠিক সামনে আর একজন অফিসার, তার মুখে কাল দাড়ি আর হাতে সাদা দস্তানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল, দেশলাইয়ের আলোয় তার চোখদুটো ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠছে। সামঘিন দেখল শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শতকণ্ঠের উত্তেজিত চিৎকার কানে আসে। তাদেরকে ছাপিয়েও স্টোকারের ভারী গম্‌গমে গলা ভেসে আসে :

'থাম, দাঁড়াও! আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলছি! মেয়েরা, একটা ওড়না! সাদা রঙের! আমি গিয়ে বুঝিয়ে বলছি! মেয়েরা, একটা ওড়না! সাদা রঙের! ইয়েগর ইভানিচ এস, তুমি তো বুড়ো মানুষ! ভাইসব, এক্ষুণি আমরা সব বুঝিয়ে দেব। মনে হচ্ছে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এখানে। একটা ওড়না। ইয়েগর একটা ওড়না দোলাও...'

স্টোকারের বিশাল শরীরখানা ফৌজের দিকে অবলীলাক্রমে এগিয়ে যায়। ওড়না দোলাতে দোলাতে সে চেঁচায :

'শুনুন, শুনুন আপনারা!'

তাকে পাঁচ পা এগিয়ে যেতে দিয়ে শ্রমিকরা কীলকের আকার নিয়ে দাঁড়াল। শীর্ষ বিন্দুতে বুড়োমানুষটা আর পেছনে পেছনে ওরা সবাই। স্টোকার লম্বা লম্বা পা-ফেলে এগিয়ে চলেছে। ছোট সাদা ওড়নাটা হাত থেকে উড়ে গেল। কলারের পেছন থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে সেটাকেই দোলাতে থাকে সে। বৃদ্ধ লোকটি দ্রুত হাঁটছে, কিন্তু সামান্য একটু খোঁড়ায় ব'লে স্টোকারকে ধরে উঠতে পারছে না। অল্প ক'জন লোক প্রায় জনাদশেক, বুড়োকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। সৈন্যদের প্রাচীরটা কেঁপে ওঠে। বেয়নেটগুলোর চোখা দাঁত ঝক্‌মক্ ক'রে উঠে মিলিয়ে যায়। শুকনো ফ্যাস ফেসে আওয়াজ ওঠে, খুব বেশী জোরে না --দু'বার, তিনবার। যখন মাথার ওপর দিয়ে শীঁ ক'রে একটা বুলেট চলে গেল, আর একটা কঁকিয়ে উঠল, তখনো সামঘিন মোটেই ভয় পেল না। কাঠের দেওয়ালের চাপড়া ফেটে খসে পড়ল, ওর সামনে তিনটে লোক পিঠ দিয়ে দেওয়াল ঘসটাতে ঘসটাতে মাটিতে পড়ে গেল। সামঘিন আতঙ্কে হিম হ'য়ে ওঠে, সৈন্যরা যে রাইফেল ফেলে দিয়েছে, আর শ্রমিকেরা পেছন দিকে হঠ্‌তে শুরু করেছে আস্তে আস্তে, বসে পড়ে, মাটিতে পড়ে যায়। একটা মেয়েছেলে তীক্ষ্ন আর্ত চিৎকার ক'রে ওঠে :

'গুলী করছে, শয়তানরা গুলী করছে! দেখ, দেখ ওদেরকে!' ভীড়ের মধ্যে

থেকে কয়েকটা কণ্ঠস্বর ওঠে : 'ফাঁকা আওয়াজ! ভয় দেখাচ্ছে শুধু!'

স্টোকার থেমে পড়েছে। মজুরেরা ওর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। এমন-ভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় 'বক্সার' দাঁড়িয়ে। বাঁ-হাত বুকের ওপর চাপা, ক্যাপ্ হাতে ডানহাতটা সামনে ছড়ান। হঠাৎ হাতটা পড়ে গেল, লোকটা টলে উঠল, কয়েক পা সামনে এগিয়ে যায় আর তারপরেই তুষারে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—সটান সোজা কাঠের তক্তার মতো। মাথাটাকে তুলে, তুষারের ওপর ক্যাপ অছড়াতে আছড়াতে লোকটা অমানুষিক চিৎকার ক'রে ওঠে। কিছুটা গড়িয়ে আসতেই পা দুটো ছড়িয়ে গেল, মুখটা বরফের মধ্যে ডুবে গেল।

সামঘিন এই আশ্চর্য মৃত্যু-দৃশ্য অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখল। সব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছে ও। বিশেষ আঘাত পায়নি। ওর মনে এ-কথাও হয় যে মৃত স্টোকারের আকৃতি যেন অনেক বড় হ'য়ে গেছে। কিন্তু মেয়েছেলেটার চিৎকারের পর চোখে ধাঁধা লাগে। এখন সব দৃশ্যই বহুদূরের, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ঘটনার যন্ত্রণাদায়ক মন্থরতা বিশ্রী দুর্বোধ্য। চোখের ওপর প্রতি মুহূর্তে অজস্র নড়াচড়া —কিন্তু মনে হয় যেন সব মিলে অদ্ভুত এক মন্থরতা।

শ্রমিকদের জমাট পিণ্ডটা ধীরে-ধীরে পিছু হঠছিল। লোকে পেছনে যেতে-যেতে সৈন্যদের দিকে চেয়ে ঘুষি দেখাচ্ছিল। এখনো কোন-কোন হাতে সাদা উড়ুনি পত্‌পত্ করছে। ভীড়ের বিন্যস্ত দেহ ভেঙে ভেঙে পড়ছে; দু'একজন ভীড়টার পাশ থেকে ছিট্‌কে-ছিট্‌কে আসে, দৌড়য়, মাটিতে থুবড়ে প'ড়ে যায়, যন্ত্রণায় শরীর আছড়ায়, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলে। বরফের ওপর বহুলোক বিশ্রী অঙ্গভঙ্গীতে পড়ে আছে। কৃষাণ কোট-পরা ডীকনের মতো দেখতে লোকটাও এমনিই অনড় হয়ে পড়ে আছে। কোটের কলারের নীচে দেহের কোনো এক জায়গা থেকে অজস্র রক্ত গড়িয়ে-গড়িয়ে মাথার পাশটায় মস্ত লাল দাগ সৃষ্টি করেছে—সামঘিনের চোখে পড়ে দাগটা থেকে স্বচ্ছ বাষ্প উঠ্‌ছে। ঘাড়ে সবুজ স্কার্ফ জড়ানো আরেকটা লোক প্রাচীরের দিকে পা'-টাকে টেনে টেনে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। ছোট্টমতন একজন মেয়েছেলে মাটিতে বসে নিজের পা থেকে স্নো-বুট টেনে খুলছিল। হঠাৎ ঘাড়ের পেছনে চোট্ খাওয়ার মতো মাথাটা দুইহাঁটুর ভেতর গুঁজে হাতদুটো টান্-টান্ ক'রে ছুড়ে কাত হ'য়ে পড়ে গেল। বোতাম-খোলা কোট গায়ে তুরবোয়েভ একজন তরুণকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রাচীরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল—তরুণের মুখে অল্প-অল্প কালো গোঁফ। তার পা'-দুটো জড়িয়ে গেছে, চোখ বন্ধ, দাঁত বেরিয়ে আছে আর ওপর-ঠোঁটটা সিঁটিয়ে গেছে। বাতাসে শাপ-শাপান্তের রুদ্ধগর্জন। কে-একজন চেঁচিয়ে হুকুম দেয় :

'বুর্স ব্রীজের দিকে চল, ছেলেরা!'

'শয়তানের দল জল্লাদ!'

সামঘিনের মনে হয় ভীড়টা আবার সৈন্যদের স্থির দেওয়ালটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আহতদের কুড়িয়ে আনতেই নয়।—অনেকে দৌড়ে সামনে যায়, সৈন্য-দের একেবারে কাছে, তাদের গাল দিতে থাকে। একজন মেয়েছেলে, গায়ের শর্ট-কোটটা বগলের নীচে কাটা হঠাৎ স্কার্টটা তুলে সৈন্যদেরকে লাল পেটিকোট দেখাতে দেখাতে শক্ত ঠন্‌ঠনে গলায় চেঁচায় .

'গুলী কর্' আমাকে গুলী কর্!'

'দৌড়োও, চল পালাই' সামঘিন চিৎকার ক'রে তুরবোয়েভকে বলে। মরিয়ার মতো সাইনবোর্ড আঁকড়ে ধরে আছে, ওর হাঁটু যে ভয়ে কাঁপছে তা তুরবোয়েভ কিছুতেই না দেখে ফেলে। মনের মধ্যে শেষ-চিৎকার জুড়েছে ছোট্ট একটা শব্দ : 'কেন? কেন?' তাকে থামিয়ে দিয়ে চারপাশের লোককে ও আহ্বান করে :

'চল, পালাই, আবার ওরা গুলী চালাবে...'

তুরবোয়েভ তার রক্তলাগা লাল-টকটকে আঙুলগুলো রুমাল দিয়ে মোছে। মুখের দাড়ি ভীষণ খোঁচা-খোঁচা। ছুঁচলো দাড়ির সূক্ষ্ম প্রান্ত প্রায় সমান্তরাল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঠোঁট কামড়ে ফেলেছে। ক্লিমের দিকে তাকিয়ে চেঁচায় : 'পালাও,, সব্বাই পালাও! ঘোড়সোওয়ার ফৌজ ছাড়বে...'

সৈন্যদের দেওয়াল ইতিমধ্যেই দু-ভাগ হ'য়ে গেছে, যেন গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। মরচে-রঙের ঘোড়ারা টগবগিয়ে খোলা স্কোয়্যারে চলে এল। পায়ের নীচে স্প্রে-র মতো তুষার ছোটে, সাদা-ক্যাপ পরা সওয়ারীরা চেঁচায়,, তীব্র আওয়াজ করে, বাঁকা-তলওয়ার এলোপাথারি চালায়। ভীড় গোঙিয়ে ওঠে, পেছন দিকে দোলে, ছোট্ট ছোট্ট দল আর ব্যক্তিতে ভেঙে পড়তে শুরু করে। আবার এত আস্তে যে ক্লিম ভয়ানক ভয় পায়। ক'জন লোক,—বোধহয় কম বয়সীই হবে কেন না কি রকম অবলীলায় তারা লাফ দিয়ে-দিয়ে চলছিল, -ঘোড়াদের মধ্যে পাঁকের মতো জড়িয়ে যায়, একবার একটার তলে আবার ধাক্কা খেয়ে আরেকটার তলায়। ঘোড়াগুলো ভয়ে পাশ কাটিয়ে যায়, কিন্তু পিঠের সৈন্যরা নীচু হয়ে লোকগুলোকে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে ফেলে যাতে ঘোড়ারা ওদের ওপর দিয়ে লাফাতে পারে। সামঘিনের মনে হলো ওর চোখ বুঝি ক্রমশঃ বড় হয়ে পড়েছে, সবকিছুই বড় করুণ স্পষ্টতায় চোখের সামনে ফুটে উঠছে। মনে হলো অন্ধ হ'য়ে যাবে। ও চোখ বোঁজে। পাশের লোকগুলো প্রাচীর বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে। প্রাচীর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ ক'রে ওঠে, দোলে। ঘোড়াগুলো চিঁ-চিঁ করে, বিদ্বেষের চিৎকার। ঝনঝন আওয়াজ ওঠে, ঠন্ ক'রে ও একটা শব্দ হয়। চাবুকের সাঁ-সাঁ শব্দ। মানুষ গোঁ-গোঁ ক'রে ওঠে, কোঁকায়, ঘোড়াগুলোর মতো চিল্লায়, আর তারপর পড়ে যায়—

টুপীহীন একটা যুবক সামঘিনের মাথার ওপর দিয়ে একটা তক্তা খসিয়ে আনছিল। ঘড়-ঘড় স্বরে চেঁচিয়ে বলে :

'হাত লাগাও না, দেখছ না?'

'শুয়ে পড়!' তুরবোয়েভ চেঁচিয়ে ওঠে। সামঘিনের পায়ে এক লাথি মেরে ওকে প্রাচীরের পাশে ফেলে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে সামঘিনের মাথার ঠিক ওপরে একটা ঘোড়া পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দুলো লাফায়। জানোয়ারটার ওপর সুসজ্জিত ঘোড়সওয়ার সেনা, নীল-নীল চোখ, পাতলা গোঁফ। দাঁত বের ক'রে ছোটদের মত আর্তনাদ ক'রে ওঠে। হাওয়ায় বাঁকা-তলোয়ার ঘোরায়, প্রাচীরের ওপরেও দু-চার ঘা দেয়। তলোয়ার দিয়ে তুরবোয়েভকে ধরতে চায়। সে ততক্ষণে গড়াতে গড়াতে প্রাচীরের ধার দিয়ে মাটি ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলেছে। চিৎকার ক'রে ওঠে :

'ভাগ ব্যাটা জানোয়ার! ভাগ শয়তান!'

হঠাৎ সে বিশ্রীভাবে হেসে ওঠে, চেঁচিয়ে বলে :

'ওরে গবেট! ইহুদী পেয়েছিস নাকি আমাকে?'

ঘোড়াটা পেছনের পা তুলে লাফিয়ে ওঠে। একজন মজুর তার পায়ে তক্তার টুকরো দিয়ে মারে এক বাড়ি। সেপাই ঘোড়াটাকে তীব্র প্যাঁক দিয়ে ঘুরিয়ে নেয়, যেমন সার্কাসে দেখা যায় অনেকটা সেই রকম। আর তারপরেই মজুরটির মুখে বাঁকা-তলোয়ারের এক কোপ। লোকটা হোঁচট খায়, রক্ত-কান্না কাঁদে ঘোড়ার কুঁচকিতে তক্তাটা ঠুসে দিয়েই তার পায়ের তলাতেই পড়ে যায়। সেপাইটা তুর-বোয়েভের দিকে আবার তলোয়ার উঠায়। সামঘিন চোখ বন্ধ ক'রেও ঘাতকের মুখটা দেখতে পায়, সেটা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, রাগে লাল, তার দাঁত আর খাড়া-খাড়া কানও চোখে পড়ে। আহত ঘোড়ার চিৎকার, তার পায়ের দলে-মুচড়ে এগিয়ে যাওয়ার আওয়াজ আর প্রাচীরের ওপর তলোয়ারের আঘাতের ধ্বনি সব

মিলে কানে সামঘিনের খুব ভারী একটা বস্তুর পতনের শব্দ হলো।

'ওকে মেরে ফেললে। এবার আমার পালা,' সামঘিন ভাবে, এমন নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে যেন অন্য কারো কথা ভাবছে। মনের মধ্যে আরেকটা ভয় এসে ওকে হিম ক'রে দিল—নিজের প্রাণের ভয় নয়—আরো ভীষণ, আরো মারাত্মক।

ওর চারপাশটা এখন অনেক শান্ত। চোখ খুলে ফেলে। তুরবোয়েভকে দেখতে পেল না কোথাও। তার টুপীটা মজুরটির পায়ের কাছে পড়ে আছে। নীল চোখ অশ্বারোহী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘোড়াকে টেনে নিয়ে চলেছে পিটার-পল দুর্গের দিকে। ঘোড়াটা চলতে-চলতে প্রায়ই পেছন-পায়ের ওপর প'ড়ে-প'ড়ে যাচ্ছে, মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে সামনের পা দুটো মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে, সৈনিকটি চেঁচায়, লাগামে কষে টান দেয় আর ঘোড়ার মাথার ওপর বন্‌বন্‌ ক'রে বাঁকা-তলোয়ার ঘোরায়।



সামঘিন উঠে ব'সে প্রাচীরে ভর দিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। ফৌজী পল্টনের এখন অনেকটা দূরে শ্রমিকদের মারতে মারতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। কামে ন্নোস্ত্রভ্‌স্কি প্রস্পেক্টের দিকে। রক্তঝরা লোকগুলো হামা দিয়ে দিয়ে স্কোয়্যারের দিয়ে চলেছে। কোনো বাক্যব্যয় না ক'রে অন্যেরা তাদের তুলে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। চারপাশের মাটিতে ক্যাপ আর গলোশ ছড়িয়ে আছে। মস্ত বড় একটা শাল পিণ্ড পাকিয়ে প'ড়ে আছে, মনে হয় যেন কোন ছেলে বোধহয় জড়ান। পাশেই বরফের ওপর কালো একটা হাত চেটো তুলে প'ড়ে আছে। একজন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে মারা শ্রমিকের দেহ পড়ে আছে, মাথাটা রক্তের ডোবায় থুবড়ে পড়ে আছে। হাত দুটো বুকের নীচে পা দুটো ইংরেজি ভি. অক্ষরের মতো ছড়িয়ে আছে। ব্রীজের কাছে রুক্ষধূসর পদাতিক ফৌজ লাফায়-ঝাঁপায়, লাথি মেরে-মেরে মাটি কাঁপিয়ে তোলে। বেল্টে পেতলের তকমা আঁটা একজন সেপাই বেশ খানিকটা উঁচুতে লাফ মারে। সৈন্যদের অনেকেই চোখে হাত দিয়ে ঠাহর করছে, দূরের দিকে তাকিয়ে আছে যেখানে মানুষজন ছুটোছুটি লাগিয়েছে, ঘোড়াগুলো চক্কর খাচ্ছে, সামনের পা তুলে লাফ মারছে, বাঁকা-তলোয়ারের ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

সামঘিন পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়, প্রাচীরের ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে হাঁটে। মোড়টায় পৌঁছে অন্যদিকে ঘুরে চলে। সেখানে একটা লোক বাঁধের পাথরটার ওপর ব'সে আছে, মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। থুতু ফেলে নাক ঝাড়তেই মাটিতে জমা রক্তের ক'টা দলা পড়ে।

'শুনুন, একমিনিট!' হাঁটুতে হাত ঘষতে-ঘষতে চেঁচায়: এই কি নিয়ম নাকি? বিউগ্‌ল-বাজিয়ে সংকেত করা উচিত ছিল। আমি নিজে সৈনিক। নিয়ম-কানুন জানি। কানুন তো বলে প্রথমে বিউগ্‌ল-বাজিয়ে সংকেত করবে, ...বদমাশ পাজীরা!' জোরে ফুঁপিয়ে ওঠে, অশ্লীল মুখ খিস্তি করে। 'ভাসিলি মিরোনিচকে কেটে দু-ফালা ক'রে দিয়েছে, উঃ! বৌকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলছিল আর বাস্‌, তলোয়ার এসে দিল দু-ফাঁক ক'রে...'

সামঘিন চুপচাপ পা বাড়ায়। হাঁটছে যেন ঘুমের ঘোরে প্রায় অচৈতন্য অবস্থাতে, মনে শুধু একটিই অনুভূতি: যা দেখত তা' কক্ষণো ভুলতে পারবে না,

আর ও' না ভুলে বেঁচে থাকাটা তো অসম্ভব। অ-স-ম্ভ-ব।

শহরের এই দিকটা ওর চেনা। আন্দাজে-আন্দাজে মোড় ঘোরে। একটা রাস্তায় শ্রমিকদের ছোট্ট দল দেখল। প্রাচীরের ধারে জানালার নীচে দ্বটো লোককে মাথায়-মাথায় স্বন্দরভাবে শোয়ানো। একজনের ম্বখ ক্যাপে ঢাকা, আর আরেক-জনের দাড়ি না-কামান ম্বখটায় হলদে গোঁফ, পাথ্বরে চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ। আকাশ ভেঙে তুষার পড়ছে। পর্চের বাঁধান সিঁড়িতে নিকেলের চশমাপরা এক-জন মাঝবয়সী লোক ব'সে। শক্তসমর্থ এক মেয়েছেলে তার পাশে ব'সে পায়ের পাতার ওপর দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিচ্ছে, পা'টা এমনভাবে রক্তলাগা যে, মনে হয়, লোকটা বোধহয় লাল মোজা প'রে ব'সে আছে। পায়ের আঙ্বল নাড়াতে-নাড়াতে লোকটা ধীর-গলায় কিন্তু বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই ব'লে ওঠে :

'বোধহয় এখানটায় দ্বর্গ আছে ব'লেই।'

পাতলা-মত একজন শ্রমিক গায়ে জীর্ণ কোট আর কোমরের ওপর বেল্ট বাঁধা, চিৎকার ক'রে ওঠে :

'দ্বর্গ? দ্বর্গ তো কী? ও-সব দ্বর্গ-ট্বর্গের কথা আমায় বলো না। আমরাই তো দ্বর্গ!'

নিজের ব্বকের ওপর ঘ্বঁষি মারে। মারতেই খক্ খক্ ক'রে কাশতে শ্বর্ব করে। তার হল্বদ স্যাঁত্‌লা-পরা ম্বখটা অস্ব্স্থ দেখায়, চোখ দ্বটো উন্মাদের মতো। ভেতরে-ভেতরে রাগের যে আগ্বন জ্বলে উঠেছে, তা-তেই যেন সিদ্ধ হচ্ছে লোকটা। এই ক্রোধ ক্লিম সামঘিনের মনেও আছড়ে পড়ে।

'জার আর ওই ফাদারটাকে এর জবাব দিতে হবে,' কান্নাভরা হতাশায় ও ব'লে ওঠে 'জার তো তুচ্ছ, অস্তিত্বই নেই তার। সে তো এক আত্মঘাতী! অন্যকেও হত্যা করছে, নিজেকেও! রাশিয়াকে সে হত্যা করছে কমরেডরা—আর কোন খোদিঙ্কা নয়! তোমরা কিছ্বতেই '

'আমি কিছ্বতেই কিছ্ব-নয়!' শ্রমিকটি সামঘিনের কাঁধে থাবা দিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে। 'কি বলছ কি, এখানে? আর তুমি কে? বল! কি বলতে চাও?

গর্জন ক'রে লোকটা ক্লিমের কাঁধ খাম্‌চে ধরে, খক্‌খক্ ক'রে কাশতে কাশতে জোরে-জোরে নাড়ায়। আহত লোকটা মেয়েছেলেটার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। যন্ত্রণায় ক'কিয়ে উঠে আবার ব'সে পড়ে।

'কি ক'রে আমি হাঁটব?'

'ওকে যেতে দাও,' মোটা ভেড়ার চামড়ার কোটপরা এক ব্বদ্ধ ব'লে ওঠে : 'যান মশাই আপনি। এ আপনার জায়গা নয়।' সামঘিনের দিকে চেয়ে নিস্পৃহ-গলায় বলে। শ্রমিকটাকে হাত ধ'রে টানে 'চল মিশা। দেখছ না লোকটা ভয় খেয়েছে '

ক্লিম দেখে শ্রমিকরা সবাই ওর কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে। ও চলে যাক্, তাই ওরা চায়। ব্বকের মধ্যে হিম হ'য়ে আসে, অপমান মনে হয়। কিছ্ব একটা বলতে যায়, কিন্তু সেই শমিকটি কাশি থামিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে

'তোমার আত্মঘাতী এখন চা খাচ্ছে। জেনারেলদের নরম-গলায় বলছে : "খ্বব ভাল, খ্বব ভাল, ধন্যবাদ তোমাদের।" আর তুমি এখানে কথার চিত্তির আঁকছ বাব্ব '

সামঘিন রাগে হাত নাড়ায়। ওখান থেকে পা চালিয়ে চলে আসে, এক্ষ্বণি শহরে ফিরে যাবে। যথেষ্ট দেখা হ'য়েছে, সাক্ষী হবার মতো প্রচুর।

'ওই লোকটা ঠিক বলেছে। বিউগ্‌লারের সঙ্কেত করা উচিত ছিল। তা'-হলেই তো শ্রমিকরা চলে যেত।'

প্রায় ছুটেই চলে। শ্রমিকদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়, তাদের বেশির ভাগই গুই-মুখোই, জোরে-জোরে কথা বলতে বলতে হাঁটছে। হাসিও হচ্ছে, উত্তেজিত মানুষের বিশ্রী অট্টহাসি. যেন মনে করিয়ে দিতে চায় : 'বেঁচে আছে বলে মহা-খুশী'।

সামঘিনের সামনে দুজন তরুণ আবএকজনকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তার সীলস্কিন ক্যাপ ঘাড়ের ওপর ঠেলে দেওয়া, পিঠে রক্তরাঙা তুষারের পিণ্ড।

'ও কিছু না,' নাক-ডাকার মতো শব্দ তুলে বলছিল : 'ও কিছু না।'

পা আর টানতে পারছে না। মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে এল। ঘর্ঘর শব্দ করতে করতে সাথীদের হাতের ওপর লোকটা ঝুলে পড়ল।

মনে হচ্ছে খতম হয়ে যাচ্ছে,' ওদেরি একজন চেঁচিয়ে ওঠে। আরেক জন পেছন ফিরে সামঘিনকে জিজ্ঞেস করে : 'আপনি ডাক্তার?'

'না.' সামঘিন জবাব দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে অনিচ্ছাবশত মুখ থেকে বেরিয়ে আসে : 'ফিট হয়ে গেছে।'

ছেলেটাকে সামলে শুইয়ে দেওয়া হলো ঠিক সামঘিনের রাস্তার ওপর। মুহূর্তের মধ্যে ভীড় জড়ো হয়ে রাস্তা আটকে যায়। লম্বা-মতন, চামড়ার জ্যাকেট পরা লালমাথা একটা লোক নড়বড়ে ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে আসছিল। সামঘিন কোচোয়ানটাকে চিনতে পারে। বাক্সে বসে চাবুক আছড়াতে-আছড়াতে কোচোয়ান নালিশের গলায় চেঁচায় :

'কোথায়? না না যাব না। আমি যেতে পারি না। আমি আমার ছেলেকে খুঁজছি।'

কিন্তু ততক্ষণে আহত ছেলেটাকে স্লেজে তুলে দেওয়া হয়েছে। একজন সঙ্গী ইতিমধ্যে ছেলেটার পাশটিতে গিয়ে বসেছে. আরেকজন কোচোয়ানের বাক্সে গিয়ে ওঠে। কোচোয়ান তার গায়ে চাবুকটা ভুঁকিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে :

'দোহাই ভগবানের আমাকে যেতে দাও। বলছি যে. আমার ছেলে '

'আমরা সবাই সন্তান।' কে একজন ভীষণ গলায় চেঁচায়।

কোচোয়ান বাক্সের ওপর থেকে গড়িয়ে লোকগুলোর পায়ের ওপর এসে পড়ে। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ব'সে মেয়েছেলের মতো কাঁদে

'আমি যাব না গো। যাব না। যেতে পারি না।'

লোকে হাত ধরে ওকে হেঁচকে টেনে তোলে কলার ধরে উঁচু ক'রে স্লেজের বাক্সের ওপর ছুঁড়ে দেয়।

'চার জন এতে যেতে পারবে না,' কে এক জন বলে ওঠে। কয়েকজন স্লেজটাকে সঙ্গে-সঙ্গে মারে এক ধাক্কা। ঘোড়াটা ঘাড় বেঁকায়. কিন্তু সামনের পা দুটো এমনভাবে বাঁকায় যে. মনে হয় সেটাও শুয়ে পড়তে চাইছে।

'নিজেদের মানুষ বল তোমরা?' কোচোয়ান চিৎকার করে।

'নিষ্ঠুর,' সামঘিন ভাবে এতক্ষণে আত্মস্থ হয়ে উঠেছে। পেছনে ভীষণ একটা কণ্ঠস্বর উল্লাসে চিৎকার করছে ·

'ভাসিলিয়েভ্স্কি আইল্যান্ডে একটা অস্ত্রের দোকান ভেঙে চুরমার ক'রে দেওয়া হয়েছে। ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে।'

'কে বললে?'

'আমাদের দলের ছেলেরা .'

'জওয়ানরা কে যাবে শহরের দিকে। কমরেড. শহরে কে কে যাবে?'



শ্রমিকদের ভীড়ে এসে যোগ দেয় সামঘিন, তাদের মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিক ধরে। বুর্শ এর সমস্ত দালান চোখে পড়ে, সেখানটায় পুলের ওপর ঘোড়া আর সৈনিকেব দল। শ্রমিকরা থেমে পড়ে, নিজেদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু করে, ফৌজ যদি গুলী চালায়।

'অনেক তো গুলী চালিয়েছে,' ধূসর জ্যাকেট-পরা একজন বেঁটে লোক বলে ওঠে, তার ডান কনুইয়ের কাছে জ্যাকেটটা তালি দেওয়া। 'বরফের ওপর দিয়ে কে যাবে, মার্স-ফিল্ডে?'

ছ'জন লোক ওর পিছু পিছু যায়। সামঘিন সপ্তম জন। বরফ-জমা নদীটার ওপর দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট একটা মানুষের মূর্তিকে ছুটে ছুটে যেতে দেখে শহরের পানে। নদীর প্রশস্ত বুকের ওপর তাদেরকে অতি তুচ্ছ মনে হয়। পেছনের পটভূমিকায় কালো-কালো প্রাসাদ, ছাদেব ওপব পাথুরে-ধূসর আর ভারী আকাশ টাঙান।

'কোন একা-মানুষের দিকে ওরা গুলী ছুঁড়বে না' সামঘিনের মনে হয়। মনটা অসাড় হয়ে পড়েছে প্রায় স্থির।

রাস্তার চেয়ে নেভার ওপর অনেক বেশী ঠাণ্ডা। দমকে-দমকে ঝাপ্টা দিয়ে বাতাস বয়, তুষারকে ছিড়ে-কুড়ে। বরফের নীল্‌চে খালি জায়গাগুলো খুলে ধরে, পায়ের ওপর সাদা ধোঁয়াব আস্তরণ নিয়ে আসে। ছোট্ট দলটা দ্রুত পথ হাঁটে, প্রায় দৌড়োয়। একজন শ্রমিক অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করছিল। বেঁটে লোকটা দু'বার তার দিকে পিছু ফিরে অবশেষে দৃঢ় গলায় গম্‌গমে সুরে ঘোষণা করে :

'সব বাজে কথা। পল্টন এখন ঘোড়াগুলোর মতোই লাগাম-কষা। যদি লাথ্ ছুঁড়তে শুরু করে '

অদ্ভুত একটা শব্দ হলো, যেন বীচ-গাছের কুঁড়ি ফাটল। সামঘিনের মাথার ওপরের বাতাস ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে ওঠে।

'আমাদের জন্যেই এটা,' বেঁটে লোকটা বলে : 'ছড়িয়ে পড়, ছড়িয়ে পড়!'

তবুও শ্রমিকেরা দল বেঁধেই চলতে থাকে। আবার যখন বাতাসে ফটফট আওয়াজ হয় আর দু-দুবার বুলেট এসে খুব কাছে বরফের ফুলঝুরি ছড়িয়ে যায়, শুধু তখনি একজন শ্রমিক প্রাণপণে লাফ মেরে বাঁধের দিকে সোজা দৌড় লাগায়।

'মজার লোক,' বেঁটে লোকটা সামঘিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে : 'বুলেট থেকে দৌড় মারে।'

'হ্যাঁ যা বলছিলাম : কর্নেল তেরপিৎস্‌কির সঙ্গে, আমরা চীনের রাজধানী পেকিঙ্ নিচ্ছিলাম. '

শ্রমিকদেরই বলছিল গল্পটা কিন্তু তার কথাগুলো সোজা সামঘিনের মুখে ভেসে আসে।

'ওঃ, তাহলে তুমি গুলী করতে চাও না?' না, স্যার। ওখানটায় গিয়ে দাঁড়াও তবে। আলিয়োশা ওখানে গিয়ে গুলীবিদ্ধ মৃতদেহটার পাশে দাঁড়ায়, ক্রুশচিহ্ন আঁকে। এক নিমেষে সব শেষ : প্লেটুন, ফায়ার! এই তো তোমার খৃস্ট! সৈনিকের রক্ষায় খৃস্ট নেই, একেবারেই নেই! সৈনিক মানুষটাই যে বিধিবহির্ভূত...'

মার্স ফিল্ডে এসে সামঘিন সঙ্গীদের পেছনে পড়ে যায়। কয়েক মিনিট পর

নেভ্স্কি প্রস্পেক্টে গিয়ে বেরোয়। এখানটা যে শুধু অনেক উষ্ণই তা নয়, পরিচিতও, বোধগম্যও বটে। মানুষজনের নীরেট সারির ওপর দিয়ে টুকরো-টুকরো আলাপ-আলোচনা ভাসে, উত্তেজিত কিন্তু নরম, উদ্ভাসিত। লোকে প্যালেস স্কোয়ারের দিকে চলছে। তাদের মধ্যে সুন্দর জামা-কাপড় পরাও অনেকে রয়েছে, বড়লোক, পুরুষ এবং স্ত্রী দুই-ই। ধাঁধা লাগে সামঘিনের মনে, ভাবে :

'ও-পাড়ে যা হয়েছে তা কি ভুল করেই নাকি?'

আশায় খুব সহজেই গা-ভাসিয়ে দেয়। এ-পাড়ে সব ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, সব জটিল সহজ হবে। অন্য সব শহরতলী থেকে শ্রমিকরা আসবে; জার আসবেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে...'

ওর সামনে একটা লোক ফারকোট পরে চলেছে, তার ফার-ক্যাপের কাট্‌টা অদ্ভুত। একজন মহিলাকে বগলদাবা করে নিয়ে চলেছে, নরম গলায় তাকে আশ্বাস দিচ্ছে :

'আমি বলছি কিছু হয়নি।'

'হয়েছে,' সামঘিন বলতে চাইল, সাক্ষীর ভূমিকার কথাটা ওর মনে পড়ে যায়। কিন্তু লোকটা ততক্ষণে বলে উঠেছে :

'ও তো এক সিনিক। হয়েছে বটে তবে এমন কিছু না..'

সামঘিন এই জোড়াটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যায়। লম্বা-লম্বা পা ফেলে-ফেলে চল। মানুষের স্রোত যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বাহিত হয়ে যাচ্ছে এই ওর এক মস্ত বড় শান্তি।

প্রস্পেক্টের শেষে এসে দেখে প্যালেসে যাবার রাস্তায় দুই সারি খুদে ফৌজ। ভীড়ের ঠেলায় ও তাদের একেবারে সামনে এসে পড়ে। লাইনের শেষপ্রান্তের একটা পাশে ও দাঁড়িয়ে যায়। খুব কাছ থেকে পদাতিক পল্টনদের খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে। ছোটখাটো সব মানুষ, দেখলে করুণা হয়, সংখ্যাও বোধহয় দুশোর কমই হবে। তাদের বাঁ পাশের উইংগ্‌টা নেভস্কি প্রস্পেক্টের কোণের একটা দালানের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, আর ডান উইংগ স্কোয়্যারের রেলিং-এ ভর দিয়ে। নেভস্কি থেকে সেণ্ট আইস্যাকস স্কোয়্যার পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েক হাজার ঠাস-বোঝাই মানুষের বিরুদ্ধে এরা কীই বা করতে পারে?

'হ্যাঁ,' সামঘিন ভাবে। 'ওখানে যে একটা ভুল হয়েছিল যে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।—জঘন্য অপরাধ,' মনে-মনে যোগ করে।

মনে হলো সব সৈনিকেরই বোধহয় খাঁদা নাক। অনেকক্ষণ ধরেই হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে, ঠাণ্ডায় গালগুলো নীল হয়ে গেছে। অজান্তে সামঘিনের মনে হয় যে এই বেচারী-গোচের ফৌজকে এখানে এই জন্যেই রাখা হয়েছে যাতে লোকে ওদেরকে ভয় না পায়। লোকে ভয় পাচ্ছেও না। পল্টনদের প্রায় বুকে বুক লাগিয়ে তারা দাঁড়িয়ে, তাদের করুণার ভাবটাই যেন লোকের মনে জাগছে। একটা বুড়ো, খাটো ফার-কোট আর কানঢাকা ফার-ক্যাপ পরে কর্পোরালকে বলছিল :

'আমাকে শিখিও না বাপু! আমি নিজেই তো গার্ডদের সার্জেণ্ট-মেজর!'

মেয়ে-দরজী বা পরিচারিকার মতো দেখতে একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসার সুরে ক'রে বলছিল :

'তোমরা নাকি মানুষকে গুলী করছ?'

'আমরা গুলী করি না।' সেপাইটা জবাব দেয়।

প্যালেস স্কোয়্যারের ওপর আলেক্সাণ্ডার কলমের মুখোমুখী রেলিঙের ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বিরাট-বিরাট কালো ঘোড়া, তাদের পিঠে-চট্‌পটে ঘোড়সওয়ার ফৌজ। কলমের আশেপাশে কিছু পদাতিকও আছে কিন্তু তাদের রাইফেলগুলো

এক জায়গায় জড়ো করা। সবুজ রঙের ঠেলাগাড়ীও আছে, একটা ছোপ্-ছোপ্ রঙের মস্ত কুকুর ছুটোছুটি লাগিয়েছে। সব কিছুই আশ্চর্য সহজ, মনে কোনই রেখাপাত করে না। সামঘিনের চোখে স্পষ্ট ফুটে উঠল একটা দৃশ্য—এই স্কোয়্যারের ওপরেই বেটে-বেটে লোকের ভীড় জারের সামনে একদিন জানু পেতে বসেছিল। ওর মন হলো এই রাইফেল, কুকুর, ঠেলাগাড়ী সবই অনাবশ্যক। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁদিকে তাকায়, সেণ্ট আইস্যাকের ক্যাথেড্রালের ধূসর গম্বুজটা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, ওপরে আকাশের ওল্টানো গামলাটা ঝুলে আছে—বিরাট আর ফাঁপা, যেন ফ্যাকাশে পাথর কুঁদে তৈরি।

খাঁদা নাক সৈন্যদের পেছনে স্কোয়্যারের ওপর অফিসারেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাইনের সামনে কিন্তু তাদের একজনাও নেই, আছে শুধু এক সার্জেণ্ট, সেও ছোট মতোই। মুখটা অকালপক্ক তরুণের মতো, মাঝে মাঝে অলস গলায় চেঁচাচ্ছে :

'আঃ, চাপ্ দেবেন না।'

সামঘিন কিন্তু দেখতে পেল না যে একজন অফিসার টিন রঙের কোট-পরা, লাল-লাল চুল, মোটা গোঁফ, হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো। যেন সামঘিনের পেছনে কোন দেওয়াল থেকেই তার উদয় হয়েছে। সামঘিনের একেবারে ধার ঘেঁষেই দাঁড়ায়, কেমন যেন জোলো-জোলো গলায বলে ওঠে

'এ্যাটেনশন!'

আরো কি কি সব বলে। খাঁদা নাক লোকগুলো এক সঙ্গে নড়চড়ে ওঠে, নিস্পন্দ নীরবতায় দাঁড়ায়। লাল চুল অফিসার যেন পকেট থেকে একটা লম্বা তলোয়ার বের করে, তারপর সেটা বাতাসে দোলায়। চেঁচিয়ে ওঠে। খাঁদা নাক মানুষগুলো গালের সঙ্গে রাইফেল চেপে ধরে, পেছনে দোলে, আর ফায়ার করে। সমস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব দ্রুততায ঘটে, অত্যন্ত সহজভাবে, ও-পাড়ের মতো একেবারে না। পাশের একটা অনুকূল জায়গায় দাঁড়িয়ে সামঘিন দেখতে পায় বেয়োনেটগুলো উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে, বাঁকা-বাঁকা রেখায়, কোনোটা উঁচু কোনোটা নীচু, সামনের লোকগুলোর মুখের দিকে সোজা নিবদ্ধ হয়ে আছে খুবই কম। গুলীর ঝাঁক ফেটে ওঠে, একটি মাত্র সম্মিলিত আওয়াজ নয়, বিক্ষিপ্ত বটে ভেঙ্গে-ভেঙ্গে, একটুও ভীতিকর না।

তবুও সৈন্যদের ঠিক সামনে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা ভীত হয়ে পড়ে। ভীড়টা পেছন দিকে পিছলে যায়, সৈন্যদের থেকে প্রায় ফিট্ পাঁচেক জায়গা খালি ক'রে দেয়। গার্ডদের প্রাক্তন সার্জেণ্ট-মেজরটি অনমনীয়ভাবে টুপীতে হাত তোলে আর তারপরেই সেপাইয়ের পায়ের কাছে ধপাস্ করে পড়ে যায়। তার কাছে আরো তিন-চার জন পড়ে যায়। ভীড়ের মধ্যেও লোক পড়ে-পড়ে যায় একের পর এক।

'ভয় পেয়েছে,' সামঘিনের কানের কাছে কে একজন বলে ওঠে : 'ওগুলো তো ফাঁকা কার্তুজ। আর ওরা– '

কিন্তু ততক্ষণে সামঘিন বুঝতে পেরেছে লোকগুলো শুধু ভয় পেয়েই পড়ে যাচ্ছে না। দেখল ভীড়ের মধ্যে অসম্ভব চাপ বেড়ে উঠেছে, পায়ের নীচ থেকে মেয়ে-পুরুষকে হিঁচড়ে বের ক'রে দিচ্ছে। কেউ কেউ বসে পড়ছে, পড়ে যাচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে। আর্ত চিৎকাররত একজন তরুণ এক-পা আর হাতের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়ে-গড়িয়ে চলছিল। সামঘিন দেখল লোকে মরছে তাদের যে হত্যা করা হচ্ছে সে-কথাটা বুঝবার বা বিশ্বাস করবার আগেই। শুনতে পেল লালমাথা অফিসার সেপাইদের সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দস্তানা-পরা মুঠি নাড়াতে-নাড়াতে আর তাদের তলপেটে তলোয়ারের ডগা দিয়ে খোঁচা মারতে-মারতে জঘন্য মুখখিস্তি করছে। আর দেখল, মুখ ঘুরিয়ে ক'পা

এগিয়ে এসেই অফিসারটি হামাগুড়িরত তরুণের শরীরে দিল তলোয়ার বসিয়ে। তার বাহু দুটো সঙ্গে-সঙ্গেই পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ল।

ভীড় চিৎকার ক'রে ওঠে, চেঁচায়, হল্লা করে, সৈন্যদেরকে ঘুষি পাকিয়ে ভয় দেখায়, কেউ কেউ তাদের দিকে স্নো-বল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারে। সৈন্যরা পায়ের কাছে রাইফেল ধরে আগের চেয়ে আরো ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে, ভয়ে বিবর্ণ তারা, অদ্ভুত দীর্ঘ দেখাচ্ছে তাদের।

দৃশ্যটা ও-পাড়ের চেয়েও অনেক বিস্ময়কর। বোধহয় এত কাছ থেকে সামঘিন লক্ষ্য করেছে বলেই। আবার সেই যন্ত্রণাদায়ক মন্থরতার উপলব্ধি, এক-এক মিনিটের কি সাংঘাতিক ঘটনা-ধারণ করবার ক্ষমতা, কত আন্দোলন আর কত মৃত্যু। যাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল তাদেরি ধাক্কায়-ধাক্কায় নেভ্‌স্কি প্রস্পেক্টে এসে পৌঁছয়। এখনো তারা চিৎকার চেঁচামেচি করছে, শাপ-শাপান্ত দিচ্ছে, মুঠি পাকাচ্ছে যদিও সৈন্যদের আর চোখে পড়ছে না। সামঘিন দেখে পেছন-ফিরে যাওয়া অসংখ্য মানুষের দল কোন অদৃশ্য বাধার ওপর গিয়ে আঁটো হয়ে পড়ল আর সঙ্গে-সঙ্গেই একটিমাত্র বিকট গর্জন সামনের দিকে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের মতো ছুটে এল শবের ওপর হোঁচট খেতে-খেতে, আহতদের কুড়িয়ে নিতে নিতে। বেশ জোরে এক ঝাঁক গুলী ফাটে, আবার আর এক ঝাঁক। সেপাইরা বন্দুক ছুঁড়তে ছুঁড়তে লাফিয়ে আসে, রাইফেলের কুঁদো বন্-বন্ করে ঘোরায়, বেয়োনেট নাচায়। ভীড় শরীরেট একটা পিণ্ডের মতো এক সঙ্গে ছোটে তীক্ষ্নস্বরে গর্জন তোলে, স্কোয়্যারের লোহার রেলিং বরাবর দৌড়য়, কেউ-কেউ লাফ দিয়ে দিয়ে রেলিং টপকে যায়। নেভ্‌স্কি প্রস্পেক্টেও ক'জন সেপাই গুলী চালাচ্ছে। সামঘিনের চার পাশের ভীড় পালাতে শুরু করে, ওকে সঙ্গে নিয়েই। পেছনে কে একজন দৌড়ে আসতে সামঘিনের পিঠের ওপর মাথা দিয়ে প্রবল ধাক্কা মারে।

'লোকটা মরেই গেল—নিহত হলো,' মাটিতে পড়তে-পড়তে সামঘিনের মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। লোকে ওর ওপর দিয়েই চলে গেল, পাশ কাটিয়েও ছুটল। অনেকক্ষণ ধরে গড়িয়ে-গড়িয়ে আর হামাগুড়ি দিয়ে চলবার পর এক সময়ে ও আবার কোনোমতে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, আবার প্রাণপণে দৌড়োতে আরম্ভ করে।

*

জান্তব ভয়টাকে কাটিয়ে উঠে, ঘামে নেয়ে ও এসে দাঁড়াল একদল লোকের মাঝে। তারাও ওরই মত ভয়-বিহ্বল, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। সবাই একটা বন্ধ দরজায় গায়ে সেঁটে থাকে। সামঘিনের চোখ পিটপিট ক'রে, যে দৃশ্যটা বাইরে থেকে ওদের দিকে এগিয়ে রয়েছে সেটাকে না-দেখবার জন্যেই চোখের বোধহয় এই কসরৎ। মনে পড়ল স্কোয়্যার থেকে গারোখভাইয়া স্ট্রীটে যাবার রাস্তাটায় নৌ-সেনার পাহারা ছিল। দৌড়তে দৌড়তে তাদের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল ওর; বিশ্রীভাবে তারা চিৎকার করে উঠেছিল :

'কোন্ চুলোয় যাচ্ছ বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

একজন নৌ-সৈনিক হাত ধরে টেনে ওকে রাস্তার উল্টো দিকে ছুঁড়ে দেয়। জলদ-স্বরে দু-দুবার গর্জন করে ওঠে : 'এ্যাই বেটা—' চাপা গলায় বলে : 'পালাও! পালাও!'

স্মৃতিচারণে বাধা পড়ল। তেলতেলে ভিজে কোট-পরা একটা লোক এসে ওর গায়ের ওপর চেপে দাঁড়ায়। সামঘিন বাধ্য হয়ে নালিশ জানায়: 'সারা গা যে তোমার রক্তে ভেজা।'

'আমার নয়,' লোকটা বলে ওঠে। হাসির মতো ভাব করেই যেন সজোরে আবার বলে: 'বহু লোক ওরা মুছে ফেলল—শতখানেক তো বটেই, বেশীও হতে পারে। এর মানে কি, বলতে পার? মানেটা হলো গিয়ে—জনতার সঙ্গে যুদ্ধ, তাই না?'

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু সামঘিন হয় মনে-মনে ভেবেছিল বা হয়তো উত্তরটা দিয়েও ছিল .

'কোন ভুল-টুল নয়; এই এক পদ্ধতি।'

মনের মধ্যে চিমনির ধোঁওয়ার মতো কি একটা পাক খেয়ে ওঠে, শোঁ শোঁ শব্দ করে। স্মৃতিও তোলপাড় হয়। পা' দুটো ঠকঠক ক'রে কাঁপছে, চশমাটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। সব কিছুই যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী কদাকার। ওর ঠিক সামনে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাঁশুটে বাদামী রঙের একটা পুরোনো বাড়ি তাতে দুসারি রং-জ্বলা জানালা। জানলার শার্সীর ও'ধারে আরো সব অস্পষ্ট দাগ, মানুষের মুখের মতো যেন দেখায়। শহরটা গুন গুন করছে, সেই অবিরাম গুন গুন-ধ্বনির মধ্যে ফেটে-ওঠা কুড়ির পট পট শব্দ যেন শোনা যায়। লোকজন আবার রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে। ক্যাপের ওপর সাদা ক্রাউন-পরা ঘোড়-সওয়াররা জোর কদমে ছুটছে আর তীব্র চিৎকার করছে। সামঘিনের পেছনে গেটটা চি'-চি' শব্দ ক'রে খুলে গেল। একজন কালো গোঁফওয়ালা অশ্বারোহী সৈনিক ঘোড়ার ওপর নিজের শরীরটাকে একটু পিছু হটিয়ে নিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার লাগাম এমনভাবে চেপে ধরে যে, ঘোড়াটা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়ে দাঁত বার করে, লোকটার টুপী আরো উঁচুতে উঠে যায়। ঘোড়াটা অস্বাভাবিক চিৎকার করে, সামঘিনের মনে হয় চিৎকারটা যেন কর্কশীয় গাধার চিৎকারের মতো—করাতের ঘ্যাঁস্-ঘ্যাঁস্ আর নাক-ডাকার শব্দের একটা সংমিশ্রণ। জন্তুটার চিৎকারে লোকের ভীড় ভয় খায়, আবার তারা ছুটতে আরম্ভ করে। সামঘিনও দৌড়ায়। দেখে ওর সামনে ক'জন ছুটতে ছুটতে বরফের ওপর পড়ে যাচ্ছে, তাদের গা থেকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ময়কার ডান পাড় ধ'রে অন্ধের মতো হাঁটে পেভচেস্কি ব্রীজের দিকে। দেখে পাঁচজন ঘোড়-সওয়ার লোকভর্তি ব্রীজটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের বাঁকা তরোয়ালের দীপ্তি ওর চোখে পড়ল। দেখতে পেল এমনিই দু'টো ঝিলিক ঘোড়ার ওপর থেকে উঁচুর দিকে উঠে কালো পিণ্ডের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। একটা ঘোড়া নদীর ডান পাড়টার দিকে কোনো রকমে এগিয়ে এসেছে লোকে তুষার পিণ্ড ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে মারতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঘোড়াটা পা-আছড়ে তীব্র-বেগে মাথা নাড়ায়, চোয়ালের দু'পাশ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ে।

যে বাড়িটায় পুশকিন বাস করতেন, তাঁর জন্মও যে-বাড়িটায়, সেখানে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ—ঠিক যেন পুশকিনের লেখা "এক ধীবর আর ছোট্ট মাছের কাহিনী" থেকে বেরিয়ে এসেছে! বুড়োটার পাকাদাড়ি, গায়ে মেয়েছেলের তুলোর বাণ্ডি ব্লাউজ, মাথায় শতচ্ছিন্ন ক্যাপ। হাতে এক টুকরো ইঁট।

'ওরা বেশ মারটা খেল না?' ছোট-ছোট তীক্ষ্ন চোখ মটকে বুড়ো চেঁচায়। ইঁটটা ক'বার দেওয়ালে মেরে লোকের পায়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়। 'আর কত্তো গুবকই যে মার খেল! বাব্বাঃ! বাব্বাঃ!' বিস্ময়ের সুরেই জোরে-জোরে ব'লে ওঠে বৃদ্ধ।

লোকে ধীরে-ধীরে এখন পথ হাঁটছে। মুখ কালো ক'রে পেছন দিকে তাকাচ্ছে।

কেউ-কেউ ধাক্কা দিয়ে দৌড়চ্ছে। সকলেই যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে, হয়তো জানেই না কোথায় বা কেন যাচ্ছে। সাম্‌ঘিনেরও জানা নেই। ওর সামনে একজন মেয়ে, মাথায় হ্যাট নেই, আলুথালু চুল, টলতে টলতে পা ফেলছিল, গালে চেপে ধরেছে একটা রক্তে ভেজা রুমাল। সাম্‌ঘিন যখন তার পাশ কাটিয়ে যায়, মেয়েটা জিজ্ঞেস করে :

'আপনার কাছে কি একটা পরিষ্কার রুমাল হবে?'

মেয়েটার লাল লাল আঙুলের নীচ থেকে রক্ত গড়াচ্ছিল, কলারের নীচেও। তার ভয়-পাওয়া চোখে জল।

'না, নেই,' সাম্‌ঘিন হন্‌হন্‌ ক'রে পা চালায়। ক'পা গেছে কি-না-গেছে অমনি দেখে একটা লাল মাথা মস্ত লোক মেয়েটাকে শিশুর মতো পাঁজাকোলে ক'রে নিয়ে চলেছে। তিনজন লোক পাশ দিয় খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল, তারা একটা মরা বা আহত লোককে ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছিল; যে-মানুষটা মাথার দিকটা ধরেছিল তার মুখে সিগারেট। সাম্‌ঘিনের পেছনে কে-একজন ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে নিশ্বাস ফেলল ঠিক ঘোড়ার মতো।

'যদি আমাদের ক'টা রিভলভার থাকত—'

হঠাৎ সাম্‌ঘিনের মনে পড়ে যায় ঐতিহাসিক কজলভের কথাটা—স্বীয় ক্ষমতার নিষ্ঠুর প্রদর্শনী জারকে খুলতেই হবে।

'দাঁড়াও!'

চিৎকারটা এল তুরবোয়েভের কাছ থেকে। স্লেজে ব'সে চলেছে সে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথায় একটা জীর্ণ বিশ্রী ক্যাপ, সেটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে।

'ঢুকে পড়!' স্লেজ থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আদেশ জানায়। 'যাও '

একটা ঠিকানা ব'লে, সাম্‌ঘিনের হাতে কি সব কাগজ গুঁজে দেয়। টুপীটা সোজা ক'রে নিয়ে হাত নাড়ায়। তারপর পেছন-দিকে ফিরে চলে। মাথাটা শক্ত ক'রে চলে, যেন খুব ভয়, পাছে ওটা হারাতে হয়।

॥ ২৫ ॥

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। কদম ছাঁটের একটা লোক এসে সামঘিনকে দরজা খুলে দিল; লোকটার মুখখানা তাতারের মতো, তীক্ষ্ম চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। দরজা খুলতেই সামঘিন দেখে ওপাশে একটা অন্ধকার হলঘর।

'কি চান?' কড়া প্রশ্ন, সামঘিনকে তখনো ঢুকতে দেয়নি। 'উনি তো বাইরে গেছেন। ভেতরে আসুন। অপেক্ষা করতে হবে।'

লোকটা হাত দিয়ে বাঁ-দিকটা নির্দেশ করে। সামঘিনের মনে হয় এ-তাতার-মুখ যেন কোথায় দেখা, কণ্ঠস্বরও যেন পরিচিত। বিরাট অনাড়ম্বর ঘরটায় জনা পাঁচেক লোক, সব্বাই চুপচাপ, দেখে মনে হয় যেন ওরা কিছুক্ষণ পূর্বে ঝগড়া ক'রেছে। লম্বা মতো একজন, ফরাসী কায়দার দাড়ি মুখে, ঘরের এদিক থেকে ওদিক ত্রস্ত পদক্ষেপে পায়চারি করছে। এ-সেই লোক যাকে ও সকালে দেখেছিল, ইস্কুল বাড়িতে। একজন পরিষ্কার চাছা-ছোলা কামান কালো মতন লোক জানলায় ব'সে, মুখটা তার বুড়োর মতো। টেবিলের পাশে ডীভানের ওপর একজন গুটিসুটি মেরে ব'সে খুব তাড়াতাড়ি কি যেন লিখছে। ফ্রক-কোট আর সোনার চশমা পরা অধ্যাপক-চেহারা একটি লোক ঘর থেকে ধরে দুম্‌দুম্‌ ক'রে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে, বোধ হয় খুঁজছে কিছু। সে সামঘিনকে জিজ্ঞাসা করল :

'কিছু খাবেন কি?'

'হ্যাঁ', ক্লিষ্ট জবাব দেয়। হঠাৎ বড় খিদে পায় ওর, দুর্বলও বোধ হয়। ডাইনিং-রুমটা অন্ধকার। একটাই জানলা, তা-ও ইঁটের প্রাচীরের দিকে খোলে। মস্ত টেবিলের ওপর একটা সামোভার ফোঁস-ফোঁস করছে, পাশে রুটি, সসেজ আর চীজের প্লেট। দেওয়ালের পাশ দিয়ে মস্ত বড় একটা ভারী সাইড বোর্ড, দেখায় যেন ধনী ব্যবসায়ীর কবরের ওপর গ্র্যানাইটের কোন মনুমেণ্ট। সামঘিন খেতে খেতে ভাবে যে অ্যাপার্টমেণ্টটা ছ'তলার ওপর হলেও মনে হয় যেন মাটির নীচে। এখান-কার গোমড়া-মুখো লোকগুলো অত্যন্ত সাধারণ স্তরের, ইতিহাস যাদের বিবেচনাও ক'রে দেখে না, যাদের একপাশে শুধু ঝেঁটিয়েই রেখেছে।

'নিশ্চয়ই আমাকে এখন জিজ্ঞেস করবে কি কি দেখেছি—'

যা দেখেছে সে সব কঠোরভাবে ওদেরকে বলতে চায়, তাহলেই যদি ওরা ভয়ের সংকেত পায়। হ্যাঁ, সামঘিন তো এই চায়—চায় ওদের ভয় খাইয়ে দিতে। কিন্তু ওকে কেউ কিছু প্রশ্ন করল না! প্রায়ই ঘণ্টা বাজছে। তাতার দরজা খুলে দিতে দিতে অভব্যভাবে কাটা কাটা সুরে কথা বলছে, জিজ্ঞেস করছে : 'তাকে দেখেছেন কি?'

ডাইনিং-রুমটার চারদিক দেখতে দেখতে সামঘিনের মনে হয় সবাই যেন ওর দিকে তীক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। টেবিলে এসে ঠাণ্ডা চায়ে যখন চুমুক দিয়েছে তখন সামঘিন কোটের পকেটে রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে। তামাশা মনে হয়। খিদে মিটে গেছে। সামঘিন বড় ঘরটায় গিয়ে প্রবেশ করে, নতুন নতুন লোকের আগমন প্রত্যাশা করে। কিন্তু সেই একই সব পুরোনো লোক। নতুনের মধ্যে শুধু একজন, তার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত টার্কিশ-টাওয়েল দিয়ে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

'এই হলো ব্যাপার,' নবাগত বলছিল। তার গম্ভীর দৃষ্টি জানালা পেরিয়ে শীতের

সন্ধ্যার আকাশের নীলাভার দিকে। 'আমি ওকে তুলতে যাচ্ছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে—ধাম্‌, ধাম্‌! গুলী লাগল ওর চোয়ালে আর আমার?—এই যে এই জায়গাটার। নাঃ, বুঝতে পারি না। কোন্‌ অপরাধের জন্যে?'

সোনার চশমা-পরা লোকটা ওকে কিছু খেয়ে নিতে অনুরোধ করল, সেই সঙ্গে কিছু মদ পান আর বিশ্রাম।

'সারা জীবন এর থেকে বিশ্রাম নেই,' আহত লোকটা ব'লে ডাইনিংরুমে এল।

'খোদিন্কা থেকে তো আমরা বিশ্রাম পেয়েছি,' সামঘিন মনে মনে ভাবে। ক্রমে সাক্ষীর ভূমিকার চেয়ে বিচারকের ভূমিকাই যেন ওর মনে বড় হ'য়ে উঠেছে।

আবার ঘণ্টার শব্দ হয়। একটা চাপা কণ্ঠ হল্‌ঘরের মধ্যে গম্ভীর প্রশ্ন করে: 'ওই রিভলভারটা কিসের জন্যে এখন?'

'কতকগুলো ভবঘুরে—বোধহয় পুলিসের টিকটিকি হবে—এখানে অনবরত যাওয়া-আসা করছে—গ্যাপনের কথা শুধাচ্ছে—'

'সাভা মরোজভ!' সামঘিন অবাক হয়। নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। একজন দীর্ঘকায় লোক ভেতরে এল। চোয়ালের হাড় দুটো উ'চু উ'চু, লাল-লাল গোঁফ। গায়ে অদ্ভুত বোতামহীন জ্যাকেট, বাঁ-পাশটায় হুক দিয়ে দিয়ে আটকান, পায়ে হাই-বুট। লম্বা চুলের গোছা স্বত্ত্বেও তাকে ছদ্মবেশী সৈনিক ব'লেই মনে হয়। আঙুল দিয়ে চোখ ঘষতে ঘষতে বাঁ-দিকের দরজায় যায়। সামঘিন তুরবোয়েভের কাগজগুলো তার হাতে গুঁজে দিল, লোকটি একবার সামঘিনের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কোন কথা না ব'লে মরোজভের সঙ্গে দরজার দিকে চলে যায়। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে, তারপর চলে যাবে ব'লে ঠিক করল। কিন্তু হল-ঘরে গিয়ে ঢুকতেই দরজায় খুব জোর ধাক্কার শব্দ শোনে, বাইরের দিক থেকে ধাক্কা। ঘণ্টাটাও একনাগাড়ে বেজে চলেছে। মরোজভ দৌড়ে আসে, একটা হাত পকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা খুলে দেয়।

'কী? কে আপনি? গ্যাপন? আপনি কি গ্যাপন?' মরোজভ তাড়াতাড়ি একটু পাশে সরে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের মধ্যে মাথা নীচু ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা লোক। লোকটা ছোটখাট কিন্তু কোটটা শরীর আন্দাজে খুবই লম্বা আর অনেক বড়। টুপীটাও মাথার পক্ষে বেশ ঢল্‌ঢলে। শরীরটায় এক ঝট্‌কা মেরে আর হাতদুটো পেছন দিকে ছুঁড়ে লোকটা গা' থেকে কোটটা ঝেড়ে ফেলে দিলে। টুপীটা তার পাশে ফেলে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে:

'মার্টিন আছ এখানে? পেত্‌র?'

বড় ঘরটার সব লোকই তাকিয়ে থাকে। ঝুর্‌ঝুরে গোঁফওয়ালা লোকটা বিরক্তি আর অবাক হবার ভাবটা এতটুকুও না-লুকিয়ে কর্কশ-কণ্ঠে শুধায়:

'রুটেনবার্গ আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—কোথায় সে?'

'জানি না।'

গ্যাপনের সঙ্গে যে অদ্ভুত-দর্শন লোকটা এসেছিল সে মেঝের ওপর থেকে কোটটা কুড়িয়ে নিয়ে চেয়ারের ওপর রাখে। তারি ওপর চেপে ব'সে আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে ব'লে ওঠে: 'এক্ষুণি এসে পড়বে।'

গ্যাপন বড় ঘরটায় ছুটে চলে যায়, উত্তেজনায় জোরে-জোরে এদিক ওদিক পাইচারি করতে শুরু করে। পা'দুটো এমনভাবে বে'কে বে'কে যাচ্ছে যেন মনে হয় মচকানো পা। কালো মুখটা ক্ষণে ক্ষণে কে'পে উঠছে কিন্তু চোখ দু'টো স্থির। মাথার চুল ছোট ক'রে কাটা। দাড়িও খোঁচা খোঁচা ক'রে ছাঁটা। কাঁধের ওপর থেকে একটা এলোমেলো পুরনো জ্যাকেট ঝুলছে, আস্তিনদুটো এত লম্বা যে হাত

ঢেকে রয়েছে। ঘরের এদিক থেকে ওদিক ছ্বটতে-ছ্বটতে ঘড়্ঘড়ে গলায় বলে :

'কিছ্ব পান করবার মতো দাও তো। মদ হোক, জল হোক—যাই-হোক। নাঃ, সবকিছ্ব ধ্বংস হ'য়ে যায় নি। না, নাঃ! এক্ষ্বণি ওদেরকে লিখছি। ফ্বল্লেন!' পাদ্রী অভিযোগের স্বরে চিৎকার ক'রে ওঠে, হাত দোলাতে-দোলাতে, ছাদের দিকে জোরে-জোরে ঘ্বসি দেখায়। জ্যাকেটের হাতা কাঁধের ওপর নেমে আসে, ভাঁজের মধ্যে প'ড়ে ম্বখের অর্ধেকটা অদ্শ্য হ'য়ে যায়। 'ফ্বল্লন আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে!' চেঁচিয়ে উঠে গালের ওপর থেকে হাতাটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে। যে-ভঙ্গীতে লম্বাচুল পেছন দিকে সরিয়ে দিত ঠিক সেই ভঙ্গীই যেন। হাতটা সীসার মতো নীচে পড়ে যায়, শরীরের সঙ্গে লেপ্টে লম্বা হ'য়ে থাকে। আঙ্বলগ্বলো জ্যাকেটটা ছ্বঁয়ে ছ্বঁয়ে সেটাকে দলেম্বচড়ে ফেলে, অপর হাতটা পেন্ডু-লামের মতো দোলে। নক্সা-কাটা মেঝের ওপর ছোট ছোট পা ফেলে প্রায় সমস্ত ঘরটায় গোড়ালির ঠ্বক্ঠ্বক্ শব্দে ভরে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেয় জ্বতো-ঘষার শব্দ, ফোঁস্-ফোঁস্ আর হ্বহ্বঙ্কার ধ্বনি।—সামঘিনের মনে পড়ে যায় রান্না-ঘরের নানা বিরক্তিকর আওয়াজের কথা : মাংসের কিমা করা হচ্ছে, স্টোভের ওপরে সোঁসোঁ ক'রে কিছ্ব একটা ফ্বটছে, ভেজা কাঠের গ্বঁড়ি কট্কট্ আর ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ ক'রে জ্বলছে।

সোনার চশমা-পরা লোকটা গ্যাপনকে এক গেলাস মদ দেয় আর পাদ্রী সেটাকে লোভীর মতো গিলে ফেলে। আবার এদিক ওদিক ছোটাছ্বটি শ্বর্ব হয়। চক্রাকারে ঘ্বরতেও থাকে, বিড়বিড় ক'রে বলে :

'তোমরা মিথ্যাবাদী! শ্রমিকরা আমার সঙ্গেই আছে! তারা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। শেষ পর্যন্ত থাকবে আমার সঙ্গে। মিথ্যেবাদী! কিন্তু মার্টিন কই? কোথায়?'

সামঘিন হতবাক। লোকটাকে লক্ষ্য ক'রে ক'রে দেখে। ওর মনের মধ্যেও আশ্চর্য উন্মত্ত সব উপলব্ধি ভীড় ক'রে আসে। ক্যাশক না থাকায় 'পালক-ছাড়া' গ্যাপনকে আর পাদ্রীর মতো দেখায় না যে ঝড়ের আগে বাতাসের হঠাৎ-দম্কার কোনো এক পেছন-আঙিনায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের সামনে তড়বড় তড়বড় ক'রে নেচে চেঁচাচ্ছিল, যেন এক কচি মোরগ ছানা। এখন তার মাথার লম্বা চুল আর দাড়ি খাপছাড়া ভাবে ছেঁটে দেওয়ায় (—ব্যাঙ্গ-চিত্রের মতই দেখাচ্ছে—) ম্বখটা হ্যাঁচ্ড়ানো-গোছের দেখায়, কালো, প্রায় নীলচেই যেন। চোখের কালো তারা দ্ব'টি নীলাভ তেল্তেলে সাদা ডিমে যেন জমে আছে। মস্ত বড় খাড়া নাকটা সর্ব-সর্ব নাসারন্ধ্র সমেত বাঁদিকে বেঁকে গেছে। তাইতে মনে হচ্ছে ম্বখের একটা পাশ অন্য পাশ থেকে যেন অনেক বড়।

সামঘিন লক্ষ্য ক'রে দেখল যে গ্যাপন দ্ব'একবার না-থেমে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিয়েছে। প্রত্যেকবারই কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাতের দ্রুত ভঙ্গীতে নিতম্বে চাপড় মারছে। কখনো এত তীব্রভাবে শিহরণ খেলে যে দেখে মনে হ'য়েছে হয়তো আঙ্বল বোধহয় প্বড়িয়েই ফেলল। আবার তক্ষ্বণি সোজা হ'য়ে হাত নাড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছে :

'নট? অভিনয় করছে?' সামঘিনের মনে চিন্তার বিদ্যুত খেলে যায়।

না। গ্যাপনকে দেখে মনে হয় উন্মাদের সঙ্গেই ওর বোধহয় বেশী মিল। ক্রমে ক্রমে সেটা আরও পরিষ্কার ফ্বটে উঠল। মনে হচ্ছিল এই ঘরে পাদ্রী ছাড়া বোধহয় আর কেউই নেই। সকলেই চুপচাপ, নড়ছেও না। গোঁফ-ওয়ালা লোকটা দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সেপাই। তার বিকশিত দন্তপাটির মধ্যে একটা সিগারেট গোঁজা, কিন্তু আগ্বন জ্বালান হয়নি তাতে। ম্বখের ভঙ্গী

এমন যেন কাউকে কামড়াবে। মুখটায় সিগারেট গুঁজেছে বোধহয় যাতে পাদ্রীর ওপর চেঁচিয়ে ওঠাটা বন্ধ থাকে। তার পাশে চেয়ারে বসেছে মরোজভ। শক্ত সমর্থ দৃঢ় লোকটা, যেন লোহার পাত। এমন ভঙ্গীতে বসে আছে যেন দরকার হ'লে এক্ষুণি লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে পালাবে। সামঘিন শুনতে পায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে মরোজভ বলছে : 'একজন নেতা, য়্যাঁ?' তার তাতার মুখটায় দ্রুত বিষণ্ণ হাসি খেলে যায়।

গোঁফওয়ালা লোকটা দাঁতের মধ্যে যেন কথা লোফালুফি করে :

'অপরাধ নিয়েছেন—কিন্তু বিদ্বেষ নেই; অভিযোগ জানাচ্ছেন—কিন্তু ক্রোধ নেই।'

সামঘিন ভুলে গিয়েছিল গ্যাপন একজন নেতা। কিন্তু এখন এই মৃদু কথার শব্দে ওর মনে প'ড়ে যায় ডজন-ডজন মৃতদেহের কথা, মনে পড়ে রক্তগঙ্গায় স্নাত মানুষদের সেই দৃশ্য. আর্ত-চিৎকার-রত সেই স্টোকার।

'এই মুহূর্তে আমার লুকনো উচিত; ওরা আমায় খুঁজছে,' গ্যাপন থেমে-থেমে জানায়। লোকগুলোকে স্থির দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করে : 'কোথায় লুকিয়ে রাখবে?'

রাগত সুরে গম্ভীর গলায় মরোজভ তাকে এক ধমক দেয়। কিছু করার আগে নিজের চেহারার দিকে মন দিক্—চুল কাটুক, মুখহাত ধুয়ে নিক। একমিনিট পরে ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসেছে গ্যাপন। বুড়োটে মুখওয়ালা লোকটা তার চুল কাটতে আরম্ভ করে। কাঁচিটায় হয়তো বিশেষ ধার ছিল না, বা লোকটা হয়তো চুল কাটতে পারে না। মাঝে-মাঝে গ্যাপনের উঃ-আঃ নালিশ কানে আসে :

'আঃ! কি করছ?'

'আর কিছুক্ষণ যে এ সইতেই হবে,' মরোজভ ব'লে ওঠে, কণ্ঠস্বর রুক্ষ। মুখে নানারকম খুঁত্‌খুঁতির দাগ।

অবশেষে পাদ্রীর চুল কাটা শেষ হয়। মুখ হাত-পা ধুতে যায়। দর্শকেরা নীরবে ছড়িয়ে পড়ে। অপ্রস্তুত ভাবেই যেন।

'কি-রকম বিহ্বল হ'য়ে পড়েছে ও!' ফরাসী-দাড়িওয়ালা লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে। না-বলাই বোধহয় উচিত ছিল, সে-কথা মনে হ'তেই জানলার দিকে তাকায়। কাঁচের ওপর কপাল চেপে ধ'রে জানালার ফাঁকে যে ঘন-অন্ধকার পর্দার মতো ঝুলছে সেই-দিকে নীরবে চেয়ে থাকে।

ঘণ্টাটা আরো ঘন-ঘন আর অনেক জোরে-জোরে বেজে ওঠে। জ্যাকেটের ঝুল পকেটে হাত ঢুকিয়ে মরোজভ হল্‌ঘরে দৌড়ে যায়। ক্লিম শুনতে পায় উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। কথায় কথা আটকে যাচ্ছে,—শ'য়ে-শ'য়ে শ্রমিক কিভাবে নিহত হয়েছে তারই বৃত্তান্ত। গ্যাপনও ব'লে মারা গেছে।

'পুলিশ এক্ষুণি ওর দেহ নিয়ে এসেছে...'

'রাবিশ!' মরোজভ চেঁচিয়ে ওঠে। মূর্ছনা-তোলা গলা, সতেজ স্বর। 'দশ মিনিট আগে ওই—ওই দেহ—এখানেই ছিল।'

গ্যাপনের সঙ্গে যে-লোকটা এসেছিল সে-ও সায় দিল : 'হ্যাঁ, সত্যি।'

গলা নীচু ক'রে, গঞ্জনার সুরেই যেন, ওদের মনে করিয়ে দেয় :

'ফাদারকে শ্রমিকেরা খুব ভালোবাসে—হ্যাঁ, খুবই ভালোবাসে।'

অন্যেরা আরেকটা গুজব নিয়ে এসেছে : গ্যাপন জীবিত আছে; পুলিশ তাকে খুঁজছে; তাকে ধরবার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা হ'য়েছে।

'হবে!' মরোজভ বলে। যোগও করে : 'বেশী টাকা নিশ্চয়ই নয়।'

শিল্পপতিটির পরিহাস-বোধের উৎস খোঁজার বৃথাই চেষ্টা করল ক্লিম। কালো-

দাড়িওয়ালা একজন লম্বা লোক ভেতরে এল। লাল দাড়ির মানুষটাকে সঙ্গে ক'রে একটা কোণায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে ফিসফিস ক'রে তারা কথা বলে। দাড়িওয়ালা লোকটা বিতৃষ্ণার গলায় চেঁচিয়ে ওঠে: 'কক্ষণো না! কোন রূপকথা না! কিছুতেই না!'

গ্যাপন দৌড়ে আসে। চুলে ঠিকমত ছাঁট পড়ায় আর ধোওয়ামোছা ক'রে তকতকে হ'য়ে ওটায় এখন ওকে জিপসীর মতো দেখাচ্ছে। ঘরের সকলের দিকে দৃষ্টি হেনে, আয়নায় নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে নিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে শাসানির ভঙ্গীতে ঘোষণা করে:

'এই তো শেষ নয়! শ্রমিকরা আছে আমার সঙ্গে!'

বেশ শক্তিমান চেহারার একটা লোক এল। তার দৃষ্টি সন্ধানী আর চলাফেরা মন্থর, দেখে সাবধানীই মনে হয়।

'মার্টিন!' গ্যাপন দৌড়ে তার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: 'বস! লিখে ফেল! তাড়াতাড়ি করতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি!'

কয়েক মিনিট পরে মার্টিন টেবিলের ধারে বসে লিখে চলে। গ্যাপন ঘরে পায়চারি করতে করতে হাতদুটো ছুঁড়ে-ছুঁড়ে চিৎকার করে:

'"রক্তের রাখীবন্ধনে গ্রথিত ভ্রাতৃগণ," যা বলি তাই লেখ: "রক্তের রাখীবন্ধনে গ্রথিত, হ্যাঁ! "আমাদের এখন আর জার নাই!"' থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে: '"আমাদের", না "তোমাদের"?...লেখ "তোমাদের নাই"।'

'"এখন আর"—শব্দ দুটো অনাবশ্যক', মাথা না তুলে লেখক বিড়বিড় ক'রে ওঠে।

'"যে বুলেটে তোমাদের হাজার হাজার সাথী ও স্ত্রী-পুত্রের মরণ ঘটিয়েছে সেই বুলেটে তিনিও নিহত"—হ্যাঁ!'

পাদ্রী ঝোঁক দিয়ে-দিয়ে কথাগুলো বলে, অনেকক্ষণ থেমে থেমে। কথাগুলো অনেকবার ক'রে উচ্চারণ করে, বহু চেষ্টা ক'রে যেন সেগুলো খুঁজে পাচ্ছে। শব্দ ক'রে ক'রে শ্বাস টানে, নীলাভ গালে হাত ঘষে। মাথাটা এমনভাবে দোলায় যেন লম্বা চুলের অভ্যেসটা লেগে রয়েছে, প্রতিবার মাথা দুলিয়ে উঠেই হাত দিয়ে কদম ছাঁট চুলে ঠাওর ক'রে নেয়। বলতে বলতে প্রায়ই থামে, নীরবে মেঝের দিকে চেয়ে চিন্তা করে। ধীরস্থির মার্টিন ক্রমশ লেখাব গতি বাড়িয়ে দেয়। তাই দেখে ক্লিমের মনে হয় যে ও বোধহয় গ্যাপনের বক্তব্য মেনে চলছে না।

'লেখ!' গ্যাপন সজোরে মাটিতে পা ঠুকে আদেশ দেয়। '"এবং এখন সত্যকে জনসাধারণের রক্তে ভাসিয়ে দিলেন যে-জার, সেই জারকে, আমি, জর্জি গ্যাপন, প্রিস্ট, ভগবৎ-দত্ত ক্ষমতার অধিকারে সর্বতোভাবে শাপ দিচ্ছি, এবং তাঁকে আমাদের গির্জা থেকে তাড়াচ্ছি "।'

'উহুঁ, উহুঁ, বোকামী করো না!' মার্টিন বলে ওঠে। ডিকটেশন যে দিল তার দিকে বিন্দুমাত্র না-তাকিয়ে লিখেই যায়।

'কেন?...লেখ তুমি!' পাদ্রী আবার সজোরে পা-ঠুকে হুকুম দেয়। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে হাত দু'টোকে ঘাড়ের ওপরে জড়ো করে। 'আমার অধিকার আছে।' আগের চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে। 'আমার ভাষা ওরা অনেক ভাল বুঝতে পারে কি ভাবে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা' আমি জানি। আর তোমরা, তোমরা বুদ্ধি-জীবীরা, যখন শুরু কর—'

হাতটাকে নাড়ায়। মুখ লাল হ'য়ে ওঠে, মিনিট-খানেকের জন্যে সত্যি সত্যি বোধহয় বিদ্বেষে ভরেও ওঠে, চোখের তারা দুটো এমনভাবে নড়ে যেন সাদার মধ্যেই স্ফীত হ'য়ে মিশে যাবে।

'না, না! রূপ-কথা-টথা নয়,' ঝুরেঝুরে গোঁফ-ওয়ালা লোকটা তর্জন ক'রে ওঠে।

'"তোমাদের রক্ত দ্বারা তোমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের অধিকার ক্রয় ক'রে নিয়েছ",' গ্যাপন বলে লিখতে।

ঝুরো-গোঁফওয়ালা আর কালো দাড়ি-ওয়ালা লোক দুটো ওর দিকে এগিয়ে আসে, আগের জন অভদ্রভাবে মন্তব্য ক'রে ওঠে:

'গুজব রটেছে যে আপনি নিহত হয়েছেন বা গ্রেপ্তার হ'য়েছেন, আরো কত কি। সবই ভুল!'

'যেমন সব মিথ্যাই—' কালোদাড়িওয়ালা লোকটা কাশতে কাশতে টিপ্পনী কাটে। এখন' ইকনমিক সোসাইটিতে অনেক লোক জড়ো হ'য়েছে। সেখানে গিয়ে নিজেকে দেখিয়ে আসা উচিত।'

'কেন?' গ্যাপন জানতে চায়: 'ওই লোকগুলো তো বুদ্ধিজীবী। 'ইকনমিক সোসাইটি' কি তা' আমি জানি—বুদ্ধিজীবীরা,' গলা তুলে বলে: 'আমি আছি শ্রমিকদের সঙ্গে!'

'সেখানে শ্রমিকরাও আছে,' কালোদাড়ির লোকটা বলে।

ক্লিম বুঝতে পারে কথাটা পাদ্রীর মনঃপুত হলো না। একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে পড়েছে সে। মুখটা ঝুঁকিয়ে গ্যাপন রুটেনবার্গের দিকে ঝুঁকে বিড়বিড় ক'রে ওঠে।

ওর দিকে না তাকিয়েই রুটেনবার্গ বলে: 'আপনার নিশ্চয়ই যাওয়া দরকার।'

'দরকার?'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই যাবেন...'

জ্যাকেটের হাতাদুটো সোজা ক'রে নিয়ে, মাথা দুলিয়ে, গ্যাপন আয়নার দিকে একবার তাকায়। সাধারণভাবে প্রশ্ন করে: 'আমাকে ওরা চিনবে? বিশ্বাস করবে? জান তো আমাকে ওরা দেখেই নি...'

'বিশ্বাস করবে ওরা,' গোঁফওয়ালা লোকটা আশ্বাস দেয়। 'চলুন।'

অনেকক্ষণ থেকেই সামঘিনের মনে হচ্ছিল এ-জায়গা তো ওর নয়, কখন ফেরবার সময় হ'য়ে গেছে। কিন্তু নানা কারণে যেতে পরাছিল না,—কৌতূহল, অসাড় দুর্বল-ভাব, রাস্তায় একা-একা পথ চলবার অনিচ্ছা এবং কিছুটা ভীতিও। এখন রাস্তায় ওরা চারজন তো হবে এই ভেবে হলঘরে গিয়ে ঢোকে। কোট পরতে পরতে শোনে মরোজভ বলছে:

'ওরা মুচড়ে দেবে।'

'নিজেরটা সামলে রাখবেন, ঝুরো-গোঁফের লোকটা সাবধান ক'রে দেয়।

দরজা খুলে সামঘিন ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামে। মনে-মনে ভেবেছিল ওরা এসে ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। কিন্তু রাস্তার দরজায় এসে যখন পৌঁছুল শুধু তখনি কানে গেল ওপরের সিঁড়িতে পদশব্দ।...রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই দেখে চমৎকার ঘোড়ায় জোড়া একটা স্লেজ দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছে।

'ভাড়া হয়ে আছে,' কোচোয়ান বলে। নরম গলায় যোগ করে: 'প্রাইভেট।'

স্লেজের পেছনটায় নজর ক'রে সামঘিন দেখে কোনো নাম্বার-প্লেটই নেই। তাছাড়া গাড়ীটায় চারজন বসতেও পারে না।

'দূর হোক গে, চলা যাক!' হিমেল অন্ধকারের মধ্যে ও নেমে পড়ে। মিনিট-খানেক পর পাশ দিয়ে একটা কালো ঘোড়া দৌড়ে যায়, টগ্‌বগে পায়ে ছুটতে-ছুটতে। স্লেজে শুধু দু'জন। সামঘিন ক্লিষ্ট হাসি হাসে।



অন্ধকারটা যেন অস্বাভাবিকভাবে ঘন। এত ভারী যে ওর কাঁধ ঝুলে পড়ল তার হিমেল চাপে। শহর নিস্তব্ধ। আলোহীন বাড়িগুলো প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে, প্রাণহীন। শুধু কয়েকটি বরফ জমা জানলার শার্সি থেকে মোমবাতির ভীরু আলোর স্পন্দন দেখা যায়। আলোর অভাবেই বোধহয় নিস্তব্ধতা এমন অদ্ভুত প্রাণময় হয়ে উঠেছে, এমন আঁটো-সাঁটো, যেন ঢাকের চামড়া। বহুদূর থেকে গুলীর আওয়াজ ভেসে এল। সামঘিনের মনের মধ্যে দিয়ে আবার সেই বিসদৃশ্য তুলনাটা ঝিলিক দিয়ে যায় : বসন্তকাল—টস্‌টসে ফল ফাটছে। নিঃশব্দে পা ফেলে চলবার বৃথাই চেষ্টা করে ও। ওর হাঁটু দুটো ঠক্-ঠক্ ক'রে কাঁপে, বরফের ওপর সরসর শব্দ হয়। বাড়িগুলোর কালো কালো ছায়াগুলো সব এক রকম হয়ে উঠতে থাকে। তাদের ইঁটের খট্‌খট্ শব্দ যেন এই নিঃসঙ্গ মানুষটার পদশব্দকে অনুসরণ ক'রে তারই সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে কোন খালের তল দিয়ে অতি দ্রুত চলেছে। ওর সবটুকু চলার মধ্যেই এ রয়েছে, ওর লক্ষ্যস্থলের এতটুকু ধারে-কাছে পেঁৗছুতে কিন্তু পারছে না।...কোনো গেটে কোনো দরোয়ানের ভালুক-সদৃশ মূর্তি নেই. কোনো পুলিশ নেই. কোনো পথচারিও নেই। সর্বব্যাপী অন্ধকারের হিমার্ততা ক্রমশ ঘন হয়ে আসে, আসছে আরো ব্যাপক হয়ে।

ভয়কে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করে সামঘিন। রিভলবার হাতে মরোজভের মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গ্যাপনের ওপর সোজাসুজি বিদ্বেষের ভাবটা না থাকলে মূর্তিটা হাস্যকরই দেখাত।

'ব্যবসায়ী মানুষ, যে লালবাতি জ্বালায় তাকে ঘৃণা করে।'

ভাববার জন্যেও অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আঁটো-সাঁটো নিস্তব্ধতাকে কান পেতে শুনতে বাধা দিচ্ছে চিন্তা। ভয়ঙ্কর দিনটির সমগ্র চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, সব কলরবের সমস্ত শব্দ, সমস্ত বিলাপ, আর্তধ্বনি, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে আছে। আর ডুবে আছে মানুষকে পাগল ক'রে তুলবার মতো সাঙ্ঘাতিক সব বিভীষিকার পুনরুত্থানের অনিষ্ট ইচ্ছা।

'পাদ্রীটি অতি সাধারণ। সব চাক্ষুষ সাক্ষী—লেখক, সৈনিক, শ্রমিক, হত্যাকারী, বিজিত, দর্শক—সবাই সাধারণ, দীন-দরিদ্র,' ক্লিম সিদ্ধান্ত ক'রে নেয়। যন্ত্রণাকর ভয় থেকে মুক্তি খোঁজে, ভয়টা ওকে যেন ভয়ানক অপমানিত করছে।

তবুও নেভস্কি-প্রসপেক্টে এসে ভয়টা আরো তীব্র হয়ে উঠল। এখানে রাস্তা অনেক চওড়া, অন্য জায়গার থেকে অনেক বেশী। তবু কাক-পক্ষী নেই, বাড়িগুলো নিঃস্প্রাণ, মরার মতো পড়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যে রাস্তাটা যেন গলা লম্বা ক'রে ঢুকে গেছে, যেন পাহাড়ের মধ্যে কোন গিরিপথ। অনেক দূরে নীচের দিকে, যেখানে মাটি পাবার কথা, সেখানে অবলুপ্ত অন্ধকারের ঠাণ্ডা মাংসের ওপর ছোট-ছোট ঝাপসা আলোর দগদগে ক্ষত আঘাত আর রক্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই আলোগুলোয় কিছুই পরিষ্কার হয়নি। রাস্তাটাকেই শুধু অসীমের দিকে গভীর ক'রে তুলেছে; ওৎ পেতে রেখেছে যেন।

ক্ষণেকের জন্য সামঘিন দাঁড়ায়। ধীরে-ধীরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে, কপালের দুটো পাশে অজস্র ঘামের বিন্দু। খানিক দূর এসে দেখল আলোগুলো রাস্তার বাতি, গেটের কাছে হয় পাশ-পথে নয়তো মাথার ওপরে ঝোলান।

কতকগুলো অস্পষ্টভাবে জ্বলছে, কোন কাজেরই যে নয় সেই কথাটাই যেন ব্যক্ত করছে। তাছাড়া, হয়তো, নীচ দিয়ে যারা যাবে তাদেরকে গুলী ক'রে মারাটা সহজ ক'রে তুলছে।

মাঝে মাঝে চোরের মতো পা টিপে-টিপে, প্রায় নিঃশব্দে, জলের ভেতরে মাছের মতো, কালো-কালো ছোট মনুষ্য মূর্তি দ্রুত চরণে চলে যাচ্ছে। সামনে কোথাও জানালার ওপর কে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ ক'রে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা কাঁচের ঝনঝন শব্দ হয়, লোহার ওপরে কাঁচ পড়তেই শব্দটা উঠছে। ক্যাঁচ ক'রে একটা গেট খুলল, দড়াম ক'রে বন্ধ হলো। দেখল খুব তাড়াতাড়ি ওর দিকে কে যেন হেঁটে আসছে। আবার হঠাৎ সে মুহূর্তেই কোথাই অদৃশ্য হয়ে গেল, যেন, মৃত্তিকা তাকে গ্রাস ক'রে ফেলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেছনের একটা গলির মাথা থেকে পাঁচজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল, তারা যেন দড়ির ফাঁসে আটকানো। তাদেরই একজন ভয়-বিহ্বল গলায় চেঁচিয়ে ওঠে :

'দুল্‌কি চালে!'

একের পর এক সমরেখায় ওরা ছুটে চলে যায়। দুটো গুলীর শব্দ হয়, তিনটে, তারপরে একটা। একটা মানুষের তীক্ষ্ন বুকফাটা কান্না ভেসে আসে, যেন কাস্পীয়ান সাগরের ওপরে সী-গল পাখীদের ক্রন্দন। সামঘিন থমকে দাঁড়ায়। নিস্তব্ধতাকে সময় দেয় গা-ঝারা দিয়ে ওঠার জন্য। আবার চলতে শুরু করে। নেভ্‌স্কি-প্রসপেক্টে কোন সৈন্য নেই—বিশ্বাস করা যায় না। বোধহয় থাঁদা নাক ধূসর মানুষগুলো বাড়ির উঠনে-উঠনে লুকিয়ে আছে। আর সেই সব বাড়ির সামনে রাস্তার বাতি জ্বলছে। হ্যাঁ, থাঁদা-নাক মানুষগুলো নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে, এইসব অঙ্গনে পাথর-বাঁধান ই'দারার মধ্যে। ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপছে, হয়তো বা ভয়েও। শহরের সীমার বাইরে লোকেরা হয়তো ইতিমধ্যেই গ্যাপনের আহ্বান খুঁটিয়ে পড়ছে :

'রক্তের রাখী বন্ধনে গ্রথিত ভ্রাতৃগণ!'

এই কথাগুলোকে অন্তঃস্থ করছে বাপ-মা, ভাই-বোন, কমরেড্‌ ফি'য়াসে—নিহত বা আহতদের সব আত্মজনেরাই। হয়তো কাল শহরতলী আবার শহরে মিছিল গড়বে। কিন্তু সে মিছিল হবে আরও ঘন সন্নিবদ্ধ, আরও দৃঢ়,—হয়তো তা এগিয়ে যাবে মৃত্যুর গহ্বরে। "শ্রমিকের কিছুই হারাবার নেই শুধু শৃঙ্খল ছাড়া।"

কোথাও আয়েসী বাড়ির আরাম আর উষ্ণতার মাঝে রয়েছে মন্ত্রীরা, সামরিক ব্যক্তিরা, সরকারী আমলারা। আর অন্য কোন বাড়িতে পাগলের মতো এলোমেলো চিৎকাররত লেখক, জননেতা, মানবদরদীর দল. চড়ুইয়ের মতো পরস্পরের দিকে ফরফর ক'রে উড়ে বেড়াচ্ছে—যাদের অক্ষমতা আজকের এই দিন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ ক'রে দিয়েছে।

'নেতৃবৃন্দ!' মনে মনে সামঘিন গর্জন ক'রে ওঠে। কিন্তু সেই চিৎকারে ওর নিজের অন্তরের বাইরেও শুনতে পেল। এমনকি পেছন দিকে মুখও ফেরাল। 'আর জার? সম্ভব নয় যে সেই মনুষ্যেতরটি চুপচাপ বসে চা খাচ্ছেন—'

সামঘিন কল্পনায় দেখে জার অস্থিরভাবে গ্যাপনের মতোই এদিক-ওদিক পায়চারি করছে. যে অঘটন ঘটে গেল তারই বিভীষিকায় সে অস্থির।...

হোটেলটা কাছে এসে পড়েছে। ওর মনের ভীতি এখন স্তিমিত। সারাদিন যা অনুভব করেছে তারজন্যে মনের মধ্যে আত্ম-বিদ্বেষ জেগে উঠছে।

'জীবন অসম্ভব! ভয়ানক বৈচিত্র্যহীন, ছেদহীন নাটক হয়ে পড়েছে।' হোটেলের প্রবেশ-পথ বন্ধ আর অন্ধকার। শার্সিতে ফুটে আছে পোর্টারের মোটা মুখ।

তালা ক্লিক ক'রে খোলে, সামান্য আওয়াজ ক'রে পাল্লা খুলে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে সামঘিনের নাকে-মুখে এসে লাগে আহার্যের উষ্ণ সুগন্ধ।

'শয়তানেরা কেইনকে খুঁচিয়ে তুলছে, জানালা-টানালা ভেঙে নাশ করল।—' পোর্টারের কণ্ঠে নালিশ। সাধাসিধে ওভার-কোট আর হ্যাট্ পরা, অন্য দিনের চক্চকে পোশাকটি আর নেই।

জিজ্ঞাসার সুরে বলে: 'লোকে বলে নয় হাজার মরেছে।' সামঘিনের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, বলে: 'দুনিয়াটা দিনে-দিনে কী যে হচ্ছে! নয় হাজার...'

ক্লিম যেই জানতে চায় মস্কোতে গাড়ী চলছে তো, অমনি পোর্টার ওর দিকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। প্রশ্ন তুলে জবাব দেয়·

'রেলের লোক স্ট্রাইক করবে ভাবেন নাকি?'

সিঁড়ির মাথায় ফরমায়েস-খাটার ছোঁড়ার সঙ্গে দেখা। সামঘিনকে ফিস্‌ফিস ক'রে জানাল:

'মিস্টার সামঘিন, ওই পোর্টারের সঙ্গে কথা বলবেন না। খুব পাজী ও, পুলিশের চর।'

ছেলেটাকে সামঘিন বহুদিন থেকে জানে। কাজের লোক, চিরদিনই হাসি-খুশী, ফুর্তিবাজ,--আজ সকালেও তাই ছিল। কিন্তু এখন ওর গোলগাল মুখটা অদ্ভুত শুকনো। ছুঁচলো দেখাচ্ছে, যেন অসুস্থ। অপরিচিত দৃষ্টিতে সামঘিনের দিকে চায়, চাপা গলায় বলে·

'ওই ব্যাটা কুকুরের বাচ্চা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। গুলী চলছে দমাদম, কশাকরা আসছে তেড়ে, মানুষজনকে মেরেপিটে শেষ করছে। লোকগুলো আমাদের এখানে দৌড়ে এসে আশ্রয় খুঁজছিল, আর তা দরজা বন্ধ ক'রে দাঁত বের ক'রে হাসল, ব্যাটা মোটা পিপে।'

ব্যাগ গুছনোর কাজে সামঘিনকে সাহায্য করতে করতে খুব উত্তেজনায় চাপা গলায় বলে:

'আর যারা ম'লো তাদের অপরাধটা কিসের? মজুরদের ওরা বললেই পারত: এই যাস্ না। কিন্তু যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়: ওরা যাবে আর তোমরা ধরে-ধরে মেরো।'

'হ্যাঁ,' ক্লিম অজ্ঞাতেই বলে, বিস্ময়করভাবে: 'কথাগুলো তাই ছিল বটে।'

ছোঁড়াটা হাঁটু-গেড়ে বসে তাড়াতাড়ি ব্যাগ ভরছিল। কিন্তু কথাটা কানে যেতেই ছিটকে উঠে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড ক্লিমের দিকে চেয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করল। আবার হাঁটুর ওপর বসে বিড়বিড় ক'রে ওঠে:

'ও, বুঝেছি।' ব্যাগের ওপরে হাঁটুটা জোরে চেপে অশ্লীল খিস্তি ক'রে ওঠে। বলে· 'তার মানে, এই—'

কিন্তু ওর কথায় সামঘিনের মোটেই কান নেই। ভাবছিল যে-কোনো মুহূর্তে আবার এই জমাট-আঁধারে বন্দুকের মুখর আওয়াজ হয়তো শুনতে হবে। হোটেলের গাড়ীতে ছিল দুজন নীরব সঙ্গী, ফার-কলারে সযত্নে মুখ-ঢাকা, কি হচ্ছে না-হচ্ছে সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য নেই, দেখা বা শোনা কিছুই যেন ঘটেনি। সামঘিন গাড়ির দরজার কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় আঁধারটার কায়া আছে, ওজন আছে। শহরের যত ধূলিকণা, আজকের যত প্রবাহিত রক্ত, সব ঘন হয়ে জমাট হয়ে তৈরি হয়েছে ওই কৃষ্ণ-আঁধার। মানুষের মনের নিষ্ঠুরতা আর উন্মত্ততার ঘনীভূত রূপ। রেলকামরায় গোটা অনিদ্র রাতটায় ওর মনের মধ্যে শুধু এই নিষ্ঠুরতা আর উন্মত্ততার কথাই পাক খায়।

*

বাড়িতে ভারভারা ওকে প্রশ্নবানে জর্জরিত ক'রে তোলে। কৌতূহল স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত উঠেছে, ক্রোধের সীমানায় এসে ঠেকেছে। সামঘিনকে নতুন বই পেল যেন, পাতার পর পাতার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উল্টে যাচ্ছে কোন্ পৃষ্ঠা সবচেয়ে লোমহর্ষক, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর? সেই সন্ধ্যাতেই তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ওকে বলতে রাজী করালো, সামঘিন কি দেখেছে না-দেখেছে সব বলবে। ও নিজেও বলবার জন্যে ছটফট করছিল। বুঝতে পেরেছিল সীরিয়াস কোনো রিপোর্টের খসড়ার মতোই এ বর্ণনা ওর কাজেই আসবে।

সেই সন্ধ্যায় প্রায় কুড়ি জন শ্রোতা এসে জমল। এল বিখ্যাত স্থূল বপু কবিপ্রবর যিনি জুডাসের ওপর আর ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তানের তাস খেলার কবিতা লিখেছেন; এসেছে সাহিত্যের অধ্যাপক আর কবি এভজন্‌ভ্,—ছোটো-খাটো মানুষ, কালো-কালো দাঁত. তার হলুদ মুখে ঘৃণার হাসি। ব্রাঘিন নামে এসেছে একজন, —সেও ছোট্টখাট্টো মানুষ, গোগলের কায়দায় চুল ছাঁটা, সারাক্ষণ বকর্-বকর্ করছে. মানুষের সব কথা যেন তার নখদর্পনে, এর হাল-চাল বিশ্রী লাগে সামঘিনের—ও যা হতে চেয়েছিল. বা, বছর-পাঁচেক আগে যা ছিল সেই চেহারাটাই যেন। শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। ছ'জন মেয়েও এসেছে। সামঘিন ভারভারার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুদবোভাকেই চিনতে পারে—রঙ-কারখানার মালিকের বিধবা, নয়না-ভিরাম দেহবল্লরী। মেয়েদের ওপর ভারভারার মনোভাব খুব খুঁৎ-খুঁতে, ছিদ্রান্বেষী। দিন-দিন ও বড় সাধারণ হয়ে উঠছে, সামঘিন ভারভাবার মনোভাবটার এই কারণ খুঁজে নেয়।

স্ত্রীর সব বন্ধুদের "তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ" বলেই ভাবতে অভ্যস্ত ক্লিম,- শ্রেণীবিভাগটা অবশ্য ভ্যাসতভের। কিন্তু কিছু দিন থেকে ওর মনের মধ্যে এরা হিংসা জাগিয়ে তুলছে। যে হিংসা আসে সব মানুষকে দেখেই অকৃতকার্য ব্যক্তির মনে; ওরা কেমন নিজেদেব "বাক্-রীতির" মধ্যে সুসম্বন্ধ যেন নীড়ের মধ্যে স্টার্লিঙ পাখীর ছানা। ওদের বাক্-বৈদগ্ধ্য সামঘিনের কানে ক্রমশঃ বিরক্তির চিৎকার হয়ে বাজে। কোনো কোনো পুরানো গানের অস্ফুট সুর মানুষের জীবনে অমন জবরদস্তির দাবী যেন নিয়ে হাজির হয়. যেন তাকেও বিশ্বস্তভাবে স্মরণ করা হোক। এরাও যেন এই। এই লোকগুলোও অন্যদের বই পড়ে ওরই মতো,—বইগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বার-বড়াই করে। দুদরোভা আর এভজনভ তো এমন বহু লেখককের নাম করে যাদের নামই শোনে নি সামঘিন. শুনতেও চায় না।

'লিয়ন্সের ইরেনিয়ুস.' 'হালিকারনাসাসের ডায়োনিসিয়াস' 'ফারর্ দ্য'অলিভিয়ে', 'শ্যুরে'—সামঘিন শুনল। আর শুনল ভয়ানক সব ওজনদার কথা : প্রেম, মৃত্যু. অলৌকিকত্ব, নৈবাজ্যবাদ। নিজেকে অপ্রস্তুত মনে হয়। বিরক্তিও লাগে। বয়সে ওর চেয়ে ছোট এরা, বুদ্ধিবৃত্তিতেও নিম্নস্তরের। ধনী ফ্যাশনদুরস্ত বারাঙ্গনারাও যা জানে, ও তা জানে না আর এই জন্যেই যেন ওকে তারা দয়া ক'রে অর্ধ-অসভ্য বলবার অধিকার পেয়ে গেছে।

সেই সন্ধ্যায় কিন্তু ওরা সামঘিনের দিকে লোভীর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল, যেমন দৃষ্টি ভোজন-রসিকেরা সুখাদ্যের প্লেটের ওপর বর্ষণ করে। চুপচাপ খুব স্ফীত বেতনের প্রফেসর এসে যেন লেকচার ঝাড়ছে যেখানে সচরাচর কেউ আসে-

টাসে না, আর যে শহরের অধিবাসীদের অদ্ভুতের ওপর খুব আকর্ষণ রয়েছে। ঘরে মানুষ গিজ্-গিজ করছে, বেশ গরম। অস্পষ্ট আলোয় মেয়ে-পুরুষ সবাই গুটি-সুটি মেরে বসে আছে বাধ্য ছাত্রছাত্রীর মতো। গতকাল যে ইতিমধ্যেই ইতিহাসের পর্যায় উঠে গেছে সে-কথা ভাবতেও ভাল লাগে।

চোখে-দেখা ঘটনার শুধুই সাক্ষী, এই সুরটা বজায় রাখতে স্যামঘিন চেষ্টা করল, যে মানুষ সত্যকেই পরম মূল্য দেয় তা সে-সত্য যেমনই হোক না কেন। নিজের কানেই এল জার এবং গ্যাপন সম্পর্কে ওর কণ্ঠস্বর বেশ তিক্ত হয়ে উঠেছে। চিন্তাধারার মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বেশ সংহতিই আছে। জার আর ওই পাদ্রীটাকে ঘিরে গণিতের "৪" সংখ্যাটা আঁকে-জোঁকে, দু'জনেরই তুচ্ছতায় বিশেষ জোর দেয়, তাদের অপরাধের দিকটাই তুলে ধরে। শ্রোতাদের মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করতেই যেন ওর আগ্রহ। মহানন্দে সে-কার্য ও সফলভাবেই করল।

কাহিনী শেষ হওয়ার পর শ্রোতারা খুব সাবধানে নড়ে-চড়ে ওঠে, যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছে। তারপর শুরু হলো তাদের কথাবার্তা। প্রথমটা ইতস্ততঃ ক'রে, মৃদু চাপা কণ্ঠে। পরস্পরের সঙ্গে বলছেও না যেন, অস্পষ্ট কথা ছুড়ে দিচ্ছে আকাশে-বাতাসে। এভজনভই সর্বপ্রথম নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে। উঠে দাঁড়িয়ে বাক্স থেকে একটা সিগারেট আঙুলের ফাঁকে ধরে কালো কালো দাঁত বের ক'রে বলে :

'শ্রেণী-বৈষম্যের সংঘাত দিয়ে এই বিভীষিকার অর্থ করতে পারবেন না। উহুঁ, তা পারা যাবে না। ব্যাপারটা আরো গভীর—আরো ভয়ঙ্কর।'

'হ্যাঁ, তাই,' আঙুল ফোটাতে ফোটাতে দুদ্রোভা সায় দেয়। 'এরপর রাশিয়া হয় মুক্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করবে, নয় তো অতলান্ত খাদে পড়ে যাবে।'

পুরুষদের মধ্যে কে একজন সমাহিত কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে :

'একটটা ঘুষি মারা হয়েছে—মরণ-ঘুষি—শুধু স্বৈরতন্ত্রের নীতির ওপরেই নয় ব্যক্তিত্বের ওপরেও বটে।'

বক্তৃতা অন্তে ক্লিম নীরবে বসে বসে শ্রোতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। আরও গভীর মন্তব্যের আশা করে ও। ভারভারা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। তামাটে রঙের পোশাক ওর অঙ্গে, এ পোশাক যেন ওর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে। ও যেন একটা পিলসুজ, হাসি-উদ্রেক-করা বাতিদান।

'খুব সুন্দর বলেছ,' সত্যিকারের বিস্ময় ভারভারার কণ্ঠে : 'অদ্ভুত সুন্দর! খুঁটিনাটি কত বিবরণ, আর কী সুন্দর বর্ণনা করলে! ঈস্, একেক সময় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে—'

ভারভারার বিস্ময়ে সামঘিন নিজের প্রশংসার কিছুই পায় না। তাছাড়া ও তো অন্যে কি বলছে না-বলছে, সেকথা শোনায় বাধাই সৃষ্টি করছে। ক্লাউনের মতো পাউডার মাখা মুখে একজন, লম্বা গলা আর ভাবহীন ড্যাবডেবে চোখে যারা তাকে চেপে বসেছিল, তাদের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলে উঠল—স্বরটা উঁচু নয়, কিন্তু বেশ শ্রাব্য, আশেপাশে চেয়ার ঠেলার আওয়াজেও তা ডুবল না, শ্রোতাদের উত্তেজিত গলাতেও না, ততক্ষণে শ্রোতারা ছোট-ছোট দলে ঘোঁট পাকাচ্ছিল :

'মানুষ পবিত্র! খ্রীস্টও একজন মানুষ যে শয়তানকে পরাজিত করেছিল। খ্রীস্টের পর আর অন্তঃজাত পাপের অস্তিত্ব নেই। এখন পাপ হচ্ছে এক সামাজিক ব্যাধি। শুধু মানুষই এর থেকে মুক্ত।'

সমাহিত কণ্ঠস্বরটি প্রতিবাদের উচ্চৈঃস্বরে বলল : 'ও তো হলো এক ধরনের ব্রহ্মবাদী অনাচার...'

আর দুদরোভা চেঁচিয়ে উঠল :

'মানুষে ভাল বা মন্দ কিছুই তৈরি করে না, শুধু বাস্তব উপাচার...'

বিশাল বপু কবিটি বিস্কুট খামচাচ্ছিল। এখন পাঁশনে-পরা এক খুদে মহিলার দিকে চেয়ে শপথ নেবার ভঙ্গীতে ঘোষণা করে :

'মানুষের অধিকার আছে জুডাস হবার, বা হেরোস্ট্রটাস ..'

'যাই বলুন, বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী!'

নানাভাবে নানা ধরনে প্রকাশিত এই মনোভাব সামঘিনের কাছে নতুন নয়। এই বিপত্তিটির ওপরে যে এরা নিজেদেরকে কোনো রকমে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছে, ভয়ানকতম সর্বনাশের মধ্যে যে এটা সামান্য সাধারণ ঘটনা মাত্র এবার মন্তব্যের মধ্যের সেই ভাবটা ওর একটুও নতুন লাগে না। ঘরটার চারপাশে ঘুরে বেড়ান এখন অনেক সহজ। শুধু যারা পরিচিত তারা চলে গেছে, এখন আছে ভারভারার বন্ধুরা। আনফিমিয়েভনা ও আরেক জন দাসী চায়ের টেবিল সাজাচ্ছে। দুদরোভা চেঁচিয়ে এভজনভকে বলল :

'ইবসেন হলো অতি-বিদ্যাদর্শী, পাণ্ডিত্যাভিমানী ..'

সামঘিনকে সবাই ভুলে গেছে, কেউ আর কিছু জিজ্ঞেস করছে না।

'ওরা এখন পরিপূর্ণ।' একটু বিদ্রূপের ছোঁওয়া থাকে ক্লিমের চিন্তায়। ও ফিরে যায় ওর পড়ার ঘরে। শুয়ে-শুয়ে ভাবে : 'হ্যাঁ, এই লোকগুলো বাস্তবের থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখেছে, শব্দের দুর্ভেদ্য জটিল প্রাচীর তুলেছে নিজেদের চার ধারে। বাস্তব তথ্যের বিভীষিকার ভেতর দিয়ে অন্যতর বিভীষিকায় চোখ রাখার এক অদ্ভুত হিংসেয় শক্তি আছে এদের, বোধহয় সেই বিভীষিকা শুধুই কাল্পনিক—উদ্দেশ্যটি বিশেষ, নিজেদের জীবনকে আরো একটু আরামপ্রদ ক'রে তোলা।'

তারপর ছোটো-খাটো তুচ্ছ বিষয়ে ও মনোনিবেশ করল যাতে উত্তর না খুঁজতে হয় : এরা যেমন ক'রে বাঁচে তা আমি পারছি না কেন, বাধা কোথায়? বাধা তো কিছু আছেই, সেটাও শুধুমাত্র ভয়ই হয় যে নিজেকে এইসব লোকের ভীড়ে হারিয়ে ফেলতে হবে। এদের তুচ্ছতায় ও নিঃসন্দেহ। নিকনোভাকে মনে পড়ে। ওই একজন ছিল যার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ পাওয়া যেত। মেয়েটি তার খেপা-সন্দেহে ওর মনে অপমানেব জ্বালা ধরিয়েছিল, কিন্তু সেসব তো কবে ও ক্ষমা ক'রে বসে আছে যেমন ক্ষমা করেছে সেনারক্ষীদের সঙ্গে ও-মেয়ের যোগ-সাজসের ঘটনা।

'অন্য কেউ হলে নির্দয়ভাবে দুষতাম। কিন্তু ওকে তো তা পারি না। বোধ-হয় অন্তর থেকেই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম ওর প্রতি—প্রেমের চেয়েও কোনো বড় আকর্ষণ। ও-ই অবশ্য শিকার হয়ে পড়ল—' কথাটা নিজেকে বার বার মনে করিয়ে দেয়।

পরদিন সকালে গোঘিন এল। 'রক্ত-রবিবার' সম্বন্ধে দু-তিনটে লেকচার দেবার নেমন্তন্ন করতে, কমিটির সুবিধার্থে। নিকনোভার সেই কান্ডের পর গোঘিনকে ওর মনে হয় বৌ-চোর। রবিবারের কাহিনীটাকে ও বেশ দীর্ঘ ক'রে তুলল, জার সম্পর্কে নিজের দেখা ঘটনার গল্প ঢোকাল, গ্যাপন ও জারের বেশ উদ্দীপক তুলনা করল, দু'জনের মাঝে অনেক ধোঁয়াটে মিলের ইঙ্গিত ও দিল—সেগুলো নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। স্টোকারের কথা বললে, শ্রমিকদের কথা, আশ্চর্য সহজতায় যারা জীবন দিল তাদের সবাইয়ের কথা বলল। যে-বাড়িতে পুশকিনের জীবন ও মৃত্যু সেই বাড়ির দেওয়ালে পাথর ঠুকছিল যে-বৃদ্ধ, তার কাহিনীও বলল। আসলে বৃদ্ধ সম্বন্ধে যা জানত তার চেয়েও অনেক বেশী যোগ দিল। প্রতিটি লেকচারের পর নিজেকে মনে হয় আরো বুদ্ধিমান, মনে হয় ও যেন আজ অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় ব্যক্তি। ও যা দেখেছে সেটাকে যত সুন্দর ক'রে তুলছে ততই যেন নিজের কাছে তার বিভীষিকা হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শ্রোতারা যাতে ভীষণ ভয় পায় সেদিকে ওর ভয়ানক আগ্রহ, ভয়ে ওরা বাক্‌হীন হয়ে পড়ছে, এ দেখতে পেলেই যেন ওর উদ্দেশ্য সফল হলো। ও লক্ষ্য করে যে ওর শ্রোতাদের মনে ভয় বেশীক্ষণ বাসা বেঁধে থাকছে না—ওদের যে সত্যিই বিশ্বাস যে ওরা নাকি বাস্তবকে বদলে দিতে পারে—পোষ মানাতে পারে।

'মনের কি লঘুতা,' মনে-মনে ও মন্তব্য করে। এদের এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মনে ওর তীব্র ক্ষোভ, এবং সে-বিষয়ে ও সচেতন।

ভারভারা বলল: 'ক্লিম, আমি তিন-তিনবার তোমার বক্তৃতা শুনলাম। কি চমৎকার বল, সত্যি! আর প্রত্যেকবারই নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন বিবরণ। সত্যিই যে বলেছে যে ট্র্যাজেডীর মধ্যেই পরমতম আনন্দ, সে খাঁটি কথাই বলেছে!'

ওর উচ্ছ্বাস শুনেও সামঘিন উদাসীন হয়েই থাকে, ক্লান্তি মনে হয়।

'এর জন্যে আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।'

'তা তো বটেই।' ভারভারা বলে।

সাফল্যের এই দিনগুলোতে মনের মধ্যে অভিনব এক অভিজ্ঞতা হয় ক্লিমের। অদ্ভুত, জীবনে যা কোন দিনই হয়নি। ধীরে ধীরে আপন মনেই একটি সূত্র এসে সামঘিনের মনে দানা বাঁধে: 'বিপ্লবীদের ধ্বংস করবার জন্যেই বিপ্লবের প্রয়োজন।'

কথাটা যখন মনে হলো, মনে মনে হেসে উঠল: 'অর্থহীন চিন্তা!'

কিন্তু হাসিতে সূত্রটি মন থেকে মুছে গেল। একে সঙ্গে নিয়েই যেন পেঁছিল দেশের বাড়িতে। সেখানে ডাক পড়েছে ভারাভকার কিছু দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে। তাছাড়া সেখানেও--ডাঃ লুবোমুদ্রভের গৃহে—"নয়ই জানুয়ারী" সম্বন্ধে ওকে বলতে হবে।



ছোট একটা প্রবন্ধ লিখে ফেলুন, সব তথ্য দিয়ে,' স্পিভাক পরামর্শ দেয় ঠোঁট কামড়ে লক্ষ্যহীন পায়চারি করতে করতে।

সামঘিন চটপট লিখেও ফেলল। সেদিনের ঘটনাটা ওরই ঘরোয়া ব্যাপার। কাহিনীটা জোরে-জোরে পড়ে শোনাতেই কিন্তু চামড়ার মতো পাকান দুনায়েভ তেলতেলে মুখে আঁতকে ওঠে:

'শহরের লোকদের পক্ষে খুবই ভয়ের কথা।'

'ছেঁটে নিতে হবে,' স্পিভাক বলে। লম্বা-লম্বা ঠ্যাংওয়ালা করনেভ পাণ্ডু-লিপিটা ছিনিয়ে নেয়, যেন বস্তুটা তারই। বিড়বিড় ক'রে বলে যে সে দেখা যাবে।

'ছেঁটে-কেটে ঠিক করে নেব আমরা। দু-এক দিনের মধ্যেই জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে পারব।' এর পর সামঘিন উকীল-প্রাভদিনের বাসা-বাড়িতে একদিন বক্তৃতা দিল। শ্রোতা ছিল প্রায় জনাচল্লিশেক, সবাই র‍্যাডিক্যাল সমর্থক। তারপর মেয়র রাদিয়েভের বাসায়, সেখানে জনা-পনের রাশভারী লিব্যারেল জুটেছিল ওর কথা শোনার জন্যে। ক্রমে নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে জড়িয়ে পড়ে—ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা, নতুন নতুন মুখ। দিনের হিসাব হারিয়ে ফেলল। ওর উত্তেজনায় পুরোনো দামী মদের নেশা। বুঝতে পারে, লোকে ভাবছে নৃশংস কাণ্ডটায় ও

সরাসরিই ভূমিকা নিয়েছিল। হাজার আলঙ্কারিক গল্প-কাহিনী সত্ত্বেও সেই কান্ডটার রহস্যময় শক্তি তো লোকের বোধশক্তিকে পরাভূত করেছে। দেখল স্পিভাকদের চক্রের বাইরে লোকে ভাবছে যে ও যতটা জানে ততটা হয়তো বলছে না, ঘটনাটায় ওর নিজের অংশ বোধহয় লুকিয়েই রাখছে। মনে মনে পুলকিত হয়ে ওঠে, প্রাণে জোয়ার আসে, আরো তীব্র, আরো জ্বালাময় শব্দ খুঁজে খুঁজে বক্তৃতা দেয়। এমন এমন শব্দ ব্যবহার করে যে নিজেরই আশ্চর্য লাগে, পরে ভাবে উত্তেজনার মুহূর্তে ওগুলো নেহাৎই মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছে। সমস্ত শহরটাতেই উত্তেজনার প্রবল অনুভূতি। সমস্ত সাক্ষর জনতাই মুখ-গুমড়ে ভাবছে যে অত্যন্ত-অস্বাভাবিক, অত্যন্ত-সাংঘাতিক কিছু ঘটেছিল।

দুনায়েভ তার ঝকঝকে সাজান দাঁতের পাটি বের ক'রে শহরের লোকদের মনের ভাবের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেয়. যদিও তা একটু স্থূল গোছের :

'বিচ্ছিরি বীভৎস রাতে কুকুরগুলো যেমন জেগে-জেগে ওঠে, এদের অবস্থাও তাই। ভয়ানক কিছুর আঁচ পাচ্ছে কিন্তু জানে না কার ওপর ঘেউ-ঘেউ করবে। তাইতো আস্তে-আস্তে অতি সাবধানে গরর-গরর করছে।'

করনেভ আরো একটু সূক্ষ্ম ক'রে বলে : 'বুঝতে শুরু করেছে কেমন দেশে এদের বাস।'

এইসব কথাবার্তা সামঘিনকে বিচলিত তো করেই না, উল্টে ও যেন আবার অস্পষ্ট আশা দেখতে পায়। নেতা হবার সাধ জাগছে ওর প্রাণে। যে প্রাণ দুলে-দুলে উঠছে. মচ্‌কাচ্ছে. গোঙিয়ে-গোঙিয়ে দীর্ঘঃশ্বাস ছাড়ছে আর ডজন-ডজন চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আশ্বাস খুঁজছে আত্মপ্রকাশ চাইছে। মনের মধ্যে যে তীক্ষ্ম হিংসিত ইচ্ছাটা এতদিন ছিল সেটা আরো জোর পেয়ে উঠল।—লোককে শান্ত করা চলবে না, ভয় দেখাতে হবে। শান্ত-নিরীহ লোকজনকে একথা বলে ওর ভারী আনন্দ যে শ্রমিকেরা, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটেরা, সিনেটর শিদ্‌লভ্‌স্কির শ্রমিক-প্রশ্নের কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছে। আর তারা চাইছে রাজনীতির দাবী করতে।

'ভীড় বা জনতাই ক্রমশঃ আমাদের কালে হিরো হয়ে উঠছে,' লিব্যারেল বুর্জোয়াদের বৈঠকে ও বলে ওঠে। তাদের সঙ্গে মেশবার ফলেই স্পিভাককে খবরাখবর দিতে পারে। মহিলাকে কিন্তু ভয় দেখানোর জন্যে বেশ জোর দিয়ে দিয়ে বলে : লোকজনের মনের মধ্যে আজকাল নাকি জোরদার "কমন-সেন্স" দেখা দিয়েছে দক্ষিণের দিকে ঘেঁষে চলবার। রুশ জনসঙ্ঘের কাঠামো নিয়েও বক্তৃতা দেয়, যার চেয়ারম্যান কজলভ আর ভাইস-চেয়ারম্যান কয়ার মাস্টার করভিন। মিস্ত্রী, কারিগর, দোকান কর্মচারী আর চাকুরেদের মাঝে সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনিস্টরা কি রকম কাজ করছে সেই নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বলে। কিন্তু ওর যা জানা এলিজাবেথার তার চেয়ে কিছু কম না, ভয়ের কোন চিহ্নই নেই। শুধু বলে : 'এ তো স্বাভাবিক।'

অনেক রকম কাজের ভার দেয় স্পিভাক, ক্লিমও আপত্তি করে না। উদগ্র কৌতূহল আর সব দুঃখের আশু সমাধানের অস্পষ্ট আশা গিয়ে ওর মনের মধ্যে অনভিজ্ঞ জুয়াড়ীর তীব্র-অশান্তির ভাবের সঙ্গে মিশে যায়।

শহরের অনেক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পায় সামঘিন। সংবাদদাতা হলো ইভান দ্রোনভ। হাসতে-হাসতে হাত কচলিয়ে হয়তো দ্রোনভ বলে :

'দেখ, সব বলা সত্ত্বেও আমি একজন কৃষক তার মানে বাস্তববাদী। কাজেই আমার পক্ষে সোশ্যালিস্ট-রেভল্যুশনিস্ট হওয়াই তো ঠিক এবং সেটাই উচিত। আর তোরা, অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তো শুধু এক বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন।'

দ্রোনভের সোশ্যাল রেভল্যুশনিজমকে সামঘিন বিশ্বাস করতে পারে না।

নিশ্চয়ই অন্য অনেকের মতোই ইভানও "আগামী কাল পর্যন্তই বিপ্লবী," আজ মনে ভয়ের চোটে সাহস ডেকে এনেছে। দ্রোনভের ভাবভঙ্গী সব সময়েই এলোমেলো, আর এখন অনেক বেশী ইতস্ততঃ ভাব, হঠাৎ-হঠাৎ কাজকর্ম। আঙুল থেকে আংটি খুলে ফেলেছে, বেশবাসের জাঁকজমক কমিয়ে দিয়েছে। আগের চেয়ে সাধারণ বেশে ওকে অনেক বেশী গণতন্ত্রী দেখাচ্ছে। কিন্তু বারবার অস্থিরভাবে জ্যাকেটের বোতাম খোলা আর বন্ধ করা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তার দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠা—স্বার্থের অনুকূলে কাজ হচ্ছে কি না-হচ্ছে সে সম্বন্ধে যেন নিশ্চিত নয়।

'আমরা, সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনিস্টরাই তো দেশটাকে রাজনৈতিক ভাবধারা দিয়ে সংগঠিত করছি,' বলে ওঠে। কণ্ঠস্বরে বোঝা যায় না প্রশ্ন, না, কোন তথ্যের ঘোষণা।

সামঘিন দেখে দ্রোনভ সব সময় ওর কাছে ঘুরঘুর করছে। কৃতার্থ হতেই চাইছে যেন, নেহাৎ নিঃস্বার্থেও নয়। সামঘিন অনেক সময়েই কর্কশ ব্যবহার করেছে, তবুও।

'আমার মধ্যে হয়তো নেতার লক্ষণ খুঁজে পেয়েছে, এখন পরীক্ষা করে দেখতে চায় সত্যিই কী না,' সামঘিন মনে-মনে ঠিক করে। দ্রোনভের ওপর বিতৃষ্ণার ভাবটা বিদ্বেষে এসে পৌঁছয়।

দিনের দ্রুত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কুতুজভ এল, দু-তিন ঘণ্টার জন্যে। রাস্তায় তার সঙ্গে সামঘিনের দেখা। প্রথমটা চিনতেই পারে না, দেখাচ্ছিল যেন গেঁয়ো-মুদী। কুতুজভের মুখ যেন ফারক্যাপের পেয়ালা দিয়ে ঢাকা, দু-কানে ফ্ল্যাপ রয়েছে। খাটো মেষ চামড়ার কোটের বুকে তেলের দাগ আর ময়দার গুঁড়ো। পায়ে ধূসর রঙের চামড়া-মোড়া ফেল্ট-বুট। সন্ধ্যাবেলায় স্পিভাকের বাসায় বুটজোড়া দেখেই সামঘিনের মনে পড়ল জেমস্ত্‌ভো-প্রশাসনের বিল্ডিং-এ কুতুজভকে তো আগেই দেখেছে।

কুতুজভ চা খায়। এখনো যেন গ্রামের লোকটি—সেই রকম হাবভাব। চলনে-বলনে বিশিষ্ট ব্যক্তির মেজাজ। ভাবভঙ্গী ধীরস্থির, মর্যাদাসম্পন্ন। যেন নিজের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন, তাড়া মেরে কাজ করান, উঁহুঁ, সেটি সম্ভব নয়।

সামঘিনকে গঞ্জনার সুরে বলে: 'মনে থাকে যেন আমার নাম—মিখাইল কুজ্‌মিচ আন্তনভ!'

'কি সরেস অভিনেতা,' সামঘিন ভাবে। সেন্টপীতর্সবুর্গ সম্বন্ধে তার নানা কাজের প্রশ্ন। তারি উত্তর জোগায় সামঘিন।

'হুঁ! লাল-ঝাণ্ডা তখন চাইল না, না?' দাড়ির জঙ্গল ঠেলে বেমানান হাসি হাসে কুতুজভ্: 'বেশ, বেশ। এখন বুঝবে মন খুলে কথা শোনাবার লোক নয় জার, লড়াইয়েরই প্রতিপক্ষ।'

বিপরীত দিকে বসে দুনায়েভ খুক-খুক ক'রে হাসে। কুতুজভ্ মাথা নাড়ায়। গেলাশের চায়ের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বলে:

'শিক্ষাটা খুব দুর্মূল্যই হলো। কিন্তু যা শেখান্‌টা শেখানো হলো দশ বছর ধরে চেষ্টা করলেও মুখের কথার বা লিখিত ইস্তাহারে তা হতো না। দশ বছরে এর চেয়েও অনেক বেশী শ্রমিকের মৃত্যু হতো যা এই দু'টো দিনে হয়েছে—আর তাও হতো সবচেয়ে মূল্যবান শ্রমিক জীবনের...'

'রিগাতেও বেশ অনেক গুলীই চলেছে,' দুনায়েভ মনে করিয়ে দেয়। কুতুজভ্ তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দাড়িতে হাত বুলোয়। ধীরকণ্ঠে বলে:

'রাইফেলগুলোর কাজই তো তাই—লোককে গুলী করা। কিন্তু রাইফেল

তৈরী ক'রে মজুরেরা সেকথাও তো আমরা জানি...'

দুনায়েভের মুখে হাসি ফোটে। সে-হাসি ক্লিমের পরিচিত। 'একেবারে সরল।' মন্তব্য করে।

সামঘিনের দিকে ঘুরে কুতুজভ্ বলে :

'পাদ্রীটাকে কি মনে হলো? ফাঁপিয়ে-তোলা সংখ্যা? না, আকস্মিক ব্যক্তিত্ব? হুঁ, শ্রমিক-আন্দোলনে অপঘাত তো থাকা উচিত নয়—থাকে না।'

ভুরু কুঁচকে থেমে পড়ে। প্রশ্ন করে : 'তুরবোয়েভের আঘাত কি গুরুতর?'

ঠিক সেই মুহূর্তে আরকাদিকে নিয়ে স্পিভাক এসে প্রবেশ করে। ছেলেটার গাল দুটো ঠাণ্ডায় লাল। একদৌড়ে সে একেবারে কুতুজভের হাঁটুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে : 'এসেছে! এসেছে!'

কুতুজভ্ হাসতে-হাসতে দাড়ির মধ্যে ওর ছোট্ট মুখটা চেপে ধরে। ছেলেটার কোঁকড়ান চুলের গোছার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে বিড়বিড় করে আদর জানায় :

'ও আমার আর্কাশকা—ছোট্ট ছারপোকাটা, আমার ছোট্ট গুবরেপোকা। তুই এত্তো ছোট্ট কেন রে—বলবি আমাকে?'

'বাঃ তা কেন? আমি তো ছোট্টো না!'

'আর কি সরু রে—মাছিরাও তো তোকে ভয় পায় না।'

'মাছিরা কাউকে ভয় পায় না। তোমার দাড়ির মধ্যে ছিল, মনে নেই? সেই যে গরমকালে।'

স্পিভাক সাজ ক'রে এসেছে। হিমেল বাতাসে মুখে-চোখে রক্তের উচ্ছ্বাস। দুনায়েভের কাঁধে হাত রেখে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে।

'বেশ!' দুনায়েভ রাজী হয় : 'যাব!'

'সাবধান কিন্তু। পনের কি বড়জোর বিশ জন। তার বেশী যেন না হয়,' খুব কঠিন সাবধানবাণী।

মাথা নেড়ে দুনায়েভ বেরিয়ে গেল। সামঘিনের মনে পরে যে ক'দিন আগে ও যখন বাচ্চাটার সঙ্গে খেলা করতে গিয়েছিল, তখন বোধহয় কোনো কারণে ছেলেটাকে অসন্তুষ্ট করেই তুলেছিল। আরকাদি ওর কাছ থেকে রাগ-রাগ ভঙ্গীতে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। স্পিভাক তখন মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেও বেশ মাস্টারী ঢঙে বলে উঠেছিল :

'ছোটদের খুব ভাল লাগে যখন বড়রা ওদের সঙ্গে খেলে, আর ওরা শুধু খেলনাই হয়ে যাকে।'

স্পিভাক এসে টেবিলে বসল। নিজের জন্যে চা ঢালল। কুতুজভ্ পিয়ানোতে গিয়ে বসেছে। ছেলেটাকে কোলে বসিয়ে বাজনার তালে-তালে নীচু গলার গান ধরে :

'হায়—আমাদের মহান, আমাদের উজ্জ্বল উক্রাইনা
পেয়েছে কত, জেনেছে কত ভীষণ দিন, ভয়ঙ্করের, অত্যাচারের...'

'নাঃ, কান্নার গান ভাল না!' আরকাদি বলে। 'ওইটা করো না, ওই প্রভুরটা!'

'তোমার মন পাওয়া বড় শক্ত, আরকাশকা,' কুতুজভ্ বলে। কিন্তু ধরে ঠিক সেই গানটাই যেটা চেয়েছে :

'আমাদের প্রভুর ট্রাউজার,
তার শয়তান-দাদুর উপহার।
আর মোজাগুলো বোনা-বোনা
চুরি ক'রে আনা।'

হাতে তালি দিতে-দিতে ছেলেটিও গান ধরে :

'আমাদের প্রভুর ওই টুপীটি
ফেলে গেছে যে ভাই ডেভিলটি...'

চা খেতে খেতে স্পিভাক কাগজপত্তর গোছায়। একটা চোখ কিন্তু গাইয়ে দুজনের ওপরে। চোখটায় সুস্মিত হাসি। সমস্ত ব্যাপারটাই সামঘিনের কাছে বিশ্রী লাগে। ভড়ং মনে হয়। কুতুজভ্ আর স্পিভাক নিশ্চয়ই ওকে দেখতে দিতে চায় না যে তারা আগামীকালের ভয়ে আচ্ছন্ন।

ক'দিন পর সামঘিন নিজেকে দেখে স্থানীয় জেলে বন্দী। সেখানে এসেই বুঝতে পারে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কত কি সহ্য করতে হয়েছে, কি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও। একা-একা থাকতে হবে ভেবে যেন বেশ খুশীই হয়। এখন ওর আর অন্যদের মাঝে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথা পেত্রোভনা নির্মিত বুড়ো কারাগারটার মোটা দেওয়াল। নোংরা সেলের মধ্যে ওকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে তিন জনের মতো হেলানো শয়ন-তক্তা। ঘরটায় বাঁকা ধনুকের মতো ছাদ, আর বহু উঁচুতে—প্রায় দুরতিক্রম্য—এক বাতায়ন। শার্সি ভাঙা, লোহার গরাদের ভেতর দিয়ে মার্চ-আকাশের অপর্যাপ্ত বাতাস আসে। বহুদূরে গরাদ পেরিয়ে এক চাপ সুনীল আকাশ।...প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় বন্দীদের গুণে তোলার আগে ওর সেলের ঠিক উল্টো দিকে কয়েক জন ছোকরা তাদের বিউগ্লের মতো কণ্ঠে গান ধরে, সব সময়ে ওই একই গান :

'এলুম আমরা আরকাদিয়া,
আরকাদিয়া থেকে লিভাদিয়া,
সেথা হতে ছুটে অজেরকি..'

নীচের কণ্ঠস্বর 'কি-কি!' সুরটা টেনে চলে। উঁচু স্বরগুলো ততক্ষণে দ্রুততালে টাপ্-টাপ্-টাপ্-টাপ্ শব্দের সঙ্গে একটা নাচের সুর ধরে :

'কাউকে এখানে চাপলুম,
কাউকে সেখানে ধরলুম,
বলনাচের আখড়ায়..'
'বলনা—চ্!'

এ-গান সৈন্যদের সান্ধ্য-প্রার্থনার মতোই অবধারিত। হবেই হবে। প্রতিটি বন্দী-দিন শেষ হয় এই গানের রেশে। সামঘিনের মনে হয় যে গোটা চব্বিশটা ঘণ্টাই বুঝি অদ্ভুত উল্লাসে কেটেছে, যেন ভীড়ে-বোঝাই জেলখানায় সকাল থেকে সাঁঝ পর্যন্ত কোন অজানার অনুভূতি টগবগ ক'রে ফুটে ওঠে। মনে হয় বন্দীরা ছুটির দিনের অধৈর্য আশায় দিন গুনছে, মাতোয়ারা হবে কোন উপায়ে, তারই যেন মহলা দিচ্ছে। জেলখানায় তিনটে টাইফাস-কেস্ হয়েছিল, সেইজন্যেই বোধহয় কয়েদীদের গাদা ক'রে বন্দীশালার প্রাঙ্গণে রেখে আসা হতো সেই কোন্ ঊষা-লগ্নে। সেখানেই থাকত তারা সারাটা দিন। প্রাচীরের পাথরগুলোর মতোই ধুসর ওরা। শুয়ে বসে বাসন্তী-রোদ পোয়াতে পোয়াতে নানা খেলায় মেতে হৈ-হুল্লোড় বা গানে সময় কাটাত। সশস্ত্র কারাদণ্ডীরা শৃঙ্খলের ঝনঝন তুলে অঙ্গনের চারপাশে ঘুরে বেড়াত। প্রাচীরের পাশে যেখানটায় ছায়া পড়ে, সেখানে

একের পর এক কত লোক বিচরণ করত—করনেভ, দুনায়েভ, পরিসংখ্যানবিদ ম্যাভিন, আরো কত সামঘিনের অচেনা মুখ। পাহারাদারেরা দূরে দূরে থাকত, কাউকে বড় একটা জ্বালাত না। ওরাও বোধহয় কোন কিছুর আশায় চুপচাপ দিন গুনছে। মোটের ওপর ক্লিমের মনে হয় যে, জেলখানায় নিয়ম-শৃঙ্খলার বড়ই অভাব। আশ্চর্য মনে হলেও এতে ওর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে না। সব ছাপিয়ে ওর মনে এই কথাই হয় যে যারা বন্দী জীবনের কষ্টের কথা বলে তারা কথাটা খুব বাড়িয়েই বলে।

ক্লিমের বাঁদিকে একটা সেলে ছিল করনেভ। সামঘিন বন্দী হবার পর প্রথম রাত্রে দেওয়াল ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে ক্লিমকে জানাল যে চারজন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট্‌ আর এগারো জন সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনিস্ট গ্রেপ্তার হয়েছে। সেই তখন থেকেই প্রায় প্রত্যেক রাত্রেই গোণাগুণ্তির পর, জার্মানসুলভ নিখুঁতভাবে, করনেভ বাইরের দুনিয়ার সব খবর ক্লিমকে জানাত। সেই তথ্য থেকে সামঘিনের মনে হয় যে গোটা দেশটাই বোধহয় এক হয়ে গিয়ে স্বৈরতন্ত্রকে শেষ আঘাত করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

'সোশ্যালিস্ট রেভল্যুশনিস্টরা কৃষাণ ইউনিয়ন গড়ে তুলছে। ওদের হাতে রয়েছে এক গ্রাম্য শিক্ষক। শ্রমিকদের আন্দোলন অপ্রতিহতভাবে বেড়ে চলেছে.' দেওয়াল ঠক্‌ঠক্‌ করে জানায যেন খবরেব কাগজের শিবোনামা পাঠাচ্ছে।

সামঘিন শোনে, বিশ্বাসও করে, যে দেশে ইঞ্জিনীয়র ডাক্তার. উকিল, সবায়েরই ইউনিয়ন তৈরী হচ্ছে; সমস্ত ইউনিয়নের এক বড় ইউনিয়ন গড়ে তোলার পরিকল্পনাও হয়েছে। পাথরের মধ্যে দিয়ে শুক্‌নো আওয়াজ ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে ভেসে আসে। ওর মনে উল্লসিত আশা জাগিয়ে তোলে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, বুদ্ধিজীবীরা বিরাট শক্তিতে সংগঠিত হবে বৈকি! কিন্তু এই সংগঠনের পরে কী সে-কথা ভাববার অনুমতি দেয় না মনকে। নিজের আশা আনন্দ বা স্বপ্নেব কোন ফর্মুলা যাতে গড়ে না ওঠে সেই সদিচ্ছাতেই মনকে বাধা দেয।

*

এক মাসের ওপর হয়ে গেল কিন্তু সেনারক্ষীরা তো ওকে জেরা করতে ডাকল না। মনের সাম্য যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই দেরীতে, বিশেষ যখন জানা সাক্ষাৎকারটা হবে কর্নেল ভাসিলিয়েভের সঙ্গে। কিন্তু যতখানি আশঙ্কা করেছিল অপ্রীতিকর হ'ল না ঘটনাটা।

'আরেকবাব আপনার সঙ্গে যে কথা বলতে চাই, ক্লিম ইভানোভিচ,' ডেস্ক থেকে উঠতে-উঠতে কর্নেল বলে। মুখের সামনে যেভাবে এক হাতে সিগারেট-কেস্‌ নাড়ায় আর অন্য হাতে কাগজপত্তর—তা দেখে বেশ বোঝা যায় যে এ সমস্তই পূর্ব-পরিকল্পিত। 'বসুন!' ডেস্কের ওধারে অমায়িকভাবে একটা চেয়ার দেখিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই দলিলপত্তরে মুখ গোঁজে।

কর্নেল পপভের সেই পরিচিত আরামপ্রদ স্টাডিটি আর চেনা যায় না। জানলার তাক থেকে ফুলগুলো অদৃশ্য, এখন সেখানটায় ঢেকে আছে লাঙুলচিহ্নিত প্রেস্‌কৃপ্‌সনের স্লিপ সাঁটা ওষুধের শিশি। আলোর রেখায় বিদ্ধ হয়ে এক শিশি লাল কালি ঝক্‌ঝক্‌ করছে। নীল-নীল ফাইলে সব "কেশ" কুশনের মত উঁচু হয়ে আছে। পুরোনো একটা পিস্তল দেখতে পায় ক্লিম—সেটার নল খাড়া আর ট্রিগারটা সাদা কাগজের গলাবন্ধনী দিয়ে বাঁধা। সব জিনিসই অভ্যস্ত স্থান থেকে

সরিয়ে রাখা। ঘরটার এমন চেহারা যেন কর্নেল ভাসিলিয়েভ গতকালই এখানে উঠে এসেছে, অথবা অন্য কোথাও উঠে যাবার বন্দোবস্তই যেন হচ্ছে। শুধু তৃতীয় আলেকজান্ডারের প্লাস্টার-মূর্তিটায় হাত পড়েনি, তেমনিই ধুলো সেখানে; জারের নাকের অনেকখানি ধুলোয় ধূসর, কান দুটো আরো ধূসর। আরামের অভাব ঘরটায় বিরাজমান।

এর চাইতেও বেশী অনুমোদন, সামঘিনের মনে হয়, যেন কর্নেলের চেহারায়। তার মুখটা শুকন, কালছে, অন্ধকার ঘনিয়েছে সেখানে। তীক্ষ্ন চোখ ভোঁতা মেরে গেছে নীচে নীল থলো-থলো মাংস। টাক-মাথার ওপর দিযে দুটো মাছি হাঁটছিল, জানতে না পেরে কর্নেল ঠোঁট কামড়ে-কামড়ে, আর গোঁফ নাড়িয়ে সে-টা সহ্য ক'রে যাচ্ছে। মস্কোতে যেমন দেখেছিল তার থেকে অনেক বেশী কুঁজো হ'য়ে পড়েছে। কাঁধ দুটোও খোঁচা-খোঁচা। মোটকথা, লোকটা অনেক ক্লান্ত, অনেক ঢিলেঢালা।

'যাক্, ব্যাপারটা আর লম্বা করবার কোন দরকার নেই,' কর্নেল ক্লিম সামঘিনকে উদাস-দৃষ্টিতে দেখে, বিষণ্নভাবে বলে 'আপনি অবশ্য সাক্ষী দিতে অস্বীকার করবেন।' গলার সুরে বোঝা গেল না সামঘিনকে প্রশ্ন করা হলো না উপদেশ দেওয়া হলো : 'আমরা খবর পেয়েছি যে মস্কো থেকে এসে আপনি বলশেভিস্টদের স্থানীয় কমিটির সাহায্য নিয়ে এবং তাদের সাহায্যার্থেই, অনেকগুলো সভা করেছেন, যাতে প্রবেশমূল্য নেওয়া হ'য়েছে, আর সে সব সভায় সরকারী কার্য পদ্ধতিব তীব্র সমালোচনা আপনি করেছেন। এ রিপোর্ট সত্য ?'

'সভা করেছিলাম কিন্তু প্রবেশমূল্য কিছু ছিল না। আমাব বক্তৃতায় ছিল শুধুই সত্য ঘটনা। বলশেভিস্ট কমিটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যা বক্তব্য তা' এই,' সামঘিন তাড়াহুড়ো না-ক'রেই জানায়। বোঝে বেশ গুছিযেই বলা হযেছে, সম্ভ্রম বজায় রেখেই বলেছে।

কর্নেল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাঁতের মধ্যে দিযে হিস্‌হিসিযে বলে 'ও-হ্যাঁ—ঠিক ' বাঁ-হাতের নীল-নীল নখগুলোয পেন্সিলেব টোকা দিতে-দিতে বেশ চিবিয়ে-চিবিয়ে আবার বলে 'কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকাব কবা অর্থহীন। আমাদের তদন্তে এ-কথা প্রমাণিত হযেছে যে আপনাব মা-যেব বাড়িতেই বলশেভিস্টদেব হেড-কোয়ার্টাব। অতএব বুঝতেই পারছেন—

কর্নেল দ্রুত হাত চালিয়ে লিখতে আবম্ভ কবে। কাগজেব ওপব দিয়ে কলম খস্‌খস্ কবে চলে। ভুরুর ওপবে ছোট ছোট কুঞ্চন জাগছে ওপবদিকে উঠছে সেগুলো।

সামঘিন ভাবে

'এক্ষুণি জিজ্ঞেস করবে 'বেশ তবে এ টা কি হলো '

কিন্তু কর্নেল কলমটাকে কাগজের টুক্‌রো-ভর্তি গেলাসে গুজে বেখে টেবিলের তলায হাত নাড়ে যেন আঙুল থেকে কিছু ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। চেয়ারের হেলানে শরীরটাকে এলিয়ে দিযে চোখ পিট্‌পিট্ কবে নীচুগলায় বলে

'আচ্ছা বলুন দেখি—অবশ্য এ-টা আমার সরকারী কাজেব এক্তিযারেব বাইরেই অফিসার হিসাবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি' এখন শুধু একজন রুশ অরেক-জন রুশের কাছ থেকে কিছু চাইছে—সে-ও সৎ তবে ভিন্ন মতের, এই যা। মানেন কি না ?'

'নিশ্চয়ই,' সামঘিন চট্ ক'রে জবাব দেয় কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না কি মেনে নিল।

'এই যে পাদ্রী—গ্যাপন, না আগাফন—আপনি তাকে দেখেছেন ?'

'হুঁ, দেখেছি,' সামঘিন গম্ভীর-ঘোষণার আওয়াজ করে।' নিজের গাইকে মোটেই ঘাবড়ায় না।

'সে-লোকটা—কি ধরণের লোক সে?' ডেস্কের ওপর বুক এগিয়ে নিয়ে এসে হাতদুটো মুঠো ক'রে রক্ষীদলের কর্তাটি ফিস্‌ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করে। 'আচ্ছা সত্যিই সে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ক্রুশ-হাতে ক'রে, জারের ছবি হাতে নিয়ে? সত্যিই কি সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ শক্তি একটা?

কর্নেলের মুখটা হঠাৎ নরম হ'য়ে পড়ে, চোয়ালের হাড় দু'টো যেন কোথায় মিশে যাচ্ছে। চোখ দুটো আরো নিরাবরণ দেখায়। তাদের তীব্র দৃষ্টিতে সামঘিন ভয় এবং বিদ্বেষের চিহ্ন স্পষ্টই খুঁজে পায়। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সন্ধানী চোখ দু'টোর দিকে দৃষ্টি মেলে সামঘিন জবাব দিল

'আমার মনে হয় না সে এমন কিছু বিরাট-লোক।' সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বুঝতে পারে যে কথাটা বলা উচিত হয় নি। তাই তাড়াতাড়ি যোগ করে 'কিন্তু সে খুব সবল—সবল, কারণ লোকে তাকে ভালবাসে তাকে বিশ্বাস করে '

'কিন্তু সে নিজে—অসত্তা?' কর্নেল চট্ ক'রে জিজ্ঞেস করে। 'সত্তাহীন নয় কি?' আবার জরুরী গলায় যেন তাগাদা দিয়ে ওঠে।

চেয়ারের পিঠে আর একবার হেলান দিয়ে কর্নেল মুঠির মধ্যে মুখটাকে নিয়ে ফিসফিস করে বলে ওঠে। কথাগুলো যেন ফুটন্ত জলের বাষ্প স্রোত, দাঁতের ভেতর দিয়ে-দিয়ে বেরোয়। বলতে বলতে ডেস্কের কাগজের ওপর হাতের চেটো দিয়ে মৃদু মৃদু আঘাত করে

'আমাদের কাছে যে সব তথ্য আছে তাতে জানা যায় যে লোকটা একেবারেই একটা সত্তাহীন একজন বক্তাবাগীশ। কিন্তু সত্যিই যদি সে কিছুই না হয়, তবে তো বড় খারাপ! ভেবে দেখুন একজন শূন্যক্ষম মানুষ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে গোটা পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে সিটি গভর্নরকে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে—আপনাদেরকে—এমন কি আপনাকেও! চাপা উত্তেজনায় ফিসফিস ক'রে কথা বলে, সামঘিনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখায় তারপর আবার ডেস্কের নীচে হাতদুটো ঢুকিয়ে ফেলে যেন কোন কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। একেবারেই অবিশ্বাস্য! আমি বিশ্বাস করি না! স্বীকার করি না! চাপা গলায় বলে। চেয়ারের ওপর তার শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মুখটার দিকে সামঘিন একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। লিউতভের মুখের মতো হ'য়ে উঠছে সে মুখ বলিরেখায় দোমড়ানো-মোচড়ানো। সামঘিনের মনে হয় কর্নেল বোধহয় পাগল এখুনি কিছু একটা ছুঁড়ে না মেরে বসে বা ডেস্কের ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা টেনে এনে

'আমার মনে হয় কর্নেল যে আমাদের এই কথাবার্তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক—' সামঘিন খুব-সাবধানে নম্র কণ্ঠেই বলতে চায়। কিন্তু কর্নেল থামিয়ে দেয়

'তবু কি আপনার মনে হয় না যে এই পাদ্রী এবং তার হতচ্ছাড়া কাণ্ডকারখানা চার্চের মোক্ষম জবাব আপনাদের ওপর অর্থাৎ নাস্তিকদের ওপর, আমাদেরও ওপর অর্থাৎ সরকারী আমলাদের ওপর—হ্যাঁ আমাদের ওপরেও বটে!—তলস্তয়ের দিকেও, পবেদনোস্তজেভের উদ্দেশ্যে অত্যাচারের উদ্দেশ্যে চার্চের মুখ বন্ধ করার বিরুদ্ধে? বোঝেন না পাদ্রীর পেছনে আছে বিশপরা? ওই অলক্ষণে মিছিলটা চার্চ আর ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের মধ্যে ফাটল ধরাবার প্রথম প্রয়াস? তা মনে হয় না আমার?'

সামঘিন স্তম্ভিত। নাঃ কর্নেল ঠিকই পাগল হ'য়ে গেছে। চশমাটা সোজা ক'রে নিয়ে বলবার মতো কিছু একটা ভাবতে বসে। কিন্তু জবাবের অপেক্ষা না

দেখেই ভাসিলেয়েভ বলে ·

'বোঝেন না যে যে-চার্চকে আপনারা অস্বীকার করেছেন, যারা আপনাদের শত্রু তারাই আপনাদের বিরুদ্ধেও লোক খেপাতে পারে? পারেই তো। অবশ্য আমরা জানি যে আপনারা ইউনিয়ান গড়ে নিজেদেরকে সংগঠিত করছেন, আত্ম-রক্ষার আয়োজন করেছেন নৈবাজ্যবাদের বিরুদ্ধে '

উত্তেজিত পুলিশ অফিসবেব দিকে ক্লিম এবার একাগ্রতায় তাকিয়ে থাকে। কথাগুলোব মধ্যে খানিকটা অর্থ আছে বই কি।

'কিন্তু এই সব নিবস্ত্র লোকদেব ইউনিযান কি কবতে পারে? ডাক্তার আর উকিলবা তো কখনো বন্দুক চালাতে শেখেনি। কিন্তু 'রুশ-জন-সঙ্ঘ'-তে পাদ্রীরাও আছে, সে-কথা জানেন?— বিশপবাও!'

কালো মুখে ঘামেব অজস্র তেলতেলে বিন্দু ফুটে ওঠে, চোখদুটো লাল টকটকে। চাপাগলাব ফিসফিসানি আবো অসংলগ্ন হ'য়ে ওঠে। সামঘিন বৃথাই অপেক্ষা কবে, নৈবাজ্যবাদেব বিবুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের আত্মবক্ষাব সেই কথাটা নিযে কর্নেল আর কিছু বলল না' কথার তোড়ে দম আটকে আসছে এমনিভাবে কর্নেল ফিসফিস্ ক'বে বলে 'সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবা ইতিহাসেব বিশেষজ্ঞেবা—তাঁদেব জানা উচিত—প্রতিটি সংগঠন অত্যাচাবেব ভিতেব ওপবেই তৈবি হযে থাকে সাংবিধানিক আইনেব নীতি এই কথাই অভ্রান্তভাবে প্রমাণ কবেছে—আপনিও তো উকিল?'

হঠাৎ কর্নেল ভযানকভাবে কেঁপে ওঠে। ডেস্ক থেকে পড়ে যায, একহাত দিযে বুকটা চেপে ধবে আবেক হাত দিযে কপালেব বগের ওপব। জোরে জোরে মুখ খুলে নিঃশ্বাস টানে, লাল হ'যে ওঠে—।

'আপনি অসুস্থ!' ক্লিম ভয পেযে চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কর্নেল হাতটাকে নীচেব দিকে ঝুলিযে দিযে বিড়বিড ক'বে ওঠে

"খাড়া পাহাড ক্লান্ত অশ্ব!"' বুমাল দিযে মুখ মুছে আওযাজ কবতে কবতে নিঃশ্বাস ফেলে 'এমন অসময না হ'লে আমি কাজে ইস্তফা দিতাম!' সামঘিনের দিকে একটা কাগজ এগিযে দিযে ক্লান্ত গলায বলে

'এইটা পড়ুন—আব সই ক'রে দিন।'

'কতদিন আমাকে আটক বাখবেন?' ক্লিম জিজ্ঞেস কবে।

'সেটা আমাব ওপবে নয। সত্যি বলতে গেলে, আমি সবাইকে ছেড়ে দিতে চাই—সাধারণ অপবাধী বা পলিটিক্যাল প্রিজনাব—সকলকেই। যা বললাম তাই করুন দয়া ক'বে—আচ্ছা যা খুশী কবুন! বেশ!—তাহ'লে এখন নমস্কার!'



সামঘিন এক ছ্যাকড়াগাড়ীতে চ'ড়ে জেলখানায ফিবে এল। পাশে ব'সে এক পুলিশ, ড্রাইভাবের বাক্সে ওর মুখোমুখি ব'সে আরেকজন। তার মোটা নাক ছোট-ছোট চোখ আব দুটো তীবের মতো গোঁফ। নিরিবিলি রাস্তা নিয়ে গাড়ী চলেছে, পথে লোকজন খুব কমই। সামঘিনের মনে হলো ওরা বোধহয় বোকার মতো পুলিশকে দেখিয়ে দিল যে কোন মানুষকে জেলে নিয়ে যেতে দেখে ওদের কোনই আগ্রহ নেই। কর্নেলের কথাগুলো মাথায় ভীড় ক'রে ওঠে, বিভ্রান্তিতে বিপর্যস্ত। স্বপ্নের মতো সামঘিন ভাবে .

‘লোকটা অদ্ভুত—[illegible]—তার দুনিয়া দেখে।’ আমাকে ওর দেখাতে চেয়েছিল। ‘নাঃ, লোকটার কথা ভাববার মতোই নয়।’

কিন্তু সেলে ব'সে চোখের সামনে তার মুখটা ভেসে ওঠে, লিউডভের মত বাঁক-রেখায় দোমড়ান। নীরবতার মধ্যে কথাগুলো কিন্তু ফোঁসফোঁসিয়ে উঠতে থাকে :

‘আপনারা আত্মরক্ষার আয়োজন করছেন নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে..’

‘ওই একটি মাত্র জ্ঞানের কথাই যা ব'লেছিল,’ সামঘিন ভাবে।

সেলের ওধার থেকে নীচুগলার গান ভেসে আসে। দু'জন কয়েদী সাবধানে গান ধরেছে। এত আস্তে-আস্তে যেন দুঃখের কথা কারো কানে-কানে ব'লে দেবার মতো :

‘বালুকাবেলায়,’ একজন গায়।

আরেকজন ধরে · ‘নদী কিনারায়।’ দু'জনেই গুণগুণ ক'রে ওঠে, যেন হৃদয় থেকেই

‘সেথায়—ওহো, সেথায়, যন্ত্রীরা পদাতিক ’

সুর ভেসে-ভেসে যায় ক্রিমের সেলের জানলা পেরিয়ে, বসন্তরাত্রির উষ্ণ নীরবতাকে আদরে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। রাতের গোপনতায় অজস্র বংশীয় বিষাদ ঢেলে দেয়—যে-বিষাদ মানুষের প্রাণকে কোমল ক'রে তোলবার জন্যে সর্বজনপ্রিয় হ'য়ে আছে, মহৎ হ'য়ে আছে।

‘বোধহয় হত্যাকারী—চোর তো নিশ্চয়ই—তবু সুন্দর গায়,’ সামঘিন ভাবে। মন থেকে এখনো কোনো একটা দোমড়ান মুখের ঘোলাটে ছাপ মুছে ফেলতে পারছে না, টগবগে ফিসফিস কথাগুলো। এখনো যেন চোখের সামনে ভাসছে সেই ঘর যেখানে ধুলোটে জার, কুতুজভের মতো দাড়ি নিয়ে তাকিয়ে আছে অন্ধ চোখে।

‘একটা লোকের মধ্যে ভাল-মন্দ'র এ রকম সংমিশ্রণ বিচারবুদ্ধিকে খুব ভয় খাইয়ে দেয় ’

গানটা ওকে দাঁতের ব্যথার মতোই ঘুমোতে দেয় না।—খুব বেশী ব্যথা নয় কিন্তু যন্ত্রণা হ'য়ে উঠবার ভোগান্তি।—সামঘিন শয়ন-তক্তা থেকে পা নামিয়ে সাবধানে কাঠের মেঝে ছোঁয়। ঘরে পায়চারি শুরু করে, পা টিপে-টিপে, আঙুলে ভর দিয়ে। যেন পাতলা বরফের ওপর পা ফেলছে।

পেছন থেকে গুঞ্জন ভেসে আসে

‘হায় রাত তুমি কালো—
যত কালো, কালোয় কালো ’

রাতটা কিন্তু ঝকমকে। গান অস্পষ্ট হয়ে আসে। কানে আসে শুধুই তান, কোনো কথা নয়।

‘বিচারবুদ্ধিকে অবিশ্বাস ক'রে তার বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে তলস্তয় ঠিকই করতেন। দস্তোয়েভস্কিও বিচারবুদ্ধিকে ভালোবাসতেন না। রাশিয়ানদের তো এই-ই সাধারণ ধারা ’

তলস্তয় সম্বন্ধে নিকনোভার কথা সামঘিনের মনে প'ড়ে যায়

‘নিষ্ঠুর বুড়ো লোকটা, সব কিছু জানে।’

‘মেয়েটা ম'রে গেলেও এত বিশ্রী হতো না,’ সামঘিন ভাবে।

ভারভারার কথা মনে পড়ে। নিরানন্দ অনুভূতি। দেখা করতে এসেছিল, খুবই কায়দাদুরস্ত বেশভূষা। কথার মধ্যে একটা আহত-বিষণ্ণ ভাব থাকলেও চোখ দুটোয় ছিল যেন খুশীর ঝিলিক

ওর জানালায় পিটপিটে চোখে তাকিয়ে আছে তিনটি তারা। জ্যোৎস্না-ভরা নীল রুপোলি আকাশে তিনটি বিন্দু। গান থেমে গেছে, আর সেই থেমে পড়াতেই যেন

বাতাস আরো ঠাণ্ডা মনে হয়। সামঘিন শোবার বাঙ্কতে ফিরে গেল। চুপচাপ শুয়ে প'ড়ে আপাদমস্তক কম্বলে জড়িয়ে নেয়। যা-তে ওই ফোকরের মধ্যে দিয়ে ওর সেলে চাঁদের ঝল্‌মলে আলো যেন না দেখতে হয়।...শুয়ে পড়তেই কিন্তু মন ভরে এক ছোট্ট ভয় এসে ওকে ক্লিষ্ট ক'রে তুলছে। নেভ্‌স্কি প্রস্পেক্টের সেই ভয়টার মতন, না, এ অন্যধরণের! তখন ভয় পেয়েছিল মরণকে, আর এখন ভয় জীবনকে।

*

প্রায় দুই সপ্তাহ এমন কাটল যেন বিষ পান করেছে ও। করনেভ সব খবরই সযত্নে টক-টক ক'রে জানায়, কিন্তু সামঘিনের আচ্ছন্ন-মানসে খবরগুলো শুধু গড়িয়েই যায় ভেতরে আর ঢুকতে পারে না।

'স্পিভাক মুক্তি পেয়েছে। দুনায়েভ ও ফ্লেরভকে মস্কৌতে পাঠান হয়েছে। জাপানের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে—অত্যন্ত বিশ্রী চুক্তি। স্পিভাকের স্কুল বন্ধ হ'য়ে গেছে।'

পাথরের ওপর টক-টক শব্দ শুনতে শুনতে সামঘিনের মনে হয় করনেভের ঢ্যাঙা শকুন-শরীরটা যেন অস্ত্র বিশেষ অক্লান্তভাবে দেওয়াল ধ্বংস ক'রে যাচ্ছে।

'ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্কে বিরাট স্ট্রাইক—আমাদের লোকদের নেতৃত্বে। বিদ্রোহ শুরু হয়েছে কৃষ্ণসাগর নৌ-বাহিনীতে।

অল্প-অল্প বিরতি দিয়ে, খবরের উচ্চকিত প্রকাশ। প্রত্যেক দিনই কয়েদখানায় যেন আরো বেশী গণ্ডগোল। কয়েদীরা পরস্পরের দিকে বিজয়-হুঙ্কার ছাড়ে। উঠোনে যখন বেড়ায় তখন করনেভ জানালায়-জানালায় চেঁচিয়ে খবর বলে। রক্ষীরা উচ্চবাচ্য করে না। শুধু একবার ওয়ার্ডেন করনেভের বেড়ানো তিনদিন বন্ধ ক'রে দেয়। এই অশান্ত লোকটা একদিন সামঘিনকে ঘুম ভাঙিয়ে তোলে। ঠক ঠক্‌ ক'রে জানায় : 'ভাসিলিয়েভ কাল বন্দুকের গুলীতে মারা গেছে।'

'কে মারল?'

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কে। গ্রেপ্তার হয়নি কেউ।'

সকালে করনেভ সামঘিনের সেল পেরিয়ে যেতে-যেতে করিডরে চিৎকার করে 'বিদায় সামঘিন! আমি মুক্তি পাচ্ছি! শীগগিরি সবাই '

সারারাত সামঘিনের ঘুম এল না। কর্নেলের প্রলাপ যেন ও শোনে। কর্নেলের জন্যে দুঃখ হয় না। কিন্তু মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। গ্যাপনের মতোই চিত্ত বিকৃতি ছিল লোকটার। আজ আর সে নেই, মারা গিয়েছে।

মনে পড়ে ভাঙা একটা গুদামঘরের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একদা ইনোকভ কিভাবে বলে উঠেছিল :

'দেখ!'

নোংরা ধুলো-রঙের গোঁফওয়ালা একটা ইঁদুর পচা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসেছিল। তার এলোমেলো লোমগুলো গোছা-গোছা হয়ে গায়ের সঙ্গে আটকে আছে। ইঁদুরটার বসায় কাঠের গুঁড়ির অকেজোপনা যেন সম্পূর্ণ হয়েছিল। মুষিক-প্রবরটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন বৃদ্ধা ভিখারিণী। থাবা ছড়িয়ে অক্ষমভাবে বসে ছিল। ল্যাজটা এক খণ্ড মরা রশির মতো ঝুলছিল। লাল লাল ঘের-দেওয়া চোখে দুটোর কালো ফুটকি রৌদ্রস্নাত নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল। সামঘিন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিল, কিন্তু ইনোকভ ওর হাতটা ধরে থামিয়ে দিলে :

'থাক, থাক। যেমন আছে ঠিক ওইভাবেই ব্যাটা মরুক।'

সামঘিনের মনে পড়ে কথাগুলো কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। এখন কিন্তু একটা মানুষ ইনোকভ হত্যা করতে পারে।

তবু নিজের কথা ছাড়া অন্য কারো কথা চিন্তা করতে ভাল লাগে না। দেওয়ালে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা বন্ধ হয়ে গেছে। বহির্জগতের আশ্চর্য সব খবর কেউ আর দেয় না। সামঘিন ভাবে ওর কথা বোধ হয় সবাই ভুলেই গিয়েছে। অনুভূতিটার মধ্যে একটা অদ্ভুত সানন্দ তিক্ততা। সেটা বিদ্রূপ করে-করে ওঠে, এমন সব কথা বলে যেমন .

'কী জীবন .বাইরের থেকে যেন জেলখানাতেই অনেক বেশী স্বাধীনতা!'

ওর এই পরিবেষ্টিত জীবনটা মন্দ কাটে না—যতটা পারে ততটা গুছিয়েই রাখে। কয়েদীদের কেউ এসে ওব সেল সুন্দব ক'রে পরিষ্কার ক'রে যায়। খাবার আসে বাইবেব রেস্তরাঁ থেকে। পড়াশোনাও কবে। ভারাভকাব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-গুলোর মিটিযে ফেলাব কাজ শেষ কবেছে প্রতিষ্ঠানগুলো এখন রাদিয়েভের হাতে গিযে পড়ছে। কয়েক বাব মেযবের এ্যাটর্নী প্রাভ্‌দিন ওর সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে, সঙ্গে এসেছিল সহকাবী জেলা এ্যাটর্নী। ভারভাবাও আব একবার দেখা ক'রে গেছে। বলল সামঘিনেব মুক্তি নাকি আসন্ন। তারপর তাড়াতাড়ি চাপা গলায় প্রশ্ন করে :

'তুমি জান, নিকোনোভা—'

'জানি।' সামঘিন বেশ জোরেই বলে ওঠে।

'ইস্‌ কী দিনকাল গো!'

কর্নেল ভাসিলিযেভেব হত্যাব পর কয়েদখানায় এল ছ'জন নতুন বন্দী। তাদের মধ্যে সামঘিন দ্রোনভকে চিনতে পারে। দেখে প্রায় আনন্দই হয় যে, খাটো সোয়ালো-টেল্‌-কোট আর স্ট্র-হ্যাট্‌ পরে দ্রোনভ স্ট্রাইপ-ওয়ালা ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিযে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে দেওযালেব পাশ দিয়ে সংযত পাযচারি করছে। তার মাথাটা নীচেব দিকে নোযানো, মাটির দিকে। কখনো আবার থমকে থমকে দাঁড়ায়, যেন কোন কিছুতে ধাক্কা খেযেছে। পাতলা কটা-রঙের গোঁফে মাঝে মাঝে হাত বুলোয। পুবনো কৌতুক-নাট্যেব কোন চরিত্র যেন। মনেই হয় না যে এই লোকটা কখনো বাজনীতিতে অংশ নিতে পারে। বার-দশেক পাযচারি ক'রে দ্রোনভ অন্তর্হিত হতেই সামঘিন মনে মনে হেসে ওঠে

'জেলখানায় ও পাচ ঘণ্টা সময় কাটাল।'

॥ ২৬ ॥

সামঘিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি পেয়ে গেল, এমন ঔদাসীন্যে যে মনে লাগে। সকালে রক্ষাদপ্তরের অ্যাডজুটান্ট এসে উপস্থিত, সঙ্গে সহকারী জেলা-এ্যাটর্নী। দিলদরিয়া মেজাজে খোশগল্প করে। বলে যায় সেইদিন সন্ধ্যাবেলাতেই সামঘিন ছাড়া পাবে। কিন্তু ছাড়া পেল তার পরের দিন সন্ধ্যায়। গাড়ী চেপে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখে রাস্তায় অস্বাভাবিক ভীড়, কয়েদখানায় যেমন দেখেছে শহরেও ঠিক তেমনিই হট্টগোল। বাড়িতে অভ্যর্থনা জানায় ডাঃ লুবমুদ্রোভ। হাসপাতালের পোশাকেই উঠোনে বেড়াচ্ছিল। দেখে থমকে দাঁড়ায়, হাতের তল দিয়ে সামঘিনকে ঠাহর ক'রে চেঁচায় :

'আরেঃ, বন্দী যে! এস এস, আমার অভিনন্দন! কী-সব ঘটছে, অ্যাঁ? রাশিয়া অবশেষে গড়ে উঠছে যে।'

একই নিঃশ্বাসে জানায় আর্কাদির অসুখ। আমাশা।

উল্লসিত অভ্যর্থনাটুকু সামঘিনের ও-বাড়িতে থাকবার পরের দিনগুলো পাকা রঙে রাঙিয়ে তোলে। কর্নেল ভাসিলিয়েভ কিছু বাড়িয়ে বলেনি, বাড়িটা সত্যিই বলশেভিস্ট হেড-কোয়ার্টার। ওপরতলায় ডাক্তারের ঘরে আর চত্বরে স্পিভাকের বাসায় এত গোলমাল, যেন মনে হয় রেলের স্টেশন। সামঘিন অতিথি-অভ্যাগতের সংখ্যা দেখে অবাক। তারা সবাই বাগানে বেড়ায়, কুঞ্জে গিয়ে বসে, খিট্‌খিট্‌ স্বরে তর্ক তোলে, ফিস্‌-ফিস্‌ গুজ-গুজ করে, কোথায় চলে যায় আবার ফিরেও আসে। সামঘিনের প্রতিবেশী কাঠের-ব্যবসায়ী তাবাকভের আঙিনায় ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে ক্রোকেই-বল খেলার আওয়াজ। বড় ছেলেটি—লম্বা চুলওয়ালা তরুণ। বিশাল নাক, ঢ্যাঙা হাত, আগাগোড়া সাদা পোশাক পরা যেন মস্কোর কোন সরাইখানার ওয়েটার—দোষীর মতো ভঙ্গীতে সামনে দাঁড়িয়ে শুনছে স্পিভাকের কথা

'এ একেবারেই ক্ষমাহীন, বুঝেছ? এতো মেনশেভিজম্‌। শ্রমিকদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া তো তোমারই কর্তব্য জনতার প্রতিনিধিত্বের আইডিয়াকে ভ্রান্ত ক'রে তোলার চেষ্টা তাদের সামনে খুলে ধরতে হবে।'

ছেলের সাংঘাতিক অসুখ তবুও স্পিভাকের পাত্তা পাওয়া যায় খুবই কম। সকালে কোথাও চলে গিয়েছিল, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার জন্যে ফিরেছিল, তারপর আবার অদৃশ্য। খুব রোগা হয়ে গেছে, ফ্যাকাশে। তবুও আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর ধরন। গোল-মতো মার্জার-মুখে কেমন বিদ্বেষের ভাব। সে-ভাব ফুটে উঠেছে ওর টিপে-রাখা ঠোঁটে এবং দুশ্চিন্তা কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগলের বঙ্কিম রেখাতেও। আগস্টের বিশ্রী দিন। শহরের ওপর দিয়ে ধূসর মেঘ হামা দিয়ে-দিয়ে বেড়ায়, রাস্তায় তাদের ছায়াগুলো পেছনে-পেছনে চলে। লোকের চলাফেরার গতি অনেক বেশী। রোজই আশা করা হচ্ছে কন্‌স্টিট্যুশানাল গভর্নমেণ্টের ঘোষণা করবেন জার। তাবাকভ তার লম্বা চুল দুলিয়ে স্পিভাকের কাছে শেখা কথাগুলোই বাগানে কা'কে যেন বলছে :

'এই কন্‌স্টিট্যুশানটা লিব্যারেলদের প্রতি জারের নৈবেদ্য, যাতে তারা শ্রমিক-শ্রেণীর গলার ফাঁসটায় টান মারতে সাহায্য করে।'

'গবেট!' সামঘিন ভাবে। যারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের বিশ্বাসঘাতকতা করে,

ওদের সম্বন্ধে ভ্যাসিলভস্কির উক্তি মনে পড়ে যায়। 'কীসের জন্যে?' একশো বারের বার নিজেকে ও প্রশ্ন করে।

হঠাৎ ইনোকভ কোত্থেকে এসে—(ছাদ থেকেই পড়েছে যেন!)—চেয়ারে ছড়িয়ে বসে জোরে-জোরে দু'হাত ঘষে প্রশ্ন করে :

'জেলখানায় কেমন লাগল? বিশ্রী জেল এখানকার। সেদলেৎস্ক হলে হ্যাঁ...'

ঘন কালো ছোট-ছোট দাড়িতে মুখ ভর্তি। চোখগুলো গর্তে বসে গেছে, যেন ভয়ানক অসুখ থেকে উঠল। কিন্তু দৃষ্টিতে খুশীর দীপ্তি; বোধহয় রোগ সেরে ওঠবারই আনন্দ। মুখটা মোহান্ত-মার্কা, পরিচ্ছদ খেটে-খাওয়া মানুষদের মতো। ঘরের প্রায় মাঝখানটা পর্যন্ত পা ছড়ান, তাতে শোভা পাচ্ছে একজোড়া বহু জীর্ণ দোমড়ানো হাই-বুট। বুকের ওপর তাড়াতাড়ি ক'রে রাখা দুটো হাত ধাতু-কারখানার শ্রমিকের মতো কালো। ক্যানভাসের ব্লাউজ আর ধূসর-রঙের নোংরা ট্রাউজার পরনে।

'লোকে বিপ্লবীকে সত্যি-সত্যিই বুঝতে আরম্ভ করেছে,' চোখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বলে। 'পার্মে একদিন রাতে আমি রাস্তা ধরে চলেছি—একটা হাঙামা বাধল—তিনজন লোক একটা মানুষকে ধরে দিচ্ছে আচ্ছা ক'রে ধোলাই। জানতে চাইলাম, কি ব্যাপার। যে-মার খাচ্ছিল সে বললে, "কে আপনি? বিপ্লবী নাকি?"..."কেন?"..."না; আপনি চেনা-নাই জানা-নাই একটা লোককে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন কিনা, তাই।" ভাল বলেছিল, না?'

বিশ্রী গন্ধওয়ালা একটা সিগারেট ধরায় ও। নীল-নীল ধোঁয়ার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর পায়ের নীচে গার্টারে হাত ঢুকিয়ে একটা জিনিস টেনে এনে টেবিলে রাখে। জিনিসটা পেতলের, দেখতে অনেকটা দরজার হাতলের মতো।

'এটা তোর জন্যে। মনে আছে একবার তোর পেপার-ওয়েট ভেঙে দিয়েছিলাম?'

অবাক হয়ে সামঘিন জিনিসটা হাতে তুলে নেয়। সাপ হাতে একটা স্ত্রীলোকের পেতলে-গড়া মূর্তি।

'সে-তো কতদিন আগে। এখনো মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। কারো কাছে ধার রাখতে আমার ভাল লাগে না। ক্লিওপেট্রা।... নিজেই ছাঁচ করেছি, ঢেলেছি। বেশ মজার কাজ এই ছাঁচ তৈরি আর ঢালাই। এই কাজেই লেগে থাকব ভাবছি।

'তুই কি—সোশ্যালিস্ট-রেভল্যুশনিস্ট?' সামঘিন জানতে চায়।

'নাঃ,' মাথা নাড়িয়ে ইনোকভ উত্তর দেয় 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দিকেও টান নেই। বলশেভিস্ট। মেনশেভিস্ট। অমন জিনিস আমার মাথাতেও ঢোকে না, মনেও না। বোধহয় আমি নৈরাজ্যবাদী—কি বলিস?'

ক্লিওপেট্রার পেতলের সুন্দর মূর্তিটা ইনোকভকে কিছুটা সামঘিনের মনে ধরিয়ে দিয়েছে।

'হ্যাঁ, বোধহয় তুই নৈরাজ্যবাদীই,' ভেবে-ভেবে বলে। তারপর জিজ্ঞাসা করে: 'জানিস্ করভিন্ আছে রুশ-জন-সঙ্ঘে।'

'ওটা জাহান্নমেও যেতে পারে,' ইনোকভ শান্ত গলায় জবাব দেয়। 'বেশ মজার,' একটু থেমে নিয়ে দম ফেলে বলে: 'তখন বোধহয় আমার কোনো শত্রুর দরকার হয়ে পড়েছিল, যার ওপর ঝাল ঝাড়া যায়। তাইতো বেছে নিলাম ওই জানোয়ারটাকে। এই বিষয়টার ওপর গল্পও লেখা যায়—কোনো এক সন্ধ্যায়, মনটাকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একঘেয়েমি কাটাতে। আমি কবিতাও লিখেছিলাম। নিজেকে বুঝ্ দিয়েছিলাম প্রেমে পড়েছি'

খুক্-খুক্ ক'রে হাসতে-হাসতে ইনোকভ চোখ বন্ধ করে। যেন তন্দ্রা এসেছে।
'খুব চাল মেরেছে তো।' সাময়িন ভাবে।

চোখ না খুলেই ইনোকভ বলে : 'ও হ্যাঁ, শোন—কামা-র ওপর স্টীমারে যাচ্ছি, এক রেড-ক্রশ নার্স। মুখটা চেনা-চেনা, কিন্তু ঠিক চিনতে পারি না। হঠাৎ মেয়েটা অংগ দুলিয়ে শালে সারা-শরীর জরিয়ে বসল। তখন চিনলাম, আরে লিদিয়া। শুনলাম স্বামীকে নিয়ে চলেছে—তাকে কবর দিতে।'

'নিহত ?'

'টাইফাস না, নিউমোনিয়া। কি জানি, ভুলে গেছি। অদ্ভুত একটা গল্প বলল, কোন্ রেলওয়ে স্টেশন সৈন্যরা লুঠ করছিল—এমনভাবে বলল যেন স্টেশনটা ওর নিজেরি সম্পত্তি।'

ইনোকভ শরীরের নীচে পা দু'টো গুটিয়ে নেয়। বলের মতো গুড়ি-সুড়ি মেরে বসে। কথায় স্পষ্টতঃই ভাল-লাগার উত্তাপ, চোখ দু'টো উত্তেজনায় ধক্-ধক্ ক'রে জ্বলে।

'আমিও অমন একটা কাণ্ড দেখেছি। তোমস্কের কাছে। অদ্ভুত দৃশ্য, সাময়িন, হারিকেন-ঝড়ের মতো। স্টেশনে গর্জন করতে করতে এল একটা ট্রেন, তীব্র আওয়াজ তুলে ধোঁয়া ছড়াতে-ছাড়াতে। সমস্ত কামড়া থেকে পিল্‌পিল ক'রে বেরুল ফৌজী-পল্টন। সৈন্যগুলো এমন ক'রে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল যেন বিষের ক্রিয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে সারা স্টেশন জুড়ে চিৎকার, চেঁচামেচি, খিস্তি-খেউর। জানলার শার্সিতে-শার্সিতে সব কিছুতেই ভেঙ্গে-চুরে ছত্রখান—শত্রুপুরী যেমন ক'রে বিধ্বস্ত করত ঠিক তেমনিই উৎসাহে চলল এই কাণ্ড।'

লোভীর মতো নিঃশ্বাস টেনে উত্তেজিত সুরে আবার বলে :

'আধ ঘণ্টারও কম ওদের এই যুদ্ধ চলেছিল। তারপর আবার চিৎকার-চেঁচামেচি ঝন-ঝনাৎকার তুলে চলে গেল। স্টেশনটাকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে গেল, দেখে মনে হলো যেন পগ্রোমের পর কোন ইহুদী-বাড়ি। এক ব্যাটা দাড়ি-ওয়ালা—যেন অ্যাডনিস—তার বেয়নেটের ওপর স্টেশন-মাস্টারের ক্যাপটাকে বিদ্ধ ক'রে নিয়ে গাড়ীর পেছন দিককার প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়েছিল মনুমেন্টের মতো। আশ্চর্য মূর্তি। সৈন্যরা খেপে আছে। এমন মেজাজে ওরা সেন্ট পীতর্সবুর্গকেও বিধ্বস্ত করতে পারে। রক্ত-রবিবারে ওদের ওখানে থাকা উচিত ছিল,' বক্তব্য শেষ হলো। শরীরটাকে নরম ক'রে নিয়ে হাসিমুখে আবার চেয়ারের ওপর এলিয়ে পড়ল।

তার মোহান্তর মতো মুখটার দিকে ভেঙচি কেটে সাময়িন জিজ্ঞেস করতে চাইল সেণ্ট-পীতর্সবুর্গ ধ্বংস করবার প্রয়োজনটা কি। কিন্তু দমন করল নিজেকে। শুকনো-কণ্ঠে বরং জিজ্ঞেস করল : 'সাইবেরিয়ায় গিয়েছিলি কেন?'

'এমনিই—দেখতে,' ইনোকভ জবাব দেয়। হাই তুলে আবার বলে : 'কাল এখানে ফিরে এলাম কিন্তু কেন জানি না। এখানকার তো সবই জানা, আর আমার কেউ নেইও। ভাল কথা। তামিলিন মাস্টারের সঙ্গে পথে দেখা হলো। বেশ মুটিয়েছে, ফুলে গেছে। চোখ দু'টো চর্বিতে ছেয়ে গেছে। বাড়িতে চায়ের নেমতন্ন করল। ওঁর সঙ্গিনীটি মারা গেছে, কাজেই বাড়ির মালিকানা এখন ওরই। পাঁশনে-পরা এক কাপড়ের খুঁটি নিয়ে বাস করছে। ভগবানের ব্যাপারে ডিগবাজী খেয়েছে। খুব মজাদার জীব একটা!. .হ্যাঁ ক্লিম, আজ রাত্রে এখানে থাকা যাবে?'

ইচ্ছা না থাকলেও ক্লিম ওকে ডাইনিংরুমে নিয়ে যায়। ঘরটা অন্ধকার, ফাঁকা,

জানালাগুলোর খড়খড়ি তোলা। বসে হাইবুট টেনে খুলতে খুলতে ইনোকভ বলে:

'মন্তরে বিশ্বাস করিস? ডাইনীদের ঝাড়ফুঁক,—রক্ত শুকিয়ে দেবে, পিরীত জাগিয়ে তুলবে?'

'কি বাজে বকছিস।'

'কিন্তু আমি করি। নিজের চোখে দেখেছি বুড়ীগুলো কেমন ক'রে রক্ত বশ করে।.. আমার মনে হয় চৈতন্যের বিরুদ্ধে দর্শন এমনি এক জাদুমন্ত্রই। তোব তাই মনে হয় না?'

'ঘুমো দেখি,' বিড়বিড়েয়ে উঠে সামঘিন চলে আসে। ভাবে এখানকার সব এক্ষুনি মিটিয়ে দিয়ে মস্কো চলে যাই।'

ডাইনিং-রুমের মেঝেতে গাদাখানেক সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে রেখে সকাল-বেলা ইনোকভ চলে গেল। সেদিন শহবের বাড়ীগুলো যেন সংকুচিত হযে পড়েছিল, সব বাসিন্দাদের বাস্তার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিযেছিল। ক্যাথেড্রালেব ঘণ্টা গম্ভীরস্বরে বাজছিল। রাস্তা দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ীগুলো ঘর্ঘর ক'রে চলে, লোকে ব্যস্ত পায়ে পথ হাঁটে, কথা বলছেনা চেঁচাচ্ছে যেন। অদ্ভুতভাবে মিলে মিশে গিযেছিল ছুটিব পোশাকপরা শহুবে লোকেদেব পাশে নোংবা বেশ-বাসেব শ্রমিক। গুণ্ডা বদমাযশেরা সব জায়গাতেই দৌড়ে দৌড়ে চলেছে যেন আগুন দেখতে ছুটেছে, অথবা কোন মিলিটাবী প্যাবেডে। সপ্তাহেব অন্য সব দিনের মতোই দিনটা ঢিলেঢালা, বৈশিষ্ট্যহীন ঠিক বোঝা যায না, অপরিষ্কার আকাশে বৃষ্টির হুমকি কিনা। ফালি ফালি নীল এবং ধূসর মেঘেরা আকাশকে চিত্র-বিচিত্র বেশ পরিয়েছে। তালিদেওয়া পালের কথাও মনে পড়ে এই আকাশ দেখে।

সামঘিন ক্যাথেড্রালে গেল না। সেখানে আজ চলেছে এক প্রার্থনার ব্যবস্থা। শহবের পার্কে ও থেমে পড়ল। মনে হয় যেন নানা তরিতরকারীতে-ভবা বিরাট একটা থালা। ছাতা এবং মেযেদেব সাজ যেন বীট, গাজব বা শসা। পার্ক লোকে ঠাসা, তারা ছোট ছোট দল ক'রে সন্দিগ্ধ সুরে চাপা কথাবার্তা বলছে। একটা বেঞ্চের ওপরে একজন লম্বা টাক-মাথা সরকারী কর্মচাবী দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল .

'ভদ্রমহোদয়গণ! আমি কিছুই চাই না, জীবনের কোন পবিবর্তনইনা। কিন্তু মহাশয়রা, আপনাদের আনন্দে, আপনাদের উৎসাহে, আপনাদের প্রাণবহ্নিতে আমি বাহবা জানাচ্ছি—হুর্‌রা।'

শ্রোতাদেব মুখে সামঘিন আনন্দের কোন চিহ্ন খুঁজে পায় না, তাদের চোখেও প্রাণ-বহ্নির কোন স্ফুলিঙ্গ ও দেখে না। মনে হয়, সবাই বোধহয় ওরই মতো অনিশ্চিত মেজাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্বা লিক্‌লিকে বক্তাটিকে ও দেখ্‌বা-মাত্র চিনতে পারে,—পোষ্টাপিসের কেরানি ইযাকভ্‌-জ্যবিন যার বাড়িতে মাকারভ একসময় বাস করতো। মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোক তাব হুরবার প্রতিধ্বনি তুলল—তাও অপ্রস্তুতভাবে, দুর্বল কণ্ঠেই। সামঘিনের পাশে গরম ওভার কোট পরা নাদুস-নুদুস একটা লোক বলে ওঠে: 'হেঃ! লোকটা কেমন চম্‌কে চম্‌কে উঠছিল না?'

'বিক্ষোভটা বের ক'রে দিচ্ছে', কে একজন মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে।

'হি-হি-হি '

জ্যাম-ফ্যাক্টরীর একদল মেয়েশ্রমিক, প্রায় জন তিরিশ হবে, পাশ দিয়ে মহানন্দে রসে ডগমগ হ'যে কনুই ঠেলে ঠেলে রাস্তা ক'রে চলছিল। তাদেরই একজন, খুব সুন্দর দেখতে, পায়ে তাল দিতে দিতে উজ্জ্বল স্কার্ট দুলিয়ে গান ধরেছিল:

'রাস্তায় যাব গো,
কিনিতে মিঠা বিস্‌কুট প্রভুর আমার
কিনিতে গরম বাণ্‌-ও তাহার—
ধর গো এ-গুলো,
ঠুঁসে নামাও না গলা দিয়ে তোমার!'

'আমাদের শহরের সবচেয়ে রসবতী এরা,' মোটা লোকটা সামঘিনকে জানায়। অহঙ্কার করছে যেন শহরটা এই বিশেষত্ব দেখাতে পেরেছে ব'লে।

মেয়েটির সঙ্গিনীরা সতর্ক নজর বুলিয়ে মাঝে-মাঝে খিলখিলিয়ে উঠছে। তাদের পেছনে রাশভারি-চলনে চলেছে কারখানার মালিক, শতবর্ষবয়স্ক অন্ধ ইয়ের্‌মলায়েভ, তার বিবর্ণ লম্বা দাড়িওয়ালা মৃতের মতো মুখে কালো-রিমের চশমা। ছেলে গ্রিগরি একটা হাত বগলের নীচে পুরে তাকে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে, ঠেলাগাড়িওয়ালার মতোই ঝলঝলে-ভাব। সে-ও নিজে বুড়ো কম নয়, ষাট বছর প্রায় বয়স, শহরের মধ্যে একনম্বরের ঝগড়াটে। বৃদ্ধের আর একটা হাত ধরেছে তার জামাই নিয়েলভ। সে-ও বুড়ো, ইঁটের ভাটার মালিক,—খুশী-খুশী মুখ, লম্বা নাক আর কোঁকড়ান চুলে দেখাচ্ছে একটা কুমড়োর মতো। গ্রিগরি চোখের হলুদ শ্বেতাংশ কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে লোকজনকে অনবরত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধমক দেয়:

'একপাশে স'রে! দেখতে পাও না?'

তার বাবা হাঁটু-ঝুলের কালো ফ্রক-কোর্ট আর কালো ভেলভেটের লম্বা টুপী প'রে কাঠের মতো পা দু'টো টেনে নিযে চলেছে। ভেজা-ভেজা পচা নাকটা হাতের তালু দিয়ে ঘষে নাকী-নাকী সুরে ব'লে ওঠে: 'এ-হ'তে দিও না, ক্রীশ্চানেরা, এ-হ'তে দিও না!'

সামান্য একটু টেনে-টেনে কিন্তু লম্বা-লম্বা পা ফেলে, দৃঢ়পদে এক-একটা পা-য়ে অনেকটা ক'রে পথ এগিয়ে,-ভীড় ঠেলে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে চলে সরাইখানা-মালিক আর মাল-খালাস করবার গাড়ীর ঠিকাদার ভরোনভ, ভীড়ের মধ্যে দিয়ে হনহন ক'রে চলেছে। লোকটা বিশাল মুখটা যেন ভেড়ার মোটা ল্যাজের মতো, হাতে বেশ ভারী ওজনের একটা লাঠি। তার পেছনে, চিন্তিত মুখে, আর ঠিক ওইরকম ব্যস্ত-সমস্ত ভাবেই রুশ-জনসঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যেরা চলেছে বাবায়েভ, যে আগে ক্ষৌর-কার ছিল আর এখন "কৃত্রিম-খনিজ-জলের" প্রস্তুতকারক; কশাই করোবভ; জঞ্জাল-পরিষ্কার-ব্যবসায়ের মালিক লালেচকিন, স্নানঘরের মালিক দমোগাইলভ; ফার-ব্যবসায়ী জাতিরকিন—অপ্রতিদ্বন্দ্বী দাবা খেলোয়াড় একটি, লোকটার বুক, মুখ, সবই লেপা-পোঁছা, আর চোখদুটো অনাসক্ত।

ঘণ্টা দেড়েক পার্কে বসে সময় কাটানোর পর ক্লিমের ধারণা হয়, যে সাধারণ লোকের মনে কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে অস্পষ্ট ভীতি জেগেছে, কিন্তু তার কৌতূহল সে-ভয়টা কাটিয়ে উঠেছে। এরা ঘটনাটার রাজনৈতিক গুরুত্বের কোন উল্লেখই করছে না—নিঃসন্দেহে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছে না ব'লেই ভয় পাচ্ছে যদি সাংঘাতিক কিছু বলা হ'য়ে যায়।

'লোকে বলছে এখানে নাকি বাজনা বাজবে।' সামঘিন শুনতে পায়।

'বাজনা—কেন—সৈন্যেরা তো আর প্যারেড করছে না?'

'ঠিকই তো! জারের নয়।'

'আমাদের সঙ্ঘের লোকেরা মার্চ করছে।'

'করতেই হবে।'

একজন বেঁটে লোক, বারিপোতা স্যুট আর ধূসর হ্যাট পরা, বেতের ছড়ি

পুলিসের উদ্বিগ্নকণ্ঠে ব'লে ওঠে : 'পুলিশ নেই কেন? জানেন নাকি পুলিশ কেন নেই?'

'লোকে এখন অনেক সংযত ব'লে।'

শুধু একজন গোমড়ামুখো লোক, তার গা'য়ে জীর্ণ কোট আর মাথায় অভিজাত টুপী, সাহস ক'রে তার মতামত জানাল। তার ঘাড়টা দিয়ে সামঘিনকে একপাশে ঠেলে ফেলে সে ওরই আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল, তারপর হেঁড়ে গলায় বলে উঠল :

'এই ইহুদী-কান্ড থেকে কিছু ভাল ফল হবে না, আর ইউনিয়নপন্থীদের তো সব মাথায় গোবর-পোরা।'

দিনটা যেমন ঢিলেঢালা, বৈশিষ্ট্যহীন, লোকগুলোও তাই। অনেকে দাঁড়িয়েছে গাছের ছায়ায যেন নিজেদেরকে আড়ালে রেখেছে; কিন্তু মেঘের থেকে মুখ বের ক'বে সূর্য তাদের স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিল অতি অল্প ক'জন, তা-ও ইতস্ততঃ চরণে, স্কোয়্যারের দিকে চলেছিল, ক্যাথেড্রালের পানে।



সামঘিন পার্কের রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই মেঘের পেছন থেকে সূর্য গড়িয়ে এসে ক্যাথেড্রালেব সিঁড়িতে আলো ছড়িয়ে দেয়, চকচক ক'রে ওঠে পাদ্রী স্নাভোরসভের দণ্ডায়মান মূর্তি—চওড়া বুকের ওপর সুবর্ণ-ক্রশ, বাঁ-হাত আকাশের দিকে উত্থিত আর ডান-হাত ভীড়ের পানে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে সটান মেলে দেওয়া। তাব চারপাশে, নীচে, লোক গিজগিজ কবছে, তাবা তেবঙা পতাকা দোলাচ্ছে, আইকনেব টুকরোগুলো ঝকঝক ক'রে উঠছে, চুলভর্তি বা টেকো মাথা-গুলো নিবাবরণ। এক মিনিটেব জন্য গোলমাল থেমে যায়, একটা বাজখাঁই গলা চেঁচিয়ে ওঠে মনে হয় যেন মেগাফোনেব মধ্যে দিয়েই কথা বলছে

'উন্মাদের প্রলোভনকে বিশ্বাস কবো না' বিদেশীদেব চালাকীতে আস্থা স্থাপন করো না!'

সামঘিন দেখল আইকন আর পতাকাধারী মানুষগুলো এক সারে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভীড যে রকম চটপট্ স'বে গিযে তাদেব পথ ক'রে দেয তা-তে জনতার মনের ভয়টা সামঘিন স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। স্নাভোবসভের কাছে ঐতিহাসিক কজলভের ছিমছাম ছোট্ট শরীরটা চোখে পড়ে তার এক হাতে ছাতা আর অন্য হাতে টুপী। জিনিসগুলো ভীডেব দিকে দেখিযে দেখিয়ে সে বোধহয কথা কইছিল চিৎকার করছিল। ক্যাথেড্রাল গেটের পটভূমিকায় তার মূর্তিটাকে দেখাচ্ছিল যেন এক তবুণ বৃদ্ধের সাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লিমের পেছনে একজন ব'লে ওঠে · 'চলল ওরা।'

উচ্ছৃঙ্খল ভীড়টা ক্যাথেড্রাল থেকে পিছু হঠে রেলিঙেব ওপর চাপা খেয়ে দাঁড়ায।

কয়েকটা মিনিট লোকের মাথার পেছন দিকটা ছাড়া আর কিছুই সামঘিনের চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু পরেই লোকগুলো মাথা সবিয়ে নিয়ে রেলিঙ ঘেঁষে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে চলল। নানা আকারের পাশ-ফেরান মূর্তি সামঘিনের সামনে দিয়ে বন্যার মতো চলে যায়, সবায়ের চোখে-মুখে একই রকমের আন্তরিক অভিব্যক্তি।

'ওরা এদিকে আসছে কেন? আমাদের বিরুদ্ধে?' সার্মাঘনের সামনে একজন পাতলা মতো লোক একপাশে সরে গিয়ে ফিসফিস ক'রে ওঠে। কর্নীভনের দৃঢ় মুখটা সার্মাঘন দেখতে পায়। তার মোটা গোঁফের ফাঁক দিয়ে পরিস্কার কথাগুলো হিংস্রভাবে কেটে-কেটে ঝাঁকুনি দিয়ে-দিয়ে বেরোয় 'আমাদেব—মহা-নুভব-সম্-রাট-যেব প্রতি '

তাব চোখগুলো নাকের হাড়েব থেকে সবু একটা বেখা দিয়ে প্রায় অবিচ্ছিন্নই থেকে গেছে—সার্মাঘন আগেও যে-বকম লক্ষ্য করেছিল এখনো তাই মনে হলো—ওর ওই জায়গাটায় যেন ৪-এব মতো।

কবভিনেব পাশে মাটিতে ছাতা ঠুকতে ঠুক'ত আব হাতেব ওপব সযত্নে ক্যাপটা ধ'রে ঐতিহাসিক কজলভ চলেছে তাব লাল মুখটা ঘামে স্যাঁতসেঁতে বা হয়তো চোখেব জলেই ভিজে গেছে। সে ও গান কবছিল মুখটা হাঁ ক'বে খোলা ঠোঁট দু'টো নড়ে কিন্তু কণ্ঠস্বব শোনা যয না। তাব ঘাড়েব ওপব দিযে ভবোনভেব মোটা অন্ধ মুখটা দেখা যায় ভেড়াব লেজ মাকা দাড়িতে একটা গোল ছিদ্র।

'আল-এবজান্দব ওভিচ ছিদ্রটা চেঁচিয়ে ওঠে।

ভবোনভ জা বব প্রাতর্কৃতি বযে নিযে চলেছে। লালেচকিনেব হাতে সোনার সাজ পরানো আইকন তাব বোলাব হাতে ফিতে দিয়ে জ্যাকেটেব বোতামে আটকানো বুকেব ওপব সেটা নড নড ক'বে দুলছে আইকন দিযে সেটা ধাক্কা দিযে সবাকে সবাতে পথ চলছে। তাব পাশে জেগে আছে ইযেবমলাযেভেব টাক-মাথা সেই কালো চশমা সাঁটা মতেব মুখ সবুজ দাড়িব দোলানি দেখে মনে হয যে সে ও বোধহয গান গাইছে বা প্রার্থনা কবছে। ভযঙ্কব দেখাচ্ছে। বোধহয ভয দেখানোব জন্যই তাকে বিশেষ ক'রে আনা। পতাকা আইকন আব জার-জাবিনাব বাধান ছবি হাতে লোকগুলো জমাট ভীড় সৃষ্টি ক'বে মিছিল ক'রে চলেছে। অনেক ক্ষণ পবে পবে হঠাৎ কোন উজ্জ্বল নাবীমূর্তি দেখা যায। তাদেবি একজন গোটান লাল প্যাবাসল হাতে চলে গল প্যাবাসলটব মুখ থেকে একটা সাদা বুমাল ঝোলে।

'তিন শো—বা হয়তো পাঁচ শোই সার্মাঘন গোনে। ক বে তো সত্তব হাজারেব বাস।'

সেণ্ট পীতর্সবুর্গেব ভাইবর্গী সাহেব শ্রমিকদেব সেই অদম্য মিছিলেব কথা ভাবে তাদেব কথাবার্তাব সেই মখমল নরম গুঞ্জন আব তাব গাম্ভীর্য। ইউনির্যানিস্টদেব এই অসংলগ্ন গোলমাল শোনাটা কি বিশ্রী যন্ত্রণাদাযক কি ভযানক বৈচিত্র্যহীন।

'এ-এক অদ্ভুত দেশ। সব কিছুই যা হওযা উচিত তা নয সে বকম হবাব কথা তা নয–

মিছিলেব পেছন পেছন দলছাড়া নানা একক লোক চলে ছ স্পষ্টই বোঝা যায ওবা মিছিলে যোগ দিতে মোটেই ব্যস্ত নয। পার্ক ক্রমে ক্রমে পবিত্যক্ত হযে ওঠে। বেলিঙ থেকে প্রায় বাবো-পা দূবে বাস্তাব খোযাব ওপব কোন এক মহিলাব হলুদ দস্তানা পবে আছে। তাব দু'টো আঙুল এমনভাবে জড়িযে গেছে যেন ক্রুশেব চিহ্ন বানিয়েছে। দৃশ্যটায সার্মাঘনেব মনে পড়ে যায তুষারের মধ্যে সেই কাটা হাতেব কথা। এক মুহূর্ত ভীড়টাকে লক্ষ্য কবে ক'বে দেখে শহবেব বড় বাস্তাব মুখে গিযে মিছিল শবীবটা চেপে ঢুকে পড়ছে পেছনে বেখে যায দুটা মোটা-মোটা ল্যাজ। তখন সার্মাঘন পার্কেব মধ্যে নেমে পড়ে বুট দিযে দস্তানাটাকে মাড়িযে নদীর ধাবেব দিকে চলে যায। ওকে পেছনে ফেলে এগিযে যায একটা ছোট্ট নেড়ী-কুকুব, তার দাঁতের মধ্যে দস্তানাটা ধরা। সে-ও নদীর দিকে ছুটে চলেছে।

সামঘিন তাই ফিরে চলল পার্কের দিকে। সেখানে বেঞ্চের ওপর এখন বুড়ো-বুড়ীর মতো বসে আছে অনেকগুলো চড়ুই। পুকুরের কালো জলে হলদে পপলার-পাতা ভাসছে, তারা যেন আঙুল কেটে বাদ দেওয়া মানুষের হাত। সামঘিন একটা বেঞ্চে বসে সংখ্যার ভয়ানক অমিলটার কথাই ভাবে :

'পাঁচ বা সাত শো লোক—আর সম্ভব হাজার।



বাড়ি ফিরে যেতে ওর ইচ্ছা করছিল না। কারণ ও নিশ্চিত য এতক্ষণে সেখানে 'জনস্বার্থের সমর্থকদের বজ্রকণ্ঠ নিনাদিত হচ্ছে। তবুও ধীরে-ধীরে বাড়ির দিকেই চলে। সরু সরু নির্জন পথ দিয়ে হাঁটে ছোট্ট-ছোট্ট বাড়ির বন্ধ গেট আর কপাট-তোলা জানালা পেরিয়ে চলেছে। সব শান্ত। একটি শিশুর কান্না নেই। ঈষৎ হাওয়ায় বাগানের গাছের ডালে শুধু শুকন পাতাগুলো দোলে। শহরের মাঝখান থেকে গুরু-গুরু আওয়াজের গুঞ্জন ভেসে আসছে। বাড়ি যেতে হলে সামঘিনকে একটা রাস্তা পেরোতে হবে যেখান দিয়ে লোকগুলো মার্চ করছে। যেই বাঁক খেয়ে আরেকটা ছোট্ট রাস্তায় ঢুকতে যাবে সামনেই পথ আটকে দেখে ইয়াকভ জন্নারিন একটা মোড় পেরিয়ে বিরাট বিরাট পা ফেলে হনহন করে ওর দিকে আসছে। টুপীটা হাতে নিয়ে বাহু দুটো এমন করে মেলে রেখেছে যেন সামঘিনকে আলিঙ্গন করবে। ওর মুখটা ফুলো ফুলো চোখ দুটো ভেজা-ভেজা ঝাপসা। গলা উঁচু না করেই হতভম্বের মতো স্বরে বলল

'ধারণা করতে পারেন? ওরা একটা মানুষ মেরে ফেলেছে! ভরোনভ, ওই হোটেলওয়ালাটা লোকটার মাথায় মারল এক লাঠির বাড়ি আমার চোখের সামনে মশাই—সক্কলের চোখের ওপর! বলুন না আপনা কই জিজ্ঞেস করছি—এর মানে কি? লোকটা—দাওয়াইখানার মালিক হাইনৎজে—সব্বাই তাকে চেনে!'

সামঘিন থমকে দাঁড়ায়। হাইনৎজেকে ও চেনে বেশ বিনয়ী আর বুদ্ধিমান, শহরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলের বিশিষ্ট কর্মী।

'ছ্যাকড়াগাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল আর হঠাৎ ভরোনভ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল,' জন্নারিন হাত নেড়ে নেড়ে বলে টুপীটাকে বিজ্ঞাপন বোর্ডের ওপর বারকয়েক নাড়ে। তার ফোলা ফোলা চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়ায় লম্বা লম্বা পা-দুটো দিয়ে রাস্তার ওপর সজোরে আঘাত করে। শরীরটা দুলে দুলে ওঠে। সামঘিন দেখল লোকটা কিন্তু মোটেই মাতাল নয় শুধু ভয় খেয়েছে আর ঘৃণা জেগেছে

'ফুরম্যানের দোকানে ওর [illegible] গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেঙে দিয়েছে, কর্মচারীটাকে মেরে রক্তে ভিজিয়ে [illegible] ফোঁস ফোঁস করে বলে। 'ঘোড়াটা—লাঠি দিয়ে মাথার ওপর। [illegible] জন্যে? মুক্তি কি?'

সামঘিন ওকে ঘুরে চলে যায় যেন একটা খুঁটিকে প্রদক্ষিণ করে গেল। বড় রাস্তার দিকে একটা গলিপথে ঢোকে। দেখে গলিটা লোকে ভরে উঠেছে।

অনেক দূরে বহু উঁচুতে বাতাসে পত পত করে একটা লাল পতাকা সরু আর লম্বা জীবের মতো যেন।

'একটা বিক্ষোভ-মিছিল,' ক্রিমের করমর্দন করতে করতে উকীল প্রাভদিন বেশ [illegible] বলে ওঠে। বাঁ হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে নিঃশ্বাস ফেলে

বলে · 'আমার ভয় হয়, হয়তো এ হবে অক্ষমতারই প্রদর্শনী।'

সামঘিন ফিরে চলে যেতে চায়, কিন্তু প্রাভদিনের সামনে সেটা কেমন দেখাবে, বিশেষতঃ সে-ভদ্রলোক যখন দস্তানজোড়া পকেটে পুরে বলে উঠেছে : 'ওঃ, বেশ—চলুন যাই। আমাদের তো যেতেই হবে।'

সামঘিন তার পেছনে-পেছনে চলে। তাদের সঙ্গে অনেকেই এসে জোটে।

'আমরা যাকে বলে অবরুদ্ধ,' প্রাভদিন জানায় : 'দেখুন,' কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে নির্দেশ করে : 'ইউনিয়নের লোকগুলো উন্মাদের মতো ছুটছে, আর সামনের দিকে রয়েছে—আমাদের—চলুন ওদেরকে প্রাণপণে বোঝাতেই হবে—'

পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে খুব জোরে হেঁটে চলে, সামঘিনের বাহুটা শক্ত ক'রে ধরে থাকে।

রাস্তার মাথায়, লাল ঝাণ্ডার চার পাশে দাঙ্গাকারীদের দল স্ফীত হয়ে উঠেছে : রেলের লোক, কারখানার শ্রমিক, জিমন্যাশিয়ামের ছাত্র—অনেক মেয়েও—যুবকের সংখ্যাই বেশী।

'তিন-চার শো,' সামঘিন গোনে। আবার মনে পড়ে : 'সত্তর হাজার—!'

ভীড়ের মধ্যে লম্বা এক বাঁশের মাথায় পতাকা হাতে ক'রে করনেভ দাঁড়িয়েছিল, তার মাথাটা সব্বার চেয়ে উঁচু। সামঘিন লক্ষ্য ক'রে দেখে যে করনেভের মুখটা আজ অন্যরকম, সধারণতঃ যেমন রুক্ষ আব চাঁছাছোলা থাকে তেমনটি নয়। তার চোখ দু'টোও ভিন্ন ধরনের, ছেলেমানুষের মতো।

'কমরেডরা!' ডীক'নর মতো গোছা-গোছা চুলওয়ালা জনৈক ব্যক্তি হুকুম দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে ওঠে। তার গায়ে ফাটা-কলারের একটা নীল ব্লাউজ। চোঙের মতো ক'রে হাত দু'টো মুখের ওপর রেখে চেঁচায় . 'পাঁচ জন ক'রে সার দাঁড়াও!'

বিক্ষিপ্ত হয়ে সব ছুটোছুটি করে। প্রথম ঝাণ্ডার পাশে আরো তিনটে ঝাণ্ডা উঁচিয়ে দাঁড়ায়।

'কমরেড! উপস্থিত ভদ্রমহিলা আর ভদ্রমহোদয়গণ!' প্রাভদিন চিৎকার ক'রে ওঠে : 'ভেবে দেখুন এতে আপনারা কোনখানে গিয়ে ঠেকবেন।'

' "আপনারা" বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন মশাই?' গাজর-রঙের এক ছাত্র চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে।

গোছা-গোছা চুলওয়ালা লোকটা মাথা নাড়িয়ে ঊর্ধ্বে মুঠি পাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে গান ধরে : 'তোমরা শিকার হয়েছ .'

তার সুছাঁদ মুখের দিকে তাকিয়ে সামঘিন চিনতে পারে, লোকটা দুনায়েভের বন্ধু ভারাক্সিন।

প্রাভদিন মাথার টুপী খুলে দস্তানা পকেটে রাখে। দুর্বল বিষণ্ণ কণ্ঠে গানটা চালিয়ে যায় :

'জনতার সীমাহীন প্রেমের।'

ওদের পায়ে মার্চের তাল নেই, গানটার গম্ভীর সুরও বেতালা হয়ে ভাসে। আশে-পাশের হাততালি আর চেঁচামেচিতে সুরটা ডুবে যায়, লোকগুলো বসে আছে জানলায়-জানলায় যেন থিয়েটারের বক্সেই বসেছে, কেউ-কেউ আবার দরজা বা গেট থেকে মুখ বের ক'রে আছে। সামঘিন চুপচাপ বিনীতভাবে মিছিলের পেছনে-পেছনে চলে। মিছিলটা বড় রাস্তার দিকে চলেছে। যুবকদের এই বহুবর্ণ ভীড় ওর চোখে সঙ্ঘীয় লোকগুলোর মিছিলের মতই তুচ্ছ। কিন্তু যখন মোড় ঘুরতেই নিশানের রক্তজিহবা অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার চারপাশে উঠল নানা কলরব—শিস, চিৎকার, হল্লা—তখন সামঘিনের বুকের ভেতরটা অজান্তেই যেন কেঁপে ওঠে।

'গোল্লায় যাক! শুনেছেন?' প্রাভদিন চলায় গতি বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। মোড়টায় তাঁর বাঁক খেয়ে ও থমকে দাঁড়ায়। একটা পা উঁচু ক'রে তুলতেই সেটা ওভার-কোটের তলে চাপা পড়ে, আরেক পায়ে খাড়া হয়ে টাল সামলাতে-সামলাতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বলে ওঠে · 'জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গেছে।'

চশমার ভেতর দিয়ে সামঘিন দূরের দিকে তাকায়। সেখানে তিন-রঙা ঝাণ্ডা-গুলো দুলছে, আইকনের সাজ ঝক্‌ঝক ক'রে উঠছে, মানুষের মাথার ওপর দিয়ে উঠে লাঠি-সোঁটা আকাশে নানা ক্রুশ আঁকছে। ওর কাছের কয়েক জন শোভাযাত্রীকে দেখল রাস্তা ছেড়ে পাশ-পথে যেতে। জানালার কপাট আর দরজা ধম-ধম আওয়াজ ক'রে বন্ধ হচ্ছে। মাথার উপরে, মনে হলো যেন ছাদের ওপর থেকেই, সুদৃঢ় গলায় কে চেঁচিয়ে ওঠে . 'গেট বন্ধ কর! কুকুরটার চেন খুলে দাও!'

'চলুন, বুটটা ঠিক ক'রে বেঁধে নিই, এখানেই ঢোকা যাক,' মহিলাদের সাজ-পোশাকের একটা দোকানের দরজা ঠেলে প্রাভদিন বলে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিছিলের বহু লোক পেছন দিকে এক বিষম আলোড়নের চাপে চলে আসে, সামঘিন এক ধাক্কায় দোকানের মধ্যে ঢুকে যায়। এক স্থূলাঙ্গিনী মহিলা, ময়দার মতো সাদা নাকে পাঁশুনে আটা, খুব হাসিখুশী মুখে প্রাভদিনকে অভ্যর্থনা করে। প্রাভদিন সামঘিনের পরিচয় করিয়ে দিয়েই ওর কথা স্রেফ ভুলে যায়। বুটের কথাও ভুলে গেল।

*

ডান-দিকের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্লিম লক্ষ্য করে। দেখে, রাজতন্ত্রীরা রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশ সমস্ত জায়গা জুড়ে তাড়াতাড়ি চলেছে। মনে হয় যেন তারা কোন ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে; তাদের চলাফেরায় যেন কেমন অন্ধত্ব। একদিক থেকে আরেক দিক দুলে-দুলে উঠে তাদের স্তূপীকৃত ভীড় বাড়িগুলোর দেওয়ালে-দেওয়ালে ধাক্কা খায়। রাস্তাটা ভরে উঠেছে বিষাক্ত এবং নীরস এক শীতার্ত চিৎকারে।

তাদের মুখোমুখি পতাকা দুলিয়ে করনেভ একটা জম-জমাট দলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে, দলটা সংখ্যায় দু'শোর বেশী হবে না, প্রতি সেকেণ্ডে আবার তার সারি থেকে লোক কমে কমে ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।

সামঘিন দেখে ঐতিহাসিক কজলভ পাশ-পথ দিয়ে যতটা জোরে সম্ভব খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, ছাতাটাকে উঁচিয়ে ধরে। করনেভকে দেখল মাথার ওপরে হাত তুলে একটা রিভলভার ধরে আছে। দেখলে গোছা গোছা চুলওয়ালা ভারাকসিন করনেভের হাত থেকে ঝাণ্ডাটা ছিনিয়ে নিয়ে সেটাকে লগুড়ের মতো নাড়াচ্ছে, লাল কাপড়ের ওসাড়ে কয়ার মাস্টারের হাত আর মাথা ঢেকে গেছে। গুলি ছোঁড়ার দু'টো পরিষ্কার, ক্রুদ্ধ শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। করনেভ আর ভারাকসিনের মাথার ওপর দিয়ে লাঠি-সোঁটা আর ডজন ডজন হাত আন্দোলিত হয়ে উঠছে, পতাকাটা ধরতে যায়, সেটাকে নীচে নামিয়ে ফেলে। মনুষ্য-দেহের পিণ্ডের মধ্যে সেটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

'এগিয়ে চল ভাই সব! চল ওদের ওপর!' গোলাপী সার্ট-পরা একটা লোক উন্মত্তকণ্ঠে চিৎকার ক'রে ওঠে। লোকের তালগোলের মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে ভারাকসিন, তার কোমর পর্যন্ত অনাবৃত। গোলাপী সার্ট-পরা লোকটা

দৌড়ে তার দিকে যায়। কিন্তু ভারাকসিন ছোট একটা দড়ি ছুঁড়ে মারে, যার একটা প্রান্তে গেরো দিয়ে ভারী ওজন ঝোলান। মানুষটা উপুড় হয়ে পড়ে যায়। দোকানের সামনে লড়াই দু-তিন মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। শোভাযাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা এখন দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটা ল্যাম্প-পোস্টকে জড়িয়ে ধরে ধাঙগর লালেচ্কিন দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধ ইয়েরমলায়েভ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাত দুটো কেঁপে-কেঁপে পাছা, বুক আর তলপেটে বুলোচ্ছে, দাঁড়িও কেঁপে উঠছে। উল্টোদিকে একটা বাড়ির গেটের ধারে একজন ছেলে মাটিতে পড়ে আছে। গোলাপী সার্ট-পরা লোকটা দোকানের সামনে ছড়িয়ে পড়ে আছে, মাথাটা পাশ-পথের ওপর এলান। এমন অনেক ভয়ঙ্কর দৃশ্য সামঘিন সেণ্ট-পীতর্সবুর্গে দেখেছে, তাই এখন যা চোখে পড়ল তাতে ও বিশেষ ভীত হলো না।

'অর্থহীন অর্থহীন,' নিজেকে ও বলে।

পেভমেণ্টের ওপর লাল-শালুর টুকরো আর পতাকার ছেঁড়া-ছেঁড়া নানা ফালি পড়ে আছে; দুটো খোয়ার টুকরোর মাঝে একটা ভাঙ্গা লাঠি গোঁজা, দাঁড়িয়ে আছে সেটা। জারের একটা ছবি মুখ থুবরে রাস্তার পাথরের ওপর পড়ে আছে। এখানে-ওখানে পরিষ্কার খোয়ার ওপর রক্তের ছিটেফোঁটা আর গড়ান রক্তের ধারা। দু'জন লোক, দোকান-কর্মচারীর মতো দেখতে, করভিনকে কনুই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে চলেছে ধিকিয়ে-ধিকিয়ে, পা-দুটো জড়িয়ে-জড়িয়ে যাচ্ছে। বুড়ো লোকটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ওরা তার গায়ে ধাক্কা খায়; বুড়োর পাগুলো দুমড়ে যায়, মাটির ওপর ধপ ক'রে বসে পড়ে, চারপাশের খোয়া-পাথরগুলো হাতড়ায়। মৃতের মতো মুখটা আকাশে তুলে ধরে, সেটা এখন ধূসর রঙের একটা ঘন স্তূপ।

সামঘিন মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকায়। ওর পেছনে বসে একটা মেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রার্ভাদিনকে দেখা যাচ্ছে না। দোকানের মহিলাটি সাদা গোঁফ-ওয়ালা একজন বুড়ো লোককে বক্তৃতা দিয়ে বোঝাচ্ছে:

'ফৌজ ডাকা উচিত ছিল '

রাস্তায় বেরিয়ে পরে সামঘিন। সঙ্গে-সঙ্গে একদল মানুষের ঝাঁকে এসে পড়ে, জামাকাপড় আর মুখের চেহারা দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে তরা এই হাঙ্গামায় প্রচুর মার খেয়েছে। তাদেরই একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'থাম হে তোমরা! এই ব্যাটা ভারাভকার বাড়ির।'

ক্লিমের ডান হাতটায় হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওর মুখের দিকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, গরম ভদ্কার গন্ধ ছড়ায়। জিজ্ঞেস করে: 'সত্যি নাকি? ঠিক ক'রে বল।'

সামঘিন দেখে ওর মুখোমুখি একটা ফোলা-কপাল আর নিষ্প্রভ কুয়াশা-পাণ্ডুর চোখ। ছেঁড়া-দোমড়ান টুপীর নীচে আরেকটা চোখ আর গাল ঢাকা পড়ে গেছে।

'আমি অন্য শহরের—একজন এ্যাটর্নী আমি,' ও বলে ওঠে—যা মাথায় আসে তাই বলে যায়। মাতাল মানুষগুলো ওকে ঘিরে ফেলেছে দেখে মনে-মনে আশঙ্কা করে, এবারে বোধহয় মারই খেতে হবে, ভয়ের চেয়ে ঘেন্নাই হয় বেশী। কিন্তু একজন কম-বয়সী তরুণ মাতাল লোকটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে ক্লিমের কাঁধে হাত রাখে—ছেলেটার পরনে নীল-এমব্রয়ডারী-করা সার্ট আর পায়ে উঁচু পেটেণ্ট লেদারের বুট। তার স্পর্শে সামঘিনেরও সামান্য নেশা ধরে যায়।

'বলুন তো বিচার-টিচার হবে নাকি? আমাদেরও কি ডেকে তুলবে?'

এই ছেলেটার মুখেও আঘাতের চিহ্ন, তবে সঙ্গীদের চেয়ে ও অনেক বেশী গম্ভীর, চোখে অনেক বেশী বুদ্ধির দীপ্তি।

'সম্ভবতঃ,' দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সামঘিন বলে।

'হুজ্জতটা বাধলই তো ভারাভকার বাড়ি থেকে,' মাতাল লোকটা চেঁচায়। অন্য লোকটা আবার তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।

'চুপ কর। নইলে মারব এক গাঁট্টা নাকের ওপর,' অতি-শান্ত সুরে বলে, ভয় দেখানোর কোন ভঙ্গীই নেই। সামঘিনের দিকে ফিরে বলল: 'কিন্তু কার বিচার করবে, শুনি? কে সুরু করল সব? ওরাই তো। কেন আমাদের রাগিয়ে তুলল? ঝান্ডা তুলল আমাদের চেয়ে বড়, টুপী খুলতেও অস্বীকার করল? কেন, কোন্ অধিকারে?'

'সে তো মারা গেছে।'

'ভারাভকার জানলাগুলো চুরমার ক'রে দিয়ে আসি চল!'

'মারা গেছে? ওঃ, তাহলে '

তাদের চার জন মন্থরগতিতে এগিয়ে গেল। সামঘিনের পাশের দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছোকরাটা চিন্তিতসুরে বুকের ওপর দু'টো বাহু আড়াআড়ি ক'রে রেখে বলে ওঠে:

'জিনিসটা ঠিক ভাল হলো না, না?'

'নাঃ, ঠিক ভাল তো হয়ই নি' সামঘিন তার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বলে।

বাড়ি-ঘরের জানলা খুলতে সুরু হয়েছে। লোকে মাথা বের ক'রে দেখে, সবাই একই দিকে, যেদিকটা থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে, বিজ্ঞাপনের বোর্ড না কি একটা পড়ে যাবার শব্দও ভেসে এল। ছোকরাটা দাঁতের মধ্যে দিয়ে চিক ক'রে থুতু ফেলে ইস্কুলের ছেলেটার পাশেই বসে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই লাফিয়ে খাড়া হয়ে উঠে চার পাশ দেখে নিয়ে দৌড়ে রাস্তার শান্ত দিকটায় তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সামঘিন রাস্তার উল্টো দিকটা দিয়ে ছেলেটার পিছু-পিছু ত্বরিতপদে চলে। মাথার ওপর যেই কোন একটা জানলা খুলে যায় ও চমকে উঠে কাত হয়ে পড়ে। একটা জানালা থেকে মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকার ওঠে:

'এই যে আরেকজন চশমাওয়ালা পালাচ্ছে! ধর ধর!'

কয়েক-পা এগোতেই একেবারে সামনা-সামনি 'এই যে এক কলমী-বাবু। তা, পেটে যন্তন্না হচ্ছে কি গো?'

প্রায় আত্মধিক্কার আর মানুষের জন্যে লজ্জাবোধের মতো একটা অনুভূতি ওর মনে জাগে, হাঁটার গতি কমিয়ে দেয়। সামনে এক দল ঘোড়সওয়ার পুলিশকে ঘুরতে দেখে পাশের একটা রাস্তায় ও ঢুকে পড়ে। একজন মাঝবয়সী লোক বিরাট একটা বিজ্ঞাপনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনের জ্যাকেটটার দু'টো হাতই ছিঁড়ে বের হয়ে গেছে। লোকটা জোরে-জোরে বলে:

'আমাকে একলা থাকতে দাও না, যেমনটি আছি। টুপী হারিয়েছি, তাতে কি?' বিজ্ঞাপনের ফাটলের মধ্যে থেকে, লোকটার কাঁধের ওপরে, একজোড়া চোখ ঝকঝক ক'রে ওঠে। একটা মেয়েলি কণ্ঠ অভিযোগ করে:

'তুমি কেন এ-সবের মধ্যে গিয়ে জড়াচ্ছ, ন্যাড়ামাথা হ্যাংলা? এ-সবে তোমার কি দরকার?'

'চেঁচিও না! লোককে মারলেই হলো, মারের কোন নিয়মই নেই!'

'সেটা বের করতে পেরেছ—এ্যাঁ—নিজের বুদ্ধি থেকে! আ-হা-হা, কী আমার বুদ্ধিমান রে! ছিঃ! একেবারে কিছু নাই!'

রাস্তার ও-পাশ থেকে খালি পায়ের ওপর রবার-গলোশ প'রে একটা লোক বন্দুক কাঁধে এদিকে এল।

'আত্মীয়-বন্ধুরা!' ছোট্ট একটা বাড়ি আধখোলা জানলায় মুখ রেখে চিৎকার করে : 'ছররা দিন তো আমায়।'

জানলাটা খুলে গেল। উইন্ডো-সীলের ওপর ফুলের টবের মধ্যে সবুজ চোখের একটা বেড়াল, দেখে ক্লিমের মনে হলো তর্মিলিনের কথা।

ক্যাথেড্রাল-স্ট্রীটের হিংস্র সংগ্রামের পর এই ছোট ছোট গলিপথের শান্তি মনে সন্দেহ জাগায়, মনে হয় জানলা-দরজার পাশে লোকে বোধহয় গুঁড়ি-মেরে কারো অপেক্ষা করছে। এই সব অপ্রশস্ত ছোট রাস্তার বাসিন্দারা, শান্ত ছোট্ট-ছোট্ট বাড়ির অধিবাসীরা, যাদের কজলভ কি সুন্দর ছবি এঁকেছেন, যাদের জীবনের স্থির ধারা একদা সামঘিনের প্রশংসা অর্জন করেছিল, তারাই কি না আজ উন্মত্ততার সাংঘাতিক বিস্ফোরণে উদাসীন দর্শকের ভূমিকা নিয়ে রইল! দেখে সামঘিনের কষ্ট হয়। বন্ধ-গেটের ভেতরে বাড়িতে বসে বসে এরা বন্দুকে ছররা ভরছে যেন কাক মারবার জন্যেই তৈরি, অথচ শুধু ছাতা হাতে এক সত্তর বছরের বৃদ্ধ আর আরেকজন জ্যাম আর ক্যান্ডির কারখানার অন্ধ মালিক তাদের বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল।

'পাজী নচ্ছার!' সামঘিন এই ফিটফাট মানুষগুলোকে গাল দিয়ে ওঠে। কিন্তু অস্পষ্ট একটা সন্দেহও জাগে যে মনের এই ক্ষোভের মধ্যে খানিকটা যেন বৈসাদৃশ্যই লুকিয়ে আছে। ও যেন সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ, ভেঙে-গুঁড়িয়ে গেছে, অসহায়।



সামঘিন যেখানে থাকে সেই রাস্তার মাথায় মোটামোটা পুলিশ তদধিক মোটা মোটা ঘোড়ায় চেপে রাস্তা আটকে আছে দেখতে পেল, কয়েক ডজন অলস দর্শকও রয়েছে। অর্থহীন নগণ্য বলেই মনে হয় ওদেরকে। এমন বিচ্ছিরি সাদৃশ্য তাদের মধ্যে যে কয়েদীদের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। ওদেরি একজন, দাড়ি নেই লোকটার, কেমন ধূসর-রঙের, বলে ওঠে :

'এই আরেকজন ভারাভকার পোনা। বু-উঃ—!'

এখানেও সব বাড়ির গেট বন্ধ। লুবোমুদ্রভের বাসায় জানালার শার্সী চূর্ণ-বিচূর্ণ। নীচের তলায় একটা জানলার খড়খড়ি ভেঙে তুলে ফেলা হয়েছে। বা উঠোনে লোকজন নেই। বাড়িতে কোন সাড়াশব্দ নেই, চত্বরেও না। সাশা বেড়ার দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে বলে যে ডাক্তার গেছে গভর্নরের কাছে নালিশ করতে।

'তাবাকভ পাড়ার আর তিনজন ওর সঙ্গে গেছে। তাবাকভের ছেলে মার খেয়েছে। কমরেড করনেভও—'

ওর কথা না শুনেই সামঘিন নিজের ঘরে যায়। পোশাক খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে, ও আজ চিন্তা করতে চায় না একটুও। কিন্তু চিন্তা ওকে ছাড়ে না, ঠাণ্ডা কালো জলের ওপর এক পরত ধুলোর মতোই যেন চিন্তাগুলিকে ও দেখতে পায়—ঝড়ো দিনের পর পুকুরে যেমন ধুলোর আস্তরণ পড়ে তেমনিই পরত পড়েছে। সামান্য-সামান্য চিন্তা, বোধহয়—মানুষের মুখ, কথা, চিৎকার বা ভঙ্গীর ঝাপসা-ঝাপসা দাগ—বন্যদিনের খড়কুটো। কিছুক্ষণ পর ওপরতলায় ডাক্তারের ঘরে পা আছড়ানর শব্দ হয়, যেন চার-ঘোটকের কোয়াড্রিল নাচা হচ্ছে। নিজের কাছ থেকে

পালিয়ে যাবার জন্যে, আজ যেন আত্মবীক্ষণ সমস্ত জগতের বিরুদ্ধেই, সামঘিন সিঁড়ি বেয়ে লুবোমুদ্রভের ঘরে ওঠে। ভেবেছিল অন্ততঃ জনা-পাঁচেক তো থাকবেই কিন্তু দেখল শুধু দু'জন রয়েছে—ডাক্তার আর স্পিভাক। দু'জনেই ঘরে পায়চারি করছে, পরস্পরের বিপরীত দিকে।

'তুমি হাসপাতালে যাবে না লিজা!' ডাক্তার রুমাল নাড়তে নাড়াতে চেঁচায়। সামঘিনকে দেখে রুমালটা ওর দিকে দুলিয়ে বলে ওঠে : 'ও যাবে আমার সঙ্গে...'

দু-জনেই সামঘিনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। ডাক্তারের মুখ উত্তেজনায় স্ফীত, ঘাম ফুটে বেরিয়েছে, চোখ পিটপিট করছে। মেয়েটি পাংশুবর্ণ, চোখ দু'টো একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

'জানেন, করনেভ সাংঘাতিকভাবে জখম হ'য়েছে,' স্পিভাক বলে।

কিন্তু ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিয়ে চিৎকার করে. 'নঃ! কুত্তার বাচ্চা রাদেয়েভটাকে তোমার কি মনে হয়, য়্যাঁ? যদি শুনতে ওই জুডাস গভর্নরকে কি বলছিল! সুদখোর মেয়েছেলে, দ্রুসভাও তো ওর চেয়ে অনেক সৎ। সে বললে : 'আপনি কেমন গভর্নর, ইয়োর এক্সেলেন্সি! বাস্তায় স্কুলের ছাত্রীরাও মার খাচ্ছে আর আপনি কিছু বলছেন না?" ওই ব্যাটা বদমাশ কী বলল জান . "আশা করি বিচক্ষণ লোকেরা এবারে বুঝবে যে গর্ভমেণ্টকেই যেন তারা সমর্থন করে, গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ওই ইহুদীগুলোকে নয়," হুঃ তোমার কি মনে হয়?'

রুমালটাকে ওপরের দিকে ছুঁড়ে মেঝেতে ফেলে দেয়। স্পিভাককে চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে :

'তোমাকেও তো বলেছিলাম আর তোমার ওই সব ছোড়াদের, যে নিরস্ত্র মিছিলেব সময় এ-টা নয়!—নাও এখন?'

'হাসপাতালে যাচ্ছেন?' কঠোরকণ্ঠে স্পিভাক জিজ্ঞেস করে।

'হুঁ!'

ডাক্তার টুপীটা ফট ক'রে টেনে নিযে সিঁড়ি দিযে দুর্‌দুর্‌ ক'রে নেমে গেল। সামঘিন-ও পেছনে-পেছনে নামল। কিন্তু সংগে যাবার আমন্ত্রণটা লুমোমুদ্রোভ আর না করায় সামঘিন বাগানে ঢুকে পড়ল, কুঞ্জে গিয়ে বসল। অকস্মাৎ ওর মনে হয় শত বিভীষিকা সত্ত্বেও ৯ই জানুয়ারী বোধহয় আজকেব মারামারির তুলনায় অনেক অকিঞ্চিৎকর; এই পান্ডুর দিনটা ব্যক্তিগতভাবে ওকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে গেল।

'হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার, একটা কিছু হ'যে যাওযা দরকার এবং শীগগিরি।'



পরদিন ওর মেজাজ চড়ে গেল, না-চড়ে উপায় ছিল না। ইউনিয়নিষ্টদের এই হাঙ্গামা-হুজ্জতে শহরের সব সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই রেগে উঠেছে। জানা গেল আগের দিনেব হাঙ্গামায় পাঁচজন লোক নিহত হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন ছাত্র, জেল-ইনস্পেক্টর তপরকভের ভাইপো; এগারজন সাংঘাতিকভাবে আহত হ'য়ে হাসপাতালে আছে; দ্বদশ ব্যক্তি করনেভ মৃত্যুপথযাত্রী; আর প্রায় জনা-বিশ জখমী লোক বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে। "আমাদের এলাকা"র অফিসে জানলার শার্সী ভেঙ্গে চুরমার, প্রিণ্টিং প্রেস আর মেসিন বিধ্বস্ত, টাইপ লুঠ হ'য়ে গেছে। সকাল হ'তেই শহব রাগে গর্‌গর্‌ করছে। বাড়ির দরজা-জানলা-গেট সব খুলে যায়। অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজেদের ঘোড়া জুতে গাড়ী নিয়ে বেরোয়। রাস্তায়-রাস্তায়

লোকজন হাতে লাঠি-ছড়ি নিয়ে পথ চলে, টুপী বা ক্যাপ চোখের ওপর অনেক-খানি টেনে নামান; যুদ্ধের জন্যে যেন প্রস্তুত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় যেই গুজব ছড়াল যে পুরোনো স্কোয়্যারে ইউনিয়নিষ্টরা আবার একত্রিত হয়েছে, দু-জন ইহুদী আর হাসপাতাল-নার্স লিচ্‌কুশকে বেদম পিটুনি দিয়েছে, অমনি রাস্তাগুলো আবার জনশূন্য হ'য়ে পড়ল, সব জানলা বন্ধ হ'য়ে গেল। শহর যেন বিষণ্ণ বিরামের কোলে ঢলে পড়ল। প্রায় মধ্যরাতে, শান্তি অবিঘ্নিত রেখেই গেটের সামনে এসে একটা গাড়ী দাঁড়াল। স্পিভাক বাড়ি ফিরল ভেবে সামঘিন আওয়াজটায় কোন কান দিল না। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে ঘুম-ঘুম-চোখ দারওয়ান এসে কড়া নেড়ে বলে :

'একজন অসুস্থ লোককে ওরা নিয়ে এসেছে।'

'আমাকে নিশ্চয়ই ডাকেনি—ডেকেছে ডাক্তারকে?'

'আপনাকেই হুজুর,' দারোয়ান কিছুতেই শুনবে না, জোর করে। মানুষটা গোমড়ামুখো, কিষাণদের মতো একটুও না! সামঘিন হলঘরে গেল। সেখানে, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে একটা লোক সাদা পাগড়ী আর আকারবিহীন স্যুট প'রে ছিল।

'মাপ করিস, সামঘিন, তোর কাছেই এলাম। হাসপাতাল আমাকে নিলে না।'

আস্তে-আস্তে নিঃশ্বাস নিয়ে-নিয়ে লোকটা কথা বলে, বেশ ভার-ভার গলা। চট ক'রে ইনোকভকে চিনতে পারেনি সামঘিন। দারওয়ানকে বলল ডাক্তারকে ডেকে আনবার জন্যে। ডাইনিং রুমে ধরে-ধরে নিয়ে এল ইনোকভকে।

দীভানের ওপর ধপ্‌ ক'রে প'ড়ে ইনোকভ বলে 'হ্যাঁ,—মার খেয়েছি—জখম হয়েছি।'

শোবার সার্ট প'রে ডাক্তার এল খালি পায়ের ওপর স্লীপার গলান। ইনোকভের মাথা থেকে তোয়ালেটা খুলে নিয়ে নাড়ী দেখে, বুকে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে আঙুল ঠোকে, সামঘিনের দিকে চেয়ে গজ্‌গজ্‌ ক'রে ওঠে

'হু-হ্যাঁ—অচেতন—হুম্‌। এলিজাবেথাকে ডাক—ঝিকেও। গরম জল আন তাড়াতাড়ি!'

একঘণ্টা পরে সামঘিন জানতে পারে যে ইনোকভকে বাহুর মধ্যে দিয়ে গুলী করা হয়েছে। তার মাথার খুলিতে চোট লাগেনি, কিন্তু মাথার চামড়া দুই জায়গায় ফেটে গেছে।

'আর খুব সম্ভবতঃ ওর পাঁজরও ভেঙ্গে গেছে।' ছাদের দিকে তাকিয়ে লুমোমুদ্রভ জানায়।

ইনোকভের খুলির ওপরের চুল ডাক্তার খুব সুপটুহাতে কামিয়ে দেয়, দাড়িও। ফুলো-ফুলো চক্ষুহীন একটা মুখ বেরিয়ে পড়ে। শুধু ডান চোখটা নীল ফালির মধ্যে থেকে জ্বরের ঘোরে ভূতের মতো চক্‌চক্‌ করে। মরার মতো টান-টান হ'য়ে শুয়ে ইনোকভ গোঙায়, নাকিসুরে অবোধ্য কথা বলে। তার প্রলাপ বকার সাথে সাথে ঝড়ো বাতাস এসে বাড়ীর দেওয়াল আর জানলার খড়্‌খড়িকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

টেবিলে ব'সে ল্যাম্পের সামনে রাতের পোশাক প'রে স্পিভাক হ্যাণ্ডবিল সম্পাদনা করছিল। ওটা ক্লিমেরই লেখা, বিষয়, "ইউনিয়নিষ্টরা কি চায়?" রাতের-জামার চওড়া-চওড়া হাতাদুটো কাজে অসুবিধা ঘটানোয় সেগুলো কাঁধের ওপর তুলে দিয়েছে। চাপা স্বরে বলে :

"আপনি বিভীষিকার এমন ফিরিস্তি ক'রে তুলেছেন যে মনে হয় শহরবাসী আর কর্মী সবাইকে ভয় দেখানোই বোধহয় আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

ফিয়েনা ত্রুসভার সঙ্গে যে কথাবার্তা হ'য়েছিল তা-ই মনে ক'রে সামঘিন ঠিক

করে : 'মস্কো চলে যাব'। যুবসভা বাড়িটা কিনতে চায়, গরীব ইস্কুলের ছাত্রীদের জন্য নাকি একটা হোস্টেল বানাবে। সে-মহিলা খুব মুটিয়েছে, তার প্রিয় বারগাণ্ডি দিয়ে মুখ আর গলা লাল ক'রে কিছু ঘৃণা আর কিছু মনুষ্যবিদ্বেষ মিশিয়ে সামঘিনকে বলেছিল :

'দাম কম করুণ, ক্লিম ইভানোভিচ! দেখুন, আমার লিভারে আছে পাথর, কিড্নীতে বালি। শয়তানেরা শীগগীর এসে আমাকে নিয়ে যাবে তাদের রান্না-বান্নার কাজ ক'রে দেবার জন্যে—আমি তাদের সামনে আপনার হ'য়ে ওকালতি করব—প্রতিজ্ঞা করছি। এ্যাঁ? আর টাকায় আপনার কি দরকার? আমার দিকে চেয়ে দেখুন! সতের বছর ধ'রে আমি আমার পাপের কড়ি মেয়েদের জন্যে খরচ করছি—তাদের কতজনকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছি—আর আপনি? আপনি কি করেছেন? বাজী ফেলে বলতে পারি তাদের একজনকে এনে রাস্তাতেও বোধহয় ফেলতে পারেন নি। কখনো কাউকে ফোঁসলাতেও পারেন নি, পেরেছেন?'

বলতে বলতে কব্জি থেকে একটা সোনার ব্রেসলেট খুলে নিয়ে হাতে লোফালুফি করছিল, তার লাল-লাল আঙুলের মাঝে সোনাকেও ফিকে দেখাচ্ছিল।

'কি অদ্ভুতভাবে লিখেছেন আপনি' স্পিভাক আবার বলে নির্দয়ভাবে কলম চালায়। 'সোস্যালিস্ট-রেভল্যুশনিস্টদের মতো -ভাবাবেগে ভরা।'

সামঘিন কিছুই বলে না। লক্ষ্য ক'রে ক'রে দেখে। সাশাকেও লক্ষ্য করে, মেঝের ওপর থেকে সে তখন রক্তের দাগ ভরা জল ন্যাকড়া ভিজিয়ে-ভিজিয়ে মুছে তুলছিল। ওপরে শুয়ে ইনোকভ ঘর্ঘর শব্দ করছে, গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ বের হচ্ছে প্রলাপের তোড়ে শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে যেন। সামঘিনের মনে হয় যুবসভার কথা, স্পিভাকের কথা, ভারভারার কথা, নিকনোভার কথা, সাধারণভাবে নারীদেরই কথা।

'আশ্চর্য সব জীব। মাকারভই বোধহয় ঠিক। অন্ধকার আত্মা '

যখন থেকে ঘরে ঢুকেছে সেই মুহূর্ত থেকেই স্পিভাক সামঘিনকে অবাক ক'রে তুলেছে। ইনোকভের আহত-দশা দেখে, একটুও উত্তেজিত তো হয়ই নি বরং অপরিচিতের মতোই যেন ব্যবহার করছে। ডাক্তারকে যতটুকু সাহায্য করবার ছিল ক'রে টেবিলে এসে অ্যাপীলটা সম্পাদন করতে ব'সে গেছে। শান্তস্বরে বললও, অবশ্য একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস দিয়েই .

'বোধহয় আপনাকে এবারে লিখতে হবে "নিহত বলশেভিস্ট কী চায়?" করনেভ আর ভাল হবে না।'

ডাক্তার বিড়বিড় ক'রে উঠল 'নাঃ। সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, একটি অন্ধকার-আত্মা', সামঘিন পুনরাবৃত্তি করে ওঠে, মেয়েছেলেটির কাঁধ থেকে নগ্ন বাহুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। অক্লান্তভাবে নিজের কাজ নিয়েই আছে ও: কারিগর, দোকান-কর্মচারী বা সামান্য-চাকুরেদের মধ্যে সোস্যালিস্ট-রেভল্যুশনিস্টদের সাফল্যে খুব ঈর্ষা। এই ঈর্ষার মধ্যে সামঘিন ছেলেমানুষী দেখতে পায়। ডক্তার তার চারপাশে ঘন-ধূম্রজাল সৃষ্টি ক'রে বসেছিল, তার মধ্যে দিয়ে স্পিভাকের পেন্সিলের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে শুনল সে বলছে

'গভর্নর যে হুমকি ছেড়েছে "সব-জনসমাবেশ অস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা" ভেঙে দেওয়া হবে—কী ভাষার কায়দা!—তা-রি উত্তরে এখানে-ওখানে লিথো করা ইস্তাহার ছড়ান হয়েছে–

"যদি দুঃসময় আরো আসে,
আমিও বা কম কী সে!
লব তুলে অস্ত্র

পতির বিরুদ্ধে—এই শপথ!
ত্রেশারের বিরুদ্ধে—হাঁ-হাঁ-হাঁ!
মৃত্যু হানি
সব-যুগল ভাঙ্গ!"

'এই-রকম সর, ওই একই রুচিহীনতা। "আমাদের এলাকা" সম্বন্ধে ঠিক হয়েছে যে ওটা আপাততঃ ঢাকনা-চাপা পড়ুক...'

'বেশীদিন এ-সব টিকবে না,' হাত দিয়ে ধুঁয়ো সরাতে-সরাতে ডাক্তার বলে। 'আচ্ছা, কম্প্রেশটা লাগান যাক। ভয় হচ্ছে—ওর বাঁ-চোখটা কেমন? সামঘিন তুমি এখন শুতে যাও, দু-তিন ঘণ্টা পর এসে এলিজাবেথাকে বিশ্রাম দিও।'

✱

সামঘিন ঘরে ফিরে গেল। পোশাক খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবে ভারভারার চিঠিতে যা জানা যায় তাতে মস্কো তো এইরকমই, সংবাদপত্রের রিপোর্টেও তাই মনে হয়—হরতাল, সভাসমিতি এবং রাস্তায়-রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামাগুলো দিন-দিন অনেক বেড়ে উঠছে। এখানে নিজেকে ও জীবনের সঙ্গে কোন রকমে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। স্পিভাকের ব্যবহারে উদ্বেগ আছে বটে, কিন্তু রসকসহীন। মানুষের ওপর সাধারণতভাবে উদ্বেগ রয়েছে, করনেভ এবং ভারাকসিনের নেতৃত্বে যে আন্দোলন হ'য়ে গেল, তার বিরুদ্ধেই ছিল ও।

গাছপালার ওপর শিরশির ক'রে বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টির বেগ ক্রমে বেড়েই ওঠে কিন্তু তবুও একঘেয়ে বর্ষণের অন্তরালে যে-শান্ত উন্মত্ততা লুকিয়ে থাকে সেটাকে কিছুতেই জয় ক'রে উঠতে পারে না। সামঘিন বুঝতে পারে বিগত কয়েক মাসে মনের ওপর যে ছাপ পরেছে তা' ওকে ওর নিজের কাছ থেকেই অপ্রতিহত শক্তিতে ছিঁড়ে নিয়ে চলেছে। এটা কি ভাল, না খারাপ? এক-এক সময় মনে স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে এটা বোধহয় খারাপ। নিঃসন্দেহে গ্যাপনও তো বাস্তবের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তার নেশায় মাতাল হ'য়ে ওঠবার এক হতভাগ্য উদাহরণ। কিন্তু জার বাস্তবেরও বাইরে, তবু তিনিও নিশ্চয়ই অসুখী।

যখন ডাক্তার এসে জাগিয়ে দিল তখন ওর মনে হলো ও বোধহয় ঘুমোয় নি।

'এস এস। খুব উত্তেজিত, এখনো কথাই ব'লে যাচ্ছে। কিন্তু দেখো, ও-কে আবার উৎসাহ দিও না। আমি একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে এসেছি।'

ভোর হ'য়ে আসছিল। শুক্তি-শুভ্র আকাশে গোলাপ-রাঙা মেঘের সাজ। ডাইনিংরুমে ঢুকে সামঘিন দেখল সাদা বালিশের ওপর বাতির আলোয় আলোকিত একটা অপ-মানবিক মুখ, যেন পাথরে কোঁদা, একটা চোখের বদলে সরু একটা ফালি। রাতে যে-রকম ছিল তার চেয়েও মুখটা যেন এখন অনেক বেশী ভয়ের দেখ চ্ছে।

'ওই ভাবেই ওরা—আমার কর্ম সেরে দিল,' ঘড়ঘড়ে গলায় ইনোকভ বলে।

'কা'রা?' ক্লিম এমনভাবে জিজ্ঞেস করে যেন কোন রহস্য উদ্ঘাটন করতে ব্যস্ত।

'করভিন,' ইনোকভ জবাব দেয়, নামটা চট্ ক'রে তার মনে আসেনি। 'সে আর—নিশ্চয়ই—অন্য কয়ারিস্টরা। চারজন।'

একটু থেমে আবার বলে : 'কি রকম—বোকা, স্প্যানিয়ার্ডটা! ক-টা বাজে?'

'ছ-টা বেজে গেছে।'

'খুন করতে চেয়েছিল, বদমাশটা! গুলী করেছিল!'

'কথা বলিস না তুই,' সামঘিনের মনে পড়ে।

'বলব না।'

কিন্তু এক মিনিটকাল চুপ ক'রে থাকবার পর, ইনোকভ আবার থেমে-থেমে ব'লে যায় :

'বোধহয় আমি ওকে বুঝি! যখন জিমন্যাশিয়াম থেকে আমায় তাড়িয়ে দিলে, মনে প্রবল ইচ্ছা রুঝিগা-কে খুন করি—ওকে মনে আছে তোর?—সেই যে ইনস্পেক্টর। হ্যাঁ' তারপর থেকে অনেকবার চেয়েছিলাম—হয় এটা নয়, ও-টা। প্রতিহিংসা আমি চাই না, কিন্তু কখনো-কখনো আমার মনে ঘৃণার প্রবল অনুভূতি আসে আসে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে। ভয়ানক বেদনাদায়ক..'

ক্লান্ত হ'য়ে ও চুপ করে। সামঘিনও অন্যদিকে মুখ ফেরায় যা-তে দামী পাথরের খণ্ডর মতো ওই অর্ধচক্ষুটি ওকে না দেখতে হয়। ইনোকভ আবার বিড়বিড় করতে শুরু করে, পয়ারের কথা, মাছ-ধরা— বেশ পরিষ্কারভাবে জোর দিয়ে ব'লে ওঠে :

'ওকেও এখনো—তা-র জন্যে মূল্য দিতে হবে।'

সামঘিন তিন ঘণ্টা ওর সঙ্গে থাকল। সর্বক্ষণ ইনোকভ বকর-বকর ক'রেই চলল। পাঁচ মিনিট চুপ ক'রে থাকে, তারপর আবার কথায় ভরে ওঠে, গড়গড় ক'রে কথা বলে, কাশে। দশটার সময় স্পিভাক এল। বলল 'আমার ঘরে লিদিয়া তিমোফেয়েভনা ব'সে আছে।

ক্লিম বাইবে বেরিয়ে গেল। লিদিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হবার ব্যাপারে খুব বেশী উল্লসিত যদিও নয় তবুও ইনোকভের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ভাল লাগে।

'মনে হলো ওর শরীরটা বোধহয় তেমন ভাল নেই,' পেছনেপেছনে স্পিভাকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।



লিদিয়া ওকে অভ্যর্থনা করে 'জানতাম না তুমি এখানে আছ। এলিজাবেথা স্পেভাভনার কাছে এসেছিলাম, ও-ই আমাকে বললে! জান, এই বাড়িটাকে যেন আমি ঠিক সহ্য করতে পারছি না। সত্যিই।

রেডক্রশ নার্সের পোশাকে সামঘিনের মনে হ'ল লিদিয়া ভীষণ বুড়িয়ে গেছে। কেমন ফ্যাকাশে আর রোগা দেখাচ্ছে। অনবরত মাথা নাড়ায়, বোধহয় ভুলে যায় যে ওর উদ্দাম চুলের রাশ এখন টুপীর ভেতরে বেঁধে রাখা। টুপীটাতে মাথাটা বিশাল দেখায়, অন্ততঃ ওর ছিপছিপে শরীর আন্দাজে। ক্লিমকে দ্রুত কণ্ঠে বলে যে স্বামীর দু'জন আত্মীয়ের সঙ্গে এখন ও চলেছে শাশুড়ীর এস্টেট, সেখান থেকে কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে আসবার জন্যে। বলল ·

আন্তন যে বাড়িতে জন্মেছিল যেখানে ওর শৈশব কেটেছিল সেটা দেখবার জন্যে আমি খুব উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি.- তোমাকে একটু কফি দেব কি?'

কিন্তু কফি ওকে দিল না। বরং সামঘিনের কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে ওর দিকে ঝুঁকে প'ড়ে একজোড়া অস্থির চোখে ভয় ফুটিয়ে বলতে আরম্ভ করল— কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে গলার স্বরটাও নীচু করেছিল :

'তোমার অবশ্য জানা আছে : গ্রামগুলো খুব চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে। মাঞ্চুরিয়া থেকে ফিরতি-পথে সৈন্যরা যেখানে পাচ্ছে দাঙ্গা বাধাচ্ছে! দেখ, তোমার কাছে

বলতে কি, ক্লিম, ওরা সব ভেগে-আসা সৈন্য—হ্যাঁ, তাই! ওঃ, সে-যে কী ভীষণ! আমার স্বর্গগতঃ স্বামীর কাকা,'—এই বলে ও বুকের ওপর খুব তাড়াতাড়ি তিনবার ক্রুশ এঁকে নেয়—'তিনি একজন জেনারেল ছিলেন, তুর্কীর যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, সেন্টবর্জ পদকও পেয়েছিলেন—সেই তিনি করুণ স্বরে বিলাপ করছিলেন, কাঁদছিলেন আর বলছিলেন : "স্করেলেভ বা সুবরভের অধীনে কি কখনো এ-রকমটি ঘটতে পারত।"'

গলার স্বর উঁচু ক'রে করুণ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। মুখের পেশী নড়ে-নড়ে ওঠে, কালো চোখে ভয় ঘনিয়ে আসে।

'এ-একেবারেই অবিশ্বাস্য!' বিস্ময়োক্তি ক'রে ওঠে। তারপর স্বর নামিয়ে বলে : 'কি অদ্ভুত উত্তেজনা, নিজের গাঁয়ে যদি গিয়ে না পৌঁছতে পারে!—সে-কী আদিম ভয়! এ-সব আমি নিজের চোখে দেখলাম। ওরা যেন বাড়ি যাবার রাস্তা ভুলে গেছে, নয়তো বাড়ি কোথায় সে কথাই যেন ভুলে গেছে। ক্লিম, জান, আমি একজন লালচুল-ওয়ালা সৈন্যকে দেখলাম বুটের গোড়ালী দিয়ে একটা পুতুলকে থেঁতলে দিল—ন্যাকড়ার পুতুল জানতো কি রকম হয়—সস্তা গোছের। লোকটা তার ওপর সজোরে লাথি মারল, রাইফেলের কুঁদো দিয়ে খুব জোরে সেটাতে আঘাত করল, আর তারপর পুতুলটা ফেটে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে কি সব বেরিয়ে এল কি যেন বলে ওগুলোকে?'

'ভুষি,' সামঘিন স্মরণ করিয়ে দেয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুষি। আমি ঠিক জানি সত্যিকারের কোন শিশু হ'লেও ও ঠিক অমনিই করতো।'

মাথাটাকে হাতে ক'রে ধরে লিদিয়া লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, মনে বহুদূরের চিন্তা। ঘরটায় পায়চারি করতে শুরু করে দেয়। আবেগভরা কণ্ঠে বলে :

'উঃ, কি ভীষণ, কি দুঃখী সব লোক!'

ওর ভয় অভিযোগ, স্নায়ুদৌর্বল্য সামঘিনকে অভিভূত না ক'রে বিস্মিতই ক'রে তোলে। এতটা যে ভেঙে পড়েছে তা ধারণাই করা যায় না।

'বিধবা হওয়াটা ওকে মানায়। অবশ্য বিগতবয়স্কা কুমারী হিসাবেও ও বেশ ভালই মানাত,' ঘরের মধ্যে লিদিয়ার ইতস্ততঃ-চারণ দেখে সামঘিন মনে-মনে ভাবে। সব জিনিসই ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখে যেন গরম না ঠাণ্ডা পরখ করছে। আগের চেয়ে খানিকটা শান্ত হ'য়ে সে আবার চাপা-সুরে ব'লে ওঠে :

'সবাই আশা করছে বিপ্লব হবে। বুঝতে পারে না ওটা কেমন ধারা হবে? আমাদের ফৌজী পুরোহিত বলে যে বিপ্লব আসে জীবনের অক্ষমতা থেকে আর অক্ষমতা নিরীশ্বরতা থেকে। লোকটার জীবনধারা খুব কঠোর যেন শপথ নিতে যাচ্ছে এমনি কণ্ঠে বলে, জগৎ শয়তানের ক্ষমতাধীন হয়ে গেছে।'

সামঘিনের মনে পড়ে পুরোনো দিনের কথা ও যখন রাত্রে ইন্দ্রিয়বাসনা চরিতার্থ করত তারপর লিদিয়া কেমন সব খাপছাড়া প্রশ্ন ক'রে ক'রে ওকে অতিষ্ঠ ক'রে মারত। ওর চিঠিগুলোর কথাও মনে পড়ল।

'এ কি হ'তে পারে যে ও সব ভুলে গেছে? কিন্তু আমি কেন ভুলতে পারি না?' দুঃখের সুরে নিজেকে শুধায়, তিক্ততার সাথেও।

'হ্যাঁ শোন, জান কার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল? মেরিণা, সে-ও বিধবা · অনেকদিন হ'ল হ'য়েছে। আঃ, ক্লিম কি মেয়েমানুষ! কত বড়, আর কি সুন্দর দেখতে—গীর্জাই উপাচার বিক্রী করে! অবশ্য সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু ও একেবারে চমৎকার! ব্যবসাটা শুধুই মুখ দেখান। ওর সব কথা তোমায় বলতে পারব না। আমাদের ট্রেন ১২ : ৩২এ।'

'তোমার কি কিছু টাকার দরকার নেই?' ক্লিম জিজ্ঞেস করে।

'টাকা? কিসের টাকা? কেন?' লিদিয়া খুব অবাক হ'য়ে জবাব দেয়।

'তোমার বাবার টাকা,' সামঘিন মনে করিয়ে দেয়।

'না। আমার কোন দরকার নেই। ব্যাঙ্কে আছে কি? থাক ওখানেই থাক। আমার স্বামী তার যা ছিল সব কিছু আমাকে দিয়ে গেছেন।'

সামঘিনের এত কাছে এসে লিদিয়া দাঁড়ায় যে হাত বাড়ালেই সামঘিন ওকে আলিঙ্গন করতে পারে। এমন একটা কল্পনা মনের মধ্যে দিয়ে পাক খেয়েও গেল।

ঘড়ির অপূর্ব চেনটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে লিদিয়া দেঁতো হাসি হেসে বলে: 'আমার বিশ্বাস আমি নিলর্জ্জ রকম ধনী। যদি তোমার টাকার দরকার থাকে কিছু নাও না।'

সামঘিন ঈষৎ তিক্তস্বরেই বলে যে তার টাকার কোন দরকার নেই।

'জানুয়ারী মাসে তোমার বাবার ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর লিকুইডেশন্ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাবে.' ব্যবসায়ী সুরে কথাগুলো বলে।

'হুঁ,—এখানে বাবা ছিলেন সারা জীবন কাজ নিয়ে পাগল হ'য়ে। আর এখন? —লিকুইডেশন' কি অদ্ভুত।'

লিদিয়া ধপ ক'রে চেয়ারে বসে পড়ে। মিনিট খানেক চুপ ক'রে থেকে ঠোঁটের ওপর অনিশ্চিত হাসির রেখা ফুটিয়ে সামঘিনের দিকে চায় কিন্তু ওর কালো চোখে হাসি ফুটল না। আবার কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, যেন জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ি থেকে উদ্গত ধোঁয়ার রাশ।

'জান, বেঁটে-বেঁটে জাপানীগুলো সত্যিই প্যাগান। যন্ত্রণা সহ্য করতেও ওদের লজ্জা। আমি আহতদের কথা বলছি বন্দীদের। ওরা—আমাদেরকে ঘেন্নাও করে। প্রাচ্যে আমরা বাজী হেরে গেছি ক্লিম-আমরা হেরে গেছি' সকলেই ভাবছে সেখানে আরেকটা যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন—হারান সম্মান ফিরে পাবার জন্যে।'

পাঁচ মিনিট পর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আবার বলল 'মস্কোতে আলেনার সঙ্গে দেখা হলো। ও একেবারে অপূর্ব। ওর আর মাকারভের মধ্যে রোমান্সটোমান্স কি একটা আছে—, প্লেটনিক। মাকারভের জন্য দুঃখ হয়। অনেক কিছুই আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে একেবারে নিষ্ফলা ডুমুর। এই যে পাপী আলেনা তার কাছ থেকে ও কি চায়?'

'মনে হচ্ছে ইনিও এক ভণ্ড বিড়ালতপস্বী হ'য়ে শেষ হবেন,' সামঘিন ভাবে। সন্দেহ হয় কিন্তু যে লিদিয়া কথাবার্তায় বোধহয় আন্তরিকতা নিয়ে আসেনি। 'ওকে তুরবোয়েভের কথা বলি?' কিন্তু না-বলাটাই সাব্যস্ত করল, কেননা, বলতে গেলেই তো চলবে আরো খানিকক্ষণ। ঠিক তক্ষুণি ভুরুটুবু খুব কুঁচে স্পিভাক এল।

'ইনোকভের অবস্থা কি আরো খারাপ হয়েছে' ক্লিম জিজ্ঞেস করে।

স্পিভাক জবাব দেয় 'না।'

'ইনোকভ!' লিদিয়া অবাক। 'সেই লোকটা? এখানে আছে নাকি? সাইবেরিয়া থেকে ফেরবার পথে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কামা-র ওপর দিয়ে যে জাহাজে যাচ্ছিলাম ও ছিল তার একজন নাবিক। অদ্ভুত লোক'

স্পিভাককে বলল তার ছেলে দেখাতে, কিন্তু আরকাদি তো নার্সের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে। লিদিয়া তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'লে ওঠে নাঃ, স্টেশনে যাবার সময় হয়ে গেছে, আর নয়।'



লিদিয়াকে বিদায় দিয়ে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করে না, সাক্ষাৎকারটায় শরীর পর্যন্ত অসুস্থ ঠেকছে, বাড়ি ফিরলেই তো আবার ইনোকভের পাশে গিয়ে বসতে হবে। ঠিক করল মাঠে-মাঠে ঘুরে আসবে। নির্জন রাস্তা দিয়ে বেড়াল। মনে-মনে ভাবে শীগগিরি আর শহরে ফিরবে না, বোধহয় কক্ষণো না। দিনটা শান্ত পরিষ্কার; বৃষ্টিতে ধুয়ে আকাশ তকতকে হয়ে গিয়েছে, বাতাস নির্মল, সতেজ। ঘাসের লালচে নরম শীষ থেকে সুবাস বেরুচ্ছে।

'বড্ড বেশী ঘটনা,' মাঠের নির্জনতায় বিশ্রাম নিতে-নিতে সামঘিন ভাবে। 'চিরদিন এ-রকম চলতেই পারে না। মানুষ শীগগিবি ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে, বিশ্রাম আর শান্তি চাইবে।'

কিন্তু ওর ভাগ্যে বিশ্রাম ছিল না।

ফৌজী ছাউনীর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একজন সৈনিকের তাঁবুর ফুটোটার এক পাশে ইভান দ্রোনভের পরিচিত মূর্তিকে উঁচু হ'য়ে থাকতে দেখে ও। তার মুখে বিশ্রী কৃতার্থ হাসি। দ্রোনভের মাথায় কোন আবরণ ছিল না, এলোমেলো চুলের রঙ ঠিক কুঁকড়ে-যাওয়া ঘাসের মতো। দশ-বার পা দূরে থেকে দুটোয় কোন তফাৎ ধরা যায় না। সামঘিন পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে হাত তুলে টুপীটা স্পর্শ করল। কিন্তু দ্রোনভ চেঁচিয়ে উঠল :

'আরে, এক মিনিট দাঁড়াও!' ফুটোটা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে-বেরুতে হাসে।

তার কোটের বোতাম খোলা। একহাত দিয়ে টুপীটা ধ'রে আছে, অার অন্যহাতে এক বোতল ভদকা। ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে বোঝা যায় বেশ ভালই টেনেছে, কিন্তু ধনুকের মতো বাঁকা-বাঁকা পা-দুটোয় চলন এখনো বেশ দৃঢ়।

ক্লিমের পাশে-পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বলে : 'ভাগ্যটা ভালই, এক্ষুণি ভাবছিলাম গল্পগুজব করবার জন্যে কাকে পাওয়া যায়? তোর কথা অবশ্য ভাবিনি, তোকে পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার! কিন্তু যখন এখানে এসেছিস—'

জ্যাকেটের পকেটে বোতলটা পুরে ফেলে, টুপীটাকে তুবড়ে নেয়। কাঁধের ওপর থেক কোটটা পড়ে যেতেই সে-টাকে হাতে ঝুলিয়ে নিলে।

দ্রোনভের পেশীবহুল হাত ওর বাহু চেপে ধ'রে শক্ত ক'রে টিপুনি দিতেই সামঘিন কঠোর কণ্ঠে ব'লে ওঠে : 'কি চাস? ব্যাপারটা কী?'

'চাই তুই আমাকে মস্কো-তে বসিয়ে দে। কতবার তো তোকে লিখলাম কিন্তু তুই কখনো আমায় জবাবই দিস না।—কেন? আচ্ছা, সে যাকগে! দেখ—' মাটিতে থুতু ফেলে নিয়ে বলে : 'এখানে বাস করা আমার দ্বারা হবে না। কেননা, আমি মনে করি ইতরের মতো বাস করবার অধিকার আমারও আছে। বুঝলি না? কিন্তু ইতরের মতো আচরণ করবার মরশুম তো আর একটা নয়। মানুষ,—' বুকের ওপর ঘুষি মেরে বলে : "মানুষ এমন একটা জায়গায় এসে পেঁৗছেছে যখন তার মনে হচ্ছে যে ইতরের মতো বাস করবার অধিকার তার জন্মেছে। কিন্তু আমি তা চাই না! বোধ হয় আমি ইতিমধ্যেই ইতর হ'য়ে গেছি, কিন্তু আর তা' চাইনা— বুঝলি এবার?'

'মাতাল হ'য়েছিস সে কথাটা বোধহয় আমার ভাবা উচিত না। আমি জানতাম

না,' সামঘিন বলল। দ্রোনভ পকেট থেকে বোতলটা বের ক'রে সামঘিনের মুখের ওপর দোলায়। বোতলটা বোধহয় শুধু একঢোক পানীয় বাদে ভরাই ছিল। দ্রোনভ হাতটায় এক ঝটকা দিয়ে বোতলটাকে বহুদূরে ছুঁড়ে ফেলে। ঝনঝন শব্দ ক'রে সেটা ভেঙে পড়ল।

'তোকে মস্কো-তে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে—' সামঘিন কেমন অপ্রস্তুতভাবে কথা শুরু করে, সঙ্গীটির লাল টক্‌টকে গণ্ড আর তীক্ষ্ন অস্থির চোখ দু'টোর দিকে দেখে।

'তোকে করতেই হবে! তুই একজন বিপ্লবী! তুই ভবিষ্যতের জন্যে বাঁচ। তুই মানুষের রক্ষক. এবং ইত্যাদি ইত্যাদি—এটা কোন কাজের কথা নয়! নন্‌সেন্স' মানুষকে বর্তমানেই সাহায্য কর! এক্ষুণি!'

ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে সামঘিনের বাহু আঁকড়ে ওকে শূন্য মাঠের মধ্যে আরো দূরে নিয়ে গিয়ে দ্রোনভ তীক্ষ্নতর সুরে আরো ঝাঁঝের সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে:

'আমি এখানকার সব জায়গা চিনি. সবাইকে জানি—তাদের গোটা জীবন, সমস্ত দুঃখ দুর্দশা যা চোখে পড়ে, সব আমার জানা। যত সমাজবাদী. সমালোচক বা ধাঙড় আছে তাদের সবাইয়ের থেকেই আমি বেশী জানি। ভাগ্য আমাকে সমস্ত নোংরা জমা করবার জন্যে একটা বস্তা ক'রে তুলেছে, ওকি. গা শিঁউড়ে উঠছে, ওভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমাকে ঘেন্না হচ্ছে? আর, তুই কি? তুই একটা স্রেফ ফাঁকা—কর্তুজ. তাড়াবার জন্যে যা ব্যবহার হয়- এই হচ্ছে তোর চেহারা!'

সামঘিন ওর কথায় মন দিতে শুরু করেছে। দ্রোনভের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে শোনে সে আবার মেজাজ চড়িয়ে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলছে:

'তোর প্রবন্ধ. তোর সমালোচনা. শুধুই খড়ের গাদা! কিন্তু আমার আছে প্রতিভা!'

চুপ করল। দূরে মাঠের মধ্যে গোলন্দাজ ব্যারাকের যে লাল দালানটা জেগে উঠেছে সে দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। সেদিকে বুড়ো বার্চ গাছও ছিল, মস্কো যাবার রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বোধহয় সেই ক্যাথারিণ দি গ্রেটের আমল থেকে!

'ব্যারাক হচ্ছে পৃথিবীর মুখে ব্রণ. একটা ফোঁড়া. বুঝলি? একটি গাছ হচ্ছে একটি ফোয়ারা; পৃথিবীর বুক থেকে মোটাধারায় বেরিয়ে আসে, আর বাতাসে তরল সোনার বিন্দু ছড়িয়ে দেয়। তুই দেখতে পাবি না. কিন্তু আমি পাই। হ্যাঁ?'

'গাছ হচ্ছে ফোয়ারা—এ-কথা নিশ্চয়ই ভাবিস নি' সামঘিন অভ্যাসবশত জেদের সুরে বলে. চিন্তা কিন্তু অন্যত্র। ভয়ানক অবাক হ'যে গেছে. দ্রোনভ এমন সুন্দর ক'রেও বলতে পারে। এতই বিস্মিত হ'য়ে পড়েছে যে লোকটার এ-সব কথাবার্তায় কিছু মনেও করে না। বিস্ময়ের সঙ্গে আরেকটা অনুভূতি এসে জাগে সামঘিনের মনে,- সেটাতে এই মানুষটার সঙ্গে ওর এক ভয়ানক বিশ্রী সম্পর্ক স্থাপন হলো। সামঘিন চারপাশে চেয়ে দেখে। মাঠে আর একজনও মানুষ নেই। শুধু দূরে, রাস্তার ওপর দিয়ে একজোড়া ছোট্ট খেলনার ঘোড়া ছুটে চলেছে। তাদের সাথে-সাথে নিঃশব্দে গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে একটা মেলভ্যান। নীল শারদ বাতাস এতই স্পষ্ট যে মাঠের সমস্ত জিনিসই সুদক্ষ হাতের রেখাচিত্রের মতো পরিষ্কার দেখায়।

'আমি ভাবি নি? প্রমাণ কর!' দ্রোনভ চেঁচিয়ে ওঠে, তার কর্কশ মুখটা সেদ্ধ-করা চিংড়ীমাছের মতো লাল হ'য়ে উঠেছে, না-কামান গালে খোঁচা-খোঁচা কাঁটাগুলো নড়ে-নড়ে ওঠে। মুখের সামনে হাতটা এমন ক'রে দোলায় যেন হাতের মুঠোতে বাতাস ভরে নিয়ে মুখের মধ্যে ঠুসবে। সামঘিন তামাশার রেশ বুলোতে যায়।

'আমার ওপর একেব'রে ডাকাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়লি যে'

কিন্তু দ্রোনভ ঠাট্টার ধার দিয়েও গেল না।

'জানি তুই আমাকে ঘৃণা করিস। কেন, কীসের জন্যে? আমার আধপোড়া শিক্ষার জন্যে? মিথ্যে কথা। আমি সবচেয়ে বাস্তব কথা জানি, জানি খুদে শয়তানদের নোংরা কাজকর্ম, সত্য, অজেয় জীবন। আর তোরা সবাই তোদের বিপ্লব আর আত্মাভিমানের ভণ্ডামি নিয়ে চুলোয় যা। তোরা কিছুই করতে জানিস না, করতে পারিস না, করতে পারবিও না—তোরা হলো গিয়ে বাদাম-বসান মিঠে-বিস্কুট!'

দ্রোনভ ধাক্কা দিয়ে সামঘিনকে একপাশে সরিয়ে দেয়, তারপর হঠাৎ চুপ ক'রে যায়, মাটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকায়, যেন সেখানেই বসে পড়বে। নিজের মধ্যে যে বিশ্রী অনুভূতিটা ক্রমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যে-টা দ্রোনভের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আরো পাকা ক'রে গাঁথছে, প্রায় ভয় পাইয়ে দেবার মতোই যার তীব্রতা সেটাকে মনে-মনে বুঝে নেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত থেকে সামঘিন বিড়বিড় ক'রে ওঠে :

'তোর—তোর জীবিকা, ইভান তোকে নৈরাজ্যবাদী ক'রে তুলেছে।'

'জীবন, জীবিকা নয়,' দ্রোনভ চেঁচিয়ে ওঠে। জঙ্গলের দিকে আবার হাঁটতে শুরু ক'রে আগের কথায় যোগ দিয়ে বলে : 'মানুষে। তুই যখন জেলে ছিলি, ওরা তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসত রেস্তোরাঁ থেকে। আর আমি খেতাম কনভিক্টদের মেসের কুৎসিত খাদ্য। আমিও তো রেস্তোরাঁ থেকে খাবার আনাতে পারতাম, কিন্তু ওই নোংরা গ্রহণ করতাম শুধু তোর মতো মানুষকে লজ্জা দেবার জন্যে। তুই তা' লক্ষ্য করিস নি?' খিক্‌খিক্ ক'রে হেসে ওঠে। 'জেলখানায় বেড়ানর সময়েও আমাকে তাহলে লক্ষ্য করিস নি?'

'কিন্তু তুই গ্রেপ্তার হয়েছিলি কেন?' দ্রোনভের মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে সামঘিন প্রশ্ন করে।

'কর্নেল ভাসিলিয়েভের হত্যার ব্যাপারে। যত্তো বুদ্ধু কাহাকী!' দ্রোনভ থামল, যেন নিঃশ্বাস আটকে আসছে। গলা খেঁকড়ে স্মৃতিচারণের মৃদুকণ্ঠে আবার শুরু করে : 'কর্নেল! আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল ভদ্রলোক, এগার দিন জেলে রেখেছিল, তার ডেকে নিয়ে ক্ষমা চেয়ে বললে—ভুল হয়েছে।' দ্রোনভ থমকে দাঁড়িয়ে ক্লিমের মুখের দিকে উদগ্র চোখে তাকায়, তারপর ওকে সামনে ঠেলে দিয়ে জোরে-জোরে পা চালায়। 'ভুল? নাঃ। আমাকে পরখ ক'রেই দেখতে চেয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি কেমন মানুষ তা'নয়—নাঃ, শুধু আমার সংবাদের ভাণ্ডার কতটা তাই। বুঝলে না? লোকটা মূর্খই ছিল তবু কিন্তু বুঝে নিয়েছিল যে আমি নীচে নামলেও নামতে পারি।'

মাথা এক পাশে সরিয়ে নিয়ে সামঘিন ফিসফিস ক'রে বলে :

'ওরা তো সবাইকেই চাকরি দিতে চাইত...'

'না!' দ্রোনভ চেঁচিয়ে ওঠে। 'কোনো সৎ লোককে ওরা এমন কথা বলতোই না। তোকে বলেছিল? তবেই তো দেখলি! নাঃ, যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিল, ঠিক জানত কি রকম লোকের সঙ্গে কথা কইছে। বদমাশ! ঠিকই বুঝেছিল যে মানুষটা যখন তিক্ত হয়ে আছে, চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। আহাম্মকটা বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি করে ফেলল কি না, নইলে আমি নিজেই হয়তো কথাটা পাড়তাম...'

'থাম তো!' সামঘিন অনুনয় করে। আবার দ্রোনভকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে চেষ্টা করল :

'আচ্ছা, তুই কি ওকে গুলি করেছিলি?'

প্রশ্নটা যখন করেছিল তখন কিন্তু এক মুহূর্তের তরেও ভাবেনি যে যা জিজ্ঞেস করল তার মধ্যে সত্যের লেশ মাত্রও থাকতে পারে। কিন্তু কোন একটা প্রবৃত্তিগত তাড়নাতেই হাতটা সরিয়ে নেবার জন্যে টান দিয়েছিল, দ্রোনভ কিন্তু সেটা শক্ত

ক'রেই ধরে রাখল। সামঘিন হাতটা আর ছাড়াতে পারল না। দ্রোনভও ওর চেষ্টাটা যেন নজরেই আনেনি এমনিভাবে হাতটাকে আঁকড়েই রইল।

'আমাকে দেখে কি সন্ত্রাসবাদী মনে হয়? এমন একজন সাধারণ জীব—সন্ত্রাসবাদী?' বিশ্রী আওয়াজ ক'রে দ্রোনভ হেসে উঠল।

'এ এক অদ্ভুত প্রশ্ন,' সামঘিন বিড়বিড় ক'রে ওঠে। মনে পড়ে স্থানীয় সোস্যালিস্ট রেভলিউশনিস্টরা সেনারক্ষীদের কর্তাটির হত্যার ব্যাপারে কোন রকম প্রকাশ্য মতামত ব্যক্ত করে নি, আর এই ব্যাপারে যে দু'জন শ্রমিক আর একজন থিয়লজিক্যাল ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছিল তাঁদেরকেও খুব তাড়াতাড়িই মুক্তি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

'না,' দ্রোনভ বলল: 'আমি বালমাশভ নই বা সাজোনভও নই। এমন কি কোচুরা হিসাবেও আমাকে চালান যাবে না। আমি শুধুই দ্রোনভ, যে-মানুষটা ইতিহাসের জন্যে গঠিতই নয়—একজন হা-ঘরে, কোন কিছুতেই যার কোন বন্ধন নেই। বুঝেছ? যাকে কথায় বলে কোন-কর্মেরই-না।'

সামঘিন আবার বলে: 'তুই এক নৈরাজ্যবাদী।' দ্রোনভের কথাগুলো যে ক্রমশই শ্রুতিকটু হ'য়ে উঠছে তা বেশ বুঝতে পারে।

'যদি আমি বলি, হ্যাঁ, আমি তাকে গুলি করেছিলাম তুই তা' বিশ্বাস করবি?'

ওর মুখের দিকে তির্যকদৃষ্টিতে তাকিয়ে সামঘিন জবাব দিলে: 'না, তা করব না।' দ্রোনভের সে-কি হাসি। হাসির উচ্ছ্বাসে কাঁপতে কাঁপতে সামঘিনের হাত ছেড়ে দিল। যখন হাসিটা কমে এল তখন বললে:

'আমার বন্ধুদের একটা ছেলে আছে, বেশ সুন্দর স্বভাবের ছোট্ট ছেলে। ছয় মাস থেকে তাদের খুচরো পয়সা কড়ি চুরি করছে ছেলেটা। কিন্তু ওদের সন্দেহ গিয়ে পড়ল ঝিয়ের ওপরে—'

সামঘিন ভাবে 'পরোক্ষ স্বীকারোক্তির মতো শোনাচ্ছে যেন।' জিজ্ঞেস করল: 'খুনটা হয়েছিল কি ভাবে?'

দ্রোনভ হঠাৎ শহরের দিকটায় মুখ ঘুরল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর গম্ভীর হ'য়ে নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন বলল: লোকে বলে কোন এক মহিলার বাড়ি থেকে ভদ্রলোক বেরুচ্ছিলেন এখানে তাঁর একটা ঘটনা-টটনা রয়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে বেরিয়ে এল এক বিনীত-হিরো—দুম্! একেবারে সামনে থেকে তাঁর ওপরে, তারপর আবার—দুম্! এইতো হলো কাহিনী। শোনা যায় তিনি নাকি রমনী-রঞ্জন ছিলেন, মস্কো-তে নাকি এক পার্টি-ওয়ার্কারও তাঁর প্রেমিকা।'

'কে আর এ-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে গেছে?' সামঘিন বিড়বিড় ক'রে বলে ওঠে। এই প্রথম বুঝতে পারল যে হৃদয়ে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার দংশন বলেও জগতে সত্যি সত্যিই কোন কথা আছে।

'পুলিশ। পুলিশ সেনারক্ষীদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না,' দ্রোনভ আবার তেমনি অনিচ্ছা বশতঃই এক পাশে থুঃ থুঃ ক'রে থুতু ফেলে বলে ওঠে: 'আর আমি পুলিশদের দোস্ত। বিশেষতঃ ওদের একজনের সঙ্গে—এমন খুদে শয়তান সে-ব্যাটা!'

আবার শহরে বাস করবার তার যেসব অসুবিধা সেইসব কথা নালিশের সুরে সামঘিনকে বলতে আরম্ভ করে। মাঠের ওপর নীলিমা গোধূলি গাঢ় হ'য়ে আসছিল, অবারিত মাঠকে যেন চেপে ছোট্ট ক'রে তুলেছে। শহরের ওপর দিয়ে আগুনে-মেঘের সার। গীর্জার ঘণ্টায় সান্ধ্য-প্রার্থনার আহ্বান। সামঘিন চশমাটা খুলে নিয়ে কাঁচ দু'টো মোছে, যদিও মোছবার মতো কিছুই ছিল না। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক নিরীহ-কোমল সাদাসিধে নারী মূর্তি। ওর দিকে অনেকটা ঝুঁকে

এসে মূর্তিটা বিষণ্ণ সুরে বলছে 'রাশিয়ানদের থেকে কত স্বতন্ত্র তুমি। তোমার স্বপ্ন নেই, গীতিময়তা নেই, তুমি সব সময়ই শুধু যুক্তি আওড়াও।'

ভাবল : 'হ'তে পারে ও-ই বোধহয় ভাসিলিয়েভের প্রেমিকা।' জিজ্ঞেস করল 'মেয়ে ছেলেটার নাম কি সেটা বের ক'রে নেওয়া খুবই জরুরী?'

'কোনটা?' দ্রোনভ অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে। ও:,—ওইটা! হ্যাঁ, তা' বুঝি বই কি। কিন্তু ঘটনাটা তো অনেক পুরোনো হ'য়ে গেছে এখন।'

কর্নেল-হত্যার ব্যাপারে দ্রোনভের কতখানি অংশ—আদৌ সে তাকে মেরেছে বা মারেনি—তাতে আর এখন সামঘিনের কিছু এসে যায় না। সমস্ত ব্যাপারটা সুদূর অতীতে মিলিয়ে গেছে।

একটা সন্দেহজনক চেহারার ছোট রাস্তার মোড়ে বিদায় নিতে নিতে দ্রোনভ ওকে তিরস্কার ক'রে ওঠে: 'ভুলে যাস না।' ঠাট্টার সুরে যোগ দেয় : 'আমাকে ঘৃণা করবার জন্যে খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়িস না। মনে হয় তোর সঙ্গে আমার খুব নৈকট্য আছে, আত্মীয়তার মতোই '

'স্কাউণ্ড্রেল,' সামঘিনের আপাদমস্তক তিক্ত হয়ে ওঠে 'আত্মীয়তার মতোই—এই শূন্য-কুম্ভের সঙ্গে আত্মীযতা এই হতভাগাটার সঙ্গে আত্মীয়তা!'

'এ যে তার চেয়েও খারাপ, যদি সে শূন্যই হয়,– আরো খারাপ,' হলদে মুখের অসুস্থ অফিসারটিও তো তাই বলেছিল।

'আশ্চর্য জীবন কিভাবে মানুষকে নিবীর্য ক'রে তোলে। সত্যিই এক ভয়ংকর শক্তির দরকার, মানুষকে তাদের হাঁটুর ওপরে বসানোর জন্যে, ঠিক যেমন নতজানু হয়ে তারা প্যালেস্-স্কোয়ারে ওই হতভাগ্য জারের সামনে একদিন বসেছিল। তাঁর অক্ষমতা দেশকে ধ্বংস করছে, মানুষকে নিবীর্য ক'র তুলছে আর নেতৃত্ব নিয়ে ফেলছে যত সব ভীরু পাদ্রীগুলোর ওপর।'

*

এর আগে সামঘিন এতখানি তিক্ততা আর কখনো অনুভব করেনি, বাস্তব-জীবনের কুৎসিত-ভীষণতা এত গভীরভাবে আর কখনো উপলব্ধি করেনি। বাড়িতে স্পিভাক খুব সহজসুরে বলল · 'করনেভ মারা গেছে। একটা হ্যাণ্ডবিল লিখতে পারবেন?'

'সানন্দে,' বলতে কোন বাধাই এল না।

কিন্তু রচনাটা যখন শেষ ক'রে এনে দিল, স্পিভাক সেটা পড়তে পড়তে নিঃশ্বাস ফেলে বলে :

'নাঃ। এতে চলবে না। সমালোচনার অংশটুকু বোধহয় ভালই, কিন্তু বাদ-বাকী—আমরা যা চাই তা নয়। আমি নিজেই চেষ্টা ক'রে দেখি।'

যেতে যেতে শুনল স্পিভাক বলছে : 'লোকে বলছে করভিনও মারা গেছে।'

দেখা গেল, সত্যিই তাই। পরদিন সকালে সামঘিন দেখল প্রাদেশিক গেজেটে আলংকারিক ভাষায় শোক-সংবাদ বেরিয়েছে : 'যে মহাক্ষণে জারের প্রতি পরম আনুগত্যের শপথ হিসাবে নিজের আদর্শ অনুযায়ী হাজার-হাজার নরনারীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া মহৎ এবং সৎ-প্রেরণায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে বিপথচালিত কতিপয় উন্মাদের আঘাত-প্রসূত একাধিক দৈহিক ক্ষতের ফলস্বরূপ আজ মৃত্যু আসিয়া এই বীরকে নির্বাক করিয়া

দিল...'

'হাজার-হাজার! কি রকম মিথ্যাকথা!'

কিন্তু ইনোকভের গল্প যে কয়ারমাস্টার তাকে নাকি গুলী করেছিল, সেটাও তো প্রলাপের ঘোরে। সামঘিনের খুব ইচ্ছা ঘটনাটার বিশদ বিবরণ ইনোকভকে জিজ্ঞেস করে। ডাইনিং রুমে ও এল। শরৎকালের ভ্যাপসা গোধূলিবেলায় সেখানে মাছি ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে; একজন শক্তসমর্থ নার্স বসে-বসে ব্যান্ডেজ গোটাচ্ছে।

'শ্-শ্!' হিস-হিস ক'রে ওঠে সে। এক কোণায় শুয়ে আছে ইনোকভ, কোন নড়াচড়া নেই। অসুস্থ মানুষটার সঙ্গে কথা কইতে ডাক্তার সামঘিনকে বারণ ক'রে দিল।

'ওর মস্তিষ্কে এখন একটা কিছু ঘটতে সুরু হয়েছে।'

ইনোকভ আর করভিনের সম্পর্কটা বলতে আরম্ভ করে সামঘিন, কিন্তু ডাক্তার ওকে সাবধান ক'রে ছেড়ে দিল, বিড়বিড় ক'রে বলল :

'জানি। এ-ব্যাপারে আমার কিছুই করবার নেই। তবু তুমি যদি জানতে চাও তো বলছি কাল কয়ারমাস্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে ইউনিয়নিস্টরা খুব সম্ভব আরেকটা মার-কাট সুরু করবে।'

আরেকটা জলুসের সম্ভাবনায় সামঘিনের মেজাজ গম্ভীর হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবাব পর, ব্রুশভার কাছে গেল। বাড়ির জন্য সেই কম-দামটাই সই। হাতে-হাতে বায়না নিল, একগাদা দলাপাকান নোট ব্রুশভার মোটা হাত থেকে। দুঃখের সঙ্গে ভাবে :

'এই মত তিমোফেই ভারাভকার "প্রাশান্স্-বিজয়" সমাপ্ত হইল।'

বাড়ি ফিরে দেখে গেটে একজন পুলিস দাঁড়িয়ে, অলিন্দেও আরেকজন। শুনল ওরা ইনোকভকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল কিন্তু ডাক্তার তা দেয় নি। এক্ষুণি নাকি একজন পুলিস এবং কোর্ট ইন্ভেস্টিগেটর এসে হাজির হবে—ডাক্তারের বক্তব্য তিনি যাচাই ক'রে দেখবেন, এবং ইনোকভের শরীরে যদি সাক্ষ্য দেবার মতো যথেষ্ট বল থাকে তো তাকেও জেরা করবেন, অপরাধটা হচ্ছে "গুরুতর আঘাত-প্রদান যাহা দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়াছে।"

'মিথ্যা কথা বলছে হারামজাদা কুত্তার বাচ্চাগুলো,' রাগে গর্গর্ ক'রে ওঠে ডাক্তার লুবোমুদ্রভ। আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে এত জোরে জোরে টাই বাঁধছে যেন গলটা ছিঁড়ে ফেলবে।

সামঘিন বলল : 'ডাক্তার, আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু আমাকে যে আজই মস্কো যেতে হচ্ছে।'

ডাক্তার ব'লে ওঠে : 'বেশ তো, তুমি যেতে পার'।—যেন অনুমতি দিচ্ছে। 'লিজা আবার গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। মেয়েটা এত অবাধ্য, বুঝলে, যেন একেবারে একটা—ছাগল—একটা উ'ট—হ্যাঁ, সত্যিই!'

সামঘিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে গেল।

॥ ২৭ ॥

আবার বাড়িতে ফিরে আসে ও। ভারভারা গরম নাক দিয়ে গালে ঠোনা মেরে-মেরে আদর জানায়। মান-অভিমানের কত কথা, বর্ষার ধারার মতোই যেন অজস্র-বর্ষণ।

'টেলিগ্রাম করলে না কেন? রঙ্গ-নাটকে হিংসুটে স্বামীরাই এমনি কান্ড করে। কয়েক মাস ধ'রে এমন ব্যবহার, করছ যেন আমাদের ডাইভোর্স হ'য়ে গেছে—কক্ষণো আমার চিঠির উত্তর দাও নি—সময়টা এমনিতেই এত খারাপ, তার ওপর আমি একলা ছিলাম...'

অসহ্য-রঙচঙে ড্রেসিংগাউন আর পিঠ পর্যন্ত ছড়ান এলোচুল থেকে নতুন ধরনের একটা কড়া সুগন্ধ বেরুচ্ছে।

'বুড়ী হ'য়ে পড়ছে, এখন আর নিজের ওপর ভরসা নেই,' সামঘিন ভাবে। ভারভারা চোখ কুঁচকে ওকে দেখতে দেখতে শান্তকণ্ঠে ব'লে ওঠে,—গলায় এক আন্তরিক বিষন্নভাব :

'কপালের দু'পাশে তোমাব চুলে কি রকম পাক ধরেছে!'

'তুমিও এমন কিছু কচি হওনি।'

'কিন্তু আমি তো এখন সেজে নেই,' ভারভারা বলে।

কফি খেল ওরা। সামঘিনের মাথার মধ্যে এখনো যেন ট্রেনের লৌহগর্জন, ঘোড়ার গাড়ীর নিরুত্তাপ ঘর্ঘর-শব্দ, বড় শহরের বিচিত্র সব কলরব। চোখের সামনে এখনো পারার মতো বৃষ্টির ফোঁটা দুলে দুলে উঠছে। ওর কাছে এই নারী অপরিচিতা, তার হলুদ-হয়ে-আসা মুখ আর ঘোলাটে সবুজ-চোখের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবে: 'ওর নিশ্চয়ই উন্মত্ত রাত গেছে।' ভাবতেই অন্তরের রাগটা উথলে ওঠে। বলে : 'হ্যাঁ, বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। ভেতরে-ভেতরে যে ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়েছে সেটাতে ভয় পেয়ে উঠতে হবে বই কি মানুষকে; এই ঘৃণার নগ্ন-প্রকাশ আর তা'তে ভীত হ'য়ে ওঠাটা যে খুবই প্রয়োজন।'

মিনিট দশেক অনর্গল কথা ব'লে যায়। যেই চুপ করা অমনি মনে হলো ভয়ানক দৈহিক ক্লান্তি, যেমনটা হয় অনেকক্ষণ ধ'রে বমি করার পর।

'হায় ভগবান, তোমার মেজাজ একেবারেই গেছে!' নীচু গলায় ভারভারা বলে : 'কিন্তু তুমি কথা বল কি চমৎকার!...'

'এমন ভাবে কথা বলছিলাম যেন নিকনোভা,' সামঘিন ভাবে।

'কি চমৎকার! ঠিক জানি ওকালতীতেই তোমার ভবিষ্যত। প্রসিক্যুটর হিসাবে নাম করবে।' একটু হেসে আবার বলে : 'এমন প্রতিহিংসা নিয়ে কথাগুলো বললে যেন বিপ্লব হ'তে যাচ্ছে সে-টা আমারই দোষ। ভগবান জানেন এখানে কি ঘটবে।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে : 'সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে এর শেষ কোথায়। কত যে গল্প ছড়াচ্ছে. অবিশ্বাস্য কত গুজব। সমভা এসে পৌঁছেছে। প্রায় প্রলাপের ঘোরেই সে আর গোঘিনা চাঁদা তুলছে, শ্রমিকদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে তুলবে। ভাব তো! একদম এই কথাই বলছে—"অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করুন"! অবশ্য এখন সকলেই রিভলভার কিনছে। মিত্রোফানভ আবার এসেছে—এবারেও বেকার, মুখটা এমন কষ্টের, এমন অপরাধীভাব,—আর বিশেষ কথাবার্তাও এখন বলে না, শুধুই

হ্যঁ-হ্যাঁ করে।'

সন্ধ্যেবেলায় চমক্ দেবার মতো খবরের ফেরিওয়ালারা একে-একে ভারভারার কাছে আসে—এদের কাউকেই সামঘিন আগে দেখেনি। দৌড়ুতে-দৌড়ুতে আসে, চেয়ারে ভদ্রভাবে বসেও না, নিজেদেরকে ছুঁড়ে দেয়, চেয়ারগুলোর ওপর ধপ ধপ ক'রে পড়ে, নিজেদের বা আসবাবপত্তর কাউকেই রেহাই দেয় না।

'শুনেছেন? জানেন?' ধর্মঘটের কথা বলে, জমিদারদের এস্টেট লুঠ হ'য়ে যাবার কাহিনী, পুলিসের সঙ্গে ঠোকাঠুকির বৃত্তান্ত। ভারভারা সামঘিনকে জানায় যে একদল মহিলা নাকি ধর্মঘটিদের ছেলেমেয়ে আর নিহতদের বিধবা ও অনাথ-শিশুদের সাহায্য করবার আয়োজনও করছে।

'জান', প্রবল উত্তেজনায় সামঘিনকে জানায়: 'এখানে লোকজন মারাও যাচ্ছে।' গায়ের সবুজ উলের জামা, কানের ওপর দিয়ে আঁচড়ে নিয়ে যাওয়া চুল আর পাউডার-মাখা নাকে ভারভারাকে এমন কিছু সুন্দরী মনে হয় না, কিন্তু উত্তেজনা তাকে দীপ্তিময়ী ক'রে তোলে। সামঘিন বোঝে যে ভারভারা এ-কথাটা বেশ অনুভব করতে পারছে, কিছু-একটা'র মধ্যমণি হ'য়ে উঠতে পারায় খুব খুশী। কিন্তু সামঘিন এ-কথাও স্পষ্ট বোঝে যে ওর স্ত্রী এবং তা-র বন্ধুদের উল্লাসের পেছনে যে জিনিসটা গা-ঢাকা দিয়ে আছে—তা হলো ভীতি।



অভ্যাগতদের মধ্যে একজন ছিল বেশ চিকণ, তার লম্বা লম্বা চুল, কপালে একটা আঁব। সরু ঘাড়ে জড়ান বড় একটা লাল টাই। চিবুকের নীচে টাইটা ছোট হ'য়ে গেছে। সোজা সোজা কালো চুলের গোছ সরু হ'য়ে অদ্ভুত হল্‌দেটে মুখটায় বিকলাঙ্গের ছাপ এনে দিয়েছে; চওড়া নাকটা মুখের তুলনায় বেমানান। গোল গোল খুদে চোখ, কথা বললেই পিটপিট করে আর কৃতার্থ-হাসি হাসে।

'ব্রাঘিন', ক্লিমকে নিজের নাম জানিয়ে হিম শীতল আঙুল দিয়ে ক্লিমকে স্পর্শ করে। চেয়ারে বসে বেশ সাবধানে। মহাত্মাদের মতোই তিরস্কারের গলায় বলে:

'নিজেকে বলুন: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমরা সমাপ্তির সূচনায় এসে পৌঁচেছি!'

মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে যেন ছাদের লেখা পড়ছে এমনি ভাবে গমগমে গলায় বলে:

'শ্রমিকদের নেতৃত্ব করছে "মারাত" নামে একটা লোক—তার প্রকৃত নাম লেভ্ নিকিফরভ্। একজন কনভিক্ট, সাইবেরিয়া থেকে পালিয়ে এসেছে। অদ্ভুত কার্য-ক্ষমতা, ডিক্টেটরের মতোই স্বভাব-চরিত্র। গাল আর নাকের ওপরে জন্ম-দাগ। কাল আমি এক গোপন সভায় তার বক্তৃতা শুনলাম—চমৎকার বলে।'

সোনার চশমা পরা একজন শক্তসমর্থ ভদ্রমহিলা একটু ইতস্ততঃ ক'রে জিজ্ঞেস করলেন: 'সত্যি কি এদের সবাইকে জাপানীরা ঘুষ দিয়ে হাত করেছে?'

'জাপানীদের ঘুষের কথাটা রাজতন্ত্রীদের আবিষ্কার,' ব্রাঘিন দৃঢ় গলায় ঘোষণা করে। 'হুঁ, ভাল কথা, জানেন, যদি এ-সব স্ট্রাইক না হতো আর উইট্টে রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট না হ'তে চাইত তো কুরোপাত্‌কিন জাপানীদের ধূলিসাৎ ক'রে দিত। একেবারে ধূলিসাৎ,' ভারিক্কী-গলায় কয়েকবার বলল। তারপর অন্যান্য খবরের জাল বিছিয়ে বসে, সেগুলোও কিছু-কম অনাকর্ষণীয় নয়।

'অদ্ভুতরকম ওয়াকিবহাল,' ভারভারা সামঘিনকে ফিসফিস ক'রে জানায়।

সামঘিন বুঝতে পারে রাঘিনটা বোকা, শুধুই দেখন্‌-সার।—ভারভারা থেকে আরম্ভ ক'রে এই বাড়ির সবই তাই।

'বোধহয় অন্য সব বাড়িতেও এই একই রকম—' সামঘিন ভাবে।

সন্ধ্যেবেলায় বোকামি আরো বৃদ্ধি পায়। বিশাল একজন লোক, লাল টক্‌টকে মুখ, ড্রইংরুমে এসে প্রবেশ করল। নিজের সম্বন্ধে বলল : 'মাক্সিম র্‌-রিয়াখিন।'

লোকটার কাঁধদুটো চওড়া, মাথাটা ছোট, সরু-সরু লম্বা ঠ্যাংয়ের ওপর খাটো শরীর, তলপেটটা সামোভারের মতন। তার গোলগাল আঁটো-ক'রে টানা মুখটায় পাতলা, পরিষ্কার ক'রে ছাঁটা গোঁফের শোভা, গভীর হ'য়ে বসা দু'টো সানন্দ নীল-নীল চোখ, মোটা নাক আর বড়-বড় লাল ঠোঁট। তার সব কিছুতেই গরমিল যেন ধাক্কাধাক্কি ক'রে আছে। ছোট চাঁদিটা ঘাড়ের দিকে লম্বা হ'য়ে গেছে, ক্ষীণ কপাল, আর ফর্সা চুলের স্বল্প গোছ একটা চোখে বিশ্রী জবুথুনির ভাব এনে দিয়েছে। তার পায়ের জঙ্‌-ধরা কাপড়ের বুটজোড়া দেখে সামঘিনের মনে পড়ে যায় দৈত্যাকৃতি উইট্টের কথা, যার ডাকনাম "সাখালিনের কাউণ্ট।"

'আমি আশাবাদী,' রিয়াখিন বলে। 'রাশিয়াতে ওইটাই সবচেয়ে ভাল—আশাবাদী হওয়াটা, ইতিহাস তো তাই শিখিয়েছে। ইহুদীগুলোর মতো বেশী নার্ভাস যেন না হ'য়ে পড়ি। একটু-আধটু গোলমাল করুক না, হিংস্র উল্লাসেও মাতুক,—পরে তো পিঠের ওপর চাবুক পড়বেই। মনে নেই আপনার, অবলেনস্কি কি ভাবে লোকগুলোকে চাবকেছিল খারকভে, পলতাভাতে?'

তিন চুমুকে এক গেলাস চা শেষ ক'রে দিল। হাতের চেটো দিয়ে হাঁটুতে মারতে মারতে বলে (—হাতদুটো কিন্তু শরীর আন্দাজে নেহাৎ-ই খাটো—) :

'পলতাভা প্রদেশে চাষীরা এসেছিল এক এস্টেট লুঠ করতে। সেখানে তারা কাজ করে না। এস্টেটের চাষীগুলোর দশা কাঁথার ছারপোকার মতো। হ্যাঁ, এল তো ওরা, শোরগোলও করল। একজন বুড়ো লোক তখন গিয়ে তাদের বলল : "এ্যাই চুপ! সারঘেই মিখাইলোভিচ ঘুমোচ্ছেন।" বাস্‌, চাষীগুলোর আর টু শব্দ নেই, কিছুক্ষণ পা ঘষে-ঘষে বিদায় নিলে। সত্যি ঘটনা এ-টা,'—এই স্বস্তিকর ঘটনাটার শেষ করল বেশ সানন্দ কণ্ঠস্বরে।

'কী গর্দভ!' সামঘিন ভাবে, লোকটাকে লক্ষ্য করতে করতে দাড়ি চুমড়ায়। ভারভারাকে হঠাৎ হাসিতে বিগলিত হ'য়ে উঠতে দেখে,—যেন কাহিনীর চেয়ে কাহিনীকারের ওপরেই তার ভক্তি বেশী। সামঘিনের হঠাৎ ইচ্ছে করে রিয়াখিনের মাথায় মারে এক ঘুসি। তীক্ষ্নসুরে প্রশ্ন করে :

'তা-হ'লে আপনি কৃষকদের ওপর যে মারকাট চলেছে—খবরের কাগজের সে-সব তথ্যও বিশ্বাস করেন না?'

'স্রেফ রাজনীতি!' চোখে খুশী-খুশী ভাব ফুটিয়ে রিয়াখিন বলে : প্রতিক্রিয়াশীলদের একটু ঘাবড়ে দেওয়া তো দরকার। যদি সরকার চায় লোকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুক, তাহ'লে তো আমাদের সে অধিকার নিশ্চয়ই দিতে হবে। আর তা' দেবেও', সযত্নে নাসপাতি ছুলতে-ছুলতে রিয়াখিন প্রতিজ্ঞার ভঙ্গী করে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা স্বস্তিবাচক কাহিনী নিয়ে পড়ে।

সামঘিন বোঝে লোকটা "জনমনকে শান্ত করবার" একক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে।

ও এসে ওর স্টাডিতে ঢোকে। কি করবে ঠিক করবার আগেই ভারভারা এল।

'ওর উৎফুল্লতা কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে। খুবই বড়লোক, টেক্সটাইল-ফ্যাক্টরীর বোর্ডের মেম্বার—ওকে আমার প্রয়োজন আছে। এখন একটা সভায় যেতে হবে ওর সঙ্গে।'

ক্লিমকে চুম্বন ক'রে বলে :
'চালাক নয় কিন্তু অসাধারণ। আনারস খরমুজা চাষ করে।'
খরমুজার কথায় আবার হাসি পায়। খুক ক'রে হেসে চলে যায়।

*

সামঘিনের মনে হলো ও এমন একজন লোক যে অভিনয়-কালে মঞ্চের পেছনে ঢুকে পড়েছে, যে-সব তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেতা মঞ্চের ওপরে অভিনয়ে অংশ নেয় নি বা তার অর্থও যাদের বোধগম্য হয় নি, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে আছে। আয়নার নিজের শুকন ছোট্ট মূর্তি আর বিষণ্ণ-পাণ্ডুর মুখকান্তির প্রতিফলন দেখে ফরাসী উপন্যাস থেকে একটা কথা মনে পড়ে : 'জীবনের পরিমার্জিত যন্ত্রণা।'

সিগারেট ধরিয়ে আয়নার ওপর ধুঁয়ো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। নীল ধুঁয়ো সাময়িক-ভাবে প্রতিবিম্বিত মুখচ্ছবিটিকে মুছে ফেললেও কাঁচের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ছড়িয়ে গিয়ে আবার ওরা ওর চশমার মরণাত্মক বৃত্ত দুটি ফুটিয়ে তোলে,—আবার সেই নরম-নরম নাক, পাতলা ঠোঁট আর কালো দাড়ির ছুঁচালো বুরুশ।

'বেশ তো, তা'তে কি হলো ?' সামঘিন নিজেকে জিজ্ঞাসা করে। কেঁপে-কেঁপে উঠে চারদিকে চায়। ভাবতেই বিশ্রী লাগে, যে এত জোরে আর এত তিক্ত সুরে কথা ব'লে উঠেছিল।

'স্নায়ুরোগীর মতো মনে হচ্ছে যেন,' আয়না থেকে স'রে আসতে আসতে সতর্ক চিত্তে ভাবে। মনে পড়ে কিছুদিন থেকে কুটিল আত্ম-অসন্তোষের দাবদাহ বড় বেশী প্রাণে জ্বালা ধরাচ্ছে।

পোশাক পরে নিল। বেড়াতে বেরুল, যেন নিজের কাছ থেকেই দূরে-দূরে স'রে থাকতে চায়। শহরটা উৎসব-সাজের মতো আলোকমালা পরেছে। জানলায়-জানলায় বড় বেশী আলো আর রাস্তাগুলো জনাকীর্ণ। একলা পথচারি খুব কমই, লোকে দল বেঁধে চলেছে, কথাবার্তা অভ্যস্ত-ভঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশী সরব। ভাবভঙ্গীও যেন অস্বাভাবিক উত্তেজিত। মনে হয় যেন লোকগুলো কোন রোমাঞ্চ-কর দৃশ্য দেখে ফিরছে। পথচারিদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে-যেতে সামঘিনের কানে কথার কত টুকরো ভেসে আসে :

'কি হ'তে পারে ? শহরে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি বন্ধ হ'য়ে যাবে...'

'দোকানদারেরা দাঁও মারবে।'

'তুমি হরতালের বিপক্ষে ?'

'সকলের যা মত আমারও তাই ! হরতালে সাধারণ-লোকের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হ'তে পারে...'

দোকান ঘরের আলোর রেখায় চিন্তার গতি ঢিমে তালে চলে কিন্তু যেখানে অস্পষ্ট-আলো সেখানে তারা আরো স্পষ্ট, আরো মুখর।

'কালুগা প্রদেশে সতেরটা এস্টেট পুড়িয়েছে...'

অসংখ্য গির্জার ঘণ্টাধ্বনি উঠে ভয়পরবশেই মানুষকে সান্ধ্য প্রার্থনায় আহ্বান জানাল। কোচোয়ানেরা তাদের ঘোড়াগুলোকে সাঁইসাঁই ক'রে চাবুক মারে।

'কোচোয়ানেরা দুনিয়ায় সবচেয়ে শান্ত মানুষ', সামঘিনের মনে পড়ে।...একজন ওর পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল, তার ফারকোটের বোতাম-খোলা, ফারক্যাপটা ঢিলে-ঢালা, স্ত্রীলোককে বাহু-ধ'রে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে। লোকটা বলছিল :

'সোস্যাল-ডেমোক্রেটরা রাজনীতিতে অকাল-পক্ক। এ-সব "মারাত", বাউমান-দের বেশ ভাল ক'রেই তো জানি—সব শুধু গলাবাজীই করতে পারে। ইতিহাস তৈরি করবে শুধু কৃষক সভা...'

সামঘিন ঠিক করল গোঘিনদের বাড়িতে একবার যাবে, ওরা নিশ্চয়ই সব কিছু জানে। দেখল ওদের বাড়ি যেন রেল স্টেশন...গাড়ী-ছাড়বার-আগে যেমন লোকে গিজগিজ ক'রে সেইরকম। অনেক চেষ্টায় কনুই দিয়ে-দিয়ে তরুণী আর ছাত্রছাত্রী-দের ভীড় ঠেলে এগিয়ে যায়, তারা হল্‌ঘর থেকে ড্রইংরুমে যাচ্ছিল। ওর কানে ঠিক সে-মুহূর্তেই একটা বাজখাঁই গলা এসে চেঁচিয়ে ওঠে :

'লিব্যারেলরা যে বুলিঘিন-ডুমার বিরোধী, সেই তথ্য থেকে আপনারা ইতিমধ্যেই তো রাজনৈতিক কোট্‌নামির যে প্রয়োজনীয়তা আছে, সে-রকম একটা থিয়োরী খাড়া করেছেন।'

নানা সুরের কিন্তু ঠিক ওই-রকম বাঁজখাই গলাতেই বহু চিৎকার গর্জে ওঠে :

'মিথ্যা কথা!'

'চুপ, চুপ!'

'শেম!'

'কমরেড থামুন, চুপ করুন আপনারা!'

সামঘিনের সামনে দাঁড়িয়ে রেদোজুবভ পাশের লোকটিকে নীচু গলায় বলে :

'দেখছ তো এফিম—গৃহকর্তা ছাড়াই এরা নিস্পত্তি করছে। তুমি ছাড়া আর একজনও কৃষক এখানে নেই।'

গোলমালটা একঘেয়ে একটা শব্দে পরিণত হয়, তা'কে ছাপিয়ে ওঠে খস্‌খসে গলার আওয়াজ :

'বুর্জোয়া বুর্জোয়াই, অন্য কিছু হ'তেই পারে না।'

'ওই কি মারাত?'

'বোধহয়।'

'স্ট্রাইককে বিস্তৃত ক'রে সাধারণ ধর্মঘট ক'রে তোলা আমাদের কর্তব্য...'

রেদোজুবভের বিড়বিড়-কথায় অন্য কারো গলা কানে আসা সম্ভব নয় :

'শ্রমিক! ওদের কোন্‌ শ্রমিকটা রয়েছে? একটাও না!'

চিৎকার আবার প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠে : 'বারফট্টাই!'

'আন্দোলনের হাল ধরবার মতো শক্তি তোমাদের নেই...'

'৯ই জানুয়ারী প্রমাণ করেছে...'

'তোমাদের ক্লীবত্ব!

'তা-হ'লে ওদেসা-টা কি, "পোতেমকিন"-এর সময়ে?'

আশ্চর্য ব'লে মনে হয় যে এই অধৈর্য শব্দব্যূহ ভেদ ক'রে এখনো খস্‌খসে গলাটা ভেসে আসছে।—কুড়ালের বাড়ি আর তক্তার ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ আওয়াজকে ছাপিয়ে যেমন করাতের নিজস্ব শব্দটা ভেসে থাকে ঠিক তেমনিই যেন।

'শ্রমিকদের আঙুল দিয়ে যে আগুনের মধ্যে থেকে মালটি বার ক'রে নেবে, তা চলবে না...'

কে একজন তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে : 'আমরা বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছি গাঁজিয়ে তোলার সার যা দিয়ে মজুর আর কিষাণদের জমিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তোলা হয়, মতের অমিল-টমিল নিয়ে আমরা যেন শক্তি অপচয় না করি...'

ঘরের এককোণায় একটা লোক উঠে দাঁড়াল, দেওয়ালের ওপর যেন হামাগুড়ি দিয়েই উঠল। লোকটার গোল মাথা, গায়ে গিল্টির বোতাম বসান জ্যাকেট।

চেঁচিয়ে বলে : 'আমি নিঃসন্দেহ যে ইউনিয়ন সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দেবে...'

বিরাট একটা আওয়াজ হলো, একটু ভয়ার্ত চিৎকার, আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত-দুটো দুলিয়ে বক্তা অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর পড়ে-যাওয়ায় সমর্থনের চিৎকার আর হাসির হল্লা ওঠে। সামঘিন দোরের দিকে এগোতে আরম্ভ করে।

গোঘিনদের বাসায় যা বলা হলো তাতে এমন কিছুই ছিল না যা ও আগে না জানতো—মতামতের সেই চিরপরিচিত দ্বন্দ্ব, সেই সব মানুষের মধ্যে যাদের প্রত্যেকের ভয় পাছে নিজস্ব তন্ত্রী ছিঁড়ে যায়, "বাক্‌রীতির" প্রতি অকৃতজ্ঞতা ফুটে ওঠে। এদের সম্বন্ধে সামঘিন এই কথা ভাবতে অভ্যস্ত যে এরা তথ্যের ওপর নির্ভর ক'রে মতামত তৈরি করলেও, তথ্যকে অবজ্ঞা করবার জন্যেই তাদের মতামত সৃষ্টি। শেষ বিচারে দেখতে গেলে জীবন বিদ্রোহীদের সৃজন নয়, বরঞ্চ তারাই জীবন-স্রষ্টা যারা বিশৃঙ্খলতার মাঝে শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখে যা-তে শান্তির কালে তা'কে ব্যবহার করা যায়।... বাড়ি ফিরে চিন্তাগুলো টুকে রেখে সামঘিন শুতে গেল।

জং-ধরা লৌহ বরণ পোশাক প'রে সকালবেলা আনফিমিয়েভনা কফি দিতে-দিতে ওকে জানায় :

'তাজা বান্ পেলাম না। রুটিওয়ালারা হরতাল করেছে।'

সামঘিন কোন কথা বলে না।

'ট্রামও চলছে না।'

'হুঁ—'

'মনে হচ্ছে খবরের কাগজও নেই।'

'বটে?'

আনফিমিয়েভনা তখন দুই বাহু ছড়িয়ে অখুশী কণ্ঠে গমগমে সুরে ব'লে ওঠে :

'আচ্ছা, ক্লিম ইভানোভিচ, জার আর কদ্দিন দরদস্তুর করবেন?'

'জানি না,' জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে সামঘিন জবাব দেয়।

'এখন তো তাঁর নামা উচিত। আমাদের পাচকটি ছাড়া সব মানুষই তো তাঁর বিপক্ষে।'

'আর আমাদের পাচক কি বলে?' ক্লিম তামাশার ছলে শুধায়। কিন্তু বুড়ী ইতিমধ্যে সাইডবোর্ডের কাছে চলে গিয়ে রাগতসুরে বিড়বিড় ক'রে ওঠে :

'এমন কি পুলিসদেরও সন্দেহ হয়েছে। কাল শুনলাম তারা গ্রুজিনিতে লোকজনের ভীড় সরাচ্ছে—সেখানে আবার লড়াই হলো কি না, পুলিশ মার খেয়েছে। নিজনী-নভগোরদ ইস্টিশনেও খুব হৈ-হল্লা মারধোর হয়েছে। হায় বাপু...'

সামঘিন তার চওড়া-চওড়া বাঁকান পিঠটার দিকে তাকিয়ে থাকে, কাজ করতে-করতে জীর্ণ হয়ে পড়া মস্ত-মস্ত হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখে—সে-দুটো শুধু-শুধুই কাঁপে। মনে-মনে ভাবে : 'শীগগিরই বুড়ী শেষ হবে।' জিজ্ঞেস করে : 'কিন্তু জার কা'কে দেবেন। বল?'

'বাঃ' কত বুদ্ধিমান সব লোক রয়েছে আমাদের। সবাইকেই তো আর সাইবেরিয়ায় ঠেলে দেওয়া হয়নি। এ্যাই ধরনা, যেমন তুমিই তো আছ। গাদা-গাদা কতলোক আছে...'

একপাশ থেকে আরেক পাশে দুলে-দুলে হাঁটতে হাঁটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধা—দেখাল যেন এক বিশ্রী নীরেট লোহার মনুমেণ্ট।

*

ভারভারা বিছানা ছেড়ে ওঠবার আগেই সামঘিন ডেণ্টিস্টের কাছে গেল। দিনটা চমৎকার! রূপোলী সূর্য চন্দ্র-মল্লিকার মতো আকাশে ফুটে আছে। বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি উচ্চকিত। বিলম্বিত 'মাস'-য়ের পর গির্জাগুলো থেকে মস্কো শহরের মাংসল-নাগরিকেরা পিল্‌পিল্‌ ক'রে বেরোচ্ছে।

সামঘিন কিন্তু এক নজরেই দেখতে পায় গুড়ো-মাখা-রুটীওয়ালা, গোমড়া-মুখো কম্পোজিটার আর ট্রাম ও রেলকর্মচারীদের মধ্যে ছুটির ভীড়টা মিলিয়ে গেছে। এই লোকগুলো সব ডজনে-ডজনে বেরুচ্ছে গলি থেকে, শান্তভাবে হেঁটে চলেছে, সব কিছুতেই চোখ মেলে চেয়ে আছে, বড়-বড় স্টোরের দালানগুলোর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে, যেন সবাই হন্দ-গেঁয়ো, শহরে এসেছে এই প্রথমবার। ত্‌ভেরস্কাইয়া স্ট্রীটের যত কাছে এল ভীড়ও ততই জমাট বেঁধে উঠল। সামঘিনের মনে ভীড়টায় এক সানন্দ কিন্তু অবদমিত শক্তির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ভীড়টা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আনন্দে হাসে, ঠাট্টা-তামাশা করে, যারা সমশ্রেণীর নয় তাদের দিকে চোখ বড় বড় ক'রে দেখে, নিজের দেহের মধ্যে তাদেরকেও টেনে নেয়, সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলে। সামঘিন দেখল এমনি ভাবেই ভীড়ের মধ্যে এসে পড়েছে কত দামী দামী ফার-কোট-পরা পুরুষ, ছাত্র, পরিচ্ছন্ন-সম্ভ্রান্ত নাগরিক, বাকচপল বুদ্ধি-জীবী, কলরব-মুখর ছাত্রের দল, বহু স্ত্রীলোক এবং মেয়েরা—তাদের কেউ কেউ সাদাসিধে, আবার কেউবা কেতাদুরস্ত। দেখল যে তাদের নানান মূর্তি ভীড়ের ঐক্যবদ্ধ মেজাজকে বিভ্রান্ত না ক'রেই খুব সহজে জনতার মধ্যে মিশে গেছে। মনে হ'ল না নিজেও ওইভাবে ভীড়ের সঙ্গে বাহিত হ'য়ে যাচ্ছে কেন-না জন-সমাবেশের গতি ত্‌ভেরস্কাইয়া স্ট্রীটেরই দিকে, আর ও নিজেও তো স্ত্রাস্‌ৎনাইয়া স্কোয়্যারে যাবার জন্যে ওইদিকেই চলেছিল।

পাশের একটা রাস্তা থেকে ছ'জন ঘোড়সওয়ার পুলিশ বেরিয়ে এল। ভীড়ের মাঝখানে পড়ে তারাও ভীড়ের সঙ্গে-সঙ্গে ব'য়ে চলল,—জিনের ওপর ব'সে-ব'সে তারা দোলে, অনেক ইতস্ততঃ ক'রে চাবুক আছ্‌ড়ায়। দুই-তিন মিনিট তারা শান্তিতে চলে, কিন্তু ঠিক তারপরই প্রচণ্ড চিৎকার আর শিসের ধ্বনি উঠল, কানে তালা লাগবার জোগাড়। সামঘিনের সামনে একটা লোক লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মানুষ-জনকে খপ ক'রে কাঁধে চেপে ধ'রে প্রচণ্ড-জোরে চেঁচায় :

'তাড়িয়ে দেও, তাড়িয়ে দেও, এই ছয়-পায়া স্কাউণ্ড্রেলগুলোকে!'

পুলিশের ঘোড়াগুলো এক জায়গায় এসে জমে, সমান তালে মাথা নাড়ায়, সামনের পা-তুলে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে শুরু করে। সওয়ারেরাও সবাই সমতালে আগে-পিছে দুলে-দুলে চাবুক আছড়াতে শুরু করে; তাদের হাতগুলো যেন ভয়ানক ভার, যন্ত্রের মতোই ওঠানামা করে, মনে হয় ও-গুলো যেন কলের পুতুল। একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ উন্মাদের মতো চেঁচায় : 'কেন? বলো আমাকে—কেন?'

কয়েকটা থপ্‌থপ্‌ শব্দ হয়, লাঠি দিয়ে জল আছড়ানোর মতো। মুহূর্তের মধ্যে শত-শত কণ্ঠ ভয়ঙ্কর চিৎকারে ফেটে পড়ে। এমন চিৎকার সামঘিন আগে আর কখনো শোনেনি। মনে হ'লো গির্জার খোলা দরজা গুলো থেকে, উঠোন থেকে, বাড়ির দেওয়ালগুলো থেকে এবং মাটির নীচ থেকে আদিম শক্তিতে চিৎকারটা ফুটে বেরোল। সামঘিন দেখল কয়েক ডজনের হাত ওপরে উঠে গেল, ঘোড়াগুলোর

লাগাম ধরে টান মারল, পুলিশদের বাহু এবং কোট ধরেও। তাদের একজনের দু'পায়ে দু'দিক থেকেই সমানে টান পড়ায় লোকটা জিনের ওপর সটান বসেই থাকে, —হাউ হাউ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে, মাথাটা ডান দিকে ঘুরিয়ে নেয়, চোখ দু'টো ভয়ে বিস্ফারিত। আর একজন সামনে নুয়ে কোন রকমে ঘোড়ার ঝুঁটি ধ'রে থাকে, জানোয়ারটাকে ক'জন লোক ঠেলেই নিয়ে যায়। অন্য চারজনকে আর দেখা যায় না।

একটা সাদা চুল-ওয়ালা লম্বা লোক, তার কাঁধে ছিট্-ছিট্ রক্ত, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে অনবরত প্রশ্ন করতে থাকে:

'কেন?'

ঘটনাটা ভীতিকর নয়। কিন্তু হল্লা চেঁচামেচি যেই থেমে গেল অমনি সমস্ত আবহাওয়াটাই ভয়ের হ'য়ে উঠল। মন্ত্র পড়বার মতন সুরে কে যেন কী বলছিল, মনে হ'ল মৃতের জন্যে স্তোত্রই পড়ছে বা। হল্লাটা শান্ত হ'তেই চারদিক থম্‌থমে হ'য়ে পড়ল। নৈঃশব্দে ভয় লাগে। বহু জোড়া চোখ ঘোড়ার পিঠে চড়া একটা পুলিশের দিকে আঁঠার মত লেগে থাকে যেন সে কোন অস্বাভাবিক জীব যাকে এর আগে আর কোনদিন দেখা যায় নি। একজন ছোকরা—টুপী নেই, চুল কালো কুচ্‌কুচে—পুলিশের মাথার থেকে পীক্ ক্যাপটা ছিনিয়ে নেয়, খাপ থেকে তরোয়ালটা এক ঝট্‌কায় টেনে আনে, আর তারপর হাঁটুতে ঠেকিয়ে সেটাকে যেন কিছুই-নয় এমনি ভাবে মট ক'রে ভেঙ্গে ফেলে, ভাঙ্গা টুক্‌রোগুলো ঘোড়ার খুড়ের নীচে ছড়িয়ে দেয়।

'—ওকে হয়তো মেরেই ফেলবে,' সামঘিনের পেছনে একজন মন্তব্য ক'রে ওঠে।

আরেকজন উদাসীনভাবে বলে: 'ওই তলোয়ারটা দিয়েই ওকে মারা উচিত।'

পুলিশটাকে ঘোড়া থেকে হিঁচ্‌ড়ে বস্তার মতো ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। হাঁটু দুটো দিয়ে শরীরকে আঁটো ক'রে ধরেছে লোকটা, পরিত্রাহি চিৎকার করছে, তার লোমশ মুখটা নড়ে নড়ে উঠছে, কিন্তু চিৎকারটা শোনা-ও যায় না। তার বরফের মতো নীল মুখটা যেন গলে উঠেছে। কাঁদছিল লোকটা। ক্রিমের পাশে ওর চেয়ে একমাথা লম্বা একটা লোক দাগধরা জ্যাকেট প'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তার কর্কশ দাড়ি সামঘিনের কানে সুড়সুড়ি দেয়।

'চাবুক দিয়ে কেটে-কেটে তোলার বোকা অভ্যেসটায় ওরা বেশ রপ্ত হ'য়ে উঠেছে আজকাল,' লোকটা বেশ গম্ভীর-আত্মমর্যাদার সুরে ব'লে ওঠে। তার শুক্‌নো মুখের আদলটা সুজদাল আইকনের মত,—যেমনটি প্রায়ই দেখা যায়। জ্যাকেটটা আসলে কোট,—তলের ঘেরটাকে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া।

পুলিশকে পাশের একটা রাস্তায় নিয়ে গিয়ে একটা বাড়ীর গায়ে সেঁটে দেওয়া হ'ল যেন ও-ও একটা বিজ্ঞাপন। একটা কালো হাত এসে ওর মাথায় টুপী বসিয়ে দেয়। কিন্তু ও সেটা খুলে নিয়ে তা-ই দিয়ে মুখটা মোছে, বগলের নীচে সেটাকে পুরে ফেলে।

'মারল না তা'হলে,' সামঘিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভাবে, 'বোধহয় অনেক লোকের ভীড় সেইজন্যেই, বা হয়ত অনেক অজানা-অচেনা লোক রয়েছে, তাই-ই...'

কিন্তু বেশ বুঝতে পারে যে চিন্তাটায় বুদ্ধির হীনতা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, এক মিনিট কাল সময় তো ওরও কেটেছিল হত্যার তীব্র আশায়, অপরিসীম উৎকণ্ঠায়। হঠাৎ ওর মনে কৃতজ্ঞতা মেশান একটা অনুভূতি জেগে ওঠে এই মানুষগুলোর ওপর, যারা হত্যা করতে পারত কিন্তু করল না। শ্রদ্ধাও জাগে। অনুভূতিটার নিজস্বতায় ও হতভম্ব হ'য়ে পড়ে। ভুল হচ্ছে এই ভয়ে এ-কে দমন করতে চাইল। লোকগুলোর মুখচোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা ক'রে দেখে যে এরা ঠিক তাদেরি মত যারা তিন বছর আগে ধীর পায়ে ক্রেমলিনে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের

মনুমেণ্টের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ—ঠিক সেই একই মুখ, যদিও মানুষগুলো ভিন্ন। গ্যাপনের অনুসরণ ক'রে যারা দ্বিতীয় নিকোলাসের কাছে গিয়েছিল সেই সব শ্রমিকদের মত নয়।... এরা কী উদ্দেশ্যে কা'কে অনুসরণ করছে, সে-কথা বোঝা অসম্ভব। মন্থর পদে চলেছে, অনেকটা চাষীদের ধরনে, সামান্য গড়ানে চালে। কোন লাল পতাকা নেই, বিপ্লবী গান গাইবার কোন চেষ্টাও নেই। এদের মধ্যে একজন করনেভও নেই, যদিও কিছু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী আছে বটে—কিন্তু তারা "শিক্ষাকার্যে-ব্যাপৃত-ভদ্রলোক"-দের যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তার নিয়ম-অনুসারে তো তাদের উচিত ছিল শ্রমিকদের পালা সারিতে মার্চ ক'রে যাওয়া, এমনভাবে ভীড়ের মাঝখানে রোল-বিস্কুটে মেশানো পোস্তদানার মত তো তাদের মিশে থাকার কথা ছিল না।...তাদেরি একজন, সামঘিনের সামনে, উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা ক'রে উঠল —পেছন থেকে তাকে অনেকটা গুসারভের মতই দেখাচ্ছিল :

'যখন শ্রমিকশ্রেণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে তাঁদের শ্রমের মূল্য কতখানি...'

ইতিমধ্যে ও-পাশটায় পাকান' গোঁফ আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা ছেলে পেণ্টের দাগধরা জ্যাকেট-পরা লোকটাকে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে :

'ছাড়ান্ দাও। কী করতে যাচ্ছ? ভিক্ষে চাইতে?'

'রাগ ক'র না ইয়াশা...'

'বোধহয় এ-ই হচ্ছে "সমাপ্তির সূচনা"?' ক্লিম সামঘিনের মনে বিস্ময় জাগে।



ভীড়ের সম্মুখে বোধহয় কোন বাধা এসে পড়েছিল, কেন-না হঠাৎ থেমে যাওয়ার মত এক তরঙ্গ সমস্ত সমাবেশের মধ্যে এসে ছড়িয়ে পড়ল। লোকে গতি মন্থর করল, পেছুতে শুরু করল।

'কী ব্যাপার? রাস্তা আট্কাচ্ছে নাকি কেউ? পুলিশ নাকি?'

'চল, চল সব! এগিয়ে চল!' জোর-স্ফূর্তির আওয়াজ ওঠে, গম্ভীর-ও যেন। 'কমরেডেরা, এগিয়ে চল!'

'কশাক!'

'মারছে নাকি কাউকে?'

'দেখতে পাচ্ছি না।'

বাতাসে কয়েকটা সুদৃঢ় শাপ-শাপান্তের আওয়াজ; এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে সমগ্র জনতা সামনে ছুটে গেল। প্রায় কাছেই সামঘিন কয়েকটা কশাক-মাথা দেখতে পেল, ছোট-ছোট, প্রায় সব মাথাতেই এক-একটা ঝুঁটি পাক খেয়ে-খেয়ে ক্যাপের লাল রঙের ব্যাণ্ডের দিকে উঠেছে। ছোট্ট ঝুঁটিগুলোতে কশাকদের লাল-লাল ছোট মুখে এক ধরনের উজ্জ্বল একতা ফুটে উঠেছে। ঘোড়াগুলোও ছোট-ছোট, জাব্ড়া-জোবড়া। ওদের আর ওদের ওপরের সওয়ারীদের দেখে সামঘিনের আবার নতুন ক'রে মনে হ'ল কেমন সব পুতুল-পুতুল ওরা। বাঁকা-নাকের একজন কশাক অফিসার তার ঘোড়াকে বহু কষ্টে সামনে বা দু'পাশে সামলাতে-সামলাতে মোটা এক পুলিশ-অফিসারের কথা শুনছিল। পুলিশটি সাদা-দস্তানা মোড়া হাত দু'টো তার দিকে প্রায়ই উঁচু ক'রে ক'রে তুলছিল; তারপর ভীড়ের দিকে মুখ ক'রে রাগে এবং অনুনয়ে চীৎকার ক'রে উঠ্ল :

'কোন্ দিকে ঠেলতে-ঠেলতে চলেছ? হঠ্ যাও!'

সামঘিন দেখল কশাকদের ঘোড়াগুলো লাইন ভেঙে মাথা নাড়তে-নাড়তে মানুষের পিন্ডটার দিকে এগুচ্ছে, কশাকগুলো চাবুক আছড়াচ্ছে। বুঝে উঠতে পারবার আগেই, মাটি থেকে ও শূন্যে উঠে যায়, প্রচন্ড চীৎকার-চেঁচামেচি হৈ-হল্লা আর শিসের শব্দের মধ্যে ও-কে বন্‌বন্‌ ক'রে ঘোরান হয়, সামনে ছুঁড়ে ফেলা হয়। মাথাটা গিয়ে ধাঁই ক'রে লাগে একটা ঘোড়ার সঙ্গে, মাটিতে কার যেন ক্যাপ পড়ে যায়, কে ওর কানের মধ্যে গাঁইগুঁই ক'রে ওঠে। আবার চারপাশে ওকে ঘোরান' হয়, ধাক্কা খায়, এবং অবশেষে হতচেতন অবস্থায় নিজেকে আবিস্কার করে স্কবেলেভ মনুমেন্টের ধারে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক পক্ককেশ ব্যক্তি, তাকে দেখতে ঠিক পোশাকের আলমারির মত। ফিচ্‌লাইনিং দেওয়া কোটটা ওয়ার্ডরোবের দুই পাল্লার দরজার মত সটান খোলা, ভেতর থেকে উঁকি মারছে চক্‌মকে ভুরিদার এক তলপেট। হ্যাট-টা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে লোকটা ভয়ানক গম্‌গমে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে :

'অত্যাচারী! খুনে-জল্লাদ!...'

'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক্‌!' ভীড়ের সব জায়গাতেই গর্জন ওঠে। জনতার স্তূপীকৃত পিন্ড গোটা স্কোয়্যার জুড়েই দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও একটুও জায়গা নেই, কালো লপ্‌সির মত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুট্‌ছে। এই ঘন পিন্ডের মধ্যে ঘোড়াগুলো অস্বাভাবিক ভাবে লাফাচ্ছে যেন খুরের নীচের পাথুরে আর বরফ-মাটি গলে তরল হ'য়ে গেছে, ওদেরকে ধীরে-ধীরে গ্রাস করতে উদ্যত; তা-ই তো ওরা হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে জিনের ওপর নুয়ে-পড়া কশাকগুলোকে দোলাচ্ছে। কশাকেরা এদিক-ওদিক ডানে-বাঁয়ে চাবুক চালাচ্ছে সাঁই-সাঁই। লোকগুলো আঘাত এড়াতে-এড়াতে তীক্ষ্ন-ধ্বনি ক'রে উঠছে, চীৎকার করছে :

'নিপাত যাক ব্যাটারা!...ঘোড়া থেকে টেনে নামাও!'

ভীড়ের সঙ্গে-সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে সামঘিন দেখল কশাকেরা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে, কোথাও শুধু এক-একজন। তারা আর আক্রমণ করছে না, নিজেদেরকেই রক্ষা করছে। ক'জন অশ্বারোহী এরই মধ্যে জিনের ওপর কাঠ হ'য়ে পড়েছে, দুই-হাতে তাদের লাগাম কষে ধরা তাদের একজনের মাথায় টুপী নেই, মুখটা তোব্‌ড়ান', লোকটা এমন ক'রে দুলছে যেন মনে হচ্ছে তার হাসির তোড় উঠেছে। সামঘিন চীৎকার করতে-করতে এগোয় :

'বর্বর! কোন্‌ সাহসে তোরা...?'

কিন্তু এতো গন্ডগোল যে নিজের গলা নিজেই শুনতে পায় না। মনুমেন্টের পেছনে, ফায়ার-স্টেশনের কাছে সম্মিলিত কন্ঠের আওয়াজ উঠ্‌ছে, বেশ তালে-তালে চীৎকার, যেন কোন ভারী জিনিসকে টেনে ওপরে ওঠানো হচ্ছে :

'জার নিপাত যাক্‌! জার নিপাত যাক্‌!'

পদাতিক পুলিশ এল, কিন্তু ভীড় তাদেরকে খুব তাড়াতাড়িই গিলে ফেলে, গোটা স্কোয়্যারটাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেয়। গভর্নর-জেনারেলের বাড়ীর ঘষা-ঘষা জানলার ছায়া ঝিলিক্‌ দিয়ে ওঠে, নড়েচড়ে। একটা জানলায় দপ্‌ ক'রে আলো জ্বলে; আরেকটায়, ঠিক তার পাশেই, কাঁচ হঠাৎ ভেঙে পড়ে, চুর-চুর খন্ডগুলো নীচের দিকে ঝরে।

'আসলে এ-টা বিজয়। ওরা জিতেছে,'—যখন ভীড়ের চাপ সামঘিনকে লিয়োন্‌তিয়েভ্‌স্কি স্ট্রীটে এনে ফেলে তখন ওর মনে এই কথাটাই জাগে। লোকগুলোর নির্ভয়তায় অবাক হ'য়ে তাদের মুখগুলো ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে—উত্তেজনায় লাল টক্‌টকে মুখ, ঘুঁষির চোটে ফুলে উঠেছে, রক্তে মাখামাখি, তুহিন-ঠান্ডায় রক্ত-ও খুব দ্রুত জমে গেছে। আশা করে এবার উল্লাসের ধ্বনি উঠবে, বিজয়

গর্বের প্রদর্শনী হবে, কিন্তু লম্বামতন একটা লোক বয়স-হওয়া পুরনো ময়লা খাটো-কোট প'রে দেওয়ালে ঠেস দিতে-দিতে ঘৃণার সুরে ব'লে ওঠে :

'অফিসারটা গাড়োল! এর জন্যে তাকে সমুচিত শিক্ষা পেতে হবে!'

পাঁসনে-পরা একজন যুবতী লোকটার বাঁ-হাতের তালুতে রুমাল দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিল। ডান-হাত দিয়ে লোকটা কপালের ফুলে-ওঠা জায়গাটা ঘস্‌ছিল। আশেপাশে জনাছয়েক তারই মত অম্‌নি লোক দাঁড়িয়ে, সবাই অল্পবিস্তর আহত, তুষারে গড়াগড়ি খেয়ে ওঠা।

'কখনো ধারণা করতে পার অশ্বারোহীর একেবারে কাছে পদাতিকদের আসতে দিয়েছে? তার কাজ তো দূর থেকে, শত্রুকে ঠিক এই এতটা কাছ পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দেবে, তার একটুও আগে নয়, আর তারপর—চলো ঘোড়া ছুটিয়ে জোর-কদমে! পদাতিক কক্ষণো বাধা দিতে পারবেই না। ঘোড়াগুলো দেবে একেবারে তছনছ্ ক'রে। তখন—মারো আর কাটো। আর এখানে বুক পর্যন্ত এগিয়ে আসতে দিল। বোকাটা।'

'ঠিকই তো,' কাছে দাঁড়িয়ে একটা লোক সায় দেয়। 'হোস্ খুলে দিতেও তো পারত। এক-পা দূরেই তো ফায়্যার-স্টেশন।'

'এইভাবে যদি হেলা-ফেলা করে, তবে আমরা দেব ওদের তুলোধুনে!'

'অনেক ধন্যবাদ, ম্যা'ম', আহত-হাতের লোকটা ব'লে ওঠে, থু-থু ক'রে রক্ত ছিটোয়। 'ধন্যবাদ। বেশ সুন্দর ক'রে দিয়েছেন।—চল হে!'

আবার স্কোয়্যারের দিকে হাঁটে আহত ব্যক্তিটি, সেখানে গোলমালটা এখনো ঠিক আগের মত। সামঘিনও পিছু-পিছু চলে, লোকটাকে ঘিরে যত কথাবার্তা হয় তা' কান পেতে শোনে।

'ওর হাত থেকে আমি রিভলভার কেড়ে নিয়েছিলাম।'

'কুত্তা কাঁহীকা। আর ও কী করল?'

'ধপ্ ক'রে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ভেবেছিল বোধহয় যে আমি গুলী করতে যাচ্ছি...'

'ছাত্রেরা কিন্তু চমৎকার কাজ করেছে!'

'মারামারিকে তো ওরা ভালবাসে!'

'ওখানে একজন তরুণী মেয়েও ছিল—বেশ ছোট্টখাটো নাদুসনুদুস চেহারা, কিন্তু কী যে সাহসী তা' আর কী বলব! আমার তো মনে হচ্ছিল মেয়েটা পুলিস-ইনস্পেক্টরের গালে এই মারে তো সেই মারে, ইয়া এক চড়। আর দেখ, সে তো কুকুরের সামনে ইঁদুর বই তো আর কিছু নয়...'

"একটা লোক তো তার বেত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাব্‌কাচ্ছিল...'

'আচ্ছা, কমরেডেরা, যদি বুদ্ধিজীবীরা এ-নিয়ে আমাদের সঙ্গে সুযোগ নিতে আসে, তার মানে...'

শুনে অবাক্ লাগে, যদিও আলোচ্য বিষয়বস্তু অস্বাভাবিক ধরনের তবুও এই সমস্ত লোক তাদের সহজ সাধারণ ধারায় কথাবার্তা কইছে, প্রায় ভালমানুষের মতই! কোন তিক্ত কণ্ঠ বা শব্দ সামঘিনের কানে এল না।...হঠাৎ ওর সামনের লোকগুলো একযোগে ছুটতে আরম্ভ করে। তাদের দিকে স্কোয়্যার থেকে একটা প্রচণ্ড কান-ফাটান' শব্দ ভেঙ্গে পড়ল টরনাডো-র মত—স্পষ্টই বোঝা যায় ভয় বা ব্যথার চীৎকার নয়। সামঘিনের আশপাশ্ দিয়ে লোকে ধাক্কাধাক্কি ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে ওকে পেছনে ফেলে। কে-একজন ওর আস্তিন ধ'রে সঙ্গে-সঙ্গে টেনে নিয়ে চলে, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ক'রে ওঠে :

'কেউ পেছনে পড়ে থেকনা হে!'

*

স্কোয়্যারের মধ্যে প'ড়ে জনতার বিশৃংখল পিণ্ডটা একটা সজোর বহুকণ্ঠ-নিঃসৃত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে—স্খলিতচরণে পিছিয়ে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত সামঘিনের আসেপাশে সবাই ভয় বা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে পড়ে। একটা কোণে পর্চের সিঁড়ির ওপর সামঘিন চলে এসেছিল। আবার ওর স্থিতিটা জনতার মাথার ওপরেই হ'য়ে পড়েছিল।... জনতা একটা বীভৎস প্রাকার-বিধ্বস্তকারী বিশাল মুদ্গরের ন্যায় দুলছিল, কখনো সামনে কখনো পেছনে। ওদিকটায় ত্ভেরস্কাইয়া স্ট্রীটে যাবার মুখটায় রাস্তা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল হাতে বেওনেট নিয়ে গ্রিনেডিয়ারদের একটা গোটা কোম্পানী।

ফৌজের পেছনে একটা বাড়ীর ছাদের আল্‌সেতে ছোট্ট ছোট্ট মানুষের মূর্তি দেখা যায়, তারা এমনভাবে লাফায়, হাত নাড়ায়, যে মনে হয় কোন অদৃশ্য আগুনের তাপ এসে বোধহয় তাদের দগ্ধে দিচ্ছে। অঙ্গভঙ্গী করতে করতে তারা পুলিশ আর কশাকদের মাথায় ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারে কত তক্তা, ইঁট, আর আরো-কতশত ধুলো-ভরা বেনামী বস্তু। একটা উল্লসিত চীৎকার ফেটে পড়ে :

'হুর্‌রা! ফিলিপ্পভ ছোক্‌রাদের পক্ষে বেশ ভাল, হুর্‌রা!'

ময়দার গুঁড়োয় মাখামাখি একটা লোক পরণে শুধুমাত্র একটা সার্ট আর অনাবৃত পায়ের ওপর শুধু শতছিন্ন একটা পোশাক, কাঁধের ওপর বস্তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কথাতেও ঠিক ওই উল্লাসেরই প্রতিধ্বনি। লোকটা বল্‌ছিল :

'তাই আমরাও মজদুর হিসাবে দোস্তীর খাতিরে হরতাল করলাম। রাস্তায় এলাম, চুপচাপ হল্লা না ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলাম, আর তখন কশাকগুলো এসে চাব্‌কাতে শুরু করল...'

'চাব্‌কাতে?' কে-একজন গর্জে ওঠে।

'মানে, আমাদের ক-জন দৌড়িয়ে ভাগ্‌ল—নিজেদের সাম্‌লান'র তো আর আমাদের হাতে কিছু নেই—তারা সব গিয়ে ছাদে উঠ্‌ল......'

সামঘিন ছাদের দিকে চায়। সাহসী লোকগুলোকে গুনতে যায়, স্কুলের ছাত্রের মত ছোট্ট দেখাচ্ছে ওদের। কিন্তু দেখা গেল গোণা অসম্ভব। তীব্রগতিতে চোখের সামনে দিয়ে তারা ছাদের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে কাঠের গুঁড়ি, তক্তা, ইঁট, টিনের পাত নীচের দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে, ছাদ থেকে যে পড়ে যেতে পারে সে-কথা মোটেই ভাবছে না। এই টিনের পাতগুলোই বিশেষ ক'রে কশাকদের ঘোড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সামঘিন বারবার চশমা খোলে আর পরে, অদ্ভুত লড়াইটাকে লক্ষ্য ক'রে ক'রে দেখে, লড়াই তো নয় যেন দুষ্টু ছেলেদের হুল্লোড়। ভীতচকিত ঘোড়াগুলো পাগলের মত ছোটাছুটি করছে, আরোহীরা তাদের প্রাণপণে চাবুক মারছে। পাশপথ থেকে সৈন্যদের একটা ছোট দল রাইফেল উঁচিয়ে আকাশকে ভয় দেখায়, ছাদের দিকে তাক্ করে। কিন্তু প্রচণ্ড চীৎকার-চেঁচামেচির জমাট ভীড়ে কোন গুলীর আওয়াজ শোনা যায় না। ছোট-ছোট রুটিওয়ালারা ছাদ থেকে গড়িয়ে-ও পড়ল না। এ-সব এমন কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়, কিন্তু কী যেন একটা আছে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

ওর চারপাশে দ্রুত-চকিত কথাবার্তা কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

'ওরা চিম্‌নি ভেঙে ফেলছে।'

'নিজেকে যখন রক্ষা করতে যাবে দেখবে ও-টা দিয়েও কিছু করা যায়,' উল্লসিত গলায় কে চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্রূপ-ভরা টিপ্পনিও ভেসে আসে।

'যখন যাবে! যাও-না শুধুহাতে একটা সেপাইকে ধরাশায়ী ক'রে এস, চেষ্টাই কর না! যদি আমাদের হাতে নিজেদের রক্ষা করবার মত বস্তুই থাকবে তবে এখানে আর জটলা পাকাতাম না...'

'উঃ! যদি ওদের হাতে কিছু ইঁট তুলে দিতে পারতাম...'

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতের লোকটা, যার কণ্ঠস্বর সামঘিন সঙ্গে-সঙ্গে চিনতে পারে, বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বোঝাচ্ছিল :

'বুলেট দিয়ে ছাদ থেকে কাউকে নামাতে পারা যাবে না। বুলেটের জন্যে প্রপার লাইন চাই...'

মানুষের স্তূপটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ্য করে,—গাঁয়ের লড়াই-কোন্দলে ছেলেরা যখন ধস্তাধস্তি করে তখন দশাসই জোয়ানেরা যেমনটি করে, ঠিক তেম্নিই।

'আরো ফৌজ আসছে।' একজন থম্‌থমে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে সামঘিনের কানে এল ঝাঁকবাঁধা রাইফেলের সেই অবিস্মরণীয় শুক্‌ন আওয়াজ।

'আরে : !'

'ফাঁকা আওয়াজ...'

'এ-সব ফাঁকা-আওয়াজের কথা আমরা আগেও শুনেছি...'

'চল, চল, যাওয়াই ভাল!'

তাই শুনে সামঘিনকে যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই লিয়োন্‌তিয়েভ্‌স্কি স্ট্রীটের দিকে রওনা দিল,—বিশেষ ব্যস্ততা নেই চলনে,—মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে যেন ফিরে আসবার ডাকের প্রতীক্ষাই করছে। সামঘিনও চল্‌ল, সেণ্ট পিতর্সবুর্গের ভিবর্গস্কি সাইডে মনের যে স্বাচ্ছন্দ্য আর উত্তাপ এসেছিল এখনো ঠিক তাই-ই। মোটমাট মনে বেশ তৃপ্তি, যেন রিহার্স্যাল দেখে বুঝতে পেরেছে নাটকের মধ্যে তেমন কোন স্নায়ুদৌর্বল্যের কারণ নেই, বেশ ভাল ভাবেই অভিনয় করা যেতে পারবে।



সপ্তাহখানেক সামঘিন বেশ উত্তেজিত অবস্থায় দিন কাটায়, স্ত্রীর উৎকণ্ঠায় বেশ নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করে।

'ক্রিম কী হবে ব'লে তোমার মনে হয়?' প্রত্যেক দিন সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়বার পরে ওর সেই এক প্রশ্ন। কণ্ঠস্বরে অভিযোগ ভরা থাকে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় শুধু স্ট্রাইক্‌ ছড়িয়ে পড়বার খবর, কিষাণ-আন্দোলনের, আর মস্কো-তে খাদ্য-দ্রব্য আমদানী করবার পরিবহণ ব্যবস্থার ক্রমঃ-অবনতির কথা।

'ওরা যুদ্ধ করছে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে, আর তার সাথে-সাথে আমাদেরকেও উপোষ করিয়ে মারবে.' আক্ষেপের সুরে ভারভারা বলে, কাঁধ দু'টোয় এত জোরে ঝাঁকুনি দেয় যে সেগুলো কান পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। 'আমাদেরকে নিয়ে টানাটানি কেন?'

আক্ষেপটা যে শুধু ভারভারারই তা নয়। তার বন্ধুদেরও একই কথা। আজকাল পরামর্শক জুটেছে "অদ্ভুতরকম ওয়াকিবহাল" ব্রাঘিন। সে তার চুল আরো ছোট

ছোট ক'রে ছে'টেছে, লাল টাই-এর বদলে স্ট্রাইপ্ দেওয়া নীল একটা টাই পরেছে। নতুন টাইটা তার চিবুক ঢেকে রাখ্তে পারে না, সেটাকে এখন সূচ্যগ্র দেখায়, প্রায় বিকৃতই যেন, দন্ত-হীন বুড়ো মানুষের মত তার চিবুকটাও ওপর দিকে তুব্ড়ে গেছে, মোমের মত নরম নাকটা তাতে আরো লম্বাটে দেখায়। সমস্ত মুখটাই এমন টেনে তোলা যে মনে হয় লোকটা বোধহয় রাগ ক'রেই আছে।

কেশে-কেশে ভোঁস্-ভোঁস্ আওয়াজ তুলে সে বলছিল: 'জানেন, আসলে এ সবই হাস্যকর! ওরা পথে বেরিয়ে এল, গভর্নর-জেনারেলের জানলার নীচে একটা লড়াই করল, আর কোন রকম দাবী-দাওয়া উপস্থিত না ক'রেই চলে গেল। এগারোজন মানুষ নিহত হ'য়েছিল, বত্রিশ-জন আহত। কী রকম হ'ল এটা? আমাদের পার্টিরা কোথায়? জনতার জন্যে রাজনৈতিক ডিরেক্শন কোথায়? আপনিই বলুন।'

সামঘিন নীরবতা বজায় রেখেই থাকে। কোনই সন্দেহ নেই যে রাজনৈতিক-ডিরেক্শন ছিল না, কোন নেতাও ছিল না। কিন্তু এখন ব্রাঘিন অভিযোগ করবার পর ও বুঝতে পারল যে আন্দোলনটায় যে পরিতৃপ্তি ও পেয়েছিল সেটা তো শুধু এই বিশেষ কারণটির জন্যে, যে সেখানে কোন নেতা ছিল না; যে সোস্যালিস্ট-পার্টিদের আন্দোলনে কোন ভূমিকাই ছিল না। যে সব বুদ্ধিজীবীরা মিছিলে অংশ নিয়েছিল তারা শুধুই ভাল মানুষ, সাহিত্য যাদেরকে ছোটবেলা থেকেই "মানুষেরই প্রতি ভালবাসায়" উদ্বুদ্ধ করেছে তারা শুধু তাই-ই—আর কিছুই নয়।

শ্রমিকদের তরফে যে ঐক্যবদ্ধ কর্মের অভাব আছে ব্রাঘিন তা'তে ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে জানাল যে কিষাণদের কাজ শুধুই যে অত্যধিকতা নয় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ও বটে।

'এ-তো পুগাচেভিজমে্র আরম্ভ,' চোখের ওপরে ভোঁয়া বিস্তার ক'রে ব্রাঘিন ঘোষণা করে—ওপর থেকে নীচে নয় যেমন মানুষে করে, কিন্তু পাখীদের মতন নীচে থেকে ওপরে।

রিয়াগিন্ও বোধহয় একটু হতাশ হ'য়েই ছিল। হাত দিয়ে বাতাসে জটিল আবর্ত সৃষ্টি ক'রে অপরাধীর কণ্ঠে সে বিড়বিড় ক'রে ওঠে:

'হ্যাঁ তারা জিনিসটাকে খুব বাড়িয়েই তুল্ছে—ভয়ানক উচ্ছৃংখল ওরা। হায়, এই হতভাগ্য গভর্নমেণ্ট।' ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

রেদোজুবভ্ও উল্লসিত কিন্তু শ্লেষাত্মকভাবে। সামঘিনের সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল একটা মিটিং-য়ে।

'কিষাণদের সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?' রেদোজুবভ্ ওর কাঁধে চাপড় মেরে বলে উঠেছিল। যেন প্রতিজ্ঞা করছে এম্নি সুরে যোগও করেছিল: 'ওরাই দেখিয়ে দেবে কিসের অর্থ কী।'.

সামঘিন কোন উত্তর দেয়নি, এমন কী ওর পানে তাকিয়েও দেখেনি। তলস্তয়ের এই প্রাক্তন অনুচরটি ওর মনে অস্পষ্ট ভীতির উদ্রেক করেছিল। এমন বহু লোক রয়েছে যাদের মধ্যে "মানুষের প্রতি ভালবাসার" পূর্বতন বৃত্তিটি মানুষকে ভয় পাবার মনোভাবই জাগিয়ে তুলেছে। অবশ্য রেদোজুবভ তাদের থেকে স্বতন্ত্র। চাষীদের মারামারি হানাহানি থেকে সে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর আনন্দ পায়, যেমনটি সাধারণতঃ পেয়ে থাকে গোপনে যারা ইন্ধন যোগায় সেইসব এজেণ্ট প্রভোকেচাররা। —স্বাতন্ত্র শুধু এইখানেই।...কিন্তু সামঘিনের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন দেখে রেদোজুবভের মনোভাব যে ওর নিজের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, এমন কী সমশ্রেণীর ব'লেই বোধ হচ্ছে।

*

অন্য লোকের ওপর সামঘিনের মনোভাব এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সংযত, অনেক বেশী সংরক্ষিত। সকালের কাগজে ফেঁটিয়ে-তোলা জাতীয়তাবাদের কথা পড়ে দুপুরের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়; রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরে, জমায়েত আর মীটিংগে যায়, শোনে, দেখে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়, জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু নিজের মতামত কখনো ব্যক্ত করে না, রেস্তোরাঁতে ডিনার খায়, বৌকে মনে করতে দেয় যে ও বোধহয় কোন গোপন রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিজের ভেতরে টানাপোড়েন্ চলেছে বুঝতে পারে, যেন পুরোপুরি বিদ্যুৎ-সঞ্চার হ'য়ে আছে ভেতরটায়। এক-এক সময় ভয় হয় যে ওর কথা না শুনেই হয়ত অন্তরের মধ্যে কিছু-একটা ফেটে পড়বে, আর তখন অস্বাভাবিক কোন কাণ্ডই ক'রে বসবে বা,—আর সেটা-ও হবে নিজের বিরুদ্ধেই। কেননা এ-বিষয়ে ও সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে দেশে যাই ঘটুক সে-সমস্তই ওকে ওর স্বকীয়তা খুঁজে পাবার জন্যে রাস্তা সাফ ক'রে দিচ্ছে! সারাজীবন এই হতচ্ছাড়া কিম্ভুত-বাস্তবটা আত্মোপলব্ধির পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, নিজের অস্তিত্ব-র ভেতরে ওতপ্রোত হ'য়ে মিশে গেছে, মনকে জোর ক'রে শুধু তা'র ভাবনাই ভাবিয়েছে, কিন্তু কখনো তা-কে ছাপিয়ে ওপরে উঠতে দেয়নি, তার অত্যাচার থেকে মুক্ত মানুষ হ'য়ে উঠতে পায়নি।

সেণ্ট পিতর্সবুর্গে শ্রমিক-প্রতিনিধিদের "সোভিয়েত" গঠন হ'য়েছে, সে-খবর প'ড়ে সামঘিন হতভম্ব হ'য়ে পড়ে।

'হ্যাঁ, এখন এ-টা কী হ'ল?' খবরের কাগজটাকে রুটির-টুকরো-ভরা ন্যাপকিনের মত ঝাড়তে-ঝাড়তে ভারভারা ঘুম-ঘুম কণ্ঠে রাগে খিচ্‌খিচ্ ক'রে ওঠে।

'দেখছ তো শ্রমিকদের একটা সংগঠন,' চিন্তান্বিত সুরে জবাব দেয়। ভারভারা কিন্তু ক্রমশঃ মেজাজ চড়িয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে:

'এই সব খুস্তালেভ-নোসার, ট্রটস্কি, ফেইট, এরা কে? কুতুজভের মত লোক? আর কুতুজভ-ই বা কোথায়?'

'জানি না।'

'জেলেই সম্ভবতঃ।'

'হ'তে পারে।'

'আমাদের সবাইকে জেলে পাঠিয়ে তবে এর শেষ হবে।'

'সেটা-ও সম্ভব।'

'অথবা আমাদের হয়ত মুছে ফেলা হবে।'

'দেখা যাবে সে-টা।'

মেঝের ওপর কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভারভারা চেঁচিয়ে ওঠে: 'যত্তো পাগলামি!' খোলা গোড়ালী ঠুকে ঠুকে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। সামঘিন কাগজটা তুলে নিয়ে পড়ে জেম্‌স্ত্‌ভো-লোকদের কংগ্রেসের কথা, তারাও একটা পার্টি গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পড়ল,—'কাউণ্ট হাইডেন, মিলিউকভ, পেত্রুঙ্কেভিচ।' পূর্বতন চীফের নামটা কোন আলোড়ন না তুলেই ঝলক দিয়ে চলে গেল।

'ওরা ভয়ানক দেরী ক'রে ফেলল,' মনে-মনে ভাবে। কিন্তু শ্রমিকদের সোভিয়েতের সঙ্গে-সঙ্গেই যে খ্যাতিমান্ লিব্যারেলেরাও একটা পার্টি গঠন করছে তা-তেই ও খুশী হ'য়ে ওঠে।

নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল, 'অভিজ্ঞ রাজনীতিক এরা, প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি।' কিন্তু সান্ত্বনাটা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী হয়।

'শ্রমিকদের একটা সোভিয়েত—আর ইতিমধ্যেই সমাজ-বিপ্লবের লাইন অনুযায়ী একটা আন্দোলন,' ত্ভেরস্কাইয়া-স্ট্রীটের মিছিলের কথা মনে পড়তেই ও ভাবে। কশাকদের সঙ্গে লড়াইয়ে শ্রমিকদের নির্ভীকতার কথা মনে পড়ে, ছাদের ওপরে রুটিওয়ালাদের সেই ছবি, কী অদম্য উৎসাহে তারা শহরটাকে চোখ দিয়ে গিলছিল।

'সোস্যালিস্টদের বাদ দিয়ে সোস্যাল-রেভল্যুশন,' আবার নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। মনের সঙ্গে তর্ক জোড়ে, অর্থহীন শব্দহীন সে-তর্ক, কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আরো বেশী বিভ্রান্তিকর। পোশাক প'রে বেরিয়ে পড়ল। যাদেরি চেহারায় বুদ্ধিজীবীর ছাপ তাদের সবাইকে ও খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। নিঃসংশয় হয় যে এরা অন্তরে-অন্তরে ওরই মত শতধা-বিদীর্ণ এবং ওরই মত বিভ্রান্ত। রাস্তায় লোক ভর্তি, তাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যাও অনেক। চলাফেরায় কোন রকম ব্যস্ততা নেই, দেখে শুধু দুটো জিনিস মনে হয়, এক, এরা আল্‌সেমিতে সময় নষ্ট করছে আর দুই, হয়ত কিছু ঘটবার প্রতীক্ষা করছে।

সার্মাঘন সেটার অর্থ করে, 'বৈচিত্র্যের তৃষ্ণা—চাঞ্চল্যকর ঘটনায় এরা অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ছে।' লোকে সাদামাটা গলায় কথাবার্তা বলে, সার্মাঘনের স্মৃতিতে রাখবার মত কিছুই ফেলে না। বেশীর ভাগ আলোচনাই মাংস-মাখনের দর বাড়া আর শহরে কাঠ আমদানী বন্ধ, এই নিয়েই। মনে হয় গোটা শহরটাই যেন আশায়-আশায় শান্ত হ'য়ে পড়েছে। ভীড়ের ওপর দিয়ে বেশ জোর বাতাস বয়, বিচ্ছিরি স্যাঁতসেঁতে। আকাশে নীল-নীল দাগ ফুটে উঠেছে, জ্যাবড়া-জোব্‌ড়া ভোঁয়ার নীচে চোখগুলো যেমন আধখোলা হ'য়ে থাকে, ঠিক তেমনিই। সব মিলিয়ে অন্ধত্ব আর মানসিক ক্লান্তির অনুভূতি জাগে।